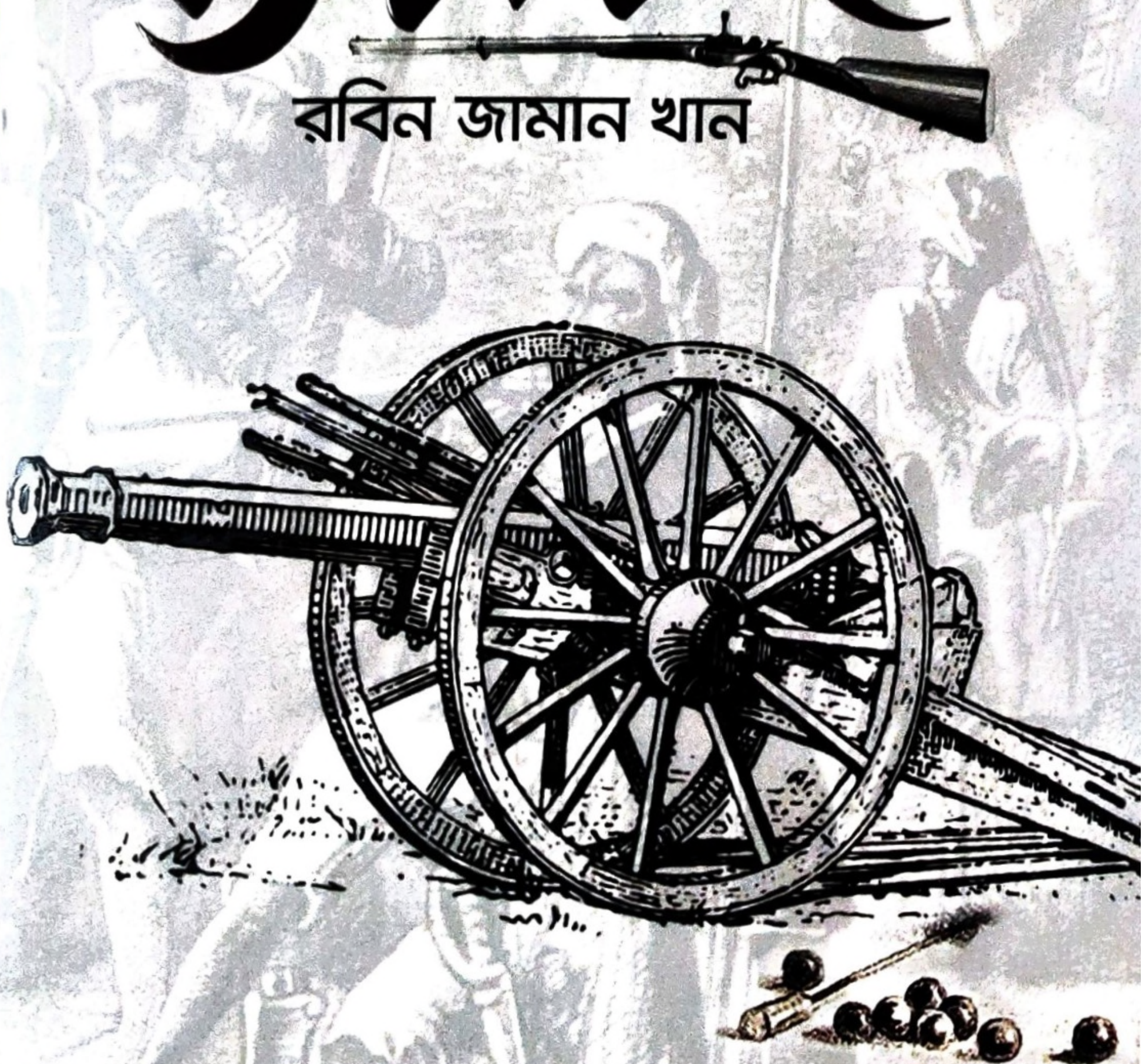


মিস্টার

রবিন জামান খান



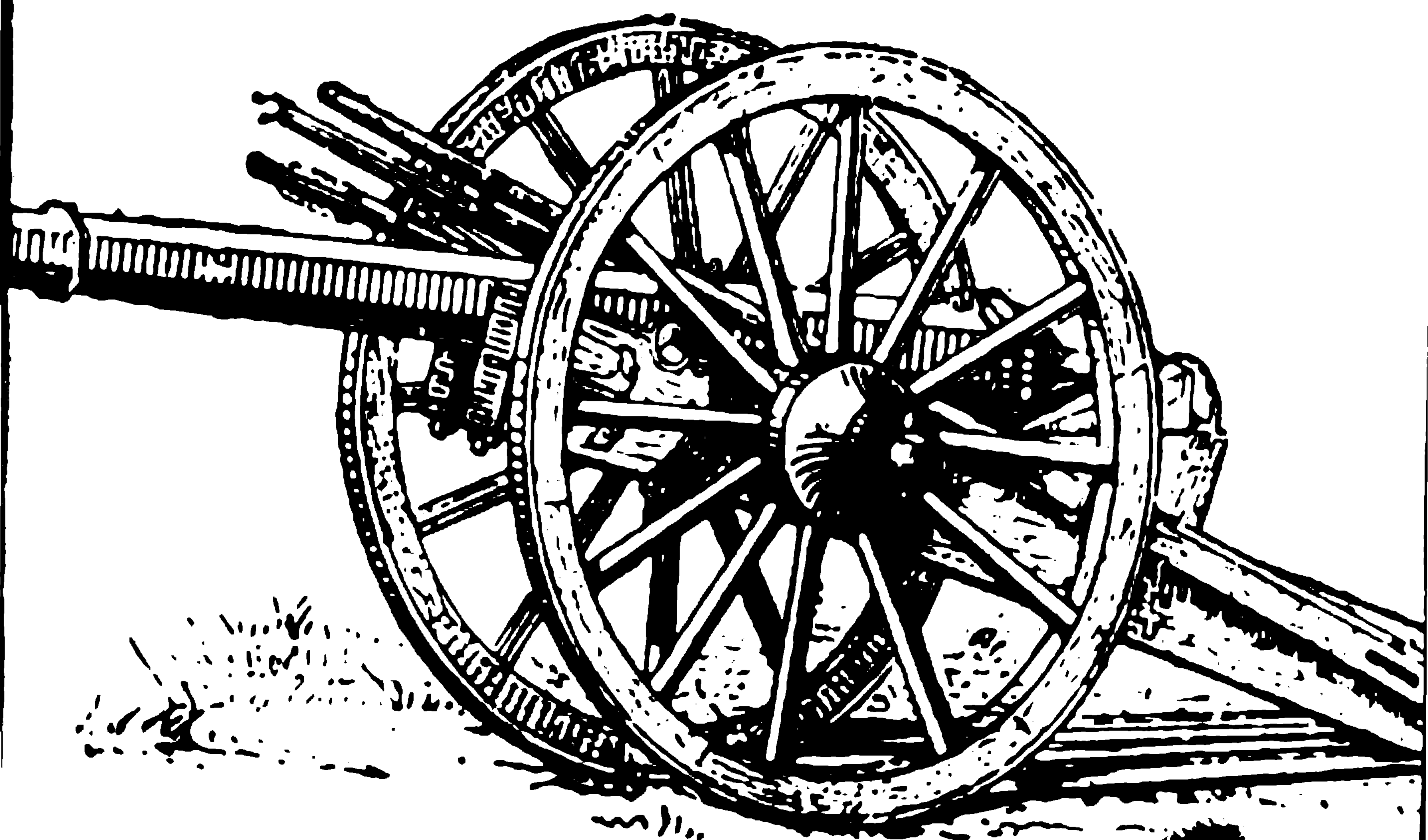
মির্জা হা



অন্যধারা

মিস্টার

রবিন জামান খান



অন্যধারা

অন্যধারা

.....
প্রকাশক বা লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ
পুনরুৎপাদন, প্রতিলিপি বা কোনো ধরনের পিডিএফ বা অনলাইন ভার্সনও তৈরি
করা যাবে না। করলে সেটি প্রকাশনা আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয়।
.....

প্রকাশক
মো. মনির হোসেন পিটু
অন্যধারা
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১২৩১৬৬, ০১৭১২৮০৭৯০১, ০১৯২০২১৬৯৬৮
email : eanyadhara@gmail.com

প্রকাশকাল
অমর একুশে বইমেলা ২০২৪
প্রচ্ছদ
আশরাফ ফুরাদ
© লেখক
কম্পোজ
অন্যধারা কম্পিউটার্স
৪৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ
তানভীর প্রিন্টার্স
১৮ হেমন্তদাস লেন, ঢাকা-১১০০
আমেরিকা পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক
www.muktadhara.com
মুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২, ব্রিক লেন, লন্ডন।
মূল্য
১০০০.০০ টাকা মাত্র

Sipahi By Robin Zaman Khan
Published by Md. Monir Hossain Pintu
Anyadhara
38/2-Ka, Banglabazar, Dhaka 1100
Price : Tk. 1000.00 Only
ISBN : 978-984-98319-4-5

ঘরে বসে বই পেতে কোন কষ্টই নেই
অথবা লগ অন করুন <http://rokomari.com/anyadhara>
<http://anyadhara.com>

উৎসর্গ

এই জীবনে আসলে কি মায়ের চেয়ে আপন কেউ হতে পারে আমাদের?
অন্যদের কথা জানি না, তবে অন্তত আমার জীবনে এমন একজন মানুষ
আছে, যে আমার আশ্রুর চেয়ে অধিক না হলেও অন্তত কোনো অংশে কম
ভালোবাসে না আমাকে...

এক জীবন যে-মানুষটার ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়,
সেই পরম ভালোবাসার ও শ্রদ্ধার আমার ছোট খালা রাকিমা খাতুন
সেলিনাকে। যে-কথাটা বলা হয়নি কোনোদিন আপনাকে, হয়তো
সামনাসামনি বলতেও পারব না, সেই কথাটা এখানে বলতে চাই,
ভালোবাসি আপনাকে। দোয়া রাখবেন আমার জন্য।



পূর্বকথা

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

শ্রেয় বিদ্রোহ ও বিষের গল্প

রক্তের দিকে তাকিয়ে থাকাটা কখনোই খুব সুখকর বিষয় নয়। আর যদি সেটা হয় নিজের রক্ত, তাহলে সেই অনুভূতি সুখকর হওয়ার কোনো কারণ নেই।

শরীর থেকে গল গল করে বের হয়ে আসা কালচে রক্তের দিকে তাকিয়ে খুব বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছে তার। বিশেষ করে চোখের সামনে যেন নিজের মৃত্যু দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার। অদ্ভুত ব্যাপার হলো মৃত্যু তার জন্য নতুন কিছু নয়। বরং সত্যিকথাটা এমন যে, মৃত্যুই তার নিত্যদিনের সঙ্গী, মৃত্যুই তার পেশা-নেশা এবং মৃত্যুই তার জীবন।

কথাটা শুনতে হয়তো বিচিত্র শোনাতে পারে, মৃত্যু কীভাবে কারো জীবন হতে পারে। কিন্তু তার জন্য এটাই সত্যি, কারণ পেশাগতভাবে একজন খুনি সে। একজন বিষকানিয়া সে। বিষকানিয়া কিংবা সর্বভারতে প্রচলিত বিষকানিয়া, যে-শব্দই তাদের জন্য প্রয়োগ করা হোক না কেন, সর্বভারতের সবচেয়ে ভয়ংকর নারী খুনেগোত্রের বিবরণ দেয়ার জন্য বা তাদের ভয়ংকররূপ প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট নয়। বিষকানিয়ারা ছোটবেলা থেকে মেয়েদের খুনি হওয়ার প্রশিক্ষণ দিয়ে বড় করে তোলে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তারা খুনি হওয়ার জন্যই শারীরিক এবং মানসিকভাবেই গড়ে ওঠে। তিন স্তরের এবং একাধিক ধারায় ভিন্ন প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে তারা প্রকৃত এবং ভয়ংকর খুনি হিসেবে গড়ে ওঠে। বিষকানিয়াদের প্রশিক্ষণ কতটা ভয়ংকর সেটা একটা ছোট্ট প্রক্রিয়ার দিকে খেয়াল করলেই বোঝা যায়। বিষকানিয়ারা একভাবে বলতে গেলে বিষ প্রতিরোধক। ছোটবেলা থেকে তাদের খাবার এবং তরলের মধ্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সামান্য পরিমাণে এবং খুবই সাবধানে বিষ মিশিয়ে দেয়া হতে থাকে, যার ফলে এরা পরিপূর্ণ যুবতী হয়ে উঠতে উঠতে এমনভাবে বিষপ্রতিরোধক হয়ে ওঠে যে এদের বিষ প্রয়োগ করা হলেও কোনো ক্ষতি হয় না, মৃত্যু তো বহু পরের বিষয়।

বিষকানিয়ারা প্রায় সব ধরনের অস্ত্র চালনায় বিষয়ে দক্ষ হয়ে ওঠে, কিন্তু নিঃসন্দেহে তাদের সবচেয়ে ভয়ংকর অস্ত্র হলো বিষ। এরা এত ধরনের এবং এমন ভয়ংকর সব বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ হত্যা করতে পারে যেটা এমনকি কল্পনা

সিপাহী

করাও কঠিন। আর এই কারণেই যখন বিশেষ ধরনের কোনো হত্যার বিষয় আসে, সেই সময়েই ডাক পড়ে বিষকানিয়াদের। যেখানে সবাই হার মানে, সেখানে খেল দেখায় বিষকানিয়ারা। আর এ-কারণেই সবচেয়ে ভয়ংকর ধরনের হত্যাকাণ্ডের জন্য বিষকানিয়ারা সবার সেরা। রাজ-রাজা থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানুষ, এমনকি যাদের কাছে পর্যন্ত কেউ পৌছাতে পারে না, সেখানে পর্যন্ত অবলীলায় পৌছে গিয়ে কাজ সমাধা করতে পারে বিষকানিয়ারা। এরকমই এক কার্য সমাধা করার জন্য ডাক পড়েছিল তার মাথুরা শহরে।

কাজটা কঠিন নয়, অসম্ভব ছিল। রাজা বিক্রম সিং নামের এক রাজাকে হত্যা করতে হবে, যেভাবেই হোক যেকোনো উপায়েই হোক। যাকে হত্যা করার জন্য এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মানুষ প্রচেষ্টা চালিয়েছে সেই মানুষটাকে হত্যা করা যে কঠিন হবে—সে আর ভিন্ন কি। আর এই কারণেই ডাক পড়েছিল তার, কারণ ভয়ংকর বিষকানিয়াদের ভেতরেও সেরাদের সেরা সে। তার ওপরে কর্তব্য বর্তানোর পর সে প্রথমেই খোঁজ নিয়ে চলে যায় দক্ষিণ ভারতে রাজা বিক্রমের দুর্গে। সেখানে গিয়ে রসুইঘরে চাকরি নিয়ে খোঁজ করে জানতে পারে রাজা বিক্রম তার দুর্গে নেই। সে মাথুরা গেছে বিশেষ কাজে। এবার সেও রওনা দেয় সেখানে। নদীবিধৌত শহরটাতে পৌছে রাজা বিক্রমের খোঁজ বের করতে খুব বেশি সময় লাগেনি। রাজা বিক্রম তারই সমপর্যায়ের, বন্ধুসম আরেক রাজার বাড়িতে অতিথি হিসেবে অবস্থান করছে। সেখানকার রসুইঘরে এক কর্মী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াতে, সেখানে চাকরি হয় তার। সেই কর্মীর হঠাৎ অসুস্থতার পেছনে কারণ কি ছিল কেউ জানতে পারেনি। আর এর পেছনেও তারই হাত ছিল।

রসুইয়ে কাজ করতে করতে সাতদিন সে স্রেফ অবলোকন করে এবং মোটামুটি ঠিক করে ফেলে কীভাবে রাজা বিক্রমকে হত্যা করবে। কাজটা সে বিষ প্রয়োগেই করবে কিন্তু সেক্ষেত্রে ভয়াবহ বাধা রয়েছে। কারণ রাজা বিক্রম থেকে শুরু করে সবাইকে খাবার পরিবেশন করার পর একাধিকবার পরখ করে তারপর খায় তারা। কাজেই সরাসরি খাবারে বিষ দেয়া যাবে না। বিষ দিতে হবে পানিতে। রসুইঘর থেকে সে অনুরোধ করে নিজের কাজ সরিয়ে নেয় খাবার পরিবেশনে। একাধিকবার পরখ করে সে মোটামুটি দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলে কখন রাজাকে বিষ দিবে। কিন্তু সে কি জানত, এটাই তার জন্য কাল বহন করে আনবে।

সমস্ত প্রস্তুতি এবং অপেক্ষার পর চলে আসে সেই দিন। সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে সে। রাতের খাবারে ঘটনাটা ঘটাতে এবং যেই মুহূর্তে বিক্রমের মৃত্যু নিশ্চিত করতে পারবে সেই মুহূর্তে সে বেরিয়ে পড়বে। অবশেষে চলে এলো রাতের খাবারের সময়। খাবার পরিবেশনের পর দেহরক্ষীরা পরখ করল। সব ঠিক আছে দেখে খেতে শুরু করল রাজারা। এমন সময় রাজা বিক্রম হাত তুলে পানি চাইল।

পূর্বকথা

পাত্রে পানি ঢেলে দিতে দিতে খুব সহজেই অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিল সে। স্রেফ এক ঢোক, ক্ষণিকের ভেতরেই রাজা ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। বিষকানিয়াদের নিয়ম অনুযায়ী যেই মুহূর্তে সে মৃত্যু অবলোকন করবে, সঙ্গে সঙ্গে সমাধা হবে তার কার্য; এর আগে নয়।

সে তাকিয়ে আছে, রাজা পাত্র তুলে ঠোঁটে ছোঁয়াবার আগ দিয়ে শহর কঁপে উঠল বিক্ষোভে। রাজ্য থেকে ভেসে এলো অসংখ্য মানুষের পদধ্বনি। খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাজা। এমন সময় হুড়মুড় করে দরবারে প্রবেশ করল এক সৈনিক। পরিশ্রান্ত দম হারানো লোকটা দরবারে ঢুকেই পড়ে গেল মেঝেতে, পানি খেতে চাইছে। রাজা বিক্রম নিজের হাতের পানি এগিয়ে ঢেলে দিল তার মুখে। ক্ষণিকের ভেতরেই গ্যাজলা তুলে মারা গেল সৈনিক। রাজা বিক্রম বোকা নয়, বহুবার মৃত্যুকে ফাঁকি দেয়া মানুষটার জন্য অনেক কিছুই এখন স্রেফ সহজাত ক্ষমতা। ক্ষণিকের জন্য তাকিয়ে রইল সৈনিকের দিকে, তার গ্যাজলা দেখল, দেখল সৈনিকের পাশে পড়ে থাকা পাত্র এবং ফিরে তাকিয়ে গর্জে ওঠে তার দিকে— ইশারা করল গ্রেপ্তার করার জন্য।

রাজা বিক্রম অভিজ্ঞ মানুষ, তার সৈনিকেজরাও দক্ষ, কিন্তু তাদের কেউই বিষকানিয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। রাজাকে সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ফেলেছে তার দেহ রক্ষীরা। সেই সঙ্গে একদল এগিয়ে গেল তার দিকে। দরবারে স্রেফ নরক বয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। রাজা বিক্রমের কাছে হয়তো পৌছাতে পারল না সে, কিন্তু তাকে ধরেও রাখতে পারল না ওরা। স্রেফ ঝড় বইয়ে দিয়ে সে নেমে এল রাজ্যে এবং ধরাটা খেল সেখানেই।

যেখানে প্রতিদিন এই সময়ে রাজ্য থাকে ফাঁকা সেখানে আজ শত শত মানুষ লড়াই করেছে। তাও যেনতেন কেউ না, সাদা চামড়ার ইংরেজ আর সেপাইরা রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধে রত। এমন দৃশ্য ভারতে কেউই এর আগে দেখেনি। কারণ এমন বিদ্রোহও এর আগে হয়নি। বিষকানিয়া, রাজা বিক্রমের প্রহরী কিংবা শহরবাসী কেউই তো আর জানে না, ভারতে শুরু হয়েছে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর সিপাহী বিদ্রোহ। ব্যারাকপুর থেকে শুরু হওয়া বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে মাথুরাতেও। সেনানিবাস থেকে বের হওয়া একদল বিদ্রোহী সৈনিক, মাথুরা গেছে শহরে থাকা ইংরেজদের মেরে শহরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য। এই সৈনিকদের প্রবেশেই যুদ্ধ লেগে যায়, আর সেটা জানাতে বিক্রমের দরবারে গিয়েছিল সেই সৈনিক, যে মারা পড়ে বিক্রমের জন্য পানিতে থাকা বিষ খেয়ে। বিক্রমের সৈনিকদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে রাজ্যে এসে ঠিক যুদ্ধরত দুই বাহিনীর মাঝে পড়ে যায় বিষকানিয়া মেয়েটা।

সিপাহী

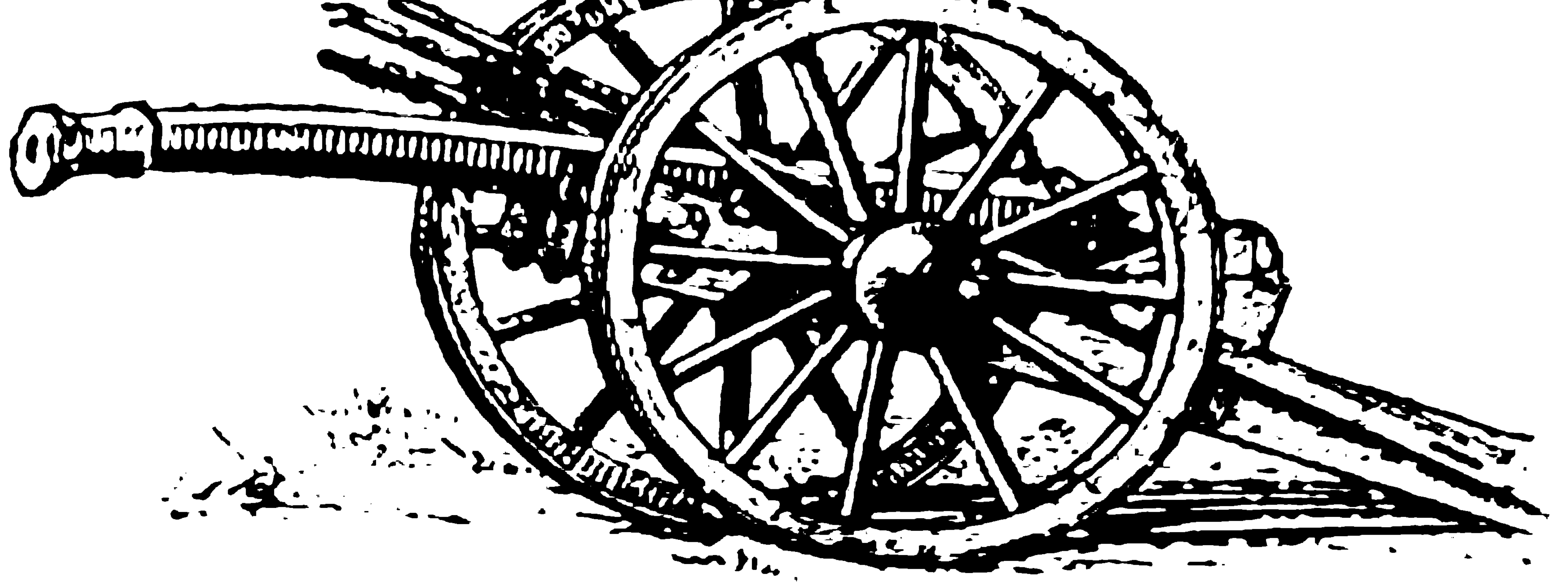
তার পরও হয়তো কেউ তার কিছু করতে পারত না। কিন্তু বিধি বায়, রাজায় দুই বাহিনীর মাঝে পড়েই সে এলোপাতাড়ি ছুটে আসা গুলি খায় পেটে এবং কাঁধে। পর পর দুটো গুলি খেয়ে সে যখন ভারসাম্যহীন, একটা বর্শা ছুটে এসে বিদীর্ণ করে দেয় তার পা। অন্য কেউ হলে এই আঘাতে মারাই পড়ত কিন্তু সে তো বিষকানিয়া। যুদ্ধরত সৈনিকদের মাঝে কোনোমতে ছাঁচড়াতে ছাঁচড়াতে সে চলে আসে নদীর পাড়ে। ইচ্ছে কোনোমতে একটা নৌকা নিয়ে নদী ধরে পালাবে। কিন্তু নদীর কিনারায় এসে দম নিতে নিতে সে দেখল গুলি খাওয়া কাঁধ পেট আর উরু দিয়ে সমানে রক্ত বের হচ্ছে। কাঁধের অবস্থাও যে একই তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এভাবে সে বেশিক্ষণ টিকবে না। দ্রুত পালাতে হবে এরপর রক্তপাত বন্ধ করতে হবে।

ঘাটে বাঁধা সারি সারি নৌকা দেখতে পাচ্ছে সে ঝাপসাভাবে। একটা নৌকা প্রয়োজন তার, স্রেফ একটা। নিজে কে টেনে ঘাটে নামাতে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে পানিতে পড়ে গেল সে। আধো অন্ধকার ঘোলাটে পানি গিলে নিল তাকে, হাত-পা নাড়ানোর চেষ্টা করেও নাড়াতে পারছে না সে। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নেবে এমন সময় খুব আলগাভাবে সে অনুধাবন করতে পারল—কেউ একজন টেনে তুলছে তাকে।

পুরোপুরি জ্ঞান হারাল সে। বেঁচে থাকুক বা মরে যাক—কোনোটাই পরোয়া করে না আর, স্রেফ শান্তি চায় তার শরীর।

স্রেফ শান্তি।

গল্প শুরুর আগে



অধ্যায় এক

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

দিল্লি, ভারতবর্ষ

দিল্লি শহরের শান্তি পুরোপুরি বিদেয় হয়েছে। বরং সুতীব্র অন্ধকার যেন উলটো হয়ে থাকা জল্লাদের খড়্গের মতো ঝুলে আছে দিল্লি শহরের ওপরে।

আর সেই অন্ধকারের ওপরে প্রলেপ বোলাচ্ছে অদ্ভুত নিখর এক নীরবতা। আজ থেকে কয়দিন আগেও এই সময়ে যে শহর প্রাণচঞ্চল থাকত অলিগলিতে জমায়েত হওয়া মানুষের মুখরতায়, সেখানে আজ সন্ধের গতি পার হওয়ার আগেই অর্ধমৃতের মতো মুখ খুবড়ে সন্ধের কালিগোলা অন্ধকারের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে সেই প্রাণচঞ্চল মুখরতা। প্রাণচাঞ্চল্য তো দূরে থাক, পুরো শহর আজ যেন প্রাণের ভয়ে ভীত।

বহুযুগের অসম অবস্থান আর শোষণের যে-ছাইচাপা আগুন ধীরে ধীরে জমা হচ্ছিল—সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দেশীয় সৈনিকদের বুকের গহিনে, চর্বিমাখা কার্তুজের বিষয়কে কেন্দ্র করে সেই ছাইচাপা আগুন প্রথমে বিস্ফোরিত হলো জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মতো, তারপর সেই লাভা সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাড়খার করে দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল পুরো ভারতবর্ষজুড়ে। দিল্লিও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। কারণ দিল্লি ছিল সবকিছুর কেন্দ্রে।

ব্যারাকপুর থেকে বিদ্রোহের আগুন প্রথমে ছড়িয়ে পড়ে অধুনা উত্তর প্রদেশ, পুরো মধ্য প্রদেশ, বিহার হয়ে সেই হাওয়া গিয়ে লাগে দিল্লিতে। সময়ের তুলনায় খানিক দেরিতে হলেও, সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা, সর্বোচ্চ বেগে গিয়ে আঘাত হানে দিল্লিতেই। কারণ দিল্লি ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসন তো বটেই, পুরো ডুবতে বসা মোগল সাম্রাজ্যের নামকাওয়াস্তে শাসক বাহাদুর শাহ জাফরের আবাসস্থলও বটে। কাজেই খেপে ওঠা বিদ্রোহীদের কূল ফিরে পাওয়ার জন্য দিল্লির দিকে ধাবিত হওয়া ছিল স্রেফ সময়ের ব্যাপার, আর হলোও তাই। বিদ্রোহের হাওয়া দিল্লিতে এসে

সিপাহী

লাগল, আর সেই হাওয়ার তোড়ে লগভগ হতে শুরু করল ইংরেজ বাহিনীর শাসন, সেই সঙ্গে এর প্রধান শিকার হয়ে উঠল দিল্লি নগরী নিজে এবং এর সাধারণ বাসিন্দারা। আমাদের গল্পটা বুঝতে হলে, অনুধাবন করতে হবে দিল্লির পুরো পরিস্থিতি। আর দিল্লির পরিস্থিতি অনুধাবন করতে হলে ফিরে তাকাতে হবে ব্যারাকপুর এবং মিরাতের দিকে।

ব্যারাকপুরের প্যারাদ গ্রাউন্ডে যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছিল, তার জের ধরে মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসি দেওয়া হয় ২১ এপ্রিল। ব্যারাকপুর থেকে সেই আগুন মিরাতের সেনানিবাসে এসে লাগে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মিরাতের সেনানিবাস ছিল সেই সময় ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় সেনানিবাসগুলোর একটা। কাজেই মিরাতে যখন ব্যারাকপুরের উত্তাপ এসে লাগে ইংরেজ বাহিনী সেটাকে কঠিন হস্তে দমন করার সিদ্ধান্ত নেয়, যেটা তাদের জন্য উলটো ফল বয়ে আনে।

ব্যারাকপুরে মিরাতের খবর এসে লাগতেই সিপাহীরা প্রথমে সেই চর্বিমাখা কার্তুজের এনফিল্ড রাইফেল ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সেটাকে বেশি পাত্তা দেয় না। কারণ মিরাতে দেশীয় সৈন্যদের চেয়ে গুর্খা সৈন্য ছিল বেশি। যে-কারণে ইংরেজরা দেশীয় সিপাহীদের সঙ্গে যা-তা ব্যবহার করত। অশ্বারোহী বাহিনীর কমান্ডার কর্নেল স্মিথ, খুবই নির্দয় মানুষ। সে যখন জানতে পারল সিপাহীরা রাইফেল ব্যবহার করতে অসম্মতি জানাচ্ছে, সে সঙ্গে সঙ্গে প্যারাদ গ্রাউন্ড থেকে নব্বইজনের মতো সিপাহীকে আলাদা করে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কোর্ট মার্শাল বসল তাদের বিরুদ্ধে, অনেকেই কঠিন সাজা পেল তাতে।

এই সিপাহীদের যখন শাস্তির জন্য নেওয়া হচ্ছে, তাদের বন্ধুরা সামরিক পোশাক ছিনিয়ে নেওয়া-লোহার বেড়ি পরানো বন্ধুদের দেখে নিজেদের আর ধরে রাখতে পারল না। কান্নায় ভেঙে পড়ল অনেকেই। অন্যদিকে মুক্ত সিপাহীদের থেকে একেবারে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বন্দি সিপাহীদের। তাদের ভেতরে থেকে আবেগ কিংবা সব হারানোর বেদনা নয়, বরং আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিল। যে-আগুনের উত্তাপ ধীরে ধীরে বন্দিশালা থেকে পুরো ব্যারাকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তবুও পরিস্থিতি বলতে গেলে শান্তই ছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকা বারুদে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে দেখা দেয় এক পাচকের বক্তব্যে। যেনতেন না, খোদ স্মিথের পাচক পরদিন দুপুরের পর দিয়ে হঠাৎ খবর নিয়ে আসে, যারা বন্দি আছে তো আছেই, এর বাইরেও শহরের বাইরের কামারশালা থেকে ইংরেজ অফিসারেরা শত শত বেড়ি বানিয়ে এনেছে। বাকি দেশীয় সিপাহীদের বন্দি করে জেলে পোরা এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার। ইংরেজরা দেশীয় সৈন্যদের শাস্তি করতে চাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু এই খবর আসলে কতটা সত্য সেটা নিয়ে সংশয় ছিল। একদিকে ভয়, অন্যদিকে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে থাকা

গল্প শুরু আগে

সিপাহীরা তখন যাচাই-বাছাই করার মতো অবস্থায় ছিল না। বাকীদের স্তূপের তখন প্রয়োজন ছিল স্রেফ একটা স্কুলিং। আর সেই স্কুলিং যখন ছড়িয়ে পড়ল, সবকিছু স্রেফ ঝড়ের তাণ্ডবের মতো উড়ে গেল।

খবর ছড়িয়ে পড়ামাত্র একরকম অপ্রস্তুত অবস্থাতেই সিপাহীরা ছুটে গেল জেলখানার দিকে। গরাদের তালা ভেঙে প্রথমে মুক্ত করল নিজেদের বন্ধুদের, তারপর সবাই মিলে উপস্থিত হলো প্যারাড গ্রাউন্ডে। খবর পেয়ে বিদ্রোহ দমনের জন্য ২০ নং রেজিমেন্টের কর্নেল ফিনিশ নিজের পুরো বাহিনী নিয়ে হাজির সেখানে। উদ্দেশ্য উচিত সাজা দেবেন সিপাহীদের। কিন্তু বিধির বিধান ছিল একেবারেই ভিন্ন। কর্নেল উচিত শিক্ষা তো দূরে, উলটো, তার নিজের বাহিনীর দেশি সিপাহীরা যোগ দিল বিদ্রোহীদের সঙ্গে। কর্নেল ফিনিসসহ অন্যদের হত্যা করল তারা। সারারাত অত্র এলাকায় তাণ্ডব চালিয়ে পুরো বাহিনী রওনা দিল দিল্লির দিকে।

দিল্লির পরিস্থিতি তখনো শান্ত, স্রেফ থমথমে ভাব বিরাজ করছিল কিন্তু কোনো ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতি তখনো সেখানে সৃষ্টি হয়নি। ঝড়ের পূর্বের শান্ত পানিকে আলোড়িত করতে তাণ্ডবের মতোই সেখানে গিয়ে হাজির হলো মিরাতের বিদ্রোহী সিপাহীদের একাংশ। মিরাত থেকে বের হয়ে তারা সম্মত হয় যে, শেষ মোংল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে স্বাধীন সম্রাট ঘোষণা করে তারা তাদের বিদ্রোহের যাত্রা অব্যাহত রাখবে, দখল নেবে দিল্লির। তারই প্রস্তুতি হিসেবে মিরাত থেকে বের হওয়া সৈন্যরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একাংশ চলে গেল বেরিলীতে, উদ্দেশ্য আরো সৈন্য এবং গোলাবারুদ সংগ্রহ করা। অন্য অংশটা সোজা দিল্লি, শান্ত দিল্লির প্রারম্ভে এই বাহিনীটাই প্রথম গিয়ে পৌঁছাল। প্রথমেই তারা যতটা পারল পুরো নগরী বাহির থেকে অবরোধ করে ফেলল।

দিল্লির ভেতরের পরিস্থিতি তখনো শান্ত। সম্রাট জাফর শাহ, এসবের কোনো খবরই রাখতেন না, ইংরেজ কিছু কর্মকর্তা ভেসে আসা কিছু খবর পেয়েছিল, কিন্তু তেমন গুরুত্ব দেয়নি। তবে তাদের ভেতরে এরকম একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল পরদিন ভোরে তারা শহরের মূল ফটকগুলোতে প্রহরা আরো ভারী এবং শক্ত করবে। এর আগেই বিদ্রোহীরা অবরোধ করে বসে শহর। শহর অবরোধ করেই তারা প্রথমে প্রাসাদরক্ষীদের কাছে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ করে, সম্রাট অস্বীকৃতি জানালে সেখানে পৌঁছায় ক্যান্টেন ডগলাস। সে তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে ফিরে যেতে বলে। কিন্তু বিদ্রোহীরা ভেতরে ঢোকার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে।

এমন সময় বিদ্রোহীরা খবর পেয়ে ছুটে যায় কলকাতা গেটের দিকে, সেখানে ফ্রেজার এবং ডগলাসের বাহিনী বাধা দেওয়ার আগেই তারা সেই গেট ভেঙে ভেতরে

সিপাহী

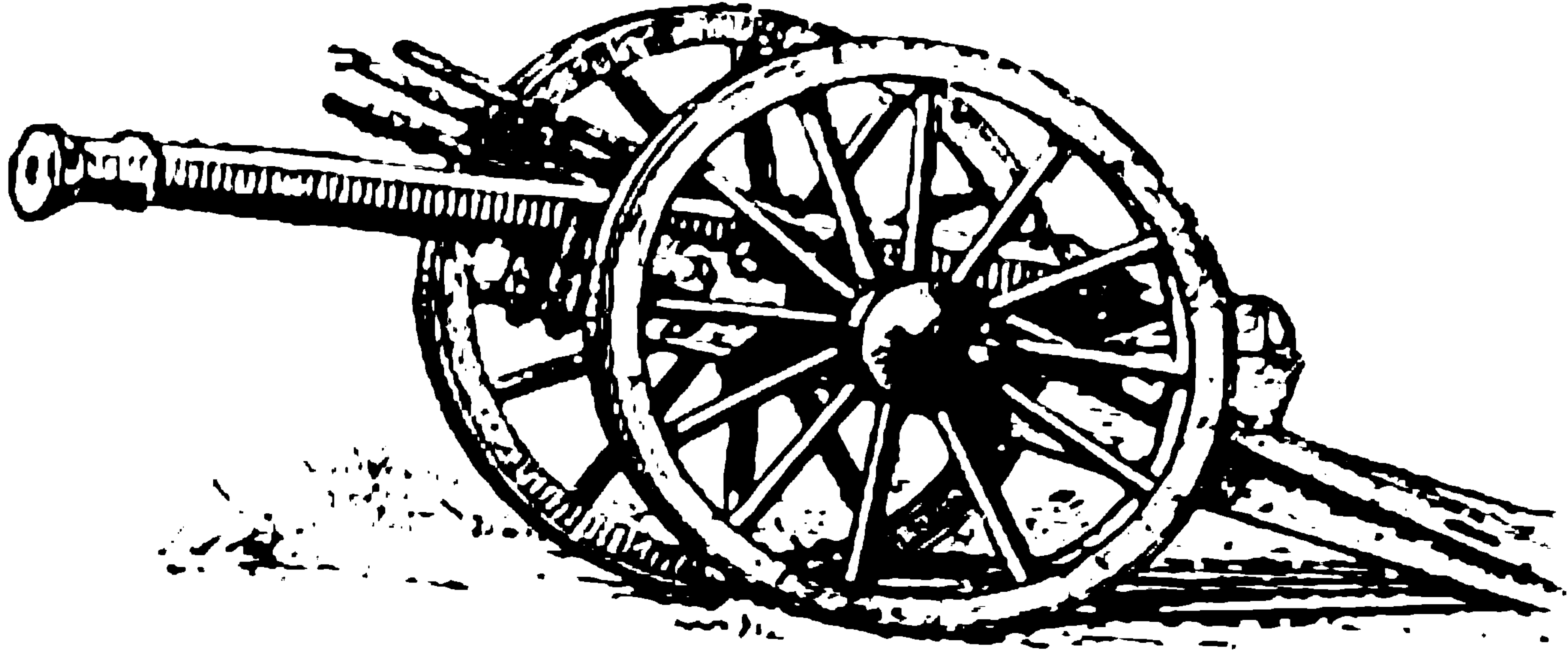
প্রবেশ করে এবং উপস্থিত ফ্রেজার থেকে শুরু করে ডগলাস এবং আরো বেশ কয়েকজন ইংরেজকে হত্যা করে তারা প্রবেশ করে দিল্লি শহরে। শহরে প্রবেশ করতেই রাজপথে মোলাকাত হয় শহরের দেশীয় সৈন্যদের তিনটি প্রধান পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে। সবাই মিলে এক হয়ে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় দিল্লি শহরের। হত্যা করতে করতে তারা গিয়ে হাজির হয় সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের বাসভবনে।

পুরনো ধূলিমাখা এক সিংহাসন তার বাসভবনের পাতালঘর থেকে বের করে এনে উল্লাসের সঙ্গে সম্রাটকে তাতে বসিয়ে স্বাধীন ভারতের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে সিপাহিরা। সম্রাট অনিচ্ছা সত্ত্বেও দায়িত্ব নিতে বাধ্য হন। যদিও সে দায়িত্ব নিয়েই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে। বিদ্রোহীদের সব ধরনের সহিংসতা পরিহার করতে অনুরোধ করে। আপাত পরিস্থিতি খানিক স্বাভাবিক হলেও, ভারতবর্ষ এবং তার স্বর্ষপণ দিল্লি, উভয়েরই পরিস্থিতি দিন দিন শুধু খারাপই হতে থাকে। বিদ্রোহী সিপাহী, ইংরেজ এবং সাধারণ জনগণ সব দিক থেকেই উত্তেজনা, শঙ্কা বাড়তেই থাকে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে নানা ধরনের অপরাধ। পুরো ভারতবর্ষ যখন দিল্লির দিকে তাকিয়ে আছে বিদ্রোহ আর স্বাধীনতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে, সেই সময়ে দিল্লির মানুষ ভয়াবহভাবে প্রতিদিন শিকার হতে শুরু করে নানা ধরনের অপরাধ, রাহাজানি, ছিনতাই, ডাকাতি আর হত্যাকাণ্ডের। এমনই এক সময়ে দিল্লিতে প্রবেশ করল এমন একজন মানুষ, যার আসলে দিল্লি থেকে বহু দূরে অবস্থান করার কথা।

অন্যদিকে সেইসময়ে আরেকজন মানুষ দিল্লি থেকে পালানোর পরিকল্পনা করছে।

পরস্পর অজানা এবং অচেনা এই মানুষ দুজনার ভেতরে সম্পর্কটা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে পুরনো সম্পর্কগুলোর একটা :

একজন শিকার এবং অন্যজন শিকারি।



অধ্যায় দুই বর্তমান সময় বেগুনবাড়ি, ময়মনসিংহ

‘আপু তুমি শিকার কাহিনি পড়ো?’

হঠাৎ প্রশ্নটা শুনে খানিক চমকে উঠে ডায়েরি থেকে মুখ তুলল আর্কিওলজিস্ট রিফাত মজুমদার। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চারপাশে চোখ বুলাল সে। যদিও মাটির নিচের পাতাল এই জায়গাটা থেকে বাইরের আবহাওয়া বা পরিস্থিতি কোনোটাই বোঝা যায় না, তাও সে পরিষ্কার বলে দিতে পারবে আসলে দিনের কোন সময় এখন, তাও ঘড়ি না দেখেই। কারণ দিনের এই সমসয়টা খুব উপভোগ করে রিফাত।

দিনের দুটো সময় রিফাত খুব উপভোগ করে। প্রথমটা হলো সকালবেলা। খুব ভোরে ওঠা মানুষ সে। বরাবরই দেহে ঘুমানোর ট্রেন্ড মনোভাব বাদ দিয়ে খুব আর্লি শুয়ে পড়ে এবং ভোরে ঘুম থেকে ওঠে সে। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, সেই সময়টা যেন একান্তই নিজের। ময়মনসিংহ শহরে ডেভলপারদের কঠিন রাজত্বে চারপাশে যখন একের পর এক বহুতল ভবন উঠতে উঠতে বলতে গেলে শহরের নকশাই বদলে গেছে, এমন এক সময়ে ময়মনসিংহ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ওদের বাড়িটা ব্যতিক্রম। কারণ একদিকে বাড়িটা বহুতল নয়, আবার অনেকটা জায়গা নিয়ে অবস্থিত। বাড়ির সামনে ছোট বাগান আছে, আবার বাড়ির পেছন দিকে ঘাসে ঢাকা ছোট্ট একটা লন আছে। রিফাতের বাবা-মা মারা যাওয়ার পর প্রতিনিয়ত ডেভলপাররা লোভনীয় অফার নিয়ে এলেও রিফাত রাজি হয়নি। যদিও ও জানে না কতদিন ধরে রাখতে পারবে, তবে এই বাড়িটার সঙ্গে ওর আত্মার সম্পর্ক।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির পেছনের লনে বসে সকালবেলার চা-টা উপভোগ করে প্রতিদিনের কাজ গুছিয়ে নিয়ে দিনের পরিকল্পনা করে ও। এরপর

সিপাহী

নিজের মতো করে পড়ালেখা করে কিংবা, কাজ করে ঘণ্টাখানেক বা ঘণ্টাদুয়েক। এরপর শুরু হয় ওর দিন। একইভাবে সন্ধ্যাবেলা নিজের কর্মস্থল থেকে সবাই যখন বিদেয় নেয়। এরপর আরো ঘণ্টাখানেক সময় দেখা যায়, নিজের মতো কাজ করে, চিন্তাভাবনা করে কিংবা দেখা যায় সারাদিনে কী করল, কীভাবে করল, কোন কাজগুলো পরিকল্পনামতো হলো, কোথায় ভুল করল সেটা রিফ্লেক্ট করার চেষ্টা করে। দিনের এই দুটো সময় রিফাত সবচেয়ে বেশি উপভোগ করে, কারণ ওর কাছে মনে হয় এই দুটো সময়ই মানুষ হিসেবে ওকে সবচেয়ে ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত করে। একজন মানুষ হিসেবে প্রতিনিয়ত নিজেকে নিজে ছাড়িয়ে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়াতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব বহন করে এই দুটো সময়।

তবে বিগত কয়েকদিন ধরে ওর বিকেন্দ্রবেলার রুটিনে বেশ খানিকটা পরিবর্তন এসেছে বিশেষ একটা কারণে। আর কারণটা হলো রিফাতের এই তরুণ কলিগ।

কয়েক বছর আগে ময়মনসিংহ শহরে এমন এক ঘটনা ঘটে, যার পরিপ্রেক্ষিতে রিফাতের জীবন একেবারেই বদলে যায়। আর্কিওলজিতে পড়ালেখা করা রিফাত ক্যারিয়ারের শুরুতে কাজ করছিল ময়মনসিংহ শহরের মিউজিয়ামে। কিন্তু সেখানে একটা ডাকাতির ঘটনা ফলে চাকরি হারিয়ে সে চলে যায় বিদেশে পড়ালেখা করতে। ফিরে এসে জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালাতে কাজ শুরু করে। এমন সময় ময়মনসিংহের পুরনো এক পুকুরের পানির নিচে পাওয়া যায় এক গাড়ি, সেটার ভেতরে সেই ডাকাতির সময়ে রিফাতের সেই সময়কার এক হারিয়ে যাওয়া বিদেশি বন্ধুর লাশ। সেখান থেকে ঘটনা গড়িয়ে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে শুরু করে বহু বছর আগের এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের, যেটার বলি হতে হয়েছিল রিফাতকে। ওই ঘটনার সময়ে রিফাতের পরিচয় ঘটে ইনসপেক্টর আহমেদ বাশারের সঙ্গে। দুজনে মিলে অদ্ভুত সেই রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের কালো এক অধ্যায়, ভয়াবহ খুনে দল, ঠগিদের সঙ্গে সংযোগ খুঁজে পায় সেই অপরাধের। অনেক কাঁঠখড় পুড়িয়ে সেই রহস্যের সমাধান করার এক পর্যায়ে ওরা আবিষ্কার করে বহু আগে হারিয়ে যাওয়া ব্রহ্মপুত্রের পাতাল এক অনাবিষ্কৃত অংশের। সেই সঙ্গে সেই পাতাল নদের এর জায়গাতে মা ভবানী, মানে কালী পূজা করা হতো এমন এক কালীমন্দিরের। মূলত ঠগিরা তাদের মা ভবানীর আরাধনা করত। সেই মন্দিরেই ওরা 'টুইন কালী' নামে ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া এক দ্বৈত কালী মূর্তির সন্ধান পায়।

সেই রহস্য সমাধান করার সময় ইনসপেক্টর আহমেদ বাশারের সঙ্গে প্রণয়ে জড়িয়ে পড়ে রিফাত। পরবর্তীতে ইনসপেক্টর আহমেদ বাশারকে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার বিশেষ এক ফোর্স, পিবিআইএসের স্পেশাল উইং টিম আলফাতে ট্রান্সফার করা

গল্প শুরুর আগে

হয়, সেই সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের পাতালের এই কালীমন্দিরকে আর্কিওলজিক্যাল সাইট ডিক্লেয়ার করে, এই সাইট নিয়ে রিসার্চ করার দায়িত্ব দেওয়া হয় রিফাত এবং ওর টিমকে। সেই থেকে ও এবং ওর টিম মিলে এখানে কাজ করছে। পুরো জায়গাটা খুবই বিচিত্র এবং রহস্যময়। শুধু মনুষ্য নির্মিত মন্দিরটাই নয়, প্রাকৃতিকভাবেই খুবই বিচিত্র আর অদ্ভুত এই জায়গা। মন্দিরটার আশপাশ তো বটেই, এর বাইরে আরো অনেক লুকানো অলিগলি এবং চেষ্টার রয়েছে এই পাতালে, যার খুব কম অংশই আবিষ্কার করতে পেরেছে ওরা এখন অবধি।

বহু বছর ধরেই ময়মনসিংহ শহরে এক মিথ প্রচলিত আছে যে এখানে শহরে অবস্থিত জমিদারবাড়ি শশীলজ থেকে, মাইল দশের দূরে অবস্থিত মুন্ডাগাছার জমিদার বাড়িতে যাওয়ার এক গোপন সুড়ঙ্গ রয়েছে। প্রি-ক্যাডেট স্কুল এবং বিদ্যাময়ী স্কুলসহ আরো বেশ কয়েক জায়গাতে এই সুড়ঙ্গের মুখও রয়েছে বলে দাবি করে অনেকে। ইনসপেক্টর বাশার, রিফাত আর ওদের টিম মিলে ওই রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে এক পর্যায়ে আবিষ্কার করে শুধু সুড়ঙ্গই নয় বরং ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে সংযুক্ত পাতাল এক নদীও রয়েছে, যদিও কালের আবর্তে সেটা শুকনো প্রায়। এই পাতাল নদীর একাংশে প্রবেশ করা যায় ময়মনসিংহের মুন্ডাগাছার জমিদারবাড়ির এক পুরনো দালানের এক আরাধনার বেদির নিচে লুকানো গোপন পথ দিয়ে। সেখান থেকে নেমে বেশ অনেকটা জায়গা পার হয়ে এলে পাতালধরে ছোট প্রায় শুকনো তিনটা সরু পানির ধারার মাঝে ছোট একটা দ্বীপের মতো আছে। আঠারো শ শতকে এই জায়গাটা ঠগিদের আস্তানা ছিল। সেই পানির ধারার মাঝের ছোট দ্বীপটাতেই কালীমন্দিরটা অবস্থিত।

রিফাতদের দায়িত্ব দেওয়ার পর ওরা পুরো এলাকাটা ইনসপেকশন করে আবিষ্কার করে শুধু মুন্ডাগাছার জমিদার বাড়িই নয়, জায়গাটা বেগুনবাড়ির কাছে আরেকটা জায়গা দিয়ে আরো কাছে থেকে প্রবেশ করা যায়। আর্কিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন দায়িত্ব নেওয়ার পর মন্দিরসংলগ্ন জায়গাটা তাদের নামে করে নেওয়া হয়, সেই সঙ্গে বেগুনবাড়ির সেই প্রবেশ পথের কাছে জায়গাটা সরকার কিনে নিয়ে ওখানে ওদের একটা অফিস নির্মাণ করে এবং পুরো এলাকাটাতে সুরক্ষিত করে ওদের কাজের সুবিধার জন্য নিচেও আরেকটা অফিস নির্মাণ করে দেয়। আর এই পুরো কাজটা করতে ওদের বেশ সময় লাগে, এরপর নির্দিষ্ট আর্কিওলজিস্টদের টিম নিয়ে কাজ শুরু করে রিফাত।

কয়েক মাস হলো ওর টিমেই একজন মেম্বার হিসেবে যোগ দিয়েছে আসিফ ইমতিয়াজ রুশো নামের এই ছেলেটা। বয়সে তরুণ, অত্যন্ত মেধাবী সেই সঙ্গে খুব ফুর্তিবাজ ছেলেটা অল্প সময়ের ভেতরেই সবার মন জয় করে নিয়েছে। সেই সঙ্গে হয়ে উঠেছে রিফাতের রাইট হ্যান্ড। প্রতিদিন কাজের পর আগে যেখানে রিফাত

সিপাহী

একই নিজের কাজ গোছাত, সেখানে এই ছেলেটা আসার পর থেকে ওরও বিকেনের রুটিনে এসেছে বেশ খানিকটা পরিবর্তন। আগে কাজ সেরে প্রতিদিন নিজের ডায়েরি বা কাজের অগ্রগতি নিয়ে বসত, বা কফি খেতে খেতে ফোনে কথা বলত বাশারের সঙ্গে। সম্প্রতি বাশার বিশেষ তদন্তে জড়িয়ে পড়া এবং রুশোর আগমনের কারণেই মূলত এই পরিবর্তন।

রুশো ছেলেটা অল্প কিছুদিনের ভেতরেই প্রায় ওর ছোট ভাইয়ের মতো হয়ে উঠেছে। অফিস শেষে প্রায়ই দুজনে শহরে কফি খেতে যায়, বা পার্কে গিয়ে ফুচকা খেতে খেতে আড্ডা দেয়। ওদের আড্ডার বিষয় ঘুরপাক খায় বই সিনেমা কিংবা আর্কিওলজি নিয়ে। প্রায় প্রতিটা বিষয়ে ছেলেটার নলেজ এবং ভাবনা-চিন্তা বেশ মুগ্ধ করে রিফাতকে। ও অবাক হয়ে ভাবে এত অল্প বয়সে এই ছেলে এতটা নলেজেবল হলো কীভাবে। তবে আজ রিফাতের মন ভালো নেই। এর পেছনে কারণ হলো বাশারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা। বিগত কয়েকদিন ধরে বাশার এমন এক মিশনে জড়িয়ে পড়েছে, যেটা অত্যন্ত জটিল এবং ঝামেলাপূর্ণ। কয়েকদিন ধরেই বাশারের সঙ্গে ওর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ওর কী অবস্থায় আছে কে জানে। তবে একটা ব্যাপার রিফাতকে অবাক করছে বেশ। রিফাত অবাক হয়ে ভাবছে এর আগে ময়মনসিংহের ঘটনায় ঠগি ও কালীদের সংযোগ পাওয়া গিয়েছিল। বাশারের এবারের কেসেও বারোভূঁইয়াদের ইতিহাসের সংযোগ পাওয়া গেছে।

ব্যাপার কি! কোনোভাবে কি কেসগুলো সংযুক্ত?

শেষবার কথা বলার সময়ে বাশারের কাছ থেকে এমনই ইঙ্গিত পেয়েছিল সে। এরপর থেকেই ব্যাপারটা মাথার ভেতরে ঝোঁচাচ্ছে রিফাতের। ওই বিষয়টা নিয়ে ওর ভাবনাগুলো বিস্তারিত লেখার চেষ্টা করছিল রিফাত। কিন্তু রাখতে গিয়ে বারবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ওর ভাবনা। কিছুতেই ওছিয়ে লিখতে পারছে না। মনে মনে শুধু ভাবছে কী অবস্থায় আছে বাশার কে জানে। তবে এবার যদিও ঠিকঠাক ফিরে আসে কালীর কেস ও বারোভূঁইয়াদের কেস নিয়ে ও যা ভাবছে সেটা শেয়ার করবে বাশারের সঙ্গে।

‘আপু, তুমি কি শিকার কাহিনি পড়ো?’ আগের প্রশ্নে জবাব না দেওয়াতে রিফাতকে আবারো একই প্রশ্ন করল রুশো। ‘হুমম,’ ডায়েরি থেকে মুখ তুলে রিফাত ফিরে তাকাল রুশোর দিকে। ওরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছে মাটির নিচের সেই পাতাল মন্দিরের কাছে অফিসটায়। ওরা পুরো মন্দির এলাকার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা থেকে স্যাম্পল সংগ্রহ করেছে আজ। সেগুলো নিয়ে বলতে গেলে সারাদিনই ব্যস্ত ছিল। রিফাতও স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশিই কাজ করেছে আজ, যাতে বাশারের জন্য দুঃশ্চিন্তা ওকে আচ্ছন্ন করে রাখতে না পারে। আর তাই অন্যান্য দিন এই সময়ে ওরা বাইরে বেরিয়ে এলেও আজ এখনো নিচেই আছে।

গল্প শুরুর আগে

যদিও বাকি সবাই চলে গেছে আরো আগেই। বাইরের গার্ড আর ওরা বাদে আর কেউই নেই বলতে গেলে।

রুশোর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে রিফাত কপট রাগের সঙ্গে বলে উঠল, 'আমি কী ধরনের বই পড়ি, তুই এতদিনে জানিস না!'

'সরি সরি,' নিজের ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসে নিজের দুই হাত ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে তুলে মৃদু হেসে বলে উঠল। 'আমার আসলে প্রশ্নটা করা উচিত হয়নি। আমি ভুল প্রশ্ন করেছি। প্রশ্নটা হওয়া উচিত ছিল, তুমি কী বই পড়ছো?' বলে মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'মানে কী বই পড়ছো এই মুহূর্তে?'

ডায়েরিটা বন্ধ করে ফুসস করে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল রিফাত। 'কি জানি একটা বই পড়ছিলাম, মনেও পড়ছে না,' বলে আবারো রুশোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আসলে মনোযোগ দিতে পারছি না,' রিফাতের চোখ খানিক ছলছল।

চেয়ারে আরো খানিকটা সোজা হয়ে বসল রুশো, 'বাশার ভাইয়ের জন্য চিন্তা হচ্ছে? তার আপডেট কি? যোগাযোগ হয়েছে?'

রুশো অনেক প্রশ্ন করলেও রিফাত কোনোটারই জবাব দিল না। স্রেফ না-সূচকভাবে মাথা নাড়ল।

'আচ্ছা, সব ঠিক হয়ে যাবে আশা করি,' বলে সে হাতের বইটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। 'চলো বের হই, আজকের মতো যথেষ্ট কাজ হয়েছে। তোমার আপত্তি না থাকলে চলো পার্কে গিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটাচাটি করি, এরপর বাসায় ফেরা যাবে।'

রুশো উঠে দাঁড়ানোতে রিফাতও হাতের ডায়েরি ব্যাগ ভরে উঠে দাঁড়াল। 'চল, আসলেই আজ আর ভালো লাগছে না,' বলে বের হতে হতে রিফাত জানতে চাইল, 'তুই কি পড়ছিস?'

রিফাতের এই এক প্রশ্নে যেন ছেলেটার পুরো পৃথিবী বদলে গেল। মোটা লেন্সের চশমার আড়ালে চোখ দুটো চক চক করে উঠল তার। গালে টোল ফেলে মৃদু হেসে বলে উঠল, 'আর বলো না, এখানে কাজ শুরু করার পর থেকে ঠগিদের নিয়ে যত বই পাচ্ছি পড়ে যাচ্ছি। এদের নিয়ে রহস্যের কোনো শেষ নেই। কী অদ্ভুত আর বিচিত্র ছিল এদের জীবনযাত্রা। আরো অদ্ভুত ব্যাপার হলো এদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইংরেজরাও যোগ দিয়েছিল।

'ফিরিস্টি ঠগি,' দারজাটা আটকাতে আটকাতে রিফাত বলে উঠল। 'আমিও বইটা পড়েছি। 'ওটা দ্বারা ইম্পায়ার্ড সিনেমাও আছে একটা।'

'হ্যাঁ, আমি ওটা পড়া শেষ করে এখন পড়ছি স্যার হেনরি স্টিম্যানের আত্মজীবনী। তাকে আমার কি মনে হয় জানো? যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেঁতুল। ঠগিরা যেমন বুনো ওল ছিল, এই লোক ঠিক তেমনি বাঘা তেঁতুল ছিল।'

'তা আর বলতে,' রিফাত আর রুশো টেম্পোরারি অফিসটার লোহার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কথা বলছে।

সিপাহী

‘তার আত্মজীবনীতে খুব বিচিত্র এক অভিজ্ঞতার কথা লেখা আছে। সে যখন শেষ বয়সে ইংল্যান্ডে ফিরে যাবে, জাহাজে ওঠার আগের দিন এক ঠগি এসেছিল তাকে খুন করতে, যাকে বলা হয় শেষ ঠগি।’

‘তাই নাকি!’ এতক্ষণ রিফাত হাঁ-হঁ করলেও এতক্ষণে সত্যিকারের মজা পাচ্ছে। এই ছেলেটার সঙ্গে থাকলে এ-ধরনের মজার সব বিষয়ে আলোচনা হয় দেখেই ওর ভালো লাগে। ‘তারপর?’ যদিও প্রশ্নটা রুশোকে করেছে কিন্তু রিফাত অফিস থেকে বের হয়ে তাকিয়ে আছে ওদের অফিসের অদূরে পাতালের কালীমন্দিরটার দিকে। এই মন্দিরটার দিকে তাকালেই ওর বিচিত্র এক অনুভূতি হয়। লাল পোড়া মাটির তৈরি মন্দিরটা দেখতে আর দশটা সাধারণ কালীমন্দিরের মতোই কিন্তু এই মন্দিরের প্রাঙ্গণেই ঠগিরা কালী সাধনা করত, ছাগল বলি দিয়ে, তাতে ভোজ্য সেরে তুপানীর গুড় দিয়ে নেশা করত। মন্দিরটার দিকে তাকালেই রিফাতের মনে হয় যেন ঠগিদের আত্মা ঘোরাফেরা করেছে এই প্রাঙ্গণে। বিশেষ করে ফিরিস্তিয়া নামে ভয়ংকর এক ঠগির গল্প শুনেছে সে, যার খণ্ডিত মস্তক আর দেহও ওরা আবিষ্কার করেছিল এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে। যেটা এখন সংরক্ষিত আছে, টুইন কালী মূর্তির সঙ্গে।

রুশো বকবক করে যাচ্ছে, রিফাত হঠাৎ থেমে গেল, ওর ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এলো বাস্তবে। রিফাতকে থেমে যেতে দেখে রুশো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই রিফাত চুপ করিয়ে দিল ওকে, ‘তুই কি কিছু শুনেছিস?’

‘না তো,’ রুশোর কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে। দুজনেই চুপ। এমনিতেই এই জায়গা খুবই নীরব, কারণ ওপরের পৃথিবীর আওয়াজ এখানে আসে না বা এলেন খুবই সামান্য। যদিও দিনের বেলা লোকজনের কথা-বার্তা, টুকটাক-ঠুকঠাক শোনা যায় কমবেশি। কিন্তু এখন এখানে যেন কবরের নীরবতা। ‘কি ব্যাপার আপু—’ রুশো প্রশ্ন শেষ করার আগেই এবার দুজনেই পরিষ্কার শুনতে পেল। ধপ করে একটা শব্দ হলো প্রথমে, তারপর পায়ের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল একাধিক মানুষের। সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই ফিরে তাকাল জায়গাটার প্রবেশ পথের দিকে।

এখানে প্রবেশের দুটো পথ আছে। একটা এসেছে মুজাগাছা রাজবাড়ি থেকে। অন্যটা এসেছে বেগুনবাড়ির দিক থেকে। দুটো পথই অনেকটা কোনাকুনি এসেছে এল শেপের মতো, যে এলের একপাশে মন্দিরটা অন্যপাশে ওদের অফিস। ওরা দুজনেই প্রবেশপথের দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার কিছু দেখতে পেল না। পাতালে হলেও দিনের বেলা বিচিত্র কোনো উপায়ে এখানে মোটামুটি আলো থাকে। দিনের আলো কমতে থাকলে সেটাও কমতে থাকে। আর এ কারণেই অথরিটি যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা করেছে। তাও খুব অল্পই কভার করতে পেরেছে তারা। প্রবেশপথের দিক থেকে অন্ধকার মতো জায়গাটার দিকে তাকিয়ে ছিল দুজনেই, সেখান থেকে

গল্প শুরু আগে

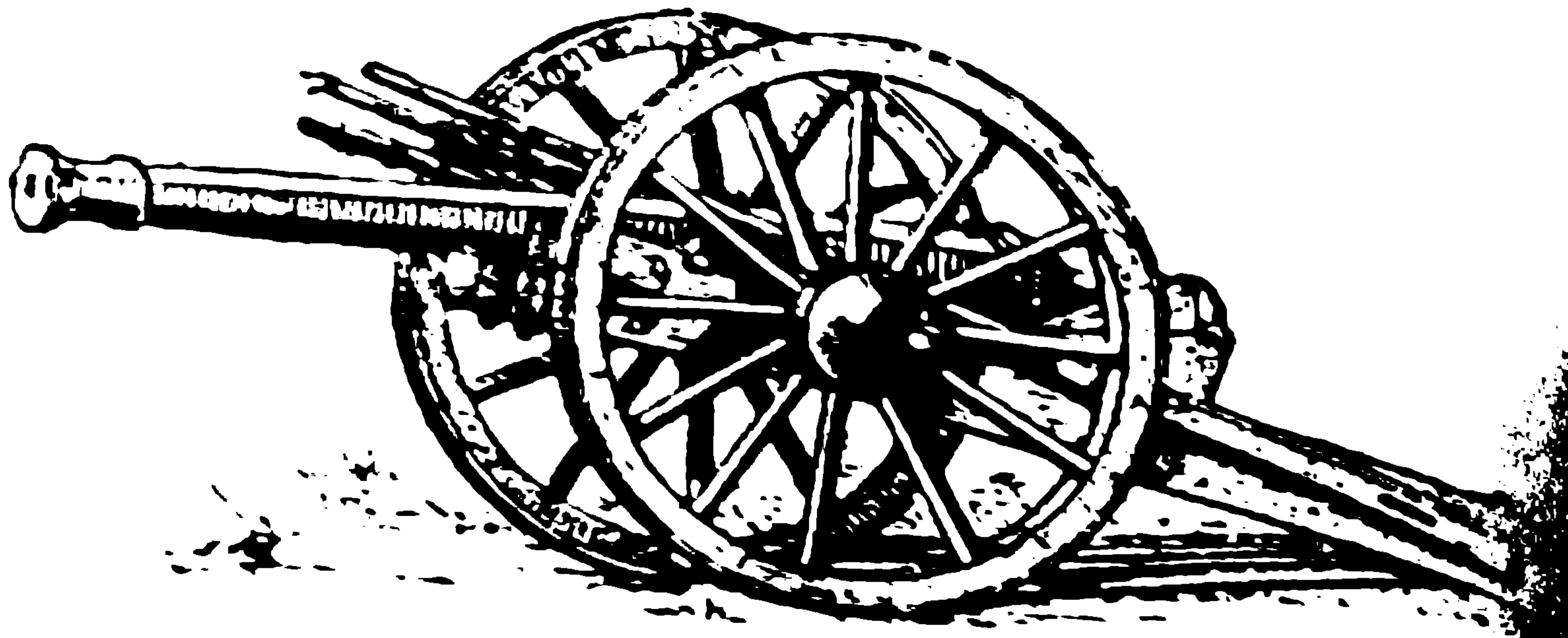
আলোতে বেরিয়ে এলো ওদের গার্ডদের প্রধান, মোটাসোটা বয়স্ক ইকবাল লোকটা।

‘কি ব্যাপার ইকবাল ভাই?’ ইকবালকে দেখে কেন জানি অন্যরকম লাগছে। প্রচুর নেশা করলে লোকজন যেভাবে মুভ করে অনেকট সেরকম। ‘আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?’

ইকবাল কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই তার সিকিউরিটি ইনিফর্মের বুকটা বিস্ফোরিত হলো, আর সেখান দিয়ে বেরিয়ে এলো অনেকটা হারপুনের মতো দেখতে একটা অস্ত্রের মাথা।

প্রাণপণে চিৎকার করে উঠে রুশোর হাতে নখ বসিয়ে দিল রিফাত। অস্ত্রকারের ভেতর থেকে আলোতে গড়িয়ে পড়ল আরো দুজন গার্ডের দেহ। পেছনে দেখা গেল অনেকটা কমান্ডোদের মতো পোশাক পরা একাধিক অবয়ব। তাদের সর্বাত্মে যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে, সেই লোকটা অন্যদের থেকে দু-পা এগিয়ে এসে একেবারে রিফাতদের সামনে এসে দাঁড়াল।

নিজের মুখের কালো মুখোশটা খুলে, খুব সুন্দর একটা হাসি দিয়ে নিজের ব্রেস লাগানো দাঁতের পাটি দেখিয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া রিফাতের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘হ্যালো ম্যাডাম, আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।’



অধ্যায় তিন

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

দিল্লি, ভারতবর্ষ

একজন মানুষকে নিয়ে যাত্রার জন্যে এত আয়োজন, ভাবতেই কেমন জাণি লাগছে মেজর উডসনের। অন্ধকারের চাদর ভেদ করে উড়ে যাচ্ছে তামাকের ধোয়া।

বুক ভরে দম নিতে গিয়ে মেজর উডসনের মনে হলো, অন্ধকার এই বাতাসের ভেতরে তামাকের ধোয়ার সঙ্গে যেন মিশে আছে সন্দেহ, আবিশ্বাস আর অস্থিরতার তীব্র গন্ধ। আর সেই গন্ধ তামাকের ধোয়ার গন্ধের থেকে অনেক বেশি গাঢ়, অনেক বেশি তীব্র।

শেষ কথাটা মনে হতেই মেজরের মন ভালো হয়ে গেল, কারণ ঠিক এমনটাই চাচ্ছিল সে। শিকার করার জন্যে ঘোলা পানির চেয়ে উত্তম স্থান-কাল আর পাত্র কীইবা হতে পারে। আর আজকের রাত শিকারের রাত, যজ্ঞগার রাত, ধ্বংসের রাত। বিগত কিছুদিন ধরে দিল্লি শহরে যে-তাজবের শুরু হয়েছে সে তাগুবে ঝড় ঝঠার রাত আজ, আর এখানেই ভূমিকা দেখা দিয়েছে মেজর উডসনের।

ইংল্যান্ডের বনাঞ্চল এলাকা নটিংহ্যামশায়ারের বাড়ি তার আদি পুরুষদের। নিজের চাচাতো ভাইকে ছুরি মেরে, বাড়ি থেকে পালিয়ে ভাগ্যের অন্বেষণে ভারতবর্ষে পা রেখেছিল উডসনের বাবা। ভারতবর্ষ তখন ইংরেজদের জন্যে ভাগ্য, ক্যারিয়ার, খ্যাতি আর সাফল্যের আতুরঘর। উডসনের বাবা জেনারেল মেয়ার্স উডকেও খালি হাতে ফেরায়নি ভাগ্য। বোম্বের মাটিতে পা রেখেই নিজের নাম লিখিয়েছিল মিলিটারিতে, সাধারণ সৈনিক হিসেবে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে সে উঠে আসে ক্ষমতা-সাফল্য আর সম্পদের শীর্ষে। তারই ছেলে, বাপের নামে যার নামকরণ করা হয় উডসন।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো যে-ভারতবর্ষ জেনারেলকে এত উজার করে সব দিয়েছে, সেই ভারতবর্ষকে কোনোদিন ভালোবাসতে পারেনি জেনারেল সাহেব।

গল্প শুরু আগে

ভারতের মাটি আর ভারতবাসী উভয়কেই স্রেফ নিজের সাফল্যের হাতিয়ার হিসেবে দেখেছে সে। সেটা হলেও সমস্যা ছিল না, কিন্তু জেনারেল সাহেবের সমস্যা ছিল, সে কোনোদিনই নিজ স্বদেশে ফিরে যেতে পারেনি, আর এ-কারণে কোনো এক অদ্ভুত উপায়ে সে সবসময় ভারতীয়দের দোষারোপ করত ভেতর থেকে। আর তাই যখনই সুযোগ পেত চরম নিষ্ঠুরতা দেখাত সে ভারতীয়দের ওপরে। ছোটবেলা থেকেই এই একই ব্যাপার একেবারে আসন গেড়ে বসেছে তার ছেলে উডসনের ভেতরেও। আর তাই বড় হয়ে সে বেছে নিয়েছে এমন এক পেশা যেটাতে নিষ্ঠুরতাই কাজ। মানুষের ওপরে নজরদারি এবং হারিয়ে যাওয়া মানুষ শিকার করা তার কাজ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং তাদের চালিত অ্যাডমিস্ট্রেশন এবং মিলিটারি থেকে প্রায়ই বিভিন্ন মানুষ হারিয়ে যায়। ইংরেজ থেকে শুরু করে স্থানীয় সৈন্য, কেউই এর বাইরে নয়। বিশেষ করে বিগত কয়েক দশকে যখন ইংল্যান্ডের রাজ প্রশাসন আর ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ভেতরে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের মতানৈক্য দেখা দিয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তৈরি হয়েছে অবিশ্বাস আর সন্দেহের বেড়াছাল, সেই সময়ে এই মানুষগুলোর ভূমিকা দেখা দিয়েছে আরো প্রকট হয়ে। মেজর উডসন কাজ শুরু করেছিল মিলিটারির একজন সাধারণ অফিসার হিসেবে, সেখান থেকে একের পর এক কাজে দক্ষতা দেখিয়ে সে ধাপে ধাপে উঠে এসেছে ওপরে। সেই সঙ্গে তার বাপের প্রভাব তো ছিলই। এমন সময় গত চার বছর আগে সে এই বিশেষ দায়িত্ব যেখানে তাকে মিলিটারির কাজের অংশ হিসেবে সামরিক দায়িত্বের ভাগিদার না হয়ে বরং বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

কী সেই দায়িত্ব?

প্রথমত, কোম্পানির হয়ে নির্দিষ্ট কিছু মানুষের ওপরে নজর রাখতে হবে, তাদের গতিবিধির ওপরে। এই কর্মের আওতায় ব্রিটিশ থেকে শুরু করে ভারতীয়রাও রয়েছে। কোম্পানির যাদের ওপরে সন্দেহ, অবিশ্বাস সেই মানুষগুলোরও পরে শুধু নজর নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের গ্রেপ্তার, এমনকি গুম এবং হত্যা পর্যন্ত করাতে রাজি তারা। বিগত কয়েক বছরে এই কাজ উডসন এবং তার বাহিনী খুব ভালোভাবেই করেছে এবং এই কাজ করতে গিয়ে উডসনের হাতে চলে এসেছে অপরিসীম ক্ষমতা। আর সেই ক্ষমতার বলেই সে আজ রাতে আরো একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব পেয়েছে এই ঝড়ো বিক্ষুব্ধ সময়ে।

বিগত কিছু সময় ধরে কোম্পানি এক বিশেষ ব্যক্তির ওপরে নজর রাখছিল। এ সময় যখন সেই মানুষটার ওপরে আসা সন্দেহ প্রমাণ হতে শুরু করে তখন গোলযোগ ছড়িয়ে পরে পুরো ভারতে। এমন অবস্থায় চাইলেও উডসন আর কাজটার

সিপাহী

সমাধা করতে পারেনি। এমন সময় তাদের মিত্র এক রাজা বিক্রম সিং খবর পাঠায় শিকার দিল্লিতে অবস্থান করছে তার শিকার।

অন্যদিকে দিল্লির হয়েছে আরো করুণ দশা। ব্যারাকপুরের আগুন মিরাট হয়ে দিল্লিতে ছড়াতে শুরু করে সেই সময়ে সামরিক কাজ বাদে খুব বেশি ইংরেজ দিল্লিতে ছিল না। বিদ্রোহীরা দিল্লির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ইংরেজকে হত্যা করে, অনেকেই লুকিয়ে পড়ে নানা দিকে। অনেকে আবার এদিকে-সেদিকে দিয়ে কোনোমতে দিল্লি থেকে পালিয়ে বাঁচে। কিন্তু দিল্লির সাধারণ মানুষ কোথা যাবে।

প্রথমে যখন বিদ্রোহীরা দিল্লির নিয়ন্ত্রণ নেয় সে সময়ে সাধারণ মানুষেরা খুশি হয়েছিল। সরাসরি ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সম্পৃক্তরা বাদে বাকি মানুষেরা সুখী ছিল। এরপর সম্রাট বাহাদুর শাহের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পর প্রায় সবাই বেঁধেছিল আশায়। কিন্তু তাতে গুড়ে বালি। প্রথমত, আশীতিপর সম্রাটের নাজ নিজেসঙ্গে সামলানোর ক্ষমতা, না ছিল শাসনভার চালানোর ক্ষমতা। দ্বিতীয়ত, সম্রাট নিজে আগে নির্ভরশীল ছিল ইংরেজদের ওপরে, এরপর সে জিম্মি হয়ে বিদ্রোহীদের ওপরে।

অন্যদিকে বিদ্রোহীরা প্রথমে দিল্লির দখল নেওয়ার পর এদিকে-সেদিকে বিক্ষিপ্ত ঘোরাঘুরির পর স্থায়ী আসন গেড়ে বসে রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে, সেই বিক্ষিপ্ত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রথমে চালায় হত্যাকাণ্ড এবং এরপর শুরু করে লুটপাট। প্রথমে বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য ঠিক ছিল। তারা এদিকে-সেদিকে লুকিয়ে থাকা ইংরেজদের খুঁজে বের করে হত্যা করছিল। এরপর তারা শান্তি দিতে করে ইংরেজদের লুকিয়ে রাখা স্থানীয় ভারতীয় পরিবার বা অন্যদের। সেখান থেকে শান্তির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় লুটপাট। বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে যোগ দেয় মুচি, কামার, কুমার, তাঁতি থেকে শুরু করে রাজ্যের চোর-বাটপাড়ের দল। সব মিলিয়ে বিশাল দল বানিয়ে যথেষ্ট লুটপাট চালাতে শুরু করে তারা। সম্রাটের খাতি কোষাগার এবং সৈনিকদের বেতন দিতে না পারার অপারগতা এই আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। দিল্লি হয়ে ওঠে উত্তপ্ত উনুন। না আছে মানুষের জীবনের নিরপত্তা, না আছে মালসামানের নিরাপত্তা। চারপাশে অবিশ্বাস, সন্দেহ আর অবিশ্বাসের কটু গন্ধ। এমন এক সময় সম্রাটের তরফ থেকে নির্দেশ আসে কাল থেকে সব ধরনের সহিংসতা, অপরাধ, খুনোখুনি এবং লুটতরাজ বন্ধ করতে হবে।

উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরি যদি বিস্ফোরণের দ্বারপ্রান্তে থাকে, আর তাতে যদি পানি ঢেলে দেওয়া হয় সেটা ঠিক যেভাবে বিস্ফোরিত হয়, ঠিক সেভাবে বিস্ফোরিত হয় সম্রাটের এই নির্দেশ। যেই মুহূর্তে ভবঘুরে, অপরাধী আর বিদ্রোহীরা বুঝতে পারে কিছু একটা হতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে তারা। আর এই

গল্প শুরুর আগে

সুযোগটাই নিতে চলেছে আজ উডসন এবং তার দল। বিদ্রোহীদের কাজে লাগিয়ে সে নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করবে আজ।

তামাক শলাকা ফেলে দিয়ে নিজের ঢেকে রাখা মুখটা খানিকটা উচু করল উডসন। তাকে মুখ উচু করতে দেখে গলির অন্যপ্রান্তে ভিখারি সেজে থাকা অন্য লোকটা নিজের সামনে থাকা থালাটা উচু করল খানিকটা। ভেতরে ভেতরে খুশি হয়ে উঠল উডসন, তার লোকেরা প্রস্তুত রয়েছে। উডসন জানে স্থানীয় ভবন দিওয়ানে আম এবং দিওয়ানে খাসকে ঘিরে তার অস্তিত্ব দশজন লোক ছড়িয়ে আছে। নিজের লোকদের ইশারা করে উডসন বসে পড়ল আবার। এখন দুটো ব্যাপার ঘটাতে হবে তাকে। প্রথমত, আরেকটু ধৈর্য ধরতে হবে। আসলে একজন মানুষের জন্য অপেক্ষা করেছে সে। সেই লোকটা ব্যাংক ভবন থেকে বেরিয়ে এলেই তাকে কাজ শুরু করতে হবে। অন্যদিকে, যেই মুহূর্তে সেই লোকটা বেরিয়ে আসবে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ইশারা দিতে হবে একটা নির্দিষ্ট দলকে। এরপর শুরু হবে আসল খেলা।

উডসনের পরিকল্পনা খুব সহজ। পাকা শিকারি সে, আজ রাতে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পরিকল্পনা তার। উডসন এমন একজন মানুষ, যে-ভারতবাসী, রাজনীতি, বিদ্রোহ ইত্যাদি কোনোকিছুরই পরোয়া করে না, এমনকি উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে সে নিজের জানেরও পরোয়া করে না। সে স্রেফ পরোয়া করে নিজের কাজের। রাজা বিক্রম সিংয়ের থেকে যখন জানতে পারে তার টার্গেট দিল্লির শহরের ভেতরে আছে, সঙ্গে সঙ্গে সে রওনা দিয়েছিল তাকে ধরতে। কিন্তু সেই সময়ে দিল্লি দখল করে নেয় বিদ্রোহীরা। এরপর থেকে দিল্লির আশপাশেই অবস্থান করে স্রেফ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সে আর তার দল। ধীরে ধীরে দিল্লির পরিস্থিতি যত তগু হয়ে উঠতে থাকে, সেই সময়ে সে নিজের প্রস্তুতি নিতে থাকে। নিজের দলকে দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগকে অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করতে থাকে। অন্য গ্রুপকে দিল্লির ভেতরে প্রেরণ করে খবরের জন্য। এসব কাজেরই এক্সপার্ট সে, কাজেই ঘোলা পরিস্থিতি তার জন্য বরং সমস্যা নয় সুবিধাই হয়। প্রস্তুতি নিতে নিতে তার দল খবর নিয়ে আসে, ছড়ানো-ছিটানো হিসেব বাদ দিলে দিল্লির ভেতরে এখনো দুটো জায়গা ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে আছে, বারুদখানা এবং সরকারি ব্যাংক ভবন। এই দুটো জায়গার একটাতেই তার টার্গেট আছে এবং কয়েকদিনের ভেতরেই খবর চলে আসে, তার টার্গেট ব্যাংক ভবনেই আছে।

খুশি হয়ে ওঠে উডসন, শহরের ভেতরে লুটতরাজ চালানোর অন্যতম প্রধান ডাকাত গ্রুপের একজনের কাছে খবর পাঠায় তার কাছে বিশেষ তথ্য আছে, সেটা সে দিতে পারে বিদ্রোহীদের, তাকে একটা কাজে সামান্য সাহায্য করতে হবে। বিনিময়ে বিপুল সম্পদের অধিকারী হতে পারবে তারা। ব্যাপারটা শুনতে অদ্ভুত

সিপাহী

শুনতে পারে, কারণ সে জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছে সেই তাদের থেকেই ঘুৰ নিচ্ছে হুন্দেবির। কিন্তু বস্তুবত্ব হলো—কোম্পানি এবং ইংরেজেরা ঘোলা পানিতেই চিরকাল মাছ শিকার করে এসেছে। এর জন্যে যা করা প্রয়োজন তারা করবে, যত নিচে নামা লাগে নামবে। যাই হোক বিদ্রোহী নামের ডাকাতদের সঙ্গে উডসনের বাহিনীর চুক্তি হয়ে গেল। এবার স্রেফ অপেক্ষার পালা, যেদিন সম্রাটের ঘোষণা এলো, সঙ্গে সঙ্গে উডসন বুকে ফেলল, এখনই সময়। নিজের লোকদের নিয়ে গোপনে শহরে প্রবেশ করল সে। ছাত্রগামতো অবস্থানও নিয়ে ফেলল।

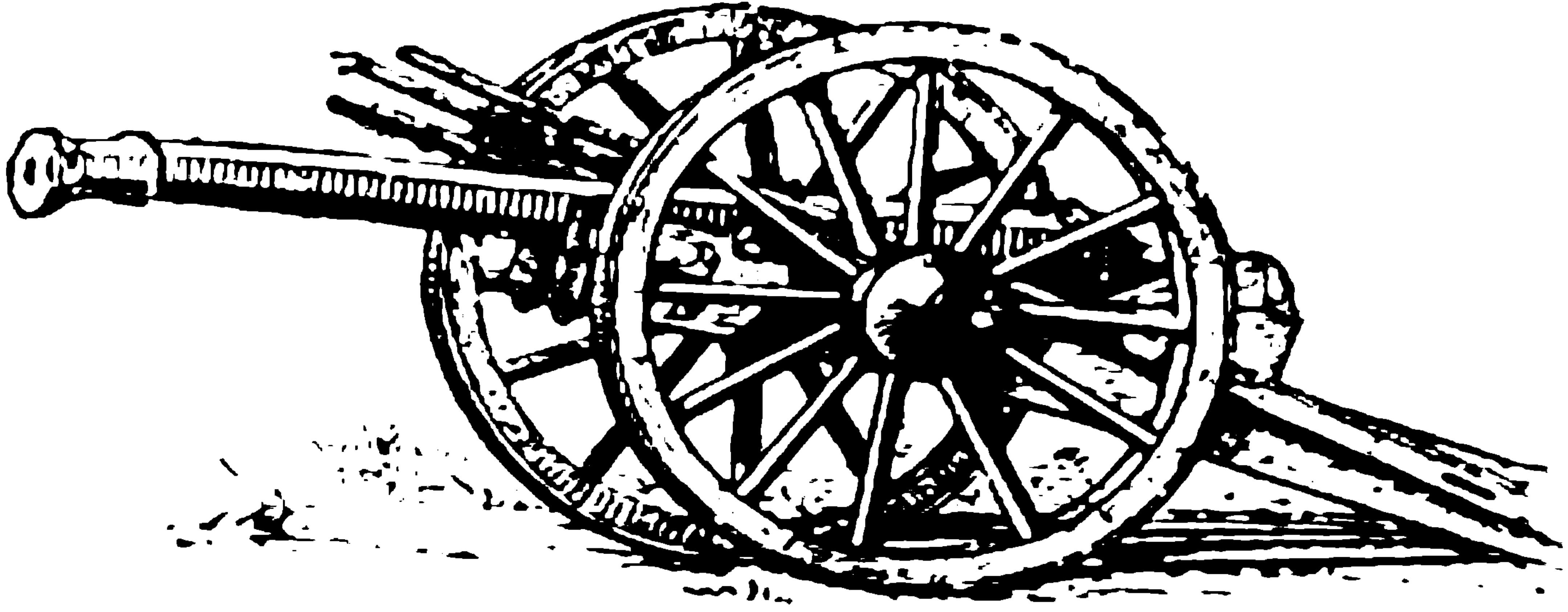
কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই উডসন দেখল ব্যাংকের দালানের এক জায়গাতে ছোট একটা আঙুনে বিন্দু নাড়াচাড়া করছে। আবারো হাসি ফুটে উঠল উডসনের মুখে। সময় এসে গেছে। য়দু স্বরে শিস বাজাল সে, অনেকটা সাক্ষ্য পাখির ডাকের মতো। শিস বাজিয়ে বানিকবংশ চুপ করে রইল সে, কয়েক মুহূর্ত পরেই একই শিস বেছে উঠল আরো কয়েক জায়গাতে। শিসগুলো বাজানো হয়ে যেতেই চারপাশ যেন নীরব হয়ে গেল।

উডসন কান পেতে আছে, কিন্তু কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

ব্যাপার কি, ওরা কি বেইমানি করল, কিছু হচ্ছে না কেন?

আরো কিছুক্ষণ সব চুপ, অস্থির হয়ে উঠছে উডসন, এমন সময় শুনতে পেল অনেক মানুষের হুলা। ডান দিকে তাকাতেই দেখতে পেল, একদল লোক পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে হাতে লাঠিসোঁটা আর মশাল হাতে হুলা করতে করতে এগিয়ে আসছে এদিকে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল উডসন। তার পরিকল্পনা পুরোপুরি কাজে লেগেছে। ভুয়া বিদ্রোহী আর স্থানীয় ডাকাতদের দিয়ে ব্যাংক লুট করাতে যাচ্ছে সে।



অধ্যায় চার বর্তমান সময় বেগুনবাড়ি, ময়মনসিংহ

লুটপাট বা ডাকাতি যে এদের উদ্দেশ্য নয়, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কারণ কমান্ডোদের মতো পোশাকধারী দলটা দুই পাশ থেকে অস্ত্র তাক করে আছে রুশো আর রিফাতের দিকে, ওদের কমান্ডার লোকটা হাসিমুখে রিফাতের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘ম্যাডাম আপনাকে তো নেবোই, সেই সঙ্গে,’ বলে সে মন্দিরটার দিকে তাকিয়ে ওটাকে দেখিয়ে যোগ করল। ‘ওটার খানকিটা অংশও।’

রিফাত প্রথমে গার্ড ইকবালের মৃতদেহ দেখে, তারপর বাকি গার্ডদের মরা অবস্থায় দেখে ওর চিৎকার রূপ নেয় গোঙানোতে। সে এখনো শক্ত করে ধরে আছে রুশোর হাত, ওর নখ বসে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে ছেলেটার হাত থেকে। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠতেই রুশো চট করে পেছন দিকে খানকিটা সরিয়ে দিল রিফাতকে, তার কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে এনে অনেকটা ঢালের মতো ধরে রেখেছে ওদের দুজনার সামনে, রিফাতকে পেছন দিকে সরিয়ে দিয়ে ডানদিকে বেশ খানকিটা সরে গেল ও।

‘আমার নাম, সারোয়ার,’ নিজের বুকে হাত দিয়ে যেন কোনো গালা নাইটের পার্টিতে কাউকে পরিচয় দিচ্ছে এমনভাবে বলে উঠল লোকটা। তার মুখে হাসি কিন্তু, তাতে কোনো উজ্জ্বলতা নেই, দাঁতে লাগানো ব্রেস সেটাকে আরো অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা ভাব এনে দিয়েছে। ‘সবাই স্যাম বলে ডাকে, এক্স মিলিটারি,’ বলে সে রুশোর পেছনে কম্পনরত রিফাতকে দেখিয়ে বলে উঠল। ‘বালক, ম্যাডামের সঙ্গে আজ রাতে আমাদের সবার ডেট আছে, তাই তাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে,’ বলে সে নিজের লোকেদের দিকে দেখিয়ে মৃদু হেসে উঠল। ‘ডেটটা আমাদের সবার সঙ্গে তো, তাই—’

সিপাহী

‘মগের মুলুক নাকি! আপনারা জানেন আমরা কারা, এখানে এভাবে—’ রুশো কথা বলতে বলতে আরেক ধাপ ডানে সরার চেষ্টা করল তার আগেই ধমকে উঠল লোকটা।

‘চূপ,’ একটু আগের হাসি মুখটা সঙ্গে সঙ্গে গুমোট হয়ে গিয়ে প্রায় গর্জন করে উঠল, সারোয়ার ওরফে স্যাম নামের লোকটা। ‘বালক, তুমি আমার কথা খেয়াল করেনি, আমরা ম্যাডামকে নিতে এসেছি, তুমি এখানে স্রেফ আবর্জনা,’ বলেই পুরনো দিনের ওয়েস্টার্ন সিনেমার ডুয়েলারদের মতো, বিদ্যুৎবেগে নিজের দিক বের করে আনল রুশোকে গুলি করার জন্য। কিন্তু তার আগেই রিফাতকে দিয়ে ফেলে দিয়েই ডান দিকে লাফ দিয়েছে রুশো। মাটিতে পড়ার আগেই হাতের ব্যাগ দিয়ে ডান দিকে একটা পাম্পের মতো দেখতে জিনিসের নিভা ওপরে সর্ব শক্তি দিয়ে বাড়ি মারল সে।

সঙ্গে সঙ্গে জলকামান থেকে যেভাবে পানি বেরিয়ে আসে সেরকম তীব্র গতি নিভারে ওপরের অংশে থাকা পাইপের মুখ দিয়ে তীব্র বেগে পানি বেরিয়ে গিয়ে সোজা কোমরে আঘাত করল লোকটার। তীব্র ধাক্কা সামলাতে না পেরে লোকটা গিয়ে বাড়ি খেল নিজের এক সঙ্গীর গায়ে, দুজনে মিলে গড়িয়ে পড়লে অপরজনের গায়ের ওপরে।

এই সুযোগে, মাটি থেকে উঠেই রিফাতকে টেনে তুলে ফেলল ছেলের। ‘জলদি আপু জলদি বলেই প্রায় টেনেইঁচড়ে ওকে নিয়ে যেতে শুরু করল ওদের অফিস ঘরটার দিকে। পেছন থেকে আশপাশে দুয়েকটা গুলি এসে লাগতেই দুজনে মাথা নিচু করে দৌড় দিল। কিন্তু স্যাম লোকটার গর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই গুলি খেতে গেল। কিন্তু ততক্ষণে রিফাত আর রুশো পৌছে গেছে লোহার সিঁড়ির গোড়ায়। গুলি খামতেই, দুজনে হাঁচড়েপাঁচড়ে কোনোমতে উঠে পড়ল, অফিস ঘরে। ভেতরে ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিল ভেতর থেকে। দুজনেই প্রাণপণে হাঁপাচ্ছে হাপড়ের মতো।

‘গুলি করেছে কে?’ মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে একেবারে শান্ত গলায় জানতে চাইল সারোয়ার। গায়ের ভেজা পোশাক থেকে তখনো টপ টপ করে পানি ঝরছে। বিরক্তির সঙ্গে সে একবার ফিরে তাকাল—যেখান থেকে পানির ধারা এসে ওদের গায়ে লেগেছিল। ওখান দিয়ে এখনো হর হর করে পানি বের হচ্ছে এখনো। যদিও পানির শক্তি কমে গেছে অনেকটাই। পাতাল নদীতে পানির ধারা

গল্প শুরু আগে

নেই বললেও চলে। তার পরও সরু যেসব ক্ষীণ ধারা রয়েছে, সেগুলোকে পাম্প করে মেশিনের মাধ্যমে পুরোপুরি শুকিয়ে সেই পানি জমা করে রাখা হয় একটা পানির ট্যাংকে, প্রয়োজনে সেটাই ব্যবহার করা হয় মন্দির ও অফিস ঘরের চারপাশে পানি ছিটিয়ে ধুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। এটাই ওদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে ছেলেটা। নিজের লোকদের দিকে ফিরে তাকিয়ে আবারো একই প্রশ্ন করল।

‘ওরা যখন পালাচ্ছিল, প্রথম কে গুলি করেছে?’ সে চোখ নিচু করে তাকিয়ে আছে অপর দিকের দুই সঙ্গীর দিকে। দুজনের কেউই জবাব দেওয়ার আগে, ঠিক আগের মতোই বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো মাটি থেকে তুলে আনা পিস্তলটা তাক করল দুজনার দিকে। দুজনেই আঁতকে, উঠতেই সে গুলি না করে ওটার মাথা তাক করে, নাড়তে নাড়তে বলে উঠল, ‘খুব সাবধান বাচ্চারা, প্রথমবারের ভুল বলে মাফ করে দিলাম। এরপর এ-ধরনের ভুল হলে সবাইকে একসঙ্গে মেরে ফেলব,’ তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। আর মেরে ফেলব এই অংশটুকু এমনভাবে উচ্চারণ করল যেন, মশা বা মাছি মারার কথা বলছে। ‘ডু ইউ আন্ডার স্ট্যান্ড?’ শেষ অংশটুকু প্রায় গর্জন করে জানতে চাইল সে।

‘ইয়েস স্যার,’ প্রায় সমানভাবে গর্জন করে জবাব দিল সঙ্গীরা।

‘ভেরি গুড, বলে সে মাথা দুই পাশে নেড়ে ঘাড় ফুটাল কট কট করে, তারপর সামনের ছোট অফিস ঘরটা দেখিয়ে বলে উঠল, ‘সময় এসেছে খোয়াড় থেকে মুরগি ধরে আনবার। আমরা ম্যাডামকে জ্যাস্ট ধরব, আর ওই ছেলেটাকে আমি গুলি করব। অন্য কেউই নয়। লেটস মুভ।’

‘রুশো,’ আবারো রুশোর হাত খামচে ধরে রিফাত বলে উঠল, ‘ওই লোকগুলো কি আমাদের মেরে ফেলবে?’ ওর মুখ শুকিয়ে গেছে, গলায় যেন কেউ ঘষে দিয়েছে শিরিস কাগজ।

‘আপু শান্ত হও,’ যদি তার নিজের গলাও কম্পমান, তাও রুশো তুলনামূলক শান্ত আছে। ‘সারোয়ার নামের লোকটার কথা যদি আমি বুঝে থাকি তবে, ওরা তোমাকে কিডন্যাপ করতে এসেছে, আমার ব্যাপার জানি না, তবে ওরা তোমাকে অস্ত্র মারবে না, দেখলে না, গুলি করেও থেমে গেল ওরা,’ এরকম ভয়ংকর অবস্থাতেও ছেলেটার ঠান্ডা মাথা ও অবজারভেশন অবাক করল রিফাতকে। কথা বলতে বলতে রুশো খানিক মাথা তুলে অফিসের পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখল লোকগুলো সারি দিয়ে এগিয়ে আসছে ছোট অফিস ঘরটার দিকে।

সিপাহী

‘রুশো, ওরা যদি আমাকে নাও মারে তোকে তো মেরে ফেলবে বাধা দিলে,’ যদিও সে পুরোপুরি নিশ্চিত নয়, তাও রুশোর কথা শুনে আতঙ্কিত অবস্থার ভেতরেও প্রথমে এই কথাটাই মনে এলো ওর। ‘এক কাজ কর আমি—’

‘এক মিনিট আপু,’ রুশো মোবাইল বের করেছিল আগেই। সেটা টিপতে টিপতে ধামিয়ে দিল রিফাতকে। কারণ সে ঠিকই বুঝতে পেরেছে রিফাত আসলে কী বলতে যাচ্ছে। ‘তোমার মোবাইল বের করো তো,’ রুশোর নির্দেশনা শুনে রিফাত নিজের ব্যাগ খুঁজল কিন্তু কামরার কোথাও ওটা দেখতে পেল না। আসলে বের হওয়ার সময়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই ও নিজের হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে বের হয়েছিল আর ওখানে আক্রমণের সময়ে ওটা নিশ্চয়ই ওখানেই ফেলে এসেছে।

‘শিট,’ রিফাত ব্যাগ না পেয়ে রুশোর দিকে তাকাল।

‘কি ব্যাপার?’

‘মোবাইলে কোনো নেটওয়ার্ক নেই,’ বলে অসহায়ভাবে রিফাতের দিকে তাকাল। এই পাতালে এমনিতেই নেটওয়ার্ক নেই। সে-কারণে এখানে একটা মোবাইল ডিভাইস বসানো আছে যেটার মাধ্যমে ওটা মোবাইলের নেটওয়ার্ক পায়। ‘তুমি নিশ্চয়ই নেট মেশিনটা অকেজো করে দিয়েছে,’ বলেই সে হামাগুড়ি দিয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে অফিসের লাগোয়া টিএনটি ফোনটা তুলে নিয়ে হতাশার সঙ্গে ডায়ালটা নামিয়ে রাখল। ‘তার কেটে দিয়েছে?’

‘এখন তাহলে করব কি আমরা?’ রিফাতের ভেতরে আতঙ্কিত ভাবটা খানিক কমে এখন লজিক্যালি চিন্তা করার চেষ্টা করছে ও।

‘বুঝতে পারছি না তো,’ বলে রুশোর দৃষ্টি পড়ল অফিসঘরের দরজার পাশে ছোট একটা বাক্সের দিকে। সে নিচু অবস্থাতেই লোকগুলো আসছে কি না বাইরে থেকে দেখে নিয়ে চলে এলো রিফাতের কাছাকাছি। ‘উপায় একটা আছে কি তাতে খানিক ঝুঁকি আছে।’

‘লোকগুলো এখনো আসছে না কেন? এতক্ষণে তো অফিস ঘরে পৌঁছে যাওয়ার কথা।’

‘আমি তো বুঝতে পারছি না, তবে—’ রুশো কথা শেষ করতে পারল না তার আগে দুজনেই নিজেদের প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল, কেন লোকগুলো এগিয়ে আসছে না। কারণ ঠন করে শব্দের সঙ্গে অফিসের জানালার কাচ ভেঙে ভেতরে পড়ল একটা শ্মোক বম্ব। সেটা পড়েই গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল।

‘ওড জব, শ্মোক বম্ব ফায়ার করা লোকটার উদ্দেশ্যে ভি সাইন দেখিয়ে অন্যদের সবাইকে বলে উঠল, ‘এরা এখন বেরিয়ে আসবে। মনে রেখো কোনো গুলি করা

গল্প শুরু আগে

চলবে না, যদি গুলি হয় তবে একমাত্র আমি করব। অস্ত্র সেফ ভয় দেখানোর জন্য,' বলে সে নিজের টিমের দিকে ইশারা করল সামনে এগোনোর জন্য। অফিস ঘর থেকে সেফ ডিসটেন্স মেইনটেন করে ওটা থেকে বের হয়ে আসার লোহার সিঁড়িটা কভার করে ওটার দু পাশে দাঁড়িয়ে গেল সবাই।

সারোয়ার একটু অবাক হয়ে নিজের ঘড়ি দেখল। মনে মনে একটু অবাক হচ্ছে সে। বস্তুটা মারা হয়েছে প্রায় মিনিটখানেক হয়ে যাচ্ছে। এরা বের হচ্ছে না কেন। হিসেবে তো আরো ত্রিশ সেকেন্ডে আগেই বের হয়ে আসার কথা। অফিসের আধা খোলা দরজা আর ভাঙা জানালা দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। কিন্তু মানুষ বের হওয়ার নাম নেই।

আরো দশ সেকেন্ডে অপেক্ষা করে সে নিজের লোক একজনকে ইশারা করল এগোনোর জন্য। সে বুঁকি নিতে চাচ্ছে না। কারণ ভেতরে আবার দম আটকে মরে গেলে সমস্যা। তার লোকটা মুখে গ্যাস মাস্ক লাগিয়ে সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ উঠতেই খট করে শব্দ হলো সঙ্গে সঙ্গেই, পাতালের জায়গাটা ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার হয়ে গেল। ওরা সতর্ক হওয়ার আগেই আধখোলা দরজাটা পুরো খুলে গেল। সেটা দিয়ে প্রথমে উড়ে এলো একটা চেয়ার। সিঁড়িতে দাঁড়ানো লোকটা মাথা নিচু করে সেটা এড়িয়ে যেতেই ওটা উড়ে গিয়ে নিচে একজনের গায়ে লাগল। লোকটা চেয়ার এড়াতে পারলও। দরজা দিয়ে আড়াআড়িভাবে গড়িয়ে আসা টেবিলটা কিছুতেই এড়াতে পারল না। ভেতর থেকে তীব্র ধাক্কার সঙ্গে বেরিয়ে আসা টেবিলটা তাকেসহ গড়িয়ে পড়ল নিচে সিঁড়ির গোড়ায় আরো একজনকে নিয়ে।

টেবিলটার ঠিক পেছন পেছন কামরাটার ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো মানুষ দুজন। বাকিরা তো বটেই এমনকি সারোয়ার নিজেও পুরোপুরি সতর্ক হওয়ার আগে, অদ্ভুত এক সাদাটে পিচ্ছিল জিনিসে মাখামাখি হয়ে গেল তার মুখ।

রুশো আর রিফাতের পরিকল্পনাটা খুব সহজ আর পরিষ্কার। ওরা যখন ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে, তখন প্রথমেই রুশোর চোখে পড়ে অফিসের মেইন সুইচটা। ওটা এই আন্ডারগ্রাউন্ডের পুরো ইলেকট্রিসিটি কন্ট্রোল করে। তার মাথায় একটা ভাবনা পাক দিয়ে ওঠে কিন্তু সেটা রিফাতকে বলার আগেই ভেতরে এসে পড়ে স্মোক বম্ব। এবার রিফাত নড়ে ওঠে রুশোর আগে, নিজের ওড়না দিয়ে মুখ চেপে ধরে গড়িয়ে সরে যায় অফিসের কোনার দিকে। একহাতে মুখ চেপে ধরে টান দিয়ে খুলে ফেলে ক্যাবিনেটের নিচের ড্রয়ার। ছোট একটা সিলিন্ডার বের করেই ওটার

সিপাহী

মুখে জুড়ে দেয় একটা ব্রিডিং মাস্ক। প্রথমে নিজে নিঃশ্বাস নেয়। এরপর রুশোর মুখ চেপে ধরে সরে আসে।

ওরা যেহেতু আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করে তাই কারো সাফোকেশন বা নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হলে বিশেষ অক্সিজেন সিলিন্ডার রাখা ছিল আগে থেকে, আর এটিও করেছে ওরা বহুবার। নিঃশ্বাস নিতে পেরেই রিফাতকে ইশারায় এবং বলে বসিয়ে দেয় কী করবে। প্রথমেই ওরা মেইন সুইচ অফ করে দেয়। অন্ধকার হয়ে যেতেই অফিসের দরজাটা খুলে বাহিরে ছুড়ে দেয় চেয়ার। আগেই টেবিলটাকে ঠেলে দিয়ে এসেছিল কাছে, ওটাকেও ঠেলে দেয় নিচে। এবার দুজনে ফায়ার এক্সটিংগুইশারের দুটো হ্যান্ড সিলিন্ডার নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে সামনে যাকে পায় ফোম ছুড়ে দিয়ে প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করে বেগুনবাড়ি দিয়ে বের হওয়া পাতাল পথটার বিপরীত দিক দিয়ে।

‘আপু দৌড়াও,’ চিৎকার করে বলেই রুশো দৌড় দেয় সামনে। যেহেতু লোকগুলো বেগুনবাড়ির পথ দিয়ে নেমে এসেছে কাজেই ওদিকে না গিয়ে উল্টো পথে গেলে মুক্তাগাছা দিয়ে বের হওয়ার বন্ধ পথটা নিয়ে হয়তো ওরা বের হতে পারবে। ওটাই ওর ভাবনা। আর সেটা করতে হবে লোকগুলোর প্রাথমিক ধাক্কা কেটে যাওয়ার আগেই।

দুজনে প্রায় ছড়াজড়ি করে দৌড়াচ্ছে যাতে রিফাতের গায়ে গুলি লাগার ভয়ে লোকগুলো রুশোকে গুলি করতে না পারে। পেছনে ধেয়ে আসছে পায়ের শব্দ, তবে আক্রমণকারীরা খানিক পিছিয়ে পড়েছে। কারণ রিফাত বা রুশো এই জায়গাটা যেভাবে চেনে ওরা সেভাবে চেনে না। অন্ধকারের ভেতরে রিফাত-রুশো আলো ছাড়াই যেভাবে এগোতে পারছে, ওরা পারবে না।

‘আমি আর পারব না,’ বেশ অনেকটা এগিয়ে ছোট একটা পানির ধারার কাছে এসে মাটির ওপরে বসে পড়ল রিফাত। রুশোও হাঁপাচ্ছে, ও ইশারায় আধো অন্ধকারে ভেতরে ও জায়গার শেষটা দেখাল। ‘আরেকটু,’ বলে পেছন দিকে দেখে নিয়ে রিফাতকে টেনে তুলে ওপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে এগোতে লাগল। পেছনে আবারো পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দুজনেই নিজেদের হাঁচড়েপাঁচড়ে তুলে ওপরে ওঠার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। নড়ারও শক্তি নেই।

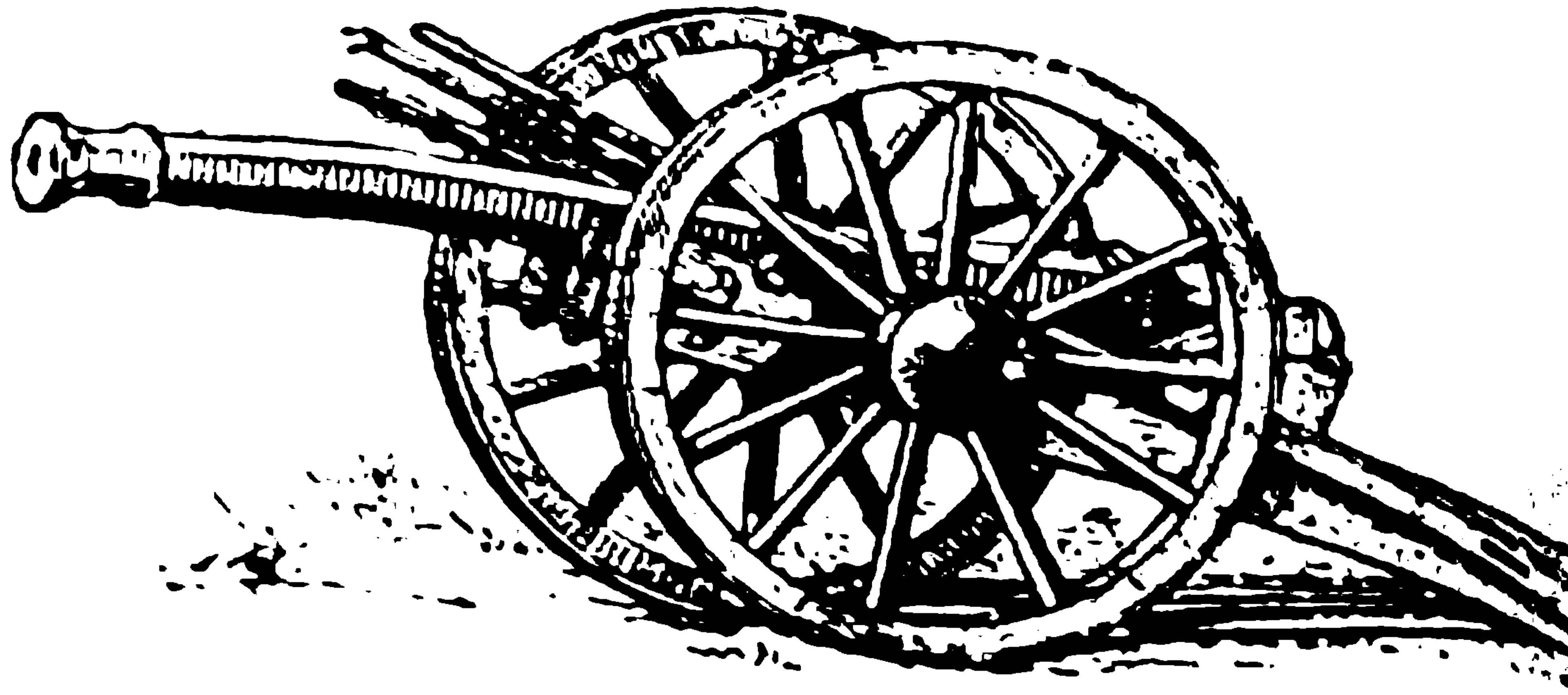
ওরা নিজেদের ছির করার আগেই ধপ করে মন্দিরের ভেতরে বাতি জ্বলে উঠল। রিফাত আর রুশো দুজনেই চূড়ান্ত হতাশার সঙ্গে দেখল নিচের লোকগুলোর মতোই একই পোশাক পরা দুজন অস্ত্রধারী দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের বেদির পাশের ছোট কামরাটায়। ‘হ্যালো,’ ওদের দেখে একজন হাসি মুখে বলে উঠল। ‘আপনারা

গল্প শুরু আগে

কি ভেবেছিলেন, এই পথটার কথা আমরা জানব না। বরং আমাদের পরিকল্পনাই ছিল তোমাদের নিচে ধরতে না পারলে এদিকে ধাওয়া করে এখানে ধরা হবে—’ লোকটা দাঁত বের করে হাসছে নিচ থেকে একে একে ওপরে উঠে এলো সারোয়ার আর তার সঙ্গীরা।

সারোয়ার লোকটার ভেজা পোশাক আর ফেনায় মাখামাখি চেহারা গম্ভীর হয়ে আছে। ‘আমি,’ দ্রুত ওপর থেকে মুখের ওপরে পড়া ফেনার একহাতে মুখে বিরক্তির সঙ্গে সে ওদের দুজনার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘খুব নন ভায়োলেন্ট একজন মানুষ কিন্তু বিরক্ত হলে,’ সে বিদ্যুৎবেগে পিস্তল বের করে গুলি করল মাটিতে আধ বসা হয়ে হাঁপাতে থাকা রুশোকে।

ছেলেটা গুলির ধাক্কায় একপাশে ছিটকে পড়তেই সেকেন্ডের জন্য ব্যাপারটা ধরতে পারল না রিফাত, শকের কারণে, পরমুহূর্তে প্রাণপণে চোঁচিয়ে উঠল ও ভয় আর আতঙ্কে।



অধ্যায় পাঁচ

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
চাঁদনি চক, দিল্লি

আতঙ্ক ছড়ানোই যেন জায়গাটার কাজ, আর নামটাও মিলে গেছে কাজের সঙ্গে।

জায়গাটার নাম খুনি দরওয়াজা, চাঁদনি চকে সুনেশ্বর মসজিদের কাছে, নাদি শাহকে এখানে হত্যা করা হয়েছিল বলে এই নাম। এরই বিপরীতে বেগম সামারের উদ্যান আর বাসভবন অবস্থিত। আর এই অবস্থানের ঠিক ঠিক সামনে কোনোকোনিতাবে ব্যাংক ভবনটি অবস্থিত। উডসনের কাছে নিশ্চিত খবর আছে এই ব্যাংক ভবনের ভেতরে নিচের ফ্লোরের ভেতরে এখনো অনেক টাকা আছে, যেটার পাহারায় নিযুক্ত রয়েছে বেশ কিছু ইংরেজ অফিসার। আর ব্যাংক ভবনের ভেতরে আশ্রিত আছে কিছু ইংরেজ পরিবার এবং উডসনের টার্গেট। সুরক্ষিত এই ব্যাংক ভবনের ভেতরে হানা দিয়ে যাকে সে কোনোদিনই ধরে আনতে পারত না। কাজেই তার এই বন্দোবস্ত।

ভূয়া বিদ্রোহী আর ডাকাতদের সশস্ত্র দলটা স্রেফ ঢেউয়ের মতো ব্যাংক ভবনের গেটটার ওপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতগুলো লোকের চেষ্টার ফলও কাজে দিত না, যদি না তাদের কাছে গেটে লাগানো তালি ওড়ানোর জন্য বিশেষ ধরনের বোমা না থাকত। এটাও তাদের সাপ্লাই করেছে উডসনের লোকেরাই। প্রাথমিক ধাক্কায় গেট ভাঙতে না পেরে ক্ষণিক সময়ের ভেতরে বিদ্রোহীরা গেটের তালার কাছে বোমা সেট করে সরে গেল। তীব্র বিস্ফোরণের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গেটের একপাশ ভেঙে পড়তেই ডাকাতরা হইহই করতে করতে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

উডসন দাঁতে দাঁত চাপতে চাপতে উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠল, 'এবার শুরু হবে খেলা,' কথাটা বলেই উডসন দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে দু পাশে তাকিয়ে নিজের লোকদের আরেকবার ভালোভাবে দেখে নিল। সে অনুভব করতে পারছে ওরা অস্থির হয়ে উঠছে। তাও হাতের ইশারায় সে তাদের স্থির থাকতে বলল। ব্যাংকের ভেতরে ডাকাতরা প্রবেশ করা মাত্রই ভেতরের বাধার কাছে প্রতিহত হলো তারা। উডসন

গল্প শুরুর আগে

দেখল ভবনের ভেতরের লোক আর বাইরের বিদ্রোহীদের ভেতরে বাদানুবাদ চলল কিছুক্ষণ, তার পরেই শুরু হলো আক্রমণ।

প্রথমেই ডাকাতদের গুলি করা হলো ভেতর থেকে, বাইরে থেকে সমানতালে পালটা জবাব দিতে লাগল তারা। অন্যদিকে একদল দরজা ভাঙার আয়োজন করছে। এই বাদানুবাদ কিছুক্ষণ চলার পরই বিদ্রোহীরা আগুন ধরিয়ে দিল ভবনের নিচের অংশে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে নিজের লোকদের এগোনোর জন্য ইশারা করল উডসন। একহাতে একটা গাদা বন্দুক, অন্যহাতে ছোট একটা মোটা লাঠি তার। দুটোকেই বাগিয়ে ধরে তীব্র দৌড়ের সঙ্গে সে প্রবেশ করল ব্যাংক ভবনের লনে। ব্যাংক ভবন তখন নরকে রূপ নিয়েছে। ভেঙে পড়েছে সদর দরজা, সেটা দিয়ে ভেতরে ঢোকা ডাকাতদের উল্লাস ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, বাইরে এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সাদা চামড়া আর স্থানীয়দের লাশ।

কোনোকিছুরই পরোয়া না করে, স্রেফ ঝড়ের বেগে সামনে এগিয়ে গেল উডসন, সামনে কেউ পড়তেই প্রথমে গুলি করল, তারপর বন্দুকটাকে উলটো ধরে স্রেফ পিটিয়ে জায়গা করে যখন সে ভবনটার পেছনের দেয়ালের কাছে পৌঁছাল, তখন হাঁপাচ্ছে সে। দেয়ালটার কাছে পৌঁছে ক্ষণিকের জন্য দেখে নিল তার লোকেরা সবাই এসেছে কি না। গোনার সময় নেই। স্রেফ একবার দেখে নিয়ে দেয়াল টপকাল সে আর তার সঙ্গীরা। ছোট রাস্তাটা পার হয়ে প্রবেশ করল বেগম সামারুন্নের উদ্যানে। উদ্যানের অন্ধকারে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে লাগল তারা শিকারের।

‘হুজুর,’ হাঁপাতে হাঁপাতে জানতে চাইল তার এক সঙ্গী। ‘ওরা এদিকেই আইব আপনে নিশ্চিত?’

উডসন মাথা নেড়ে সায় জানাল। এই কাজ সে বহু বছর ধরে করছে, পালাতে থাকা মানুষের প্রতিটা পদক্ষেপ সে অগ্রিম টের পায়। তার হিসেব এবং ইনফরমেশনের বলে ব্যাংক ভবন থেকে কেউ যদি পালাতে পারে এবং পালাতে চায়— এটাই সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা। উডসনের মন বলছে তার শিকার আসবেই।

কারণ তার শিকার এমন অবস্থার জন্যে যে-প্রকৃতি নিয়ে রেখেছে, সেটার কাছে পৌঁছাতে হলে তাদের এখান দিয়েই পালাতে হবে।

ব্যাংক ভবনের গেটে হুল্লারত লোকগুলোকে দেখেই যা বোঝার বুঝে গেছে সে। চুল-দাড়ি তো পেকেছে তার বহু আগে, জীবনের প্রতিটা ধাপে সংগ্রাম করে উঠে দাঁড়ানো একজন মানুষ সে। খুব ভালো করেই জানে এবং অনুধাবন করতে পারে কখন কী করতে হবে তাকে। ব্যাংক ভবনের গেটে মানুষগুলোকে দেখেই সে বুঝে

সিপাহী

নিয়েছে সম্রাটের নির্দেশ উলটো ফল বয়ে আনতে শুরু করেছে। গতকাল আর আজ আরো বেশ কয়েকটা ব্যাংকে ডাকাতি হয়েছে। কাজেই সে জানত এই অবস্থাতে এখানে আক্রমণ স্রেফ সময়ের বিষয়। সেই অনুযায়ী প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেছিল কিন্তু বাধ সঙ্গে কালাজ্বর।

বিগত কয়েকদিনে এই ভবনে আশ্রয় নেওয়া মানুষগুলোর ভেতরে অল্পত এই জ্বর ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এর ভেতরে মহিলা, শিশুও আছে। কাজেই পালাতে চেয়েও সে পালাতে পারেনি দুটো কারণে। এক নিজের দায়িত্ববোধের কারণে, দুই তাকে কাজ গোছাতে হতো।

বিদ্রোহীদের হুন্সা দেখেই সে বুঝে গেছে, দেরি হয়ে গেছে। নিজের মানুষ এবং প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়ে পালানোর আগেই আগুন ধরে গেল ভবনে। জ্বলদি জ্বলদি পালাতে হবে। পালানোর জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে সে ফিরে তাকাল বড় দেয়ালটার দিকে। এগিয়ে গেল দেয়ালটার কাছে, যতই জ্বলদি হোক এই কাজটা করতে হবে তাকে পালানোর আগে।

অসুস্থদের কজনকে আগে সরানো হয়েছিল অন্যদের এবং নিজের সঙ্গীদের নিয়ে সে বেরিয়ে এলো ভবনের পেছনে। আগে থেকেই তার পরিকল্পনা ছিল, এবং আগে কিছু লোক সরিয়েও ফেলা হয়েছিল, কিন্তু সবাইকে পারেনি স্রেফ সময়ের কারণে। নিজের লোকদের নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে সে রাস্তা পার হলো। এরপর হাতের ইশারায় থেমে যেতে বলল সবাইকে। বিপদের গন্ধ পাচ্ছে সে। তার অনুমান সত্যি হতে যাচ্ছে। বেগমের উদ্যানে শত্রু অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে, যা ধারণা করেছিল এই ডাকাতি তাহলে স্রেফ ডাকাতি নয়। তাকে ধরাও একটা উদ্দেশ্য। তার লোকেরাও সবাই থেমে গেছে। এমন সময় চিৎকার করে উঠল সে।

বিগত কয়েকদিন ধরেই রাত আরেকটু গভীর হলে এই পথে খুবই গোপনে সে অল্প অল্প করে লোক সরাচ্ছিল, এই পথের প্রতিটা ধূলিকণা সে চেনে। দুনিয়া ভেঙ্গে খাওয়া মানুষ সে। কাজেই ভালোভাবেই জানত তাকে যদি এখান থেকে কেউ ধরার চেষ্টা করে, সেটা এদিকেই কোথায় করবে। আর সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল আগে থেকেই।

আর এই চিৎকারটা সেই প্রস্তুতিরই অংশ।

দলধরা মানুষগুলোকে ভবনের পেছন দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে খুশি হয়ে উঠল মেজর উডসন। এবার ফাঁদে পড়তে হবে তাদের। ঠিক যেভাবে ভেবেছিল সে, সেভাবেই হচ্ছে সব। অন্য কাউকে সে কেয়ার করে না, তার প্রয়োজন শুধু একজনকে। অবশ্যই মারবে না, স্রেফ ধরে নিয়ে যেতে হবে তাকে। এই নির্দেশনাই দেওয়া হয়েছে। তবে কী অবস্থায় ধরে নেওয়া হবে সেই বিষয়ে কিছু

বলা হয়নি। কাজেই, উলটো করে ধরে রাখা বন্দুক আর লাঠির হাতলে আঙুলগুলো শক্ত হয়ে উঠল তার, উলটোদিকে মুখ ফেরাল নিজের লোকদের অবস্থান দেখে নেওয়ার জন্য।

প্রতিটা লোক প্রস্তুত আছে। মেজর উডসন শেষ প্রস্তুতির ইশারা দিতে যাবে এমন সময় তার লোকদের একজন ইঙ্গিতে সামনে দেখাল। যে-জন্য মাথা ঘুরিয়েছিল, সেটা না করেই সে ফিরে তাকাল এবং অবাক হয়ে দেখল যে-লোকগুলো ব্যাংক ভবনের পেছন থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তাদের অগ্রভাগের দলটা হঠাৎ থেমে গেছে, বলতে গেলে প্রায় ছির দাঁড়িয়ে গেছে। ক্র কুঁচকে উঠল উডসনের, পলায়নরত মানুষদের একটা দল এভাবে পালাতে পালাতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া, ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক হতে পারে না। নিজের লোকদের সাবধান করবে তার আগেই আরো অবাক হয়ে দেখল, দলের অগ্রভাগে থাকা লম্বা অবয়বটা চিৎকার করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল উডসনের।

সে শিউরে উঠেছে মূলত দুটো কারণে। একে তো সে মিলিটারির লোক, যে মানুষটা চিৎকার করেছে সেও অবশ্যই মিলিটারিতে ছিল, এটা সাধারণ কোনো চিৎকার নয়। এটা মিলিটারির বিশেষ একটা ইঙ্গিত, আর সেটা আক্রমণের ইঙ্গিত।

কাদের আক্রমণ করার জন্য ইঙ্গিত দিল লোকটা?

তবে কি ওরা উডসনদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে? কিন্তু কীভাবে? আর শিউরে ওঠার দ্বিতীয় কারণ, চিৎকার করার ঠিক আগমুহূর্তে সে দলের অগ্রভাগে থাকা লম্বা অবয়বের মানুষটাকে চিনতে পেরেছে। এটা সেই মানুষ, যাকে ধরার জন্য আজকের এত আয়োজন।

মানুষটাকে চিনতে পারলেও সমস্ত প্রস্তুতি আর আয়োজনের শেষ মুহূর্তে সব ঘটনা মিলিয়ে সে এমনভাবে চমকে উঠল, কিছুতেই সামলাতে পারল না নিজেকে। না পারল নিজের লোকদের ইশারা করতে, না পারল নিজের অবস্থান ধরে রেখে পরিকল্পনামাফিক কাজ করতে।

অন্যদিকে সামনের লোকগুলো চিৎকার করে উঠেই দৌড়াতে শুরু করল একেবারে সরাসরি উদ্যানের দিকে। উডসনের কাছে ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক লাগছে। কারণ লোকগুলো থেমেই গেল কেন, আবার যদি ওদের উপস্থিতি বুঝেই গিয়ে থাকে তাহলে অন্যদিকে না পালিয়ে এদিকে দৌড়াচ্ছে কেন। ওরা সবাই একসঙ্গে পাগল হয়ে গেছে এটাও বিশ্বাসযোগ্য না।

হঠাৎ নিজের ভেতরে পূর্ণ শক্তি আবিষ্কার করল উডসন। কে পাগল হলো, কে ভয় পেল, দেখার বিষয় না, তার লক্ষ্য একটাই, যেকোনো মূল্যে নিজের শিকারকে ধরা। বন্দুক আর লাঠির হাতল শক্ত করে ধরে নিজের অবস্থান ছেড়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াল, তার পেছনে পুরো দলটা। আধো অন্ধকারের ভেতরে সামনের মানুষগুলো এগিয়ে আসছে, উডসন নিজের মুখ-মাথা ঢেকে রাখা কাপড়ের আবরণটা টেনে খুলে ফেলে দিল, দৌড়ে এগোতে থাকা লোকগুলোর অগ্রভাগে পরিষ্কার দেখতে

সিপাহী

পাছে সে বয়স্ক কিন্তু শক্তিশালী মানুষটাকে, লোকটাও সরাসরি তাকিয়ে আছে তার দিকে। উডসন মাথার ওপরে একপাক ঘুরিয়ে বন্দুকটাকে নিয়ে এলো শরীরের সামনে। আয় একবার! আনমনেই বলে উঠল সে।

কিন্তু তার ভাবনা ভেতরেই রয়ে গেল, লোকগুলো প্রায় কাছে চলে এসেছে। উডসনরা তাদের আক্রমণ চালাতে যাবে, এমন সময় ছোট ছোট কিছু জিনিস উড়ে এলো তাদের দিকে। উডসনেরা বুঝে ওঠার আগেই ছোট ছোট হাতবোমাসমূহ বিস্ফোরিত হতে শুরু করল তাদের আশপাশে। কথায় বলে, অজানার ভয় সবচেয়ে বড় ভয়। উডসনের দলের সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটল। আসলে তাদের সঙ্গে কিছু হচ্ছে তারা প্রথমে বুঝতেই পারল না। কারণ এরকম কোনো কিছুই অভিজ্ঞতায় তাদের নেই। ছোট হলেও ছোট ছোট বাকুদে বোমাগুলোর বিস্ফোরণ আর আগুনের ঝলকে এদিকে-সেদিকে ছিটকে পড়তে শুরু করল উডসনের লোকেরা, আক্রমণ তো দূরে থাক শত্রু আর আগুনের হুকায় নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

উডসন নিজেকে সামলে নিয়ে যখন উঠে দাঁড়াল ততক্ষণে দলটা ওদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। উডসন রাগের সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, মাথার এক পাশ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে তার। প্রথম আক্রমণের ধাক্কায় তার দল যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, সেই সময়টাতেও সে নিজেকে ধরে রেখেছিল কিন্তু যে-জিনিসগুলো দিয়ে ওদের আক্রমণ করা হয়েছিল, সেগুলোর একটা উড়ে এসে লাগে তার মাথার একপাশে। উডসনের মনে হলো তার মাথায় নৌকার বৈঠা দিয়ে কেউ বাড়ি মেরেছে। একদিকে লেগেছে আঘাত, অন্যদিকে তীব্র আঘাতের চোটে তার মাথা গিয়ে বাড়ি খায় একটা নারকেলগাছের সঙ্গে। কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাক সে। হুঁশ ফিরে আসে কাঁধের কাছে তীব্র উত্তাপের চোটে। স্রেফ কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিল সে, চোখ মেলতেই দেখতে পায় তার কাঁধের কাছের কাপড় পুড়ছে। হাতে তাল দিয়ে চাটি মারতে মারতে উঠে দাঁড়িয়ে রাগের সঙ্গে দেখতে পায় লোকগুলো ওদের ছাড়িয়ে চলে গেছে উদ্যানের প্রায় শেষ প্রান্তের দিকে।

চিৎকার করে ডাকাডাকি করে নিজের লোকদের ঠিকঠাক করে তারা যখন আবার নিজেদের পায়ের ওপরে দাঁড়াল ততক্ষণে লোকগুলো উদ্যানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। উডসনরা এবার পিছু নিতে শুরু করল তাদের। কিন্তু এবার গতি অনেক কম, উডসন একটু আগের ঘটনায় সতর্ক হয়ে গেছে। লোকগুলোকে পিছু করে উদ্যানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ওরা দেখতে পেল লোকগুলো প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে রাস্তা ধরে। ওরাও দৌড়াতে শুরু করল। সমান রাস্তা ধরে দৌড়াতে দৌড়াতে ওরা পৌঁছে গেল খান-সামানি ভবনের ঠিক সামনে।

উডসন তার লোকদের ক্ষণিকের জন্য থামার ইশারা করল। ওদের সামনের লোকগুলো তখনো দৌড়ে চলেছে। উডসন বোঝার চেষ্টা করছে পলায়নরত লোকগুলো আসলে সম্ভাব্য কী করার চেষ্টা করছে। ওদের বামে পেছনে কোনাকুনিভাবে ফেলে এসেছে বেগমের উদ্যান, হাতের ডানে খান-সামানি ভবন,

গল্প শুরুর আগে

সামনে এগিয়ে হাতের ডানে ঘুরলে। উডসন সঙ্গে সঙ্গে অনুধাবন করল বন্দিরা কী করার চেষ্টা করছে। ওরা নদীপথের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কারণ এদিক দিয়ে কোনোমতে একবার নদীপথের দিকে যেতে পারলে, ওরা নদী থেকে কোনো একটা নৌকা বা এমন কিছু একটা নিয়ে পালাতে পারবে।

‘দৌড়াও, ওরা নদীপথে পালানোর চেষ্টা করবে,’ বলেই সে আবারো দৌড়াতে লাগল। উডসন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, সে তার আঘাত বা ব্যথা কোনোকিছুরই পরোয়া করছে না। যেকোনো মূল্যে তাকে মানুষটাকে ধরতে হবে। কোনোভাবেই সে এভাবে পালাতে দিতে পারে না তাকে, কোনোভাবেই সে তার এতদিনের পরিশ্রম পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে দিতে পারে না। উডসনের লোকেরাও এবার একটু আগের আঘাত কাটিয়ে উঠেছে। সেই জায়গা ভর করেছে রাগ আর জেদ। ওরা জান দিয়ে দৌড়ে লোকগুলোর সঙ্গে দূরত্ব খানিকটা কমিয়ে ফেলল। কিন্তু আরো খানিক এগোতেই উডসন অবাক হয়ে দেখল, লোকগুলো ডানে নদীর দিকে যাওয়ার রাস্তায় না গিয়ে সোজা দৌড়াচ্ছে। উডসন আবারো খানিক অবাক হলেও এবার তারা গতি কমাল না বরং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল।

উডসন খুশি হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে সতর্কও। খুশির কারণ, সামনে আর কোনো পালানোর পথ নেই, রাস্তাটা সোজা গিয়ে মিলে গেছে শহরের সবচেয়ে বৃহদাকায় ভবনগুলোর একটাতে। আর সতর্ক একটু আগের অভিজ্ঞতার কারণে।

সামনের লোকগুলোও বুঝতে পারছে উডসনের দলটা অনেকটাই এগিয়ে গেছে তাদের থেকে। ওরা চেষ্টা করেও দূরত্ব কমাতে পারছে না, বরং প্রতি মুহূর্তে ওদের সঙ্গে এদের গতি কমছে। ‘জলদি জলদি,’ চিৎকার করে নিজের লোকদের উৎসাহ দিয়ে উডসন রীতিমতো লাফ দিয়ে ধরে ফেলার চেষ্টা করল দলটার শেষ সদস্যটাকে। লোকটাকে সে মিস করে গেলেও, গিয়ে ধাক্কা খেল দুজনেই গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। উডসন এক গড়ান দিয়ে উঠেই দেখল লোকগুলো দেয়াল টপকাচ্ছে। সে যাকে ধরার চেষ্টা করছিল সেই লোকটাও দেয়াল টপকাচ্ছে দারুণ দক্ষতার সঙ্গে। উডসন উঠে গিয়ে কাছাকাছি পৌছাতে পৌছাতে লোকগুলো সব টপাটপ নেমে গেল ওপাড়ে।

‘সবাই এখানে এসো,’ বলে নিজের এক লোককে হাত পেতে দেওয়ার ইশারা করতেই লোকটা দুই হাত পেতে ধরল দেয়ালের কাছে, সঙ্গে সঙ্গে এক পা দিয়ে ওপরের দিকে লাফ দিয়ে ধরে ফেলল উঁচু দেয়ালটার ওপরের অংশ। দুই হাতে ধরে ওপরে উঠে নেমে এলো অন্যপাশে। একে একে তার বাকি লোকেরাও নেমে এলো নিচের দিকে। ‘ব্যাপার কি, এরা গেল কোথায়?’ উডসন অবাক হয়ে দেখল বিরাট একটা ভবনের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। ভবনটার সামনের লন গিয়ে মিশেছে একপাশে। ‘আমার ধারণা ওরা ওইদিকে গেছে,’ লনটা যেখানে ভবনের পাশে গিয়ে মিশেছে, সেই কোনাটা দেখিয়ে বলে উঠল। ‘মানে ওরা বাড়ির পেছন দিকে গেছে। কারণ এ ছাড়া তো আর রাস্তা নেই।’

সিপাহী

‘প্রশ্ন হলো ওরা, নদীর পাড়ের দিকে না গিয়ে এদিকে এলো কেন? উডসন এখনো ওদের নদীপথে না পালানোর কারণটা বুঝতে পারছে না।

‘এটা তো অস্বাভাবিক,’ নিজের লোকের কথাটা শুনে চট করে তার দিকে ফিরে তাকাল উডসন, তারপর ঝট করে ফিরে তাকাল ভবনটার দিকে। আগের রাতে শহরে দুটো জায়গা আছে যেটা এখনো ইংরেজদের দখলে। কাজেই অস্বাভাবিক চাইলে ব্যাংক থেকে এখানে আসবে এটাই তো স্বাভাবিক।

‘ব্যাপার কি অস্বাভাবিক শুনেছিলাম এখনো আমাদের দখলে, তাহলে সাধারণত কোন, কোনো প্রহরা নেই কেন?’

‘অতো দেখার সময় নেই, আমাদের ভেতরে যেতে হবে খুঁজে বের করা হবে লোকগুলোকে। চলো চলো সবাই,’ উডসন তাড়া দিতেই সবাই সামনে এগিয়ে লাগল, হঠাৎ গুলি এসে লাগল পায়ে কাছের কাছে। অন্ধকারের ভেতর থেকে ইংরেজিতেই কেউ একজন জানতে চাইল, ‘কারা তোমরা?’

‘আমি মেজর উডসন, আমাদের ভেতরে প্রবেশ করতে দাও, এখানে কিছু লোক—’ কথা বলতে বলতে উডসন তার লোকদের নিয়ে এগিয়ে গেল দলের দিকে, পায়ে কাছের আবারো গুলি এসে লাগল।

‘স্ববরদার আগে বাড়বে না,’ ভবনের আড়াল থেকে কণ্ঠটা আবারো বলে উঠল। ‘আগে নিজেদের পরিচয় নিশ্চিত করো।’

‘বললাম না আমি মিলিটারি, মেজর উডসন, এখানে বিশেষ দায়িত্বে আছি আজ রাতে একজন অপরাধীকে ধরার জন্য। লোকগুলো তোমাদের ভবনের পেছনে প্রবেশ করেছে। ওদের ভেতরে কিছু বিদ্রোহী ডাকাতও আছে। কাজেই আমি নির্দেশ করছি, এই মুহূর্তে আমাদের ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে তল্লাশি চালানোর সুযোগ দেওয়া হোক।’

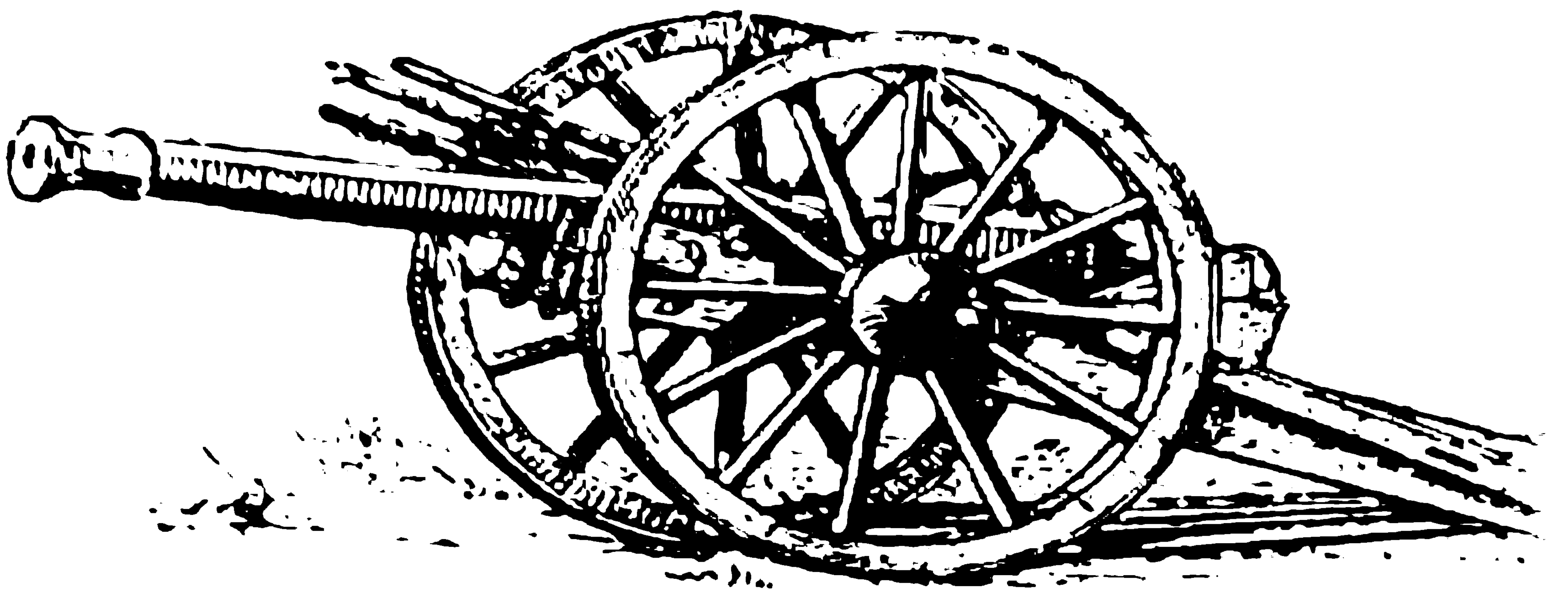
অপরপক্ষের লোকগুলোর দিক থেকে কিছু বলার আগে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো মিলিটারির পোশাক পরা দুই অফিসার। দুজনেই বন্দুক ধরে আছে এমনভাবে দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভীত হয়ে আছে। ‘তোমরা কোম্পানির লোক হলে ইউনিফর্ম কোথায় তোমাদের?’

জবাব দেওয়ার জন্য উডসন এগিয়ে গেল খানিকটা সামনে, তার সঙ্গে বাকিরাও। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই ভবনের ভেতর থেকে ভয়বহ শব্দ শোনা গেল একটা। কেঁপে উঠল পায়ে নিচের মাটি। কেউ কিছু বলার আগেই কয়েক দফা তীব্র বিস্ফোরণের সঙ্গে উড়ে গেল ভবনের একাংশ, বাকিটা ধসে পড়ে গেল। শুধু ভবনের প্রাঙ্গণ নয়, অস্বাভাবিক থাকা জমা বাকীদের দফায় দফায় বিস্ফোরণের সঙ্গে কেঁপে উঠল পুরো শহর।

অন্যরা তো বটেই উডসনের দলের প্রতিটা লোক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, খোদ উডসনসহ।

প্রথম অংশ

শেষ মৃতদের প্রতিনিধি



অধ্যায় ছয়

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
রেডফোর্ড শায়ার, ইংল্যান্ড

সহিস লোকটা সময়ের হিসেবে খানিক গোলমাল করে ফেলেছে, আর সেটার ভুক্তভোগী হতে হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লিয়াজো অফিসার, ওরফে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের গোপন সংবাদদাতা, যাকে স্পাইও বলা যায় সেই জন হ্যান্ডিম্যানের।

‘ক্যাল, হচ্ছেটা কি?’ বিরক্ত হয়ে ক্যারিজ থেকে মাথা বের করে জন জানতে চাইল সহিসের কাছে। বাইরে সন্দের আঁধার বেশ ভালোভাবেই জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে। জঙ্গুলে রাস্তার চারপাশে তাকিয়ে জন ভেতরে ভেতরে খানিক বিরক্তি বোধ করলেও সে মনে মনে খানিক স্বস্তিও বোধ করেছে কারণ, ভাগ্যিস এখন শীতকাল নয়। ‘তুমি করছোটা কি?’

সামনের দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের ক্যারিজ। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মাথার টুপি খুলে টাক চুলকাতে লাগল ক্যাল। ‘স্যার, আমি তো ভেবেছিলাম—’

‘গাধা,’ সাধারণত নিজের অধীনস্থদের সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার তো দূরে থাক, সবসময় সুন্দর ব্যবহার করার চেষ্টা করে জন, কারণ তার লড়াই বড়দের সঙ্গে, তার চেয়ে ছোট বয়সের বা ছোট ক্ষমতার কারো ওপরে চাপ প্রয়োগে বিশ্বাসী নয় সে। কিন্তু আজ খানিক রাগে রীতিমতো গালিই বকে বসল জন। কারণ একে তো যাচ্ছে এমন এক কাজে, যেটাতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম, তার ওপরে যদি সেই কাজে যেতেও দেরি হয়, কেমন লাগে তাহলে। ‘ক্যাল, এক কাজ করো ডানের রাস্তাটা ধরে চলো। যেতে যেতে যদি বাড়িটা পেয়ে যাই তাহলে তো, কথাই নেই। আর যদি না পাই তবে জনসমাগম আছে, এমন কোনো জায়গা দেখে হয় খোঁজ নিতে হবে, অথবা থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।’

সিপাহী

ক্যালকে এবার দেখে মনে হলো সে খুশি হয়েছে, অন্তত একটা সিদ্ধান্ত তো পেয়েছে সে। গাড়ি হাঁকিয়ে সে ডানের রাস্তাটা ধরে চলল। বাড়িটা খুঁজে না পেলেও, মাইল তিনেক যেতেই একটা সরাইখানা দেখে তার সামনে থামাল। এক রাউন্ড বিয়ার চালাতে চালাতে যার বাড়িটা খুঁজছে, সেটার সন্ধান বের করে ফেলল জন। বিয়ার শেষ করে ওরা আবারো সেই দুই রাস্তার মোড়ে ফিরে এসে অন্য রাস্তাটা ধরে রওনা দিল এবার। আধমাইলের মতো এগোতেই জঙ্গলের ভেতরে বামে বাঁক নিয়ে আরো মাইল দেড়েক এগোনার পর অন্ধকারের ভেতরেও পরিষ্কার চোখে পড়ল ম্যানশনটা। বিরাট আকারের একেবারে সামনে এসে থেমে গেল কালো রঙের ঘোড়ার গাড়িটা।

গাড়ির ভেতর থেকে কুচো পাথরের ড্রাইভওয়ায়েতে নেমে পা রেখে বাড়িটার চারপাশে ফিরে তাকাল জন। এই বাড়িটাকে ঘিরে কত-শত স্মৃতি তার। একটা সময় ছিল এই বাড়িতে প্রতিনিয়ত আগমন ঘটত তার। শৈশব তো বটেই, যুবক এবং কৈশোর বয়সেও একটা সময় সপ্তাহে অন্তত এক দিন এখানে না এলে তাদের পুরো বন্ধু-বান্ধবদের গ্রুপটার ভালোই লাগত না। কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই সে তার বাম হাতের কনুইয়ের কাছে হাত বুলাল। পুরনো একটা ছোট্ট কাটা দাগ আছে সেখানে। এই বাড়ির জঙ্গলের পেছনে শিকার করতে গিয়েই আহত হয়েছিল সে। সেই সময়টার কথা মনে করে মৃদু হাসিমুখে সে বাড়ির সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজায় করাঘাত করার আগেই খুলে গেল ভারী দরজাটা। সেখানে আলো হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন বাটলার। জন আশা করেছিল আগের দিনের পুরনো বাটলারকে দেখতে পাবে, সেখানে নতুন একজনকে দেখে খানিক চমকেই উঠল। বাটলার লোকটা এই সন্ধ্যাবেলাতেও একেবারে ধোপদুরুন্ত পরিপাটি ট্র্যাডিশনাল ইংলিশ পোশাক পরে আছে। খুব ভদ্রভাবে একেবারে ইংরেজ কেতা মেনে সে জ্ঞানতে চাইল, জনের পরিচয় এবং কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সে। নিজের পরিচয় দিয়ে ভেতরে ভেতরে মৃদু হাসল জন। এই বাড়িতে দেখা করার মতো মানুষ একজনই আছে। কাজেই কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এই প্রশ্ন রীতিমতো অবাস্তব। জনকে বসার কামরায় রেখে, ভেতরে চলে গেল বাটলার।

প্রায় কোনো কারণ ছাড়াই আবারো চারপাশে চোখ বুলাতে শুরু করল জন। আশ্চর্য কতদিন পর এলো এই বাড়িতে, অথচ মনে হচ্ছে যেন এই তো সেদিন। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, সবকিছু আগের মতো থেকেও কিছুই যেন আগের মতো নেই বাড়িটাতে। মেঝেতে সেই পার্শিয়ান কার্পেট, দেয়ালে ঝোলানো সব শিকারের ট্রফি চক চক করছে, দামি কাঠের পালিশ করা সব ফার্নিচার, কামরার একপাশে দেয়ালজোড়া বুকশেলফ, ঘরের প্রতিটা কোণেই বসানো সুগন্ধি

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

মোমবাতি, সবই সেই আগের মতোই আছে। শুধু নেই সেই উচ্ছল জনকোলাহল। একসময়ের সেই জনবহুল বাড়িটা যেন সব থেকেও মৃত প্রেতপুরীর মতো। জন উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালজোড়া আলমারিটার দিকে এগিয়ে গেল। বেশ খানিকটা কৌতূহলের সঙ্গেই সে হাতের চামড়ার গ্রাভস খুলে বুকশেলফের বিশেষ একটা জায়গায় হাত দিল। যৌবনের দিনগুলোতে তারা একটা বিশেষ কাজ করত, আলমারির একটা গোপন খোপে নানা জিনিস লুকিয়ে রাখত তারা। জন দেখতে চাচ্ছে সেই গোপন খোপটা আজো আছে কি না।

বইয়ের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে নির্দিষ্ট জায়গাটাতে নখ দিয়ে খুঁটতে লাগল সে কিন্তু হতাশার সঙ্গে আবিষ্কার করল সেই ফাঁকটা খুঁজে পাচ্ছে না। আরো ভেতরে হাত ঢুকিয়ে চেষ্টা করতে লাগল। নিজের কাজে এতটাই হারিয়ে গেছে জন, কামরাটায় আরেকজন মানুষ প্রবেশ করেছে সেটা খেয়ালই করেনি।

‘তুমি ভুল করছো বন্ধু,’ পেছন থেকে পরিচিত ভারী গলাটা ভেসে এলেও মুখ ফেরান না জন, স্রেফ মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি। ‘সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি তোমার সঙ্গে সামান্য বেইমানি করেছে। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে তোমাকে আঙুলগুলো ঘোরাতে হবে ডান দিকে,’ কথা বলতে থাকা মানুষটার নির্দেশনা অনুসরণ করল জন এবং ঠিকই নির্দিষ্ট খোঁটাটা খুঁজে পেয়ে সেটাকে নখে খুঁটে সামান্য চাপ দিতেই গোপন প্যানেলটা খুলে গেল। ওটার ভেতরে ছোট্ট একটা খাম। খামটা হাতে নিয়ে হাসিমুখে মানুষটার দিকে ফিরে তাকাল জন। ‘সময়ের চেয়ে বড় প্রতারক আর কে হতে পারে বন্ধু,’ বলে তার সামনে উদয় হওয়া হাসি মুখের মানুষটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল জন। যদিও এরকম সম্ভাষণ ইংরেজ কেতার ভেতরে পড়ে না, তাও সে পরোয়া করে না, কারণ তাদের বন্ধুত্বও কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার ভেতরে পড়ে না।

দুই বন্ধু পরস্পরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রইল বেশ কিছুক্ষণ। মাথার ভেতরে স্মৃতির ঝাঁপি বাহার খুলে বসেছে কিন্তু সেগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়ে বন্ধুর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে শক্ত হাতে তার দুই কাঁধ চেপে ধরল জন। ‘বন্ধু, কতদিন পর, তাই না?’

‘কতদিন নয়, প্রায় অর্ধ দশক পর,’ সামনের মানুষটা হাসিমুখে বলে উঠল। সময় প্রতারক হলেও সে তার একটা বড় গুণ কিংবা দোষ হলো, সে কখনো তার প্রবাহ থামায় না। এই কারণে আমার কাছে মনে হয় সময় হলো সবচেয়ে নিষ্ঠুর নিয়ামক।’

হেসে উঠল জন, ‘তুমি তো দেখি একেবারেই আগের মতো আছো।’

‘কেন মিথ্যে বলছো জন,’ বলে ব্রিটিশ আর্মি অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল স্যান্ডার্স এরিকসন, সামনের আসনে বসে পড়ল। ‘তুমিও জানো আমিও জানি সময়ের কামড় আমাকে শুধু আহত করেনি, রীতিমতো খুবলে খেয়ে ফেলেছে। ‘খামটা খুলবে না?’

সিপাহী

বলে কর্নেল বন্ধুর হাতে ধরা খামটার দিকে ইশারা করল। এই খামটাই সে বুকশেলফের গোপন খোপ থেকে বের করে এনেছে। জন মৃদু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে খামটা খুলে ফেলল। যদিও সে অনুমান করতে পেরেছিল তাও ভেতরের কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইল সে বেশ কিছুক্ষণ। ভেতরে একটা ছবি, হাতে আঁকা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনজন মানুষ। একজন পুরুষ, একজন মহিলা এবং একটা ছেলে।

‘সময়, তাই না?’ জন তাকিয়ে দেখল কর্নেল ভেজা চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কঠিন মানুষ সে, তাই সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিল নিজেকে। ‘দুঃখিত, বন্ধু,’ বলে সে বড় করে একবার দম নিয়ে বাটলারকে ডাক দিল। ‘আমাদের ড্রিংকস দিয়ে যাও।’ জন কিছু না বলে চুপ করে রইল কর্নেলও কিছু বলল না। বহুদিন পর দেখা হওয়া দুই বন্ধুর বৃকের ভেতরে থেকে বৃদবৃদের মতো উঠে আসতে চাইছে অনেক কথা কিন্তু বৃদবৃদ যেভাবে ওপরে উঠে ফেটে যায় সেভাবেই মনের কথা মুখ পর্যন্ত যাওয়ার আগেই বাস্তবতার চাপে ফেটে যাচ্ছে ভেতরেই। বাটলার ড্রিংকস পরিবেশন করতেই অস্বাভাবিক ভারী নীরবতার অন্তিমকর পরিবেশটা কেটে গেল।

জনকে নিজ হাতে ড্রিংকস পরিবেশন করল কর্নেল। বন্ধুর হাতে গ্রাস তুলে দিয়ে নিজেও তুলে নিল একটা গ্রাস। শেরিতে চুমুক দিতে দিতে কর্নেলকে ভালোভাবে খেয়াল করল জন, মানুষটা মোটেই ভুল বলেনি। সময়ের কষাঘাত ভালোভাবেই দাঁত বসিয়েছে তার মন আর শারীরিক অবয়বে। না শারীরিকভাবে সে অসুস্থ বা দুর্বল নয় মোটেই। লম্বা মানুষটা ঠিক আগের মতোই শক্তিশালী রয়েছে আজো। পাকানো দোহারা শরীর, সাধারণ ব্রিটিশদের তুলনায় আর দশজনের থেকে একটু বেশিই লম্বা এবং বড় আকৃতির সে, পুরো গঠনটাও আগের মতোই শক্তিশালী রয়েছে, ঠিক যেমনটা মিলিটারিতে থাকতে ছিল। মাথাভরা ব্যাকব্রাশ করা চুলে ধূসর ছাপ, মোমপালিশ করা যত্নের সঙ্গে চোখা করা গোঁফ। মানুষটা যেন ঠিক তার স্কেলারে রাখা দামি ওয়াইনের মতোই যত বয়স বাড়ছে ঠিক ততটাই আরো মূল্যবান হয়ে উঠছে।

কিন্তু সূক্ষ্ম পরিবর্তনটা ধরা যায় মানুষটার চোখের দিকে তাকালে। ব্রিটিশ মিলিটারি থেকে স্বচ্ছ অবসর নেওয়া কর্নেল স্যাভার্স এরিকসনের চোখের দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে জন খানিকটা অবাক হয়ে গেল। একটা মানুষের অবয়ব আর চেহারা যেমনই থাক, সে আসলে কেমন আছে সেটা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় তার চোখের দিকে তাকালে। কর্নেল স্যাভার্স এরিকসনের চোখের রং পৃথিবীর সবচেয়ে বিরলতম চোখের রংগুলোর একটি, নীলচে পিঙ্গল। জনের মনে পড়ে, তারা যখন তরুণ ছিল, স্যাভার্সের জন্য মেয়েরা পাগল ছিল। জনের মনে পড়ল, ওর এক বান্ধবী ওকে বলেছিল, স্যাভার্সের চোখের দিকে তাকালে মনে হয় তার

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

মাথার ভেতরের একাধিক দুষ্টামি সর্বক্ষণ ঝিলিক মারছে। এরপর তারা যখন ভারতে যায়, সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া থেকে শুরু করে স্যাভার্সের নেতৃত্বে কাজ করে, কঠিনতম সময়ের ভেতর দিয়ে পার হয়েছে, ওদের ভেতরে একমাত্র কর্নেলের চোখের তারা কখনো স্তান হতো না। সবসময় এক এক অদ্ভুত দীপ্তি থাকত তার চোখে, এই মানুষটা যেন কখনো ক্লান্ত হতো না, কখনো ধৈর্য হারাত না, কখনো নিজের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতো না।

সেই প্রাণচাঞ্চল্য মানুষটার চোখের তারা আজ একেবারেই স্তান, সেই ঝিলিক সেই প্রাণচাঞ্চল্য যেন প্রকৃতির বিচ্ছিন্ন কোনো অভিশাপে একেবারেই দ্যুতি হারিয়েছে। জন অবাক হয়ে লক্ষ করল, একজন মানুষ, যার চেহারায় তেমন কোনো পরিবর্তনই আসেনি, স্রেফ চোখের দৃষ্টির স্তান ভাবটার কারণে পুরো মানুষটাকেই যেন অন্যরকম লাগছে।

জন নিজের ওপরে খানিক বিরক্ত হলো। এভাবে সরাসরি এত লম্বা সময় একজন মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকাটা মোটেই শোভন নয়। দৃষ্টি নামিয়ে সে হাতে ধরা ছবিটার দিকে তাকাল। 'তোমার ছেলের আঁকা, তাই না? সম্ভবত আমরা তখন জয়সলমিরে, যদি আমি ভুল না করে থাকি,' জন আবার চোখ তুলে তাকাল কর্নেল স্যাভার্সের দিকে। জনের কথা শুনে কর্নেলের দৃষ্টি খানিক শূন্যে হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার প্রশ্ন শুনে আবার ফিরে এলো বাস্তবে।

জন দেখল যেচ্ছা অবসরপ্রাপ্ত কর্নেলের চোখদুটো আপনাতেই খানিক ভিজে গেলেও সে হেসে উঠল। ভেজা চোখে ঠোঁটে হাসি নিয়ে সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছো। গুড ওন্ড টাইম,' বলে সে সামনের টেবিলের ওপর থেকে নিজের গ্রাসটা তুলে নিয়ে তাতে একটা চুমুক দিয়ে জনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'তা কেমন আছো তুমি?' বলে সে আরো যোগ করল। 'শেষবার শুনেছিলাম মিলিটারি থেকে সরে গিয়ে একটা বিশেষ বাহিনীর প্রধান করা হয়েছে। খবরটা শুনে আমি সত্যি খুশি হয়েছিলাম,' জন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই আবারো কর্নেল বলে উঠল, 'তোমার উন্নতিতে আমি অনেক খুশি বন্ধু। ব্রিটিশ সরকারের সবসময়ই এমন মানুষ প্রয়োজন, যার ওপরে সবদিক থেকে ভরসা করা যায়।'

জন এবারও কোনো উত্তর না দিয়ে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইল, কর্নেলের শব্দচয়ন সে খুব ভালোভাবে খেয়াল করেছে। সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বলেনি, বলেছে ব্রিটিশ সরকার। জন সামান্য হেসে মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানাল, 'ধন্যবাদ বন্ধু, আমার আজকের এই উন্নতির ভিত্তি তুমিই গড়ে দিয়েছিলে।'

কর্নেল মাথা নেড়ে আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল, জন এবার তাকে কিছু বলতে না দিয়ে জানতে চাইল, 'তুমি কেমন আছো, বলো? এই বাড়ি, এই ঘর সবই দেখি একেবারে আগের মতোই আছে, সেই কাঠের গোপন প্যানেলটাও।'

সিপাহী

কর্নেল হেসে উঠল, 'হ্যাঁ সবই আগের মতো আছে,' বলে সে একবার জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাল। 'ওধু—' নিজের শব্দ উচ্চারণ শেষ না করে বলে উঠল, 'আমি ভালো আছি জন, তুমি তো জানো স্বেচ্ছা অবসর নেওয়ার পর প্রথমে আমি উদ্দেশ্যহীন ছিলাম। এখন আমি অনেক ব্যস্ত,' বলতে বলতে কর্নেল সামান্য নাক চুলকাল। ভেতরে ভেতরে হাসল জন, মানুষটা আজো মিথ্যে বলা শিখল না। 'অনেক আগে থেকেই আমার শরীরচর্চার বিষয়ে আগ্রহ ছিল, এটা তো তোমার জানা। ভারতে থাকার সময়ে ওদের যৌগিক ব্যায়াম শিখেছিলাম, সেটা এখনো নিয়মিত চর্চা করি আমি,' কর্নেল এই পর্যন্ত বলতেই জন অনুধাবন করতে পারল মানুষটা মিলিটারি ছাড়ার পর আজো এত ফিট কীভাবে।

'আমি ভারতীয় যৌগিক ব্যায়ামের সঙ্গে প্রাচীন ইউরোপীয় কসরতের সম্মিলন নিয়ে গবেষণা করছি। শুনলে খুব খুশি হবে,' কর্নেল বলে চলেছে। 'এর ওপরে একটা বই লেখার কাজ শুরু করেছি,' বলে কর্নেল নিজের পানীয়তে মন দিল। জনও নীরবে চুমুক দিয়ে চলেছে পানীয়তে, অস্বাভাবিক নীরবতা। জন মাথা ঘুরিয়ে আবারো কামরার চারপাশে দেখছে। এত বড় বাড়িতে কর্নেল একাই থাকে, স্রেফ বাটলার আর দুজন চাকরের সঙ্গে। স্রেফ নিজে আর তার ভয়াবহ স্মৃতিগুলো নিয়ে। দৃষ্টি ঘুরিয়ে সে আবারো কর্নেলের দিকে তাকাল, 'ভারতবর্ষে কী হচ্ছে তুমি জানো?'

কর্নেল কথা না বলে স্রেফ মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল, সে সবই জানে। 'গরু আর শূকরের চর্বি থেকে—' জন কথা শেষ করতে পারল না, কর্নেল হেসে উঠল। 'বের হতে না দিয়ে কোনো বেলুনে যদি স্রেফ হাওয়া ভরতেই থাকে ভরতেই থাকে, তবে কী হয় জানো?' কর্নেল নিজের পানীয় নামিয়ে রেখে জনের দিকে ফিরে তাকাল। 'একসময় বেলুনটা ফেটে যায়, ভারতে তোমরা যা করেছো, এটা সেই বিস্ফোরণ,' বলে সে মাথা নাড়ল। 'চর্বি তো স্রেফ বাহানামাত্র।'

'তারপরও এখন যা ঘটছে, তা অবর্ণনীয়,' জন আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল।

'তুমি আমার সঙ্গে কেন দেখা করতে এসেছো, জন?' কর্নেল সরাসরিই জানতে চাইল এবার।

জন সামান্য হেসে উঠল, 'পুরনো বন্ধুর সঙ্গে কি আমি দেখা করতে আসতে পারি না?'

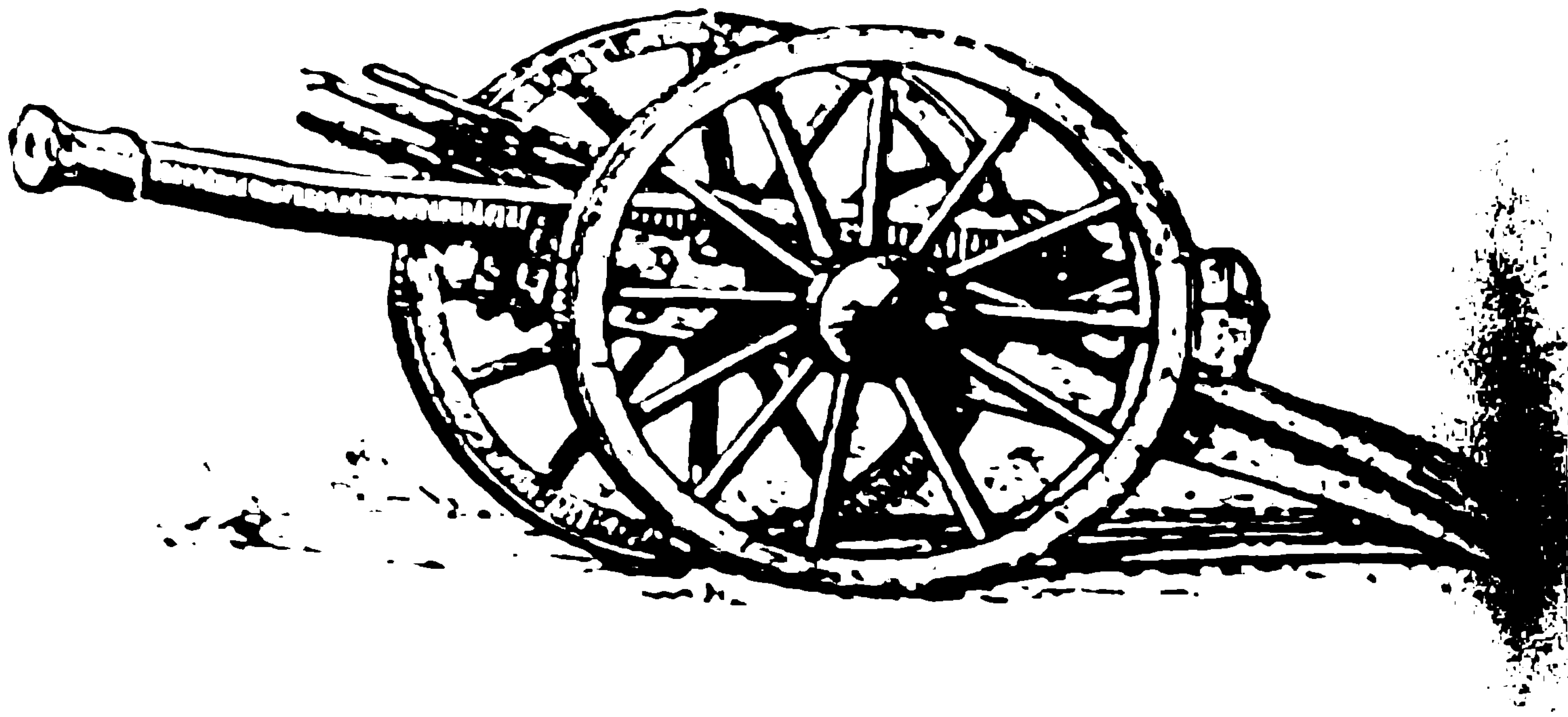
'অবশ্যই পারো,' কর্নেল হাসছে না। 'এই বিরাট বাড়িতে আমি একা থাকি, তুমি তো জানোই। বিশেষ করে গতবছর আমার পরিবারের শেষ সদস্য আমার বড় ভাই মারা গেল, তার ছেলে চলে গেল ভারতে, এরপর তো আমি—' কর্নেল বাক্যটা

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

শেষ করল না। 'কাজেই যে কেউ এলে আমি খুশিই হই, তুমি জানো। কিন্তু সেটা আমার কনসার্ন নয়। পুরো ভারতবর্ষে যখন আগুন জ্বলছে, রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে শুরু করে কোম্পানি, প্রতিটি লোকের ঘুম হারাম, এমন সময়ে বিশেষ বাহিনীর প্রধান আমার মতো একজন অবসরপ্রাপ্ত মানুষের সঙ্গে স্রেফ খোশগল্প করতে আসবে লন্ডন থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে, এটা অবিশ্বাস্য। সরাসরিই বলো জন তুমি কেন এসেছো?' কর্নেল সরাসরি তাকিয়ে আছে জনের দিকে।

'স্যাভার্স, আমি একটা কাজের অনুরোধ নিয়ে এসেছি তোমার কাছে,' বলে জন এক মুহূর্ত থামল। কাজটা ভারতবর্ষে, তোমাকেও ভারতবর্ষে যেতে হবে কাজটা করতে হলে।'

জন জানে বোমার সলতেতে আগুন দিয়েছে সে, এবার বিস্ফোরিত হবে সেটা।



অধ্যায় সাত

বর্তমান সময়

ধানমণ্ডি, ঢাকা

কথাকথানে যেন বিক্ষোভিত হলো বাশারের মগজের গহিনে।

পিবিসাই স্পেশাল ট্রাঙ্কের উইং প্রধান হাবিব আনোয়ার পাশার কথাটা শোনামাত্র ফনিফের জন্য বাশারের মাথাটা ঠিক কাজ করল না। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে ঠিক বুঝতেও পারল না আনোয়ার পাশা, কী বলেছে। নিজের অফিসের গাড়ির বনেটের কাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল আনোয়ার পাশা, তার ঠিক পাশেই মৌসুমি দাঁড়িয়ে। পেছনে বেশ কয়েকটা পুলিশের গাড়ি, স্পেশাল ফোর্সের গাড়ি এক মিটিয়া থেকে শুরু করে বহু ধরনের লোকজনের অবস্থান এবং আনাগোনা।

পিবিসাইয়ের স্পেশাল ট্রাঙ্কে নতুন ট্রান্সফার হওয়া ইনসপেক্টর আহমেদ বাশার সন্য এক অপারেশন শেষ করে এসেছে কিশোরগঞ্জ থেকে। একদিকে সে পাওয়াও করেছে এশিয়ার অ্যান্টিক চোরাচালানির অন্যতম মাথাদের একজন, ধরতে পেরেছে বিশেষ কাস্টের প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি দুর্গের সামনের পুকুর থেকে উদ্ধার করেছে বেশ কিছু ধনরত্ন ভরা এক পুরনো বাস্ক। সেই সঙ্গে ঢাকায় আসার পর ট্রেন করতে সক্ষম হয়েছে প্রফেসর ইফতেখার মাহমুদ নামে এক প্রফেসরকে, যাকে দীর্ঘদিন ধরে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল অথরিটি। এত সক্ষম একটা অপারেশন শেষ করে যখন সে প্রফেসর ইফতেখারের সঙ্গে কথা করছিল এমন সময় কেউ একজন এসে ওকে ডেকে পাঠায় ডবনের নিচে পিবিসাইএনের উইং প্রধান আনোয়ার পাশা তার সঙ্গে কথা বলবে বলে। নিচে আসার পর বাশার সেখান আনোয়ার পাশা এবং তার সেক্রেটারি মৌসুমি পাংও মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বাশার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওকে জানায় খুব খারাপ খবর আছে। ওর ফিল্ডে রিকাস্ট মজুমদারকে কে বা কারা অপহরণ করেছে।

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

কথাটা শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্য বাশার ঠিক বুঝতে পারল না পাশা স্যার ওকে কী বলেছে, যেই মুহূর্তে ওর মাথা কাজ করতে শুরু করল, চট করে দুই পা এগিয়ে গেল সে ওদের দিকে। ‘রিফাতের কী হয়েছে?’ কথাটা শান্তভাবে বলেই পরমুহূর্তে নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারাল সে। প্রায় চিৎকার করে জানানতে চাইল, ‘কারা অপহরণ করেছে ওকে?’ আরো এক পা এগিয়ে গেল সে দুজনার দিকে। বাশার এত জোরে চিৎকার করেছে আশপাশের সবাই ফিরে তাকিয়েছে ওর দিকে। পুলিশ এবং অফিসাররা অনেকে সতর্কসুলভ অস্ত্র বের করে ফেলেছে। তাদের দিকে ফিরে কিছু না করার ইশারা করে আনোয়ার পাশা এগিয়ে গেল বাশারের দিকে, ওর চোখে চোখ রেখে শান্ত সুরে বলে উঠল, ‘কুল ডাউন, বাশার তুমি একজন ট্রেইন্ড এবং এক্সপার্ট অফিসার। সবার আগে তোমাকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। কাজেই কুল ডাউন।’

‘স্যার, আগে বলুন কারা অপহরণ করেছে ওকে, কোথা থেকে কীভাবে—’ বাশার নিজের মাথা চেপে ধরেছে। একে তো বিগত কয়েকদিনের মিশনের ক্লান্তি, তার ওপরে প্রচণ্ড মানসিক চাপ, এর সঙ্গে আবার ভয়াবহ এই সংবাদ, বাশারের মাথা এবং শরীর দুটোই বিদ্রোহ করতে চাচ্ছে।

‘বাশার শান্ত হও,’ বলে ওকে এক হাতে ধরে গাড়িতে এনে বসিয়ে দিল মৌসুমি। ‘ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে, রিফাত মজুমদার তার প্রতিদিনের ডিউটি শেষ করে, বাইরে বের হওয়ার আগ মুহূর্তে তার ওপরে আক্রমণ করা হয়। মাটির নিচের টুইন কালীর সেই মন্দিরে একদল লোক সিকিউরিটিকে আগেই কাবু করে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওরা বের হওয়ার সময়ে আক্রমণ চালায়, তিনজন সিকিউরিটি গার্ড মারা গেছে, রিফাতের সঙ্গে কাজ করত একটা ছেলে, সে গুরুতর আহত হয়েছে, কিন্তু মরেনি, ওর বয়ানেই কিছুটা জানতে পেরেছি আমরা।’

‘আর রিফাত?’ বাশার স্থানুর মতো তাকিয়ে আছে, কিন্তু পরিষ্কার সব দেখছে বা বুঝতে পারছে বলে মনে হয় না।

‘ওই ছেলেটা আহত অবস্থায় যতটা বলেছে, তাতে পুরো চিত্রটা এখনো পরিষ্কার নয়,’ ওদের গাড়ির দরজার কাছ থেকে একজন বলে উঠল, বাশার তাকিয়ে দেখল কালো জিন্স, আর সাদা শার্ট পরা একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার শারীরিক ভঙ্গি আর কথা বলার ধরন এমন যে একে দেখলে দুই মাইল দূর থেকেও পরিষ্কার বোঝা যাবে এই মেয়ে আসলে পুলিশ। ‘সরি, আপনাদের কথা মাঝে ইন্টারান্ট করলাম, আমি সামিরা অফিসার সামিরা নাজনীন, আমি অফিসিয়ালি এই কেসের দায়িত্বে আছি।’

‘স্যার, এই কেসের দায়িত্ব তো আমার হওয়া উচিত,’ বাশার অসহায়ের মতো বলে উঠল। তবে ওর মাথা ধীরে ধীরে কাজ করতে শুরু করেছে।

‘এক মিনিট বাশার, আমাদের এখন মাথা ঠাভা রাখার সময়, আবেগী হলে চলবে না। এই কেস সামিরার অধীনেই থাকবে। প্রথমত, যখন এই ঘটনা ঘটে তখন তুমি ঢাকায় ছিলে না, কাজেই আমাদের এখান থেকে অন্য কাউকেই অ্যাসাইন করতে হতো, আর দ্বিতীয়ত, এই কেসের ভিক্টিমের সঙ্গে যেহেতু তোমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে কাজেই তোমাকে অফিসিয়ালি এই কেসের দায়িত্ব দেওয়া পসিবলও নয়।’

‘স্যার—’

‘এক মিনিট মিস্টার বাশার,’ অফিসার সামিরা বলে উঠল, ‘স্যার, আমি বুঝতে পারছি আপনার আবেগটা কিন্তু আমাদের এখন আবেগী হওয়ার সময় নয়। আমাদের আগে পরিস্থিতি বুঝতে হবে, এরপর খুব ফাস্ট কাজে নামতে হবে। এক মধ্যেরই দেরি হয়ে গেছে,’ বলে সে একটু থেমে আনোয়ার পাশার দিকে দেখল একবার, তারপর বাশারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘ইনসপেক্টর বাশার, আপনি ঢাকার বাইরে মিশনে ছিলেন, কাজেই এমন আরো অনেক ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে, যা আপনি এখনো জানেন না,’ মেয়েটা কটাস কটাস করে কথা বলে চলেছে। গলার স্বর শুনলেই বোঝা যায় এক্সট্রিমলি প্রফেশনাল। ‘আপাতত এইটুকু বলি, অনেক ঘটনা একসঙ্গে ঘটে চলেছে, যেটার শুরুও হয়েছিল আপনার হাত ধরে, ঘটনাস্থলো ঘটেও চলেছে আপনাকে কেন্দ্রে রেখে। কাজেই আপনার ফিয়রে এবং টুইন কালী মন্দিরের প্রধান আর্কিডলজিস্ট রিফাত মজুমদারের অপহরণ এবং সিলেটে—’ আনোয়ার পাশা আঙুল নাড়তেই অফিসার সামিরা সেটা চেপে গিয়ে বলে উঠল, ‘এগুলো সব একসূত্রে গাঁথা। এগুলো—’

‘এক মিনিট,’ বাশার আবারো মাথা চেপে ধরে প্রায় ধমকে উঠল সবাইকে। ‘আপনারা কি আমার মাথা খরাপ করে দিতে চান নাকি!’ প্রথম বাক্যটা রাগের সঙ্গে, দ্বিতীয় বাক্যটা প্রায় অসহায়ের মতো বলে উঠল সে। ‘আমি মাত্র একটা মিশন শেষ করে এসেছি, এসেই শুনলাম এই নিউজ, এখান আপনারা আমাকে দায়িত্বও দিচ্ছেন না, এর বাইরে আবার কী সব বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,’ বাশারের চোখ দিয়ে আপনাতেই এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল কোলের ওপরে।

‘স্যার, আমি বলছি বাশারের ওপরে অনেক বেশি, টার্চার হয়ে যাচ্ছে,’ মৌসুমি ওর পাশ থেকে আনোয়ার পাশাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল।

‘বাশার,’ আনোয়ার পাশা বাশারের দুই কাঁধ চেপে ধরে সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘বাশার, ডু ইউ ট্রাস্ট মি?’ বাশার কিছু না বলে স্রেফ মাথা নেড়ে সায় জানাল। ‘তাহলে আমাকে অল্প কিছুক্ষণ সময় দাও,’ বলে বাশার আর মৌসুমিকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে অফিসার নিহাকে নিয়ে চলে গেল সে।

‘মৌসুমি আপা, রিফাত কি ঠিক আছে?’ তুমি আমাকে অন্তত এটুকু বলো।

‘বাশার, মাথা ঠান্ডা রাখ,’ মৌসুমি অফিসের সব অফিসারদের তুই করে ডাকে, বাশারের সঙ্গে যদি অল্প পরিচয়, তাও সে তুই করেই বলে উঠল। ‘তুই তো শুনলিই রিফাতের অফিসের ছেলেটা বলেছে তাকে কোনো ধরনের আহত করা হয়নি। কাজেই তুই নিশ্চিত থাক।’

‘বাশার ধপ করে সিটে হেলান দিয়ে দুই আঙুলে মাথা চেপে ধরল। ওর মনে হচ্ছে ও বমি করে দেবে। ‘কারা ওকে কিডন্যাপ করল, কোন ট্রেস বা কোন ক্লু পাওয়া গেছে?’

‘এখনো না, তুই—’

‘কেউ কিছু ক্রেইম করেছে, ওর পরিবারের কাছে বা—’

বাশার কথা শেষ করতে পারল না, গাড়ির দু পাশের দুটো দরজা খুলে গেল। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসল আনোয়ার পাশা, আর ওদের পাশে বসল অফিসার সামিরা। ‘জাস্ট টু লেট ইউ নো ইনসপেক্টর বাশার,’ গাড়িতে উঠে নিজের স্বভাবসুলভ কটকটে ভঙ্গিতে বলতে লাগল সামিরা। ‘প্রফেসর ইফতেখার, মিস পৃথা এবং আপনার সঙ্গী সোহেলকে নিরাপদে এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে, সেই সঙ্গে উনাদের এখানে প্রয়োজনীয় এবং আনুষঙ্গিক যা কিছু ছিল সেগুলোও।’

‘কারণ কি?’ বাশার খুব অবাক হয়ে জানতে চাইল। ওর মাথা এখন আবার কাজ করছে না। ‘উনাদের নিরাপদ জায়গায় সরাতে হবে কেন?’

‘এই কেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো মানুষই এখন আর নিরাপদ নয়,’ বলে অফিসার সামিরা বড় করে দম নিয়ে বলে উঠল, ‘সেই সঙ্গে ভরসারও যোগ্য নয়। না আমি না, আপনি, না মিস মৌসুমি কিংবা পাশা স্যার। কেউই নিরাপদও নয় আবার পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্যও নয়।’

‘ফাক ইট,’ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না বাশার। ‘আপনারা এরকম গোল না ঘুরিয়ে দয়া করে প্রথম থেকে বলবেন কী হচ্ছে আসলে। আর সবার আগে আমি রিফাতের ব্যাপারে জানতে চাই। বাকি দুনিয়া পরে।’

‘রিফাতের বিষয়ে আমি বলছি,’ আনোয়ার পাশা নির্দেশ দিতেই গাড়ি চলতে শুরু করেছিল। বাশার দেখল ওদের সামনে দুটো পেছনে দুটো গাড়ি, নিরাপত্তার জন্য।

‘এক মিনিট, আমরা আসলে যাচ্ছি কোথায়? এত সিকিউরিটাই বা কেন?’

‘ইনসপেক্টর বাশার,’ বাশারের পাশ থেকে শান্ত স্বরে বলে উঠল অফিসার সামিরা। ‘আপনি এখনো শকে আছেন, আপনি শান্ত হোন। আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি সব,’ বাশার সরাসরি তাকিয়ে আছে নিহার চোখের দিকে, নিহার চোখেরও পলক পড়ছে না। ‘আপনি যদি সত্যি রিফাতের, নিজের এবং আমাদের সবার

সিপাহী

কাজে লগতে চান, তাহলে আপনাকে ঠান্ডা মাথায় শুনতে হবে,' বাশার কিছু না বলে তাকিয়ে রইল। আবারো সে অফিসারের কঠোরতা টের পাচ্ছে তার দৃষ্টিতে। সামিরা একবার সামনের সিটে বসে রিয়ার ভিউ মিররে পেছন দিকে তাকিয়ে থাকে। আনোয়ার পাশার দিকে দেখে নিল। পাশা মাথা নেড়ে সায় জানাতেই সে বলতে শুরু করল।

'ঘটনার শুরু অনেকটা চেইন ইভেন্টের মতো বলতে পারেন,' সামিরা কথা বলা শুরু করতেই বাশার আবার থামিয়ে দিল তাকে।

'আমরা যাচ্ছি কোথায়, এত সিকিউরিটি বা কেন?' একই প্রশ্ন উচ্চারণ করে সে আবার।

'বাশার কাম ডাউন,' আনোয়ার পাশা ভারী গলায় বলে উঠল। 'আজ অনেক লম্বা হতে যাচ্ছে। কাজেই শান্ত হয়ে শোন সামিরা কী বলে। সব প্রশ্ন উত্তর পাবে। তবে অস্থির হলে কোনো কাজই হবে না।'

বাশারের পাশ থেকে মৌসুমি আপা ওর একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল। দৃষ্টিতেও আশ্বাস, 'শান্ত হ, বাশার।'

'যা বলছিলাম,' আবারো একই গলায় বলতে শুরু করল সামিরা। 'আজ বেশ কিছুদিন আগে সিলেটে একটা ঘটনা ঘটে। আসামের এক আর্কিওলজিস্ট সাইট থেকে একটা বহু পুরনো, মিথিক্যাল এক বুদ্ধ মূর্তি উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন। আসার সময় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসর অপসারিত হয়ে যায়। তাকে উদ্ধার করতে সিলেটে পাঠানো হয় সদ্য ইংল্যান্ড থেকে দেশে সম্পন্ন করে আসা অফিসার...'

'তানভীর মালিককে,' বাশার বলে উঠল, তার গলা শান্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। শান্ত হতেই দ্রুত কাজ করতে শুরু করেছে তার ট্রেনিং পাওয়া ইনভেস্টিগেটিভ মাইন্ড।

'ইয়েস, আপনি ঠিক ধরেছেন। তানভীর মালিক। অফিসার তানভীর অপারেশন চালাতে গিয়ে বিরাট একটা ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে বসে, যেটা বহু বছর ধরে বাংলাদেশের বুকে দানা বেঁধে চলেছে এবং আমাদেরও এই বিষয়ে কোন ধারণাও ছিল না,' এইটুকু বলে এক পায়ের ওপর থেকে অন্য পায়ে ভর পরিবর্তন করল সামিরা। 'পাশা স্যার অনেকদিন ধরেই ভাবছিলেন পিবিআইএসের ভেতরে নিজের মতো একটা টিম প্রতিষ্ঠা করার, যারা সব ধরনের ইনস্ফুয়েন্স থেকে করাপশন থেকে মুক্ত। সিলেটে তানভীর মালিককে পাঠানোর সময়ে তিনি যখন বাধা পেলো, সিলেটে তানভীর সফল ছিল। সেই সঙ্গে বিরাট আকারের ষড়যন্ত্র রিভিল হওয়াতে, এই প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী একটা পদক্ষেপ নিতে সমর্থ হন পাশা।'

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

স্মার। প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় দেশব্যাপী সব আইনপ্রয়োগকারী সংস্থায়। এই সময় ময়মনসিংহ শহরে ঘটতে থাকে আরেক ঘটনা।

‘কাহিনিতে এন্ট্রি হয় আমার।’

‘ইয়েস ময়মনসিংহ শহরের পুরনো এক পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয় এক গাড়ি এবং সেটার ভেতরে একজন মানুষের লাশ। ঘটনার পরিক্রমায় সেখান থেকেও উদ্ধার হয় এক পুরনো আর্টিফ্যাক্ট, যেটাকে বলা হয় টুইন কালী। টুইন কালী উদ্ধার করার সময়ও কিছু বিষয় জানা যায় এবং সেখান থেকেও পুরনো এক ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যাপারটা যে এতটা বড় এবং গভীর সেটা বোঝা যায়নি। এই ঘটনার পর ইনসপেক্টর বাশারকে ডেকে নেওয়া হয় ঢাকায়, টিম আলফায় জয়েন করার জন্য। একই সময়ে আরেকটা ঘটনা ঘটতে শুরু করে।

‘এবার চট্টগ্রামে,’ সামনে থেকে হাবিব আনোয়ার পাশা বলে উঠল।

সামান্য মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে সামিরা আবাবো বলতে লাগল। ‘চট্টগ্রামে এক লোক রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে একাধিক মহল। বলতে গেলে অকারণেই জলঘোলা হতে শুরু করার আগেই টিম আলফার আরেক ট্রেন্ড অফিসার, তানভীর মালিকের ফ্রেন্ড শারহান শারিয়ারকে পাঠানো হয় চট্টগ্রামে। সেখানেও বেশ বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে এবং সেখানেও জানা যায় বেশ কিছু ঘটনা—যেগুলো বেশ বড় ধরনের ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়।’

‘কেন? কী হয়েছিল সেই মিশনে?’ এতক্ষণে বাশার খানিকটা আগ্রহ বোধ করতে শুরু করেছে। কারণ আগেরটুকু বলতে গেলে সে জানতই।

‘সেই মিশনে হয়েছিল অনেক কিছুই কিন্তু মূল যে বিষয়টা ঘটে সেটা হলো—স্পেশাল এজেন্ট তানভীর ওখানেও বেশ বড় একটা ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে। বিশেষ করে যে-ভদ্রলোক অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছিল সে ছিল একজন আর্কিওলজিস্ট এবং গবেষক।’

‘প্রফেসর ডক্টর হাসনাত আবদেল,’ তারই ফ্রেন্ড প্রফেসর ইফতেখার, যাকে বারোভূঁইয়াদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মিশনটা থেকে খুঁজে বের করেছে বাশার। সে মনের ভাবনা ভেতরেই রাখল, কারণ জানে সামিরা যেটুকু বলার বলবে। বরং সে ধীরে ধীরে কানেকশনটা ধরতে পারছে। তবে পুরোটা ধরার জন্য আরো বিস্তারিত শোনা প্রয়োজন।

‘ঠিক, ওখান থেকে জানা যায়, প্রফেসর ডক্টর হাসনাত আবদেল কিছু একটা নিয়ে গবেষণা করছিলেন এবং তিনি সবকিছু একটা চিপের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছেন। শারিয়ার মিশন শেষে শুধু চিপটাই নয়, বরং এই সব ষড়যন্ত্রের সঙ্গে

সিপাহী

সংশ্লিষ্ট হোতাদের একজনকেও ধরতে সমর্থ হয়। ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল
সিলেটেও। এমনকি আপনার এই সদ্য সম্পন্ন মিশনেও।’

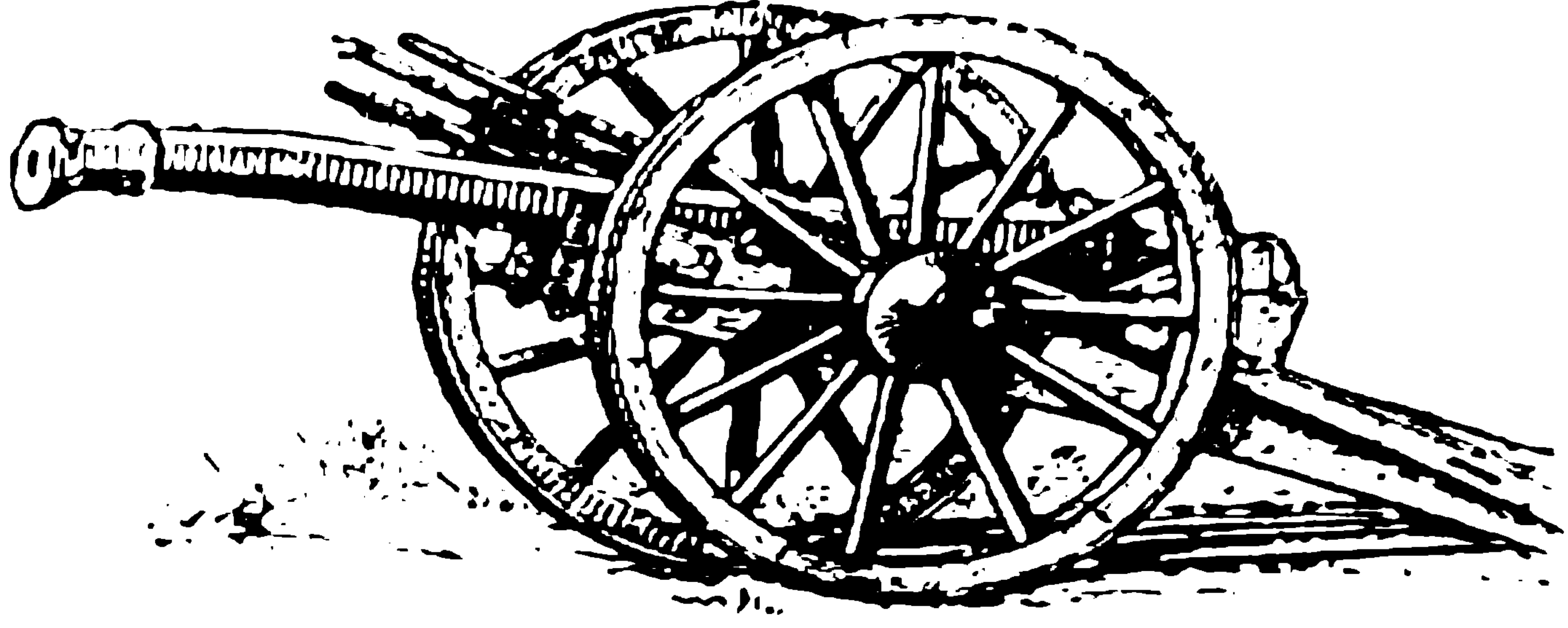
বাশার ফিরে তাকাল সামিরার দিকে। কিছু বলল না।

‘আন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাত দুটো আর্কিওলজিক্যাল চোরাচালানি সংগঠন,
নেক্রপলিস এবং রেলিকের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে এসব ঘটনার। এবং ওদের দুজন
বড় বড় মহারথী বন্দি আছে আমাদের হাতে,’ এইটুকু বলে চুপ করে রইল সামিরা।
তাকিয়ে আছে বাশারের দিকে।

ক্ষণিকের জন্য বাশার বুঝতে পারল না, সবাই কেন তাকিয়ে আছে বাশারের
দিকে। হঠাৎ বিষয়টা উপলব্ধি করে গা শিউড়ে উঠল ওর। অক্ষুটে মুখ দিয়ে
বেরিয়ে গেল, ‘রিফাত, রিফাতের অপহরণ...’ সেও বাক্য সমাপ্ত করল না, বাকিটাও
কিছু বলল না।

সবাই নিচুপ। বাশারই আবার বলে উঠল। ‘মানে রিফাতকে অপহরণ করা
হয়েছে এইসব ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েই,’ বড় করে দম নিল বাশার। স্তম্ভ
থাকার চেষ্টা করেছে ও। ‘যেই মুহূর্তে একাধিক জায়গায় ওদের লোক ধরা পড়েছে
এবং আমি খুঁজে বের করে ফেলেছি হারানো সম্পদ এবং প্রফেসর ইফতেখারকে,
ওরা অপহরণ করেছে রিফাতকে।’

আনোয়ার পাশা ভিউ মিররে তাকিয়ে সম্মতির সঙ্গে মাথা নাড়ল, ‘ঠিক বলছেন
তুমি।’



অধ্যায় আট

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
রেডফোর্ড শায়ার, ইংল্যান্ড

ঠিক-বেঠিক পরে, জন ভেবেছিল তার কথা শুনে স্যামুয়েল বোমার মতোই বিস্ফোরিত হবে, কিন্তু তেমন কিছু হলো না। বরং জনের প্রস্তাব শুনে মৃদু হেসে উঠল কর্নেল স্যামুয়েল। টেবিলের ওপর থেকে শেরীর পাত্রটা উঠিয়ে নিয়ে খানিকটা শেরী গ্রাসে ঢেলে চুপচাপ কিছুক্ষণ শেরী পান করল। শেরী পান করতে করতে জনের দিকে না তাকিয়েই সে দেয়ালের অন্যদিকে তাকিয়ে সে অনেকটা মৃদু স্বরে কথা বলে উঠল, 'জন, তুমি তো আমার বন্ধু মানুষ, একেবারে সেই ছোটবেলা থেকেই। আমার জ্ঞান যতটুকু বলে তাতে আমি এটা জানি তোমার মতো বুদ্ধিমান মানুষ আমি খুব কম দেখেছি,' কথা বলতে বলতেই সে চোখ তুলে তাকাল। 'সেই তুমি খুব ভালো করেই জানো আমার ভারত বিষয়ের ভাবনা এবং ওখানে কী ঘটেছিল আমার এবং আমার পরিবারের সঙ্গে। সব জানার পরও তুমি আমাকে এমন একটা প্রস্তাব করছো এর, কারণটা কি?' প্রশ্নটা করে চুপচাপ তাকিয়ে রইল জনের দিকে।

জন অবশিষ্ট শেরীটুকু গলায় ঢেলে দিল। আসলে সে সময়ক্ষেপণ করার চেষ্টা করছে। বুদ্ধিমান এবং ঠান্ডা মাথার মানুষ জনের জন্য এ-এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা। জীবনের নানা ধাপ পার করে একের পর এক ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিহত করে শূন্য থেকে উর্ধ্বে উঠে আসা জন একসময় ভাবত দুনিয়াতে এমন কিছু নেই যা সে এখন আর ধরতে পারে না, কিংবা তার জ্ঞাত নয়। কিন্তু জীবন তাকে প্রতিনিয়ত অবাক করে চলে। যেমন, আজকে সে জানত বন্ধু স্যামুয়েল কী অবস্থায় আছে, তাকে ভারতে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব দিলে সে কীভাবে রিঅ্যাক্ট করতে পারে। কারণ তার ধারণা ছিল, ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হওয়া স্যামুয়েলকে সে চেনে। কিন্তু যে-স্যামুয়েলকে আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে বোম্বের বন্দর থেকে শেষ বিদেয়

সিপাহী

জানিয়েছিল, সেই স্যাভার্স আর আজকের স্যাভার্সের ভেতরে আকাশ আর পাতাল পার্থক্য। ক্ষণিকের জন্য এমনকি স্যাভার্সকে যে-কাজের জন্য সে কনভিন্স করতে এসেছে, সেটা নিয়েও তার খানিক দ্বিধা হলো। কিন্তু সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে নিজের ক্ষুধার মস্তিষ্কটা সচল করে ফেলল জন। ঈষৎ মিষ্ট এবং তিতকুটে ঘন তরল গলা দিয়ে নেমে যাওয়ার আগেই সে নিজের বক্তব্য ঠিক করে ফেলল। কারণ সে জানে স্যাভার্সের দুর্বলতা কোথায়।

‘কারণ দেশের কোম্পানির এবং পুরো ব্রিটিশ জাতির তোমাকে এই মুহূর্তে প্রয়োজন,’ জন খুব সূক্ষ্মভাবে স্যাভার্সের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে। তার কথা কর্নেলের চোখের পাতা সামান্য কঁপে উঠল, কিন্তু যে-প্রতিক্রিয়া জন ভেবে সেরকম কিছু হলো না। এবার ভেতরে ভেতরে সামান্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল জন। পারবে তো। সাহস না হারিয়ে দ্বিতীয় বুলেট চালাবে বলে ঠিক করল। তারতবর্ষে এই মুহূর্তে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, পরিস্থিতি আর কোনদিকে যাচ্ছে, আমরা কেউই ঠিক পুরোপুরি ধরতে পারছি না। আর তুমি জানো যেখানে পরিস্থিতি ঠিকভাবে ধরা যায় না, সেখানে সবচেয়ে কঠিন করণীয় ঠিক করা। ঠিক সেটাই ঘটে চলেছে আমাদের সঙ্গে,’ কথার রাশ ধরল জন, সে জানে ভারতে কী ঘটছে—সেই ব্যাপারে কর্নেল খুব ভালোভাবে জানে। তার ওপরে এমন এক বিষয় দেখা দিয়েছে যেটা মুশকিলের খোঁজ খারাপ। আর এটা এমন এক সমস্যা যেটার সমাধান একমাত্র তোমার পক্ষে সম্ভব। মানবিকতার জন্য হলেও এটা এমন এক কাজ, যেটা একমাত্র তোমার পক্ষে সম্ভব। বিশ্বাস করো, সেটা যদি না হতো তবে আমি এখানে আসতাম না। মানবিকতার জন্য হলেও তোমাকে আমাদের প্রয়োজন।’

কর্নেল মনোযোগের সঙ্গে শরীর খালি গ্রাসটার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখল এবারও কর্নেলের মুখে মদু হাসি। সঙ্গে সঙ্গে জন বুঝে গেল তার দ্বিতীয় বুলেটও কাজ করেনি। সে জানত কর্নেলের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা তার দেশ, দায়িত্ব, আর দ্বিতীয় দুর্বলতা গণ-মানুষ। দেশ আর মানবিকতা দুটোর কোনো দোহাই দিয়েই কাজ হয়নি, বরং কর্নেল যে ওর অস্ত্রগুলো খুব ভালোভাবেই ফেলতে পেরেছে, সেটা সে বুঝতে পারছে কর্নেলের মুখের হাসি দেখে। বাবাকে ছেলেরা বাবা-মায়ের কাছে খুব বুদ্ধি করে কিছু লুকানোর চেষ্টা করলে, বাবাকে যখন সবই বুঝতে পারে, তখন তাদের মুখে যে-ধরনের হাসি থাকে, কর্নেলের মুখে অনেকটা সে-ধরনের হাসি।

জনকে ইশারা করে উঠে দাঁড়াল কর্নেল। শরীর পাত্রটা হাতে নিয়ে সে থেকে খানিকটা ঢেলে দিল জনের হাতের গ্রাসে। সেই সঙ্গে নিজেও খানিকটা ঢেলে নিয়ে সোজা চলে গেল বিরাট জানালাটার কাছে। জনের মনে পড়ল, ছোটবেলা

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

তারা এই জানালার অলিন্দে খেলা করত, এরপর একসময় তার নিজের আর জনের ছেলেমেয়েদের খেলা করতে দেখেছে। তার ছেলেমেয়েরা আর দশজনের মতো স্বাভাবিক থাকলেও, স্যাভার্সের পরিবারের আর কেউই নেই বলতে গেলে।

‘জন,’ অস্বাভাবিক ভারী গলায় বলে উঠল কর্নেল। ‘তুমি তো আমাকে চেন। তুমি খুব ভালো করেই জানো আমার ওপরে কোন কথাগুলো কাজ করবে,’ কর্নেলের কথায় লজ্জা পেল জন। ‘কিন্তু সত্যি কথা হলো, যে-আমাকে তুমি চিনতে সেই আমি আর আগের মতো নেই,’ বলে সে অন্ধকার জানালার দিক থেকে জনের দিকে ফিরে তাকাল। জন দেখল ঠিক আগের মতোই ঝুঁকু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা শক্তিশালী গড়নের মানুষটার অবয়বের ভেতরে যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ দেখতে পাচ্ছে সে, যার চোখ দুটো যেন বহুদূরে চলে গেল এই মুহূর্তে। ‘একভাবে দেখতে গেলে আফগানিস্তানের সেই যুদ্ধ ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অনেককিছুই বদলে দিয়েছিল,’ বলে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। ‘আর সবচেয়ে বেশি বদলে দিয়েছিল আমার জীবনটাকে। বিগত কয়েক বছর ধরে আমি বিষয়গুলো নিয়ে অনেক ভেবেছি। দেশপ্রেম, নিষ্ঠা, মানবিকতা, কর্তব্যবোধ ইত্যাদির যে-সংজ্ঞা আমি ধারণ করতাম, বহুমুখী চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে সেগুলোর অনেক কিছুই বদলে গেছে এখন,’ বলে সে আবারো সেই আগের হাসিটা দিল। জানালার একপাশে কাঠের প্যানেলে হেলান দিতে দিতে সে যোগ করল। ‘আরফরচুনেটলি তোমার আগের সেই কথাগুলো আমার ওপরে কোনো কাজ করবে না।’

‘তুমি কি ভারতবর্ষকে ঘৃণা করো?’ নিজের তীব্র কৌতূহল সামলাতে না পেরে প্রশ্নটা স্রেফ বেরিয়ে গেল জনের মুখ দিয়ে।

প্রশ্নটা উচ্চারণ করার পর জনের মৃদু আফসোস হলো এতটা সরাসরি জিজ্ঞেস করার জন্য। সে ভেবেছিল কর্নেল রিঅ্যাক্ট করবে বা হেসে উঠবে। কিন্তু এবারও সে সরাসরি কোনো কথা বলল না। ‘দেখো কিছু ব্যাপার থাকে, যেগুলো খুব সাদা চোখে উত্তর দেওয়া যায় না। কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়কে ঘৃণা করা সবচেয়ে সহজ একটা ব্যাপার, চাইলেই করা যায়। কিন্তু প্রশ্নটা ঘৃণার নয়। প্রশ্নটা,’ বলে থেমে গেল কর্নেল। সে ভাবছে। ‘প্রশ্নটা আসলে বেছে নেওয়ার। সাদা চোখে ব্যাপারটা খুব সহজ, যাদের কারণে এবং যাদের হাতে আমার পরিবার...’ কর্নেল দ্বিধা করছে। ‘তাদের আমি ঘৃণা করব, এটাই স্বাভাবিক কিন্তু বাস্তবতা সেটা নয়। আবার,’ কর্নেল এবারও কথা শেষ করল না। ‘জন, তুমি আমার মনের অবস্থা জানো। তুমি আমার প্রতিজ্ঞা জানো। তুমি জানো আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমি আর কোনোদিনই ভারতবর্ষের মাটিতে ফিরে যাব না,’ মাথা নাড়ল কর্নেল স্যাভার্স। তার গলা অস্বাভাবিক রকমের শান্ত। ‘আমাকে নীরবে আমার মতো করে আমার দুঃখগুলোর সঙ্গে বেঁচে থাকতে দাও।’

সিপাহী

জন আনমনে মাথা নাড়ল। সে তার তৃতীয় অস্ত্র ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ‘এমনকি তোমার পরিবারকে শেষবারের মতো—’

‘জন আমি জানি তুমি কীভাবে কাজ করো। তোমার কথার অস্ত্র আমার ওপর আর কাজ করবে না। দুঃখিত বন্ধু, আমি তোমার কিংবা মাতা ইংল্যান্ডের অ কোনো কাজে আসব না। এমনকি আমি আমার নিজের জন্যও আর কোনো কাজে আসব না। ঠিক যেভাবে কাজে আসিনি আমার পরিবার কিংবা মানুষগুলো জন্যও।’

‘আমি সেটা বিশ্বাস করি না,’ জন এই প্রথমবারের মতো খানিকটা হতাশ বোঝাল। তবে এখনো সে পুরোপুরি হতাশ নয়। শেষ একটা আশা আছে তার মনে তবে কর্নেলের পরিবর্তন তাকে খানিক হতাশ করেছে। ‘ঠিক আছে বন্ধু,’ বলে উঠে দাঁড়াল। তবে একটা অনুরোধ করতে পারি।’

‘অবশ্যই আমি হয়তো ফুরিয়ে গেছি, কিন্তু মারা তো যাইনি,’ বলে কর্নেল সে পুরনো দিনের মতো ক্র নাচিয়ে হেসে উঠল। ‘পুরনো বন্ধুর জন্য অবশ্যই।’

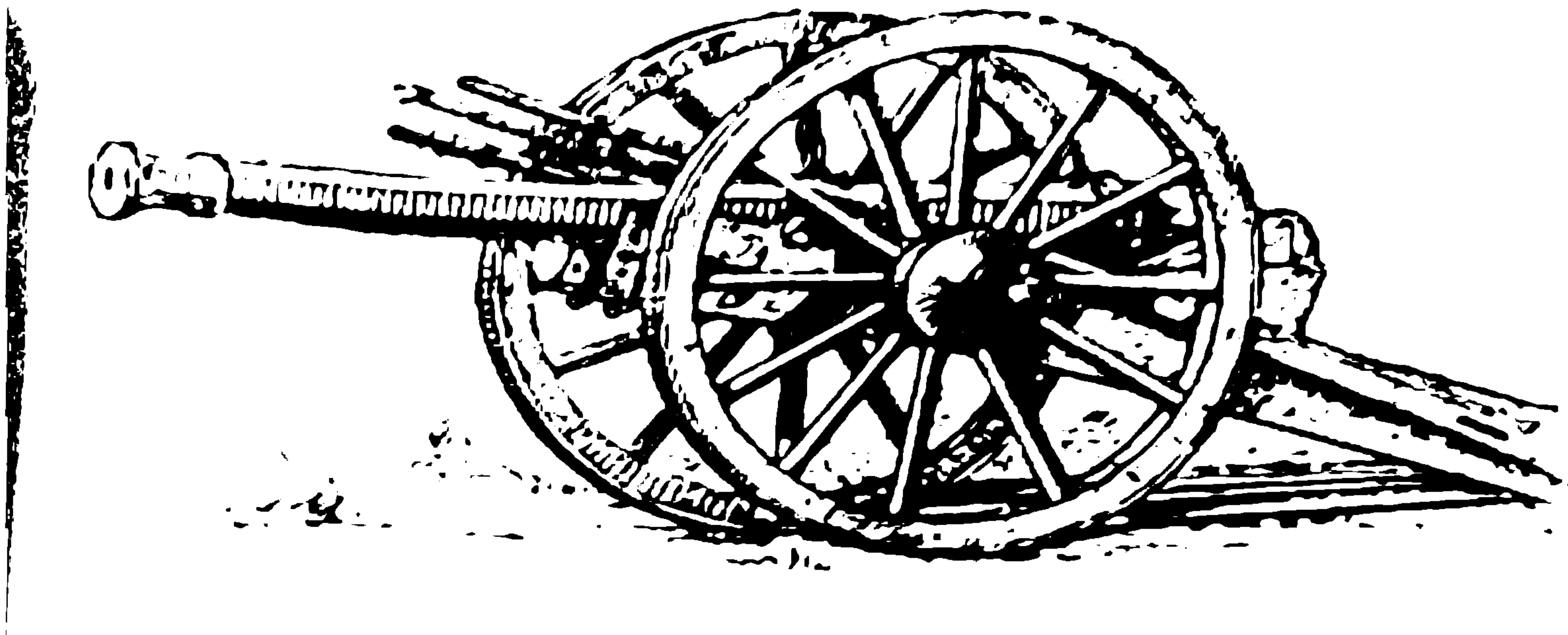
জন শেরীর গ্রাসটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে কর্নেলের চোখের দিকে তাকাল সরাসরি। ‘তুমি তো জানো ভারতবর্ষ এখন অগ্নিকুণ্ড। আমার ভারত তোমার ভারত, দেশবাসীর ভারত,’ এটুকু বলার জন্য নিজেকে অভিশম্পাত করল জন। অভ্যাস এমন এক বিষয়, না চাইলেও চলে আসে কথায়। মানুষকে কথাটা টোপে ফেলতে ফেলতেই আলাদা কথাগুলো চলে আসে তার কথার ভেতরে। ‘কি তুমি কি জানো আমি আসলে কেন তোমার কাছে এসেছিলাম?’ বলে ইচ্ছে করেই সে থামল। ‘আমি এসেছিলাম তোমার কাছে— তোমাকে দ্বারা একজন মানুষকে খুঁজে বের করার জন্য।’

কর্নেল ক্র কুঁচকে জানতে চাইল, ‘তুমি বলেছিলে এমন কাজ নিয়ে এসেছো, যেটা স্রেফ আমার পক্ষেই সম্ভব। একজন মানুষকে খুঁজে বের করার কাজ যে কেউ করতে পারে—’

‘যদি বলি মানুষটা তোমার একসময়ের সবচেয়ে কাছের বন্ধু, আমাদের একসময়ের সবচেয়ে কাছের বন্ধু,’ আবারো সে ইচ্ছে করে থামল। কর্নেল নামটা শোনার জন্য চুপ করে আছে।

‘মানুষটা তোমার বন্ধু ইংরেজ জাতির সেরা মেখাদের একজন—’

‘...জ্যাকসন,’ অনেকটা ফিসফিস করে বলে উঠল কর্নেল। ‘ভিক্টর জ্যাকসনকে খুঁজে বের করার জন্য তুমি আমার কাছে এসেছো,’ কর্নেলের হাত থেকে শেরীর গ্রাসটা কার্পেটের ওপরে পড়ে গেছে।



অধ্যায় নয় বর্তমান সময় ধানমণ্ডি থেকে তেজগাঁওয়ের মাঝামাঝি সড়কে

টপ টপ করে ঘাম পড়ছে বাশারের। মুখটা মুছে নিয়ে সে আবার কথা বলে উঠল। ‘আমি যা বললাম আপনাদেরও কি তাই মতামত?’ বাশার অনুভব করল তার ক্লান্ত কাঁধের পেশি থেকে শীতল ঘাম গড়িয়ে কোমরের দিকে রওনা দিয়েছে। সে একবার সামিরা, তারপর আনোয়ার পাশার দিকে দেখল।

‘আমাদের কাছে এখনো কোনো সলিড প্রমাণ নেই,’ সামিরা কিছু বলার আগে আনোয়ার পাশা বলে উঠল। ‘তবে সব এভিডেন্স সেদিকেই লিড করে।’

‘কিন্তু কীভাবে?’ সামিরা বলে উঠল বাশারের পাশ থেকে। ‘আমার প্রশ্ন হলো কীভাবে এবং কেন?’ বলে সে কাঁধ ঝাঁকাল। ‘মানে আমি বুঝতে চাইছি কারণটা কি, আসলেই এটা কি পসিবল?’

‘আমার মনে হচ্ছে সেটা কনফার্ম করতে হলে আমাদের অপহরণকারীদের মোটিভটা পরিষ্কার করা প্রয়োজন,’ বাশার ঠান্ডা মাথায় ভাবতে শুরু করেছে। সে মাথা যত ঠান্ডা করছে, যুক্তিগুলো তার কাছে পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। তবে তাকে আরো অনেককিছু জানতে হবে। ‘আমি বাকিটুকু জানতে চাই। বিশেষ করে নেত্রপলিস এবং রেলিকের ব্যাপারে। এরা কারা, কতটুকু এদের ক্ষমতা এবং যারা ধরা পড়েছে এরা কারা। কোন গোত্র বা কাস্টের লোক এরা?’

‘ঠিক আছে,’ সামিরা বলতে লাগল। ‘সেও বাশারের যুক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করার চেষ্টা করছে। ‘সিলেটে ধরা পড়ল জেড মাস্টার, উদ্ধার হলো বুদ্ধমূর্তি, ময়মনসিংহে উদ্ধার হলো কালীমূর্তি, ধরা পড়ল একজন,’ সামিরা এটুকু বলতেই বাশারের চোখে ভেসে উঠল জয়া সরকারের চেহারাটা। মন থেকে সেই স্মৃতি বিদেয় করে সে বর্তমানে মনোনিবেশ করল। ‘চট্টগ্রাম থেকে জানা গেল ওখানে সরকার থেকে বিতাড়িত এক প্রফেসর লুকিয়ে কিছু একটা নিয়ে গবেষণা করছিল ঢাকা

সিপাহী

থেকে পালিয়ে। সেখানে তার গবেষণা থেকে সে কী পেয়েছিল সেটা লুকানো আছে একটা কোডেড চিপে। চিপ উদ্ধার হলো এবং ধরা পড়ল নেরুপলিসের আরেক টাই আলট্রা ম্যান। মিস্টার ইউ। এরপর বাশার বলেন।’

‘যে-প্রফেসর চট্টগ্রামে গেল, মানে চিপটা যার দ্বারা কোডেড করা হয়েছিল, সেই মানুষটার একজন বন্ধু ছিলেন, যে অনেকদিন জনসম্মুখের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। তাকে আমি খুঁজে বের করেছি ঢাকা থেকে, সেই সঙ্গে কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি দুর্গ থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ বড় ধরনের একটা হারানো গুপ্তধন, বাশার বলতে বলতে থেমে গেল। ‘সেই সঙ্গে ওখানে ধরা পড়েছে আরেক লোক এবং এক গোপন সংগঠনের দুই প্রতিনিধি,’ বলে বাশার আবারো থেমে গেল।

‘একটা ব্যাপার খেয়াল করেন, এতগুলো ঘটনা, এগুলো ঘটতে শুরু করেছে প্রায় কাছাকাছি সময়ে, এবং এই কাছাকাছি সময়ে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু গুপ্তধন। মহামূল্যবান পুরনো সম্পদ এবং ধরা পড়েছে বড় বড় একাধিক সংগঠনের লোক। এতগুলো ঘটনা কোনোভাবেই কো-ইন্সিডেন্স হতে পারে না। এখানে অনেক অনেক বড় সংগঠনের হাত আছে, এর পেছনে অনেক গুট রহস্য আছে। এর পেছনে অনেক অনেক বড় কোনো মোটিভ আছে,’ বলে বাশার কিছুটা তুলল। ‘এবং আমার ধারণা যদি ভুল না হয়, তবে ঘটনা শ্রেণি করা হয়েছে। আরো অনেক কিছু ঘটা বাকি।’

‘আমি সম্পূর্ণ একমত,’ বাশার দেখল ভিউ মিররে আনোয়ার পাশা। একবার সামিরার সঙ্গে দৃষ্টি মেলান। বাশার প্রায় নিশ্চিত, এরমধ্যে অনেককিছু এর মধ্যেই ঘটেছে, যেটা সে এখনো জানে না।

‘আমি এবার রিফাতের অপহরণের বিষয়ে ফোকাস করতে চাই। কিছুটা আমরা বাকি ঘটনাগুলো ধরতে পেরেছি, বাকিটা আমরা পরেও অ্যানালিসিস করতে পারব কিন্তু প্রথম প্রায়োরিটি হলো রিফাত। কী হয়েছে কেন হয়েছে, তা নিয়েই বিস্তারিত জানতে হবে আমাদের।’

এবার সামিরার পরিবর্তে মৌসুমি কথা বলে উঠল, ‘স্যার, অনুমতি দিলে আমি বলি,’ আনোয়ার পাশা মাথা নাড়তেই সে বিস্তারিত বলে গেল ময়মনসিংহের মন্দিরের কাছে কী ঘটেছে। ‘এগুলোর সবই জানা গেছে সেই রুশো’র বয়ানে,’ তার বক্তব্য শেষ করল মৌসুমি।

‘ছেলেটা আহত হওয়ার পরও এতটা বলতে পারল?’ বাশার খানিকটা অবাক হয়েই জানতে চাইল।

‘হ্যাঁ, সে আসলে গুলি খেলেও, খুব বেশি আহত হয়নি। স্পট থেকে তাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এরপর নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানে ট্রিটমেন্ট করার পর সে মোটামুটি সুস্থই ছিল, তাই বয়ান দিতে সক্ষম হয়েছিল।’

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

‘এরকম সুরক্ষিত একটা জায়গায় এতগুলো লোক ঢুকে এভাবে একজনকে আহত করে অপরজনকে অপহরণ করে নিয়ে চলে গেল। আমাদের সিকিউরিটির কী করছিল?’

‘এটা তো বটেই, অবাক করার মতো আরো একটা বিষয় আছে। সেটা পরে বলছি। ওরা এসেছে তো বটেই, আমাদের সিকিউরিটি কিন্তু একেবারে খারাপ ছিল না। কিন্তু সিসি টিভিতে যা-কিছু দেখা গেছে এবং ছেলেটা যা বলেছে, তাতে এটা একেবারেই পরিষ্কার যে খুবই দক্ষ, প্রফেশনাল এবং সংঘবদ্ধ একদল লোক এসেছিল, রীতিমতো কমান্ডোদের মতো। আমাদের সিকিউরিটি টিকতেই পারেনি ওদের সামনে।’

‘তারমানে যারাই কাজটা করে থাকুক, রিফাতের বিষয়টা খুবই গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে ওরা। এরমানে অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে যাই সংযোগ থাকুক না কেন, রিফাত এখানে খুবই মূল্যবান একটা ভূমিকা পালন করেছে বা করবে। আরো অবাক করা বিষয় কোনটা?’

‘লোকগুলো কারা বা কীভাবে করল সেটা তো দূরে— সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ওরা এখানে এলো কীভাবে কিংবা এত দ্রুত সরেই বা পড়ল কীভাবে, সেটাও এখনো বের করা যায়নি।’

‘তারমানে রিফাতের কোনো ট্রেস পাওয়া যায়নি, তাই না?’ বাশার চিন্তিত মুখে অনেকটা মন্তব্য করার মতো করেই প্রশ্নটা উচ্চারণ করল। ‘আরেকটা কথা, সব ধরনের অ্যালাট ইত্যাদি—’ বাশার প্রশ্নটা শেষ করার আগেই সামনে থেকে আনোয়ার পাশা হাত নেড়ে সায় জানাল সব ফর্মালিটি পূরণ করা হয়েছে একেবারে নিয়ম অনুসরণ করে। ‘আর কোনো ধরনের ডিম্যান্ড বা কিছু করেছে অপহরণকারীরা?’

‘এখনো কিছুই নয়,’ আনোয়ার পাশা কথাটা বলেই ঘড়ি দেখল। ‘কোনো ধরনের ডিম্যান্ড বা ক্রেইম কিছুই করা হয়নি,’ বলেই সে ড্রাইভারকে কিছু একটা বলল। বাশার দেখল সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি খানিক সামনে এগোতেই দিক পরিবর্তন করল। ওদের আশপাশের গাড়িগুলোও দিক পরিবর্তন করল ওদের সঙ্গে সঙ্গে। ‘যদি এখনো কিছুই না করা হয়ে থাকে। তবে আমার মতে অন স্পটে গিয়েই আমাদের তদন্ত শুরু করা উচিত হবে,’ বাশার কথাটা বলেছে সামিরাকে উদ্দেশ্য করে।

‘হ্যাঁ, আমাদেরও ওটাই পরিকল্পনা। আর সেজন্যই আমরা, তেজগাঁও যাচ্ছি, ওখানকার এয়ারপোর্ট থেকে একটা ছোট হেলিকপ্টারে আমরা ময়মনসিংহ যাব। কারণ সময় আমাদের হাতে একেবারে কম।’

বাশার মাথা নেড়ে সায় জানাল।

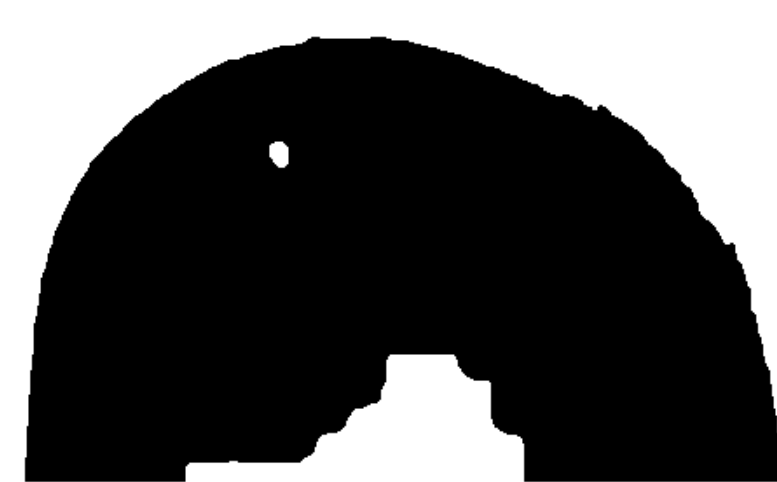
‘আরো একটা ব্যাপার তোমাকে জানানো প্রয়োজন বাশার,’ আনোয়ার পাশা বলে উঠল। ‘আমরা এখনো পরিষ্কার জানি না তুমি যে-কেসটা সদ্য সমাপ্ত করেছে এবং কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি থেকে যা পাওয়া গেছে, সেগুলোর আর্থিক মূল্য বাদেও আরো কোনো অ্যাডেড ভ্যালু আছে কি না, তবে কোনো না কোনোভাবে গুলোর সঙ্গে এবং প্রফেসর ইফতেখারের সঙ্গে এগুলোর গভীর কোনো সংযোগ রয়েছে।’

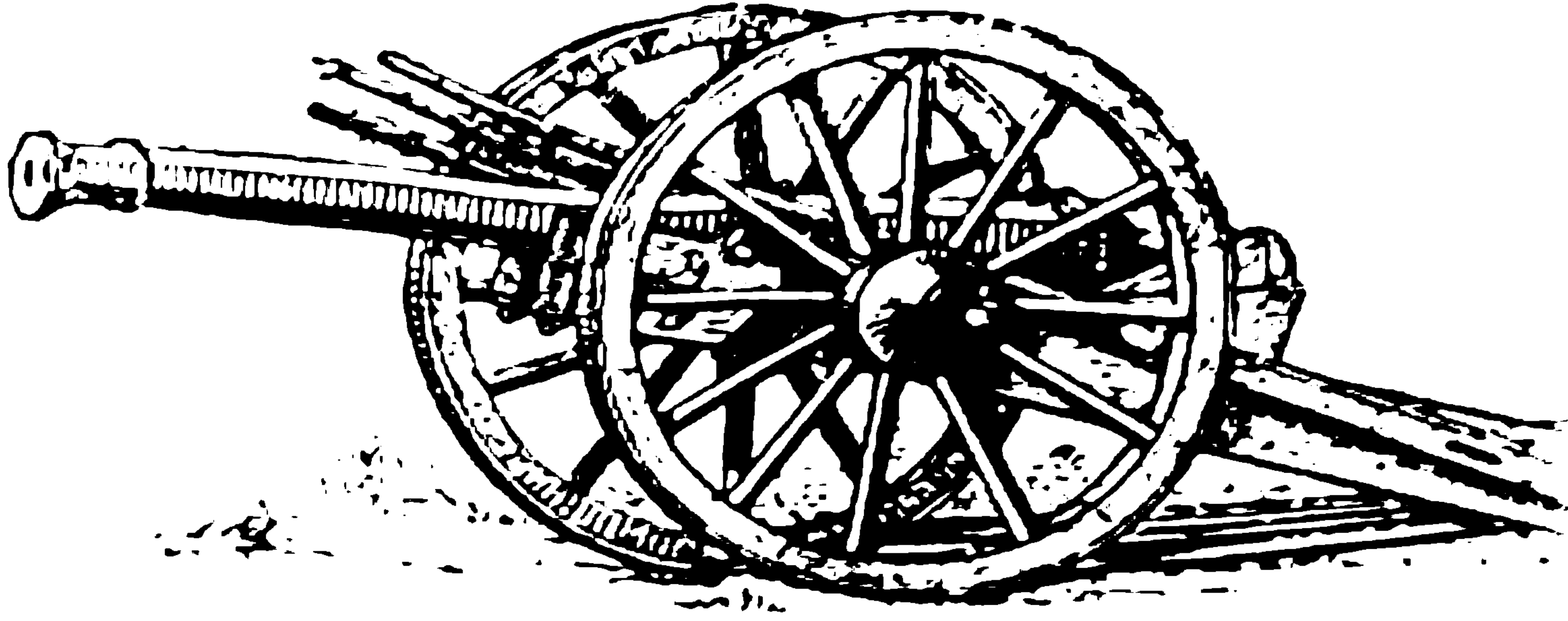
বাশারের ক্র কুঁচকে উঠল। ‘কেন স্যার, এরকম মনে হওয়ার কারণ কি?’

‘কারণ,’ বাশার দেখল আনোয়ার পাশার চোখ বন্ধ সে সিটে হেলান দিয়ে আছে। ‘জিনিসগুলো তো তোমার পাওয়ার কথা ছিল না। অন্তত রেলিক বা নেক্রপলিস, যাই বলি না কেন কিংবা সেই কাল্ট, জিনিসগুলো উদ্ধার করার কথা ছিল ওদের। কিন্তু তুমি সেটা হতে দাওনি। ওদের হারিয়ে ঠিক যে-মুহূর্তে তুমি পুরো বিষয়টা উদ্ধার করলে ঠিক তখন থেকে চেইন ইভেন্টের মতো একের পর এক ঘটনা ঘটতে শুরু করে,’ বলে আনোয়ার পাশা থামল। ‘শুধু রিফাতের অপহরণ নয়, সিলেট এবং চট্টগ্রামেও আমাদের ওপরে আক্রমণ হয়েছে।’

‘স্যার, বলেন কি!’ অবাক হয়ে বলে উঠল বাশার।

‘হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বুনেছো, ভয়াবহ আক্রমণ।’





অধ্যায় দশ

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

রেডফোর্ড শায়ার, ইংল্যান্ড

‘জ্যাকসন, ভিক্টর জ্যাকসন,’ নামটা আবারো অনেকটা আনমনেই উচ্চারণ করল কর্নেল স্যান্ডার্স। ‘তাকে কেন খুঁজে বের করতে হবে?’ প্রশ্নটা উচ্চারণ করতে করতেই কর্নেলের চোখে ভেসে উঠল বিশালদেহী জ্যাকসনের লাল গৌফওয়ালা ভারী চেহারাটা। সদাহাস্য, অপরিমিত শক্তিশালী আর বিপুল জ্ঞানের অধিকারী জ্যাকসন, যার বুদ্ধিমত্তা এবং কাজের জন্য সে খোদ ইংল্যান্ডের রাজ দরবার থেকে পুরস্কার পর্যন্ত পেয়েছে। ‘জ্যাকসন কি কোনো বিপদে পড়েছে কিংবা হারিয়ে গেছে অথবা—’ প্রথম যে-বিষয়টা কর্নেলের মাথায় এলো সেটাই বলে দিল সে, কারণ এ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না কর্নেল।

কিন্তু তার কথা শুনে আনমনে মাথা নাড়ল জন। ‘ব্যাপারটা আসলে উলটো, জ্যাকসন কোনো বিপদে পড়েনি, বরং সে আসলে অন্যদের বিপদে ফেলেছে। শুধু মানুষ হলে কথা ছিল, সে পুরো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, প্রশাসন, এমনকি ভারতবাসীকেও সে বিপদে ফেলে দিয়েছে। এমন এক বিপদ যার থেকে সত্যি কথা হলো কারোই রেহাই নেই। আর রেহাই পেতে হলে তাকে খুঁজে বের করতে হবে। যা একমাত্র তুমি করতে পারবে।’

কর্নেল চুপ করে আছে, এর অর্থ জন খুব ভালোভাবেই জানে। কর্নেল শুরু থেকে জানতে চাইছে। ‘তুমি তো জ্যাকসনকে খুব ভালোভাবেই জানো। তার জ্ঞান প্রজ্ঞা ইত্যাদির বিষয়েও জানো।’

‘হ্যাঁ, তাকেও আমি ছোটবেলা থেকেই চিনি,’ কর্নেল মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল। ‘ছোটবেলার বন্ধুত্ব এবং সখ্যতা,’ বলে কর্নেল সরাসরি তাকাল জনের দিকে। ‘তাকে আমি সম্মান করি, মন থেকেই করি। সেই সঙ্গে এও মনে করি

সিপাহী

ভারতবর্ষে খুব গুটিকয় লোকজন যারা ভালো কিছু করার চেষ্টা করছে, যেটা সত্যিকার অর্থে মানবতার কাজে লাগবে, সেটা জ্যাকসনদের মতো খুব অল্প কজন করছে। তোমার আমার মতো মানুষেরা শুধু শাসন আর শোষণ করছে,' কর্নেল সরাসরি তাকিয়ে আছে জনের চোখের দিকে।

যদিও বন্ধু মানুষ, কর্নেলের প্রতি জনের ভালোবাসার কোনো কমতি নেই। তাও কর্নেলের এতটা সরাসরি কথা শুনে কপিকের জন্য জনের গা জ্বালা করে উঠল, হাজার হলেও ইংরেজ প্রশাসনের লোক সে, কোম্পানি এবং প্রশাসনের নুন খেয়েই সব কিছু তার। কিন্তু জনের মতো ঠান্ডা মাথার মানুষ সহজে উত্তেজিত হয় না। এবারও হলো না। কপিকের রাগ সে খুব সহজেই দমন করে হেসে উঠল, তাও কর্নেলের দিকে একটা হাত তুলে বলে উঠল, 'এই আলোচনা আমরা পরে করব। যা কলঙ্কিত। নৃতত্ত্বের ছাত্র জ্যাকসন একেবারে তরুণ বয়সেই ভারতবর্ষে গিয়েছিল ভারতবাসীদের কিছু বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে, সেটা করতে করতে সে নৃতত্ত্বের পাশাপাশি সে ভূগোল এবং পুরাতত্ত্ব নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ভারতবাসীদের বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতি এবং তাদের পুরাতত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে শুরু করে। সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল, যে কারণে বিভিন্ন সময়ে কোম্পানির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছে সে। আমার স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই যে জ্যাকসনের অনেক উপদেশ কোম্পানি এবং ইংরেজ শাসনের জন্য দারুণ কাজে দিয়েছে। বিশেষ করে ভারতবাসীকে বোঝার এবং তাদের বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে সে যা বলেছে সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে।'

'তাহলে সমস্যাটা হলো কোথায়?' কর্নেল কথা বলতে বলতে ছোট একটা ঘন্টার বাড়ি মারল ছোট একটা হাতুড়ি দিয়ে। একজন বাটলার আসতেই তাকে তামাক সাজানোর নির্দেশ দিয়ে জনকে কথা বলা চালিয়ে যেতে বলল সে।

'সমস্যা দেখা দেয় মূলত আফগান যুদ্ধের পর থেকেই,' জন আজকের আলোচনার যতটা পারে আফগান যুদ্ধের বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে চাইছিল, কিন্তু চাইলেও আসলে অনেক কিছু এড়ানো যায় না। 'আফগান যুদ্ধে সে মূলত তোমাদের সঙ্গে গিয়েছিল আফগান ট্রাইবদের নিয়ে গবেষণা করতে, তাদের সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করতে। কিন্তু তারপর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তো সব বদলে যায়। ওখান থেকে ফিরে এসে তুমি যখন ভারতবর্ষ ছাড়ো এরপর জ্যাকসন একটু পাগলামি হতে শুরু করে। সে এমনভাবেই পাগলামি করত, মাঝেমাঝেই এদিক-সেদিকে হারিয়ে যেত, কিন্তু এই যুদ্ধের পর সে প্রায়ই এরকম হারিয়ে যেত। আগে থেকেই ভারতের নানা জাতি-উপজাতির সঙ্গে সে মিশত কিন্তু এবার যেন সেটা বাড়তে থাকে। প্রায় কয়েকবছর ভারতের মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

মিশতে মিশতে একসময় সে বলতে গেল কোম্পানি এবং প্রশাসন থেকে অনেক দূরে সরে পড়ে। বেশির ভাগ সময় সে ঘুরে বেড়াত আর বাকি সময় সে নিজের গবেষণা নিয়ে থাকত। এর ফলে যেটা হয়, সে অনেকটা সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে,' জন খেয়াল করল সে সভ্যতা শব্দটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে কর্নেলের মুখে একটা সামান্য বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

'সে তার মতোই চলছিল কিন্তু একটা সময় গিয়ে কোম্পানির কাছে খবর আসে, ভিক্টর কিছু একটা নিয়ে কাজ করছে, তার ওপরে নজর রাখতে শুরু করি আমরা। কিন্তু সম্ভবত সেও বুঝতে পারছিল তার ওপরে নজর রাখা হচ্ছে। নজর রেখে যখন তাকে কাবু করা যায় না, তখন তাকে সরাসরি জবাবদিহিতা করতে বলা হয়।'

'আর তখনই তাকে হারিয়ে ফেল তোমরা,' কর্নেল খানিক তরল গলায় বলে উঠল, খুব সূক্ষ্মভাবে বলতে গলে সেখানে এক ধরনের সূক্ষ্ম তাচ্ছিল্য আছে, কারণ কর্নেল জানে জনের গুপ্ত বাহিনী কিংবা টিকটিকির দল জ্যাকসনের সঙ্গে বুদ্ধিতে পেরে উঠবে না। পারার কথাও নয়। জ্যাকসন পাগলাটে কিন্তু অসম্ভব বুদ্ধিমান সে। 'তারপর?'

'তারপর তাকে একাধিকবার ট্রেস করতে পারলেও তাকে কখনোই ধরতে পারিনি আমরা। আর এখানেই দেখা দেয় সমস্যা—'

কর্নেল হাত তুলে থামিয়ে দিল জনকে। বাটলার এসে ইশারা করতেই জনকে নিয়ে স্মোকিং রুমের দিকে রওনা দিল কর্নেল। সাজানো তামাকের পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জনের কাছে সে জানতে চাইল, 'আগে বলো জ্যাকসন কি নিয়ে গবেষণা করছিল, যেটা নিয়ে তোমাদের এত আগ্রহ।'

'আমরা সঠিকভাবে জানি না, তবে সেটা যাই হোক না কেন, খুবই বড় কিছু।'

'তোমরা নির্দিষ্টভাবে জানো না, তবে বড় কিছু এটা জানো কীভাবে?' কর্নেলের গলায় সন্দেহ এবং খানিক অবিশ্বাস।

'কারণ সে যা নিয়ে গবেষণা করছে সেটা ধীরে ধীরে তার জন্য কোম্পানির জন্য এবং ভারতবাসীর জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে,' বলে জন ধোঁয়া ছাড়ল। 'যেই কারণেই মূলত তোমার কাছে আসা। ভিক্টরকে আমরা ধরার চেষ্টা করেছি সে একাধিকবার আমাদের হাত ফসকে গেছে এবং সে ভয়াবহ ক্ষতি করেছে প্রায় সবার। শেষবার সে প্রায় একদল মানুষ হত্যা করেছে, সেই সঙ্গে এমনকি সাধারণ মানুষও তার বলির শিকার হয়েছে।'

জন এই পর্যন্ত বলতেই কর্নেলের ড্র কুঁচকে উঠল। কিছু না বলে সে তাকিয়ে রইল। 'তাকে একাধিকবার ধরতে না পেরে আমার লোকেরা যখন ত্যক্ত-বিরক্ত, তখন আমরা ট্রেস পাই সে দিল্লিতে রয়েছে। দিল্লিসহ পুরো ভারতবর্ষে আগুন

সিপাহী

‘জলছে। প্রশাসন থেকে শুরু করে সবাই যখন ভীষণ বিপদে পড়ে যায় এবং কিছুতেই বুঝতে পারছিল না কীভাবে কী করবে, ভিক্টরের জন্য সেটা হয়ে ওঠে সুবিধাজনক। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের স্পেশাল সেলের এক অফিসার এবং তার টিমকে লাগিয়ে রাখা হয়েছিল তার পেছনে। মেজর উডসন। পাকা শিকারি ছিল সে। খবর বের করে গল্প শুকতে শুকতে ঠিকই বের করে ফেলে জ্যাকসন দিল্লির ভেতরে কোথায় লুকিয়ে আছে।’

‘উডসন, জেনারেলের মেয়ার্সের ছেলে?’

‘হ্যাঁ, জেনারেলের ছেলে। খুবই বুদ্ধিমান এবং—’

‘সে আমার অধীনে নিজের ক্যারিয়ার শুরু করেছিল, কাজেই সে কেমন আমি জানি। তুমি বরং বলে যাও এরপর কী হলো,’ কর্নেল পাইপে টান দিতে দিতে বলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল।

‘মেজর উডসনের মতো পাকা লোক ঠিকই জানত স্বাভাবিক পন্থায় ভিক্টরের মতো একজন মানুষকে ধরা যাবে না। কাজেই সে স্থানীয় বিদ্রোহী ডাকাতদের লোভ দেখিয়ে এবং তাদের হাত করে সে ভিক্টরকে ধরার জন্য একটা ফাঁদ পাতে। ভিক্টর সেই ফাঁদ ঠিকই এড়িয়ে যায় কিন্তু তাকে ধাওয়া করতে সক্ষম হয় উডসন এবং তার লোকেরা।

‘ওরা যখন তাকে প্রায় ধরে ফেলার দ্বারপ্রান্তে, তখন—’

‘আবিষ্কার করে ভিক্টর তাদেরই উলটো ফাঁদে নিয়ে ফেলেছে,’ কর্নেল আনমনে বলে উঠল।

‘হুম, তুমি যে তার সাইকোলজি সবচেয়ে ভালো বোঝো এটা তার প্রমাণ,’ বলে পাইপে শেষ টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জন বলে উঠল, ‘এই কারণেই আমি তোমার কাছে এসেছি। যাই হোক, উডসন এবং তার লোকদের যে আসলে ফাঁদে নিয়ে ফেলছে এটা ওরা বুঝতে পারেনি। এখানেই ভিক্টর ভয়াবহ রকমের নিষ্ঠুরতাটা দেখায়। সে যেখানে নিয়ে ফাঁদে ফেলে ওদের, ওটা ছিল আর্মারি। দিল্লি শহরে তখন দুটো মাত্র জায়গায় ইংরেজদের জন্য নিরাপদ ছিল। একটা আর্মারি, অন্যটা ছিল ব্যাংক। ব্যাংকটা এর মধ্যেই ভিক্টরকে ধরা জন্য ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে অস্ত্রাগারে পৌঁছে ওরা যখন পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে, খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে লোকগুলো কোনদিক দিয়ে পালাল, সেই সময়ে ভিক্টর পুরো অস্ত্রাগার উড়িয়ে দেয়,’ জন এই পর্যন্ত বলে পাইপে আবারো টান দিল। ‘উডসনের পুরো টিম তো বটেই। বাচ্চা-বুড়ো, ভারতীয়-ইংরেজ এবং আশপাশের লোকজনসহ প্রায় হাজারের ওপরে লোক হত্যা করে সে।’

কর্নেল কিছু না বলে নীরবে পাইপ টেনে চলেছে। জন বলে চলল, ‘যে-ভিক্টরকে তুমি চিনতে বা আমরা চিনতাম, সেই মেধাবী, পাগলাটে বুদ্ধিমান

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

মানুষটা মারা গেছে। তার জায়গায় জন্ম নিয়েছে বুদ্ধিমান ভয়ংকর এক শয়তান।
যে-কি না ইংরেজ, ভারতীয় এবং তার নিজের জন্যও বিপজ্জনক।’

‘কিন্তু সে অস্ত্রাগারের নিয়ন্ত্রণ পেল কীভাবে, আর এরকম ভয়ংকর বিস্ফোরণই বা ঘটাল কীভাবে?’ কর্নেলের ড্র কুঁচকে আছে। ‘বাস্তবিকভাবে বিবেচনা করলে ব্যাপারটা স্রেফ অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে আমার কাছে।’

‘আমি জানতাম তুমি এই প্রশ্ন করবে,’ জন সোজা হয়ে বসল। তার ধারণা এতক্ষণে সে কর্নেলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। ‘এখানেই চলে আসে সে আসলে কী নিয়ে গবেষণা করছিল এবং কোম্পানি শাসনের সঙ্গে তার দূরত্বটা তৈরি হলো কীভাবে। এটা নিয়ে অনেক কথা প্রচলিত আছে, এর ভেতরে একটা হলো, সে কোনো একটা ভয়ংকর অস্ত্র আবিষ্কার করেছে, অথবা সে পুরনো কোনো অস্ত্র আবিষ্কার করেছে। ব্যাপারটা শুনতে অবিশ্বাস্য লাগছে কিন্তু একাধিকবার তার কর্মকাণ্ড তাই প্রমাণ করেছে এবং সে বারবার যেভাবে পালিয়েছে অথরিটির থেকে চোখ সরিয়ে, ব্যাপারটা এমন কিছু না হলে অসম্ভব। আর যদি সে এমন কিছু করেও থাকে, তবে বিষয়টা কেমন বিপজ্জনক হতে পারে আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি।’

কর্নেল মনোযোগ দিয়ে শুনছে, জন বলে চলল। ‘প্রথমত, সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তার কাছে কী আছে না আছে আমরা জানি না। তার কাছে খুব গোপন বা শক্তিশালী কিছু একটা তো আছে, সেটা যদি সে রাখতে পারে বা স্বেচ্ছায় কারো হাতে তুলে দেয় বা তার কাছ থেকে কেউ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, যেকোনোটাই ভয়ংকর। ভারতবর্ষ এই মুহূর্তে স্রেফ নরককুণ্ড। কোম্পানি এবং ইংরেজ মিলিটারি সবখানে মার খাচ্ছে, বিদ্রোহীরা একের পর এক শহর দখল করে নিচ্ছে। এমন সময় যদি এরকম ভয়ংকর একজন মানুষ বা তার আবিষ্কৃত কিছু বিদ্রোহীদের হাতে পড়ে তবে কী হতে পারে ভেবে দেখেছো একবারও।’

জন থেমে গেল, কর্নেল চুপ করে পাইপ টানছে। ‘তোমার কাছে কেন মনে হচ্ছে ভিক্টরকে আমি খুঁজে বের করতে পারব?’ বলে কর্নেল ড্র ওপরে তুলল। ‘আমিই কেন?’

‘সাদা চোখে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগতে পারে। কারণ ভারতবর্ষে এত এত অফিসার বড় বড় কর্মকর্তা থাকতে আমি এরকম পরিস্থিতিতে এমন একজন মানুষের কাছে এসেছি, যে স্রেফ ভারত থেকে থেকে হাজার হাজার মাইল দূরেই বরং কখনো ভারতে ফিরে যেতে চায় না। বিশ্বাস করো, উপায় না থাকলে আমি তোমার কাছে আসতাম না,’ জন এগিয়ে গেল কর্নেলের দিকে। ‘একমাত্র তুমি তাকে খুব ভালোভাবে চেন, ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছো। তোমরা ছিলে সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তোমরা একসময় একসঙ্গে কাজ করেছো। তুমি তার চাল,

সিপাহী

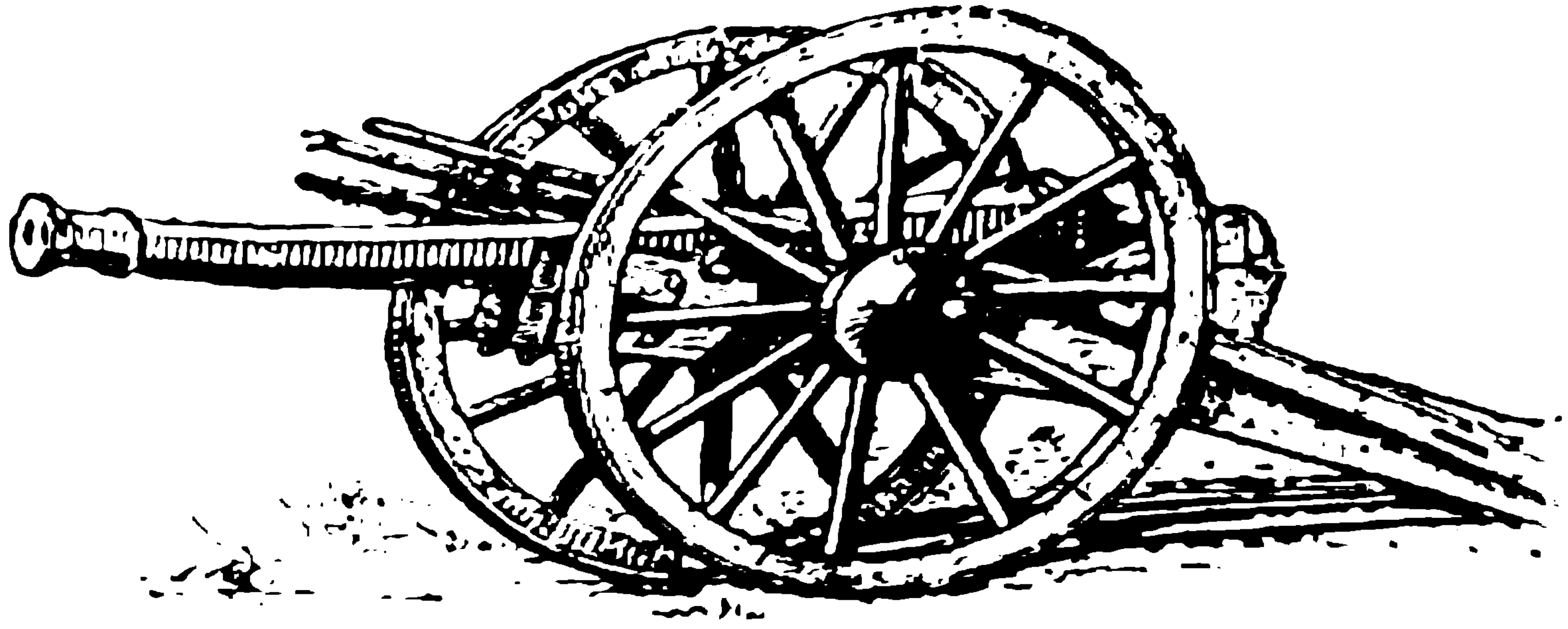
তার পদক্ষেপ সব ধরতে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা একদিকে তুমি তার বন্ধুসম, অন্যদিকে তুমি ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে সব চেন। কাজেই তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না। তুমিই পারো কোম্পানি, ইংরেজ শাসন এবং ভিক্টর নিজেকে নিজের হাত থেকে রক্ষা করতে। পিছ বন্ধু আমাদের তোমাকে প্রয়োজন।’

জনের কথা শুনতে শুনতে উঠে দাঁড়াল কর্নেল। পায়চারি করতে করতে সে বলে উঠল, ‘তুমি যা বলছো তা অসম্ভব, এমনকি আমি যদি রাজিও হই তাহলেও অসম্ভব, ভারতবর্ষ ছোট কোনো জায়গা নয়, সেখানে একজন মানুষ খুঁজে বের করা অসম্ভব। তার ওপরে এই মুহূর্তে ভারত স্রেফ অগ্নিকুণ্ড। এর ভেতরে আমি এমন এক মানুষ, যে ভারত ছেড়েছে আজ প্রায় এক দশক। এর ভেতরে বদলে গেছে প্রায় সব। কাজেই আমি যদি এমনকি রাজিও হই, তা-ও পুরো বিষয়টা স্রেফ অসম্ভব এবং অবাস্তব মনে হচ্ছে আমার কাছে। ভিক্টর যেকোনো জায়গায়, যেকোনো অবস্থায় থাকতে পারে।’

‘তুমি স্রেফ একবার রাজি হও, আমি জ্ঞান দিয়ে দেব,’ জনের গলায় বেপরোয়া ভাব। ‘আমি জানি ইংরেজ শাসন, কোম্পানি এখন বিপদে আছে, তাও তোমাকে সর্বাত্মক সহায়তা করা হবে, তোমাকে তোমার পুরনো দলকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। সবচেয়ে সেরা বাহক, বাহন এবং রসদ দেওয়া হবে,’ বলে সে খানিক থেমে যোগ করল, ‘সবচেয়ে বড় কথা ভিক্টরের হাতে আসলে কী আছে আমরা জানি না, আর সেটা অন্য কারো হাতে পড়ার আগে তাকে থামাতে হবে, যেকোনো উপায়ে।’

কর্নেল পায়চারি থামিয়ে জনের সামনে এসে থামল। ‘জন, আমি জীবনে কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিনি,’ বলে সে দেয়ালের একটা চাবির দিকে তাকাল। ‘আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর কখনো ভারতে ফিরে যাব না, কিন্তু কিন্তু...’ কর্নেলের গলা বুজে আসছে। ‘কিন্তু তোমার কারণে বা কথায় না হলেও প্রিয় বন্ধুর এই পরিণতি আমি ভাবতে পারছি না। আমি হয়তো ফুরিয়ে গেছি কিন্তু ভিক্টরের মতো মেধাবী, বুদ্ধিমান মানুষ এভাবে শেষ হয়ে যাবে এবং সবার জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে, এটা ভাবা যায় না,’ বলে বড় করে দম নিল কর্নেল। ‘আমি যাব ভারতে, তবে আমার কিছু শর্ত আছে।’

জন স্বস্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সাই জানাল।



অধ্যায় এগারো বর্তমান সময় সিলেট, এয়ারপোর্ট এলাকা

এই ভয়ানক অন্ধকারে কোনো মানুষ তো দূরে থাক নিশাচর প্রাণীরও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার উপায় নেই।

যদিও ঘন অন্ধকারের ভেতরে রাস্তার পাশের সৌন্দর্যটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু লাক্কাতুরা আর মালিনীছড়া টি-এস্টেটের পাশ দিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে যাওয়া এই রাস্তার সৌন্দর্য সবসময় তাকে মুগ্ধ করে। তবে মেজর করিম জানে, আজ যদি দিনের বেলাও হতো তা-ও এই সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো পরিস্থিতি তার থাকত না। কারণ সে এই মুহূর্তে চলেছে এমন এক মিশন নিয়ে যার গুরুত্ব তার স্বাভাবিক জীবন কিংবা সৌন্দর্য উপভোগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আজকের মতো এমন অদ্ভুত এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মেজর করিমের জীবনে এর আগে আর আসেনি।

মেজর করিম হাতের ওয়াকি-টকিতে একবার কথা বলে নিয়ে নিশ্চিত করল তাদের ব্যাকআপ টিম এবং সামনের গাড়িটা ঠিকঠাক আসছে। টকিতে কথা বলা শেষ হতে না হতেই তার পারসোনাল মোবাইলটা বাজতে লাগল। কলটা দেখে সে খানিক ভাবল, ক্ষণিকের জন্য তার মনে হলো এই কলটা রিসিভ না করাটাই বেটার হবে। কিন্তু সেটা বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে না, কারণ শেষ মুহূর্তে কোনো নির্দেশনা আসতে পারে। কলটা রিসিভ করে সে স্রেফ হ্যালো বলে চুপ হয়ে গেল, যা বলার বেশির ভাগ ওপারের মানুষটাই বলল। মেজর করিম স্রেফ চুপচাপ শুনে গেল, কিছু জায়গায় প্রয়োজন মতো সে রেসপন্স করল, আপডেট জানানোর বিষয়গুলো সে ঠিকঠাক জানাল কিন্তু খুব বেশি কথা বলল না। বিশেষ করে কাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং কোন প্রয়োজনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—সেসব বিষয়ে সে কিছুই বলল না। কারণ আজকের মিশনটা এমন একজনকে নিয়ে, যাকে নিয়ে

সিপাহী

হিংসতা এবং ঝুঁকির কোনো শেষ নেই। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে মেজর করিমের একেবারে ভিন্ন একটা কথা মনে হলো, আসলে ওরা যা পরিকল্পনা করেছে সেভাবে কি আদৌ সব হবে কি না।

একজন মিলিটারি কমান্ডো হিসেবে এরকম অপারেশনে সাধারণ সে কিংবা তার ফোর্সের লোকেরা বলতে গেলে প্রায় কখনোই সামিল হয় না। কিন্তু আজকের বিষয়টা ভিন্ন। পিবিআইএস থেকে যখন বিশেষ একজন মাস্টারমাইন্ড ক্রিমিনালকে এসকর্ট করার জন্য অনুরোধ করা হয়, তারা প্রথমে রাজি হয়নি। কারণ এ-ধরনের মিশনে সাধারণত তারা অংশগ্রহণ করে না। কিন্তু পিবিআইএসের স্পেশাল উইংয়ের প্রধান আনোয়ার পাশা অনুরোধ করার পর, তাদের ইউনিটের প্রধান বেশ অগ্রহবোধ করে। বিশেষ করে এই মিশনটা যখন বিশেষ ধরনের একটা মিশন—বিশেষ পারপাসে পরিচালিত করা হচ্ছে। তাদের ইউনিটের প্রধান তাকে এবং তার সমসাময়িক আরেক কমান্ডো অফিসার মেজর কায়সারকে ডেকে পাঠায়। বুঝিয়ে দেওয়া হয় পুরো মিশনের গতি-প্রকৃতি এবং সমস্ত ডিটেইল। বিস্তারিত ব্রিফিং শেষে তাদের জানানো হয় এই মিশন একভাবে বলতে গেলে রাইড মিশন। যেগুলোতে মৃত্যুঝুঁকি তো থাকেই, সেই সঙ্গে সফল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে একেবারেই কম। কাজেই তাদের স্পেশাল অনুমতি নেয়া হয়। এরপর তাদের রওনা হতে হয় গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। মেজর করিম সিলেটে, অন্যদিকে মেজর কায়সার চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে।

মেজর করিম ছোটবেলা থেকে এতিমখানায় বড় হওয়া ছেলে, নিজেকে সে অত্যন্ত ভাগ্যবান এবং আশীর্বাদপুষ্ট মনে করে। কারণ যে-এতিমখানা থেকে সে বড় হয়ে উঠেছে সেখান থেকে খুব কম মানুষই তার মতো এই পর্যায়ে উঠে আসতে পারে। সে মেধাবী ছিল, পরিশ্রমী ছিল, তবে সে বুদ্ধিমানও ছিল, যে-কারণে সে এই পর্যন্ত উঠে আসতে পেরেছে। আর্মিতে জয়েন করার পর, যখন যেভাবে সুযোগ পেয়েছে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করেছে, দেশের সেবা করেছে। আর্মি থেকে স্পেশাল কমান্ডো কোর্সে জয়েন করে একের পর এক মিশন সম্পন্ন করেছে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে বুকের গভীর থেকে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। নিজের কাজে আর দেশসেবায় এতটা ব্যস্ত ছিল যে বিয়েটাও করা হয়নি এখনো। এবারের এই মিশনটায় সফল হতে পারলে বেশ কিছুদিন ছুটি নেবে। বিয়ে করবে, কিন্তু বিয়েটা করাবে কে, জীবিত কেউ তো নেই তাকে নিয়ে ভাবার জন্য। নিজের ব্যবস্থা তার নিজেকেই করতে হবে।

ভাবতে ভাবতেই একটা ঝাঁকির সঙ্গে সতর্ক হয়ে বাস্তুবে ফিরে এলো সে। সামনে একটা জিপ, পেছনে এটাতে সে ড্রাইভারের সঙ্গে বসে আছে, ভেতরে বন্দি, আর পেছনে একটা জিপ। ফোনের আপডেটগুলো দ্রুত সে নির্দেশনার মাধ্যমে নিজের লোকদের বলে দিল ওয়াকিটকির মাধ্যমে।

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

কাজ সেরে একবার ঘড়ি দেখল। সামনের বাঁকটা পার হলে তাদের বহর এয়ারপোর্টে ঢুকবে। সব সেরে শেষবারের মতো একবার নিজেকেই প্রশ্ন করল মেজর করিম, আসলেই কি যা ভাবছে সেরকম কিছু হবে, নাকি সবই শ্রেফ কল্পনা! চট্টগ্রামে তার বন্ধু মেজর কায়সারের কী অবস্থা কে জানে।

বর্তমান সময়, চট্টগ্রাম

মেজর করিমের গাড়িবহর যখন স্পেশাল বন্দিকে নিয়ে লাক্ষাতুরা টি-এস্টেটের পাশ দিয়ে সিলেট এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে চলেছে ঠিক একই সময়ে তার বন্ধু মেজর কায়সারের জিপগুলোও এগোচ্ছে আরেক জায়গায়, দেশের আরেক প্রান্তে। তবে তাদের ব্যবস্থাটা একটু অন্যরকম। সেখানে সামনে একটা জিপ, মাঝে বন্দির সঙ্গে ত্যানের ভেতরে বসেছে মেজর কায়সার এবং তার সঙ্গে আরো দুজন কমান্ডো।

মেজর কায়সার মেজর করিমের ব্যাচমেট এবং বন্ধু হলেও সে এসেছে একেবারেই ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। বিরাট বড়লোক বাপের বখে যাওয়া ছেলে সে অল্প বয়স থেকে, ইন্টার পাস করে এটা-সেটা করে নিজেই পুরোপুরি নষ্ট করে ফেলার দ্বারপ্রান্তে, ঠিক সেই সময়ে তার মিলিটারি চাচা একরকম জোর করেই তাকে আর্মিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠায়। কীভাবে কীভাবে যেন তার আর্মিতে হয়েও যায়। জয়েন করবে কি করবে না, ভাবতে ভাবতে সে জয়েন করেই ফেলে। তবে ইচ্ছে ছিল আর্মিতে জয়েন করার পর কিছুদিনের ট্রেনিংয়ের সময়ে পালাবে অথবা এমন কিছু করবে যাতে ওরাই তাকে বের করে দেবে। কারণ কায়সার প্রায় নিশ্চিত ছিল যে তার মতো বাউগুলে আর বেপরোয়া ছেলের জন্য আর্মির মতো ডিসিপ্রিন্ড জীবন নয়।

কিন্তু কথায় আছে না, মানুষ ভাবে এক, আর হয় আরেক। কায়সারের জন্যও ব্যাপারটা এমন ছিল। আর্মিতে জয়েন করা এবং ট্রেনিং শুরু করার পর সেখানের আবিষ্কার ব্যাপারগুলো তার ভালো লাগছে। তার বাউগুলেপনার যে ভেতরগত স্বভাব আছে সেটাকে শ্রেফ খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে এখানে অ্যাডভেঞ্চার আর চ্যালেঞ্জের কোনো অভাব নেই। মিলিটারির জীবন একদিকে তার ভালো তো লাগেই সেই সঙ্গে সে সত্যিকার অর্থে এখানে এসে তার জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য খুঁজে পায়। সেই সঙ্গে সে এটাও বুঝতে পারে আসলে সে কী পছন্দ করে। অ্যাডভেঞ্চার এবং চ্যালেঞ্জ।

নিজের ব্যাচে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সে ট্রেনিং সম্পন্ন করে কাজ শুরু করে আর্মিতে। দেশে-বিদেশে একের পর এক ধাপ সুচারুভাবে সম্পন্ন করে সে ধীরে ধীরে উঠে আসে ওপরে, এরপর একসময় নিজেই চ্যালেঞ্জ করার জন্যই জয়েন

সিপাহী

করে স্পেশাল কমান্ডো ফোর্সে, যেখানে শুধু সর্বোচ্চ চ্যালেঞ্জিং দায়িত্বগুলো দেওয়া হয়। এখানে সে সফলভাবে একের পর এক মিশন সম্পন্ন করে এবং এখানে আসার পর নিজের পরিবারের বাইরে তার আরেকটা পরিবার গড়ে ওঠে। এখানেই তার সঙ্গে পরিচয় হয় মেজর করিমের সঙ্গে এবং গড়ে ওঠে গভীর বন্ধুত্ব। একের পর এক কাজ করার পর বিগত কয়েকদিন আগে তাদের ডাক পড়ে পিবিআইএসের সঙ্গে স্পেশাল এক মিশনে কোলাবোরেটিভলি কাজ করার জন্য। আর এখন সেই মিশনের অংশ হিসেবে হাই ভোল্টেজ এক প্রিজনারকে সে তার টিম নিয়ে এসকর্ট করছে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা এলাকা আর নেভাল একাডেমির মাঝামাঝি একটা নির্জন গ্রাইভেট এয়ারপোর্টে।

মেজর করিম এবং মেজর কায়সার দুজনারই প্রাথমিক মিশনটা একই এবং খুব সহজ। কিছুদিন আগে সিলেটে এবং চট্টগ্রামে পিবিআইএসের স্পেশাল দুই এজেন্ট তানভীর মালিক এবং শারহান শারিয়ারের হাতে ধরা পড়ে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী এবং কুখ্যাত দুই অ্যান্টিক্স চোরাচালানি সংস্থা রেলিক এবং নেত্রপলিসের দুই বিশেষ প্রতিনিধি জেড মাস্টার এবং মিস্টার ইউ, অর্থাৎ এজেন্ট আলট্রা। দুজনের ব্যাপারেই প্রমাণ পাওয়া গেছে, দুজনেই নেত্রপলিস এবং রেলিকের হাই ভোল্টেজ এজেন্ট। শুধু সাধারণ এজেন্ট নয় বরং বেশ শক্তিশালী এবং বড় ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে আছে।

কথামতো ভাবে ভাবতেই তাদের গাড়ি, পতেঙ্গা রোডের একটা বিশেষ বাকের কাছে এসে সামান্য স্লো করে আবার স্পিড বাড়িয়ে দিল। নির্দিষ্ট এই এয়ারপোর্টের রোডে উঠতেই টকিতে সবার খবর নিতে নিতে আড়চোখে একবার বন্দির দিকে দেখে নিল সে। মুখে মুখোশ পরা মানুষটা মাথা নিচু করে বসে আছে, হাতে-পায়ে সম্মিলিত একটা চেইন দিয়ে আটকানো। কথা বলা শেষ করে হেলান দিল মেজর কায়সার তার সিটে। মনে পড়ে গেল পিবিআইএসের স্পেশাল উইংয়ের অফিসার এক্স মিলিটারি শারহান শারিয়ারের কথাগুলো।

এই বন্দিদের নিয়ে ডিল করার প্রথম সমস্যা যেটা সেটা হলো, এদের ব্যাপারে নির্দিষ্ট তথ্যের বড় অভাব, তারচেয়ে বেশি অভাব এদের সংগঠনের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের। রেলিক আর নেত্রপলিসের ব্যাপারে এটুকু জানা যায় যে এরা সারা বিশ্বেই অপারেট করে এবং পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে এদের আকার বিরাট, এতটাই বিরাট যে দুনিয়ার অনেক দেশে এরা এমনকি সরকার পর্যন্ত নামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এর মূলত অ্যান্টিক্স চোরাচালানি সংগঠন। তবে এদের পরিসরটা বিশাল। এরা অপারেট করার জন্য সেভাবেই দেশ সিলেক্ট করে যেখানে অ্যান্টিক্সের স্বর্গ বা খনি রয়েছে। যেমন নেপাল, ইন্ডিয়া, চায়না, থাইল্যান্ড এ-ধরনের দেশ। এরা যে-দেশে প্রবেশ করে সেখানে নিজেদের ক্ষমতা আর শক্তি

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

দিয়ে সে-দেশের প্রশাসনের ভেতরে এবং বাইরে নিজেদের শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে বছরের পর বছর ধরে। বলতে গেলে সরকারের এবং প্রশাসনের সবচেয়ে ক্ষমতামূলক মানুষগুলোকে এরা বিপুল পরিমাণ টাকা দিয়ে কিনে ফেলে। এভাবে একটা দেশের ভেতরে যখন নিজেদের পুরোপুরি একটা পরজীবী প্রাণীর মতো প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, এরপর এরা শুরু করে শোষণ, মানে অ্যান্টিক সংগ্রহ এবং চোরাচালান। এরা করাপশনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, এরা দেশের মানুষদের দিয়ে নিজেদের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অ্যান্টিক চোরাচালানের জন্য রীতিমতো একটা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এবং ঘাঁটি তৈরি করে। এদের ব্যাপারে কথিত আছে, এদের নিজেদের আর্মি থেকে শুরু করে এমনকি নিজেদের রিসার্চ টিম পর্যন্ত আছে, এবং এরা যেখানে কাজ শুরু করে সেখানে কোনো কিছু ঘটতে সক্ষম।

সাব-কন্টিনেন্টের ভেতরে ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড এমনকি বার্মাতেও এদের শক্তিশালী ঘাঁটি থাকলেও স্রেফ চোরাচালানির করিডর হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া এদের কখনো সেভাবে বাংলাদেশে অপারেট করতে দেখা যায়নি। এর পেছনে অন্যতম কারণ ছিল, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনেক সমৃদ্ধ হলেও অ্যান্টিকের দিক থেকে সেভাবে সমৃদ্ধ নয়। এ কারণেই হোক বা অন্য কারণেই হোক এদের কখনো বাংলাদেশে অপারেট করতে শোনা যায়নি, সিলেটের এই সাম্প্রতিক ঘটনার আগে। পর পর সিলেট আর চট্টগ্রামের দুটো ঘটনা প্রমাণ করে এরা আছে, বেশ ভালোভাবেই আছে এবং বেশ বড় কিছুই ঘটতে যাচ্ছে। আর এ কারণেই এদের সেরা দুজন মাথা যেহেতু পাওয়া গেছে, তাদের বিশেষ উপায়ে টাকা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মিলিটারি কমান্ডো দলের সহায়তা নিয়ে।

মেজর কায়সার বড় করে দম নিয়ে নিজের অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করে নিল একবার। সময় এগিয়ে আসছে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই তাদের গাড়িগুলো থেমে গেল। সামনে ড্রাইভার কথা বলছে। মেজর কায়সার ধারণা করল, তাদের গাড়িগুলো এয়ারপোর্ট চেকপোস্টের কাছে পৌঁছে গেছে।

ড্রাইভারের কথা শেষ হতে গাড়ি চলতে শুরু করতেই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যদিও একজন মিলিটারি পারসন এবং কমান্ডো হিসেবে সে যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত, কিন্তু মনে মনে সে চাচ্ছে পিবিআইয়ের স্পেশাল উইংয়ের প্রধান আনোয়ার পাশা যা ধারণা করছিল সেটা যেন ভুল হয়, আজ রাতে যেন কিছু না ঘটে।

সে ভাবনাটা সেরেও সারতে পারল না, গাড়িটা চলতে শুরু করেই আবার থেমে গেল। ধূপ করে একটা শব্দ হলো সামনে। শব্দটা কি আসলেই হলো, নাকি তার মনের ভুল—ঠিক বুঝতে পারল না মেজর কায়সার। সে ড্রাইভারের মাথার

সিপাহী

পেছনের ছোট কমিউনিকেশন প্যানেলটা ওপেন করার আগেই ভীষণভাবে কঁপে উঠল পুরো গাড়ি।

অতীত-সিপাহী বিদ্রোহে বেশ কয়েক বছর আগে

সময়টা দুপুরের ঠিক পর দিয়ে। এ-সময়টা সম্ভবত দিনের সবচেয়ে অলস সময়। ভারতবর্ষের বাঙালি এলাকার নেটিভরা এই সময়টাকে খুব সুন্দর একটা নামে ডাকে, শব্দটার বাংলাটা সঠিকভাবে মনে করতে না পারলেও নিজের বাড়ির বাটলারের কাছে শোনা শব্দটার অর্থটা কর্নেল স্যাভার্সের খুব মনে ধরেছিল। শব্দটা হলো 'ভাতঘুম'। যেহেতু এখানকার মানুষেরা মূলত ভাতই খায়। কাজেই দুপুরে ভাত খাবার পর অলস সময়টাতে খেয়ে সে ঘুম দেয় সেই বেকার সময়টাকে তার বলে ভাতঘুমের সময়। কথাটা সত্যি, যদিও সে নিজে ঠিক ভাতের মানুষ নয়, তার কোনো সন্দেহ নেই ভারতীয় হোক আর ইংরেজ বা অন্য কোনো জাতি, সত্যি ভ্যনাই, দুপুরের এই সময়টাই সবচেয়ে অলস সময়।

আর সদ্য যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা রণক্লান্ত কর্নেলের জন্য শুধু এই সময়টা বরং দিনের বেশির ভাগ সময়ই আসলে বিশ্রাম নিয়ে কাটানো উচিত কিন্তু সেটা পারছে না দুটো কারণে। একে তো সাম্প্রতিক যুদ্ধে পরাজয় এবং যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা তার উত্তম শরীর এবং মস্তিষ্কে শক্ত হতে দিচ্ছে না, অন্যদিকে দুপুরে খেয়ে সে ঘুমাতে পারে না, যে কারণে অলস এই সময় চায়ের বেশ ভূমিকা বসল তার। সেনানিবাসের বাড়ির পেছনে বাগানে বসে, যুদ্ধের বাজে অভিজ্ঞতা দুঃসহ স্মৃতি মাথা থেকে তাড়িয়ে চায়ের জন্য কাউকে বলতে যাবে, পেছন দিয়ে দেখতে পেল হাতে টি-পট নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে তার স্ত্রী জেনি।

'এই জন্যই আমি তোমাকে এত ভালোবাসি,' ক্রাস মুখের পেনিঙলোকে পাক করার চেষ্টা বাদ দিয়ে মৃদু হাসি কুটিয়ে তুলল সে মুখে। নিজের চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে জেনিকার বলে উঠল, 'তোমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত।'

কর্নেল মাথা নাড়তে নাড়তে জবাব দিতে যাবে, তার আগেই বাটলার দৌড়ে এলো, 'কর্নেল স্যার, বেশকিছু সৈনিক এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে—'

কর্নেল চট করে তার হেলান চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। জাহাজটা অব্যতাবিকভাবে দুলছে। একটু আগে জাহাজের এক লঙ্কর এসে বলে গিয়েছিল ক্যান্টেন স্যার বলেছে বত বোম্ব বন্দরের দিকে এগোচ্ছে তারা আবহাওয়া তত খারাপ হচ্ছে। কর্নেল যেন প্রকৃত থাকেন। সে-হিসেবেই সে একেবারে পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ পরিধান করেই নিজে জিনিসপত্র গুছিয়ে প্রস্তুতি হয়েই ইজিচেয়ারে হেলান

দিয়েছিল, কখন ঘুমিয়ে গেছে টেরও পায়নি। আর ঘুমাতেই ফিরে এসেছিল সেই পুরনো স্মৃতি, যার হাত থেকে নিস্তার নেই কর্নেলের।

নিজের মাথা ঝাড়া দিতে দিতে কর্নেল পকেট হাতড়ে পাইপ বের করল। জীবনের সুন্দর স্মৃতিগুলো স্রেফ সময়ের ভেদে কতটা যাতনাময় হয়ে উঠতে পারে, নিজের অভিজ্ঞতা না থাকলে সে কোনোদিনই বুঝতে পারত না।

এর হাত থেকে কি মুক্তি নেই কোনোদিনই?

পাইপে টান দিয়ে সে বর্তমানে ফিরে আসার চেষ্টা করছে। পকেট থেকে চেইনের ঘড়িটা বের করে সময় দেখল, কিন্তু ঠিক পুরোপুরি বুঝতে পারল না। সময় এখন কত। কারণ ইংল্যান্ড থেকে রওনা দিয়ে বেশ ভালো সময় পার হয়েছে। এর ভেতরে একাধিকবার বদলে গেছে সময়ের পরিক্রমা। কর্নেল বিছানার পাশে এসে পাইপটা ঠোঁটে চেপে ধরল। তার জিনিসপত্র খুব বেশি নেই, আর যা আছে সেগুলোও গোছানোই আছে। কোমরবন্ধনীর ভেতর থেকে সে নিজের পিস্তলটা বের করে একবার পরখ করে নিল। ক্যান্টেন এবং জনের ভাষ্যমতে একবার বন্দরে নামলে পরিস্থিতি কি হবে, কেউই জানে না। সে নিজে তো আরো জানে না। কাজেই কথাতো প্রস্তুতি নিতে হবে।

নিজেকে সবসময় মাটি আর পাহাড়ের মানুষ মনে করা, কর্নেল স্যাভার্সের জন্য পানি, বিশেষ করে নোনা পানি কখনোই খুব সুবিধার যাত্রা নয়। তার ওপরে একদিকে লম্বা যাত্রা এবং বিরূপ আবহাওয়া, তার ভ্রমণটাকে আরো ক্লান্তিকর এবং বিরক্তিকর করে তুলেছে। তবে ভ্রমণের এই সময়টা সে কাজে লাগিয়েছে ভাবনাচিন্তা করার জন্য।

নিজের পিস্তল আর ঘড়ি পরীক্ষা করে দুটোকেই যথাস্থানে রেখে দিল সে। ঘড়ি পকেটে আর পিস্তলটাকে কোমরবন্ধনীতে। যদিও পিস্তল জিনিসটা তার পছন্দ নয়। কারণ তার অভিজ্ঞতা বলে বিপদের সময়ে ওটা খুব বেশি কাজে দেয় না। কারণ ওটাতে স্রেফ একবার গুলি করা যায়। এরপর আবার ওটাকে প্রস্তুত করে গুলি করতে করতে এত বেশি সময় আর ঝামেলা সম্মুখসমরে ওটা তেমন কাজের জিনিস নয়। তবে জিনিসটা দ্রুত কাজ করে, নিশ্চিত দূরবর্তী আঘাতের জন্যও ভালো কাজে দেয়। ছোট ব্যাগটার ওপরের অংশ খুলে সে ভেতর থেকে একটা চামড়ার ছোট ফোন্ডারের মতো বের করে আনল। এটা ভেতরে একটা পানিরোধক ফাইলের ভেতরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র রয়েছে, কাগজের ফোন্ডারটা বের করে ওটাকে নিজের কোটের ভেতরে চালান করে দিল কর্নেল। এরপর ছোট ব্যাগটার ভেতর থেকে বের করে আনল খাপসহ একটা ইংলিশ ড্যাগার। জিনিসটা বের করে খাপমুক্ত করতেই ব্রিটিশ স্টিল ঝিকমিক করে উঠল। মৃদু হাসি ফুটে উঠল

সিপাহী

কর্নেলের চোখে। কর্নেলের ছুরিখীড়ির কারণে বহু বছর আগে জেনি তাকে ইংল্যান্ড থেকে বানিয়ে এনে উপহার দিয়েছিল জন্মদিনের সময়ে। ওটাতে এখনো খোদাই করে লেখা কথাটা একইরকম রয়ে গেছে, 'For Your Passion', সাদা ইম্পাতের তেতরে খোদাই করে কালো কালি দিয়ে লেখাটার হাজারো স্মৃতি ফিরিয়ে আনা চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ড্যাগারটাকে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে হাতের এপিঠ-ওপিঠ করে কয়েকবার ঘুরিয়ে আবারো হেসে উঠল কর্নেল, বহু বছরের ব্যবধানের ছুরি এবং তার দক্ষতা কোনোটাতেই মরচে পড়েনি। ছুরিটাকে খাপে ভরে কোমরবন্ধনীর ডান পাশে আটকে দিয়ে পাইপ ধরাল কর্নেল।

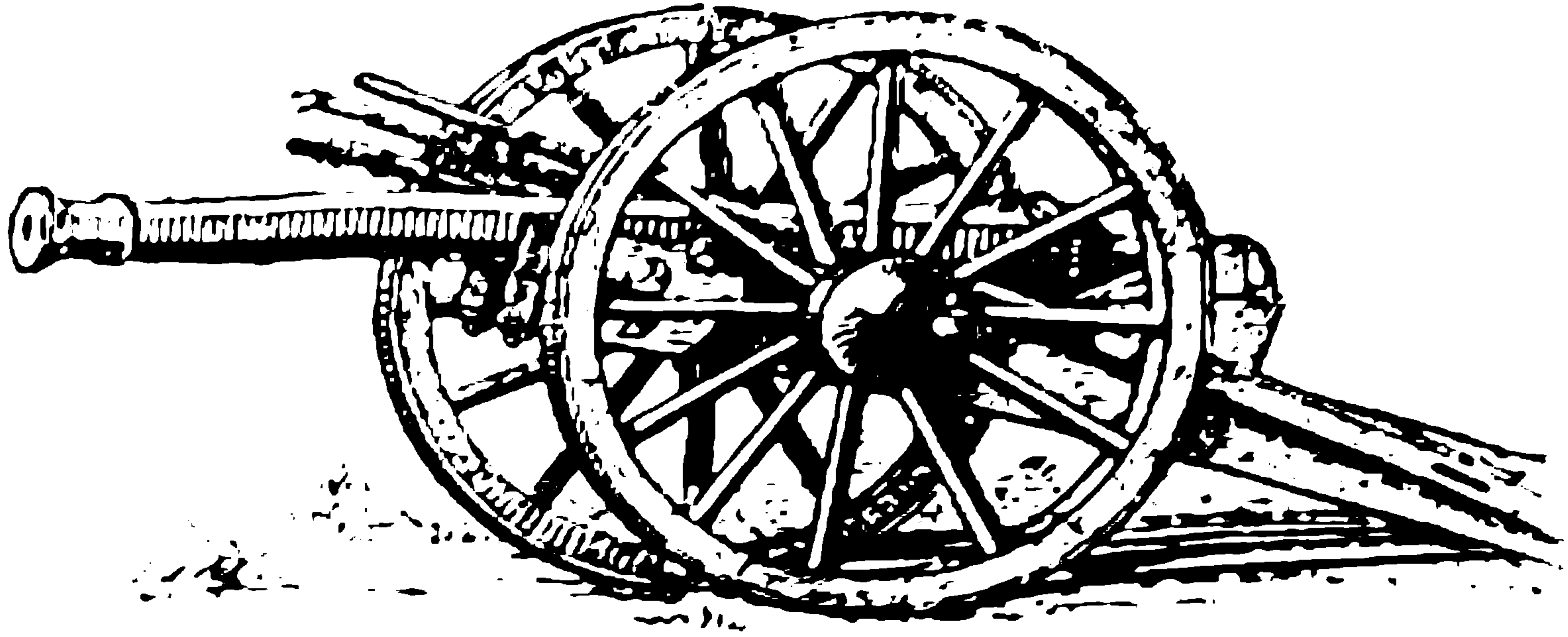
ধোঁয়া টানতে টানতে নিজের ভাবনায় ফিরে গেল সে। এই সফরটা তার হওয়ার কথা ছিল না। এই মুহূর্তে তার নিজের স্টাডিতে বসে শেরির গ্রাসে চুমুক দিতে দিতে শারীরিক কসরত আর মনঃসংযোগের ওপরে লেখা বইটা পরিপূর্ণ করার কথা ছিল। কিন্তু সেটা না করে সে এখন এই ছোট্ট জাহাজে করে আরব সাগর পাড়ি দিয়ে বোম্বের ছোট একটা বন্দরে পৌঁছাবার অপেক্ষা করছে। তার এই যাত্রা অনিশ্চিত, কিন্তু বন্দরে নামার পর যা অপেক্ষা করছে সেটা আরো আরো অনিশ্চিত।

পাইপে টান দিতে দিতে কর্নেল নিজেকে আবারো প্রশ্ন করল, নিজের কাছে নিজের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, এই কষ্ট এবং মৃত্যুর নিয়ে খেলা এটার কি আদৌ প্রয়োজন ছিল, এর আদতে সত্যিকার কোনো মূল্য রয়েছে?

নিজের ভেতর থেকে সে পরিষ্কার শুনতে পেল, অবশ্যই এর মূল্য রয়েছে। মর্তের এই পৃথিবীতে কর্নেলের তেমন কোনো আপন মানুষ আর অবশিষ্ট নেই। কাজেই বন্ধু ভিক্টরের জন্যে সে সব করতে পারে।

নিজের কাছে সে নিজে পরিষ্কার, কাজেই এবার কাজে নামতে আর কোনো সমস্যা নেই। মৃদু হাসি মুখে আবার সে পাইপে টান দিতে যাবে, তার আগেই তার কেবিনের দরজায় মৃদু শব্দ হলো।





অধ্যায় বারো বর্তমান সময় এয়ারপোর্ট রোড, লাক্ষাতুরা, সিলেট

‘স্যার, আমরা কি ঠিক রাস্তায় আছি?’ ড্রাইভারের প্রশ্ন শুনে চোখ কপালে তুলল মেজর করিম। ‘জামাল, তুমি এমন প্রশ্ন করলে হবে?’ মেজর করিম জামালের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল, এই প্রথম কোনো মিশনের প্রয়োজনে জামালকেও পুরোদস্তুর কমান্ডো পোশাক পরানো হয়েছে এবং কমান্ডো পোশাকে জামালকে দেখতে লাগছে খুবই অদ্ভুত।

‘না, মানে স্যার, এদিক দিয়া কোনোসুমে আসি নাই তো,’ জামালের জবাব শুনে খানিক জোরেই হেসে উঠল মেজর করিম। ‘সমস্যা নেই, ঠিক পথেই আছো, সামনে চেকপোস্ট পড়ার কথা। ওটা পার হলেই রানওয়েটা দেখতে পাবে, ওটাতেই ছোট একটা প্রেন অপেক্ষা করছে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য।’ মেজর করিমের কথা শুনে মাথা নেড়ে সায় জানাল জামাল। সামনের গাড়িটা সামান্য স্লো হয়ে যেতেই কারণ জানতে চাইল মেজর করিম। সামনে থেকে জানাল, সামনেই চেকপোস্ট। গাড়িগুলো একাধিক স্পিডব্রেকার পেরিয়ে তুলনামূলক ধীর গতিতে চেকপোস্টের দিকে এগিয়ে চলল। মেজর করিম পুরো এলাকার ম্যাপটা মনে করার চেষ্টা করছে। জামাল যে এলাকাটা চিনতে পারেনি ঠিকমতো, সেটার যথাযোগ্য কারণ আছে। ওরা এয়ারপোর্টে এলেও মূল এয়ারপোর্ট এলাকা পার হয়ে অনেকটা এয়ারপোর্টের পেছন দিকের একটা পরিত্যক্ত এয়ারফিল্ডের দিকে চলেছে, যেখানে আলাদাভাবে বন্দিকে নিয়ে প্রেনে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

‘স্যার, চেকপোস্টে তো কেউ নেই!’ টকিতে সামনের জিপের থেকে ভেসে কথাটা শুনে ড্র কুঁচকে উঠল মেজর করিমের। সে কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই আবারো বলে উঠল সামনের জিপের অফিসার, ‘স্যার, চেকপোস্টের ব্যারিকেডও আটকানো,’ দ্বিতীয় কথাটা শুনে মেজর করিমের কোঁচকানো ড্র আরো কুঁচকে উঠল। সে যদি সঠিকভাবে বুঝে থাকে, তবে এর অর্থ সামনের রাস্তা বন্ধ।

সিপাহী

এয়ারপোর্ট অথরিটির সঙ্গে কি তার যোগাযোগ করা উচিত, কথাটা ভাবতে ভাবতে সে সব গাড়িকে থামার নির্দেশ দিতেই তিনটে গাড়িরই ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল একযোগে, নির্জন জায়গাটা আরো নির্জন হয়ে গেল মুহূর্তের ভেতরেই। ড্যানের ড্রাইভারের পাশের সিটের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো মেজর করিম। সে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে। এই সময়ে এই পরিত্যক্ত এয়ারফিল্ডে আসলে কারো থাকার কথা নয়। স্রেফ বিশেষ প্রয়োজনে এখানে আজকের এই আয়োজন করা হয়েছে, হাই ভোল্টেজ বন্দি এসকর্ট করার জন্য। ওদের কি টাইমে গুগুগোল হয়ে গেল কোনোভাবে। নাহ, সময় তো ঠিকই আছে। বরং ওরা একটু আগে চলে এসেছে এই কারণেই কি তাদের রিসিভিং পার্টি এখনো এসে পৌঁছায়নি?

মেজর করিম নেমে আসতেই আরো কয়েকজন অফিসার এগিয়ে এলো তার দিকে, মেজর করিম মনোযোগ দিয়ে রাস্তাটা দেখছে। ছোট একটা চেকপোস্ট, ওটার সামনের বেরিকেডটা নামানো। এর ওপাশে চাঁদের আলোয় এয়ারফিল্ডের ভেতরে ছোট প্লেনটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। তারমানে ওদের লোকেশন এবং টাইম ঠিকই আছে। মেজর করিম হঠাৎ একটা জিনিস দেখে চমকে উঠল। যেখানে চেকপোস্টটা বসানো এর খানিকটা দূরে একটা পরিত্যক্ত চেকপোস্ট। এই চেকপোস্ট নতুন বসানো হয়েছে, এমনকি ব্যারিকেডটাও। এটা বসানোই হয়েছে যাতে ওদের এখানে থামাতে পারে। কারণ কী—পেছনে তাকাতেই সে কিছু একটা অনুধাবন করে চিৎকার করে উঠল। ‘অ্যামবুশ, এটা একটা অ্যামবুশ,’ বলেই সে গাড়ির দিকে দৌড় দিল।

সঙ্গে সঙ্গেই সে দেখল ওদের শেষ গাড়িটার পেছনে একটা ট্রাক ঝোপের ভেতর থেকে রাস্তায় উঠে এলো, এবার সে বুঝতে পারল কেন ওদের এখানে থামানোর প্রয়োজন পড়েছিল, যাতে আটকাতে পারে। গাড়ির দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে সে বুঝতে পারল ওরা আটকা পড়ে গেছে। সামনে ব্যারিকেড, পেছনে ট্রাক। চিৎকার করে টকিতে নির্দেশ দিতে দিতে সে গাড়ির দরজাটা খুলে ফেলল, কিন্তু ওটাতে ওটার আগেই তীব্র আঘাতের চোটে ছিটকে পড়ল সে। আধো অন্ধকারের ভেতরে দেখতে পেল একাধিক ছায়ামূর্তি ড্যানের দরজায় ছোট একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওটা খুলে ভেতরে ছুড়ে দিল স্মোক বম্ব। একটু পরেই টেনে বাইরে বের করে নিয়ে এলো বন্দিকে।

বর্তমান সময়

পতেঙ্গা রোড, চট্টগ্রাম

স্বাভাবিক নিয়মে চেকপোস্টে চেক করার পর তাদের সামনের দিকে এগিয়ে একেবারে এয়ারফিল্ডে গিয়ে থামার কথা, কিন্তু সেটা না হয়ে গাড়ি যখন চালু হয়েও আবার থেমে

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

গেল, তখনই খানিক সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল মেজর কায়সারের মনে, আর ধূপ করে শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন পুরো ভ্যানটা কেঁপে উঠল, তার আর বুঝতে বাকি রইল না আসলে কী হতে যাচ্ছে। আক্রমণ হয়েছে তাদের ওপরে। এমনটা হতে পারে অজানা ছিল না তার, এরকম পরিস্থিতিতে পড়াটাও তার জন্য নতুন কিছু নয়। কিন্তু তার পরও যখন আক্রমণটা হলো মুহূর্তের জন্য যেন খেই হারিয়ে ফেলল সে, তবে তার ট্রেনিং পাওয়া মস্তিষ্ক কাজ শুরু করল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

প্রথমেই সে টকিতে কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হলো না। কারণ এ-ধরনের আক্রমণের প্রথম শর্তই হলো আক্রমণের ভিক্তিমদের অন্যদের থেকে আলাদা করে ফেলা। আর সেটা করতে হলে, প্রথমেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হয়। যদিও খুব দ্রুত ঘটছে সব, তাও কায়সার অনুমান করল আক্রমণকারীরা কোন ধরনের জ্যামার ব্যবহার করছে, সব ধরনের কমিউনিকেশন ডিভাইস অকেজো করে দেওয়ার জন্য। যখন বুঝতে পারল ডিভাইসে কাজ হবে না, সে ড্রাইভারের মাথার পাশের ছোট প্যানেলটা খুলে ফেলল কিন্তু সেখান দিয়ে ডেকেও কোনো সাড়া পেল না। বরং ছোট প্যানেলটা খুলতেই ওদিকে দিয়ে ঝাঁজালো ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করতেই ওটাকে লাগিয়ে দিয়ে নিজের দুই সঙ্গীর দিকে ফিরে তাকাল মেজর কায়সার।

নিজের অস্ত্র বাগিয়ে ধরে দুই সঙ্গীকে বলল বন্দির দুই পাশে থেকে তাকে আগলে রাখতে। আর নিজে এগিয়ে গেল ভ্যানের দরজাটার দিকে। দরজার প্রায় কাছাকাছি চলে গেছে এমন সময় বুম করে বিস্ফোরিত হলো দরজাটা, দরজার কাছাকাছি চলে যাওয়া মেজর কায়সার বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল নিজের অপর এক সঙ্গীর গায়ের ওপরে। হাতের ছুটে যাওয়া অস্ত্রটা ধরে কোনোমতে হাতে ধরে উঠে বসার চেষ্টা করছে, এমন সময় একটা স্মোক বম্ব উড়ে এসে পড়ল ভ্যানের ভেতরে। চোখে-মুখে অন্ধকার দেখলেও কাশতে কাশতে নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে, সেই সঙ্গে দুই সঙ্গীকে সাবধান করার চেষ্টা করছে হঠাৎ তার মনে হলো, বুকের ওপরে কেউ চোখা কিছু দিয়ে গুঁতো মেরেছে। তীব্র ব্যথার চোটে মেজর কায়সারের দম বন্ধ হয়ে আসছে। আসলে সাইলেন্সার লাগানো অস্ত্র দিয়ে কেউ তার বুকের ভেস্টের ওপরে গুলি করেছে। বুলেটপ্রুফ ভেস্টের ওপরে গুলি লাগাতে ওটা ভেদ না করলেও তীব্র ব্যথায় আধবসা থেকে ছিটকে পড়ল কায়সার।

আবছা ধোঁয়াটে অন্ধকারের ভেতরে দেখতে পেল একাধিক ছায়ামূর্তি উঠে এসে ভ্যানের ভেতরে বসে থাকা বন্দির টেনে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভ্যান থেকে।

অতীত

‘স্যার,’ ক্যাপ্টেনকে প্রায় মিলিটারি কায়দায় স্যালুট ঠুকতে দেখে মৃদু হেসে উঠল কর্নেল, একে তো বহু বছরের অনভ্যস্ততা, তার ওপরে সে এখন মিলিটারির কেউ নয়।

সিপাহী

কাজেই তাকে আসলে এভাবে সালাম দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তা-ও সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে ক্যান্টেনের স্যালুটের জবাব দিয়ে বলে উঠল, 'ক্যান্টেন, আমাকে এভাবে স্যালুট দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি তো আর মিলিটারির কেউ নই।'

তার কথায় ক্যান্টেনও হেসে উঠল। 'স্যার, এটা আমার কর্তব্য। আর আপনার কথা এত বেশি ভনেছি, আপনাকে শ্রদ্ধা জানানোটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আর কিছুদিন ধরে আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে আমি আপনার ভক্ত হয়ে গেছি বলতে পারেন।'

কর্নেল মাথা নেড়ে সামান্য সম্মান জানিয়ে জানতে চাইল, 'পরিস্থিতি কি?

কর্নেল তার কাজ সেরে পাইপ টানতে টানতে নিজের ভাবনার জগতে অবসাহন করছিল, এমন সময় দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দে সে ফিরে তাকাতেই লঙ্কর ছেলেটা জানায়, তারা যাত্রার শেষদিকে চলে এসেছে প্রায়, কর্নেল কি প্রস্তুত আছে? যদি থাকে তবে ক্যান্টেনের সঙ্গে দেখা করতে যেতে অনুরোধ করেছে। কর্নেল পাইপ টানা শেষ করে লঙ্কর ছেলেটার সঙ্গে রওনা দেয় ক্যান্টেনের সঙ্গে দেখা করার জন্য। বিগত সময়ের এই জাহাজের যাত্রায় জাহাজে যাত্রী ছিল খুবই কম। মূলত যাত্রীবাহী এই জাহাজটাকে বোম্বোতে পাঠানো হচ্ছে বেশকিছু ইংরেজ কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারকে ইংল্যান্ডে ফেরত নিয়ে আসার জন্য। আর এখন চাইলেও আসলে ভারতে যাওয়ার মতো কেউ নেই। সবাই কোনোভাবে চলে আসার প্যারতারা করছে। বিশেষ করে নিয়ে আসতে চাচ্ছে তাদের পরিবারকে।

'স্যার, আমরা বোম্বে বন্দরের কাছাকাছি চলে এসেছি। পোতাশ্রয়ের কাছাকাছি গিয়ে জাহাজ থামিয়ে আমরা নৌকা নামাব। আমাদের এখন থেকে পাঁচটা নৌকা যাবে বন্দরের দিকে। দুটো নৌকায় জিনিসপত্র যাবে, আর বাকিগুলোতে আমাদের সঙ্গে আসা কয়েকজন মিলিটারি পারসোনাল এবং আপনি থাকবেন,' বলে ক্যান্টেন সামান্য থামল। 'স্যার, বারাপ খবর হলো, আমাদের কাছে সংবাদ আছে বোম্বে শহর এবং বন্দরের পরিস্থিতি খুবই বারাপ। বিদ্রোহী সৈনিকরা পুরো শহরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করছে, আর আমাদের মিলিটারির সঙ্গে তাদের রীতিমতো যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে পুরো বোম্বে শহরে। বন্দরের সব নিয়মনীতি ভেঙে পড়েছে। যে যেভাবে পারছে বন্দর ছেড়ে পোতাশ্রয়ে ভেড়ানো জাহাজগুলোতে ওঠার চেষ্টা করছে। কাজেই আমার ধারণা যদি ভুল না হয়, তবে আপনাদের বন্দরে অবতরণ সহজভাবে হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।'

'সমস্যা নেই ক্যান্টেন,' বলে কর্নেল মাথা নাড়ল। 'আমি সামলে নেব।'

'ভুড় লাক স্যার, অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যান অনার,' বলে ক্যান্টেন আবার স্যালুট চুপেই তার স্যালুটের জবাব দিয়ে কর্নেল স্যাভার্স লঙ্কর ছেলেটার পেছন পেছন রওনা দিল জাহাজের ডেকের দিকে।

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

ডেকের ওপরে উঠে আসতেই কর্নেল অনুভব করল ঠুঁড়ি ঠুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। এর ভেতর দিয়ে আবছা আলোকোজ্জ্বল বোম্বে শহরের দিকে দৃষ্টি গেল তার। একরাশ আবেগ আর ভালোবাসা আর স্মৃতির বেগ উঠে আসার কথা ছিল তার ভারতবর্ষের ফেলে আসা মাটির দিকে ফিরে তাকিয়ে। কিন্তু কর্নেলের সেরকম কিছুই হলো না, বরং আলোকোজ্জ্বল বোম্বের দিকে তাকিয়েই সে অনুধাবন করতে লাগল এই আলো আসলে অন্য কিছু না, বোম্বে শহরে আগুন জ্বলছে। ভারতবর্ষ আক্ষরিক অর্থেই জ্বলছে, মনে মনে বলে উঠল কর্নেল।

বর্তমান সময়

সিলেট এয়ারপোর্ট এলাকা

মেজর করিম, অন্ধকারের ভেতরে কোণঠাসা অবস্থাতেও তাদের শত্রুপক্ষের লোকজনের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল এরা সবাই প্রফেশনাল। অনেকটা বলতে গেলে সে যেন তার স্পেশাল কমান্ডো টিমের প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছে দলটার ভেতরে। এমনকি লোকগুলোর পোশাক এবং নড়াচড়াও তার দলের লোকদের মতোই। লোকগুলো আগে থেকেই পুরো এলাকাটা রেকি করার পর প্রস্তুত হয়ে ছিল। কোনো না কোনোভাবে তারা গুদের রিসিভ করার দলটাকে আগে কাবু করেছে তারপর এমনভাবে ফাঁদ সাজিয়ে রেখেছে যাতে করে ওরা সোজা এসে পড়ে এই ফাঁদের ভেতরে। আর হয়েছেও তাই। গুদের প্রথমে আটকে দিয়েছে তারপর আক্রমণের মুখে কাবু করে বন্দিকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একেবারেই অস্বাভাবিক এবং সাজানো সুগঠিত একটা আক্রমণ।

লোকগুলো বন্দিকে নিয়ে ভ্যান থেকে বের করে এনেই তাকে ঘিরে ফেলল তারপর চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে একটা বৃত্তের মতো সাজিয়ে ফেলল, এরপর এই মানব বৃত্তটা দ্রুত বেড়ে এগিয়ে চলল রানওয়েতে ল্যান্ড করে রাখা প্রেনটার দিকে। ছোট প্রেনটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে প্রায় প্রেনের কাছাকাছি চলে গেছে এমন সময় থেমে গেল দলটা। দলের প্রধান প্রেনটার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো সব পরীক্ষা করে নিচ্ছে। কাজ সেরে সে চলে এলো বন্দির কাছে, প্রথমেই বিশেষ কাটার দিয়ে কেটে দিল বন্দির হাতের এবং পায়ের বেড়ি, এরপর একটানে খুলে ফেলল বন্দির মুখের ওপরে রাখা আলগা কাপটা, তারপর আলো ফেলেই সে চমকে উঠল। যাকে আশা করছিল সে নয়, বরং মুখে লাগানো মাস্কের আড়ালে মৃদু হাসতে থাকা একজন তরুণের মুখ দেখতে পেল সে।

সিপাহী

সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মতো আক্রমণ শুরু হলো দলটার ওপরে। যে-প্রক্রিয়াতে তারা মেজর করিমের দলটাকে কাবু করেছিল, একই গুণ দেওয়া হলো তাদেরও। প্রথমেই উড়ে এলো একটা শোক বোম্ব এবং একই সঙ্গে একটা স্টান গ্রেনেড।

মেজর করিমরা ঠিক যেমন অভিজ্ঞ, তাদের আক্রমণকারী দলটাও একই রকম অভিজ্ঞ আর দক্ষ। কিন্তু ঘটনার পরিক্রমায় তারা এমনই চমকে গেছে যে করণীয় ঠিক করার আগেই মুহূর্মুহ আক্রমণে দিশেহারা হয়ে উঠল তারা। বিশেষ করে স্টান গ্রেনেডটা উড়ে আসতেই সবার আগে সচকিত হয়ে উঠল, তারা যাকে নিজেকে লোক মনে করে উদ্ধার করতে এসেছিল সেই মুখোশ পরা অভিনেতা কমান্ডো। গ্রেনেড উড়ে আসতেই সে প্রথমে নিজের দুই কান ঢেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মাটিতে।

বাকি দলটা স্টান গ্রেনেডের আক্রমণের শিকার হলো পুরোপুরি। তীব্র শব্দে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হতেই অনেকেই কান চেপে বসে পড়ল মাটিতে, আর না হয় শব্দের তীব্রতায় খেই হারিয়ে ফেলল। প্রথমত ঘটনার পরিক্রমা, তার ওপরে স্টান গ্রেনেডের তীব্রতায় খেই হারানো দলটার ওপরে তীব্র আক্রমণ চালানো হলো দুদিক থেকে। মেজর করিমের দলে যারা পিছিয়ে গিয়েছিল, প্রথমত তারা, তার ওপরে ব্যাকআপ টিম, দুদিক থেকে আক্রমণ চালানোর পরও খানিক খণ্ডযুদ্ধ চলল দুই দলের মাঝে কিন্তু দলনেতা বাদে আর তেমন কেউই খুব একটা প্রতিরোধ করতে পারল না। পরবর্তী দশ মিনিটের ভেতরেই ঘিরে ফেলা আক্রমণকারী দলটার আহত দু-চারজনসহ প্রায় সবাইকে বন্দি করা হলো।

মেজর করিম এগিয়ে এসে বন্দি হয়ে থাকা দলটার সামনে দাঁড়িয়ে অন্যদের ইশারা করে টকিতে রিপোর্ট করতে শুরু করল। রিপোর্ট করা শেষ করে সে আপনাতাই একবার রাতের আঁধারের দিকে তাকাল। তাদের পরিকল্পনা সফল হয়েছে। কায়সারদের কী অবস্থা কে জানে।

চটখাম

বন্দিকে যখন টেনে ড্যান থেকে টেনে নামিয়ে নেওয়া হচ্ছিল, মেজর কায়সার এবং তার দল মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করেও পুরোপুরি সফল হয়ে উঠতে পারল না। বোমার আঘাত এবং সেই কোর্সে উড়ে গিয়ে পড়া মেজর কায়সারের জন্য বিরল কিছু না, এই অভিজ্ঞতা তার আগেও হয়েছে। এর আগের অভিজ্ঞতাগুলো বরং বেশি ক্রটাল এবং ডায়ালেন্ট। বরং একভাবে বলতে গেলে আজকে সে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। তার পরও বোমার আঘাত এমন এক বিষয় যা প্রতিবার

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

নতুনভাবে মানুষকে আহত করে, প্রতিবার নতুন নতুন চমক নিয়ে হিংস্র ভঙ্গিতে ঝাপিয়ে পড়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, কখনো দেহ, কখনো মন আবার কখনো পরিষ্কৃতিকে। আজও তার ব্যতিক্রম নয়।

ভ্যানের দরজাটার দিয়ে এগিয়ে যেতেই ছোট কিন্তু শক্তিশালী বোমার আঘাতে শুধু ভ্যানের দরজাটাই খুলে গেল না, বরং বলা যায় মেজর কায়সার আঘাতের চোটে প্রায় উড়ে গিয়ে ভ্যানের একপাশের সিটে বসে থাকা আরেক অফিসারের গায়ের ওপরে গিয়ে পড়ল। দুজনেই একসঙ্গে গড়িয়ে পড়ে গেল ভ্যানের মেঝেতে। ওরা পড়ে যেতেই হেলে পড়া দরজাটা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল দুজন, আরেকজন দরজায় দাঁড়িয়ে কভার করছে তাদের। তিনজনেই প্রফেশনাল, সতর্ক এবং দক্ষ, এমনকি ওদের পোশাকও দেখতে অনেকটা মেজর কায়সারের দলের মতোই।

আধো ধোঁয়াটে অন্ধকারের ভেতরে দুই ছায়ামূর্তি ওদের বন্দিকে নিয়ে নেমে যেতেই ভ্যানের মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল মেজর কায়সার, একহাতে টেনে তুলল তার অন্য সঙ্গীকে। সঙ্গে সঙ্গে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল নিজের সঙ্গীকে মার্কের ভেতরে দাঁত বের করে হাসতে দেখে। এক হাত তুলে বুকের ওপরে দুইবার ঘুসি মেরে সে দাঁত না কেলিয়ে কাজে মনোযোগ দিতে বলল।

নিজের অস্ত্র বাগিয়ে ভ্যান থেকে মাটিতে লাফিয়ে নামতেই দেখল বাইরে প্রায় নরক গুলোজার চলছে। আক্রমণকারী দলটা প্রথমে ওদের দলের ওপরে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়েছে, তারপর মোটামুটি কোণঠাসা করেই বন্দিকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়েছে, তারপর ওদের একেবারে কোণঠাসা করে বন্দিকে নিয়ে এই মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে রানওয়ের দিকে।

মাটিতে নেমে নিজের দলের কোণঠাসা অবস্থা দেখে তারও দাঁত বেরিয়ে পড়ল। সবকিছু পরিকল্পনা মাফিকই চলছে। তার দলটা তখনো নিজেদের গুলিয়ে আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা করে খানিক আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করছে এমন সময়, ভ্যান থেকে বেরিয়ে বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা গুলি থেকে আড়াল নিয়ে সে একটা হাত তুলে সিগন্যাল দিল। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটল।

প্রথমত, তার দলের লোকে টুকটাক যা গুলি করছে সেগুলো থেমে গেল। গুলি থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিচিত্র একটা কাজ করল আক্রমণকারী দলটার সঙ্গে থাকা বন্দি। তাকে নিয়ে দ্রুতবেগে ছোট বিমানটার দিকে এগোচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ বন্দি গা ছাড়া দিয়ে উলটোদিকে দৌড়াতে শুরু করল। আক্রমণকারী দলটা ক্ষণিকের জন্য বুঝতে পারল না, আসলে হচ্ছেটা কি। নিজেদের সামলানোর আগেই রানওয়ের অন্যদিক থেকে উড়ে এলো একটা ফ্ল্যাশ গ্রেনেড। কেউই

সিপাহী

নিজ্জদের সামনে নিতে পারার আগেই প্রায় অন্ধ হয়ে গেল ফ্ল্যাশ গ্রেনেডের তীব্র আলোয়। এমনকি মাঝ পরে ছিল যারা, তারাও বাঁচতে পারল না। অনেকেই চোখ চেপে ধরে বসে পড়ল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে একটা গ্যার্নিং ভেসে এলো, এর পরও যারা অস্ত্র তুলেছিল পায়ে গুলি করে নিষ্ক্রিয় করা হলো তাদের।

ঠিকভাবে কিছু বুঝে ওঠার আগেই হতভম্ব এবং নিষ্ক্রিয় দলটাকে গ্রেপ্তার করা হলো।

বর্তমান সময়

তেজগাঁও, বিশেষ এয়ারপোর্ট এলাকা

‘তারমানে আসলে মেজর কায়সার আর মেজর করিম আসলে জেড মাস্টার কিংবা মিস্টার ইউকে আসলে ট্রান্সপোর্ট করছিলই না,’ তেজগাঁও এয়ারপোর্টের টারমাকে এসে গাড়িগুলো খেমে যেতেই অনেকটা আনমনেই বলে উঠল ইনসপেক্টর আহমেদ বাশার। ‘এরমানে পুরোটাই ছিল ফাঁদ, কিন্তু কেন?’ সে খানিক ঝাঁজের সঙ্গেই জানতে চাইল। ‘এত আয়োজন করে একা লোকবল ক্ষয় করে এই ফাঁদের কোনো অর্থই তো দেখতে পাচ্ছি না আমি,’ ইনসপেক্টর বাশার একবার সামনে বসা আনোয়ার পাশার দিকে দেখল তারপর আরেকবার দেখল পাশে বসা সামিরা আর মৌসুমির দিকে।

ওরা কিছু বলার আগেই সামনে থেকে আনোয়ার পাশা কথা বলে উঠল, তার একহাতে ধরা পাইপ। সেটাতে তামাক বা আগুন কোনোটাই নেই যদিও। ‘ইনসপেক্টর বাশার পুরনো একটা মিশরীয় প্রবাদ আছে, কি জানো?’ বলে সে পেছনে ফিরে তাকাল বাশারের দিকে। ‘তুমি যদি শয়তানের সঙ্গে একপায়ে খেতে চাও তবে তোমার হাতেও থাকতে হবে লম্বা একটা চামচ। এর মানে কী জানো। প্রতিপক্ষ যেমন খেলতে হবে সেভাবেই। তোমার হয়তো মনে হতে পারে এই বৃথা আয়োজনের অর্থ আসলে কি? এত লোকবল এবং অর্থক্ষয়। নিজের সেরা অফিসারদের ঝুঁকিতে ফেলা, আসলে কীসের জন্য। কিন্তু এর প্রয়োজন আছে।’

‘আসলে আমরা এই আয়োজনটা করেছিলাম বেশ কয়েকটা বিষয়কে মাথায় রেখে। প্রথমত, আমরা জানি রেলিক এবং নেত্রপলিস কীভাবে কাজ করে। কাজেই সেই থেকে আমরা এটাও জানতাম, আমাদের ভেতরে ওদের লোক আছে। অবশ্যই আছে। কিন্তু আদৌ সেটা কতটা সত্য এবং কতটা গভীরে সেটা নিশ্চিত বলা যাচ্ছিল না। এই অপারেশনের আগে আমরা ঢাক ওড়ুড় করেও সিলেট থেকে জেড মাস্টার এবং চট্টগ্রাম থেকে মিস্টার ইউকে ঢাকায় আনা হবে কমান্ডোদের

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

প্রটেকশনে এটা আমরা ডিপার্টমেন্টের ভেতরে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। ফলাফল তো দেখতেই পাচ্ছে।’

‘আর অন্যটা?’ বাশার জানতে চাইল। ‘মানে মিস সামিরা বললেন এই অপারেশনের বেশ কয়েকটা উদ্দেশ্য ছিল। অন্যটা?’

‘অন্যটা নয়, অন্যগুলো,’ আবাবো হাবিব আনোয়ার কথা বলে উঠল। ‘আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল যারা ধরা পড়বে যদি সম্ভব হয় তাদের মাধ্যমে কিছু তথ্য উদ্ধার করা। যদিও ওখানে আমাদের আশা কম, তাও এক্সপ্লোর করা হবে।’

‘আর তিন নম্বর উদ্দেশ্য?’

‘ডিসট্রাকশন, আসল অপারেশন থেকে দৃষ্টি সরানো।’

‘মানে?’ বাশার খুব অবাক হয়ে জানতে চাইল।

‘মানে খুব সহজ,’ আনোয়ার পাশা নির্লিপ্ত স্বরে বলে উঠল। ‘ডক্টর মিতায়ন ওরফে জেড মাস্টারকে সিলেট থেকে ঢাকা, আর মিস্টার ইউকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আনতেই হতো, কাজেই অফিসিয়ালি আমরা দেখিয়েছি মেজর করিম আর মেজর কায়সার স্পেশাল কমান্ডো প্রটেকশনে তাদের দুজনকে নিয়ে রওনা দিয়েছে। এটা স্রেফ দেখানো হয়েছে কারণ আসল জেড মাস্টার এবং মিস্টার ইউকে নিয়ে সিলেট থেকে ছোট একটা দল এবং চট্টগ্রাম থেকে ছোট আরেকটা দল রওনা দেবে ঢাকার দিকে।’

বাশার সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল আনোয়ার পাশা পাইপে টান দিয়ে চলেছে ক্রমাগত, কিন্তু সেটাতে আগুন বা ধোঁয়া কোনোটাই নেই। ‘কীভাবে রওনা দিবে ওরা?’ বাশারের মুখ দিয়ে প্রশ্নটা আপনাতেই বেরিয়ে গেল। কিন্তু কেউ জবাব দেওয়ার আগেই তেজগাঁওয়ের বিশেষ এয়ারপোর্টের টার্মাকে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার দরজা খুলে গেল। আনোয়ার পাশা ওদের নামতে ইশারা করে নিজেও নেমে এলো।

‘প্রথম কথা,’ মৌসুমি আনোয়ার পাশার হাতে একটা ফাইল ধরিয়ে দিতেই আনোয়ার পাশা সেটাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে দিল বাশারের দিকে। ‘এই ফাইলে রিফাত অপহরণ থেকে শুরু করে, সব ডিটেইল আছে। ময়মনসিংহ যেতে যেতে তুমি এটা ভালোভাবে পড়ে ফেলবে। এরপর তুমি আর সামিরা সব ডিসকাস করে, যখন ময়মনসিংহে নামবে আমি চাই একটা সেকেন্ড সময় নষ্ট না করে কাজে নামবে। ওখানের স্পেশাল ল্যাব থেকে তোমাদের নিতে গাড়ি আসবে। সেই সঙ্গে পাটোয়ারি আর টমি তোমাদের সাহায্য করবে,’ বলে সে একবার সামিরা আর বাশারের দিকে দেখে নিল। ‘এবার তোমার প্রশ্নের জবাব, সিলেট থেকে তানভীর মালিকের টিম এবং চট্টগ্রাম থেকে শারিয়ারের টিম দুই বন্দিকে নিয়ে কখন এবং কোথা থেকে রওনা দেবে আমি এবং আমরা জানি। কারণ ওই অপারেশনের

সিপাহী

প্রাথমিক সব সিদ্ধান্ত নেব আমি। ব্যাপারটা অনেকটা এমন প্রাথমিক ঘটনার পর একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি করা হবে যাতে শত্রুরা দ্বিধায় পড়ে যায়। যদিও ওই অপারেশনের সব জ্ঞান আমি কিন্তু কোথা দিয়ে কীভাবে ওরা ঢাকায় আসবে সেটা আমরা ডিসক্রোজ করব না।

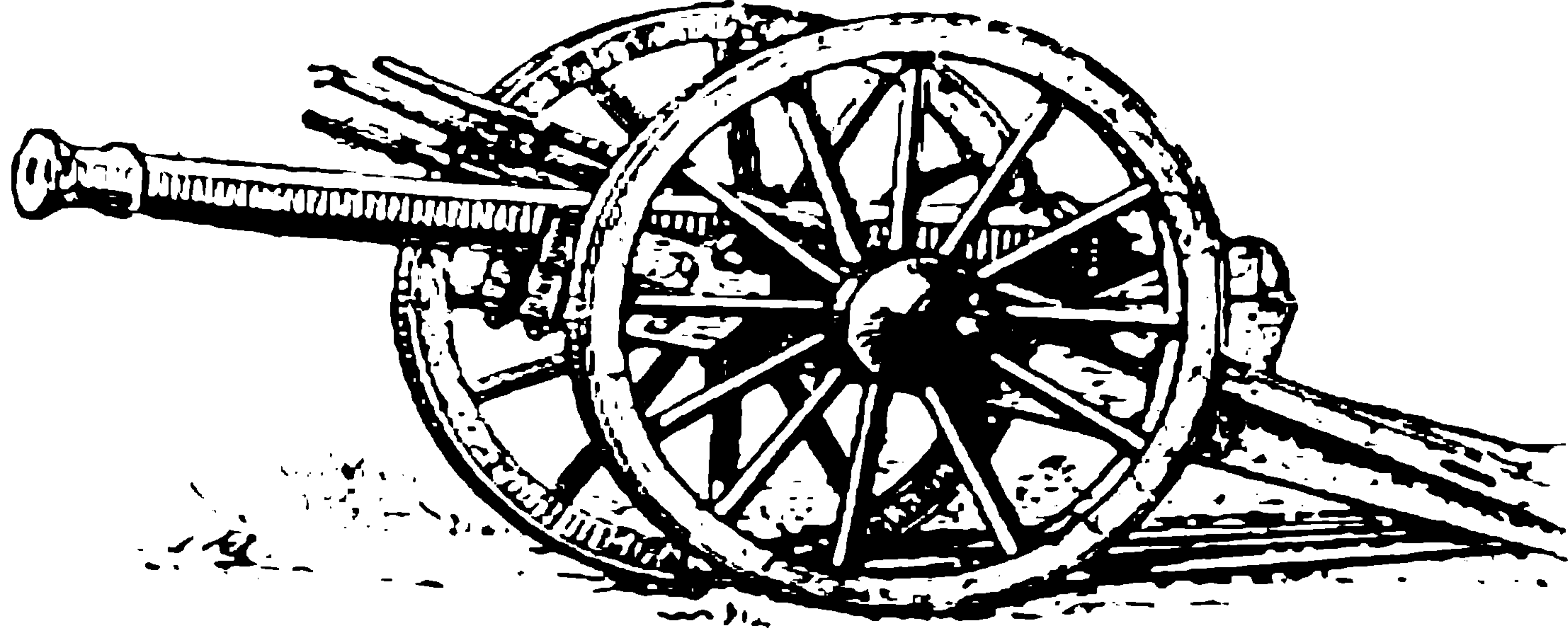
‘তাই বলে—’

ওদের নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এটা করা হয়েছে।’

‘কিন্তু এভাবে স্রেফ নিজেদের ঝুঁকিতে—’

‘আবারো বাশারকে কথা শেষ করতে দিল না আনোয়ার পাশা। ‘এবার দ্বিতীয় এবং ফাইনাল কথা। তুমি আর সামিরা ময়মনসিংহ যাচ্ছে। সামিরা অফিসিয়ালি কেসের দায়িত্বে থাকলেও মূল কাজ করবে তুমি। কারণ ওটা তোমার শহর, তুমি এর আলিগলি সব চেনো। মানুষদের বোঝো। কাজেই এই সব ঝামেলার লোড নিয়ে কেউ যদি সত্যিকার অর্থে ওখানে রিফাতের সন্ধান বের করতে পারে তবে সেটা তুমি পারবে। আর আশা করি তোমাকে বলে দিতে হবে না যে ঠিক যেভাবে সিলেটে কিংবা চট্টগ্রামে আমরা কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না, ঠিক একইভাবে ময়মনসিংহেও কাউকে বিশ্বাস করার উপায় নেই। যা করার তোমারই করতে হবে নিজে নিজেই। অথরিটির কাউকে বিশ্বাস করলেই মরবে নিশ্চিত,’ বলে সে গাড়িতে উঠে পড়ল। মৌসুমি একবার দুজনার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে ‘ওড লাক’ বলে উঠে গাড়িতে উঠতেই চলতে শুরু করল।

রাতের নির্জন ঢাকার নির্জনতম তেজগাঁও এয়ারপোর্টের ফাঁকা রাস্তায় টিপ টিপ বৃষ্টির ভেতরে ফাইল হাতে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল বাশার।



অধ্যায় তেরো

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
বোম্বে বন্দরের সায়াহ্নে

নোনা পানির ওপরে বৃষ্টি দেখে কেমন জানি বোকা বোকা অনুভব হলো কর্নেলের। জাহাজের ওপর থেকে যেটাকে গুঁড়ি গুঁড়ি মনে হচ্ছিল, সেটাই এখন বড় বড় ফোঁটায় রূপ নিয়েছে। আর এই বৃষ্টিকে কোনোভাবেই হালকা বৃষ্টি মনে করার কোনো উপায় নেই। বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টির ভেতরে নিজের ব্যাগটাকে আঁকড়ে ধরে কোনোমতে মাথা গুঁজে বসে আছে কর্নেল স্যাভার্স। ভেতরে ভেতরে সে খানিক শঙ্কিত দুটো কারণে। যদিও সে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ভালোভাবেই নিজের সঙ্গে পানিনিরোধকভাবে আটকে নিয়েছে, তাও সেগুলোর জন্য খানিক চিন্তা হচ্ছে বটে পরিস্থিতির কারণে। উপরন্তু নিজের অস্ত্রটাও এই বৃষ্টিতে ভিজে অকেজো হয়ে গেছে কোনো সন্দেহ নেই। তার ওপরে সে বন্দরের পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ চিন্তায় আছে।

একে তো বৃষ্টির পানি তার ওপরে বড় বড় ঢেউ, সবমিলিয়ে নৌকায় বসে থাকাই দায়, সেই সঙ্গে মানুষের সংখ্যাও বেশি। মাথার ওপরে পানিনিরোধক একটা পাতলা চামড়ার আবরণ দেওয়া ছিল, সেটাকে টেনে নামিয়ে এনেছে সবাই মিলে আগেই। অবশ্য তাতে ভালোই হয়েছে, কারণ সেটা না হলে ওটা এতক্ষণে বাতাসের দাপটে উড়েই যেত। এখন সেটাকে যে যেভাবে পেরেছে মাথা শরীরের ওপরে চেপে ধরে বৃষ্টি আর নোনা পানির ঝাপটা থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে। এর ভেতরেই কর্নেল চোখ তুলে দেখার চেষ্টা করল কতদূরে এসেছে ওরা।

বন্দরের দিকে তাকিয়ে আধো অন্ধকার আর বৃষ্টির ভেতরেই কালো কালো মাথা আর জ্বলন্ত আগুনের খেলা ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না কর্নেল। তীব্র বৃষ্টি আর ঢেউয়ের ভেতরে দুলতে থাকা নৌকা থেকে বন্দরের ঘাটটাকে মনে হচ্ছে পাহাড়ের মতো। এই তাগবের ভেতরেও কর্নেল হিসেব করে ধারণা করল ওরা

সিপাহী

এখনো ঘাট থেকে আশ মাইলের মতো দূরত্বে রয়েছে। কর্নেল ভেবে পেল না, ওখানে গিয়ে মাঝি নৌকাটা ভেড়াবে কীভাবে। তার ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই নৌকার সামনের অংশে দাঁড় বাইতে থাকা লোকটা চিৎকার করে কিছু একটা বলে উঠল। কিন্তু কর্নেল বুঝে ওঠার আগেই সেটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। লক্ষর ছেলেটা ওর দিকে তাকিয়ে জানানোর চেষ্টা করল মাঝি আসলে কী বলেছে, কিন্তু সেও কথা বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই আচমকাই নৌকাটা ঘুরে গেল প্রায় তিন শ ঘাট ডিগ্রির মতো। কর্নেল কোনোমতে নিজেকে সামলাতে গিয়েও বাড়ি খেল পাশেরজনের সঙ্গে। ব্যাগটাকে চেপে ধরলেও নৌকার সঙ্গে থাকা একটা দড়িও চেপে ধরতে পারল সে, যদিও মাথার ওপর থেকে পানি নিরোধক আবরণটা ছুটে গেল তাতে। একেবারে খোলা আকাশের নিচে উন্মুক্ত হতেই ঝড়ো ঝড়ো করে ভিজে গেল সে সঙ্গে সঙ্গেই। এখন জান বাঁচানো বেশি জরুরি বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার চেয়ে।

কিন্তু মাথার আবরণ পুরোপুরি সরে যেতেই যা দেখতে পেল তাতে কর্নেলের মতো পোড় খাওয়া লোকও রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। বন্দরের কিনারায় হাজারো মানুষের রীতিমতো মেলা বসেছে। অন্যপাশে আগুনের পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্নেল আরো অবাক হয়ে অনুধাবন করল বন্দরের এই তাগবের ভেতরে যেসব মানুষ অপেক্ষা করছে এদের বেশির ভাগই সাদা চামড়ার। সেই সঙ্গে এও বুঝতে পারল মাঝি আসলে কোন নৌকাটাকে ঘুরিয়ে ফেলেছে। বন্দরের যেখানে নৌকা ভেড়ানোর কথা, সেখানে অন্তত কয়েক শ মানুষ অপেক্ষা করছে কোনো একটা নৌকার জন্য। ওখানে গেলে ঠিকভাবে নামতে পারা তো দূরের কথা, নৌকাটাও বাঁচবে কি না সন্দেহ আছে। কাজেই সেখান থেকে দূরে সরে অন্যদিকে গিয়ে নৌকা ভেড়ানোর চেষ্টা করছে মাঝি। কিন্তু বিষয়টা বোকামি হয়ে গেছে। কেন বোকামি হয়েছে সেটা অনুধাবন করেই কর্নেলের গা শিউরে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বন্দরের উঁচু পাড়ের পাশের স্রোত এসে ধাক্কা মারল ছোট নৌকাটার গায়ে।

ভিজে তো গিয়েছিল আগেই এবারের ধাক্কায় পুরো নৌকা আবারো ঘুরে গেল অনেকখানি। কর্নেল চিৎকার করে মাঝিকে সাবধান করার আগেই আবারো তীব্র স্রোত আর পানির ধাক্কা আনেকটা ওপরে উঠে আবারো বাড়ি খেল নৌকার পাটাতনের সঙ্গে। নৌকাটা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে, ওটা এখন ভাসতে থাকা ঝড়কুটোর মতোই রওনা দিয়েছে বন্দরের উঁচু পারের দিকে। কর্নেল নৌকার মেঝেতে উঠে বসে দেখল তার ব্যাগটা এর মধ্যেই ভেসে গেছে পানির তোড়ে। সে আবারো দাড়টা ধরে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই আরেকটা স্রোত এসে বাড়ি মারল নৌকাটাকে আতঙ্কের সঙ্গে সে দেখল নৌকাটা অনেকখানি শূন্যে উঠে তীব্র বেগে ধেয়ে চলল উঁচু পারের দিকে। কর্নেল বোকার মতো, তাকিয়ে আছে ধেয়ে

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

আসা পারের দিকে, তাকে এক হাতে জাপটে ধরে পানিতে লাফ দিল লঙ্কর ছেলেটা।

কর্নেল কিছু বুঝে ওঠার আগেই কালচে অন্ধকার নোনা পানি গিয়ে নিল তাকে। বেশ অনেকটা নোনা পানি গিয়ে হাপুসহপুস করে পানির ওপরে উঠে এলো কর্নেল। ভারী কোট আর জুতো তাকে পাথরের মতো ভারী বানিয়ে ফেলেছে। টেনে চলেছে নিচের দিকে। এর ভেতরেই সে পারের দিকে তাকিয়ে দেখল উলটে গেছে একদিকে ভাঙা নৌকাটা। আর তার ওপরেই পার থেকে লাফিয়ে পড়ছে লোকজন। ক্ষণিকের জন্য সেদিকে তাকিয়েই আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল সে আশপাশে। যদিও পানি-অন্ধকার আর ভেসে আসা তীব্র স্রোতের কারণে না সে পারছে কিছু বুঝে উঠতে, না সে পারছে নিজেকে স্থির করতে। তার ওপরে দূর থেকে ভেসে আসা চিৎকার আর বন্দর থেকে ভেসে আসা জিনিসপত্রের ধাক্কায় জ্ঞান বাঁচানোই দায় মনে হচ্ছে কর্নেলের কাছে।

কিছুক্ষণ ভেসে থাকার চেষ্টা করতেই আবারো দম ফুরিয়ে গেল কর্নেলের। ভালোই সাঁতার জানত সে একসময়, কিন্তু একদিকে বহু বছরের অনভ্যস্ততা, অন্যদিকে ভারী কাপড় আর উত্তপ্ত সমুদ্র তাকে স্থির হতে দিচ্ছে না কিছুতেই। স্রেফ ভেসে থাকতেই খরচ হয়ে যাচ্ছে সব জীবনীশক্তি। হাত-পা নেড়ে কোনোমতে ভেসে থাকার চেষ্টা করেও বারবার দম ফুরিয়ে যাচ্ছে কর্নেলের। শরীরটাকে পানিতে ছেড়ে দিয়ে হাত-পা শিথিল করে নাকটা কোনোমতে পানির ওপরে তুলে ধরে বুক ভরে দম নেওয়ার চেষ্টা করতেই একটা ঢেউ এসে বাড়ি মারল কর্নেলের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ঝাপটা ডরা নোংরা নোনা পানি ঢুকে গেল কর্নেলের নাক-মুখ দিয়ে। শ্বাসনাশি দিয়ে পানির ঝাপটা ভেতরে ঢুকতেই সঙ্গে সঙ্গে কর্নেলের মনে হলো নাক আর বকের ভেতরে আগুন ধরে গেছে। না চাইতেও নিজের শরীরের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারাল সে। ঝট করে মাথাটা নেমে গেল পানির নিচে। ফলশ্রুতিতে আরো পানি টেনে নিল নাক আর মুখ। হাত-পা নেড়েও সে কোনোমতে পানির ওপরে ওঠার চেষ্টা করেও পারল না। কর্নেলের শরীর আসলে তার কথা শুনছে না। হাজার চেষ্টা করেও ভারী কাপড় আর শরীর নিয়ে পানির ওপরে উঠতে পারল না কর্নেল। বরং ভারী পাথরের মতোই তার শরীরটা নেমে চলল কাল অন্ধকার পানির নিচের দিকে।

বর্তমান

‘স্যার, ম্যাডাম, অল গুড?’ সামনের সিট থেকে হেলিকপ্টারের পাইলট জানতে চাইল। মৌসুমির দেয়া ফাইলগুলো চেপে ধরে সিটবেন্টটা আটকে নিয়ে ইশারায়

সিপাহী

বাশার জানান, সে ঠিক আছে। সামিরা আগেই প্রস্তুত হয়ে গেছে, সে পাইলটের দিকে তাকিয়ে ইশারা দিতেই পাইলট হেলিকপ্টার ছেড়ে দিতেই রোটরগুলো ঘুরতে শুরু করল। কিছুক্ষণের ভেতরেই ওরা উঠে এলো রাতের ঢাকার ওপরে। শূন্যে উঠে নিজের রুট ঠিক করে নিয়ে দ্রুত এগোতে লাগল হেলিকপ্টার।

বাশার এর আগে ট্রেনিং বাদে তেমন কোনো প্রয়োজনে হেলিকপ্টারে ওঠেনি। সে জানে না তুলনামূলক নতুন এই বাহন আসলে কীভাবে বা কী ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করবে তার ওপরে। কিন্তু পেটের ভেতরের গোলাপি অনুভব করে সে অনুধাবন করতে পারল অনুভূতিটা খুব একটা ভালো হবে না তার জন্য। এক হাতে ফাইল চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে সে চেপে ধরল আর্ম রেস্টটা। বমি করে সব উলটে দেয় কি না সেই ভয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল সে।

হঠাৎ হাতের ওপরে আরেকটা হাতের স্পর্শ পেয়ে চোখ মেলে দেখল সামিরা তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ও ফিরে তাকাতেই ওর হাতের ওপর থেকে হাতটা উঠিয়ে নিয়ে ওর কাঁধে দুবার শক্ত চাপড় মারল মেয়েটা। ‘প্রথমবার ফ্লাই করছেন?’ বাশার মাথা নেড়ে সায় জানাতেই সে বলে উঠল, ‘হাই অলটিটিউড ইস্যু, আমাদের কন্ট্রোলার অনেক দ্রুত মুভ করছে তাই শরীর ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না,’ বাশার ইশারায় দেখাল যেকোনো সময় উলটে দিতে পারে সে। বাশার ভেবেছিল মেয়েটা বিরক্ত হবে কিন্তু বাশারের ভঙ্গি দেখে সে হেসে উঠল। ‘দম নিন, বড় বড় করে দম নিন, ঠিক হয়ে যাবে।’

বাশার আবারো চোখ বন্ধ করে সিটে হেলান দিয়ে বড় বড় করে দম নিতে লাগল। কতক্ষণ পার হয়েছে সে-হিসেব নেই, কিন্তু এক সময় সে অনুভব করতে পারল শরীরের ওপরে সেই অস্বাভাবিক চাপটা আর নেই। পেটের ভেতরের সেই গুলোনো অনুভূতিটাও গায়েব। আবারো বড় করে দম নিয়ে চোখ খুলল সে। পাশে তাকিয়ে দেখল, সামিরা মেয়েটা ঠোঁটের ওপরে একটা সাদা রঙের বেনসন লাইট চেপে ধরে মনোযোগের সঙ্গে ফাইল দেখছে। ‘ইউ অল রাইট?’ ও ফিরে তাকাতেই কীভাবে যেন বুঝে উঠে ওর দিকে না তাকিয়েই জানতে চাইল সে।

বাশার কিছু না বলে মাথা নেড়ে সায় জানান। আসলে বেশি কথা বলে লাভ নেই রোটরের তীব্র শব্দের কারণে কথা বোঝা মুশকিল। প্রায় চিৎকার করে বললে তাহলেই বোঝা যায়। ‘কয়টা বাজে?’ বাশার জানতে চাইল। যদিও ওর নিজের কাছেই মোবাইল ও ঘড়ি দুটোই আছে, তাও সে প্রশ্নটা করল, কারণ সে আসলে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে।

সামিরা ওর দিকে তাকিয়ে নিজের হাতটা উঠিয়ে তার আপল ওয়াচে সময়টা দেখাল। ‘কতক্ষণ লাগবে আমাদের যেতে?’ এবার জেনুইনলিই সে জানতে চাইল।

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

‘নির্দিষ্ট সময় আমিও জানি না,’ সামিরা হাতের ফাইল বন্ধ করে বলে উঠল। ‘তবে রাত যথেষ্ট হয়েছে। আমার ধারণা আমরা যেতে যেতে একেবারে সকাল না হলেও প্রায় ভোরের অন্ধকারে গিয়ে পৌঁছাব আমরা।’

কেসের ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছে বাশার কিন্তু এভাবে চিৎকার করে কথোপকথন চালানো মুশকিল। ‘আমি বুঝতে পারছি আপনার এখনো অনেক প্রশ্ন আছে,’ সামিরা মৃদু হেসে বলে উঠল। ‘কিন্তু এভাবে কথা বলা মুশকিল আর আসলে আমিও সবটা জানি না,’ বলে সে সামান্য থেমে বলে উঠল। ‘এই কন্সটার আমাদের ময়মনসিংহ শহরের কেওটখালির দিকে নামিয়ে দেবে। ওখান থেকে স্পেশাল সেলের একটা গাড়ি পিক করে আমাদের নিয়ে যাবে নতুন বাজার। ওখানে গিয়ে আমরা ফ্রেশ হওয়ার হওয়ার পর পাটোয়ারি স্যার আর টিমি আমাদের ব্রিফ করে আমাদের ছোট একটা টিমের কমান্ড বুঝিয়ে দেবে। যদি সব ঠিক থাকে তবে দিন শুরু হতে হতেই আমরা কাজে নেমে যাব।’

বাশার এখনো কিছু বলল না। তার পেটের ভেতরের গুলোনো অনুভূতিটা আবারো ফিরে আসতে শুরু করেছে। এটা কি অলটিটিউডের কারণে নাকি, আসন্ন কাজের টেনশনে সে ঠিক বুঝতে পারল না। সামিরার শেষ কথাটা ওর মাথার ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে। সব ঠিক থাকলে, ওর মন বলছে কিছুই ঠিক নেই। কিছুই ঠিক থাকবে না। কারণ এটা কোনো লিনিয়ার ইনভেস্টিগেটিভ কেস নয়। এখানে অসংখ্য ভেরিয়েবল আছে। আর সবকিছুই একটার ওপরে আরেকটা নির্ভর করছে।

আর কোনোটাই ঠিকমতো কাজ করছে বলে ওর মনে হচ্ছে না। সিলেট চট্টগ্রাম, ঢাকা আর ময়মনসিংহ, বড় বড় সব ক্রাইম অর্গানাইজেশন, পুরনো কাস্ট, রিফাতের অপহরণ সবকিছুকে এক সুতোয় এনে এই কেস নিয়ে কাজ করাটা স্রেফ নারকীয় অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না ওর কাছে।

অতীত

এমনকি একটু আগের নারকীয় অভিজ্ঞতাটাও অনুভব করার মতো অবস্থায় নেই কর্নেলের শরীর কিংবা মন। খুব বিচিত্র এক অনুভূতি ভেতরে আছে সে। একদিকে মনে হচ্ছে তার শ্বাসনালি আর বুকের ভেতরে আগুন জ্বলছে, সেই সঙ্গে আবার শরীরের ভারী ভেজা পোশাকের আবরণের ভেতরে এবং বাইরে সব বরফ ঠান্ডা। অন্ধকার পানির ভেতরে ভারী পাথরের মতো তলিয়ে যেতে যেতে কর্নেলের মনে হতে লাগল, *এটাই কি তবে মৃত্যু। এটাই কি তবে শেষ!* মৃদু লয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। হাল ছেড়ে দেওয়ার লোক সে নয়, কিন্তু বিগত কিছুক্ষণের তীব্র চেষ্টায় সে এটা বুঝতে পেরেছে তার হাত-পা কিংবা শরীর কোনোটাই সে নিজের ইচ্ছেতে

সিপাহী

নড়াতে পারছে না, কাজেই যাহা ভবিষ্যৎ...কথাটা ভেবে সারার আগেই তীব্র টানের সঙ্গে কর্নেলের শরীরটা অনেকখানি ঘুরে গেল। কিছু একটা টেনে নিয়ে চলছে তাকে। কিসে টানছে কিংবা কোনদিকে টানছে, টানটা কি শুধু পানির স্রোতের নাকি অন্যকিছুর বোঝার মতো অবস্থায় নেই কর্নেল। বোঝার চেষ্টাও করল না সে। শরীর এবং মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব প্রতিক্রিয়া ঘটাতে শুরু করেছে। অবশ্য হয়ে আসছে সবকিছু।

অনন্তকাল ধরে যেন কিছু একটা টেনে নিয়ে চলছে তাকে, আচমকাই আবারো তীব্র ঝাঁকুনির সঙ্গে বাতাসে ঝাঁবি খেল তার মুখটা। ক্ষণিকের জন্য কর্নেলের মস্তিষ্ক ঠিক প্রসেস করে উঠতে পারল না, পানির নিচে বাতাস এলো কোথা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে অবিশ্বাসের সঙ্গে দেখল তার মুখটা পানির ওপরে এবং তার দুই হাতের নিচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে তীব্রভাবে তাকে ঝাঁকচ্ছে অপরিচিত একটা মানুষ।

প্রথম কয়েক সেকেন্ড কিছুই হলো না, তারপর তীব্র ঝাঁকির সঙ্গে সঙ্গে তার নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসতে লাগল নোনা পানির ধারা। বমি-কাশি-হেঁচকি আর হাঁচির সংযোগে টানা কিছুক্ষণ নোনা পানি উগড়ে গেল কর্নেল, তারপর কাশতে কাশতে বাঁকা হয়ে রইল কিছুক্ষণ। সমস্ত পানি উগড়ে দিয়ে নিজেকে খানিক স্থির করতে সমর্থ হলো সে। 'কর্নেল কর্নেল!' তাকে ধরে পাগলের মতো ঝাঁকচ্ছে অপরিচিত অল্পবয়স্ক মানুষটা, সেই সঙ্গে নিজের হিন্দি আর ইংরেজি মেশানো বিচিত্র স্বরে জানতে চাইল সে ঠিক আছে কি না।

যদিও এখনো দোদুল্যমান অবস্থা, তাও দম নিতে খানিক সুস্থির লাগল কর্নেলের। আর খানিক স্থির হতেই মস্তিষ্ক কাজ করতে শুরু করেছে তার। সঙ্গে সঙ্গে সে চিনতে পারল মাথায় পাগড়ির মতো কাপড় প্যাঁচানো ছেলেটাকে। এঁরা সেই লক্ষর ছেলেটা, যাকে জাহাজ থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল তাকে নিরাপত্তা নৌকায় করে বন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ছেলেটা বিড়বিড় করে তার খোদাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্নেলের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'হজুর, আপনি ভেবেছিলেন আপনাকে হারিয়েই ফেলেছি। পানির নিচ থেকে টেনে তুলতে পারিনি বুঝতে পারি নাই। সাঁতারাইতে পারবেন?'

'পারব,' কর্নেল পানিতে ভেসে থাকতে থাকতে এক পা দিয়ে অন্য পাগড়ি গোড়ালিতে গুঁতো দিয়ে জুতো খুলে ফেলল, তারপর একইভাবে অন্যপায়ের গায়ের কোটটাও খুলে ফেলতেই অনেকটা হালকা বোধ করল সে। এবার মতো হচ্ছে সাঁতারাতে পারবে সে। 'আমরা আছি কোথায়?'

'হজুর ওই যে ঘাট,' সে হাতের ইশারায় বহুদূরের জলন্ত আগুনের ভেতরে ঘাটটা দেখাল, ওখানেই ওদের নৌকা ভেড়ানোর কথা ছিল, এবার কর্নেল তাকিয়ে বন্দরে পারটাও দেখল সেখানে ঢেউয়ের বাড়িতে উঁচু পারের সঙ্গে ওদের নৌকাটা

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

ডুবে গিয়েছিল। ওরা সেখান থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। 'ওদিকে যাওয়ার উপায় নেই, যাব কোনদিকে আমরা?' কর্নেল চিৎকার করে জানতে চাইল।

'হুজুর, আপনি সাঁতরাইতে পারবেন?' ছেলেটা আবারো একই প্রশ্ন করল। কর্নেল মাথা নেড়ে সায় জানাতেই সে হাতের ইশারায় উঁচু পারের উলটোদিকের অন্ধকারে দেখিয়ে বলে উঠল, 'ওইদিকে আরেকটা ঘাট আছে, নিচা, আমরা ওইদিকেই যেতে হবে, কিন্তু মেলা পথ,' বলে সে দ্বিধার সঙ্গে কর্নেলের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। কর্নেল দম নিতে নিতে হাতের ইশারায় এগোতে বলল ওকে। কিন্তু ছেলেটাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে খুব একটা সন্তুষ্ট কর্নেলের অবস্থায়। 'হুজুর রাহুইন,' বলে সে বাউলি কেটে ডুব দিল পানিতে।

কর্নেল বোকার মতো তাকিয়ে আছে পানির দিকে। ছেলেটা গেল কোথায়। চলে গেল নাকি। কিন্তু সে ঠিক ভেবে ওঠার আগেই ছেলেটা ফিরে এল সঙ্গে ছোট একটা কাঠের তক্তা নিয়ে। 'হুজুর এইটা ধইরা সাঁতরাইন, আমি দেহাই দিই,' বলে সে একটানে মাথায় প্যাচানো কাপড়টা খুলে সেটার একপ্রান্ত কর্নেলের হাতে বেঁধে দিল, অপর প্রান্ত প্যাচাল তক্তার একপাশে। তারপর কর্নেলকে দেখিয়ে দিল কীভাবে বুকের নিচে তক্তাটা চেপে ধরে সাঁতরাতে হবে।

এক-দুইবার চেষ্টা করেই কর্নেল ধরে ফেলল কীভাবে করতে হবে কাজটা। ছেলেটাকে এগোতে বলে সে তক্তাটাকে বুকের নিচে চেপে ধরে সাঁতরাতে শুরু করল ছেলেটার পিছু পিছু। ছেলেটা প্রায় মাছের মতো সাঁতার কাটে, আর কর্নেলের গতি প্রায় জড়বস্তুর মতো। ছেলেটা নিজের গতি কমাতেও কর্নেল বারবার পিছিয়ে পড়তে পড়তে কোনোমতো সাঁতরে চলল। সাঁতরাতে সাঁতরাতে যখন তার মনে হতে লাগল, আর পারবে না সে, নিজের মস্তিষ্ক আর ফুসফুস বিস্ফোরিত হবে। এমন সময় পায়ের নিচে মাটি টের পেল। তাও সে পারে উঠতে পারত না, ছেলেটা উঠে গিয়ে তাকে প্রায় বস্তুর মতো টেনে নিয়ে চলল পারের দিকে। কোনোমতে পারের কাছাকাছি গিয়ে ভেজা কাদা মাটিতে বস্তুর মতোই গড়িয়ে পড়ে দম নিতে লাগল কর্নেল।

কতক্ষণ পড়ে ছিল নিজেকেও জানে না। স্রেফ মাটির স্পর্শ আর নিঃশ্বাস নিতে পারাটা যে-দুনিয়াতে কত বড় আনন্দের কাজ হতে পারে এই অবস্থায় না পড়লে কেউ বিশ্বাসও করতে পারবে না। প্রায় বেঁহুশের মতো পড়ে থেকে যখন খানিক মানুষ মনে হলো নিজেকে, উঠে বসল কর্নেল। দেখল, তার থেকে খানিক দূরে ছেলেটা নিজের ধুতি খুলে সেটাকে চিপে কোমরে পরে নিয়েছে, এখন মাথার কাপড়টা চিপে ঠিকঠাক করার চেষ্টা করছে।

সিপাহী

‘হজুর, আপনে ঠিক আছেন?’

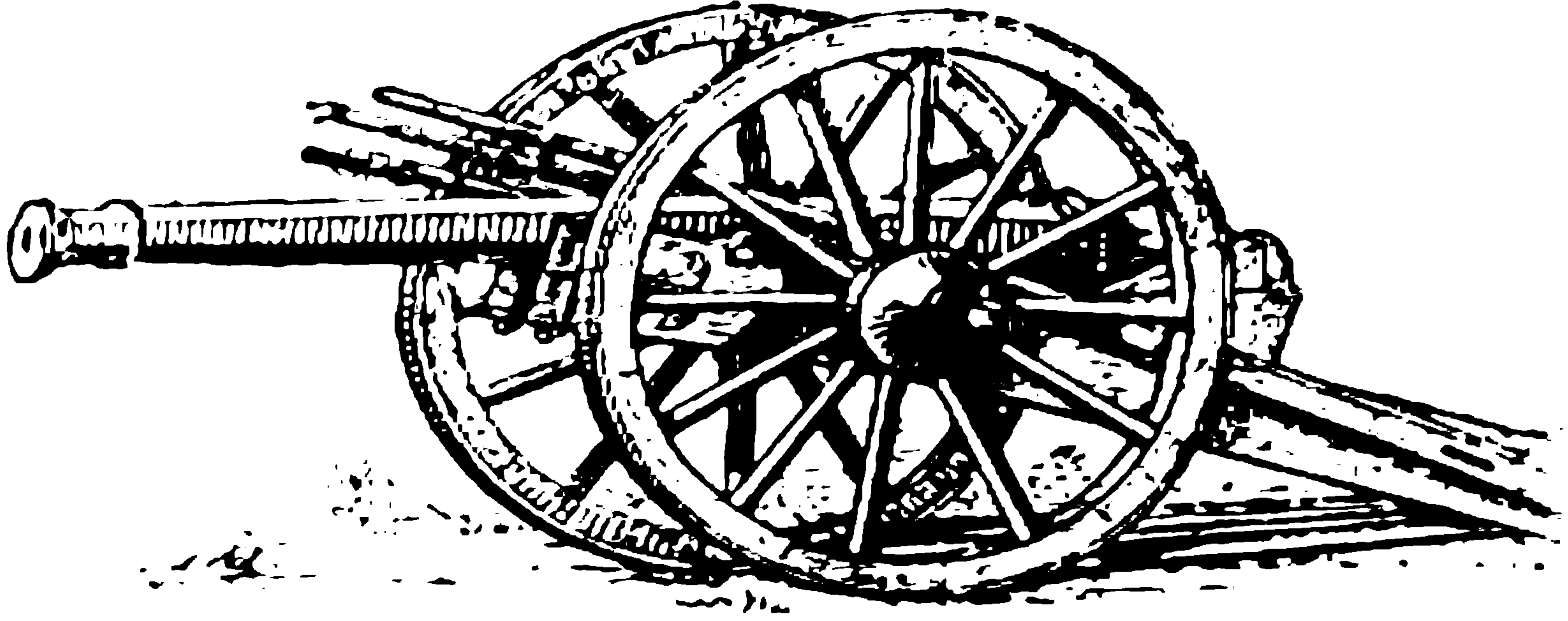
মাথা নেড়ে ছেলেটার কথায় সায় জানাতে গিয়ে কর্নেলের চোখ বাড়ান অনতিদূরে বোম্বে বন্দরের দিকে। পুরো বন্দরজুড়ে জ্বলতে থাকা গনগনে আগুন আর ধোঁয়া বলে দিচ্ছে, বন্দরের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই প্রায়। চরম দুর্বল অবস্থাতেও প্রায় লাফিয়ে উঠে পাগলের মতো এলোমেলো পা ফেলে কয়েক ধাপ সেদিকে এগিয়ে গেল কর্নেল।

নিজের সঙ্গের সব জিনিস হারিয়েছে সে, এমনকি পায়ের জুতো আর পরিধেয় বস্ত্রও, বন্দরে যেখান থেকে তাকে ইনভেস্টিগেশনের জন্য বিস্তারিত জানানোর কথা ছিল, সবকিছু দিয়ে অফিসিয়ালি সাহায্য করার কথা ছিল, সেই জায়গাতে এখন আগুন খুলো আর ধোঁয়া ছাড়া বলতে গেলে কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই অবস্থায় যেই কাজে এসেছিল সেই ইনভেস্টিগেশন তো দূরে থাক, এখন প্রাণ বাঁচাই দায় হবে তার জন্য।

এসেছিল নিজের পুরনো মিলিটারি ব্যাংক নিয়ে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করতে গিয়ে সে পরিণত হয়েছে পথের ফকিরে। আপনাতেই ভেজা বেলে মাটিতে বসে পড়ল কর্নেল।

ভারতবর্ষে তার পথচলা কি কোনোদিন সুগম হবে না!

এর আগেরবার সব হারালেও অন্তত সম্মানের সঙ্গে নিজের মাটিতে ফিরে যেতে পেরেছিল সে। এবার মনে হচ্ছে সম্মান তো বটেই প্রাণটাও খোয়াতে হবে পথের ফকিরের মতো।



অধ্যায় চৌদ্দ বর্তমান সময় ময়মনসিংহ শহর

অতিরিক্ত ক্লান্তিতে যেন জান বের হওয়ার দশা ছিল বাশারের, কিন্তু এখন অনেকটাই ভালো অনুভব হচ্ছে।

ভোরের আলো ফুটতে এখনো অনেক দেরি, তবে আকাশে থাকা অবস্থায় দিগন্তে ওপারে লালচে একটা আলোর রেখা দেখতে পেল বাশার। তীব্র ক্লান্তি শরীরে জেকে বসেছে কিন্তু বিশ্রাম নেওয়ার উপায় নেই। সংক্ষিপ্ত এই যাত্রায় খানিক হলেও ছোট পরিসরে একটা ন্যাপ নিতে পেরেছে সে।

বাশারের এখনো মনে পড়ে, সে যখন পুলিশ হিসেবে সারদায় ট্রেনিং নিচ্ছে সেই সময়ে তাদের ইন্সট্রাক্টর একটা আলাদা সেশন নিয়েছিল। সেশনটার নামটাও ছিল খুব ইন্টারেস্টিং ‘নেসেসারি পাওয়ার ন্যাপ’। ঘুমানোর ওপরেও আবার ট্রেনিং হয় নাকি, এরকম একটা মেন্টালিটি নিয়ে দুপুরের লাঞ্চ সেরে খানিকটা ঘুম ঘুম ভাব নিয়েই তারা চুকেছিল সেই সেশনে। তাদের ইন্সট্রাকশন সেদিনের সেশনটা শুরু করেছিল খুব অদ্ভুত একটা প্রশ্ন দিয়ে, ‘আপনারা চেঙ্গিস খানের নাম শুনেছেন?’ ‘চেঙ্গিস খানের বিশ্ব জয় করার পেছনে অন্যতম একটা কারণ কী ছিল জানেন?’ চেঙ্গিস খানের বাহিনী কীভাবে ঘোড়ায় চড়ে দ্রুততম সময়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাচল করতে পারত এবং তীব্র বেগে ঘোড়ায় চলতে চলতে নির্ভুল লক্ষ্যে তীর ছুড়তে পারত ইত্যাদি তথ্যের পাশাপাশি ইন্সট্রাক্টর আরো ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় জানায়। কথিত আছে চেঙ্গিস খানের বাহিনী নাকি জরুরি প্রয়োজনে ঘোড়ার ওপরেও বিশ্রাম করতে পারত। চেঙ্গিস খানের বাহিনী থেকে শুরু করে ফ্রেঞ্চ শাসক নেপোলিয়নও নাকি যুদ্ধের সময়ে ঘোড়ার ওপরে ছোট ঘুম দিয়ে নিজেকে তাজা করে নিতে পারত। সেদিনের আলোচনা চেঙ্গিস খান থেকে শুরু হয়ে নেপোলিয়ন হয়ে কাল্পনিক চরিত্র ফেলুদার বিশেষ অবস্থায় ঘুমানোর

সিপাহী

কাহদা পর্যন্ত গড়িয়েছিল। মূল কথা ছিল কীভাবে সময়ে-অসময়ে ছোট একটা পাণ্ডার ন্যাপ বেকোনো মানুষকে রিচার্জ করে দিতে পারে। সেদিন ইন্ট্রাষ্টের যেটা শিখিয়েছিল সেটা একটা কাহদা বা একাধিক কাহদার সমন্বয়ে জরুরি অবস্থায় ছোট ঘুম দিয়ে নিজেকে ঋনিক রিফ্রেশ করার ওপরে। পরবর্তীতে নানা জায়গায় এই টেকনিক কাজে দিয়েছে বাশারের। আজ রাতও তার ব্যতিক্রম নয়।

হেলিকপ্টারের আওয়াজের ভেতরেও ছোট কিন্তু গভীর একটা ঘুম দিয়ে নিয়েছে বাশার। ছোট হলেও এই ঘুমটা খুব জরুরি ছিল ওর জন্য। কারণ একে তো পুরোদোস্তর স্ট্রেনস্কুল একটা মিশন সদ্য সম্পন্ন করেছে সে, তার ওপরে এক বিন্দু কিশ্রাম না নিয়ে, এমনকি নিজেকে ঠিকমতো রিফ্রেশ করার মতো সময়টুকুও পায়নি সে। এর ভেতরেই এমন বাজে একটা ঘটনা ঘটেছে এবং সেটার পরিপ্রেক্ষিতে মস্তদানে নামতে হয়েছে ওকে। কিছু করার ছিল না, এটা মন-মস্তিষ্ক জানলেও শরীর তো আর সেটা জানে না কিংবা মানে না। কাজেই এই কিশ্রামটুকুর অন্তত প্রয়োজন ছিল।

‘ঋনিক ঘুম হলো?’ ওর পাশ থেকে সামিরা জানতে চাইল। বাশার বড় করে হাইম ছেড়ে খুব ঢেকে মৃদু হেসে বলে উঠল, ‘সরি।’

সামিরাও হেসে উঠল, ‘ইটস ওকে। আপনি যেভাবে একটা মিশন শেষ করেই এই কাজে নামলেন এটা প্রায় অসম্ভব একটা বিষয়। বিশেষ করে আমি তো আপনার মিশনটার ব্যাপারে বিস্তারিত জানি, কাজেই আপনাকে কী ধরনের স্ট্রেনস্কুল অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে আমার ভালোভাবেই জানা আছে।’

‘এ ছাড়া তো আর কিছু করারও ছিল না,’ বাশার অবারো মুখ ঢেকে হাইম ছাড়তে ছাড়তে বলে উঠল।

‘আমি জানি আপনি শ্লোক করেন,’ বলে বাশারের দিকে নিজের বেনসন লাইটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল সামিরা। এই মেয়ে যেরকম সপ্রতিভভাবে সিগারেট টানে, এটা একটা দেখার মতো বিষয়ই বটে। বাশার একবার ভেবেছিল মানা করবে, কিন্তু মনের কথা, মনে রেখেই সে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ঠোটে লাগাতে সামিরাই সেটাতে আঙন দিয়ে দিল, সঙ্গে নিজেরটাতেও। ‘সরি, আমি প্রায় চেইনের মতো সিগারেট টানি। কাজেই আমার সঙ্গে কাজ করতে হলে আপনাকে মানিয়ে নিতে হবে।’

বাশার বিষয়টাকে মেনে নেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে সাই জানাল। ‘আপনি কিশ্রাম নিতে পেরেছেন?’

‘নাহ,’ মাথা নেড়ে মানা করল সামিরা। ‘আমি মোস্টলি ফাইল চেক করেছি, কিছু জিনিস নোট করেছি। এই কেসটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং ক্রিটিক্যাল, আমার ধারণা, আমি ভাইটাল কিছু পয়েন্ট পেয়েছি, যেগুলো নিয়ে আলোচনা করা

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

প্রয়োজন। তবে এখন না, আমরা ময়মনসিংহে নামব, আমাদের এসকর্ট করার জন্য জিপ থাকার কথা। তবে কাজে নামার আগে আমার নোটসহ বিস্তারিত আলোচনা করে নেব আমরা।’

‘ঠিক আছে,’ বাশার চোখ মেলে একবার বাইরে দেখল। ‘আর কতক্ষণ লাগবে পৌছাতে? আমরা নামব কোথায়?’

‘স্যার, আর মিনিট দশেকের মতো লাগবে, আমরা নামব পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের মাঠে। এ ছাড়া এখানে আর নামার মতো এত ফাঁকা জায়গা পাওয়া মুশকিল হবে।’

বাশার মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে সিগারেটে টান দিল। বাসি মুখে সিগারেট টানতে একেবারেই শুরু লাগছে। তাও টানছে কেন জানি ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা হালকা হচ্ছে। আকাশ থেকে নিজের পরিচিত শহর কেমন জানি অচেনা লাগছে বাশারের কাছে। দশ মিনিটে না হলেও পনেরো মিনিটের ভেতরে ওদের কন্টার ভোরের আধো অন্ধকারের ভেতরে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মাঠে অবতরণ করল। কন্টার থামিয়ে পাইলট একটা ক্লিপ বোর্ডে আটকানো ফর্মের মতো এগিয়ে দিল সামিরার দিকে। ছোট ফর্মটা পূরণ করে সাইন করে পাইলটকে ফেরত দিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কন্টার থেকে নেমে এলো ওরা। কন্টার আবার চলতে শুরু করেছে। সেটার বাতাস এড়িয়ে দুজনে মাথা নিচু করে দৌড়ে এলো মাঠের কিনারার দিকে।

কন্টারটা উড়ে চলে গেল, ওরা দাঁড়িয়ে আছে মাঠের কিনারায়। দিনের আলো এখনো একেবারেই ফুটতে শুরু করেনি। এখন অনেকটা ফজরের আজানের আগে প্রকৃতি যেমন থাকে অনেকটা সেরকম। তবে পলিটেকনিকের হোস্টেলের বারান্দায় झলতে থাকা লাইটের আলোয় জায়গাটা মোটামুটি আলোকিত, আবার টুকটাক কয়েকটা দরজা আর জানালায় কৌতূহলী চেহারাও দেখা যাচ্ছে। বাশারের ধারণা হেলিকন্টারের শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে এরা। প্রতিষ্ঠানের মাঠে তো আর রোজ ভোররাতে হেলিকন্টার নেমে আসে না।

‘আমাদের নিতে আসার জন্য গাড়ি থাকার কথা?’ বাশার হাতের ফাইলটা চেক করতে করতে বলে উঠল।

‘হুমম, আসবে, বা এসেছে,’ এখানকার কমিউনিকেশন অফিসারের নম্বরে কল দিয়ে দেখছি,’ বলে সামিরা নম্বর ডায়াল করতে লাগল। ‘চলুন রাস্তার দিতে এগোতে এগোতে কথা বলি,’ দুজনে মিলে মাঠের গেট পার হয়ে মূল রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল একটা সাদা রঙের জিপ দাঁড়িয়ে আছে।

‘হ্যালো ম্যাডাম,’ জিপের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক লোক এগিয়ে এলো ওদের দিকে। বাশার ভালোভাবে তাকিয়ে দেখল, জিপের দু পাশে আরো

সিপাহী

দুজন অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তিনজনের পোশাক এবং প্রকৃতি দেখে খানিক অবাক হলো বাশার। এরা সাধারণ অফিসার তো নয়ই এমনকি পুলিশি পোশাকও পরে নেই। তিনজনেরই পরনে পুরোদস্তুর কমান্ডোদের আউটফিট।

‘হ্যালো স্যার এবং ম্যাডাম,’ তিনজনের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা ওদের দুজনার দিকে তাকিয়ে একবার করে মাথা নেড়ে অভিবাদন জানাল। ‘আপনি নিশ্চয়ই মিস সামিরা ম্যাডাম এবং বাশার স্যার, রাইট?’ লোকটার মুখে কোনো হাসি নেই, একেবারেই গম্ভীর, যেন খুব বিরক্ত কিন্তু কাজের ব্যাপারে একেবারেই নিরুত্তর এবং প্রফেশনাল। এ-ধরনের মানুষকে কারো ভালো লাগে না কিংবা, কেউই পছন্দ করে না। কিন্তু জরুরি কাজের বেলায় এদের ডাক পড়ে সবার আগে।

বাশার কিছু বলার আগেই সামিরা কথা বলে উঠল। ‘জি, আপনার মোবাইলে কল দিচ্ছিলাম,’ বলতেই লোকটা নিজের পকেট থেকে একটা মোবাইল বের করে দেখাল। ‘সরি আমাদের পৌছাতে খানিক দেরি হয়ে গেছে। ম্যাডাম পাসকোডটা বলবেন প্লিজ।’

সামিরা পাসকোড বলতেই, লোকটা সম্মতি জানানোর ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে ওদের গাড়ির দিকে এগোনের ইশারা করে জানতে চাইল। ‘আপনাদের সঙ্গে কোনো লাগেজ আছে?’

‘না, নেই,’ সামিরা বলে উঠল। সে লোকটার পাশাপাশি এগোতে শুরু করেছে। বাশার একবার চরপাশ চোখ বুলিয়ে নিয়ে এগোতে শুরু করল জিপের দিকে। লোকটা গিয়ে জিপের সামনে ড্রাইভারের পাশে বসল, পেছনে অন্য দুই কমান্ডোর সঙ্গে বসল বাশার আর সামিরা। ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়ার ইশারা করে লোকটা বলে উঠল, ‘এখান থেকে আমরা সোজা নতুন বাজার মোড় পিবিআইএসের ল্যাব কাম কোয়ার্টারে যাব।’

‘আপনারা কোনো ব্যাকআপ আনেননি?’ বাশার বেসুরো গলায় জানতে চাইল হঠাৎ।

সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটা এই প্রথমবারের মতো হেসে উঠল, ‘সরি স্যার, আমি জানি এটা ফোর্সের রেগুলেশনের ভেতরে পড়ে না। কিন্তু আপনাদের আসার বিষয়টা আমাদের ইনফর্ম করে আপনাদের এসকর্ট করার দায়িত্বটা আমাদের দেওয়া হয়েছে এমন একটা সময়ে যখন চাইলেই আসলেই আমরা ব্যাপআপের আয়োজন করে উঠতে পারিনি,’ বলে সে একবার পেছনে ফিরে দুজনকে দেখে নিয়ে যোগ করল। ‘ডেন্ট ওরি স্যার, আমরা সিকিউরিটিতে কোনো ফাঁক রাখিনি। আশা করা যায় এই অল্প সময়ের সামান্য যাত্রায় কিছু হবে না।’

বাশার আনমনেই এবার বাইরে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। ওদের জিপ চরপাড়া মোড় পার হচ্ছে, জিপটা চরপাড়া মোড় পার হয়ে বামে মোড় নেওয়ার বদলে ঘুরে গেল

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

ডান দিকে। বাইরের আধো অন্ধকার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বাশার ফিরে তাকাল সামিরার দিকে। সে একটা টিস্যু দিয়ে নিজের মুখ মুছছিল, বাশার সরাসরি তাকিয়ে আছে দেখে সেও তাকিয়ে রইল, ঠিক ধরতে পারছে না বাশারের দৃষ্টি। আনমনেই পকেট থেকে মোবাইল বের করে ওটাকে একটা টেক্সট লিখে সে এগিয়ে দিল সামিরার দিকে। সামিরা খুব অবাক হয়ে সেটাতে চোখ বোলাতে বোলাতে তার চোখ কপালে উঠে গেল। টেক্সটটাতে একটা বাক্য লেখা,
'এরা ফেইক, আমরা ফাঁদে পড়ে গেছি।'

অতীত

বোম্বে বন্দরের সায়াহ্নে

কর্নেলের বয়স মোটেই কম নয়, সেই সঙ্গে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে সে এমন সব অবস্থার ভেতর দিয়ে গেছে। বাড়ি থেকে পালানো থেকে শুরু করে চোখের সামনে গণহত্যা সংঘটিত হতে দেখা, শূন্য থেকে নিজের পরিবার গড়ে ওঠা থেকে শুরু করে নিজের পরিবারের ধ্বংস পর্যন্ত হেনতম কোনো অভিজ্ঞতা হতে বাকি নেই। সেই কর্নেলের ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে এমন ধরনের অসহায় অনুভূতি হবে, সত্যিকার অর্থে কখনো ভাবতে পারেনি সে।

কাঁদাময় ভেজা মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে পরনের কাপড়গুলো খুলে যতটা পারল চিপে নিয়ে আবার গায়ে পরে নিল কর্নেল। আবহাওয়া মোটেই ঠান্ডা নয়, কিন্তু এই খোলা বাতাসে ভেজা শরীরে দাঁড়িয়ে তার গায়ে রীতিমতো কাঁটা দিচ্ছে। ঠান্ডায় তার গা শিরশির করছে, নাকি উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে এমন অনুভূতি হচ্ছে পোড়াখাওয়া কর্নেল পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারল না। ভেজা মাটি থেকে ঘাসের ওপরে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। আর লাজ-লজ্জা কিংবা ব্রিটিশ কেতার ধার ধরে লাভ নেই। আগে বাঁচতে হবে, আর সেটা করতে হলে এখন তাকে এই বৈরী পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে হবে। আর যেকোনো অবস্থায় টিকে থাকার জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি হলো নিজের সাধ্যের ভেতরে কী কী আছে সেগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার করা।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে, কর্নেল একবার শরীরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মনে মনে হিসেব করল। তার পরনে এখন শুধুই শার্ট আর একটা ব্রিচেস, মানে প্যান্ট। জুতো জোড়া কাল রাতে পানিতে গেছে, মোজা খুলে ঘাসের ওপরে মেলে দেওয়া আছে। যদিও জুতো ছাড়া মোজার আর কোনো দাম নেই, বরং মোজা না থাকলে খালি পায়ে বেশি সুবিধা। নিজের ভারী কোটটা গেছে পানিতে। ওয়েস্ট কোটটা

সিপাহী

মেলে দেওয়া ঘাসের ওপরে। পকেটে থাকা তামাকের বাব্বাটা আছে, ওটাতে থাকা তামাক সব বরবাদ হলেও পাইপটা যেহেতু আছে, কাজেই তামাক আর আঙনের ব্যবস্থা করলে ওটা কাজে লাগবে। নিজের ছোট্ট চেইনের ঘড়িটা আছে। যদিও ওটা বন্ধ, তাও দামি রূপোর জিনিসটা কাজে আসবে। নিজের বটুয়াটা পুরো ভিজে গেছে, ওটাতে থাকা কিছু কাগজ আর ছবি সব গেছে। তবে কিছু অর্থ এবং কয়েক রসে গেছে। ওগুলোও কাজে আসবে। সব মিলিয়ে টাকা হিসাব করে রাখল কর্নেল, তার পানিরোধক ফাইলটাতেও পানি ঢুকেছে, ওটাতে থাকা কাগজের কিছু বাদে বাকি সব ঠিক আছে। এটাও কাজে দেবে। আনমনেই নিজের সাসপেন্ডারের বেলেট একবার হাত বুলিয়ে নিল। ওটার গোপন খোপে কিছু কাজের জিনিস আছে।

এবার দেখতে হবে অস্ত্রাদি। পিস্তলটা পানিতে ভিজে বরবাদ, কিন্তু এটার অবস্থ্যবটা অক্ষত আছে, এটাও কাজে লাগানো যাবে। তবে দুইধারওয়ালা ড্যাগারটা অক্ষত আছে। এটাই এখন তার মূল অস্ত্র। দুটো অস্ত্র কোমরের সঙ্গে আটকানোর চামড়ার বেলেটটা ভিজে গেলেও আছে জিনিসটা। হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থাতেই কর্নেল শার্টটাকে গুঁজে নিল প্যান্টের ভেতরে। মোজা পরার আশা বাদ দিয়ে, প্রথমে অস্ত্র রাখার আলাদা বেলেটটা পরে নিয়ে ওতে দুটো অস্ত্রই জায়গামতো রেখে দিল। বাকি জিনিসগুলো কিছু পকেটে রেখে বাকিগুলো ওয়েস্টকোট দিয়ে মুড়িয়ে নিজেকে খানিক ঠিকঠাক করে, পাইপটা ঠোটে কামড়ে উঠে দাঁড়াল কর্নেল।

দিনটা মাত্র শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের ভাষায় বলতে গেলে একেবারে কাকভোর। যদিও খুবই বাজে অবস্থায় আছে, তার পরও বহুদিন পর ভারতবর্ষের বিজয় এবং পরিচিত বাতাস পেয়ে ভালো লাগছে কর্নেলের। তত মোহ, কত স্মৃতি এই বাতাসে, এই মাটিতে এই পানিতে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে পোড়া গন্ধে মুখ কুঁচকে উঠল কর্নেলের। চোখ খুলে দেখল বোম্বে বন্দরের ওপর দিয়ে উড়তে থাকা কালো ধোয়া আর মৃত্যুর গন্ধে ভারী বাতাস। কর্নেল দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে সামনের দিকে তাকাল। ঘাসের ওপরে আধশোয়া হয়ে একটা পাথরে হেলান দিয়ে মুখ হাঁ করে ঘুমাচ্ছে লঙ্কর ছেলেটা।

একজন ব্রিটিশ অফিসারের অধীনস্থ হিসেবে একজন লঙ্কর কিংবা সহিসের জন্য এটা রীতিমতো অপরাধযোগ্য একটা কাজ। কিন্তু কর্নেল নিজে কোনো পদধারী মানুষ নয়, এমনকি যখন সে পদধারী ছিল সেই সময়েও সে এসবের খুব বেশি তোয়াক্কা করত না। আর এখন তো প্রশ্নই আসে না। বিশেষ করে কাল রাতে এই ছেলেটা না থাকলে এতক্ষণে আরব সাগরের তলদেশে তার ঠান্ডা মৃতদেহ পড়ে থাকত, কিংবা কে জানে এতক্ষণে হয়তো সে মরে ফুলে উঠে ভেসে চলে যেত দূর সাগরে। কেউ জানতও না কী ঘটেছে হতভাগ্য কর্নেলের কপালে। যেখানে পুরো দেশ জ্বলছে সেখানে একজন ব্রিটিয়ার্ড কর্নেলের দুভাগ্যজনক মৃত্যু কোনো ঘটনাই

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

নয়। কর্নেল ঘুমে থাকা লক্ষর ছেলেটাকে ভালোভাবে দেখল। বয়স হবে, ষোলো-সতেরো, হালকা-পাতলা কালো একটা চেহারা। মুখে হালকা দাড়ি-গোফের রেখা দেখা দিয়েছে সদ্য। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থেকে ক্ষণিকের জন্য কর্নেলের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। তার ছেলেটা বেঁচে থাকলে কি এই বয়সের হতো এখন, কেমন দেখতে হতো সে!

মাথা ঝাড়া দিয়ে নিজের আবেগ এবং চিন্তাভাবনা সংবরণ করল কর্নেল। এখন আবেগ আক্রান্ত হওয়ার সময় নয়। এখন সময় সূক্ষ্ম হিসেবে, এখন সময় বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করার। আর বেঁচে থাকার লড়াইয়ের সময় আবেগ সবচেয়ে মূল্যহীন বিষয় ছাড়া আর কিছু নয়। কর্নেল পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ছেলেটার দিকে। যেভাবে নাক ডেকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছেলেটা, তাকে ডাকতে ইচ্ছে করছে না কর্নেলের কিন্তু এখন না ডেকে উপায়ও নেই। ছেলেটার কাঁধে হাত রাখতে গিয়ে তার নাম মনে করার চেষ্টা করল কর্নেল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই নামটা মনে করতে পারল না সে। 'ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে মৃদু ঝাঁকি দিল। 'এই ছেলে, ওঠো,' কোনো নড়াচড়া নেই। 'এই, ওঠো।'

হঠাৎ একেবারে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেই দুই হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল সে। বিষয়টা খুব ভালোভাবে খেয়াল করল কর্নেল। নিজের জীবনে সবচেয়ে বেশি মিশেছে এবং চলেছে সে ভারতীয়দের সঙ্গে। সে হিসেবে তাদের জীবন এবং আচারকে সবচেয়ে বেশি ভালোভাবে জানে সে। জনের মতো লোক বিশেষ অবস্থায়ও তার মতো একজনের ওপরে নির্ভর করছে স্রেফ এই একটা কারণেই। কর্নেল যেভাবে ভারতীয়দের জানে খুব কম ইংরেজই সেটা জানে। এর পেছনে অন্যতম একটা কারণ হলো ইংরেজরা ভারতবর্ষে থাকলেও তারা কোনোদিনই ভারতীয়দের ভেতর থেকে সম্মান করেনি, ভালোবাসা তো দূরে। সবার না হলেও বেশির ভাগ ইংরেজের জন্য ভারত এবং ভারতীয়রা স্রেফ হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু নয়। ওপরে ওঠার হাতিয়ার, এই কারণে ভারতবর্ষে সারাজীবন থেকেও তারা এবং ভারতীয়দের কাছে স্রেফ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোই রয়ে গেছে। ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের এটাই অন্যতম একটা কারণ।

যাই হোক, কর্নেল ডেকে ওঠাতে ছেলেটা এভাবে নিজের মুখ কেন ঢেকে ফেলল এটা কর্নেল খুব ভালোভাবে জানে। এই ধরনের ছেলেরা যেসব মানুষের সঙ্গে কাজ করে, সেটা স্বদেশি হোক কিংবা বিদেশি, সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এদের মনিবেরা সাধারণত বদমেজাজি হয় এবং এই সব ছেলেটের প্রচণ্ড মানসিক চাপের ভেতরে কাজ করতে হয়। এই বুঝি কোনো ভুল হয়ে গেল, এই বুঝি কোনো কারণে এবার মার খেতে হবে। আসলে এদের প্রতিনিয়ত মার খেতেও হয়, ফলে এদের মনস্তত্ত্বের একটা অংশ এমনভাবে গঠিত হয়ে যায় সর্বক্ষণ তার

সিপাহী

দিকে কোনো না কোনো আঘাত আসবেই। যে-কারণে এদের কনসাস মাইন্ডের পরিবর্তে যেখানে সাবকনসাস মাইন্ড কাজ করে, সেখানে অযাচিতভাবেই এদের মননের একটা অংশ স্রেফ প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। আর এরই প্রতিক্রিয়ায় এই ঘুমের ঘোরে ডাকের ভেতরে এই হাত উঠে আসা, যা প্রমাণ করে এই ছেলে ছোটবেলা থেকেই এ-ধরনের চাপের ভেতরেই বড় হয়েছে এবং সম্ভবত প্রতিনিয়ত এই ধরনের আচরণ সহ্য করেই অভ্যস্ত। কর্নেল অনুধাবন করতে পারে এই ছেলে সম্ভবত এতিম এবং বাবা-মা কিংবা পরিজনহীন পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছে চূড়ান্ত প্রতিকূল পরিবেশের ভেতরে। বন্দর হোক কিংবা জাহাজ, ঘর হোক কিংবা বাইরে, এই সব ছেলেরা কোথাও ভালো ব্যবহার পায় না।

‘আন্তে, আন্তে,’ কর্নেল নিজেই পুরনো স্থানীয় ভাষার ব্যবহার ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে। দীর্ঘদিন কলকাতা, বোম্বে আর উত্তর ভারতে কাজ করার সুবাদে একাধিক স্থানীয় ভাষা জানে সে, এবং খুব ভালোভাবেই জানে। বিগত কয়েক বছরের অনভ্যস্ততায় খানিক জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু তেমন সমস্যা হচ্ছে না। ‘শান্ত হও।’

ছেলেটা সামনে কর্নেলকে দেখে শান্ত হয়ে এলো। ‘হজুর, আপনে—’ বলে সে আটকে গেল। কী বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। রাতের বেলা যে-মানুষটাকে রীতিমতো আগলে ধরে সে বস্তুর মতো টেনে পানি থেকে তুলে এনেছে, দিনের আলোতে সেই মানুষটার সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলতেও ভয় আর দ্বিধায় কুঁকড়ে যাচ্ছে ছেলেটা।

‘ক্লিন্সার,’ কর্নেল ছেলেটার দিকে এগিয়ে গিয়ে যে পাথরটাতে সে হেলান দিয়ে বসে ছিল, সেটার ওপরে মেলে রাখা কাপড়গুলো ছেলেটার দিকে ছুড়ে দিল। কর্নেল এগিয়ে আসতেই ছেলেটা একপাশে সরে গেছে। কাপড়গুলো সরিয়ে কর্নেল বসে পড়ল পাথরটার ওপরে। ছেলেটার দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখল। হ্যাংলা-পাতলা শরীরটা দেখলে বোঝা যায় ছোটবেলা থেকেই সে পুষ্টির ঘাটতির ভেতরে বড় হয়েছে। তবে পাতলা শরীরে যথেষ্ট শক্তি ধরে সে, অস্তিত কাল রাতে কর্নেলের অভিজ্ঞতা তাই বলে, হ্যাংলা-পাতলা হলেও সে লম্বা খারাপ না। এভারেস্ট ভারতীয়দের তুলনায় তার উচ্চতা খানিক বেশিই। এই মুহূর্তে তার পরনে স্রেফ একটা ল্যাস্টো ছাড়া আর কিছু নেই। পানি থেকে উঠে সব কাপড় মেলে দিয়ে ঘুম দিয়েছিল সে। এখন কর্নেলের দিকে তাকিয়ে ঠিক বুঝতে পারছে না কী করবে, কাপড়গুলো বুকের কাছে জড়ো করে ধরে আছে।

‘তোমার নাম কি?’ কর্নেল ভেস্টে মোড়ানো জিনিসগুলো পাথরের ওপরে নামিয়ে রেখে মুখ থেকে পাইপটা হাতে নিয়ে জানতে চাইল।

‘হজুর, ফটিক।’

‘বাড়ি কোথায় তোমার?’

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

কর্নেলের প্রশ্নের জবাবে খানিক অনিশ্চিত ভঙ্গিতে পুড়ে ধোঁয়া উঠতে থাকা বন্দরের দিকে দেখল সে।

‘বাড়ি নেই, তাই না, ছোটবেলা থেকে এই বন্দরেই বড় হয়েছো?’ কর্নেল না চাইতেও পাইপটাকে আবার মুখের সঙ্গে চেপে ধরল। তামাকের নেশা চেপে ধরেছে তার।

‘জি হুজুর, বন্দর, জাহাজ, পানিই আমার ঘর,’ এখনো সে ধরতে পারছে না তাদের কথোপকথন কোনদিকে যাচ্ছে।

‘বুঝতে পেরেছি, শোন ফটিক, তুমি আগে কাপড় পরে নাও, তারপর আমরা বন্দরের দিকে যাব। কর্নেল ইশারা করতেই সে ঢোলা পায়জামার মতো জিনিসটা পায়ে আর হাতা কাটা ফতুয়াটা গায়ে পরে নিয়ে মাথায় প্যাঁচাতে শুরু করল সেই লাল রঙের কাপড়টা। ওটা প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে সে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘হুজুর গোস্তাখি না নিলে একটা কথা বলি?’

‘ফটিক আমার সঙ্গে তোমার অত নিয়ম মেনে কথা বলতে হবে না। যা বলতে চাও বলতে পারো।’

‘হুজুর, যদিও বন্দরের আর কিছু আছে বইলা মনে হয় না, তাও কাইল রাইতের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে এইটা পরিষ্কার মনে অয় বন্দর এহন স্থানীয়গো দখলে, এই সময়ে একজন সাদা,’ বলেই সে নিজেকে সামলে নিল। ‘মানে ইংরেজ ভদ্রলোকের ওইখানে যাওয়া মরণেরে ডাইকা আনার সামিল।’

‘বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ওখানে না গেলে আমি আসলে—’ কর্নেল চিন্তিত মুখে পরিস্থিতি বিবেচনা করার চেষ্টা করছে। ‘আচ্ছা আমরা এখন আছি কোথায়?’

‘হুজুর এইটা বন্দরের লাগোয়া ছোট একটা ঘাট,’ বলে সে একপাশে দেখাল। কর্নেল পনির দিকে ভালোভাবে খেয়াল করে দেখল। এটা আসলে সমুদ্র নয়। আরব সাগর থেকে একটা ছোট খাড়ির মতো চলে এসেছে ভেতরের দিকে। এখানে কাঁচা হাতে বানানো একটা ঘাটের মতো। তারা গতকাল রাতে নিশ্চয়ই সাঁতরে মূল সাগরের পার হয়ে এই খাড়িতে ঢুকে পড়ে। তারপর দুজনে কোনোমতে ঘাটের পাশ দিয়ে উঠে আসে মাটিতে।

‘অন্য সময়ে এইখানে ছোটোখাটো কাম হয়, অহন সংগ্রামের সময়ে সব ভাগছে।’

সংগ্রাম বলতে ছেলেটা বিদ্রোহ বোঝাচ্ছে। ‘এখান থেকে বন্দর কত দূরে?’ যদিও দেখা যাচ্ছে কিন্তু কর্নেল বোঝার চেষ্টা করছে ঠিক কতটা দূরে আছে ওরা।

‘মাইল দুয়েক কি আড়াই,’ শান্ত স্বরেই জবাব দিল ফটিক।

কর্নেল ভাবতে ভাবতে পাইপ টানছে, যদিও তামাক বা ধোঁয়া কোনোটাই নেই ওটাতে। স্রেফ মনের শান্তি। ভাবতে ভাবতে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। ‘আমাদের



সিপাহী

বন্দরে যেতে হবে।' কর্নেলের ধারণা বন্দরে না গেলে অন্তত নিশ্চিত হতে পারছে না সে, হয়তো তার স্থানীয় কন্টাক্ট ওখানে থাকতেও পারে। আর না পেলোও অন্তত কোনোদিকে পাওয়া যেতে পারে সেই ব্যাপারে ধারণা তো পাওয়া যাবে। 'চলো।'

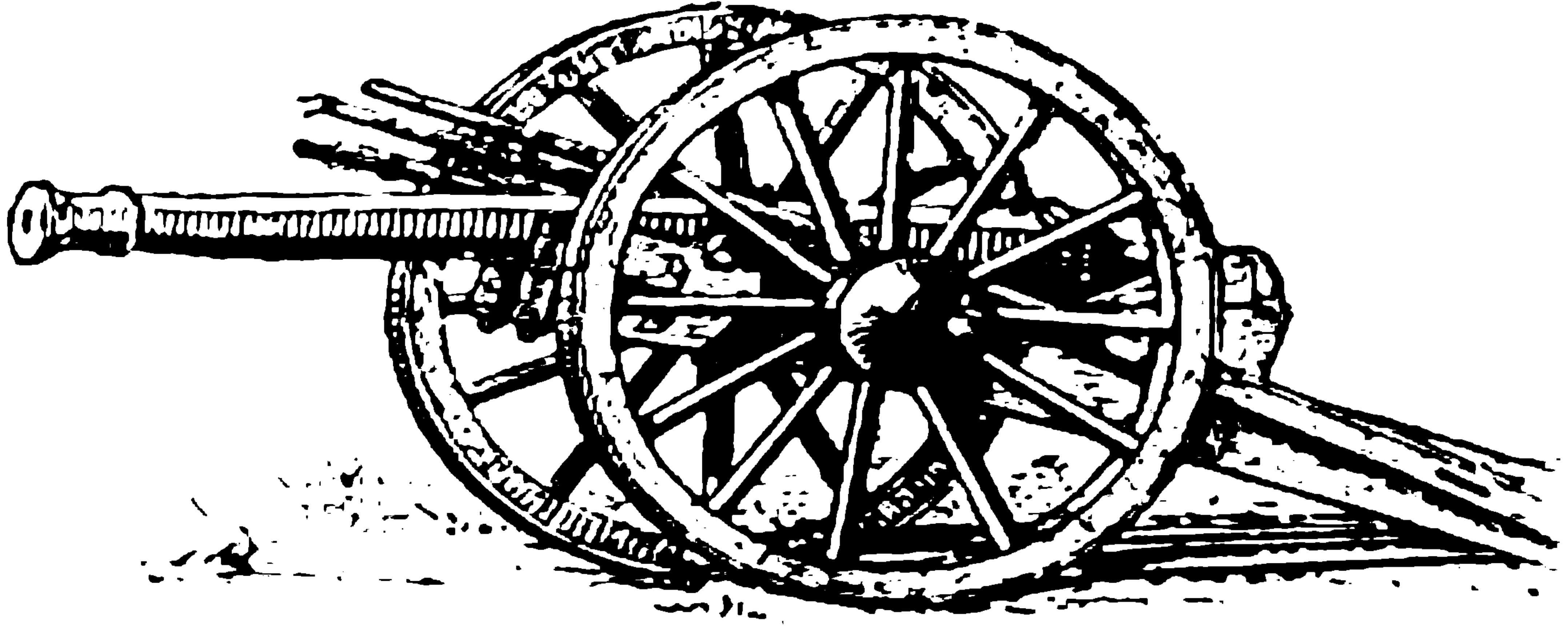
'হজুর যাবেনই?' কর্নেল মাথা নেড়ে সায় জানাতেই ছেলেটা দৌড়ে এসে কর্নেলের সেই ছোট পোটলাটা নিতে চাইল কর্নেল হাত নেড়ে মানা করে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। কর্নেল হাঁটছে, ছেলেটা তার থেকে খানিক পেছনে। কর্নেল বিরক্ত হয়ে ফিরে তাকাল তার দিকে। 'এভাবে পেছনে থাকলে আমরা সামনে এগোব কীভাবে?' ছেলেটা এমন কেন করছে সেটাও জানে কর্নেল। ভারতীয়দের ইংরেজ অফিসারের পাশাপাশি হাঁটার নিয়ম নেই।

ছেলেটা এবার দৌড়ে গিয়ে কর্নেল থেকে খানিক দূরে হাঁটতে লাগল। 'আরে পাগল, এদিকে এসো, আমার সঙ্গে হাঁটো,' কর্নেল এবার বিরক্ত হলো। ধমক খেয়েও ছেলেটা এলো না দেখে কপট রাগের ভঙ্গিতে সে তাকাতেই ছেলেটা কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে এসে পাশে দাঁড়াল। 'এবার হাঁটো,' অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে গুটি গুটি পায়ে এগোতে লাগল ছেলেটা। 'জোরে হাঁটো।' কিছুক্ষণের ভেতরে অবশ্য স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এলো সে। এগোতে এগোতে পথের বর্ণনা দিতে লাগল, কোনদিক হয়ে কোনদিকে যাবে। খানিক মেঠো পথ ধরে এগিয়ে বাক নিয়ে ওরা বড় একটা রাস্তায় উঠে এলো। এখান থেকে সোজা এগোলেই বন্দর, মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে। ওরা যতই এগোচ্ছে, সামনের পোড়া গন্ধ আর ধোয়ার রেশ তত বাড়ছে।

'হজুর আর খানিক আগাইলে—' ছেলেটা কথা শেষ করতে পারল না, তার আগেই সামনের পথে ধুলোর রেশ দেখা গেল। ওরা কিছু ভেবে ওঠার আগেই তিন-চারজনের একটা অশ্বারোহী দল প্রকট হলো সামনের রাস্তায়। ঘোড়ায় চড়া দলটার প্রত্যেক অশ্বারোহী এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক ভাব-ভঙ্গি। 'এরা তো—'

কর্নেল কিছু বলার আগে তার পাশ থেকে ফটিক বলে উঠল, 'সর্বনাশ হজুর! এরা বিদ্রোহী, ডাকাইতও হইবার পারে।'

দলটার দিকে তাকিয়ে আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল কর্নেল। বিপদের ওপরে দ্বৈত বিপদ। সব হারানোর পর স্রেফ প্রাণটা বাকি ছিল। এবার মনে হচ্ছে সোটা হারাতে হবে।



অধ্যায় পনেরো বর্তমান সময় ময়মনসিংহ শহর

যখন প্রাণ বাঁচানো জরুরি, তখন কি হারাবে, আর কি জিতবে সেই হিসেব করার মতো মানুষ সে নয়। সামিরা অত্যন্ত সাহসী এবং অ্যাগ্রেসিভ ধরনের মেয়ে, অন্তত প্রথম দর্শনে এবং আলাপে বাশারের কাছে সেই রকমই মনে হয়েছে। সামিরা সেই ধরনের মেয়ে যে-নিজের মতামত এবং কাজের বাইরে কিছু বোঝে না এবং বুঝতেও চায় না। বিশেষ করে এই ধরনের মেয়েরা দুনিয়ার মানুষ তাদের বিষয়ে কী ভাবল আর করল কেয়ার করে না। তার কাজের বিষয়েও যথেষ্ট প্রফেশনাল বলেই মনে হয়েছে বাশারের কাছে। কিন্তু ওরা যে-পেশায় আছে এতে এসব গুণ প্রয়োজনীয় কিন্তু এর থেকেও আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় রয়েছে। এর ভেতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রত্যুতপন্নমতিতা, অর্থাৎ বিশেষ অবস্থায় কে কীভাবে রিঅ্যাক্ট করে এবং কত দ্রুত ডিসিশন মেকিং করতে পারে।

ঠিক যেই মুহূর্তে বাশার সামিরাকে ওর হাতে ধরা মোবাইলে লেখা টেক্সটটা দেখাল সেটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামিরার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। বাশার টেক্সট দেখানোর ঠিক আগ মুহূর্তে সে দুই হাতে নিজের চুল খোঁপা করতে শুরু করেছিল, দুই ঠোঁটের ফাঁকে ধরা ছিল একটা ক্লিপ। বাশারের টেক্সটটা দেখামাত্র ক্লিপটা মুখ থেকে টপ করে পড়ে গেল, সেই সঙ্গে দুই হাত সরিয়ে ফেলতেই পেছনের চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। সামিরা দুই হাতে মোবাইলটা চেপে ধরে টেক্সটটা আরেকবার পড়েই বাশারের দিকে তাকাল, বাশার প্রায় কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখিয়েই একবার মৃদু মাথা নেড়ে সাই জানাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাশারের চোখ চলে গেল সামনের দিকে। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসা কমান্ডো পোশাক পরা লিডার গোছের লোকটা ভিউ মিররে ওদের দিকেই তাকিয়ে ছিল এবং সে পুরো

সিপাহী

দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছে। বাশার বুকে ফেলল লোকটা বুকে গেছে ওরা টের পেয়ে গেছে। মুহূর্তের ভেতরে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বাশার। সামিরার একটা হাত তার কোমরে থাকা পিস্তলের দিকে রওনা দিয়েছে, বাশার মানা করতে যাচ্ছিল কিন্তু সেটা না করে বরং ওর দুই পাশে দেখল। বাশারের দিকে তাকিয়েই সামনের নিডার মৃদু একটা শিস বাজিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ওদের দুই পাশে থাকা দুজন সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু বাশার নড়ে উঠল ওদের আগেই।

সে নিজের পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়ে বরং ওর বিপরীত দিকে বসে থাকা কমান্ডার কোমরে রাখা অস্ত্রের ওপরে বুট পরা একটা পা চাপিয়ে দিল, সেই সঙ্গে চেপে ধরল ওর পাশে বসা কমান্ডার ডান হাত। উদ্দেশ্য সামনের জন অস্ত্র বের করতে পারবে না এবং ওর পাশের জনও এনগেজড থাকবে, এই ফাঁকে সামিরা ওর অস্ত্র বের করে নিয়ে আসবে। ওর বিপরীতের লোকটা হাতের ওপরে বুটের চাপ খেয়ে সামান্য চোঁচিয়ে উঠে বাশারের পা সরানোর চেষ্টা করছে, বাশার সর্বশক্তি দিয়ে সেটা চেপে ধরেই ওর পাশের লোকটার ধরে রাখা হাতটা ধরে হাতটা টান মারল। লোকটা সামনের দিকে এগিয়ে আসতেই ভাঁজ করা হাতের কনুই দিয়ে লোকটার নাকের ওপরে বাড়ি মারল। তারপরে চোঁচিয়ে উঠল লোকটা। আর এই ধস্তাধস্তির সুযোগ নিজের অস্ত্র বের করে চিৎকার করে উঠল সামিরা, 'হল্ট।'

পরিস্থিতি অনেকটাই নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিল এমন সময় সামনের সিটে বসে থাকা লোকটা আচমকা জিপের হইল ধরে টান মারল, রাতের ফাঁকা রাস্তায় জিপটা প্রায় এক শ আশি ডিগ্রি ঘুরে যেতেই ভারসাম্য হারাল পেছনের প্রায় সবাই। বাশারের পা ছুটে গেল, আর লোকটা গিয়ে বাড়ি খেল সামিরার সঙ্গে, তীব্র ধাক্কা সামিরার অস্ত্র ছুটে গেল হাত থেকে। বাশারের পাশের লোকটা নিজের ভাঙা নাক নিয়ে বুনো জন্তুর মতো ঝাপিয়ে পড়ল বাশারের ওপরে। তার আক্রমণ আরো গতি বৃদ্ধি পেল গাড়ির বেগের সঙ্গে। লোকটা প্রায় উড়ে এসে পড়ল বাশারের ওপরে। বাশারকে সিটের সঙ্গে চেপে ধরে, সর্বশক্তি দিয়ে ঘুসি মারল। বাশার অনুধাবন করতে পারছিল লোকটা এমনকিছুই করবে, নিজের ভাঙা নাকের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। তাই ঘুসি মারলেও প্রস্তুত থাকা বাশারের মুখে সেভাবে লাগাতে পারল না, উলটো ভাঙা নাকের ওপরে বাশারের একটা খাবার প্রাণপণে চোঁচিয়ে উঠে নিজের অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল সে। বাশার উঠে বসার চেষ্টা করছে, লোকটা একটানে নিজের অস্ত্রটা বের করে চেপে ধরল বাশারের গলার ওপরে, রক্ত আর রাগে মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে তার। ট্রিগারে লোকটার আঙুল চেপে বসছে ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে টিম নিডার লোকটা চোঁচিয়ে উঠল, 'খামো, সবাই।' তাও হয়তো ওরা ধামত না, লোকটা পর পর দুটো গুলি করল ওদের মাঝখান দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাশার আর অস্ত্র চেপে ধরা লোকটা, সেই

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

সঙ্গে উন্মত্ত ভঙ্গিতে নড়তে থাকা সামিরা আর তার অপটেন্ট লোকটা জমে গেল যার যার জায়গায়। 'খবরদার কেউ নড়বে না,' বলে সে নিজের সঙ্গীদের দিকে ইশারা করতেই দুজনেই যার যার অস্ত্র তাক করে বাশার আর সামিরাকে বসিয়ে দিল সিটের ওপরে। একজন সিটের নিচ থেকে তুলে নিল সামিরার অস্ত্র, অন্যজন বাশারের খাপ থেকে বের করে নিল পিস্তলটা।

'হ্যাঁ, এবার সবাই চুপচাপ বসো, কেউ কোনো কথা বললে, সোজা গুলি করা হবে,' বলে সে সোজা হয়ে বসে ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে, ভিউ মিররে তাকিয়ে নিজের হাতের অস্ত্র নেড়ে বলে উঠল, 'আমাদের ওপরে নির্দেশ আছে আপনাদের নিয়ে যাওয়ার, জীবিত না মৃত সেই কথা কেউ বলেনি আমাদের, কাজেই সাবধান।'

বলে সে সোজা হয়ে বসতেই ড্রাইভার গতি বাড়িয়ে দিল জিপের। সামিরার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল বাশার। সামিরাকেও হতাশ দেখাচ্ছে। এভাবে কাজে নামার আগেই ধরা খাবে, কেউই ভাবেনি। ওদের জিপ পুরোদমে চলতে শুরু করেছে, সামিরা মুখ খুলে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ওদের চলমান জিপের ওপরে মেল ট্রেনের মতো কিছু একটা এসে বাড়ি মারল।

অতীত

লোকগুলোকে দেখামাত্রই একহাতে নিজের অস্ত্র জিনিসগুলো সামলে অন্য হাতে, লঙ্কর ফটিককে আড়াল করার চেষ্টা করতে চেয়েছিল কর্নেল কিন্তু সেটা করার আগেই উলটো ছেলেটা বরং তাকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। 'কি করছো?' রাগের সঙ্গে গড়গড় করে বলে উঠল কর্নেল। 'আমাকে সামলাতে দাও।'

'হজুর আমি জানি এরা কারা এবং এগোর লগে কেমনে কথা কইতে হবে, আপনি খানিক চুপ থাইকেন,' বলে ছেলেটা কর্নেলকে পেছনে রেখে সামনের দিকে দুই ধাপ এগিয়ে গিয়ে লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। কর্নেল চারপাশটা জরিপ করে নিল। যদিও বিগত প্রায় এক দশকের অবসর জীবনে তার আগের মিলিটারি আচরণের ধার অনেকটাই কমে গেছে কিন্তু সেটা এখনো পুরোপুরি মরচে পড়েনি বা হারিয়ে যায়নি। কর্নেলের জন্য এরকম পরিস্থিতিও একেবারে নতুন নয়। কাজেই সে খুব ভালোভাবেই জানে এক্ষেত্রে কী করতে হবে। কারণ কর্নেল জানে না এরা বিদ্রোহী না অন্যকিছু কিন্তু এটা বুঝতে পারছে, এরা রক্তের জন্য মরিয়া হয়ে আছে। জীবনে এত বেশি রক্তপিপাসু মানুষ দেখেছে সে, এখন দেখলেই চিনতে পারে কারা আসলে কেমন এবং রক্তের জন্য কতটা মরিয়া। কর্নেলের জন্য এদের পরিচয় জানার প্রয়োজন নেই। সে এটা জানে ফটিক যাই বলুক না কেন।

সিপাহী

খুব বেশিক্ষণ সে এদের আটকে রাখতে পারবে না। কাজেই প্রস্তুতিই সেরা উপায়, সেটা যতটা আর যাই হোক না কেন।

কর্নেল চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখল ওরা একটা চওড়া মেঠো পথের একপাশ দাঁড়িয়েই পথের পাশে ঝোপঝাড়ে ভালো শুকনো নালা। কাছেই একটা গাছ, আর নালার অন্যপাশ থেকে শুরু হয়েছে শুকনো ফসলের মাঠ। ব্যাপারটা শুনে হয়তো হাস্যকর বা কাপুরুষোচিত শোনাতে পারে কিন্তু যেকোনো ক্ষেত্রে যেখানে শত্রু সংখ্যা বেশি বা শত্রু অধিক শক্তিশালী সেখানে সবার আগে দৌড়ে পালানোর চিন্তা করা উচিত, যদি সম্ভব হয়। কিন্তু এখানে সেই উপায় নেই। ওরা ফাঁকা জায়গায় এবং ওদের পাশে শুকনো নালা এবং ক্ষেত। যদিও পালানোর লোকগুলো ঘোড়া নিয়ে ধাওয়া করবে এবং কিছুক্ষণের ভেতরেই ধরে ফেলবে। আর ওরা দৌড়ানোর মতো অবস্থাতেও নেই। কাজেই এক্ষেত্রে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্নেল আপনাতাই দুই পা পিছিয়ে যতটা সম্ভব পথের কিনারায় সরে শজিনাগাছটাকে পিঠের দিকে দিয়ে দাঁড়াল। এটা যেকোনো ডিফেন্সের নিয়ম, নিজেকে টার্গেট হিসেবে সম্ভাব্য আক্রমণের দিক এবং পরিধি কমিয়ে ফেলা। সেই সঙ্গে কর্নেল খানিক বাঁকা হয়ে শরীরটাকে একপাশে করে দাঁড়াল, কোনাকুনি সরে গেছে লোকগুলো যেভাবে দাঁড়িয়েছে তার একদিকে। এতে করেও আক্রমণের দিক অন্তত দুই দিক থেকে কমে যাবে। প্রস্তুতি সেরে, আলগোছে নিজের কোমরের খাপের সঙ্গে আটকানো ছুরিটা একহাতে সরিয়ে সেটাকে নিজের শার্টের ভাঁজ করা আঙ্গিনের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলল কর্নেল। এবার নজর দিল সে ওদের কথোপকথনের দিকে।

ফটিক লোকগুলোর দিকে খানিক এগিয়ে হাত নাড়তেই প্রায় পুরো দলটা থেমে গেছে। কর্নেল শুনে দেখল ওরা সংখ্যায় প্রায় ছয়জন। প্রত্যেকেরই সশস্ত্র। অন্তত দুজনের কাছে গাদা বন্দুক, আর অন্যদের কাছে রামদা, লাঠিসোঁটা। একজনের কোমরে ঠিক তার মতোই একটা পিস্তল দেখতে পেল। প্রায় একই ধরনের খোপের ভেতরে রাখা। সঙ্গে সঙ্গে সে বন্দুকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল, পিস্তল এবং বন্দুক সবই ব্রিটিশ মিলিটারির জিনিস। এগুলো লুটের মাল না হয়েই যায় না। আঙ্গিনটা খানিক বাঁকা করে ওটার ভেতরের ছুরিটাকে এমনভাবে রাখল, যেকোনো সময় হাতের ঝাঁকিতে ওটা যাতে বেরিয়ে আসে।

লোকগুলো ফটিক আর কর্নেলকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সামনের কয়েকজন ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এলো। ‘অই তোরা কারা, এইখানে কই আস?’ লোকগুলোর কথা ভাসা ভাসা বুঝতে পারছে কর্নেল। ‘এই সাদা কুস্তাডা এইখানে ক্যান?’ দলের নেতা লোকটা হাতে ধরা ছোট একটা বাঁকানো কুকরি ছুরি। সেটাকে সে কর্নেলের দিকে তাক করে ধরে বলে উঠল।

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

‘হজুর, আমরা তহশিলদার, বন্দরে যাইতেছিলাম পথ হারাই ফালাছিলাম, আর পরে আগুন দেইখা যাই নাই।’

‘বন্দরে যাইবি,’ লোকগুলোর দলনেতা এগিয়ে এসে কর্নেলকে একরকম সামনে থেকে পরখ করতে করতে বলে উঠল। ‘শুনছোস তোরা এরাব বন্দরে যাইব,’ বলতেই দলের বাকিরা হেসে উঠল। ‘বন্দরে ক্যান পুরা এলাকায় সাদা চামড়ার একটা কুস্তাও আর জিন্দা নাই। খালি এইটা বাদে,’ বলে সে ছুরিটা প্রায় কর্নেলের বুকের কাছে চেপে ধরতেই ফটিক সেটা সরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, ‘হজুর, তিনি ভালো মানুষ, নিরীহ মানুষ, তিনি হিসেবের কাম করত, এখন—’

‘ওই তোরে জিগাইছি, তুই এই কোম্পানির কুস্তাটার তাবেদারি করতাহোস ক্যান?’

‘এই শালাও ওই সাদা কুস্তাগুলোর দোসর,’ পেছন থেকে কেউ একজন বলতেই লোকটা আবারো নিজে কুকরি তুলে সেটাকে ঠেকাল ফটিকের গলায়। ‘ঠিক কইরা বল, এই লোক কে, এইহানে কী করে,’ বলে সে কর্নেলের পায়ের দিকে দেখাল। ‘আমি এমন কোনো ইংরেজ দেহি নাই যে-খালি পায়ে চলে, আবার এর লগে কোনো জিনিসপাতি-পোশাক কিছুই নাই,’ বলে সে ছুরিটার প্রান্ত ফটিকের খুতনিতে ঠেকিয়ে বলে উঠল। ‘এই লোক মিলিটারির না, ওর কোমরে মিলিটারির বন্ধনী, ওইটাতে পিস্তল, হিসাবরক্ষক অইলে এমন হওয়ার কথা না। ঠিক কইরা বল এই ব্যাটা কেডা, নাইলে তোরে আগে ঘারায়ু—’

‘হজুর হজুর—’ ক্যাক্যা করছে, কর্নেল এগিয়ে গেল দলনেতা লোকটার দিকে। কর্নেল এদের পরিচয়ের বিষয়ে নিশ্চিত না হলেও এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে এরা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির। যদিও ভারতবর্ষের এবং সার্বিক এলাকার বিষয়ে সে এখনো পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হয়নি, তাও এটা বুঝতে পারছে এরা যেকোনো কিছু করতে সক্ষম এবং বিচার আচারের ধার ধারার মতো পরিস্থিতি এখন আর নেই। ‘থামো, আমি বলছি,’ কথাটা বলেই কর্নেল দলনেতা লোকটা আর ফটিকের মাঝামাঝি সরে এসেছে খানিকটা। ফলে লোকটা বাধ্য হয়ে নিজের ছুরিটা সরিয়ে নিয়েছে, ওটাকে ফটিকের গলা থেকে খানিক সরিয়ে কর্নেলের বুকের কাছাকাছি নামিয়ে এনেছে অনেকটা। কর্নেল এখনো দাঁড়িয়ে আছে বাঁকা হয়ে, একদিকে নিজে সস্তাব্য টার্গেট হিসেবে ছোট করে এনেছে যতটা সম্ভব, অন্যদিকে নিজে অনেকটা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে ফটিক আর লোকটার মাঝে।

‘এই তুই কথা বলোস কোন সাহসে, কোম্পানির কুস্তার বাচ্চা,’ বল লোকটা এবার ছুরিটা তুলে আনল কর্নেলের বুক বরাবর। ‘তুই জানোস, তগোর দিন শ্যাম। বহুত অত্যাচার করছোস, এইবার মরবি। শালা কোম্পানির কুস্তা,’ বলে সে মাটিতে থুতু ফেলল এক দলা। তার দলের বাকিরা হেসে উঠল। ‘শালারে ঘোড়ার পিছে

সিপাহী

বাইকা ছাছড়াই, শালার সাদা চামড়া শরীর থেইকা খুবলাইয়া যাইব, বুঝব ঠেলা।
'বুদ্ধি খারাপ না।' 'এই তুলোরে এমনই করা উচিত, কোম্পানির মাদারিগুলো।'

'আমি কোম্পানির লোক নই,' কর্নেল লোকটার লাল টকটকে চোখের দিকে তাকিয়ে ছির ভঙ্গিতে বলে উঠল। 'আমি সাধারণ হিসাবরক্ষক, আমি—'

'চোপ আবার কথা কয়,' দলনেতা লোকটা মনোযোগ দিয়ে কর্নেলকে দেখছে। কর্নেল বুঝতে পারছে এই লোকটা উচ্ছৃঙ্খল একটা দলের প্রধান হতে পারে, অশিক্ষিত হতে পারে, কিংবা বোকা নয়। সে ফটিকের কথায় মোটেই সন্তুষ্ট হয়নি বরং কর্নেলের পোশাক আর বাহ্যিক অবয়ব দুটোর ভেতরে সমন্বয় খুঁজে পাচ্ছে না সে। 'এই তুই না বন্দরে যাইতেছিলি, তোর পায়ে জুতা কই? পোশাকের এই হাল ক্যান,' বলে সে কুকরির ডগা দিয়ে কর্নেলের কোমরে আটকোনা পিঙ্গলটাকে টোকা মারল। 'সবথেকে বড় কথা তোর কাছে মিলিটারির পিঙ্গল ক্যান?'

'আরে এত কথা দরকার কি, কাইল রাইত থেইকা তো কম সাদা চামড়া মারলাম না। এইটারে মারলে আর কী অইবো—'

'এই চুপ বুঝতে দে আগে, এরপরে—যা করার করব, বলেই সে চট করে ছুরিটা উঠিয়ে আনতে লাগল কর্নেলের গলা বরাবর। দলনেতা লোকটা কথা বলছে কর্নেল হিসেব করে ফেলল। এদের পুরো প্রস্তুত হতে দিলে কোনোভাবেই জেতা সম্ভব নয়। তারচেয়ে বরং চমকে দিয়ে যা করার করতে হবে।

দলনেতার ছুরিটা উঠে আসছে ওপরের দিকে কর্নেল চট করে একবার ফটিকের দিকে দেখে নিয়েই উঠে আসতে থাকা ছুরিটা চট করে ধরে ফেলল দুই হাতের পাল্কার মাঝ বরাবর। এটা ছুরি চেপে ধরার পুরনো একটা টেকনিক, এতে করে ধারালো অংশ নিচের দিকে থাকে, আহত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। ছুরিটাকে ধরেই ডান পাশে ঘুরিয়ে দিতেই দলনেতা লোকটা বিন্ময়ের সঙ্গে দেখল তার হাত থেকে ছুরিটা ছুটে গিয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল একপাশে। লোকটা অবাধ হয়ে নিজেকে সামলে নেওয়ার আগেই কর্নেল হাত চালাল বাম থেকে ডানে। কিন্তু বেগে সঙ্গে সঙ্গে হাত ঘুরতে শুরু করতেই ভাঁজ করা আঙিনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো নিজের দুই ধারওয়ালা ছুরিটা। ওটা সোজা গলাটাকে ফাঁক করে দিল দলনেতার। বিন্ময়ের সঙ্গে লোকটা একবার কর্নেলকে দেখল, তারপর গল গল করে বের হয়ে আসতে থাকা রক্ত দেখল, তারপর একই বিন্ময় নিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল একপাশে।

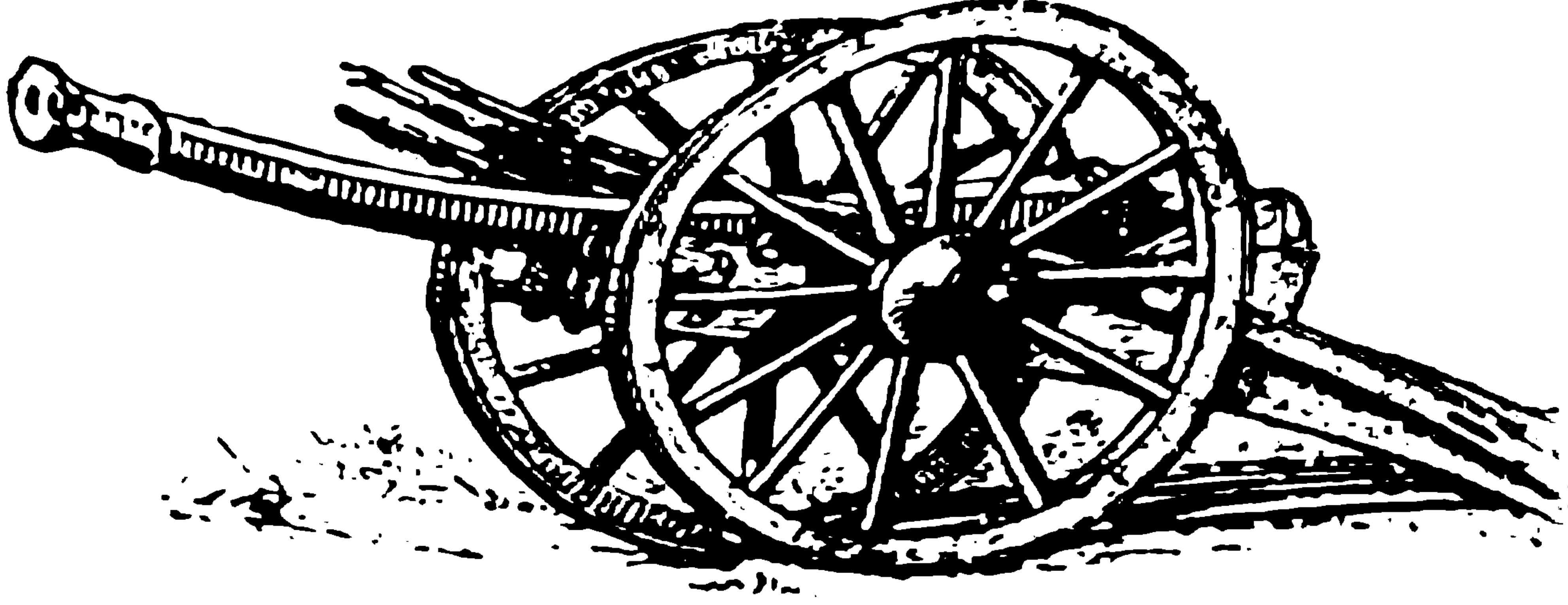
তার দলের লোকেরাও চমকে উঠেছে একইভাবে। কর্নেল ছুরিটাকে ধরে সোজা হতেই ঘোড়ার ওপরে থাকা আরেকজন লোকেরে নেমেই অস্ত্র তুলল কর্নেলের দিকে। ছুরিটা তালুতে ধরে হাত ফাঁক করে সেটাকে মাথার পেছনে নিয়ে গেল।

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

কর্নেল। হাতটা সামনের দিকে এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা ছুটে গেল সামনের দিকে। অস্ত্রধারীর বুকে একেবারে আমূলে গৌথে গেল ওটা। মুহূর্তের ভেতরে দুজনকে ঘায়েল করতে পারলেও একমাত্র অস্ত্রটা ছুটে গেছে কর্নেলের।

দলের বাকিরাও টপাটপ ঘোড়া থেকে নেমেই হামলে পড়ল ওদের ওপরে। নিজের একমাত্র অস্ত্রটা হাতছাড়া হয়ে যেতেই কর্নেল ফটিককে আড়াল করে পিস্তলটা বের করে এনেছিল। উদ্দেশ্য ছিল দলের অন্যদের ভয় দেখানো কিন্তু লোকগুলো এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপরে ওরা এমনকি অস্ত্রটা দেখলও না ঠিকমতো। একজনের উড়ে আসা লাঠির আঘাতে উঠে গেল কর্নেলের পিস্তলটা। হাতের তীব্র আঘাতের চোটে কর্নেলের মনে হলো কবজিটা ভেঙে গেছে। ডান হাতে কবজি চেপে ধরে লাথি মারল সামনের একজনকে। কিন্তু জোরদার হলো না সেটাও—আবারো আঘাত করার আগেই নিজেকে সে আবিষ্কার করল দুজনের বাহুর ভেতরে, দু পাশ থেকে চেপে ধরেছে তাকে। অন্যপাশে বন্দি করা হয়েছে ফটিককেও।

বন্দি করার কয়েক মিনিটের ভেতরে প্রথম একদফা পেটানো হলো দুজনকেই। উন্মত্ত লোকগুলো খানিক শান্ত হয়ে আসতেই, যে লোকটা কর্নেলকে ঘোড়ার পেছনে বেঁধে ছ্যাঁড়ানোর প্রস্তাব করেছিল তার নেতৃত্বে কর্নেল আর ফটিক দুজনকে বেঁধে ফেলা হলো দড়ি দিয়ে। দুজনে সল্লোসে আনন্দধ্বনি করতে করতে ঘোড়ার ওপরে উড়ে দড়ি ধরে হালকা টান মারল ওদরকে। কর্নেল আর ফটিক দুজনেই ছিটকে পড়ল মাটিতে। একজনের ঘোড়ার পিঠে চাবুকের আঘাত পড়তেই ঘোড়া শূন্যে লাফিয়ে উঠে ঝড়ের বেগে দৌড়াতে শুরু করবে—এমন সময় ঝোপের ভেতর থেকে একটা উড়ন্ত বাঁকা কাঁচি সাঁই করে উড়ে এসে কর্নেল আর ঘোড়ার মাঝের দড়িটা কেটে দিল। ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠেও থেমে গেল, সেই সঙ্গে সবাই ফিরে তাকাল যেদিক থেকে কাঁচিটা উড়ে এসেছে সেদিকে।



অধ্যায় ষোলো

বর্তমান সময়

চরপাড়া, ময়মনসিংহ

বন্দি বাশার আর সামিরাকে নিয়ে জিপটা মাত্র রওনা দিয়ে সেটা পার হচ্ছিল একটা গলির সামনে দিয়ে, বাশার তখনো পুরোপুরি নিজেকে সামলে নিতে পারেনি। একটু আগে স্কণিকের জন্য মনের ভেতরে আশা জেগেছিল হয়তো বা সে পরিস্থিতি সামলে উঠতে পারবে, হয়তোবা কাজ শুরু আগেই এই বাজে অবস্থা থেকে উদ্ধার হতে পারবে কিন্তু এই ব্যর্থ চেষ্টার পর ওরা আরো সাবধান হয়ে যাবে কোনো সন্দেহ নেই।

এবার আর মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বলতে গেলে। চূড়ান্ত হতাশা আর বিরক্তির সঙ্গে সে ফিরে তাকাল সামিরার দিকে। মেয়েটার চেহারা পুরো উলটো, একেবারে আহত বাঘিনীর মতো ছটফট করছে সে। তার দিকে তাকিয়ে বাশারের মনে হলো মেয়েটা যেকোনো সময় এমন কিছু করে বসতে পারে, যাতে আবারো উলটো ফল বহন করে আনবে। চোখের ইশারায় মেয়েটাকে শান্ত হতে বলবে, এর আগেই গলিটা পার হওয়ার সময়ে ওটার ভেতরের আধো অন্ধকার থেকে হরর সিনেমার ভূতের মতো উদয় হলো একটা জিপ। বরাবর ওদের গাড়ির দিকে এগিয়ে এসে আড়াআড়ি বাড়ি মারল।

গাড়িটা গলির ভেতর থেকে উদয় হয়ে ওদের দিকে ধেয়ে আসছে দৃশ্যটা একমাত্র দেখতে পেল বাশার। কারণ সামনে যারা বসে আছে তাদের দেখতে পারার কথা নয়, কারণ গাড়িটা এসেছে সমকোণী ভঙ্গিতে, সামিরা আর তার পাশের অপহরণকারী ওদিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে, আর বাশারের পাশের জন অল্প তাক করে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে ওর দিকে, কাজেই একমাত্র দৃশ্যটা দেখল বাশার এবং কলিশনের ঠিক আগমুহূর্তে সে সক্রিয় হয়ে উঠল।

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

সামিরার দিকে তাকিয়ে ছিল বাশার, হয়তো সামিরাও বাশারের বিস্ফোরিত দৃষ্টি দেখে কিছু একটা অনুমান করল, কিন্তু সে সক্রিয় হওয়ার আগেই ওর দিকে লাফ দিল বাশার। ক্ষণিকের ভেতরে বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল। গাড়িটা দেখামাত্রই বাশার লাফ দিয়েছে সামিরার দিকে, সামিরার কাঁধ স্পর্শ করে সেটাকে একদিকে জড়িয়ে ধরেছে বাশার এমন সময় গাড়িটা এসে আড়াআড়ি বাড়ি মারল ওদের জিপে। আঘাতটা খুব জোরেও না আবার একেবারে আন্তেও না। বাড়ি লাগার সঙ্গে সঙ্গে গতি বাড়াতে থাকা বাশারদের জিপটা প্রায় দুই শ ডিম্বির মতো ঘুরে গিয়ে মূল রাস্তা থেকে সরে গিয়ে ফুটপাথের উঁচু অংশের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে খেমে গেল ওটা, সেই সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। জিপের একপাশ পুরোপুরি ধুবড়ে গেছে। অন্যদিকে বাড়ি মারা গাড়িটাও আঘাতের বেগ এবং গতি সহ্য করতে না পেরে উলটোদিকে প্রায় দেড় শ ডিম্বির মতো ঘুরে গিয়ে খেমে গেল।

গাড়িটা যখন জিপটাকে আঘাত করে বাশার তখনো শূন্যে, সেও সামিরাকে আড়াল করল আর জিপের আঘাতটা লাগল। সামিরাকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে পাক খেল বাশার, সে আর সামিরা জিপের পেছনের খোলা অংশ দিয়ে বের হতে হতে ঘুরে যাওয়া জিপের রেলিংয়ের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে জিপের মেঝেতেই পড়ে গেল দুজনে। রেলিংয়ের সঙ্গে কোমরের মাঝবরাবর বাড়ি খেয়ে বাশারের মনে হলো কোমরের হাড় আর আস্ত নেই। চোখ মেলে দেখল, জিপের ভেতরে থাকা দুজনেই এলোমেলো হয়ে একে অন্যের গায়ে ছিটকে পড়েছে। এটাই সুযোগ পালানোর, কিন্তু বাশার নড়তে পারছে না। তবে সে কিছু করার আগেই সক্রিয় হয়ে উঠল সামিরা। বাশারের আঘাত লাগলেও ওর শরীরের কারণে সে পুরোপুরি অক্ষত রয়েছে। বাশারকে একপাশে ঠেলে দিয়ে, বার দুই হামাগুড়ি দিয়েই সে লাফিয়ে নামল ফুটপাথে, সেই সঙ্গে টেনে নামাল বাশারকে। বাশার নামতে নামতে গড়িয়ে পড়ে গেল, সেই সঙ্গে ভারসাম্য হারিয়ে সামিরাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। 'ফাক,' বলে জোরে চোঁচিয়ে উঠল সামিরা।

দুজনেই এলোমেলো অবস্থা থেকে নিজেদের সোজা করার চেষ্টা করছে, জিপের ভেতর থেকে একজনকে অস্ত্র তুলতে দেখে, 'সাবধান,' বলে চিৎকার করে নিজেকে এবং সামিরাকে আড়াল করার চেষ্টা করবে, জিপের ভেতরেই গুলি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা। গুলিটা এসেছে উলটোদিক থেকে, যেখানে জিপটাকে ধাক্কা মারা গাড়িটা রয়েছে। ক্ষণিকের জন্য গুলির শব্দে সব যেন থমকে গেল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জিপের সামনের অংশ থেকে গুলি ছুটে গেল গাড়িটার দিকে, ঠং করে শব্দ হয়ে কোথায় লাগল সেটা, সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো গাড়ির দিক থেকে।

জীবনে এমন অসহায় খুব কমই বোধ করেছে বাশার। দুই দিকে গুলিবিধিনিময় হচ্ছে, বলতে গেলে প্রায় কোনো ধরনের আড়াল ছাড়াই ঠিক মাঝখানে পড়েছে

সিপাহী

দুজনে, তাও একেবারে নিরস্ত। মুহূর্তের জন্য দিশেহারা বোধ করলেও, পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল বাশার এবং এমন অবস্থায় যা করণীয় ঠিক সেটাই করল। একহাতে সামিরার কাঁধ নিচের দিকে চেপে ধরে নিজেকেও যতটা সম্ভব নিচ করে দৌড় দিল। কোনদিকে এগোচ্ছে ঠিক বুঝতে না পারলেও আগে এখান থেকে সরার দরকার। রাস্তার অপর পাশের দিকে খানিক এগোতেই গাড়িটার দিক থেকে কেউ একজন চিৎকার করে উঠল, ‘মিস্টার বাশার।’

শক্র-মিত্র বাছ-বিচারের প্রয়োজন বা উপায় কোনোটাই নেই। আগে জ্ঞান বাঁচানো জরুরি। যেদিক থেকে ডাকটা এসেছে সেদিকেই আড়াল এবং অন্ধকার দেখে দৌড় দিল দুজনে। কয়েক সেকেন্ডের ভেতরেই বাশার নিজেকে আবিষ্কার করল আধো অন্ধকার গলির মুখে গাড়িটার ঠিক পেছনে।

‘আপনারা ঠিক আছেন?’ পুলিশের পোশাক পরা একজন জানতে চাইল।

‘একটা অস্ত্র দিন, কিছু একটা দিন?’ বাশার চেষ্টা করে উঠতেই, গাড়ির ভেতর থেকে কেউ একজন একটা পিস্তল ছুড়ে দিল ওদের দিকে। ‘আমাকেও একটা—’ সামিরার কথা শেষ করতে না দিয়ে বাশার এবং আগে থেকে গুলি করতে থাকা পুলিশের পোশাক পরা লোকটা দুজনেই অস্ত্র তুলল জিপটার দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে খেঁমে গেল। গুলি খেঁমে গেছে আগেই, অন্ধকারের ভেতরে জিপটা দাঁড়িয়ে আছে ভূতুড়ে ভঙ্গিতে। ‘ব্যাপার কি—’ বাশার কিছু বলার আগেই ধপ করে জিপের লাইটগুলো জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গুলি হলো আবারো। দুজনেই আড়াল নিয়ে নিচু হয়ে গেল। পুলিশ লোকটার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল বাশার। ‘আমাকে কভার করেন,’ ও বলতেই লোকটা সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাতেই বাশার আবারো পিস্তল তুলল।

জিপটা ঘুরতে শুরু করেছে। বাশারও গুলি করে ওপাশ থেকে আবারো গুলি হলেও নিজেকে ছিন্ন করল সে। একটা ভালো শট নিতে হবে স্রেফ। চাকার পাশ থেকে টার্গেট করেও লাগাতে পারল না। ক্ষণিকের জন্য জিপের সামনে সেই টিম লিডারের মুখটা দেখতে পেল সে। সে আর বাশার দুজনেই একসঙ্গে গুলি করল। দুজনেই মরিয়া হয়ে উঠেছে। বাশার নিজের নার্ভ ছিন্ন রাখল, এমনকি গাড়ির কাছেই কোথায় ঠং করে গুলি লাগলেও সে কভার নিল না। এবার জিপের ফুয়েল ট্যাংক টার্গেট করার চেষ্টা করল কিন্তু জিপটা সোজা হয়েই লাফ দিয়ে আগে বেড়েছে, এবারও টার্গেটে লাগাতে পারল না বাশার। জিপটা চলতে শুরু করতেই মরিয়া বাশার বেরিয়ে এলো আড়াল ছেড়ে, তার ঠিক পেছনেই চিৎকার করে ওকে ধামতে বলছে সেই পুলিশটা। আরো দুই-তিন রাউন্ড গুলি করল বাশার মরিয়ার মতো, কিন্তু জিপ ততক্ষণে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে রাস্তার ওপরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বাশার। ‘শিট,’ বলে রাগ আর হতাশার সঙ্গে চিৎকার করে উঠল ও।

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

বোম্বে বন্দরে সায়াহে

ক্ষণিকের ভেতরে পরিস্থিতি বদলে যেতেই প্রায় প্রতিটা লোক চমকে উঠল, শুধু নিজেকে ছিন্ন রাখল কর্নেল স্যাভার্স। উড়ে আসা কাঁচিটা দড়িটা কেটে দিতেই সবাই যখন আক্রমণের উৎসের দিকে কর্নেল তখন প্রথমে নজর দিয়েছে নিজের দিকে। হিসেবে কর্নেলের এই মুহূর্তে আতঙ্ক বোধ করার কথা কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত উপায়ে সে অত্যন্ত উৎফুল্ল বোধ করতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত কিন্তু খুব আশ্চর্যজনক নয়। কারণ ঠিক যেই মুহূর্ত থেকে কর্নেল এই কাজের জন্য হ্যাঁ বলেছে—ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে সে নিজের সেই পুরনো স্বত্বকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে চলেছে কিন্তু সত্যিকার অর্থেই সেই পুরনো নিজেকে সে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না। ঠিক এই মুহূর্তে যেন সেই পুরনো নিজেকে সে আবিষ্কার করতে শুরু করেছে। সেই দক্ষ অভিজ্ঞ ঠান্ডা মাথার যোদ্ধা বিপদে যে ঘাবড়ায় না, ভয়বহ পরিস্থিতিতেও যে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ চালিয়ে যেতে পারে, খুঁজে বের করার চেষ্টা করে সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে সেরা উপায়টাকে।

ঠিক যেই মুহূর্তে কর্নেল ঘোড়সওয়ার লোকগুলোকে দেখতে পেয়েছে খুবই স্বাভাবিকভাবেই সে অনুধাবন করতে পেরেছে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো এই লোকগুলো উপস্থিত হয়েছে তাদের বিপদ থেকে মহাবিপদে ফেলার জন্য। আর ওর সঙ্গে কথোপকথন শুরু করার কয়েক মিনিটের ভেতরে সে বুঝতে পেরেছে এরা বিদ্রোহী না ডাকাত না সৈন্য—সেটা জানার বা বোঝার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই, এ-ধরনের মানুষ কোন পক্ষের সেটা জানার প্রয়োজন নেই। শুধু এটা অনুধাবন করাটাই জরুরি যেকোনো ভদ্রলোকের জন্য এ-ধরনের রক্তপিপাসু মানুষেরা শ্রেফ দুঃসংবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। আর তাই যদিও সে জানত এতগুলো লোকের সঙ্গে এভাবে লড়াই করে কোনো লাভ নেই, তাও সে চেষ্টা করেছিল অন্তত নিজে না হলেও ফটিক ছেলেটাকে যদি পালানোর কোনো সুযোগ করে দেওয়া যায়। কিন্তু সেটাও সম্ভব না হয়ে বরং দলনেতাকে হত্যা করে দুজনকে আরো বড় বিপদে ফেলে দিয়েছে সে। আগে হয়তো শুধু মরতে হতো, এখন মরতে হবে খুবই বাজেভাবে এবং সম্ভাব্য অত্যাচারিত হয়ে। আর সে-সময়েই জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদের মতো ঝোপের ভেতর থেকে ছুটে আসে কাঁচিটা।

শত্রু-মিত্র জানা নেই, এটা মহাবিপদের ওপরে আরেক ধাপ মহা-মহাবিপদ কি না জানা নেই। এই আশীর্বাদের কারণে আসলে উদ্ধার পাওয়া যাবে কি যাবে না, সেটাও জানা নেই। কর্নেল শুধু অনুধাবন করতে পারে তার করণীয়। আর সেটা

সিপাহী

হলো, এটা একটা সুযোগ আর এই সুযোগ তাকে কাজে লাগাতে হবে। সত্যি কথা হলো তার নিজের জীবনের খুব একটা দাম তার কাছে নেই। আরো বড় সত্যি কথা হলো সে আসলে মারা গেছে আরো অনেক আগেই। তাই বলে ফটিক ছেলেটাকে সে মরতে দিতে পারে না। যে-সুযোগ এসেছে এই সুযোগের একটাই উদ্দেশ্য তার জন্য, সেটা হলো—হয় এই ছেলেটাকে বাঁচানো অথবা তাকে পালানোর রাস্তা করে দেওয়া। আর সবমিলিয়ে সে খুশি হয়ে উঠল কারণ এই প্রাণঘাতী বিপদের ভেতরেও তার সক্রিয় মস্তিষ্ক কয়েক মুহূর্তের ভেতরে এত সব কিছু ভেবে নিজের করণীয় ঠিক করে ফেলতে পেরেছে দেখে। সেই পুরনো ভয়ংকর যোদ্ধা কর্নেল ফিরে এসেছে তার ভেতরে। অনুধাবনটা এতটাই খুশি করে ফেলল তাকে, এক লাফে উঠে দাঁড়াল সে।

নিজের কবজি বাঁকিয়ে প্রথমে খুলে ফেলার চেষ্টা করল হাতের দড়ির বাঁধনটা। সেটা করতে না পেরে, আশপাশে তাকিয়েই দেখতে পেল, মাটিতে গৈঁধে আছে উড়ে আসা সেই কাঁচিটা। মাটিতে এক গড়ান দিয়ে সে পৌঁছে গেল ওটার দিকে। আশপাশে চিৎকার-চৈচামেচি হচ্ছে, কোনোদিকে মনোযোগ না দিয়ে সে নিজের কাজে মনোযোগ দিল। কাঁচিটার কাছে পৌঁছে কয়েক পোঁচে দড়িটা কেটে হাতদুটোকে মুক্ত করে স্রেফ একবার ঝাড়া দিল নিজের হাতটাকে। তারপর কাঁচিটা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে সন্ধান করবে ফটিকের। ছেলেটা মাটিতে বসে জান দিয়ে চেষ্টা করছে হাতের দড়ি খোলার। ‘ফটিক,’ বলেই সে এক দৌড়ে পৌঁছে গেল ছেলেটার কাছে।

এই ছেলেটা বুদ্ধিমান, আগেও দেখেছে কর্নেল। কর্নেল পৌঁছে যেতই ছেলেটা নিজের দুই হাত বাড়িয়ে দিল কর্নেলের দিকে, হাতের কাঁচিটা সাবধানে দুই হাতের মাঝে ঠেকিয়ে কয়েক পোঁচে দড়িটা কেটে দিল কর্নেল। ‘পালানো ফটিক,’ বলেই সে ফিরে তাকাল উদ্ভূত পরিস্থিতি বোঝার জন্য। দায়িত্ব পালন হয়েছে, এবার পরিস্থিতি সামলানো যায় কি না দেখতে হবে। আক্রমণকারীদের দিকে তাকিয়েই সে বোকা বনে গেল পরিস্থিতি দেখে।

কর্নেলদের আক্রমণকারী দলে ছিল ছয়জন। দুজন আগ্নেয়াস্ত্রধারী, আর চারজন সাধারণ। দলনেতাসহ দুজনকে কর্নেল নিকেশ করেছিল, এরপর ওদের বন্দি করেছিল বাকি চারজন। এরাও ওদের ঘোড়ার পেছনে বেঁধে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে মারতে চেয়েছিল। ওরাই এখন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। কর্নেল সেদিকে তাকিয়ে ওদের মারবে না বাঁচাবে ঠিক বুঝতে পারল না।

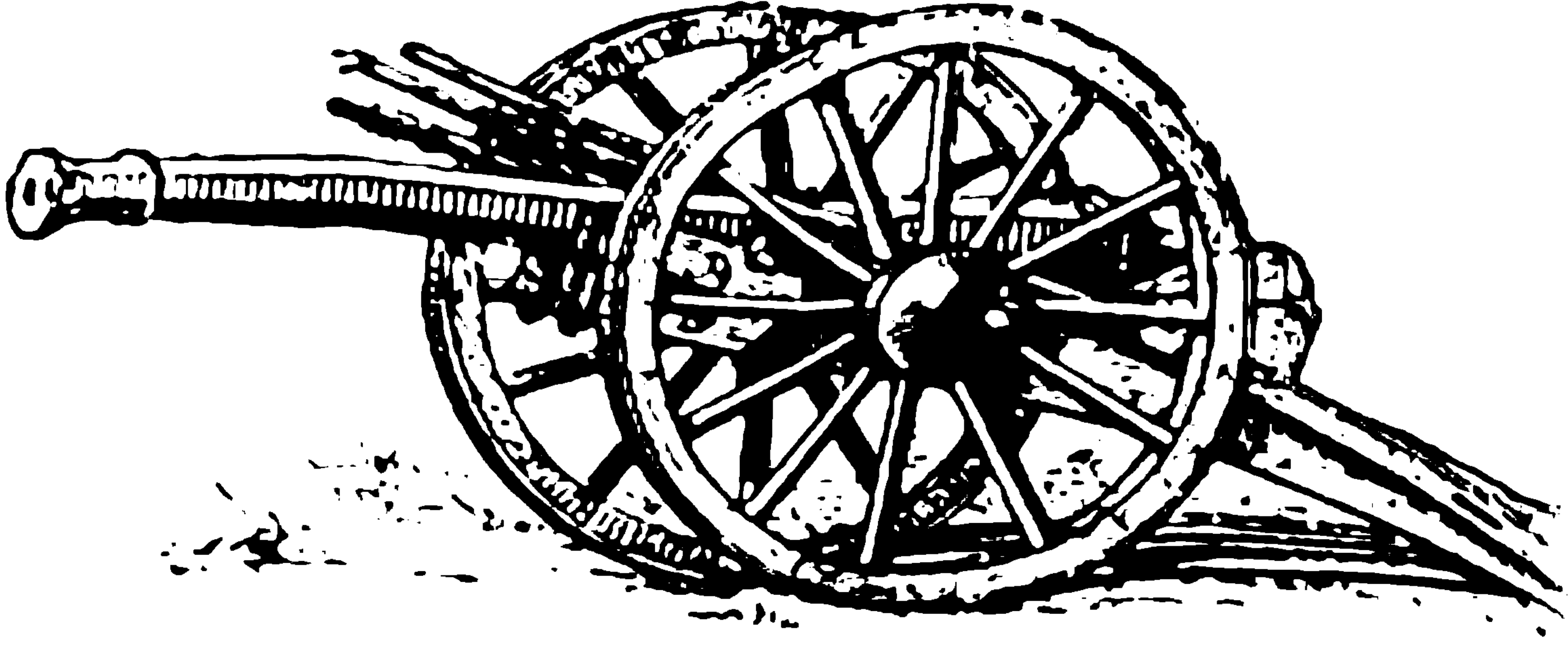
অন্য চার আক্রমণকারীর ভেতরে একজন মাটিতে পড়ে আছে, তার গলায় বিঁধে থাকা ছুরির ক্ষত দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। এরকম ক্ষত নিয়ে কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। আর বাকি তিনজন এখন আক্রমণ পালটা

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

আক্রমণে ব্যস্ত একজনের সঙ্গে। সেদিকে দুই পা এগিয়ে প্রথমবারের মতো মানুষটাকে পরখ করতে পারল কর্নেল। লম্বা-শক্তিশালী গড়নের এক যুবক বয়স বিশ থেকে পঁচিশের ভেতরে হবে। তার পোশাক খুবই বিচিত্র আর অদ্ভুত। শরীরের নিচের অংশে মিলিটারির ইউনিফর্ম, কারণ এরকম জুতো আর সাদা বিট্রেস সাধারণ ভারতীয়রা পরে না। আর ওপরের অংশে সাধারণ ভারতীয় পোশাক। তার কোমরে ঠিক কর্নেলের মতোই একটা বেল্ট আর সেটার একপাশে ছুরি এবং অন্যপাশে পিস্তল দুটোই এখনো ভেতরে রক্ষিত অবস্থায়। আর তার দুই হাতের একহাতে একটা ছোট লাঠি এবং অন্যহাতে লম্বা একটা ছুরি। এই দুটো জিনিসই কর্নেল স্থানীয়দের ব্যবহার করতে দেখেছে কিন্তু এই মুহূর্তে সে নাম মনে করতে পারল না অস্ত্র দুটোর।

বিচিত্র পোশাক পরা লম্বা ভারতীয় লোকটার মুখে লম্বা দাড়ি আর মাথায় পাগড়ি। লোকটা এত দ্রুত নড়ছে আর আক্রমণ করছে তার শত্রুদের কর্নেলের চোখে প্রায় ঝাপসা লাগছে লোকটাকে। তিনজন প্রতিপক্ষের সঙ্গে এমনভাবে লড়ছে লোক যেন নিজের গোয়ালে বসে মাছি তাড়াচ্ছে। লোকটার শরীরের নিচের অংশ বলতে গেলে স্থির, আর কোমরের ওপরের অংশ প্রতিমুহূর্তে বাঁক নিচ্ছে, মোচড় খাচ্ছে এবং ব্যস্তভাবে হয় আক্রমণ ঠেকাচ্ছে আর না হয় আক্রমণ করছে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে লড়াইয়ের এই ভঙ্গিটা চিনতে পারল কর্নেল। স্থানীয় ভাষায় এটাকে কালারিপাইয়াফ্র বলে ভারতীয়রা।

দুর্দান্ত সব শারীরিক কসরত এবং নানা ধরনের পশু এবং প্রাণীর চলাচল এবং আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার কৌশল প্রয়োগ করে নিজেকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার এই কৌশল একদিকে যেমন কঠিন অন্যদিকে ঠিক ততটাই কার্যকর যদি এটাকে ঠিকঠাক কাজে লাগানো যায়। এই লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে এই কৌশলের সর্বোচ্চ পর্যায় আয়ত্ত করেছে সে। তিন প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই চলল টানা প্রায় বেশ কিছুক্ষণ। প্রতিরক্ষা এবং আক্রমণের পারদর্শীতায় অল্প সময়ের ভেতরেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেল জয়-পরাজয়ের। ঘোড়সওয়ারদের একজন আগের জনের মতোই গলার কাছে তিনটে ক্ষত নিয়ে পড়ে গেল মাটিতে দ্বিতীয়জনকে নাশতানাবুদ হওয়ার শেষ পর্যায়ে দেখে তৃতীয়জন দিগ্বিদিগ্ ভুলে দৌড়ে পালাতে গিয়ে সোজা এসে পড়ল কর্নেলের সামনে। কাঁচির এক কোপে সোজা মাটিতে ফেলে ফিরে তাকাল সে লোকটার দিকে। ঠিক একই ভঙ্গিতে অস্ত্র থেকে রক্ত মুছতে মুছতে লোকটাও তাকিয়ে আছে কর্নেলের দিকে। দুজনেই ক্ষণিকের জন্য তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে, তাকিয়েই আছে।



অধ্যায় সতেরো

বর্তমান সময়

চরপাড়া এলাকা, ময়মনসিংহ

অপসূর্যমান জিপটার দিকে তাকিয়ে রাগ আর হতাশার সঙ্গে চিৎকার করে বাশার ফিরে তাকান গাড়িটার দিকে, যেটা বলতে গেলে ওদের উদ্ধার করেছে।

পুলিশের পোশাক পরা লোকটা বাশারের থেকে কয়েক ফিট পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখে-মুখেও খানিক হতাশা, জিপটা এবং ওটাতে থাকা কাউকে ধরতে না পারার কারণে। ‘পালিয়ে আর যাবে কোথায়, সব সিগন্যালে সতর্ক করে দিচ্ছি,’ বলে সে হাসিমুখে ফিরে তাকান বাশারের দিকে। ‘স্যার, আমি রবিউল, ইনসপেক্টর রবিউল,’ বলে সে হাসিমুখে দুই পা সামনের দিকে এগিয়ে নিজের হাত বাড়তে যাবে বাশারের দিকে, তার আগেই বাশার সোজা নিজের পিস্তল তুলল পুলিশের পোশাক পরা লোকটার দিকে। সদ্য ইনসপেক্টর পরিচয় দিয়ে নিজের নাম বলে লোকটার মুখে বত্রিশ ভোল্টের হাসি ফুটে ছিল, বাশারকে পিস্তল তুলতে দেখে সেই হাসি বন্ধ না হলেও মনে হলো কেউ যেভাবে রেগুলেটর ঘুরিয়ে ফ্যানের স্পিড কমিয়ে দেয় বা বাটন ঘুরিয়ে স্পিকারের ভলিউম কমিয়ে দেয়, ঠিক সেভাবে বাটন ঘুরিয়ে তার হাসিটা কেউ কমিয়ে দিল। ‘স্যার, স্যার করেন কি!’ ছোট পোলাপানের সারেভারের ভঙ্গিতে সে কাঁধের দু পাশে নিজের দুই হাত তুলল, এক হাতের পিস্তলের মুখ ওপরের দিকে। ‘আমি আপনাদের উদ্ধার—’

‘একদম চূপ,’ যদিও বাশার অস্ত্র তুলেছে কিন্তু সে নিজেও জানে না যে এটাতে আর গুলি আছে কি না। ওর হিসেব বলে এটাতে গুলি থাকার সম্ভাবনা নেই বলতে গেলে। সেই সঙ্গে সে আড়চোখে একবার দেখে নিল গাড়িটার দিকে। এতক্ষণ এটাকে গাড়ি বললেও এটাও আসলে পুলিশেরই একটা ভ্যান। ওটার পাশের আরো দুজন পুলিশ আর তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে সামিরা। সবাই তাকিয়ে আছে

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

বাশারের দিকে। বাশার নিজের হাতের অস্ত্র নাড়ল। ‘আগে আপনার আইডি কার্ড দেখব।’

‘অবশ্যই স্যার,’ বলে লোকটা সাবধানে নিজের পিস্তলটা ধীরে ধীরে নামিয়ে এনে হোলস্টারে ভরে ফেলল। ‘তবে স্যার, এটার কোনো দরকার নেই,’ তার মুখে ধীরে ধীরে সেই ভারি হাসি ফিরে আসছে। ‘কাম কথা কয় স্যার। আইডি তো যেকোনো নকল করতে পারে। যারা আপনেনগো অপহরণ—’

‘কথা কম ইনসপেক্টর রবিউল, আইডি দেখি আগে—’ বাশার নিজের পিস্তল নেড়ে বলে উঠল।

‘স্যার, আমার দেওয়া পিস্তল দিয়ে আমরাই হুমকি দিতেছেন, তাও আবার গুলি শেষ হওয়া পিস্তল,’ কথা বলতে বলতে সে নিজের আইডি বের করে ছুড়ে দিল বাশারের দিকে। বাশার মাটি থেকে গুটা তুলে পরখ করে, সেটাকে হাতে রেখে নিজের পিস্তল নামিয়ে নিতে নিতে ভাবল লোকটা এরকম বোকাম মতো হাসতে থাকলেও সে বুদ্ধিমান, বাশারের পিস্তলে গুলি শেষ এটা সেও হিসেব রেখেছে। মানে ঠাণ্ডা মাথার লোক। ‘ওকে ইনসপেক্টর রবিউল, আপনি এবং আপনারা বেনিফিট অব ডাউট পেতে পারেন।’

‘অবশ্যই পেতে পারি স্যার,’ বাশার পিস্তল নামিয়ে নিয়েছে দেখে সেইরকম খুশি হয়ে সে এগিয়ে আসতে লাগল বাশারের দিকে।

‘এক মিনিট,’ বাশার হাতের পিস্তল না তুলেই নেড়ে বলে উঠল। ‘শোনেন ইনসপেক্টর, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। দেখতেই পাচ্ছেন একের পর এক ঘটনা ঘটছে, নিজেদের ভেতরে নিজেদের লোক অপহরণ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমি কীভাবে বিশ্বাস করব আপনারা জেনুইন লোক, আগের লোকদের মতো ফেইক না।’

‘স্যার, আমরা আপনাদের উদ্ধার করলাম এত ঝুঁকি নিয়ে,’ সে অহসায়ভাবে একবার নিজের লোকদের দিকে দেখল।

‘সেটা হতে পারে আবারো অপহরণ করার জন্য,’ বলে বাশার মাথা নাড়ল। ‘ইনসপেক্টর রবিউল,’ বলে সে এগিয়ে গেল গাড়িটার দিকে। ‘আমি হয়তো আপনাদের অবিশ্বাস বা সন্দেহ করছি, কিন্তু আমি নিরুপায়। দেখেন আমাদের যারা অপহরণ করতে নিচ্ছিল তারা এমনকি পাসকোডও জানত। তাহলে বলেন আপনাদেরকে কীভাবে বিশ্বাস করি।’

‘বলেন কি স্যার, ঘটনা বলেন তো—’

‘আমি বলছি,’ বাশার কথা বলার আগে সামিরা কথা বলে উঠল পেছন থেকে। সংক্ষেপে সে বলে গেল কী হয়েছে।’

‘সন্ধানাশ,’ বলে নিজের একটা হাত মাথায় তুলে হায়-হতাশ করতে যাচ্ছিল ইনসপেক্টর রবিউল, তার আগেই বাশার আবারো থামিয়ে দিল তাকে। ‘কাজের

সিপাহী

কথা বলেন, আগে সত্যিকার অর্থে প্রভ করেন, আপনারা জেনুইন লোক, আমাকে অধরিটির কারো সঙ্গে কথা বলান, প্রপার চ্যানেলে। এরপর ব্যাখ্যা করেন, আপনারা কীভাবে আমাদের খুঁজে পেলেন একেবারে সঠিক সময়ে,' বলে সে নিজের খালি হাতটা তুলে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, আবারো সামিরা কথা বলে উঠল। মেয়েটার কথা বলার ধরনই এমন, সাধারণ কথাও ধমক মনে হয়।

‘উলটা-পালটা কথা বলবেন না প্রিজ, সেটার সময় এবং মুড কোনোটাই নেই আমাদের দুজনার কারো।’

এই প্রথমবারের মতো রবিউল কথা বলার আগে হাসল না, যদিও তার চেহারাটাই এমন হাসির একটা ভাব মুখে লেগেই থাকে। বাশার ধারণা করল এই লোক কাঁদলেও অনেকে ভাবতে পারে এ আসলে হাসছে।

‘স্যার, আপনাদের অপহরণের পেছনে আমগো দায় আছে কিছুটা,’ বলতে বলতে আবারো তার মুখ হাসি হাসি হয়ে গেল। ‘আপনাদের আসলে রিসিভ করার কথা ছিল আমাদের। কাল রাতে যখন স্থানীয় পিবিআইএসের ওপরে আপনাদের রিসিভ করার নির্দেশ আসে ওরা সব ঠিক করে রাখে আপনাদেরকে কারা রিসিভ করবে, কোথায় নিয়ে যাবে। খুবই সতর্কতার সঙ্গে সব ঠিক করা থাকে। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের পেট খারাপ হয়ে যায় মাঝরাতে। তখন কাউকে না পেয়ে টিম লিড করার জন্য লোকাল থানায় যোগাযোগ করা হইলে দায়িত্ব এসে পড়ে আমাদের ওপরে। আপনোগোরে যখন রিসিভ করার কথা, তার পনেরো-বিশ মিনিট পরে আসি আমরা। এসে দেখি, ময়দানে হেলিকপ্টরও নাই, আপনারাও নাই। প্রথমে ভাবি আপনারা চলে গেছেন। তারপর খোঁজ নেওয়া হইলে জানা যায় কোনো ট্রেস নাই। কী করব না করব বুইঝা ওঠার আগেই থানা থেইকা বলা হয় রেড অ্যাক্ট জারি করতে, করব করব ভাবতেছি এমন সময় আমরা গুলির শব্দ শুনি, অনুমান করি কিছু একটা হবে।’

বাশার আনমনেই মাথা নাড়ল লোকটার কথা সেস মেইক করে। ওরা যখন জিপের ভেতরে অপহরণকারীদের আক্রমণ করে জিপের সামনে থেকে ওদের সাবধান করার জন্য দলনেতা লোকটা পর পর দুটো গুলি করেছিল ফাঁকা জায়গায়, ওদের মাঝ বরাবর। এই গুলির শব্দই সম্ভবত এরা শুনেছিল। ‘গুলির শব্দ শুনেই বুঝে ফেললেন আমরা কোথায় আছি?’ বাশার এখনো তীর্থক স্বরেই জানতে চাইল।

বাশারের বলার ধরন শুনে লোকটা আবারো হেসে উঠল। ‘স্যার, যা বলেন, এত সহজ হইলে তো ভালোই ছিল। আমরা একটা আন্দাজ করতে পারি কোনদিকে আছেন। ওই পোলাটা,’ বলে সে সামিরার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা কনস্টেবল ছেলেকে দেখিয়ে বলে উঠল, ‘ও এই এলাকারই পোলা, সব চিনে। ও আমাদের গাইড করে কোনদিকে যাইতে হবে, যাইতে যাইতে আপনাদের জিপটা

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

দেখতে পাই একটা গলিতে সেটা ধরতে ধরতেই আরেক দিকে হারানো যায়। আমরা ভাবছি গেছে এমন সময় জিপটা দেইখাই আর ওইটার ভেতরে আমনগো অস্ত্র দিয়া জিম্মি করা দেইখা আমরা সোজা গাড়ি চালায়ে দিই জিপের ওপরে।' রবিউলের অকপট বক্তব্য শুনে চোখ কপালে উঠে গেল বাশারের, একবার সে সামিরার দিকে দেখল, তারপর ফিরে তাকাল রবিউলের দিকে।

'কোনো পরিকল্পনা নেই, কী হবে না হবে, এসব ভাবাবিহীন দরকার নেই, স্রেফ চালিয়ে দিলেন জিপের ওপরে,' বাশার ভারি মুখে কথা বলছে কিন্তু তাতে রবিউলের মুখের হাসি এক বিন্দু স্থান হলো না। 'আমাদের উদ্ধার করতে এসে তো মেরেও ফেলতে পারতেন, আপনারাও মরতে পারতেন।'

'হে হে, স্যার হয় নাই তো কিছু, আপনারাও উদ্ধার হইছেন,' বলে সে সমর্থনের আশায় সামিরার দিকে ফিরে তাকাল। 'কি বলেন ম্যাডাম, ঠিক বলছি কি না?'

'মোটোও ঠিক বলেন নাই,' বাশার রাগের সঙ্গে প্রায় ধমকে উঠল রবিউলকে। 'আপনার সুপিরিয়র কে, তার সঙ্গে কথা বলান আমাকে। আমার পরিচিত অথরিটিও কেউ না হলে আমি আর কাউকে ট্রাস্ট করি না। বিশেষ করে আগের গ্রুপ পাসকোড কীভাবে পেল, এটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক আছে স্যার,' রবিউলের মুখের হাসি মোটেও স্থান হলো না, সে টকিতে কথা বলতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর সে টকি বাশারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'স্যার, আপনি পাটোয়ারি স্যারকে তো চেনেন মনে হয়, পিবিআইএসের আপনাদের স্পেশাল উইংয়ের—'

'আমি চিনি তাকে,' বাশার গম্ভীর মুখে বলে উঠে টকিটা রবিউলের হাত থেকে নিতে নিতে চারপাশে দেখল, হঠাৎ ওর একটা উপলব্ধি হচ্ছে, এখানে এভাবে থাকাটা একেবারেই নিরাপদ হচ্ছে না। যেকোনো সময়ে যেকোনো একটা বিপদ হতে পারে। এমনকি ওদের আক্রমণকারীরা আরো লোকবল নিয়ে এসে আক্রমণ করতে পারে। এদের যে ক্ষমতা আর এক্সেস সে দেখতে পাচ্ছে, এতে এটা পরিষ্কার যে এরা কাউকেই ভয়তো পায়ই না, উলটো এরা চাইলে যে কাউকে ম্যানপুলেট করতে পারে। কাজেই এখানে এভাবে থাকার ঝুঁকি নেওয়াটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না।

'স্যার,' বলে টকিতে বাশার পাটোয়ারির সঙ্গে কথা বলতে লাগল। পাটোয়ারির চল ভাষায় কথা বলা গলার স্বরটা শুনে পরম স্বস্তি বোধ করল বাশার। 'জি স্যার, আমি এটাই করছি,' কথা শেষ করে সে টকিটা রবিউলকে ফেরত দিতে দিতে বলে উঠল। 'পাটোয়ারি স্যার কী বলে শোনেন, তারপর দ্রুত রওনা হবো আমরা।'

সিপাহী

রবিউল টকিতে কথা বলতে লাগল, বাশার এগিয়ে গেল সামিরার দিকে।
'আপনি ঠিক আছেন?'

'আমি ঠিক আছি,' যদিও সামিরার এলোমেলো চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না সে ঠিক আছে। 'আপনি কার সঙ্গে কথা বললেন?'

'পাটোয়ারি স্যারের সঙ্গে,' বলে বাশার সামিরার আরেকটু কাছে এগিয়ে বলে উঠল। 'এখানে এভাবে থাকাটা আমার কাছে একদম নিরাপদ মনে হচ্ছে না। পাটোয়ারি স্যার বলেছেন আমাদের নতুন বাজারের ল্যাব কাম গেস্ট হাউসে যেতে। ওখানেই আমরা ফ্রেশও হয়ে নিতে পারব, সেই সঙ্গে ওখান থেকেই আমাদের কাজ শুরু। তবে তার আগে—'

'স্যার চলেন,' রবিউল কথা শেষ করে এসে তার বিখ্যাত হাসিমুখে বলে উঠল, 'চলেন স্যার, নতুন বাজারের ল্যাবে যাই।'

বাশার মাথা নেড়ে সায় জানাল, জিপে উঠে সামিরার কানের পাশে মুখ নামিয়ে সে বলে উঠল, 'কাজ তো শুরু করবই, কিন্তু এর আগে আমাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে। তা-না হলে ভীষণ বিপদে পড়ব আমরা পরে।'

সামিরার মাথা নেড়ে সায় জানাল।

অতীত

বোম্বে বন্দরের সায়াফে

কর্নেলই প্রথম কথা বলে উঠল, লোকটার জাত-পাত-ভাষা না জানলেও নিজের কিরে আসতে থাকা কাজ চালানোর মতো স্থানীয় ভাষায় ধন্যবাদ জানাল কর্নেল। লোকটা কোনো জবাব দিল না, নিজের অস্ত্রটা কোমরের খাপে রেখে সে কপাল থেকে ঘাম মুছে একবার চারপাশে দেখে নিল। শত্রুরা সব নিকেশ হয়েছে দেখে নিশ্চয় রাগের সঙ্গে থুতু ফেলল মাটিতে। 'শালার ভেলাপোকার দল, সুযোগ নেওয়া মাছির দল,' বলে সে দুই পা এগিয়ে এলো কর্নেলের দিকে। সরাসরি কর্নেলের চোখের দিকে তাকাল। কর্নেলও তাকিয়ে আছে তার দিকে, লোকটা সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, 'কর্নেল স্যার্স, হজুর?' তার গলার সুরে যতটা না প্রস্রবোধকতা, তারচেয়ে বেশি নিশ্চয়তা।

কর্নেল বুঝই অবাক হলো লোকটার মুখে তার নিজের নাম শুনে। 'আপনি—' বলেও লোকটাকে ভালোভাবে খেয়াল করে সে নিজেকে ওধরে নিয়ে বলে উঠল, 'তুমি আমাকে চেনো কীভাবে?' আর যদিও কর্নেল স্থানীয় ভাষা ভালোই জানে কিন্তু বিগত কয়েক বছরের অনভ্যস্ততা তার ভেতরে অস্বস্তি তৈরি করেছে, বিশেষ করে

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

ইংরেজিতে সবই ইউ কিছু স্থানীয় অনেক ভাষাতেই সম্বোধনের মাত্রা নির্ধারিত হয় বয়স-সম্পর্ক ইত্যাদির ওপরে ভিত্তি করে।

‘হজুর, ঠিক যেভাবে এই ফটিক ছেলেটা আপনাকে চেনে,’ বলে সে কর্নেলের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা অবদুল্লার দিকে ইশারা করল। কর্নেল আরো অবাক হলো ছেলেটা ফটিককেও চেনে বলে। ‘মানে, আমি ঠিক বুঝলাম না,’ বলে সে একবার ফটিককেও দেখে নিল। ছেলেটাকে সে সুযোগ বুঝে পালাতে বলেছিল। এই ছেলে না পালিয়ে ছিন্ন হয়ে ছিল তার পেছনে, বিষয়টা খানিক বিরক্ত করল কর্নেলকে।

‘হজুর, আপনি আসতেছেন আমি জানতাম,’ বলে সে ইশারায় বন্দরের দিকে দেখাল। ‘জাহাজ থেইকা আপনারে ঘাটে আনার দায়িত্ব ছিল ফটিকের ওপরে, আর ঘাট থেইকা আপনাকে চৌকিতে নেওয়ার দায়িত্ব ছিল আমার ওপরে। তাই আমি জানতাম, আপনে কখন আসবেন, আপনার লগে লঙ্কর কে থাকবে।’

যদিও এখনো সন্দিহান, তাও কর্নেল খানিক স্বস্তি বোধ করল। বন্দরের যে-অবস্থা দেখছিল, সেই সঙ্গে সার্বিক পরিস্থিতি যেভাবে একের পর এক খালি খারাপই হচ্ছিল, তাতে কোনদিকে যাবে বা কী করবে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না কর্নেল—বিশেষ করে অথরিটির সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করবে কিংবা যোগাযোগ করার মতো একটা পছা খুঁজে বের করতে পারবে, কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। এই ছেলে যা বলছে সেটা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তবে যোগাযোগ যদি করতে পারেও, ভালো না হলে অন্তত যোগাযোগ করার মতো একটা পছা তো বের করতে পারবে। ‘আমি তোমার কথা বিশ্বাস করব কীভাবে?’ বলে সে ইশারায় আশপাশে পড়ে থাকা লোকগুলোকে দেখাল। ‘আমি কীভাবে বুঝব যে এদের থেকে তুমি আলাদা কিছু নও।’

‘জি হজুর,’ বলে ছেলেটা সামান্য মাথা ঝাঁকাল। ‘আপনার কথা একেবারে সত্য এবং আমি শতভাগ সম্মতি জানাই,’ বলে সে মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে আবারো কর্নেলের চোখের দিকে তাকাল। ‘তবে আমি প্রমাণ করতে পারব, আমার কাছে উপায় আছে। তবে আগে একটা অনুরোধ আছে। এইখান থেইকা এই মুহূর্তে আমগো সরে পড়া উচিত। যেকোনো সময়ে এখানে আরো বড় বিপদ আইসা উপস্থিত হইতে পারে। অনুরোধ জানাই হজুর,’ ছেলেটা এখনো মনোযোগের সঙ্গে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে আছে, একেবারে চোখের দিকে, সে এতটাই মনোযোগের সঙ্গে সরাসরি কর্নেলের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে যে কর্নেল মোটামুটি অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে। কর্নেলের মনে হলো ছেলেটা কিছু একটা খুঁজছে বা বোঝার চেষ্টা করছে কর্নেলের চোখে। কিন্তু কর্নেল পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না।

‘আমি সেটা বুঝতে পারছি কিন্তু তুমি সঠিক প্রমাণ না দেওয়া পর্যন্ত আমি কিছুই করব না।’

সিপাহী

‘ঠিক আছে হজুর অন্তত এইগুলোতে রাস্তা খেইকা সরিয়ে, ওই গাছটার আড়ালে গিয়ে কথা কই। আর ঘোড়াগুলো—’

‘এই ছেলে প্রসঙ্গ বদলাবে না,’ কর্নেল ছেলেটাকে কাছ থেকে ভালোভাবে দেখে অনুধাবন করার চেষ্টা করছে ছেলেটার পুরো অবয়বটাকে। অত্যন্ত সূচ্যম গড়নের এবং সে যে ভালো যোদ্ধা, এটা সে আগেই প্রমাণ করেছে, ছেলেটার মুখে দাড়ি, মুখে কপালে একাধিক কাটাকুটির দাগ, মাথার পাগড়ির মতো কাপড় প্যাচানো, গলায় বাঁধা একটা রুমাল, আর গায়ে উর্ধ্বাঙ্গে সাধারণ আর পায়ে মিলিটারির পোশাক। চেহারাটা পরিচ্ছন্ন, তবে মুখ এবং শরীর একেবারে রোদেপোড়া। সবমিলিয়ে সঠিক কোনো ধারণা করার মতো মানুষ নয়, তার ওপরে বয়সের চেয়ে বয়স্ক দেখায় তাকে। কর্নেল ছেলেটাকে দেখতে দেখতে অনুধাবন করল, সে যেভাবে ছেলেটাকে দেখছে তার চেয়েও গভীর আত্মহ নিয়ে ছেলেটা পরখ করেছে কর্নেলকে।

‘জি, হজুর আপনার আদেশ যথা আজ্ঞা,’ বলে সে আবারো সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে বলে উঠল, ‘হজুর প্রথম কথা, আমি আপনাকে এই তেলাপোকাকুলো খেইকা রক্ষা করছি, দ্বিতীয় কথা আমি জানতাম আপনারা এই এলাকার আশপাশেই কোথায় আছেন, সঠিক সময়ে আমার এই জায়গায় আসাও প্রমাণ করে আমার কথা—’

‘দেখো—’ ছেলেটার আজ্ঞেবাজে ব্যাখ্যায় রীতিমতো বিরক্ত বোধ করতে শুরু করেছে কর্নেল।

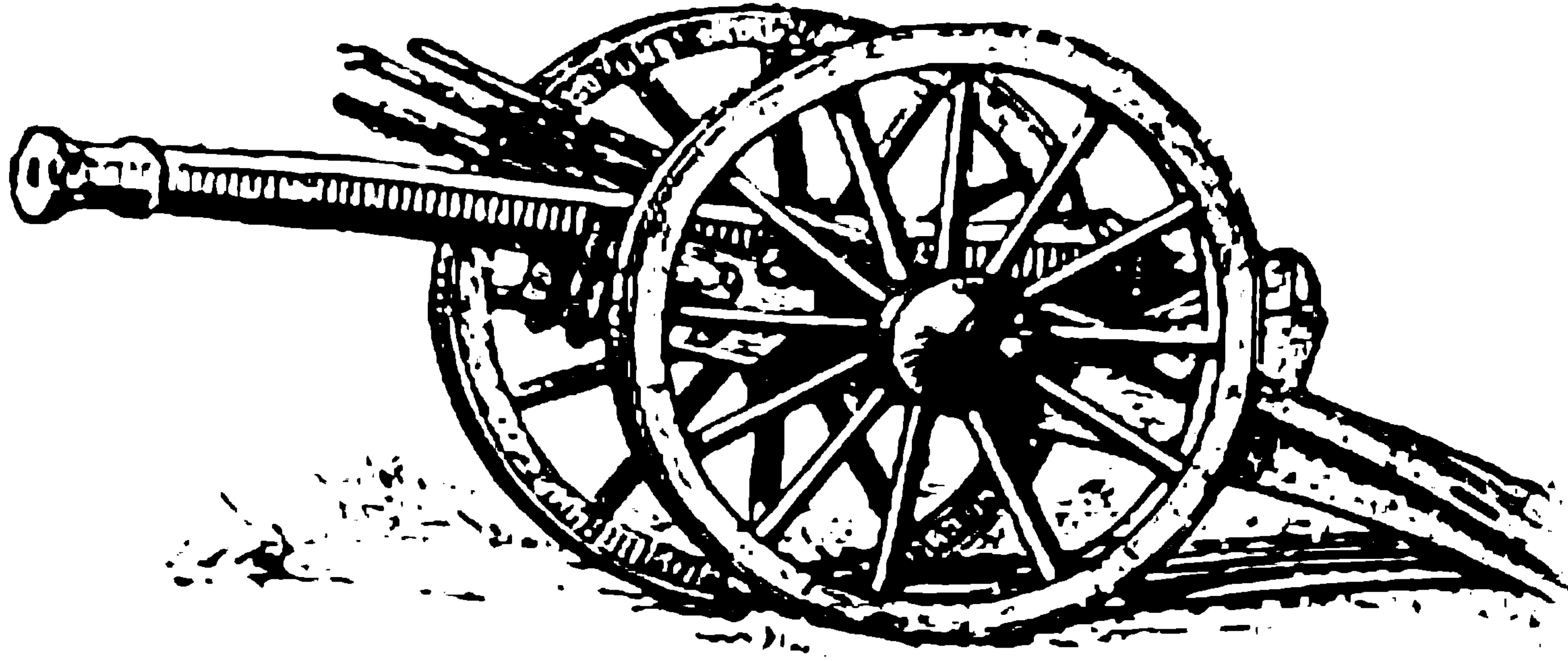
‘হজুর অনুমতি দিলে আমি কথা শেষ করি,’ ছেলেটা মাথা নিচু করেই বলে উঠল। ছেলেটার আচার-আচরণ তার চেহারার একেবারে বিপরীত, রুদ্ধ চেহারার থেকে একেবারেই ভিন্ন এবং আজ্ঞাবহ তার আচরণ, যেটা মিলিটারির সঙ্গে তার সঙ্গিষ্টতা প্রমাণ করে। ‘হজুর, আমি জানি এইগুলো কোনোটাই সঠিক প্রমাণ না, আর তাই,’ বলে সে কোমর থেকে একটা গোল করে পাকানো কাগজ বা কাপড়ের মতো বের করে আনল। ‘হজুর এই সন্দেশা, আপনার আগমনের খবর এবং আপনার বন্দরের ঘাট থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে দেওয়া হইছিল প্রমাণ হিসেবে আপনারা দেখানোর জন্য,’ বলে সে মাথা নিচু করে কাগজটা কর্নেলের সামনে তুলে ধরল।

কর্নেল জিনিসটা সাবধানে হাতে নিয়ে মুখ থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখল। ভারতবর্ষের পথে-প্রবাসে সে নানা ধরনের ঠগ আর কারসাজি করার লোক দেখেছে, যারা এরকম পত্রের ভেতরে গুণ্ডা লাগিয়ে মানুষকে কাবু করে বশ করে। কিন্তু

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

পত্রটা খুলে সে সন্তুষ্ট হয়ে উঠল। এটা নকল করা বা বাজে কোনো কাগজ নয়, জনের নিষেধের সই করা পত্র, যেখানে পরিষ্কার লেখা আছে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন সময়ে কোথায় বন্দরে থাকতে হবে। জনের হাতের লেখা এবং সই দুটোই সে চিনতে পারল, পত্রটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে স্বস্তির একটা অনুভূতি তাকে গ্রাস করে নিল। 'উঠে দাঁড়াও, তোমার আর কিছু প্রমাণ করতে হবে না। এবার বনো, বন্দরে আর সংশ্লিষ্ট এলাকায় আসলে হয়েছিল কি, তোমার এই পোশাকেরই হেতু কী এবং তুমি আমাদের খুঁজেই বা পেলো কীভাবে? এসব প্রশ্নের জবাব জানতে হবে আমার।'

'সবই বলতাছি হজুর, কিন্তু তার আগে এগোরে সরায়্যা আমগোর উচিত নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আলোচনা করা,' এই প্রথম ছেলেটার গম্ভীর মুখে খানিক খুশির আভাস দেখল কর্নেল, মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল সে।



অধ্যায় আঠেরো

বর্তমান সময়

নতুন বাজার, ময়মনসিংহ

‘সবার সন্মতির জন্যে বলতেছি, প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা অইলো,’ আলীম পাটোয়ারী পানের বাটা থেকে একটা জর্দা দেওয়া খিলি পান মুখে পুরে দুইবার চিবিয়ে গুটাকে মুখের একপাশে চালান করে দিয়ে কথা বলে উঠল, ‘ওরা পাসকোড পাইল ক্যামনে?’

বাশার খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল না। সে তাকিয়ে পরিবর্তিত এই কামটার চারপাশে দেখছিল মন দিয়ে। পিবিআইএসের নতুন বাজারের এই ল্যাভে সে এসেছে খুব বেশিদিন হয়নি, অথচ মনে হচ্ছে কত সময় পার হয়ে গেছে। সেই সময়টা খুব অদ্ভুত একটা সময় ছিল ওর জীবনে। আনঅথরাইজড এক অপারেশন চলাতে গিয়ে ভয়াবহ এক বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে সে নিজের ক্যারিয়ার এবং জীবনে। আর সেই বিপর্যয়ের অংশ হিসেবেই তাকে ডিমোশন দিয়ে পাঠানো হয় ময়মনসিংহ শহরে, ওকে নিজের শহরে, যে শহরে ওর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। মায়ের মৃত্যুর পর নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, এই শহরে আর কোনোদিনও কিয়বে না। অথচ, এই শহরেই ওর ফিরে আসতে হয় কি না ডিমোশন পেয়ে মাথা নিচু করে। আর সেই শহরে ওর পোস্টিংও হয় ওরই বন্ধুর অধীনে, যে কি না ওর জীবন নরক করে তোলে, ধরিয়ে দেয় সবচেয়ে বাজে এক কেস। কিন্তু সেই কেসই বদলে দেয় বাশারের জীবন, একদিকে সেই কেসেই পরিচয় হয় রিফাতের সঙ্গে, অন্যদিকে সফলতার সঙ্গে সেই কেস শেষ করার পর তাকে পিবিআইএসের বিশেষ টিমে যোগ দেয়ার জন্য অফার দেওয়া হয়। আর এরপর তো একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলেছে।

সেই কেসের সময়ে এই ল্যাভে এসেছিল সে প্রথমবারের মতো। ময়মনসিংহ শহরের প্রাণকেন্দ্রে এক রাজাদের পুরনো বাড়ি সরকার জেনাক করে নেওয়ার পর,

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

সেটাকে কনভার্ট করে পিবিআইএসের স্পেশাল ল্যাব কাম গেস্ট হাউসে রূপান্তর করার কাজ স্রেফ শুরু হয়েছিল সেই সময়। পিবিআইএসের স্পেশাল উইংয়ের অধীনে দেশের প্রথম প্রতিটা বিভাগীয় শহরে এরকম একটা করে সফিসটিকেটেড ল্যাব স্থাপন করার কাজ চলছে, যেখানে ডিএনএ টেস্ট স্যাম্পলিং থেকে শুরু করে আরো অত্যাধুনিক সব কাজ করার সুযোগ রয়েছে। বাশারের মনে পড়ল এই ল্যাবেই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ফরেনসিক এক্সপার্ট মনিকার সঙ্গেও। ‘বাশার, কথা কও না ক্যান?’

পাটোয়ারির মৃদু ডাকে বাশার আবার বাস্তবে ফিরে এলো। ‘স্যার, এই প্রশ্নের উত্তর তো আমার দেওয়ার কথা নয়, এই প্রশ্নের উত্তর দেবে যারা দায়িত্বে ছিল তারা,’ বলে সে মিটিং রুমে বসা অন্যদের দেখাল।

পাটোয়ারি ফিরে তাকাল অন্যদের দিকে। বাশাররা ওখান থেকে আসার পর গেস্টহাউসে ফ্রেশ হয়েছে, তারপর ঘণ্টা দুয়েকের ছোট পাওয়ার ন্যাপ নিয়ে মোটামুটি পরিচ্ছন্ন হয়ে ল্যাবে এসেছে মিটিংয়ের জন্য। খুব ওয়েল রেস্টেড নয়, কিন্তু কাজ চালানোর মতো অবস্থায় এসেছে ওরা এখন অন্তত। পাটোয়ারি ডেকে পাঠাতেই যতটা দ্রুত সম্ভব কাজে নামতে চাইছে বাশার কারণ রিফাতের যে-কেস তাতে এক বিন্দু সময় অপচয় করতে রাজি নয় সে। আবার অন্যদিকে কোনকিছু ঠিকঠাক না বুঝে পট করে ময়দানে নামতেই রাজি নয় বাশার। ল্যাবে ঢোকার সময়ে ও ঘড়ি দেখেছে সকাল প্রায় সাতটা বাজে। কাজেই খুব বেলা হয়নি, দেরি করার মতো। ল্যাবে ঢুকে দেখে স্থানীয় টিম, আইটি ও ফরেনসিকের প্রধান পাটোয়ারি আর তার অ্যাসিস্ট্যান্ট টিম প্রস্তুত ব্রিফ করার জন্য।

অডিয়েন্সের ভেতরে দেখতে পায় সামিরা একেবারে পরিপাটি আর টিপটপ হয়ে বসে আসে। সামিরার পাশে চেয়ার টেনে বসে পড়তেই প্রথম প্রশ্ন করে পাটোয়ারি, এই সাদাসিধে এবং পুরনো আমলের মতো দেখতে মানুষটার কাজে দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তা সমসময় মুগ্ধ করে বাশারকে। সে যে প্রশ্নটা করেছে এটা একেবারেই রেলোভেন্ট এবং এই প্রশ্নের সঠিক জবাব না নিয়ে সে কাজে নামতে অগ্রহীণও নয়। তাহলে পরে বিপদে পড়তে হবে।

‘স্যার,’ সামিরা একটা হাত তুলে বলে উঠল। ‘আপনাদের আপত্তি না হলে আমি এখানে কিছু বলতে চাই। আমার একটা খিওরি আছে এই বিষয়ে। আর লোকাল অথরিটির যারা আছেন তাঁরা বিষয়টাকে কনফার্ম করতে পারবেন। তবে আমার মনে হয় মিস কমিউনিকেশন হয়েছে এবং এই মিস কমিউনিকেশন হয় করানো হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা এই মিসকমিউনিকেশনের সুযোগ নেওয়া হয়েছে।’

‘তুমার এই রহম মনে অওয়ার কারণডা কি আসলে?’ পাটোয়ারি চোখ বন্ধ করে মনোযোগের সঙ্গে পান চিবুচ্ছে, কিন্তু সে প্রতিটা শব্দ শুনছে মনোযোগ দিয়ে এবং অ্যানালিসিস করছে ভেতরে ভেতরে।

সিপাহী

‘স্যার, আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, আমাদের ময়মনসিংহে অ্যাসাইন করার পর আমাদের রিসিড এবং দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার ডিউটি দেওয়া হয় পিবিআইএসের একটা টিমকে, ওদের টিম লিডার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যায় এবং তখন খানিকটা গ্যাপ তৈরি হয় এই সুযোগটাই নেয় শত্রুপক্ষ। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন রয়ে যায় তারা এতটা ভেতরের খবর জানল কীভাবে এবং এটা যদি ঘটনা হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে পাসকোডের বিষয়টা ক্রিয়ার হয় না। এটা খুবই সেনসিটিভ একটা বিষয় এবং এটা কীভাবে ওরা পেল সেটা—’

‘এইডার ব্যাখ্যা আমার কাছে আছে,’ বলে সে টিমের দিকে তাকাল। পাটোয়ারি ইশারার সঙ্গে সঙ্গে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ফরেনসিক অফিসার, হাফপ্যান্ট আর টি-শার্ট পরা টিমি হাতে একটা পয়েন্টার দিয়ে প্রজেক্টরের দিকে ইশারা করতেই সেটার স্ক্রিন চালু হয়ে গেল। প্রথমেই সেখানে একজনের ছবি দেখা গেল। ‘আমাদের পিবিআইএসের লোকাল এজেন্ট, মির্জা সারোয়ার। তার ওপরেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, আপনাদের রিসিড করার এবং এই ল্যাবে পৌঁছে আপনাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার। আপনাদের রিসিড করতে যাওয়ার খুব অল্প সময় আগে সে অসুস্থ হয়ে পড়াতে দায়িত্ব হ্যান্ড ওভার করতে হয় পুলিশের কাছে, তাই সময় লেগে যায়। এই অফিসার একদম সুস্থ এবং স্বাভাবিক ছিল এবং হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রাথমিক ধারণা করা হয়, সে ফুড পয়জনিংয়ে আক্রান্ত হয়েছে, তাই তাকে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। গেস হোস্পিটাল বলে টিমি সবার দিকে নাটকীয় ভঙ্গিতে তাকাল। এই অফিসার হাসপাতালে পৌঁছাননি।’

‘তারমানে অ্যাম্বুলেন্স করে যারা তাকে নিতে এসেছিল, ওরাই এই অফিসারকে অ্যাবডাক্ট করে এবং তার কাছ থেকে পাসকোড এবং ডিটেইল বের করে নেয়,’ বাশার বলে উঠল। ‘কিন্তু এত দ্রুত ওরা কাজটা করল কীভাবে?’

‘এই অফিসার হাসপাতালে পৌঁছায় নাই, এইটা আমরা জানছি পরে, আপনাদের উদ্ধারেরও পরে,’ রবিউল বলে উঠল। ‘আপনাদের উদ্ধারের আরো ঘণ্টাখানেক পরে তাকে চরপাড়া হাসপাতালের ফুটপাথ থেকে পাওয়া যায়।’

‘টেস্ট করে দেখা গেছে তার শরীরে দুই ধরনের কেমিক্যাল পাওয়া গেছে, একটা যেটা তাকে হঠাৎ অসুস্থ করেছিল, আর পরে কোপল্যামিন, যেটা দিয়ে খুব দ্রুত তার কাছ থেকে তথ্য আদায় করা অসম্ভব,’ পাটোয়ারি এখন বন্ধ চোখে কথা বলছে। ‘এর মানে বুঝছেন আপনারা, আমগোর শত্রুর এক্সেস কতহানি আর আপনাদের ক্যামেনে কাম করতে অসম্ভব।’

পাটোয়ারির কথা শুনে সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এমন শত্রু যাকে দেখা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না অথচ এরা খুব সহজেই এদের ঘরে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। এই শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা কীভাবে, যেখানে শত্রুর অবয়বই চেনা নেই।

অতীত

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

বোম্বে বন্দরের সায়াহ্নে

‘এবার ঘটনা খুলে বলো, আগে সব পরিষ্কার না জেনে আমি এক পা-ও আগে বাড়ব না। প্রমাণ পেয়েছি ঠিক আছে কিন্তু আমাকে আগে সব জানতে হবে,’ কর্নেল যত কথা বলছে তত তার পুরনো দক্ষতা ফিরে আসছে কথা বলার এবং সেই সঙ্গে সে তত সূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিয়ে আসতে পারছে কথার ভেতরে। ‘হয়েছিল কি গতকাল বোম্বে বন্দরে? এরকম ম্যাসাকার হলো কীভাবে?’

ওরা কথা বলছে পথের ধারের সেই শজিনাগাছটার নিচে বসে। ওদের আক্রমণকারীদের লাশগুলো রাস্তা থেকে সরিয়ে পথের অন্যপাশ সমাহিত করা হয়েছে যতটা সম্ভব ভালোভাবে। তাদের অস্ত্রগুলো নিয়ে নিয়েছে ওরা। বিশেষ করে কর্নেল একটা বন্দুক এবং একটা পিস্তল নিজের কাছে রেখে বাকিগুলো ধরিয়ে দিয়েছে ফটিককে বহন করার জন্য। তবে এই মুহূর্তে সব জিনিস সুন্দরভাবে রাখা আছে শজিনাগাছটার নিচে। আর গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে ঘোড়াগুলোকে। ওদের সবচেয়ে বড় উপকার হয়েছে আসলে ঘোড়াগুলোকে পেয়ে।

‘হজুর, আপনি এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে কতটা ওয়াকিবহাল?’ ছেলেটা জানতে চাইল কর্নেলের কাছে।

‘আমি মোটামুটি জানি কী হয়েছে এবং কী হচ্ছে,’ কর্নেল ভেবেছিল অস্ত্রের সঙ্গে এদের জুতোগুলোও যদি কাজে লাগানো যায়। কিন্তু একে তো এদের জুতোর অবস্থা খারাপ, তার ওপরে একটাও কাজে লাগানোর মতো নয়। তাও অন্তত অস্ত্র আর ঘোড়াগুলো তো পাওয়া গেছে। ‘তবে যেহেতু আমি বিগত বেশ লম্বা একটা সময় পানির ওপরে ছিলাম আমি সব বিষয় সম্পর্কে জানি না।’

‘হজুর যেহেতু আপনি আগের বিষয়গুলো জানেন, কাজেই, ক্যামনে কী অইছে, ক্যামনে সব শুরু অইলো, তারপর কী অইলো এইগুলো বইলা আমি বিরক্ত করব না। শুধু জানতে চাইব, শেষ কী আপনি জানতেন?’

‘বিদ্রোহীরা দিল্লি দখল করে নিয়ে শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে নিজের সেনাপতি ঘোষণা করেছে—’

কর্নেল এটুকু বলতেই হেসে উঠল ছেলেটা। কর্নেল দেখল ছেলেটার রোদে পোড়া মুখে তাক্সিলের হাসি। ‘হাসছো যে—’

‘হজুর, মানুষের ফট কইরা ধইরা পানিতে নামায় দিলে সে যেমন মাছের মতো সাঁতারাইতে পারে না, ওমনেই, কাউরে রাজার পোশাক পরায়া সিংহাসনে বসাইয়া দিলেই সে রাজা হয় যায় না। বাহাদুর শাহ জাফর, লোক ভালো অইতে পারে,

সিপাহী

কিন্তু হেয় রাজাও না, সম্রাটও না। সে একজন বন্দি মানুষ, জন্য খেইকা খাওয়া বড় হওয়া বাঘেরে জ্বলে ছাইড়া দিলে সে যেমন টিকতে পারব না, বন্দি পাখিরে শূন্যে উড়ায় দিলে সে সবার আগে শিকারে পরিণত অইবো। সম্রাট জাকরের অবস্থা এমন অনেকটা তেমন। সে না পারতাকে শাসন করতে, না পারতাকে সামলাইতে, না পারতাকে সহ্যে যাইতে। তারে জোর কইরা সিংহাসনে বসায় বিদ্রোহীরা ইংরেজগো খেইকা আরো ভয়ংকর হইয়া গেছে। দিল্লির মানুষ এমন আরো বড় বিপদে আছে।’

‘এখানে হয়েছিল কি, সেটা বলো—’

‘কমা চাই হুজুর, সবটা না বললেও অন্তত কিছু বিষয়ে ধারণা না দিলে আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না। আর সামনে আগাইতে গেলে পেছনের বিষয় জানতে অস্ব, এইটা তো আপনার মতো পোড়খাওয়া মানুষ অবশ্যই বুঝবেন।’

ছেলেটার কথা শুনে কর্নেল মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে কথা বলা চালিয়ে যেতে কল। ছেলেটার বয়স কম হতে পারে, কিন্তু তার কথায় যথেষ্ট ওজন আছে এবং ভুল বা অলগা কথাও বলে না সে।

দিল্লির অবস্থা মাঝনি খিচুড়ির মতো, বিদ্রোহীরা না পাইছে সেইটারে ঘর বানাইতে, না মানুষের দিতে পারছে আশ্রয়। সম্রাট শুরুতে চেষ্টা করছিল, সব সামলানির কিন্তু বিদ্রোহীগোর লগে জোট বাইকা দুনিয়ার চোর-বাটপাড় আর ডাকাইতরা যখন চাইরপাশে লুটপাট চালানি শুরু করল আর টিকা সম্ভব ছিল না। এই হইল দিল্লির অবস্থা। দিল্লি যখন এই অবস্থার ভেতরে দিয়া যাইতাকে, এই সময়ে বাইরে কিন্তু বিদ্রোহীরা ঠিকই ভালো কাম করার চেষ্টা করতাকে, কানপুর খেইকা শুরু কইরা বাঁসি, পাটনা খেইকা হায়দ্রাবাদ, সবখানে বিদ্রোহের আতন ছড়াইয়া পড়া, চেষ্টা করতাকে। অন্যদিকে ইংরেজ সরকার প্রথমে পাস্তা না দিলেও যখন বুঝছে অবস্থা খারাপ সেই সময়ে চেষ্টা কইরাও আর সামলাইতে পারতাকে না। তারা সব সেনানিবাসে কড়া পাহারা দিয়া, নিজেগো লোকবল যা আছে এক কইরা সব সামলানোর চেষ্টা করতাকে। অবস্থাটা এমন এমন যে, দিল্লি আর উত্তর ভারত একটা বৃত্ত, আর সেই বৃত্তটা কেন্দ্র কইরা এমন ইংরেজ বিদ্রোহী সবাই ঘুরপাক ভাবিতাকে। বিদ্রোহীরা এমন চেষ্টা করতাকে সবখানে ছাড়াইয়া পড়ার, আর ইংরেজরা চেষ্টা করতাকে নিজেগো শক্তি এক কইরা হেগোরো বাধা দিয়া আবার আগের অবস্থা কিরায় আনার।’

‘এরমানে দিল্লির অবস্থা খারাপ হলেও এখন লড়াই চলছে সমানে সমানে?’

ছেলেটা আনমনে মাথা নাড়ল। ‘এইটা বলা খুব মুশকিল, হুজুর। এখন পরিস্থিতি এমন যেকোনো দিকে ঘুইরা যাইতে পারে। ইংরেজরা,’ বলে সে সামান্য জিভ কেটে বলে উঠল, ‘মানে আপনারা, মানে আপনার লোকেরা আসলে কী চাল

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

চলবে এইটা বলা মুশকিল। অন্যদিকে সিপাহী আর বিদ্রোহীরা এহনো নিজেগোর উদ্দেশ্যের দিকেই আছে, কিন্তু হেগোর ভেতরেও অনেক অনেক বিভক্তি আর দ্বিধা। তার ওপরে হেরা উত্তরের আর দক্ষিণের সেসব রাজা-জমিদার আর নেতাগো এক করার চেষ্টা করতাছে, যদি পারে ভালো, কিন্তু হেগোর ভেতরেও হাজারডা সমস্যা। এহন একমাত্র সময়ই বলতে পারব কী অয়।’

‘বোম্বে বন্দরে কী হয়েছিল গতকাল?’ কর্নেল গম্ভীর মুখে বলে উঠল, সে এখনো পাইপ কামড়ে ধরে আছে। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা তবে তারচেয়ে বেশি যন্ত্রণা দিচ্ছে তামাকের তৃষ্ণা। সেই সঙ্গে সে আসলে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে। পরিস্থিতি খারাপ এটা জানত, কিন্তু গতকাল রাতে যা দেখল এবং যে-অভিজ্ঞতা হলো, সেই সঙ্গে আজ যা দেখছে এবং শুনছে তাতে এটা পরিষ্কার যে সে যা তেবেছিল পরিস্থিতি তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি খারাপ এবং ক্রিটিক্যাল। কাজেই সব জেনে বুঝে এরপরে করণীয় ঠিক করতে হবে।

‘হজুর, বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর খেইকা ইংরেজরা যখন বুঝতে পারল পরিস্থিতি আসলে তাগো নিজেগো নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চইলা গেছে আর বিদ্রোহীরা কারো কথা শুনতাছে না, কারো নির্দেশ মানতাছে না, চাইরপাশে সমানে চলতাছে লুটতরাজ আর খুন-খারাবি, সেই সময় খেইকাই তারা চেষ্টা করতাছে যতটা সম্ভব নিজেগো নিরাপদ করার, বিশেষ কইরা মহিলা আর বাচ্চাগো।’

‘কিন্তু সেটা তো সহজ হওয়ার কথা নয়,’ কর্নেল আনমনেই বলে উঠল। আসলে ভারতে আসার আগে এই ব্যাপারটা নিয়ে এমনকি সেও ভেবেছে। ‘কারণ ইংরেজদের একটা বড় অংশ বসবাস করে মিলিটারি আশ্রয়ের ভেতরে, সেটা সেনানিবাস হোক আর যাই হোক। আর এই বিদ্রোহের মূল গন্তগোলও সেনানিবাসগুলোতেই।’

‘একদম ঠিক বলছেন হজুর,’ ঘাসের ওপরে ছেলেটা বসে আছে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে, কর্নেল ভালোভাবে খেয়াল করে বুঝল এটাকে ভারতীয়রা তাদের যোগের ভাষায় বলে পদ্মাসন। কর্নেল আবারো ছেলেটার মুখের দিকে তাকাল। এই ছেলেটার ভেতরে ব্যতিক্রম কিছু একটা আছে, যা সে ধরতে পারছে না। আর এই বিষয়টা খানিক অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে তাকে। ‘মূল গন্তগোলগুলো হইল সেনানিবাসগুলোতেই, একবার অবস্থা খারাপ হওয়ার পর ইংরেজরা সব লেজ-গোবরে কইরা ফালাইছে। অবস্থা আরো খারাপ হয় এক-একটা জায়গায় বিদ্রোহীগোর লগে স্থানীয় গুণাপাওরা যোগ হওয়ার পরে। জোয়ারের পানি যখন প্রথম আসে, তার লগে অনেক আবর্জনাও ডাইসা আসে। বিদ্রোহী আর সিপাহীগোর লগেও একই ব্যাপার ঘটছে। বিদ্রোহীরা প্রথম যখন মাঠে নামে তখন নিজেগো শক্তি বাড়ানির লাইগা যারে পাইছে তারেই দলে নিছে। এর ফলে হইছে

সিপাহী

কি এগো লগে একের পর এক সুযোগসন্ধানী, চোর, ডাকাইত, বাটপাড় সব আইসা যোগ দিছে। এক-একটা ঘটনা ঘটান সময়ের এরা ইচ্ছামতো লুটতরাজ, খুনখুনি ধর্ষণ কইরা পরিস্থিতি করছে আরো খারাপ। ফলে যা ইচ্ছা তাই চলতাকে চাইরপাশে।’

ছেলেটা একটু খেমে আবারো বলতে লাগল। ‘এর ভেতরে, একটার পর একটা জল আর ফুলবন্দর দখল অইয়া যাইতাছে, কাজেই ইংরেজরা যতটা পারতাকে কেন্দ্রীয় জায়গাগুলো খেইকা ছড়াইয়া পড়ার চেষ্টা করতাকে। যে যেমন পারতাকে পলাইতেছে। বিশেষ কইরা যদি ইংল্যান্ড খেইকা কোনো জাহাজ আসে যে ইংরেজগো নিয়ত থাকে যতটা সম্ভব নিজগো পরিবার কিংবা নারী-শিশুগো জাহাজে তুলিয়া দেওয়ার। এত হান্সামার ভেতরেও বোধে বন্দর এতদিন ইংরেজরা দখল কইরা রাখছিল, জেনারেল হাংকের হাতে। কয়দিন ধইরাই খবর ছড়াইতছিল ইংল্যান্ড খেইকা তিনটা বড় বড় জাহাজ আইব এক লগে। ইংরেজরা যতটা সম্ভব লুকানোর চেষ্টা করলেও কাইল সন্ধ্যায় খবর ছড়ায়া পড়ে, আইজ রাতেই জাহাজ আইবো। সবাই জানত বোধো বন্দরে শক্ত পাহারা আর হাংকের নেতৃত্বে, সৈন্য এতগুলো জাহাজ মানেই আরো অনেক মানুষ পলাইব। বিদ্রোহীরাও দেখে এটাই সুযোগ, এইটাই কাজে লাগাতি অইব, আবার হোকো লগে চোর-বাটপাড় সব আইসা ছোটো লুটপাটের জন্য। সইন্কার পরই টের পাওয়া যায় বন্দরের চাইরপাশে লোক জড়ো হইতাছে। রাইত গভীর হওয়ার আগেই যুদ্ধ শুরু হইয়া যায়। জেনারেল হাংক সর্বোচ্চ চেষ্টা করে ধরে রাখার কিন্তু কত সময় পড়ে বন্দরের বাইরে ধসে পড়ে, বিদ্রোহী আর ডাকাইতেরা পিল পিল কইরা ঢুকতে শুরু করে বন্দরে আর শুরু হয় খুনখুনি আর লুটতরাজ—’

‘বুঝতে পেরেছি,’ কর্নেল কাল রাতের কথা মনে করতে চায় না, রক্তশোভিত সৈন্য ভালো লাগছে না। বোধে বন্দরে কী হয়েছে এবং হচ্ছে সে বুঝতে পেরেছে। ‘কি আমাদের পেলো কীভাবে?’ কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে শুরু করল। ‘কি সে ভালোভাবেই জানে এখানে এভাবে বসে খোশগল্প করাটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু এই ছেলে যত যাই বলুক না কেন, আর ব্যাখ্যা দেক না কেন, একটা ব্যাপার তাকে পরিষ্কার হতে হবে। নির্দিষ্ট সেই বিষয়ে সে যতক্ষণ সঠিক ধারণা না পায় ততক্ষণ সে এখান থেকে যাবে না। জানা বিপদ থেকে অজানা বিপদে গিয়ে পড়ার কোনো অর্থ হয় না। এখানে, কী বিপদ হতে পারে সে জানে কিন্তু তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর না পেলো কী ধরনের বিপদ হতে পারে, সেটা তার জানা নেই। কাজেই আগে তাকে নির্দিষ্ট বিষয়টা সমর্থক জানতে হবে। ‘এত হান্সামার ভেতরে তুমি আমাদের খুঁজে পেলো কীভাবে?’

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

‘হজুর, আমি ইংরেজ বাহিনীর সামান্য সৈনিকমাত্র,’ বলে সে নিজের পাগড়ি পরা মাথাটা সামান্য নাড়িয়ে মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে ফেলল। ঘামে ভেজা ছোট ছোট চুল মাথা আর কপালের সঙ্গে লেটে আছে। পাগড়িটা খুলতেই কর্নেল নিশ্চিত হলো এই ছেলে শিখ নয়, মুসলমান। ‘আমি অত বড় বড় জিনিস বুঝি না, বুঝতে চাইও না। আমি হুকুম শুনি, আর পালন করি, মাস শেষে বেতন নেই। জীবন চালাই। তবে যা হুকুম করা হয় সেই আমার স্বদেশিদের জন্য ক্ষতিকারক না হইলেই হইল। আর আমি যার নুন খাই, তার কাম সেরাভাবে করার চেষ্টা করি।’

‘কাইল রাইতে, আমার ওপরে একটা দায়িত্ব দেওয়া অইছিল, আপনারে ঘাট খেইকা নিয়া ব্যারাকে পৌছাইয়া দেওয়া। শত ঝামেলার ভেতরেও আমি ঘাটেই ছিলাম এবং বৃষ্টির ভেতরেও দেখলাম আপনোগো নদ্র দেওয়া নৌকাডা আইতাছে, কিন্তু তারপর ঘুইরা গেল। বুঝলাম ঘাটের অবস্থা দেইখা মাঝি সরায় নিছে। কিন্তু তখন এইডাও অনুমান করলাম, নৌকা সে অন্যদিকে নিলেও ভিড়াইতে পারব না, কারণ স্রোত অর ঢেউয়ের ভেতরে সে পারব না। এই এলাকাতেই জন্ম আর বড় হওয়া,’ বলে সে হাত নাড়ল। ‘হাতের তালুর চাইয়াও ভালো চিনি এই এলাকা। মাঝি কোনোদিকে যাইতে পারে অনুমান করতে খুব বেশি কষ্ট অয় নাই। সমস্যা দেহা দেয় অন্য জায়গাতে। ঘাটের ঝামেলা সামলাইয়া যখন আমি বন্দরে উঠলাম দেখ পুরা এলাকা নরক অইয়া গেছে। সেইখান খেইকা মাইরা-কাইটা বাইর অইতে অইতে সকাল হয় গেল। বন্দর খেইকা যখন বাইর অইছি, পুরা বন্দর জ্বলতাছে। সেইখান দিয়া ঘোরা পথে উলটা ঘাট, যেখানে আপনেরা নামছেন বইলা অনুমান করছি, সেইখানে যাইতাছি, পথে এই ভাইজানগো দেখলাম,’ বলে সে ঘোড়াগুলোকে দেখালেও আসলে বোঝাল ওদের যারা আক্রমণ করেছিল।

‘এরা কারা?’ কর্নেল যদিও অনুমান করতে পারে, তাও জানতে চাইল।

‘এরা বিদ্রোহী না, যদিও এরা বিদ্রোহী সৈনিকদের লগেই ছিল, পুরা বন্দরে তাড়ব চালাইছে। এরা আসলে ডাকাইত। কিন্তু এরা হইল হায়নার মতো। সিংহ যখন শিকার করে, তার পেছনে পাশে পাশে হায়না লুকায়া থাকে, যাতে সিংহের শিকারের সুযোগ নিতে পারে। এরা অইলো সেই হায়না, যারা আসলে শিকারের সুযোগ নিয়া নিজেগো আখের ওছাইতে পারে। যাকগা, দেখলাম এরা চলতে চলতে হঠাৎ থাইমা যাইতাছে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম সামনে শিকার পাইছে। ঝোপের আড়াল খেইকা দেইখা অনুমান করলাম, আপনেই হবেন। তারপর তো জানেন হজুর,’ বলে সে সামান্য থেকে যোগ করল। ‘তবে আমি সত্যি ভাবি নাই, আপনে অগোরে আগে আক্রমণ করবেন। সাহসের তারিফ করি, হজুর।’

‘তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি সময়মতো না এলো আজ—’ কর্নেল চোখ তুলে তাকাল ছেলেটার দিকে। ‘কিন্তু এত কিছু পরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার নয়, যেটা জানার জন্য আমি এতক্ষণ ধরে তোমার বয়ান শুনিছি। কেন?’

সিপাহী

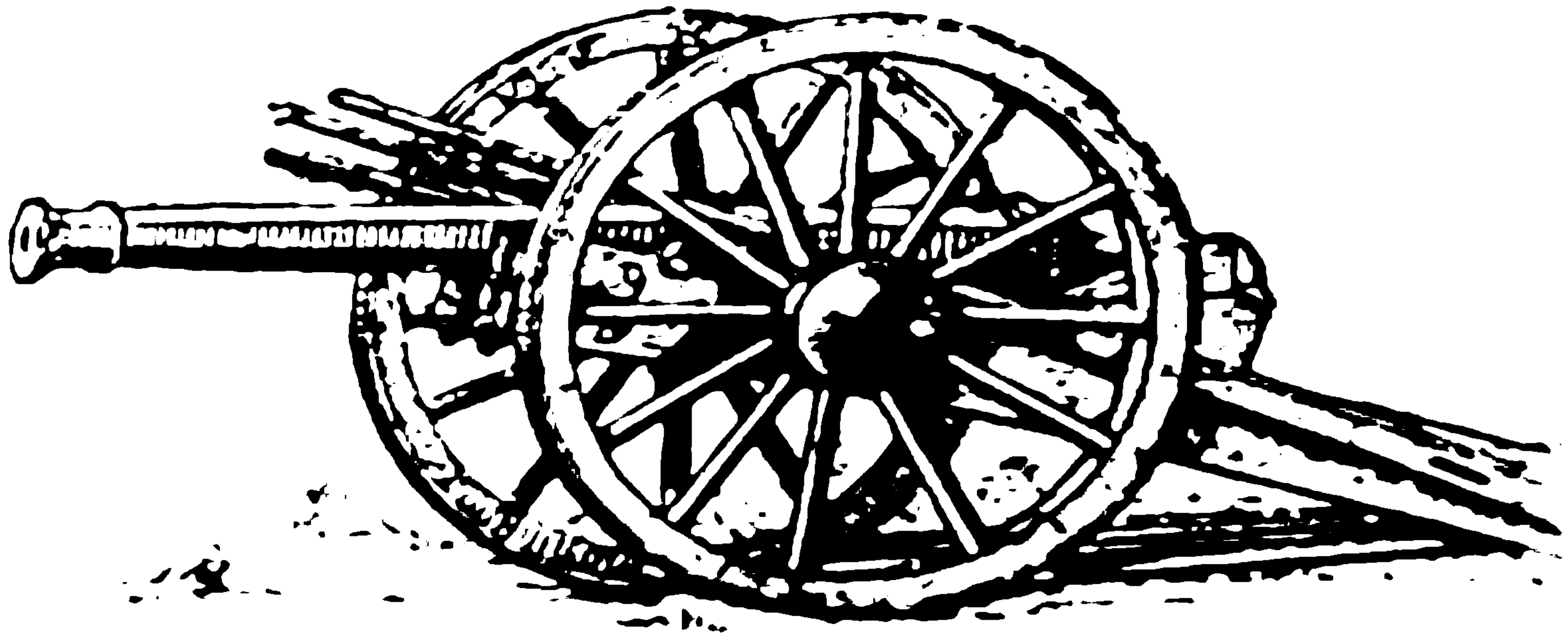
‘মানে হজুর?’ কর্নেলের প্রশ্নটা ঠিক ধরতে পারেনি ছেলেটা।

‘একে তো তোমার সব স্বদেশিরা ইংরেজ বাহিনী ত্যাগ করেছে—’

‘সবাই না হজুর—’

‘সেটা আমি অনুমান করতে পারি,’ কর্নেল একটা হাত তুলে ছেলেটাকে ধামিয়ে দিল। ‘সেখানে তুই এখনো বাহিনীর সঙ্গে আছো। সেটাও মেনে নিলাম। তার পরও গতকাল রাতে যেখানে স্বদেশিরা যখন সব নিকেশ করে নিজেদেরটা বুঝে নিচ্ছে, তখন তুমি নিজের দেশ, নিজের দেশের মানুষ আর এত হাস্যাত্মক উপেক্ষা করে জীবন থেকে শুরু করে সম্পদ সবকিছুর ঝুঁকি নিয়ে অজানা অচেনা আমাকে বাঁচানোর জন্য চলে এলে নিরুদ্দেশের উদ্দেশে, বিষয়টা আমার বোধগম্য হচ্ছে না,’ কর্নেল এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছেলেটার দিকে। ‘তুমি শ্রেষ্ঠ ইংরেজ বাহিনীর প্রতি দায়বদ্ধ বলে এতটা করবে, এটা আমার বিশ্বাস হয় না। সত্যি কথা বলো কারণ কি? আমি সঠিক ব্যাখ্যা চাই, না হলে তোমার সঙ্গে এক পা-ও কোথাও যাব না,’ কর্নেল এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছেলেটার দিকে, ছেলেটাও তাকিয়ে আছে কর্নেলের দিকে এক দৃষ্টিতে।

দুজনার সঙ্গে সঙ্গে সময়ও যেন থমকে আছে এক জায়গাতে।



উনিশ বর্তমান সময় নতুন বাজার, ময়মনসিংহ

সময় এবং পরিস্থিতি দুটোই যেন কিম মেরে আছে ওদের আলোচনা প্রসঙ্গে। পুরো কামরাঙ্গুড়ে নিষ্কলতা। বিশেষ করে পাটোয়ারি যে-মুহূর্তে ব্যান করেছে পরিস্থিতি কতটা খারাপ এবং ওদের শত্রু ওদের কাছে অচেনা কিন্তু ওরা ওদের ব্যাপারে সব জানে, এমনকি ওদের একেবারে কলিজার ভেতর পর্যন্ত শত্রুর এক্সেস রয়েছে, এটা জানতে পারাটা খুব একটা স্বস্তির বিষয় নয়। আরামদায়ক বা আনন্দদায়ক তো নয়ই। বরং কামরাঙ্গুড়ে উপস্থিত প্রতিটা মানুষ কথাগুলো উপলব্ধি করামাত্রই অস্বস্তি সেই কালো মেঘ ঘিরে ধরেছে প্রত্যেককে। কারণ যে-ঘটনা ঘটেছে, তাতে এটা পরিষ্কার যে শত্রু এমনকি ওদের ভেতরেও থাকতে পারে। এমনকি হয়তো তাদের এই মুহূর্তে ওদের সঙ্গে বসে থাকা কিংবা মিটিংরয়ে উপস্থিত একজন এমনকি একাধিক লোকও হতে পারে। পাশের মানুষটি আমাকে মেরে ফেলতে পারে প্রয়োজনে এই অনুভূতি খুব একটা আরামের কোনো অনুভূতি নয়।

‘যাউকগা,’ হঠাৎই ঘোষণার মতো করে বলে উঠল পাটোয়ারি। ‘যাই হোক যেমনই হোক সবাই সাবধানে থাকো, আর কামে তো নামতে অইব। বইয়া থাকলে তো চলবে না,’ পাটোয়ারির নজর ঘুরছে পুরো কামরাঙ্গুড়ে। পুরনো দিনের কেরানিদের মতো পোশাক পরা মানুষটার নজর এত তীক্ষ্ণ, যা তার মামুলি চেহারার সঙ্গে যায় না। এই দৃষ্টি এতটাই শক্তিশালী যেন প্রতিটা মানুষের ভেতরে দেখার ক্ষমতা রাখে। ‘তবে বিষয়গুলো সবাই মাথায় রাখবা কামের সময়ে।’

‘জি স্যার, আমাদের কাছে নামা উচিত,’ বাশার আনমনেই বলে উঠল।

‘হ, কামের কথা চলুক, সময় খুব কম,’ বলেই সে টমির দিকে ইশারা করল।
‘টমি শুরু করো।’

সিপাহী

পাটোয়ারি ইশারা করতেই হাফপ্যান্ট পরা টমি তার ভুঁড়ি দুলিয়ে জানতে চাইল, 'স্যার, রিকাত ম্যাডামের—'

পাটোয়ারি মাথা নেড়ে সায় জানাল। সে আবারো চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। পাটোয়ারির অনুমতি পেতেই টমি তার প্রকৃতি নিতে শুরু করেছে। বাশার আড়চোখে একবার পুরো কামরার দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। ওর পাশেই বসে আছে সামিরা, সে মনোযোগের সঙ্গে মোবাইলে কিছু একটা দেখছে আর ছোট একটা নোটবুকে লিখছে। তার অন্যপাশে বসে আছে ইনসপেক্টর রবিউল, যে ওদের উদ্ধার করে এনেছে। এ ছাড়া কামরা দুই ভাগের অন্যপাশে বসে আছে, পুলিশের আরো দুজন এবং পিবিআইএসের বেশ কিছু অফিসার এবং কর্মকর্তা। বাশার মনে মনে প্রতিটা মানুষের ছবি মনের ভেতরে গোঁথে নিল। এই মানুষগুলোর ভেতরে কি আদৌ কেউ বেইমান আছে, এই মুহূর্তে জানা প্রায় অসম্ভব হলেও কাজে নামতে হলে এক সফলভাবে করতে হলে তাকে ঝুঁজে বের করতে হবে। তবে সবার আগে এমন রিকাতের কেসে মনোযোগ দেওয়া উচিত ওর।

'রিকাত মজুমদার,' বলে টমি তার হাতের বাটন চাপতেই প্রজেক্টরে একজন মহিলার ছবি ভেসে উঠল। প্রায় ববকাটের মতো চুল, কাটা কাটা নাক-মুখ-চোখের উজ্জ্বল শ্যামলা চেহারার মানুষটাকে যেকোনো বিচারে যে কেউ সুন্দরি বলতে বাধ্য। রিকাতের ছবিটার দিকে তাকিয়ে বাশারের বুকের ভেতরে একটা মোচর দিয়ে উঠল। রিকাত ওর জীবনে এমন এক সময় এসেছিল, যে-সময়টাতে ওর পাশে একজনের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। আর সেই মানুষটা আজকে মিসিং, ওর কারণে কি না কে জানে। আর সে এই এসি কামরায় বসে আছে, মানুষটা কোথায় কী অবস্থায় আছে, তার সঙ্গে কী হচ্ছে, সে আদৌ বেঁচে আছে কি না, কে জানে। বাশার অবস্থির সঙ্গে সামান্য নড়ে উঠল, পাশে দৃষ্টি যেতেই সে দেখল সামিরা তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'আর ইউ ওকে?' সামিরা গভীর মুখে জানতে চাইল। তার দৃষ্টি বাশারের ওপরে স্থির।

'আমি ঠিক আছি,' মৃদু স্বরে বলে সামনের দিকে দেখাল।

রিকাত মজুমদার, পড়ালেখা জাহাঙ্গীরনগরে, আর্কিওলজিতে। অনার্স করার পর দীর্ঘদিন দেশের বাইরে কাজ করেছেন, মিশর থেকে শুরু করে মিডলইস্ট তো বটেই ইউরোপ এবং এশিয়ার অনেক দেশে বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এরপরে বাংলাদেশের ময়মনসিংহের মিউজিয়ামে মূল কিউরেটর হিসেবে কাজ করেছেন বেশ কিছুদিন। সেই সময়ে ময়মনসিংহের ইতিহাসের ওপরে একটা প্রজেক্টে ভেটিড নামের একজনের সঙ্গে কাজ করেন ময়মনসিংহের শশীলজ্ঞে। ওই সময়ে তার তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় শশীলজ্ঞের একটা প্রদর্শনীতে ডাকাতি হয়

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

এক বৈশিষ্ট্য কিছু মূল্যবান জিনিস হারিয়ে যায় সেই সময়ে। যার ভেতরে একটা বিখ্যাত কালীমূর্তিও ছিল, পরবর্তীতে জানা যায় ডেভিড নামের সেই লোকটা আসলে ফুড, সে অসম্ভব মূল্যবান এই কালীমূর্তি হাসিল করার জন্যই ডুয়া প্রজেক্ট সাজিয়ে ময়মনসিংহে এসেছিল। মূর্তি হারিয়ে যায়, ডেভিডকেও আর পাওয়া যায়নি। এরপরে দায়িত্বে অবহেলার জন্য রিক্রুট মজুমদারের চাকরি চলে গেলে সে দেশের বাইরে চলে যায় পড়ালেখা করতে। বেশ কয়েকবছর পরে সে ফিরে এসে জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালায় বেশ বড় একটা দায়িত্বে কাজ শুরু করে। এই সময়ে ময়মনসিংহের পুরনো একটা পুকুরে একটা কঙ্কাল পাওয়া যায় এবং সেই কেসের দায়িত্বে ছিল ইনসপেক্টর বাশার,' বলে টিম প্রজেক্টের একের পরে এক স্লাইড চলাতে চলাতে বাশারকে দেখান। 'ঘটনার পরিক্রমায় জানা যায় সেই লাশ আসলে ডেভিডের এবং কেসের এক পর্যায়ে তারা এই ঘটনার সঙ্গে ব্রিটিশ ভারত এবং ঠগিদের সংযোগ পায় এবং কেস সলভ করতে সক্ষম হওয়ার পাশাপাশি ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা জমিদারবাড়িসংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র নদের পাতালে একটা কালীমন্দির এবং ওখানে বৈত কালী বা টুইন কালী নামে আরো একটা কালীমূর্তি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।'

'এখন কী হয়েছে সেটাতে ফোকাস করলে বেটার হয়,' পুরনো কাসুন্দি শুনতে বাশারের বিরক্ত লাগছে। ওর মনে হচ্ছে আদতে সময় নষ্ট করা হচ্ছে।

'কলছি স্যার,' বলে টিম বাশারের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে আবার বলতে লাগল। বাশার জানে টিমেরও নিশ্চয় খারাপ লাগছে রিক্রুটের ঘটনায়। কারণ সে, টিম-রিক্রুট একসঙ্গে কাজ করেছে এর আগেও। 'তো ওই কেসের সফলতার পর রিক্রুট ম্যাডামকে দায়িত্ব দেওয়া হয় পাতালের সেই কালীমন্দিরের যেটার সঙ্গে ঠগিদের সম্পর্ক ছিল এবং যেখানে টুইন কালী বুঁজে পাওয়া গিয়েছিল,' টিম বাটনে ক্লিক করে প্রজেক্টের মন্দিরটা দেখান। 'এখান থেকেই রিক্রুট ম্যাডামকে অপহরণ করা হয়েছে গতকাল,' বলে সে আরো বেশ কয়েকটা ছবি দেখান।

'মন্দিরটাতে প্রবেশের জন্য ইনসপেক্টর বাশার প্রথমে মুক্তাগাছা রাজবাড়ির পেছনের একটা অংশ দিয়ে রাস্তা আবিষ্কার করলেও পরবর্তীতে বেগুনবাড়ির ব্রহ্মপুত্রের ওদিকে-এদিকে আরেকটা রাস্তা পাওয়া যায়। কাছে হওয়াতে, সেই সঙ্গে জল এবং ভুলপথ দুদিকেই সংযোগ থাকতে প্রজেক্ট শুরু হওয়ার পর মুক্তাগাছার জমিদার বাড়ির সেই রাস্তা সিল করে দিয়ে বেগুনবাড়ির এদিকেই স্টেশন নির্মাণ করে এদিক দিয়েই মূল যাতায়াতের পথ তৈরি করা হয়, গতকাল সন্ধ্যায় এখান দিয়েই অপহরণকারীরা প্রবেশ করেছে পাতালের সেই মন্দিরে। তারা একেবারে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার মতোই জিপ নিয়ে এসে গেছে সিকিউরিটি কার্ড দেখিয়ে। সিকিউরিটির ওরা চেক করেছে এমন সময় অতর্কিতে আক্রমণ করে তারা।

সিপাহী

আমাদের সিকিউরিটির চেয়ে ওদের অস্ত্র থেকে শুরু করে দক্ষতা সবই বেশি ছিল। কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই তারা আমাদের সিকিউরিটি বিট করে ভেতরে প্রবেশ করে,' বলে সে ক্রিক করে বেশ কয়েকটা সিকিউরিটি ফুটেজ দেখাল। বাশার মন দিয়ে দেখল এবং নোট নিল। সে খানিক অবাক হয়ে তবে নিশ্চয়তার সঙ্গে দেখল, আক্রমণকারীরা সেই একই পোশাক এবং জিপ ব্যবহার করছে যেটা তাদের ধরার সময়ে করেছে। 'কয়েক দফা ছোট যুদ্ধ হয়, কিন্তু খুব দ্রুত। এখানে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করা প্রয়োজন আক্রমণকারীরা সমস্ত সিকিউরিটি ডিটেইল থেকে শুরু করে এমনকি ব্যাক টিমকে মেসেজ পাঠানোর প্রক্রিয়াও খুব ভালোভাবে জানত। কাজেই তারা এমনভাবে আক্রমণ করে এবং পুরো ফ্যাসিলিটি দখল করে নেয় এবং এত দ্রুত সব সম্পন্ন করে, উপস্থিতরা কিছুই করতে পারেনি। এরপর তারা নিচে নামে। আর সেখানে তখন রিফাত ম্যাডাম এবং তার সহযোগী ছেলেটা বাদে আর কেউ ছিল না। এইখান থেকে আমরা সব জানতে পারি সহযোগীর ব্যানে,' বলে টমি একে একে বলে গেল নিচে কী হয়, ওরা কীভাবে ধরা পড়ে এবং রিকাতকে কীভাবে নিয়ে যাওয়া হয়। বলে সে সবার দিকে ফিরে বলে উঠল, 'এই হলো ঘটনা।'

'এটা ঘটেছে কখন?' যদিও বাশার জানে, তা-ও জানতে চাইল। সময়টা নিশ্চিত করার জন্য।

'গতকাল সন্দের ঠিক পর দিয়ে,' বলে সে সময়টা জানাল।

'এই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ,' বাশারের পাশ থেকে সামিরা বলে উঠল। 'কারণ আমি যদি ভুল না করে থাকি, তবে এই ঘটনা ঘটে বাশারের রাজদ্রোহী অপারেশনের ঠিক পর দিয়ে। যখন ওরা বুঝতে পারে ওদের জিনিস হাতছাড়া হয়ে গেছে,' বলে সে সংক্ষেপে অন্য কেসগুলো এবং তাদের সঙ্গে এই ঘটনার সম্ভাব্য সংযোগ এবং অন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বলে গেল একে একে।

'তারমানে এই সমস্ত ঘটনাগুলো কানেক্টেড?' অন্য এক পিবিআইএস অফিসার প্রশ্ন করল।

'তা তো বটেই,' টমি বলে উঠল। 'কিন্তু সঠিক কানেকশনটা এখনো পাওয়া যায়নি। তবে কিছু মিল পাওয়া গেছে। প্রথম মিল, প্রতিটা ঘটনায় যারা আক্রমণ করেছে, এদের পোশাক, অস্ত্র, কানেকশন ইত্যাদি সবই এক এবং এরকম অর্গানাইজড অপারেশন রেলিক বা নেক্রপলিস ছাড়া অন্য কেউ চালানোর সম্ভাব্যতা বা যোগ্যতা নেই বললেই চলে।'

'আরো একটা বিষয়, প্রথমে ময়মনসিংহ, তারপর সিলেট, চট্টগ্রাম এবং এরপর আজ সকালে আমাদের আক্রমণ, সবমিলিয়ে এটা খুবই স্পষ্ট এবং পরিষ্কার যে ওরা রীতিমতো আর্মি নামিয়েছে মাঠে। আর আমাদের এই অপহরণের কেস

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

বুঝতে হলে এই আর্মির বিরুদ্ধে লড়াইতে হবে,’ বলে সে টমি এবং পাটোয়ারির দিকে দেখল। ‘আমার প্রশ্ন হলো, গতকাল সন্ধ্যা থেকে আজ সকাল, এই লম্বা সময়ে কেউ কি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে? কোনো র‍্যানসম, মানে মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছে?’

‘নো,’ টমি বলার আগে পাটোয়ারি বলে উঠল। ‘নাথিং ইয়েট,’ তার পান খাওয়া মুখ থেকে হঠাৎ এতটা স্মার্ট ইংরেজি শুনলে চমকে উঠতে হয়।

‘এবার তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন,’ বলে বাশার একটা আঙুল তুলে জানতে চাইল। ‘আমাদের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ কারা হতে পারে?’

‘রেলিক, নেত্রপলিস অবশ্যই, সেই সঙ্গে আরো কিছু সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের নাম চলে আসে। বিশেষ করে, কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি থেকে তুমি যা উদ্ধার করেছো সেটা যারা আগলে রেখেছিল সেই কাল্টেরও সংযোগ থাকতে পারে।’

‘এটাই আমার সব অন্তিম কারণ,’ বাশার নড়েচড়ে বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল। ‘এত অজানা উত্তর, এত অজানা প্রতিপক্ষ অথচ, ওরা সব জানে আমাদের সব বিষয়ে। আমি এক্ষুণি মাঠে নামতে চাই, আর আলোচনা নয়।’

‘আমিও সেটাই চাই, পাটোয়ারি বলে উঠল। ‘কারণ প্রাথমিক বিষয়ে আলোচনা হয়ে গেছে, আর বাকি ডিটেইলটাই দিয়ে দেবে তোমাদের। তবে মাঠে নামার আগে, তুমি যেমন বলেছ, আর্মির বিরুদ্ধে লড়াইতে হবে, কাজেই আমি চাই সেভাবেই প্রস্তুতি নাও তোমরা,’ বলে সে উঠে দাঁড়াল। চলো আমার সঙ্গে।’

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

বোম্বে বন্দরের সায়াফে

ছেলেটা এখনো এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কর্নেলের দিকে, কর্নেলও তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। অন্তিমিকর একটা মুহূর্ত। ছেলেটাই প্রথম নীরবতা ভাঙল। ‘হজুর আপনার কথা আগেই শুনছি, আপনার মতো বুদ্ধিমান মানুষ, সৈনিক নাকি আর হয় না,’ ছেলেটা এক ধাপ এগিয়ে এলো কর্নেলের দিকে। ‘আপনে যদি সব কথা একবাক্যে বিশ্বাস করতেন, আমি আসলেই দ্বিধায় পইড়া যাইতাম, আপনার ব্যাপারে যা শুনছি সেইটা ঠিক কি না।’

‘এত কথা তো শুনতে চাইনি,’ কর্নেল ছেলেটার দিকে দেখতে দেখতে, নিজের একটা হাত শরীরের সামনে থেকে সরিয়ে কোমরের কাছে নিয়ে এলো। ওখানে অস্ত্রটা রাখা। যদিও সে পরিস্থিতি জটিল করে তুলতে চাচ্ছে না, তবুও সবধানতার কোনো মার নেই। বিশেষ করে সম্ভাব্য সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিতে। ‘আমি যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছি,’ কর্নেল আড়চোখে একবার ফটকের দিকে দেখে

সিপাহী

নিয়ে, ছেলেটার দিকে ফিরে তাকাল, 'ছেলেটার চোখে পুরনো সেই দৃষ্টি ফিরে এসেছে, কর্নেল এখনো পুরোপুরি ধরতে পারছে না সেই দৃষ্টি।

'হজুর, আপনি এহনো নাম জানতে চান নাই,' বলে সে কর্নেল এবং ফটিক দুজনার দিকে দেখল একবার। 'এতক্ষণে হয়তো আপনি অনুমান করতে পারছেন, আমি মুসলমান। কিন্তু আপনারা কেউ কি আমার নাম জানেন?'

কর্নেল মাথা নাড়ল নেতিবাচক ভঙ্গিতে। কথা সত্য, এতক্ষণ ধরে ছেলেটার সঙ্গে ওরা কথা বলছে কিন্তু এখনো ছেলেটার নাম জানে না তাদের দুজনের কেউই। 'বলো তোমার নাম শুনি—'

'সোলেমান, হজুর আমান নাম সোলেমান—'

'তাতে কি—' কর্নেল বিরক্তির সঙ্গে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই ছেলেটা আবারো বলে উঠল।

'সোলেমান ইবনে ইউসুফি,' সে এখনো ছির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কর্নেলের চোখের দিকে। প্রতিটা ক্ষণে সে ধরার চেষ্টা করছে কর্নেলের দৃষ্টি এবং দৃষ্টির পেছনের দৃষ্টিভঙ্গি। মূল উদ্দেশ্য নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কর্নেলের প্রতিক্রিয়া কী হয় সেটা বোঝা।

কর্নেল প্রথমে নামটা শুনল, সেই সঙ্গে ক্ষণিকের জন্য সে কিছু ধরতে পারল না। তারপর সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়ে গেল তার দৃষ্টি। মুহূর্তের ভেতরে তার দৃষ্টি ফিরে গেল সেই অতীতে, তার জীবনের সবচেয়ে বিষাদময় সময়ে, যেই সময়টির কথা কর্নেল কোনোদিনই মনে করতে চায় না, কিন্তু কোনোদিন সে ভুলতেও পারবে না। কর্নেলের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মৃদু হাসি ফুটে উঠতে শুরু করল সোলেমানের মুখে। 'আপনের মনে আছে হজুর, সবই মনে আছে।'

'তুমি ইউসুফির ছেলে,' কর্নেলের অধীনে কাজ করত লেফটেন্যান্ট ইউসুফি, হাসিখুশি দাড়িওয়ালা বিশালদেহী ইউসুফি ছিল কর্নেলের ডান হাতের মতো। তার জন্য, তার পরিবারের জন্য প্রাণ দিয়েছিল মানুষটা। কিন্তু—ইউসুফির ছেলে খুব বড় হয়ে গেছে আমি ভাবতে পারিনি,' ছেলেটার দিকে, আরেকবার চোখ বুজাল কর্নেল স্যাভার্স, এবার সরাসরি তাকায়নি সে। ছেলেটাকে দেখতে দেখতে মুহূর্তের ভেতরে একটা মোচড় দিয়ে উঠল তার, নিজের ছেলে বেঁচে থাকলে হয়তো এতটাই বড় হতো সে। কর্নেলের মনে পড়ল। তার ছেলে, জর্জ, ইউসুফির ছেলে সোলেমান এবং তার আরেক লেফটেন্যান্ট কেরারের ছেলে, তিনজনই এক বয়সি ছিল, এক সঙ্গেই থাকত, খেলত এবং এক সঙ্গেই বড় হচ্ছিল তিনজনে। কর্নেল স্যাভার্স কিংবা তার স্ত্রী জেনি কোনোদিনই তিনজনকে আলাদাভাবে দেখত না, কিংবা অন্য ইংরেজ অফিসারদের মতো শাসনের ছড়ি ঘোরাতে না নিজের অধীনদের ওপরে। আর সেটাই কাল হয় পরবর্তীতে।

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

‘তুমি ইউসুফির ছেলে,’ কর্নেল ক্ষণিকের জন্য কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।
‘তোমার মা—’

‘হজুর, খুব বেশিদিন বাঁচে নাই, ওই ঘটনার পরে সে আর কয়েক বছর বাঁইচা ছিল। বাবা মারা গেল, আপনার পরিবার—’ বলে সোলেমান আর বাক্য শেষ করল না। ‘কেদার, উনার ফাঁসি হওনের পর হেগো পরিবার আর আমগো পরিবার কিছুদিন একসঙ্গেই ছিল।’

কর্নেলের অধীন কেদার নামের একজনের বেইমানির কারণেই কর্নেলের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হয়েছিল। বেইমান কেদার এবং তার আরো দুই সঙ্গীর ফাঁসি হয়েছিল ওই ঘটনার পর। কর্নেল জানত, কিন্তু ততদিনে সে ইংল্যান্ডের পথে রওনা দিয়েছে। বন্ধু ইউসুফি কিংবা বেইমান কেদারের পরিবারের কী হয়েছিল জানার মতো পরিবেশ, পরিস্থিতি কিংবা মানসিকতা কোনোটাই ছিল না কর্নেলের। সেদিনের পর আজ প্রায় এক দশক পর বন্ধুসম ইউসুফির ছেলের সঙ্গে এভাবে এই পরিবেশের আবার মোলাকাত হবে, স্বপ্নেও কি ভেবেছিল কর্নেল। কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই কর্নেল চোখ তুলে তাকাল ছেলেটার দিকে, এতক্ষণে সে ছেলেটার সেই দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারছে। এতক্ষণ ছেলেটা কর্নেলের দিকে তাকিয়ে থাকলেও এখন দৃষ্টি নামিয়ে নিয়েছে, কর্নেল ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখল পাথুরে চেহারার ছেলেটার গাল গড়িয়ে পানি নেমে আসছে।

‘তোমার বাবার অভিজ্ঞতার পর আর মায়ের মৃত্যুর পরও তুমি মিলিটারিতে এসেছো?’ কর্নেল কি জিজ্ঞেস করবে বুঝতে না পেরে এটাই জানতে চাইল। কর্নেল অনুমান করতে পারছে এভাবে বড় হয়ে ওঠা একটা ছেলের জীবন কতটা কঠিন হতে পারে, কতটা কঠিন পথ পাড়ি দিতে হয়েছে ছেলেটাকে এই পর্যন্ত আসার জন্য। ‘তুমি আজ এইখানে এলে, মানে কীভাবে—’ কর্নেল এক পা এগিয়ে গেল ছেলেটার দিকে। কর্নেল ছেলেটার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার পুরনো বন্ধু ইউসুফির অবয়ব খোঁজার চেষ্টা করছে ছেলেটার ভেতরে।

‘হজুর কাইল রাইত থেকে কী হইছিল তো আপনে জানেন, এর আগের বিষয়ে খানিকটা আমি বলি। আমি মিলিটারিতে আছি খুব বেশি সময় হয় নাই। সৈনিক হিসেবেই আছি। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার ঠিক আগ দিয়া ব্যারাকপুর থেইকা আর পোস্টিং অইছিল বোম্বোতে। এক অর্ধে কইতে গেলে বাঁইচা গেছি। আর আমি কম সময় মিলিটারিতে থাকলেও বয়স কম অইলেও আমার ওপরে সরকার বাহাদুরের বিশ্বাস ছিল। ফলে যখন বিদ্রোহ শুরু অইলো আমি সেই সব দলগুলোর সঙ্গেই ছিলাম যারা কোনোদিক না বাইচ্ছা নিয়া, নিজের দায়িত্ব পালনেই ঠিক মনে করছিল। তার পরেও অনেক দল বদল আর ভাঙাভাঙি অইছে কিন্তু আমি ছিঁর ছিলাম। আর দিল্লির পতনের পর বোম্বোতে পাহারা ঠিক করা অইলে আমি ওই

সিপাহী

দলেই ছিলাম, এরপরে জানতে পারি বোম্বে বন্দরে আক্রমণ অইতে পারে। ওই সময়ে বোম্বে বন্দরে জাহাজ থেইকা নামানির লাইগা আর উঠানির লাইগা দুইটা দল বানানি অয়। যেই সব জাহাজ ভিড়ব, সেগুলোই থেইকা যারা আসব সেই দলে আমি ছিলাম, ওই সময়ে আমি জাহাজের যাত্রীর তালিকায় দেখি কর্নেল স্যাভার্সের নাম। আমি সাইখা এই দায়িত্ব নিই,' বলে সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কী বোঝাল কে জানে। 'এরপর তো আপনি জানেনই।'

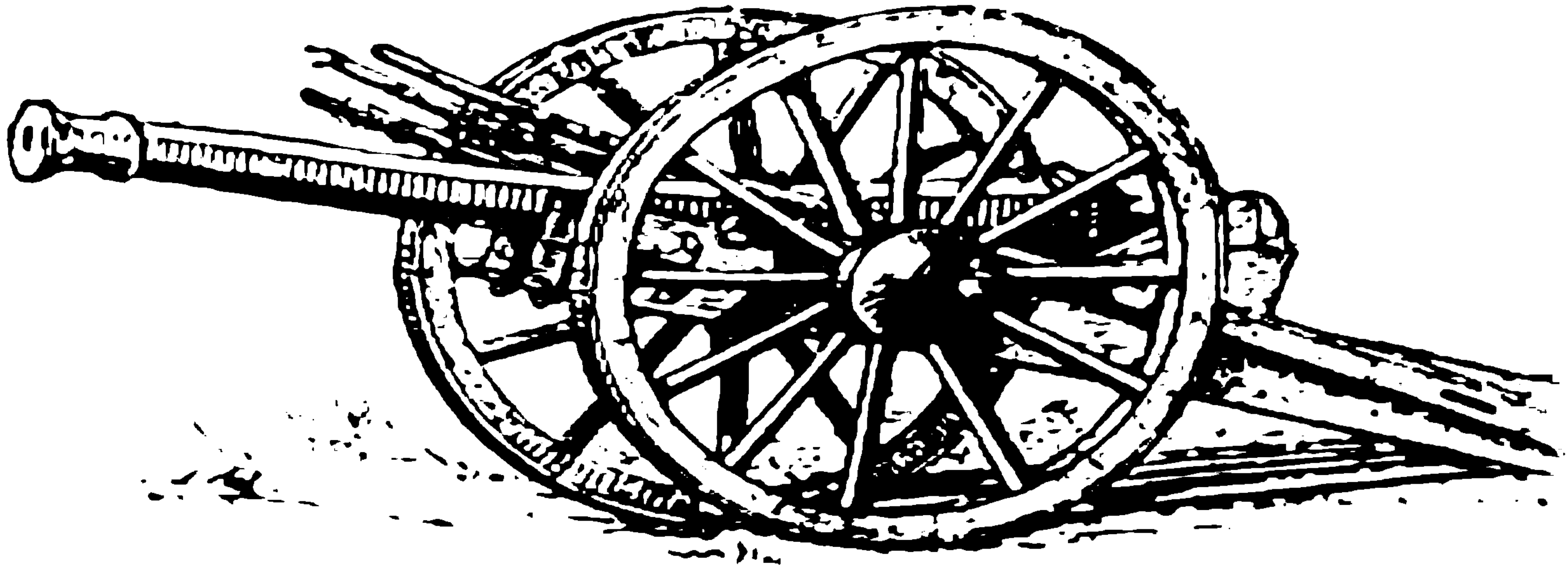
'এখন করণীয় কি?' কর্নেল জানতে চাইল।

'জি, হজুর, বেলা অইতাছে,' অনেকক্ষণ পর কথা বলে উঠল ফটিক। 'হজুর আমগো এহন জলদি সইরা পড়া উচিত।'

'আসলে আরো অনেক আগেই সরে পড়া উচিত ছিল,' কর্নেল বলে উঠল। 'কোনো ধারণা, কোনদিকে যাওয়া উচিত আমাদের?'

'হজুর, আপনি সঠিক প্রশ্ন করছেন এবং এই প্রশ্নের উত্তর এইখানে একমাত্র আমার কাছেই আছে,' বলে সে উলটোদিকের পথ দেখাল। 'কাইল রাইতে যখন আমগো দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন বলাই ছিল, যদি বোম্বে বন্দরের পতন হয় তাইলে বদলাপুরের ব্যারাকে যাইতে। যারা ইংল্যান্ড থাইকা আসছে এবং বোম্বে বন্দরের বেঁচে থাকা লোকজনরে ওইখানেই যাইতে বলা অইছিল। বদলাপুরের ব্যারাক এইখান থেইকা মাইল বিশেকের মতো। অইখানে গেলেই আপনিও কী করতে অইবো জানতে পারবেন আর আমিও পরের নির্দেশ পাব,' বলে সে ঘোড়াগুলোর দিকে দেখাল। 'আর এই ঘোড়াগুলো থাকতে আমগো কোনো ঝামেলাও অইবো না,' বলে সে অস্ত্রগুলোও দেখাল। 'আর এহন আমরা একেবারে অসহায়ও, আপনার আপত্তি না থাকলে চলেও রওনা অইয়া যাই, তাইলে বেলা পড়নের আগেই পৌছানোর সম্ভাবনা আছে।'

কর্নেল মাথা নেড়ে সায় জানাল, ফটিকের দিকে দেখে নিয়ে সে একবার ফিরে তাকাল সোলেমানের দিকে, তার দৃষ্টি এখনো ছিন্ন হয়ে আছে ছেলেটার ওপরে, তার লম্বা অবয়ব, মাথার পাগড়ি, বিশেষ করে গলায় বাঁধা রুমালটার ওপরে। পুরনো বন্ধু ইউসুফের ছায়া ঝুঁজে বেড়াচ্ছে কর্নেল, ভাবতে ভাবতেই মাথা নেড়ে সে নিজেকে মনে মনে বলে উঠল, বদলাপুরে পৌছে এবার তাকে কাজে নামতে হবে, যেটার জন্য সে ভারতে এসেছে।



অধ্যায় বিশ বর্তমান সময় নতুন বাজার, ময়মনসিংহ

বাশারের শুধু মনে হচ্ছে কাজে নামা দরকার।

পিবিআইএসের মিটিংরুম থেকে বের হয়ে স্পেশাল উইংয়ের ল্যাবের করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাশারের মনে হলো শেষবার এখানে যখন এসেছিল তার থেকে ল্যাবটা অনেকটাই বদলে গেছে।

‘তুমার মনে অয় ল্যাবটা ভালাই লাগতাকে,’ হাঁটতে হাঁটতে পাটোয়ারি বলতে লাগল। বাশার আর সামিরা পাশাপাশি হাঁটছে, ওদের থেকে খানিক পেছনে টমি। জি, স্যার, আমি যখন এখানে প্রথমবার এসেছিলাম ঠগিদের কেসে কাজ করার সময়, তখন টমির কাছে শুনেছিলাম, কীভাবে দেশের সব বিভাগীয় শহরে এ-ধরনের এক-একটা সফিসটিকেটেড ল্যাব করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু এত দ্রুত এবং এত দারুণভাবে ল্যাবগুলো গড়ে উঠবে ভাবতে পারিনি।’

‘সত্যি কথা অইলো,’ পাটোয়ারি এগিয়ে থেকে কথা বলছে। ‘যদিও এই আইডিয়াটা ছিল মূলত পাশা আর আমার ছাত্রী মনিকার, আমার শুরুতে খুব বেশি আগ্রহ ছিল না। কারণ দেশে-বিদেশে আগে যা করছি সেইটা ভিন্ন কথা, কিন্তু আমরা দেশে এই ধরনের কাম, বিশেষ কইরা যেইডা আসলেই কামে লাগব এই ধরনের কাম করতে এবং করাইতে জ্ঞান বাইর হয়। কিন্তু পিবিআইএস, টমি মনিকা আর আমরা মিলে যা করছি বিগত কিছু দিনে এইটা একটা অসম্ভব কাম অইছে। আমি সাধারণত কিছুতেই খুব বেশি প্রাউড ফিল করি না, কিন্তু এইটা প্রাউড অওনের মতো কাম অইছে, আহো,’ বলে সে একটা ঘোলা কাচের দরজার সামনের দাঁড়াতেই দরজাটা তার রেটিনা স্ক্যান করে অটোমেটিক খুলে গেল।

সিপাহী

‘ইংরেজি সিনেমাতে দেখা এই সব জিনিস আমরা বাঙালি, তাও আমাদের দেশে দেখতে পাব ভাবিনি,’ বলে সামিরা সামান্য মাথা নিচু করল পাটোয়ারির উদ্দেশ্যে। ‘আপনার এবং আপনার টিমের কারণেই সম্ভব হয়েছে বিষয়টা।’

বাশার ভেবেছিল পাটোয়ারি কোনো রি-অ্যাকশন দেখাবে না কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল পাটোয়ারি বেশ খুশি হওয়ার একটা এক্সপ্রেশন দিয়ে ল্যাবের ভেতরে ঢুকে গেল। ‘আহো, তুমিগোরে কাম শুরু করার রসদ জোগাই।’

ল্যাবের এই অংশে বাশার এর আগে আসেনি। ভেতরে ঢুকেই সে বুঝতে পারল ব্রিফিং শেষ করার পর এটা রিসোর্স সেকশন, অনেকটা জেমস বন্ড সিনেমার কিউ সেকশনের মতো। ‘আমরা খুব দ্রুত কাম করুম,’ বলে সে টিমের দিকে তাকিয়ে একবার চুটকি বাজিয়ে একটা স্বচ্ছ র‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেল।

‘আপনাকে শেষবার কখন স্মার্ট ব্লাড পুশ করা হয়েছিল?’ টিম জানতে চাইল বাশারের কাছে?’ বাশার সময়টা জানাতেই সে বলে উঠল, ‘তারমানে সময় পার হয়ে গেছে। এখন আবার পুশ করতে হবে,’ বলে সে সামিরার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ম্যাডাম আপনাকেও।’

স্মার্ট ব্লাড একেবারেই আধুনিক একটা টেকনোলজি, যেটাতে রক্তের ভেতরে এক ধরনের সিরাম পুশ করা হলে, কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই সেটা অ্যাকটিভ হয়ে যায় এবং যেকোনো জায়গা থেকে সেটার মাধ্যমে ট্র্যাক করা যায় ব্যক্তিটাকে, এমনকি সবচেয়ে রিমোট লোকেশনেও। আর নির্দিষ্ট সময় পরে সেই সিরাম, ইউরিনের মাধ্যমে বের হয়ে যায় শরীর থেকে। কামেলাহীন, হারানোর ভয় সেই, কেউ সরিয়েও ফেলতে পারবে না, আবার পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়। রাজদ্রোহী মিশনের আগে বাশারকে প্রথমবারের মতো পুশ করা হয়েছিল। বাশার আর সামিরা দুজনেই, মাইক্রোস্কোপের মতো দেখতে একটা মেশিনের সাহায্যে দুজনার হাত রেখে পরখ করল টিম, তারপর অনেকটা পিঙ্কলের মতো দেখতে সিরিজ দিয়ে দুজনার হাতের ভেতরে পুশ করে দিল সিরাম। তারপর আবার সেই মাইক্রোস্কোপে ক্যানারের নিচে রেখে পরখ করে খুশি হয়ে নিজের ভুঁড়ি নাড়িয়ে বলে উঠল, ‘পারফেক্ট, আপনারা পাটোয়ারি স্যারের ওই ডেকের সামনে চলে যাবেন। স্যার, আপনাদের ওয়েপন আর আদারস এক্সেরসরিজ প্রতাইড করবেন।’

বাশার কসুইয়ের ভেতরে পরানো ছোট ব্যান্ড এইডটা দেখে নিয়ে একবার সামিরার দিকে তাকাল। সামিরা, মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল একবার। যদিও বাশার যার একবারই পাটোয়ারির সঙ্গে কাজ করেছে, কিন্তু সে ঠিকই জানে কেন সামিরা এভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। পাটোয়ারি এমন এক মানুষ যে প্রতিটা অস্ত্র এবং প্রতিটা ইকুইপমেন্ট এজেন্টের ফিজিকালি, মিশনের ধরন এবং কাজের প্রতিটার সঙ্গে অ্যানালিসিস করে প্রতাইড করে এবং এই প্রক্রিয়াটা খানিক জটিল। বাশার এবং

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

সামিরা সাদা গ্রাস কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই পাটোয়ারি রীতিমতো ধমকে উঠল। 'এই পোলা করো কি, আগে ওইনে যাও,' বলে সে একটা আঙুল তুলে সামিরার দিকেও ইশারা করল। 'ওই মাইয়া তুমিও।'

বাশার তাকিয়ে দেখল, এটা ওয়েট, হাইট এবং বডিমেজারমেন্ট মেশিনের দিকে ইঙ্গিত করছে মানুষটা। 'স্যার, আমার সঙ্গে আসুন,' ইয়ং একটা ছেলে, অস্বাভাবিক ভারী লেন্স চোখে পরা ছেলেটার। ছেলেটাকে দেখে বাশারের মনে হলো, একে আগেও দেখেছে কিন্তু পরিষ্কার মনে করতে পারল না। ঠিক কোথায় দেখেছে একে। 'চলো,' বডি মেজারমেন্টের এমন মেশিন আগে দেখেনি বাশার। মেশিনটা দেখতে অনেকটা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি গেটের মতো। ওটার ভেতরে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা ফ্ল্যাশের মতো লেজার পয়েন্টার দিয়ে বাশারের পুরো বডি স্ক্যান করে নিল সেকেন্ডের ভেতরে। মেশিনটার ওপাশে গিয়ে নামতেই, ছোট একটা চিরকুটের মতো ধরিয়ে দিল ছেলেটা বাশারের হাতে। সামিরাও একই প্রসেসের ভেতর দিয়ে গিয়ে দুজনে দুটো ছোট চিরকুট নিয়ে হাজির হলো ওয়েপন কাউন্টারের সামনে। পাটোয়ারি হাত বাড়াতেই বাশার এবং সামিরা দুজনেই নিজেদের চিরকুট বাড়িয়ে দিল তার দিকে।

'তুমার হিসাব তো পুরান হয় নাই,' চশমাটাকে নাকের ওপরে তুলে প্রথমে ওটার ভেতর দিয়ে চিরকুটটা পড়ল সে, তারপর চশমা আর নাকের ফাঁক দিয়ে বাশারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল কথাটা। 'শেষবার তুমারে যেইটা দিসিলাম, সেইটার বিষয়ে তুমার রিপোর্ট কি?'

'স্যার, একটু ভারী আমার হাতের হিসেবে,' বাশার বিনা দ্বিধায় বলে উঠল। 'তবে বুলেটপ্রুফ ভেস্টটা কাজের ছিল।'

'আইচ্ছা, তুমার দেহি গত কয়েকদিনে, ওজনও খানিক কমছে। তুমার হাইট, ওজন আর কামের ধরন হিসাব করলে একেবারে সঠিক জিনিস আছে আমার কাছে। এই বছরই এফবিআই এইটারে নিজেগো এজেন্টগর লাইগা অফিসিয়াল করছে জিনিসটা। আমারে দুইটা পাঠাইছে স্যাম্পল হিসেবে,' বলে সে অস্ত্রের কাউন্টারের দিকে না গিয়ে বরং ড্রয়ার খুলে হোলস্টার আর গ্রিপে প্যাচানো রীতিমতো একটা বড় প্যাকেট বের করল। প্যাচানো গ্রিপ খুলতেই ওটার ভেতর থেকে দুটো অস্ত্র বেরিয়ে এলো। বাশার দেখল সাধারণ নাইন এমএম থেকে আকারে একটু ছোট কালো রঙের একটা পিস্তল। 'দুইটা অস্ত্র একটা পোলাগো লাইগা, আরেকটা মাইয়োগো। প্রায় দুই সপ্তাহ হইল আমার এফবিআইয়ের বন্ধু পাঠাইছে, কামে লাগাইতে পারি নাই অহনো। ভাবতাহি তুমগোর দুইডারে দিয়া শুরু করব।'

'মানে অমরাই গিনিপিগ হবো, প্রথমে,' বাশার মৃদু স্বরে বললেও পাটোয়ারি সেটা শুনেছে। বাশার ভেবেছিল লোকটা রাফ একটা লুক দেবে বা ধমক দেবে, তা

সিপাহী

না করে সে এক সেকেন্ডের জন্য তাকিয়ে রইল বাশারের দিকে, তারপর হা-হা করে হেসে উঠল। 'একদম ঠিক কইছো,' বলে সে অভ্যস্ত হাতে পিস্তলটা লোড-আনলড করে, ওটার ম্যাগাজিনে গুলি ভরে ভেতরে চালান করে দিয়ে কয়েকবার টার্গেটের দিকে এইম করে বাশারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'গুরু ফিকটিন, জেনারেশন ফাইভ। আগের চেয়ে অনেক হালকা, গুলি বেশি, অনেক বেশি ইক্সিশিয়েন্ট ফাইটার, এইটা অস্ত্র না রীতিমতো আর্টিস্টের রংতুলি। তুমি যে-ধরনের মিশনের নামতাছো তার জন্য পারফেক্ট।'

বাশার অস্ত্রটা হাতে নিতে নিতে ভাবতে লাগল পাটোয়ারির মতো এমন স্মার্ট একটা লোক এমন অদ্ভুত ভাষায় কথা কেন বলে, ইচ্ছে করেই এমন চল ভাষায় কথা বলে নাকি। লোকটা যেমন চোন্ত ইংরেজি পারে, তেমনই পরিষ্কার শুদ্ধ বাংলা জানে। আর চল ভাষায় কথা বলতে বলতে সে মাঝে মাঝে পরিষ্কার বাংলাও বলতে শুরু করে নিজের অজান্তে। অস্ত্রটা হাতে নিয়ে খুশি হয়ে উঠল বাশার। দারুণ হালকা অথচ বেশ কাজের জিনিস। 'গুলিও বেশি আগেরটা থেকে,' বাশার খুশি হয়ে বলে উঠল। যদিও সে জানে, আসলে গুলির সংখ্যার চাইতে দক্ষতাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

'হুমম, তুমার এই মিশনে গুলি বেশি লাগব,' পাটোয়ারি গম্ভীর মুখে বলে উঠল। 'এইটা পরো, এরপরে শার্টের ওপরে হোলস্টার পরে আমারে একাধিকবার এইম কইরা দেহাও,' বলে সে বাশারের দিকে নতুন একটা জেল ইনসুলেটেড বুলেটপ্রুফ ভেস্ট এগিয়ে দিল। 'সামিরা তুমিও,' একই ভেস্ট সামিরার দিকে এগিয়ে দিল সেই ভারী চশমাপরা ছেলেটা। সামিরা সেটা নিয়ে একটা চেঞ্জিং রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

বাশার শার্টের ওপরে ভেস্টটা পরে নিয়ে তার ওপরে হোলস্টার চাপিয়ে সেটার ওপরে হালকা জ্যাকেটটা পরে নিল। তারপর জ্যাকেটের ভেতর থেকে একাধিকবার অস্ত্রটা বের করে দেখাতেই খুশি হয়ে উঠল পাটোয়ারি। একদম ঠিক আছে। এইবার ছুরি,' বলে সে বাশারের দিকে কপট রাগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আগেরটা হারাইছো, না?'

বাশার কিছু না বলে মাথা চুলকাল। 'তোমার জন্য দারুণ একটা জিনিস আছে,' বলে সে নিজের চামড়ার সরকারি কেরানি মার্কী ব্যাগটা খুলল। 'এইটা দেহো,' বলে সে আগেরদিনের পার্কার পেনের বক্সের মতো একটা জিনিস এগিয়ে দিল বাশারের দিকে। 'বডি বিস্তার নায়ক পলিটিশিয়ান শোয়ার্জনেগারের ডো চেনো। হেয় যখন আইএফবিবি চ্যাম্পিয়নশিপ লড়ে তখন একবার তার সেরা কম্পিটিটর ছিল লুই ফারিগানো। মার্ভেলের হাঙ্ক চরিত্রে প্রথম অভিনয় করছিল যে। তো যাই হোক, হেই সময়ের বন্ডিবিন্ডিং এবং এই কাহিনি নিয়ে বিখ্যাত একটা ডকু সিনেমা আছে। নাম পাম্পিং আয়রন,'

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

‘যেটার পরের একটা সিক্যুয়াল আছে জেনারেশন আয়রন।’

‘ঠিক বলছো, খুশি হয়ে উঠল পাটোয়ারি। দুনিয়ার সেরা ছুরি কোম্পানি মাইক্রোটেক সম্প্রতি সেই বিখ্যাত ডকুসিনেমা এবং বডি বিল্ডিংয়ের সময়টাকে সম্মান জানায়ে একটা বিশেষ এডিশনের ছুরি বাজারে আনছে বিশেষভাবে মোডিফাই করা স্পেশাল ফোর্স এজেন্টগোর লাইগা।’

বাশার বাকসটা খুলে দেখতে পেল ভেতরে একটা ছোট চিকন প্রায় কলমের মতো একটা ছুরি। ‘এত চিকন,’ খানিক অবাক হয়ে সে বলে উঠল।

‘এইখানেই তো মজা,’ বলে সে বাশারের হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে নিল। ‘এই দেহো,’ বলে সে জিনিসটার মাঝামাঝি একটা বাটন চাপতেই ওটার হাতলটার আলাদা একটা অংশ বেরিয়ে এলো। ‘সব ছুরির কারিকুরি থাকে ফল্মাতে, এইটার কারিকুরি হাতলেও। এইটার হাতল ব্যবহারকারীর মাপমতো ঠিক করা যায়, বলে সে বাশারের আঙুলের গ্রিপে রেখে ওর হাতের মাপমতো অ্যাডজাস্ট করে দিল ওটাকে। ‘দারুণ,’ বাশার খুশি হয়ে বলে উঠল।

‘আরো মজা আছে,’ বলে সে বাটন চেপে ফল্মাটাকে একাধিকবার বের করে ঢুকিয়ে দেখাল। ‘সুইচ নাইফ, থোয়িং নাইফ, পেনসিল নাইফ হিসেবে এটা ফলাকেও অ্যাডজাস্ট করা যায়। খুব ফাস্ট মুভিং এবং সবচেয়ে বড় কোয়ালিটি,’ বলে সে ছুরিটার ফল্মাটাকে গুলি প্র্যাকটিসের টার্গেটের দিকে তাক করে একটা বাটন চাপতেই সেটা ছুরি থেকে খুলে তীরের মতো গিয়ে বিধল টার্গেটে। ‘মারাত্মক তাই না,’ বলে সে ভারী চশমা পরা ছেলেটার দিকে ইশারা করল ফল্মাটাকে এনে দেওয়ার জন্য।

ছেলেটা ফল্মাটা এনে বাশারের হাতে দিতে, ও সেটাকে সেট করে ছুরিটা হোলস্টারের ছুরির খাপে ঢুকিয়ে রাখল। ‘আমি রেডি স্যার।’

‘খুব ভালো,’ বলে পাটোয়ারি বাশারের দিকে ফিরে তাকাল। সে সরাসরি তাকিয়ে আছে বাশারের চোখের দিকে। ‘এই মিশন, এইটা আর খালি কাজের মিশন নাই তা তো বুঝতামো। এখানে সবাই জড়িয়ে গেছে, জেড মাস্টার, আল্ট্রা ম্যান ধরা পড়াতে বিষয়গুলো এখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে চইলা আসছে। রিফাতের অপহরণ এইটাই প্রমাণ করে। কোনো জায়গাতে শুরু করবা অনুমান করতে পারো?’

‘বাশার চিন্তিত মুখে এক সেকেন্ড ভাবল। যদিও সে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে আসলে কোন জায়গা থেকে শুরু করবে। তাও বলার আগে একবার ভাবল। ‘স্যার, আমি আগে ফিল্ডে যাব না। আমি আগে ওই ছেলেটার সঙ্গে কথা বলব, যে রিফাত অপহরণের সময়ে স্পটে ছিল। আমার বিশ্বাস—’

‘ভালো,’ বাশারকে কথা শেষ করতে দিল না পাটোয়ারি। ‘টমি আর আমি তো

সিপাহী

আছিই, ইনসপেক্টর রবিউল আর একটা পুরা টিম দেওয়া হচ্ছে তোমারে। ওরা এই ল্যাবের বাইরেই অপেক্ষা করতাকে। তুমি সরাসরি কামে নামবা এইহান খেইকা। আর সামিরা তো আছেই। তয়—’

‘কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না, তাই না?’ বাশার জানে এটা পাটোয়ারির বিখ্যাত ডায়ালগ।

‘আগে কথাটা বলতা কিন্তু এইবার আসলেই তাই, তবে এইবার শুধু একটাই কথা যোগ করব,’ পাটোয়ারি বাশারের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। ‘এইবার নিজেদেরও বিশ্বাস কইরো না।’

বাশার কিছু না বলে স্রেফ মাথা নাড়ল। ‘স্যার, আপনি—’ বাশার কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

‘কি ব্যাপার—’

বাশারে পেছনে সামিরা বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার পরনেও অনেকটাই বাশারের মতো জ্যাকেটের নিচ থেকে ভেস্ট উঁকি দিচ্ছে, বাশার জানে জ্যাকেটের নিচে ওর একই পিস্তল এবং ছুরি আছে। ‘কিছু—’

‘একটা ঘটনা ঘটেছে,’ সামিরা মোবাইলের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলে উঠল। ‘আমাদের এখনি বেরোতে হবে।’

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

বদলাপুর, উত্তর ভারত

দূর থেকে সেনানিবাসটাকে দেখাচ্ছে একটা বাচ্চাদের খেলনা গ্রামের মতো। কী মনে হয়, সব ঠিকঠাক আছে?’ কর্নেল চিন্তিত মুখে জানতে চাইল সোলেমানের কাছে। এই মুহূর্তে ওরা অবস্থান করছে বোম্বে আর মিরাতের মাঝামাঝি, ছোট একটা গ্রামের মতো এলাকা বদলাপুরের সেনানিবাসের বাইরের দিকে। সূর্য একেবারে মাথার ওপরে, ওরা বোম্বে বন্দর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে বদলাপুর পর্যন্ত দূরত্ব বেশ দ্রুততম সময়ে পার হয়ে এসেছে বলা যায়। কিন্তু সেনানিবাসে ঢোকার আগমুহূর্তে কর্নেল বলে, ওখানে ঢোকার আগে নিরীক্ষা করে দেখা উচিত এই সেনানিবাস আসলে নিরাপদ আছে কি না। সেইমতোই ওরা সেনানিবাসের ঠিক বাইরে এসে মাইলখানেক দূরত্বে ক্ষেতের আইলের আড়ালে শুয়ে বোম্বার চেষ্টা করছে সেনানিবাসের আসল অবস্থা কি। সোলেমানের কাছে একটা দূরবীক্ষণ আছে, যদিও সেটা পুরোপুরি অক্ষত অবস্থায় নেই। তবুও সে ওটা দিয়ে দূর থেকে বোম্বার চেষ্টা করছে, আসলে সেনানিবাসের অবস্থা কি। জিনিসটা ভাঙা হলেও একেবারে খালি চোখের চেয়ে অন্তত ভালো।

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

‘কিছু দেখা যাচ্ছে?’ কর্নেল আবারো জানতে চাইল সোলেমানের কাছে। সে এখন বুঝতে পারছে না, আসলেই ছেলেটা কি কিছু দেখছে নাকি স্রেফ বোকা চেষ্টাই করে যাচ্ছে সে। কর্নেল নিজের ভেতরে খানিক অধৈর্য হয়ে উঠেছে। এই বাজে পোশাক, খালি পা, সার্বিক অসহায় অবস্থা কি তাকে অধৈর্য করে তুলেছে? নাকি অন্য কিছু, সে ঠিক বুঝতে পারছে না। কর্নেল মনে মনে ভাবছে আসলে সে পুরো পরিস্থিতি ধরতে পারছে না, আর এই ধরতে না পারা এবং এই অজানা আসলে তাকে দুর্বল করে তুলছে। তাকে এই অবস্থা থেকে বেরোতে হবে, যেভাবেই হোক, পরিপূর্ণভাবে কাজে নামতে হবে।

কর্নেল মুখ ঘুরিয়ে চারপাশে মন দিল। খালি চোখেই সে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল পরিস্থিতি। ওরা এই মুহূর্তে সেনানিবাস থেকে মাইলখানেক দূরত্বে ফাঁকা ফসলের মাঠের একপ্রান্তে, এই জায়গা থেকে জঙ্গল শুরু হয়ে পুরো সেনানিবাসটাকে ঘিরে রেখেছে তিনদিক থেকে এদিকে সেনানিবাসটা জঙ্গলের সঙ্গে লাগানো হলেও অন্য তিনদিকে ফাঁকা, এটা নিরাপত্তাজনিত কারণেই করা হয়েছে, এটা কর্নেল জানে। তবে এই সেনানিবাসের কথা সে জানত না, হয়তো সে চলে যাওয়ার পর বানানো হয়েছে এটা। দূর থেকে দেখে যা বুঝতে পারছে, খুব বড় সেনানিবাস না। আসলে এ-ধরনের সেনানিবাসগুলো বানানোই হয় অনেকটা নিরাপত্তা চৌকির মতো। ইংরেজ বা স্থানীয় মিলিটারির লম্বা পথ পাড়ি দিতে গিয়ে যাতে পশ্চিমদ্যে বিশ্রাম নিতে পারে এবং এ ছাড়া সৈনিকদের থাকার ব্যবস্থা করা থাকে। নিশ্চয়ই পরিস্থিতির কারণে ইংরেজ অফিসারেরা এখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

‘হজুর—’ সোলেমান কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই কর্নেল উঠে দাঁড়াল। ‘চলো, আমাদের এগুতে হবে।’ ‘হজুর, ঝুঁকি—’ কর্নেল উঠে দাঁড়াতেই সোলেমান, পড়িমরি করে তাকে থামানোর চেষ্টা করতে লাগল। ‘ঝুঁকি হলেও কিছু করার নেই। আমাদের এখানে চেষ্টা করতেই হবে, আর সেটা করতে হলে, দেরি করে লাভ নেই। চলো,’ বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে জোরে শিস বাজাল। তারা এখানে আসার আগে জঙ্গলের কিনারার ভেতর দিকে ঘোড়াগুলো ফটিকের তত্ত্বাবধানে রেখে এসেছিল। কথা ছিল তারা ইশারা দিলেই সে গুলো নিয়ে আসবে, কর্নেল শিস বাজানোর একটু পরেই ফটিক এবং ঘোড়াগুলোর মাথা দেখা গেল জঙ্গলের বাইরের দিকে।

‘শোন,’ কর্নেল নিজের অস্ত্র পরীক্ষা করতে করতে সোলেমানকে বলে উঠল। ‘আমরা এখন সেনানিবাসে ঢুকব। কিন্তু কীভাবে ঢুকব বলে দিচ্ছি,’ বলে সে ফটিক আসতে আসতে নিজের পরিকল্পনা সোলেমানকে বলে শেষ করতেই সে মাথা নেড়ে সায় জ্ঞানাল। ফটিক চলে আসতেই তারা তিনজন মিলে রওনা দিল সেনানিবাসের দিকে। সেনানিবাসে ঢোকার ঠিক আগমুহূর্তে কর্নেল সরে পড়ল ওদের পেছন

সিপাহী

থেকে। সেনানিবাসের নির্জন ব্যারাকঘরগুলোর ভেতরের গলি ধরে এগিয়ে চলল ফটিক আর সোলেমান।

‘কি রে ফটিক,’ এগোতে এগোতে সোলেমান কথা বলে উঠল ফটিকের সঙ্গে। ‘সব কি মরল নাকি, কোনো মানুষ নাই ক্যান?’

‘ভাই, হেইডাই তো বুঝতেছি না,’ ফটিক ভাই বলাতে চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে একটা ধমক দিতে যাবে, তার আগেই সামনে একটা বৃদ্ধ শব্দ হলো। ফটিককে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল সোলেমান, সে কিরে তাকিয়ে সামনে জরিপ করার চেষ্টা করছে। সামনের গলি কিংবা রাস্তা অথবা খোলা জায়গায় এখনো কাউকে দেখা যায়নি। কিন্তু যে-শব্দটা সোলেমান শুনেছে এটা কোনো প্রাণীর বা এমনিতে হওয়ার মতো শব্দ নয়, মানুষ ছাড়া এই শব্দ—

‘ভাই—’

‘এই চুপ,’ বল সোলেমান একবার পেছন দিকে দেখে আবার ঘুরতে যাবে, ফটিকের বিস্ফোরিত দৃষ্টি দেখে চট করে ফিরে তাকাল সামনের দিকে। বলতে গেলে শূন্য থেকে ওদের সামনে উদয় হয়েছে তিনজন, একজন সাদা চামড়ার, বাকি দুজন স্থানীয় ভারতীয়, তাদের ভেতরে একজন শিখ। পেছনের দুজন কোনাকুনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে বন্দুক হাতে, দৃষ্টি এবং হাত দুটোই স্থির ওদের দিকে। সোলেমান খুব ভালোভাবেই জানে ওরা কীভাবে লুকিয়ে ছিল এবং এত দ্রুত হঠাৎ করে কীভাবে হাওয়া থেকে উদয় হলো। সেই সঙ্গে সে এও জানে ওরা কীভাবে একে অপরের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে ওদের পাহারায় রেখেছে। কারণ সে নিজেও একইভাবে প্রশিক্ষণ পাওয়া। ওদের দিকে তাকিয়ে হাতের বন্দুকটাকে মাটিতে ফেলে দিল সোলেমান। ‘আমি তুমিগো মানুষ,’ বলে সে নিজের রেজিমেন্ট নম্বর আর সৈনিকের বিস্তারিত বলল।’

কিন্তু তার কথায় তিনজনের কারো ভেতরেই কোনো ড্রফ্‌প দেখা দিল না। ‘তোমার সঙ্গে আরেকজন ছিল, সে কই?’

‘সে এইখানেই আছে,’ বলে সোলেমান একটু অস্থির ভঙ্গিতে মাথা, হাত নাড়ল। ‘কইলাম না, আমি তুমিগো মানুষ—সে এটুকু বলতেই সামনের লোকটা ইশারা করতেই পেছনের একজন এগিয়ে এসে এক লাথি দিয়ে সোলেমানের সামনে থেকে বন্দুকটা সরিয়ে দিল, তারপর চট করে তার হাত ধরে জোরে একটা মোচড় দিয়ে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে তার কপালের পাশে বন্দুক ঠেকাল। ‘তোমার সঙ্গে অন্য মানুষটা কই?’ সেই একই সুরে জানতে চাইল আগের লোকটা।

‘আরে, কী যজ্ঞা, কাইল রাতে আমার ওপরে একটা দায়িত্ব ছিল—’

‘চোপ,’ লোকটা ইংরেজ হলেও তার কথা একেবারে পরিষ্কার। ‘আগে বল—’

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

‘এই যে এখানে, ওর সঙ্গে লোকটা,’ চট করে গলির একপাশ থেকে বন্দুক হাতে বেরিয়ে এলো কর্নেল, সে একেবারে কোনাকুনি দাঁড়িয়ে আছে বন্দুক হাতে। এমনভাবে হট করে বেরিয়ে এসেছে অপর পাশের পাহারাদার এদিকে নজর রাখায় সে দেখতে পায়নি কর্নেলকে। যখন দেখেছে দেরি হয়ে গেছে। কর্নেল বেরিয়ে এসে তার হাতের বন্দুকের নল দিয়ে একটা বাড়ি মারল শিখ লোকটার ডান হাতের কনুইতে, সঙ্গে সঙ্গে লোকটার হাত অকেজো হয়ে বন্দুকের নলটা নিচের দিকে নেমে গেল। কর্নেল নিজের কাঁধ দিয়ে একটা ধাক্কা মেরে সোজা বন্দুক তুলল ইংরেজ লোকটার দিকে, অপর দিকে সোলেমানকে ধরা লোকটা ঘুরিয়ে বন্দুক তুলল কর্নেলের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে সোলেমান লাফিয়ে উঠে ছুরি বের করে পেছন থেকে জাপটে ধরে সেটা ঠেকাল প্রথম পাহারাদারের গলায়, ‘কইছিলাম আমি তুমিগো মানুষ। শুনো নাই,’ তার দাঁত বেরিয়ে এসেছে।

‘আপনি কে? নিজের পরিচয় দিন,’ পরিস্থিতি বদলে যেতেই ইংরেজ লোকটার চেহারা সাদা হয়ে গেছে। ‘এই তো এইবার বুজছো,’ সোলেমান বলে উঠল। সে টটকিরি মেরে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই কর্নেল কথা বলে উঠল। ‘বন্দুক আমার হাতে প্রশ্ন আমি আগে করব। এটা একটা সেনানিবাস, ছোট হলেও এখানকার একটা নিয়ম থাকার কথা, কেউ নেই আবার তোমরা লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছে বিষয়টা কি?’ কর্নেল বন্দুক নেড়ে জানতে চাইল।

ইংরেজ লোকটা কর্নেলের দিকে তাকিয়ে আছে, সে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। ‘বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ ব্যবস্থায়,’ লোকটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলতেই কর্নেলের ঝুঁচকে উঠল। ‘কথা তো ভালোই শিখছো, কাজে এমন অবস্থা কেন?’

‘আপনি আপনার পরিচয় দেননি,’ লোকটা আবারো একই সুরে বলে উঠল। তার গলা শুনে কর্নেল একটু অবাকই হচ্ছে, সে মাথা নেড়ে কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই ওদের পেছন থেকে কথা বলে উঠল কেউ একজন।

‘আমি বলছি তিনি কে,’ কর্নেল তো বটেই সোলেমান এমনকি ফটিক এবং ওদের দূরে রাখা বাকিরাও চট করে পেছন ফিরে তাকাল। কর্নেল পেছন ফিরতে ফিরতেই নিজের অন্ত্র তাক করে ফেলেছে ওদিকে। কর্নেলকে বন্দুক তাক করতে দেখে ছোটোখাটো কিন্তু শক্তিশালী মানুষটা হেসে উঠে নিজের সঙ্গে থাকা অন্তত এক ডজন অন্ত্রধারীর দিকে ফিরে বলে উঠল, ‘দেখসোছ বলছিলাম না, এমনকি ঘুমন্ত বাঘের প্রভাব তাজা হায়নার চেয়ে অনেক বেশি,’ বলে সে কর্নেলের দিকে ফিরে হেসে উঠল। ‘কর্নেল আপনি জানেন না, আপনাকে এখানে দেখে আমি কী খুশি হয়েছি।’

মানুষের স্মৃতি খুব অল্পটুকু জিনিস, কখনো সময়ে ফিরে আসে, আবার কখনো সময়ে সময়ে ভিন্ন হয়ে গিয়ে মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। একই ব্যাপার

সিপাহী

কর্নেলের সঙ্গেও ঘটল, মিলিটারির পোশাক দেখে সে বুঝতে পারছে মানুষটা তারই সমপর্যায়ের, মানে কর্নেল, আর তার রোদপোড়া দুখসাদা চামড়ার রু বসে দিচ্ছে সে সাদা চামড়ার হলেও জীবনের বেশির ভাগ সময় সে কাটিয়েছে এই দেশেই, এমনকি মানুষটার গলার স্বরও একেবারে পরিষ্কার গিয়ে আঘাত করছে কর্নেলের শ্রুতিতে। কিন্তু কর্নেল কিছুতেই ধরতে পারছে না মানুষটা আসলে কে। আগুনভেঁই হাতের বন্দুক নামিয়ে নিয়েছে কর্নেল, সেই সঙ্গে মানুষটাও নিজের দুই হাত ছড়িয়ে দিচ্ছে দুইদিকে আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে। সে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে অনুভব করতে পারছে কর্নেল আসলে ধরতে পারেনি সে কে, নিজে ক্র কুঁচকে কন্ট ভঙ্গিতে কিছু একটা বলতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে এক বলকের মতো কর্নেলের মনে পড়ে গেল মানুষটা আসলে সে। 'পিট, সর্বনাশ পিট, তুমি তো বড়,' কান্ডে গিয়েও সে নিজেকে ওধরে নিল। 'প্রায় বুড়ো হয়ে গেছে। হা-হা, পিট,' বলে বন্দুকটাকে একপাশ সরিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল পিটকে। কিশোর এক হেসে জাহাজে করে বাড়ি থেকে পালিয়ে ভারতের মাটিতে পা দিয়েছিল। কর্নেলের অধীনেই নিচের সৈনিক জীবন শুরু করেছিল সে।

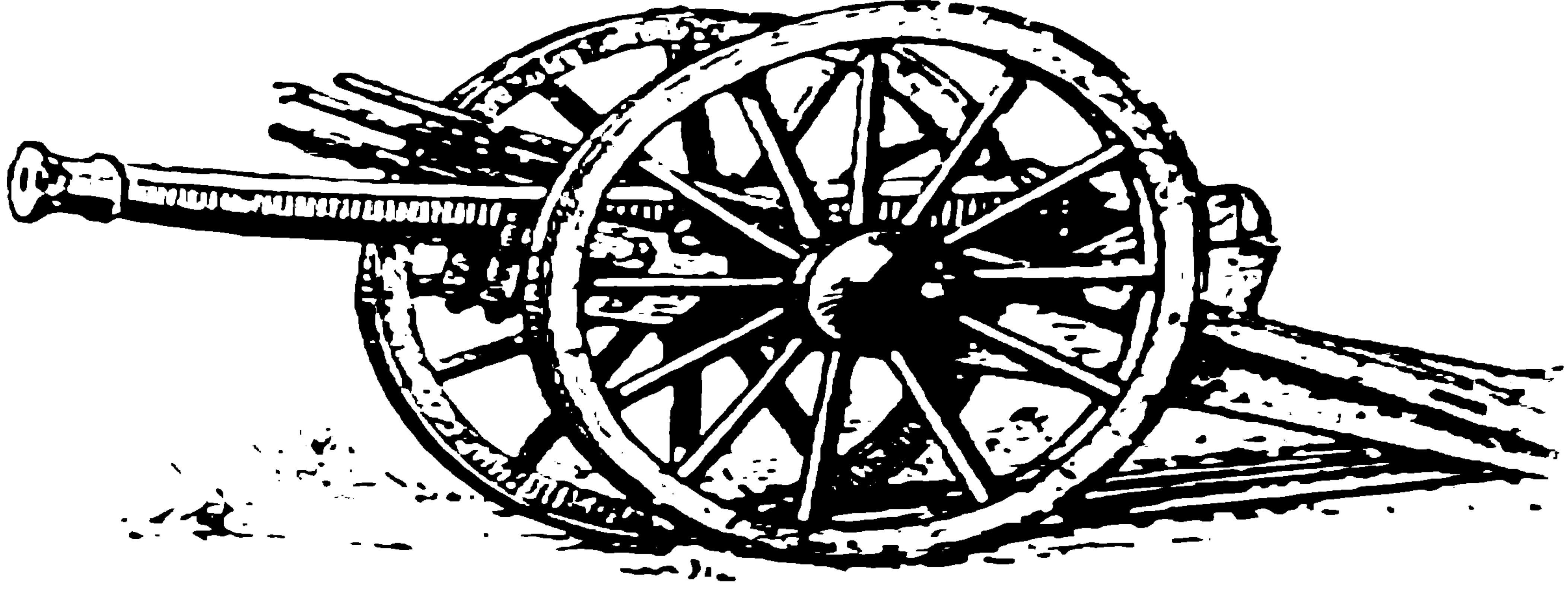
'কর্নেল স্যার,' বলে সে নিজেকে কর্নেলের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ব্যাজ দেখিয়ে বলে উঠল। 'মনে আছে কর্নেল স্যার, আপনি বলতেন একদিন আমি আপনার মতো হবো,' গর্ব করে নিজের ব্যাজ দেখাল সে।

'আমি খুবই খুশি হয়েছি পিট,' কর্নেল আন্তরিকভাবে বলে উঠল। তারপর চারপাশে দেখিয়ে জানতে চাইল, 'ব্যাপারটা কি, এখানে আসলে হচ্ছে কি?'

'নিরাপত্তা কর্নেল, কোনো সেনানিবাসই আর নিরাপদ নেই,' বলে সে জনসংখ্যার দিকে দেখাল। 'এটা আসলে আর পুরোপুরি সেনানিবাস নেই। আমরা মূল কামের জায়গা জনসংখ্যার ভেতরে সরিয়ে সেনানিবাসটাকে এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছি যে দেখলে মনে হয় যেন এটা পরিত্যক্ত। এতে করে, আমাদের বিশেষ কাজকর্মে অস্তিত্ব করা সম্ভব হবে, আর অবধা আক্রমণ এবং গ্রাণক্ষয় থেকেও বাঁচা সম্ভব হবে,' বলে নিজের লোকদের দিকে ইশারা করে এগোতে বলল। 'চলুন এগোতে এগোতে কথা বলা বাক,' বলে সে সোলেমান আর ফটিকের দিকে এক গাল হেসে এগোতে বলল।

'প্রথমেই পরিস্থিতি জানতে হবে আমার, আর যেহেতু বেঁচে গেছি, কাজেই আমি দ্রুত কাজে নামতে চাই চাই,' ওরা সেনানিবাস এলাকা পার হয়ে জনসংখ্যার ভেতরে দিকে পা রাখছে। 'তবে আগে আমাকে সব জানতে হবে, বুঝতে হবে।'

'অবশ্যই কর্নেল, তবে তার আগে আপনার পরিচয় হয়ে বিখ্যাম এবং খাওয়া প্রয়োজন, তারপর আমরা কাজে নামব।'



অধ্যায় একুশ বর্তমান সময় ময়মনসিংহ শহর

বাশারের মনে হলো দেরিতে কাজে নামার কারণেই এই ঘটনাটা ঘটেছে। ‘ঘটনাটা ঘটল কীভাবে?’ বাশার নিজের রাগ সামলানোর চেষ্টা অসফল চেষ্টা করছে। অকারণেই তার গলার স্বর উঁচু হয়ে যাচ্ছে, যেটা সাধারণত তার অভ্যাস নয়। রাগ সামলানোর জন্য এবং যাতে আর কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না বসে, সেজন্য সে নিজের নতুন অস্ত্রটা বের করে এনে পরীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু সে ধেমে গেলেও সামিরার মধ্যে ধেমে যাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই।

‘আপনাদের মাথায় কিছু আছে,’ বলে সে রবিউলের দিকে তাকাতেই সে নিজের দুই হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলে উঠল, ‘ম্যাডাম, আমার ওপরে রাগ দেখিয়ে লাভ নাই, আমি আপনাদের সঙ্গেই ছিলাম।’

কিন্তু রবিউলের জবাব শুনে সামিরা ঠাভা হওয়া তো দূরে, আরো রেগে উঠল সে। ‘আপনাকে তো আমি ভালো ভেবেছিলাম অন্তত, আমাদের উদ্ধার করার সময়ে আপনি যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন, এরকম ঘাসখোরের মতো কাজ কীভাবে করলেন আপনি?’ এরকম পরিস্থিতিতেও বাশার আরেকটু হলে হেসে ফেলেছিল সামিরার ঘাসখোর উপাধি শুনে। কে যেন বলেছিল প্রতিটা মানুষের সাফল্যের একটা বড় অংশ নির্ভর করে নিজের মনোভাব লুকানোর ওপরে। এ-ধরনের ইনভেস্টিগেশনে এই বিষয়টা আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে ব্যাপারটা শুনে যতটা না সহজ মনে হয়, আদতে সেটা নয়। বরং বাশারের মনে হয় নিজের অভিব্যক্তি লুকানো পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটা।

সামিরার কথা জবাবে ইনসপেক্টর রবিউল আবারো ব্যাখ্যামূলক কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নিজেকে সামলে নিয়ে বাশার একটা হাত তুলে থামিয়ে দিল সবাইকে। ‘এক মিনিট, মাথা গরম করে কোনো লাভ নেই। আর

সিপাহী

ইনসপেক্টর রবিউলকে দোষারোপ করার কোনো মানেই হয় না। তবে স্পটে পৌছানোর আগে আমি বিজ্ঞারিত জানতে চাই আসলে হয়েছে কি। রুশো ছেলেটা মিসিং হলো কীভাবে?’ রুশো সেই ছেলে যে রিক্সাত অপহরণের সময়ে তার সঙ্গে ছিল এবং গুলি খায়।

রবিউল মাথা নেড়ে বলতে শুরু করল, ‘স্যার, আমিও খুব বিজ্ঞারিত জানি না। যেটুকু রিপোর্টে শুনেছি সেটাই বলতে পারব। ছেলেটাকে ভর্তি করানো হয় গতকাল রাতে। সে গুলি খেলেও আসলে খুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে ছিল না। প্রাথমিক ট্রিটমেন্টেই সে নাকি কথা বলার মতো অবস্থায় আসে। পুলিশকে বয়ানও তখন দিয়েছে সে। যাই হোক সারারাত সে ভালোই ছিল। রাতে একাধিকবার তাকে পরখও করা হয়েছে। আজ সকালে তাকে পাহারায় থাকা কনস্টেবলরা গিয়েছিল নাশতা করতে—’

‘নাশতা করতে!’ এত জোরে চৈচিয়ে উঠল সামিরা সামনে থেকে ওদের জিপের ড্রাইভার পেছনে ফিরে তাকাল এক ঝলক। ওদের জিপ সঙ্গে একটা পুলিশ ভ্যান নিয়ে সাইরেন বাজাতে বাজাতে ছুটে চলেছে চরপাড়া হাসপাতালের দিকে, যেখান থেকে রিক্সাত মজুমদার অপহরণের কেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছেলেটা মিসিং হয়েছে।

‘সামিরা প্রিজ,’ সামিরা রেগে উঠলেও বাশার শান্ত গলায় তাকে থামিয়ে দিল। ‘আগে শুনি।’

‘তারপর তারা নাশতা করে ফিরে এসে হাসপাতালের করিডর দিয়ে ঢুকছে এমন সময় নার্সের চিৎকার শুনে দুজনেই দৌড়ে যায় কামরায় এবং আবিষ্কার করে লোকটা নেই।’

‘নেই মানে?’ নিজের পিঙ্কলটা চেক করে ওটাকে আবার জ্যাকেটের ভেতরের হোলস্টারে রাখতে রাখতে জানতে চাইল বাশার, না চাইতেও আপনাতাই তার গলার স্বর উঁচু হয়ে গেছে আবারো।

রবিউল সামিরার থেকে তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। ‘নাই মানে স্যার, ছেলেটাকে রাখা হয়েছিল সিঙ্গেল কেবিনে, নার্স ওষুধ দিতে গিয়ে আবিষ্কার করে ছেলেটা রুমের ভেতরে নেই, রুমের ভেতরে জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে।’

‘কেউ কি কিছু দেখেছে?’ বাশার নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাচ্ছে, সে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল ওদের জিপ চরপাড়া মোড় পার হওয়ার জন্য জ্যামে দাঁড়িয়ে আছে। দেশ এবং শহর বদলে যাচ্ছে। ময়মনসিংহ শহরে জ্যাম, কিছুদিন আগেও ভাবাই যেত না। অথচ এখন শহরের এদিকে-সেদিকে সারাক্ষণই জ্যামে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।



প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

‘আমি এখনো সেভাবে জানি না,’ রবিউল বলে উঠল।

‘অ্যালাট জারি করা হয়েছে কতক্ষণ আগে?’ বাশার পরিস্থিতির গভীরতা ধরার চেষ্টা করছে। রবিউল চুপ দেখে বাইরে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তার দিকে তাকাতেই ত্রাশ নামিয়ে নিল।

‘আপনারা অ্যালাট জারি করেননি!’ সামিরার গলায় সত্যিকারের বিস্ময়। ‘আপনি—’

‘সরি ম্যাডাম, তাড়াহুড়ায় ভুলেই গেছিই, এক্ষুনি—’

সামিরা হাত-পা নেড়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাশার তাকে চোখের ইশারায় শাস্ত হতে বলল। ‘এক্ষুনি অ্যালাট জারি করেন,’ ওদের জিপ চরপাড়া হাসপাতালের মেইন গেট পার হয়ে সামনে ছুটে চলেছে। বাশার অনুমান করল ওরা হাসপাতালের কেবিন এরিয়ার দিকে। তার অনুমান সত্যি প্রমাণ করে ওদের জিপ এবং পেছনের পুলিশ ভ্যান, দ্বিতীয় গেইট দিয়ে ঢুকে কেবিন এরিয়ার নিচের গেটের কাছে থেমে গেল। জিপ থেকে নেমে ইনসপেক্টর রবিউলের দিকে তাকিয়ে বাশার বলে উঠল, ‘প্রথমেই অ্যালাট জারি করুন,’ সে নিজের শাস্ত গলার স্বর শুনে অবাকই হচ্ছে। ‘ছেলেটার যাই হয়ে থাকুক না কেন, খুব বেশি সময় পার হয়নি। অ্যালাট জারি করে, এখানে ডিউটিরত প্রতিটা লোকের সঙ্গে ভেরিফাই করেন, এরপর কেউ কিছু দেখে থাকলে, তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি কথা বলব। আর হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই সিকিউরিটি ফুটেজ চেক করেন।’

‘স্যার, পাঠিয়ে দেব মানে?’

‘আমি কেবিনে যাচ্ছি, ওখানে পাঠাবেন,’ বলে দুজন কনস্টেবল এবং সামিরাকে নিয়ে ভেতরের দিকে রওনা দিল বাশার। ছেলেটা তিনতলার একটা কেবিনে ছিল। তিনতলায় যেতেই আর দেখিয়ে দিতে হলো না। সারি সারি কেবিনের করিডরগুলোর একটার সামনে বেশ কয়েকজন পুলিশ এবং উত্তেজিত নার্স দেখে বাশার এবং সামিরা দুজনেই বুঝতে পারল এখানেই ঘটনা ঘটেছে।

বাশার সেদিকে এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিতেই সবাই উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট দিল। ওদের ভেতরে একজন এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিল সাব-ইনসপেক্টর হিসেবে। ‘হয়েছে কি, বলেন তো আমাকে,’ বাশার দ্রুত একবার চারপাশে জরিপ করে নিল।

‘স্যার, আপনারা কতটা জানেন?’ ছেলেটার প্রশ্ন শুনে বাশার খানিক অবাকই হলো। একে খানিকটা বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে তার কাছে। সে বলার আগেই সামিরা দ্রুত জ্ঞানাল ওরা কী শুনেছে।

‘ধন্যবাদ ম্যাডাম, প্রাথমিক সবটুকু তো আপনারা শুনেছেনই। এরা দুজন ছিল ডিউটিতে,’ বলে সে দুই কনস্টেবলের দিকে দেখাল। ‘ওরা ফিরে এসে নার্সের

সিপাহী

চিংকার শুনে কেবিনের দিকে এগিয়ে যায়,' বলে সে করিডরের শেষ মাথার দিকে দেখাল। বাশার ইশারায় এগোতে বলল তাকে। 'যেতে যেতে তনি।'

'স্যার,' ওরা কেবিনে ঢুকে দেখে এই অবস্থা,' বলে ছেলেটা কেবিনের সামনে এসে দরজাটা মেলে ধরল। কিন্তু বাশার, সেদিকে দেখল না। সে বাইরের করিডর আর চারপাশটা জরিপ করছে এখনো। কেবিনটা করিডরের শেষ মাথায়, করিডরের শেষের জানালার ঠিক পাশেই। চারপাশটা দেখে নিয়ে ভেতরে পা রেখে দেখল সামিরা আর সাব-ইনসপেক্টর মিলে ভেতরে পরখ করছে। কেবিনটা ছোট হলেও সুন্দর। এখন যদিও এলোমেলো। এই কেবিনে ছেলেটাকে রেখেছিল বুঝতে পারল বাশার। জায়গাটা আকৃতিগতভাবে নিরাপদ হওয়ার কথা যদিও সেটা আর কাজে লাগছে না এখন। কেবিনে ছোট একটা জানালাও আছে। বাশার জানালার দিকে এগিয়ে গেল, পুরনো দিনের জানালার ওপরে স্লাইড গ্রাস লাগানো হয়েছে, ওপাশে ফিলটার একপাশ পুরোপুরি নড়বড়ে হয়ে আছে। জানালাটার ঠিক নিচেই একটা সানশেড, তার ওপাশে একটা আমগাছ এবং গাছটার পরেই সারি সারি নারকেলগাছ। জানালা থেকে বাশারের দৃষ্টি নিচের দিকে চলে গেল, খুব মনোযোগের সঙ্গে জায়গাটা পরখ করছিল বাশার পেছন থেকে সামিরার ডাক শুনে ফিরে তাকাল সে।

'বাশার এটা দেখো,' বলে সে বিছানার পাশেই মাটিতে পড়ে থাকা একটা বটুয়ার মতো জিনিস দেখাল। 'বাশার এগিয়ে গিয়ে হাতে গ্রাভস পরে নিয়ে ছোট প্যাকেটটা খুলল, ওটার ভেতরে একটা মানিব্যাগসহ ছেলেটার প্রয়োজনীয় আরো টুকটাকি কিছু জিনিস, বাশার ভেতরের দিকে হাত দিয়ে একটা আইডির কেস এবং দুটো আইডি কার্ড বের করে আনল। একটা এনআইডি, অন্যটা ছেলেটার আর্কিভলজিস্ট হিসেবে কাজ করার আইডি। এনআইডির ছবিটা অনেক আগের এবং প্রায় বোঝার অযোগ্য। কিন্তু অন্য আইডির ছবিটা প্রায় নতুন এবং এখানে ছেলেটার চেহারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ছবিটা দেখে প্রথমেই বাশারের যেটা মনে হলো, ছেলেটার বয়স একেবারেই কম, আইডির হিসেবে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর হওয়ার কথা কিন্তু ছবি দেখে কোনোভাবেই মনে হচ্ছে না এর বয়স আঠারো বা বিশের বেশি। মাথায় ঘন চুল পাট করে আঁচড়ানো, ভাসা ভাসা চোখ, শ্যামলা গায়ের রং। ছেলেটার চেহারার একমাত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার মোটা ফ্র আঁর ভাসা চোখ, এছাড়া একেবারেই সাধারণ একটা চেহারা। আইডিটা তুলে ধরে ইনসপেক্টর রবিউলের দিকে দেখিয়ে বাশার জানতে চাইল, 'এই ছেলে?'

রবিউল খানিক ঝুঁকে ছবিটা দেখে, বলে উঠল, 'জি, স্যার।'

বাশার আইডি দুটোর ছবি তুলে নিয়ে ছোট পাউচের মতো ব্যাগটা রবিউলের হাতে দিয়ে বলে উঠল, 'অ্যালাটে এই ছবিটা ব্যবহার করতে পারেন।' বলে সে

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

চারপাশে নজর বোলাতে লাগল। স্যালাইনের নল থেকে শুরু করে বিছানার পাশের ওষুধের ট্রে মেঝেতে পড়ে আছে। সব জিনিস ছড়ানো-ছিটানো। মেঝেতে ছড়ানো কাচের টুকরো, দুয়েক ফোঁটা রক্তের ছিটাও আছে।

‘কি মনে হচ্ছে?’ সামিরা ওর দিকে এগিয়ে এসে জানতে চাইল। বাশার চারপাশে নজর বুলিয়ে সামিরার চোখের দিকে তাকাল। ‘আমার কিছুই মনে হচ্ছে না। আমার স্রেফ একটাই কথা মনে হচ্ছে,’ খানিক রাগের সঙ্গেই বলে উঠল বাশার। ‘একজন মানুষ খুঁজতে এসেছিলাম, সেটার কোনো উন্নতি তো হয়নি, উলটো এখন আরেকজন প্রাইম আই উইটনেস গায়েব। অল্প সময়ের ভেতরে দুজন মানুষ গায়েব, আর কাজের কাজ হচ্ছে ঘণ্টা। আমরা এসে কোথায় কোনো অগ্রগতি করব উলটো নিজেরাই ফেসে যাচ্ছিলাম আরেকটু হলে,’ বলে সে মাথা নাড়ল। ‘আচ্ছা, বাদ দাও, তোমার কি অভিমত বলো।’

সামিরা বড় করে দম নিল। ‘ছেলেটার আইডি ইত্যাদি সব রয়ে গেছে, জিনিপত্র এলোমেলো এবং,’ সে কারার চারপাশে দেখিয়ে হাত নাড়ল। ‘এতে মনে হচ্ছে, একই ব্যাপার যেটা আমাদের সঙ্গে ঘটতে যাচ্ছিল কিন্তু হয়নি, এখানে সেটাই ঘটেছে। প্রতিপক্ষ যারাই হোক তারা এখানে নজর রাখছিল, সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। অন্যদিকে এখানে যারা পাহারায় ছিল এরা এই ছেলের গুরুত্ব জানত না বা পরোয়া করেনি। স্রেফ ফেলে রেখে নাশতা করতে চলে গেছে। আর যারাই নজর রাখছিল, তারা একটা সুযোগ পেয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে,’ বলে সামিরা আবারো একবার চারপাশে দেখল। ‘যখন রিফাত মজুমদারকে অপহরণ করা হয়, সেখানেও এই ছেলেটা ছিল এবং সে আহত ছিল, তাকে তখন না ধরে বা না মেরে ফেলে রেখে গেল, কিন্তু এরপর আবার এখান থেকে এত হাঙ্গামা করে অ্যাবডাক্ট করল, কারণ কি?’

‘এটার একটা সহজ ব্যাখ্যা আছে,’ বাশার বাইরের দিকে দেখল, দরজা থেকে উৎসুক পুলিশ হাসপাতালের লোকজন উঁকিঝুঁকি মেরে বোঝার চেষ্টা করছে ভেতরে কী হচ্ছে। ‘ব্যাখ্যাটা হলো, ছেলেটা ওখানে তাই ওরা গুলি করে। সম্ভবত ওরা ভেবেছিল, এই ছেলে মারা গেছে বা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ছেলেটা আসলে সেরকম আহত হয়নি। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পরে ওরা সম্ভবত,’ বাশার কথায় কথায় ওরা এবং প্রতিপক্ষ বলছে কিন্তু এই ওরাটা আসলে কারা সে জানে না, ধরতেও পারছে ব্যাপারটা খুব অবস্থি তৈরি করছে ওর ভেতরে। ‘সিদ্ধান্ত নেয়, এই ছেলে যেহেতু এই কেসের প্রাইম আই উইটনেস, একে সরিয়ে ফেলাই

সিনাট্রী

নিরাপদ,' বলে সে কাঁধ কাঁকাল। 'আর যদি সেরকম কিছু ঘটেই থাকে, তবে--' বলে সে কথা শেষ না করে হাতের ইশারায় ইনসপেক্টর রবিউলকে ডাকল।'

'প্রথমেই আপনি এখানে ডিউটিরত মার্সকে ডেকে পাঠান—'

'স্যার, তিনি এখানেই আছেন,' বলে সে হাতের ইশারায় বয়স্ক করে একজন মার্সকে ডাক দিতেই মহিলা এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিল মেট্রন হিসেবে।

'মেট্রন, যে-ছেলেটা এখানে ছিল, তার মেডিকেল রিপোর্টটা দেবেন আপনি ইনসপেক্টর রবিউলকে, তবে আমাকে একটু মৌখিকভাবে বলুন তার অবস্থা আসলে কেমন ছিল।'

মেট্রন বলে গেল ছেলেটার অবস্থা। 'প্রথমে যখন আনা হয় মনে হচ্ছিল সে খুবই ইনজুরড, কিন্তু পরে আমরা ধরতে পারি, তার কাঁধের ছোট একটা গুলি ছেড়া বাদে আর তেমন কোনো ইজুরি হয়নি, তলি লাগলেও সেটা কোনো মেজর টিস্যু বা ভেইনে টাচ না করে শ্রফ মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট দিতেই সে কথা বলার মতো অবস্থায় চলে আসে। আর সিটচ দিতেই সে অনেকটাই ঠিক ঠিক হয়ে যায়, তবে শকে ছিল।'

তার বলা শেষ হতেই কাঁধ নাড়ল বাশার। 'মানে সেরকম কোনো ইনজুরি তার নেই। সে নিজেও চলতে ফিরতে পারবে?'

'জি।'

'খন্ডবাদ মেট্রন, আপনি রিপোর্টটা ইনসপেক্টরকে দেবেন,' মেট্রনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাশার রবিউল এবং তার টিমের দিকে ফিরল। 'ইনসপেক্টর, আপনি রিপোর্টটা নেবেন, হাসপাতালের প্রতিটা সিসিটিভি ক্যামেরা চেক করেন, ছেলেটার ছবি পারলে আইডিসহ হাই অ্যালাট জারি করেন। অন্তত শহর ছেড়ে বেন কোনোভাবেই একে বের করে নিতে না পারে, তা যেই একে নিয়ে থাকুক। বুকেতে পারছেন?' ইনসপেক্টর রবিউল মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে চলে গেল কাজে।

'আমরা এখন কী করব?' সামিরা খানিক হতাশ ভঙ্গিতে জানতে চাইল। 'তুমি তো ভেবেছিলে ছেলেটার সঙ্গে আগে কথা বলবে তারপর কাজ শুরু করবে। আমরা কি তাহলে স্পটে—'

'এখনি না,' বলে সামিরার দিকে ইশারা করল বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালের করিডরে বেরিয়ে এলো দরজার ভিড় ঠেলে। আরো খানিক এগিয়ে যাওয়ার পরে সবার থেকে দূরে সরে গিয়ে সামিরার দিক তাকিয়ে বাশার বলে উঠল। 'দুটো বিষয়, প্রথম কথা রিফাত ওরকম একটা ফ্যাসিনাটি থেকে অপহরণ, আমাদের ওপরে আক্রমণ, এরপর এই ছেলেটা হারিয়ে যাওয়া।'

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিমিহি

এ. পেকে আর কিছু সমাণ ঢোক না না হোক একটা বিষয় একেবারে পরিষ্কার এবং সমাপিত যে সরসের ভেতরে ভুত আছে অথবা পুরো সরষেটাই ভুত।'

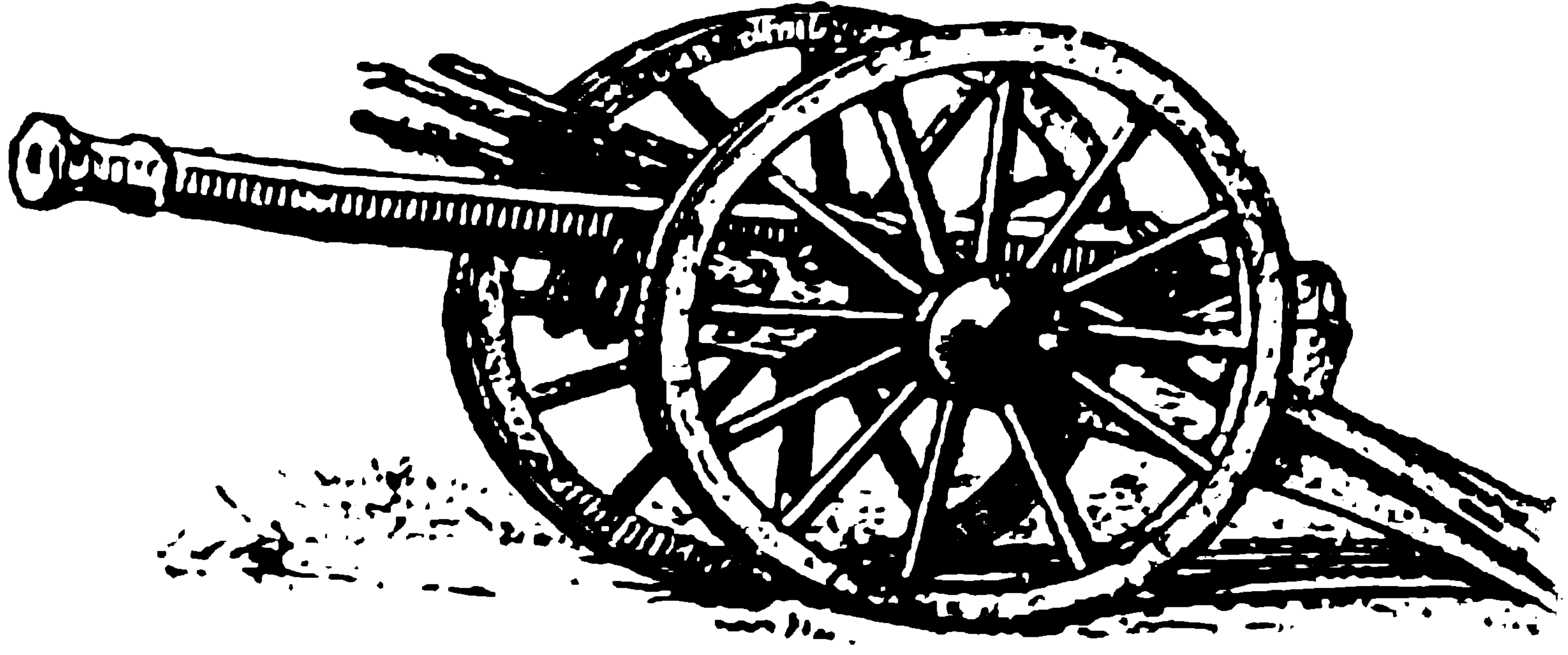
সামিরা বৃদ্ধিতে পেরেছে বাশার কী বলতে চাচ্ছে। সে বাশারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আর দ্বিতীয় কথা?'

'আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত,' বলে সে মৃদু হেসে যোগ করল। 'খালি পেটে আমার মাথা কাজ করে কম। তুমি কখনো ময়মনসিংহের বিখ্যাত পাখির দোকানের লটপটির নাম শুনেছো?'

'কি?' সামিরা ঞ্চ কুঁচকে জানতে চাইল। এরকম সিরিয়াস মুহূর্তে বাশারের মতো একজন মানুষ খাওয়া নিয়ে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল কেন সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

'পাখির দোকানের নাশতা,' বলে বাশার সময় দেখল। 'তুমি প্রথমবারের মতো কুঁচ করা শসা আর পেঁয়াজ দিয়ে পাখির দোকানের সকালের নাশতা খাও, কথা দিচ্ছি তোমার জীবন বদলে যাবে চিরতরে,' বলে বাশার হাসতে লাগল।

সামিরা ঠিক বুঝতে পারছে না লোকটার আসল অভিসন্ধিটা কি।



অধ্যায় বাইশ

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
বদলাপুর, সেনানিবাস

‘আপনাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি?’ কর্নেল জু কুঁচকে জানতে চাইল। প্রশ্নটা করেই সে তাঁবুর চারপাশে দেখল। সেনানিবাসটা ছোট হলেও এখানে যারা উপস্থিত আছে তারা বেশ হর্তাকর্তাই বলা যায়। আর যেহেতু ভারতীয় এবং ইংরেজ দুই ধরনের মানুষই রয়েছে, তাই কর্নেল প্রশ্নটা করেছে স্থানীয় ভাষাতেই।

পিটারের সঙ্গে জঙ্গলের ভেতরের দিকে এসে কর্নেল দেখতে পায় একভাবে বলতে গেলে সেনানিবাসটাকে সম্ভাব্য সব ধরনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ওটাকে বাইরে থেকে পরিত্যক্ত করে ভেতরের পুরো আয়োজনকে সরিয়ে আনা হয়েছে জঙ্গলের ভেতরে। জঙ্গলের ভেতরে অস্থায়ী বসবাস করার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বৈঠকের আয়োজন, খাওয়া-দাওয়া চিকিৎসা, সব ধরনের আয়োজন করা হয়েছে বেশ সুন্দর করেই। কর্নেলকে ভেতরে নিয়ে এসে তাকে পরিচয় হয়ে পোশাক পালটে বিশ্রাম করার সুযোগ দেওয়া হয়। কর্নেল ঠিকঠাক হয়ে ফটিক এবং সোলেমানকে নিয়ে খাওয়া সেরে একসঙ্গে তামাক সেবন করতে করতে কিছুক্ষণ এটা-সেটা বিষয়ে আলাপ করে। এই সময়টাতে পিটারও তার সঙ্গেই ছিল। এরপর তাকে ডেকে পাঠানো হয় আলোচনার জন্য মূল তাঁবুতে। সেখানে পৌঁছে কর্নেল দেখতে পায় সেখানে সেনানিবাসের প্রধান মেজর জেনারেল উইলিয়াম হেনরি এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মূল প্রতিনিধি লেফটেন্যান্ট জেনারেল জর্জ এডওয়ার্ড ফ্রেডরিক থেকে শুরু করে আরো দুজন কর্নেল, একজন ব্রিগেডিয়ার, একাধিক ক্যান্টেনসহ আরো বেশ কয়েকজন উপস্থিত। তাঁবুতে ঢুকে ক্ষণিকের জন্য কর্নেল খানিক অস্থির হয়ে পড়ে যায়, কারণ তাঁবুতে উপস্থিত সবাই এর মধ্যেই কোনো বিষয় নিয়ে জরুরি আলোচনায় ব্যস্ত ছিল, কর্নেলকে দেখে থেমে যায় সবাই।

কর্নেলের অস্থির অবস্থা আরেকটা কারণ আছে। এখানে উপস্থিত অনেককেই কর্নেল আবছাভাবে চিনতে পারছে। এদের অনেকেই তার অধীনে কাজ করত, আবার অনেকে তার সমসাময়িক সহকর্মীও ছিল। প্রায় সবাই এখন তার চেয়ে

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

ওপরের র‍্যাংকের মানুষ, হিসেবে এখন তার আসলে ওদের ওপরওয়াল্লা হিসেবে সম্বোধন করা উচিত। পরিচয় হয়ে কর্নেল যখন পোশাক পরতে যায়, তার জন্য সাধারণ এবং মিলিটারি দুই ধরনের পোশাকই বরাদ্দ করা হয়েছিল। মিলিটারি পোশাক—কারণ যে-কাজের জন্য সে এসেছে তাতে তার মিলিটারির পুরনো র‍্যাংক ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাজেই চাইলেই সে মিলিটারির পোশাক পরতে পারে। কর্নেল নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিল সে সাধারণ পোশাকই পরবে কিন্তু ক্ষণিকের জন্য সে মিলিটারি পোশাকটা দেখে নিজেকে সামলাতে পারেনি। আবেগের বশে সেটাই পরে নিয়েছে। কিন্তু এখন এই বৈঠকি তাঁবুতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সে মনে মনে আফসোস করল নিজের সিদ্ধান্তের জন্য।

কিন্তু সে ভেতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাকে বেশ সাদরে বরণ করে নেয়। বিশেষ করে মেজর জেনারেল উইলিয়াম হেনরি এক সময় তার বন্ধু মানুষ ছিল, সে তাকে নাম ধরে সম্বোধন করে এগিয়ে এসে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে যায়। তারপর একে একে পরিচয় করিয়ে দেয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফ্রেডরিকের সঙ্গে। মানুষটার সঙ্গে হাত মেলানোর সময়ে কর্নেলের মনে পড়ে গেল ক্যারিয়ারের শুরুতেই এই ছেলে দারুণ চৌকস আর ওপরে ওঠার জন্য ক্ষুধার্ত ছিল, দেখা যাচ্ছে তার ক্ষুধা ব্যর্থ হয়নি।

বসতে বসতে কর্নেল প্রথমেই জানতে চায় বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে, যদিও সে মোটামুটি জানেই আসলে পরিস্থিতি কি এবং কোনদিকে যাচ্ছে। তার পরও সে অফিসিয়াল বয়ান শুনতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই সেনানিবাসে কাজ করা এক তরুণ অফিসার সংক্ষেপে পুরো পরিস্থিতি বয়ান করার পর কর্নেল মৃদু হেসে ওঠে। 'তারমানে আপনাদের উদ্দেশ্য হলো, আপনারা এখন অপেক্ষা করছেন নেটিভরা কখন বোকামি করতে করতে নিজেরা পুরো পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে, সেই সময়ে আপনারা আবারো পুরনো নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করবেন?'

কর্নেল বাঁকা প্রশ্ন শুনে হঠাৎ থতমত খেয়ে খেয়ে যায়, আড়চোখে সে একবার ফিরে তাকায় কর্তব্যাক্ষিপ্তদের দিকে, তার দৃষ্টি অনুসরণ করে কর্নেলও তাদের দেখে নিয়ে চোখ বোলায় তাঁবুর চারপাশে। এখানে ইংরেজ অফিসারের সংখ্যা বেশি হলেও স্থানীয়ও আছে অনেকে। ফটিক উপস্থিত না থাকলেও সোলেমান দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর এক কোনায়।

'শোন বালক, তোমার ওপরওয়াল্লারা সঠিক জবাব দেবে না, আমি বলছি আসলে কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে,' কর্নেল নিজের ভেতরে পুরনো সেই শক্তি ফিরে পাচ্ছে ধীরে ধীরে, জেগে উঠতে শুরু করেছে তার ভেতরের নেতা এবং মিলিটারির মানুষটা। 'প্রথমে একটা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল,' বলে কর্নেল হাত নাড়ল। 'এটা হতোই, আগুন ছাই চাপা দিয়ে কিছুক্ষণ নিভিয়ে রাখা যায়, চিরকাল না। সেই

সিপাহী

আফগান যুদ্ধের পর থেকেই স্থানীয় সৈনিকদের ভেতরে অসন্তোষ আর বিরক্তি জমা হতে হতে সেটার পাহাড় তৈরি হয়েছে, সেই পাহাড়ের ভেতরের আগ্নেয়গিরিতে আতন দিয়েছে এই চর্বি মাখানো টোটা, যেই আতন খুব সহজেই নেতানো যেত কিন্তু তারা,' বলে সে জেনারেল আর বাকিদের দেখাল, 'ওটার পরোয়া করেননি। এর ফলে ছোট আতন ধীরে ধীরে রূপ নিয়েছে আগ্নেয়গিরিতে, তারপর সেটা যখন বিস্ফোরিত হতে শুরু করে তখন আপনারা পালাতে শুরু করেন, এই খোপের ভেতরে এসে লুকিয়েছেন নিজাদের শক্তি সঞ্চয় করার নামে। আর অপেক্ষা করতে চাচ্ছেন, তখন এই বিস্ফোরণ পুরোপুরি সব ধ্বংস করে দিয়ে ছিন্ন হবে, সেই বিস্ফোরণের ছাইয়ের ওপরে উঠে আপনারা আবার সবকিছুর দখল নেবেন।' বলে সে মাথা নাড়ল, কেন নিজেকে জানে না কর্নেল এতটা খেপে উঠল, যখন তার সতর্ক থাকা উচিত ছিল।'

'কর্নেল, আপনি যা বলছেন পুরোপুরি ঠিক না—' ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি এডওয়ার্ড ফ্রেডরিক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল। 'আপনাকে একটা কাজের জন্য আনা হয়েছে, আপনি এভাবে এখানে এসে আমাদের দোষারোপ করতে পারেন না,' প্রতিনিধি রাগের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেছে।

'ওহ, ইয়েস ডিয়ার আমি পারি,' কর্নেলও রাগের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল। 'আমি আপনাদের কারো চাকর নই যে আপনারা আমাকে এখানে ডেকে এনে যা খুশি তাই কাজ ধরিয়ে দিতে পারবেন,' বলে কর্নেল আবারো রাগের সঙ্গে বলে উঠল। 'জেনারেল, স্যার,' শব্দ গলায় বলে উঠল কর্নেল। 'আমি দুঃখিত আপনাদের সমরনীতি নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমি এই জগৎ ছেড়ে দিয়েছি অনেক আগেই। আপনি আমাকে আমার ভূমিকাটা বলুন। আপনারা আমাকে কেন ডেকে এনেছেন এরকম একটা সময়ে। জানের সঙ্গে আমার বিস্তারিত কথা হয়েছে কিন্তু আমি আসলে আপনাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন নই।'

কামরার সবাই চুপ করে আছে। মৃদু কাশি দিয়ে জেনারেল আবারো কথা বলে উঠল, 'কর্নেল, তুমি তো আমার বন্ধু ছিলে,' বলে সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে শুধরে নিল। 'এখনো আছে, অস্তিত্ব আমি তাই মনে করি। আমরা এই মুহূর্তে চূড়ান্ত এক ঐতিহাসিক সময় পার করছি,' বলে সে সম্মতির সঙ্গে মাথা নাড়ল। 'তোমার রাগের কারণ আমি বুঝি এবং তোমার কথার সঙ্গে পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই সম্মতি জানাই।'

'সম্মতি জানানো ছাড়া তো আর কোনো উপায় নেই—'

'প্রিজ, কর্নেল, বন্ধু—' বলে জেনারেল নিজের হাত তুলল। অনেকটাই আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। 'আমরা শান্তি চাই। আমি জানি আমাদের থেকে তোমাদের মাতামত অনেকটাই ভিন্ন কিন্তু আমি এটাও জানি যে তুমিও আমার মতোই একই মতামত বহন করো।'

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

‘একজন মানুষ যে অনেক আগেই বাতিল হয়ে গেছে—’

‘এডওয়ার্ড ফ্রেডরিক, এখানে অথরিটি কিন্তু আমার,’ এবার জেনারেলের গলা কঠিন হয়ে উঠল। ‘এবং কমান্ডের দিক দিয়ে আপনি এবং আপনার আমার কথা শুনতে বাধ্য। ক্রিয়ার?’ জেনারেলের কঠিন গলায় বলে উঠল। ‘ক্রিয়ার?’ সবাই এখনো চূপ হয়ে আছে। তাঁবুর পরিস্থিতি ভয়াবহ রকমের থমথমে।

‘ঠিক আছে জেনারেল,’ কর্নেলই আবার কথা বলে উঠল। ‘আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। আমারই এসব আলোচনা তোলা উচিত হয়নি। আমরা শুরু থেকে শুরু করি প্রিন্স,’ কথাটা বলে কর্নেল সবার দিকে দেখে নিয়ে জেনারেল হেনরির দিকে ফিরে তাকাতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগে তার দৃষ্টি আটকে গেল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধির দিকে, লোকটা আগুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কর্নেলের দিকে। কর্নেলের জন্য থেমে গেলেও পাস্তা না দিয়ে কাজে মন দিল কর্নেল।

‘যদিও আপনারা সবাই জানেন তার পরও আমি ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি খানিক ব্যান করছি,’ তরুণ সেই অফিসার যে-আগে কথা বলতে শুরু করেছিল, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার আগে, সেই ছেলেটা আবারো বলে উঠল। ছেলেটার পোশাক এবং ব্যাজ দেখে কর্নেল বুঝতে পারল ক্যান্টেন র‍্যাংক তার। ছেলেটা সংক্ষেপে যা বলে গেল সেটা এখানে আসার আগে সোলেমানের কাছেই শুনেছে। সেই ব্যারাকপুর থেকে শুরু করে দিল্লিতে এসে থামল তার বিবরণ।

‘কিন্তু আপনারা দিল্লি নিয়ে চিন্তিত নন, তাই না?’ কর্নেল ঞ্চ কুঁচকে জানতে চাইল। সে বুঝতে পারছে এই বদলাপুর সেনানিবাস এত ছোট হলেও এটাকে সরিয়ে এনে বাইরে থেকে ক্যামেফ্লেজ করে এত কষ্ট করে কেন জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে আসা হয়েছে, সেই সঙ্গে সে এটাও ধরতে পারছে এইরকম ছোট একটা সেনানিবাসে এত এত বড় বড় পদের লোকজন কেন উপস্থিত। কারণ অবস্থানগতভাবে এই সেনানিবাসের গুরুত্ব অপরিসীম।

‘জি, স্যার,’ ক্যান্টেন ছেলেটা বড় করে একবার দম নিয়ে বলে উঠল। ‘দিল্লি ভেতর থেকে যত নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে বাইরে থেকে আমাদের সেটাকে আবারো কবজা করার সম্ভাবনা ততটাই বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে অন্য জায়গাতে। এই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে ভারতবর্ষের অন্য জায়গাতে। বিশেষ করে দক্ষিণের নিজাম থেকে শুরু করে মারাঠা নানা সাহেব, উত্তরের লক্ষীবাই, এমনকি ছোট ছোট রাজা এবং জমিদারেরাও বিদ্রোহের সুযোগ নিজেদের স্বাধীনতার পরিধি বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।’

‘বুঝতে পেরেছি, দিল্লির অবস্থা ভেতর থেকে কাহিল, আর ভারতের অন্যান্য জায়গায় আপনাদের অবস্থা কাহিল। এখন আমার প্রশ্ন হলো, এইরকম ভয়াবহ অবস্থার ভেতরে আপনারা একজন মানুষ নিয়ে চিন্তিত কেন এবং এত এত লোকবল

সিপাহী

আর দুনিয়ার সবকিছু থাকার পরও আপনারা আমাকে কেন ডেকে এনেছেন ইংল্যান্ড থেকে,’ বলে কর্নেল কাঁধ ঝাঁকাল। তার উচ্চারিত প্রশ্নটা স্রেফ করার জন্য করা নয়, সে এটার উত্তর সত্যি সত্যি জানতে চায়।

কর্নেলের প্রশ্নের জবাবে ক্যান্টেন ছেলোটো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই জেনারেল তাকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে নিজের কেরারা থেকে। সে কামরার লোকদের দিকে ইশারা করতেই একে একে বেরিয়ে গেল অনেকে। কর্নেল দেখল কামরায় এখন স্রেফ জেনারেল, ইস্ট ইন্ডিয়ান প্রতিনিধি আর পিটার রয়েছে।

ধীর পায়ে হেঁটে চৌপায়ার ওপাশে ঝুলিয়ে রাখা ম্যাপটার দিকে দেখতে দেখতে বলে উঠল, ‘জন নিশ্চয়ই তোমাকে বলেছে কেন ভিক্টরকে নিয়ে আমরা চিন্তিত,’ প্রশ্নটা করেই সে নিজেকে শুধরে নিল। ‘মানে আমি জানতে চাইছি সে আসলে তোমাকে কতটুকু বলেছে?’

‘ভিক্টর কেন ভারতবর্ষে এসেছিল, এটা আমি খুব ভালো করেই জানি। সে একজন গবেষক, মূলত ভারতবর্ষ নিয়ে গবেষণা করার জন্যই সে এসেছিল,’ বলে কর্নেল আবারো কাঁধ ঝাঁকাল। ‘শুরুতে সে এমনকি ভারতবর্ষকে খুব বেশি পছন্দ করত না, কারণ তার গরম সহ্য হতো না। আর সে ভারতে এসেছিলও খুব ভয় হৃদয়ে। বাই হোক, সে নিজের কাজ করতে করতে এবং স্থানীয়দের সঙ্গে মিশতে মিশতে সে ভারতের প্রেমে পড়ে যায়। খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম আমরা। অত্যন্ত অভিমানপ্রিয়, বইপড়ুয়া এবং মিস্তক একজন মানুষ সে। ওর মতো জ্ঞানী মানুষ আমি জীবনেও দেখিনি। নিজের কাজ আর নিজের মানুষদের বাইরে সে খুব বেশিকিছু বোঝে না বুঝতেও চায় না। এরকম একটা মানুষ হঠাৎ সবার জানের শত্রু হয়ে উঠল কেন, আমি সেটাই বুঝতে পারছি না। আর এরকম একটা গভীর সময়ে তাকে ধরার জন্যই বা এত প্রচেষ্টার কারণ কি, আমি সেটাও বুঝতে পারছি না।’

‘আপনি কি জানেন সে দিল্লিতে কী করেছে?’ ইস্ট ইন্ডিয়ান প্রতিনিধি জেনারেল জর্জ অনেকক্ষণ পর কথা বলে উঠল।

‘আমি শুনেছি সে আপনাদের পাতা ফাঁদ গলে খুব সহজেই পার হয়ে গেছে—’

‘সে প্রায় শতাধিক মানুষ হত্যা করেছে দিল্লিতে। পুরো একটা অগ্নাগার উড়িয়ে দিয়েছে সে। সে নিজের পালানোর রাস্তা ঠিক করার জন্য সেই অগ্নাগারে আশ্রয় নেওয়া প্রায় কয়েক শ মানুষকে উড়িয়ে দিয়েছে।’

একই তথ্য আগেও শুনেছে কর্নেল। কিন্তু কেন জানি তার ঠিক হজম হয়নি। কিন্তু এবার সরাসরি জেনারেলের মুখ থেকে শুনে খানিক দ্বিধায় পড়ে গেল ও। ‘আমি বিশ্বাস করি না, ভিক্টর এ-ধরনের কিছু করতে পারে। সে জ্ঞানী এবং

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

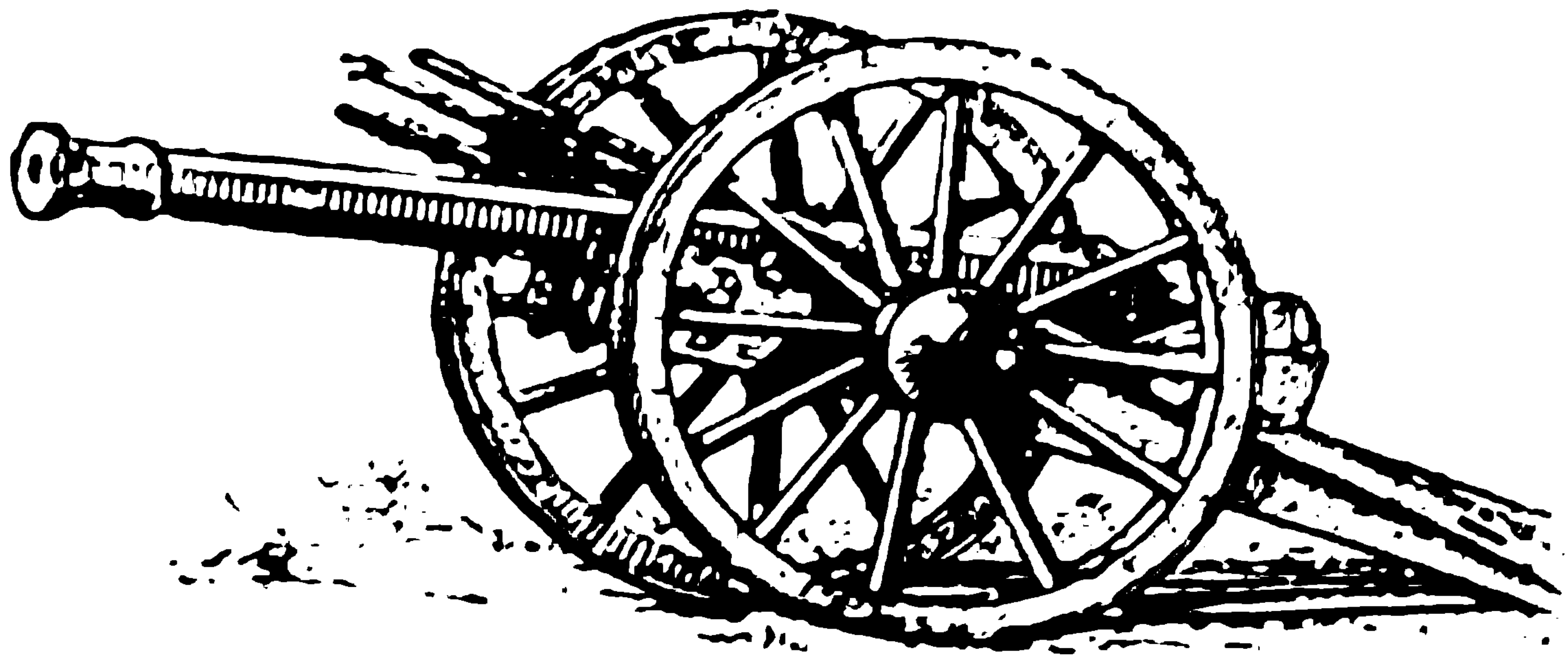
পাগলাটে হতে পারে, কিন্তু তার মতো সংবেদনশীল মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি এবং—

‘সে যাদের উড়িয়ে দিয়েছে তার ভেতরে সাদা চামড়া থেকে শুরু করে স্থানীয় অনেক মানুষও ছিল। সে নিজের পথ তৈরি করার জন্য এক বিন্দু দ্বিধা না করে স্রেফ কসাইয়ের মতো খুন করেছে মানুষগুলোকে,’ জেনারেলের কথার জবাবে কর্নেল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই জেনারেল আবারো বলে উঠল। ‘তুমি তো এখন ভারতের মাটিতে, তোমাকে আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে না—তুমি ময়দানে নেমে নিজে খোঁজ করে দেখতে পারো।’

কর্নেল চুপ হয়ে গেছে জেনারেলের কথা শুনে।

‘মেধা আর শক্তি যখন একসঙ্গে হয় তখন কী হয় জানো?’ কর্নেলকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল। ‘সেখান থেকে খুব ভালো কিছু হয়, আর না হয় সৃষ্টি হয় উন্মাদনার। যে-ভিক্টরকে তুমি চিনতে,’ বলে জেনারেল থেমে গেল। ‘যে-ভিক্টর নিজের প্রাণ দিয়ে তোমার পরিবারকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল,’ কর্নেল চোখ তুলে তাকাল জেনারেলের দিকে। জেনারেল বলে চলেছে, ‘সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভিক্টরের মৃত্যু হয়েছে। এখন বেঁচে আছে স্রেফ একটা দানব আর সেই দানবের বিনাশ আমাদেরই করতে হবে। আর সে-জন্যই তোমাকে ডেকে আনা হয়েছে। সত্যি কথা হলো জন তোমাকে পুরোটা বলেনি। তোমাকে আসলে শুধু ভিক্টরকে খুঁজে বের করার জন্য আনা হয়নি, তোমাকে ডেকে আনা হয়েছে হয় তাকে খুঁজে বের করার জন্যে আর না হয় তাকে নিকেশ করার জন্য। যেটা একমাত্র তোমার দ্বারাই সম্ভব।’

কর্নেলের মাথা আপনাতেই নিচু হয়ে গেল, এরকম কিছু ভেবে সে ভারতের মাটিতে পা দেয়নি।



অধ্যায় তেইশ

বর্তমান সময়

কাঁচিঝুলি মোড় এলাকা, ময়মনসিংহ

‘তুমি কখনো লটপটি জিনিসটা খেয়েছো?’ বাশার আপনি আপনি করছে দেখে সামিরা নিজে থেকেই গুকে তুমি করে বলতে বলেছে। কারণ একে তো ওরা সমবয়সি আবার একসঙ্গে কাজ করছে এখন।

‘হুম?’ দেখতে খুব বেশি আহামরি নয় দোকানটার চারপাশে দেখতে দেখতে সামিরা আনমনেই বলে উঠল, কাঁচিঝুলি মোড়সংলগ্ন এলাকাটায় এরকম সাধারণ একটা খাবার হোটেলে কেন তাকে এত তোড়জোড় করে নিয়ে এলো বাশার এখনো ঠিক ধরতে পারছে না সে। চারপাশে দেখতে দেখতে সে ফিরে তাকাল বাশারের দিকে। ‘সরি, কী বললে বুঝতে পারিনি?’

বাশার মৃদু হেসে উঠল। ‘তুমি কি এবারই প্রথম ময়মনসিংহে এসেছো?’

‘না, এর আগে একবার এসেছিলাম,’ সামিরা টিস্যু দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে উঠল। ‘স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় তোমাদের এখানে অ্যাগ্রি ভার্সিটিতে এসেছিলাম, অ্যাগ্রি ভার্সিটি আর ন্যাপে ট্রেনিং ছিল আমাদের। খুব বিস্তারিত না হলেও তখন টিচার ও ফ্রেন্ডদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম মোটামুটি ভালোই। খুব সুন্দর শহর। বিশেষ করে শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ব্রহ্মপুত্র আলাদা একটা আবেশ দিয়েছে শহরটাকে,’ বলে সে মুখ মোছা শেষ করে সরাসরি বাশারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘ইউ ইউ ডোট মাইন্ড, আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, তুমি হঠাৎ এখানে এলে কেন?’

বাশার সামিরা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বাইরের দিকে তাকাল, তারপর হোটেলটার কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় ওয়েটারকে ডাকল। সকালবেলার ব্যস্ত সময় ওয়েটার ছেলেরা হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিল সে আসছে। ‘কেন, খাবার জন্য এখানে আসা যেতে পারে না?’ আবার সামিরার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে উঠল

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

বাশার, 'তুমি তো বেশ ক্ষুধার্ত, তুমি আমি দুজনেই, ওরাও,' বলে সে ওদের পাশের টেবিলে বসা ওদের পুলিশ টিমের অন্যদের দিকে দেখাল। 'দিন মাত্র শুরু হয়েছে, সামনে আরো কত কি হতে যাচ্ছে কে জানে। এখুনি আমি তোমার চোখের কোপে কালি দেখতে পাচ্ছি। তাহলে আমার চেহারার অবস্থা কেমন সেটা আর কলার অপেক্ষা রাখে না। তাহলে বলো এরকম একটা সময়ে ভালোভাবে সকালের নাশতা করার ইচ্ছা কি খুব খারাপ কিছু?'

'না তা মোটেই নয়, কিন্তু এরকম একটা সিরিয়াস সময়ে যখন রিফাত মজুমদার অপহৃত, তার সঙ্গে থাকা ছেলেটা গায়েব। আমাদের ওপরে হামলা হয়েছে, ডিপার্টমেন্টে কাউকে আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না, কেসটা কি নিয়ে সেটা বুঝতে পারছি না, আমাদের শত্রুরা সব জানে আমরা কে কারা কোথায় আছি। আর আমরা এমনকি হাওয়ার ওপরেও ঘুরপাক খাবার মতো অবস্থায় নেই, এমন সময়ে তুমি তোমার পরিচিত পাখি ভাইয়ের হোটেলে নাশতা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছো, ব্যাপারটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না।'

বাশার কিছু না বলে আবারো মৃদু হাসল। ওয়েটার ছেলেটা আসতেই খাবারের অর্ডার দিলে ছেলেটা যাওয়ার সময়ে তার কাছে জানতে চাইল, হোটেলের মালিক পাখি ভাই আছে নাকি। ছেলেটা জানাল মালিকের শরীর খারাপ দেখে আজ আসেনি। ছেলেটাকে বিদেয় জানিয়ে টেবিলে রাখা খাবারটা দেখিয়ে বাশার বলে উঠল, 'এই খাবারটা খেয়েছো কখনো? এটাকে বলে লটপটি,' বলে সে পেরোটোর প্রুট টেনে দিয়ে খানিকটা ছিড়ে লটপটি দিয়ে তুলে মুখে দিল।

সামিরা খানিক সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাশারের দিকে। 'খাওয়া তো দূরে, আমি নামই শুনি—'

বাশার খাবার মুখে দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে চিবুতে চিবুতে আকসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল। 'এই হলো আমাদের বাংলাদেশের একটা সমস্যা। আমাদের দেশের প্রতিটা জেলায়, প্রতিটা গলিতে কোনায়-কানায় হাজারো মূল্যবান সম্পদ ছড়িয়ে এবং লুকিয়ে আছে। আর আমরা বাঙালিরা এর কোনো মূল্য দিতে শিখলাম না আজো। সারাজীবন হাপিত্যেশের মতো বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম, আর যা বিদেশি সেগুলোকেই ভালো আর মূল্যবান মনে করে গেলাম। কিরেও দেখলাম না আমার আশপাশে কত রহস্য ছড়িয়ে রয়েছে। এই জন্যই কবি বলেছেন, ঘর হইতে—'

'ওকে ওকে,' খাবারটা মুখে দিতে দিয়ে সামিরা থামিয়ে দিল তাকে। বারকয়েক চিবিয়ে সে আনমনে মাথা নাড়ল। 'মজা তো!'

'একদম,' বাশার খুশি হয়ে উঠল সামিরার কথা শুনে। 'আমাদের দেশের একটা সমস্যা কি জানো, এখানে সঠিকভাবে কোনো সম্পদের ব্যবহার এবং ডিস্ট্রিবিউশন হয় না,' বলে আবারো খাবার মুখে পুরে দিয়ে সে খানিকটা বাগে

সিপাহী

এনে বলে চলল। 'দেখো আমি খুব বেশি দেশের বাইরে বাইনি, কিন্তু টুকটাক না গেছি তাতে দেখেছি উন্নত দেশ তো বটেই এমনকি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতেও প্রতিটা স্টেট, প্রতিটা শহরের জন্য আলাদা আলাদা ব্রসিয়ানের মতো আছে। টুরিস্ট ডেস্টিনেশন তো বটেই, শুধু টুরিস্ট ডেস্টিনেশন না, যেকোনো সাধারণ শহরেরও প্রতিটা এন্টি পয়েন্ট থেকে শুরু করে এমনকি সাধারণ হোটেল লজিং বা মোটেলগুলোতেও এসব ব্রসিয়ানের ছড়াছড়ি। এগুলোতে প্রতিটা জায়গার প্রতিটা খাবার থেকে শুরু করে প্রতিটা অকর্মণীয় দিক খুব সুন্দরভাবে মেনশন করা থাকে এসব ব্রসিয়ারে। অথচ আমাদের দেশে কোথায় কি আছে আমরা জানিই না,' আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল বাশার।

বাশারের আফসোস দেখে মৃদু হেসে উঠল সামিরা। 'না, পরিস্থিতি একটাও খারাপ না, এখন তো তাও টুকটাক পাওয়া যায়,' বাশার আবারো রাগের সঙ্গে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, সামিরা হার মানার ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'ঠিক আছে আমি মানছি তুমি যা বলছ সেরকম অবস্থা এখনো হয়নি। তবে আমার প্রশ্ন সেটা নয়,' সামিরা আবারো খাবার মুখে পুরে দিতে দিতে বাশারের দিকে তাকিয়ে রইল। বাশার খেতে খেতে বারবার হোটেলটার দুটো প্রবেশপথের দিকেই নজর রাখছে। 'তুমি নিশ্চয়ই এখানে স্রেফ খেতে খেতে বাংলাদেশের পর্যটন নিয়ে আলোচনা করতে আসোনি।'

'তোমার কি মনে হয়, এই রুশো ছেলেটাকে কে অপহরণ করল?' বাশার খানিকটা রুঢ়ভাবেই কথার মাঝে সামিরাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল।

সামিরা কাঁধ ঝাঁকাল। 'খুব স্বাভাবিকভাবে তো মনে হচ্ছে যারাই রিফাত মজুমদারকে অপহরণ করে থাকুক না কেন, কাজটা তারাই করেছে,' বলে সে বাশারের দিকে দেখিয়ে বলে উঠল। 'তুমি আগে যেটা বলেছিল আমি সেটা সমর্থন করি। আমার ধারণা রিফাত মজুমদার অপহরণের সময়ে ওরা ভেবেছিল ছেলেটা মারা গেছে বা মারাত্মকভাবে আহত। কিন্তু পরে যেই মুহূর্তে জানতে পারে যে ছেলেটার তেমন কিছু হয়নি, তখন ওরা আঘাত করে।'

'...এবং ঠিক আগের মতোই ছিনিয়ে নিয়ে যায়,' বলে বাশার মাথা নাড়ল। 'তুমি যা বললে যদি সেটা হয়ে থাকে তবে...' বাশার বাক্যটার শুরুটাও ঠিকমতো করেনি, শেষও করল না ঠিকমতো। 'সিলেট আর চট্টগ্রামে কি হয়েছে জানো?'

'হুম, জানেছি,' সামিরা খাওয়া চালিয়ে যেতে যেতেই বলে উঠল। 'আমি জানি না তুমি কতটা বিস্তারিত জানেছো, কিন্তু পাশা স্যার এবং পাটোয়ারি স্যার সবাই মনে করছেন এগুলো সবই কানেক্টেড। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো কেন এবং কীভাবে?'

'তোমার প্রশ্ন বৃহত্তর স্বার্থে সঠিক কিন্তু এই মুহূর্তের জন্য ভুল। কারণ এই মুহূর্তে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে প্রায়োরিটি লিস্টে।'

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

‘আমি বলছি, প্রথম প্রশ্ন, রিফাত অপহৃত কেন হলো এবং আমাদের ওপরে হামলা কিংবা এই রুশো ছেলেটাকেই বা কীভাবে এবং কেন নিয়ে যাওয়া হলো। এত ঝুঁকি, এত হাঙ্গামা এতকিছু কিন্তু কেউই এখনো কিছু চাচ্ছে না। আর এই কারণেই কোনো কেনরই জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক বেশি ‘কেন’?’

‘এবারও প্রায়োরিটি লিস্টের দ্বিতীয় প্রশ্নটা করেছো তুমি?’ বাশার খাওয়া শেষ করে আঙুলগুলো ধুয়ে নিয়ে হাতের ইশারায় ছেলেটাকে ডেকে চা দিতে বলল। সামিরার খাওয়া আগেই শেষ হয়েছে। সামিরা তো বটেই অন্যদের জন্যও সে চা দিতে বলল।

‘আচ্ছা বুঝলাম,’ এবার সামিরা খানিক বাঁকা সুরেই বলে উঠল। ‘তাহলে তুমিই বলো প্রায়োরিটি লিস্টের প্রথম প্রশ্নটা কি হওয়া উচিত?’ সামিরা গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাশারের দিকে। যদিও প্রশ্নটা বাঁকা সুরে করেছে সে কিন্তু সে আসলে বুঝতে চাইছে বাশার কী পয়েন্ট মেইক করতে চাচ্ছে।

ঠিক আছে তোমার পছাতেই শুরু করি। বৃহত্তর খেলায় এর আগে ময়মনসিংহে কী হয়েছে আমার কেসে, যেটার সঙ্গে ঠগিরা ছিল, এরপর অফিসার তানভির মালিকের সঙ্গে সিলেট, অফিসার শারিয়ারের কেসে চট্টগ্রামে। এরপর আমার কেসে টের পাওয়া গেল এগুলো সবই কানেক্টেড। কেন এবং কীভাবে আমরা জানি না। জানতে চাই,’ বলে সে সামিরার দিকে একটা আঙুল তুলল। ‘এটা তৃতীয় পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্ট তুমি বলেছো, রিফাতের বিষয়টা। এত আয়োজন করে অপহরণ হলো কিন্তু কারো কোনো চেনাভেদ নেই, কোনো মুক্তিপণ চাওয়া নেই, তাহলে কারণটা কি? আবাবো আমরা জানি না। কিন্তু এসবের জবাব জানা এবং রিফাতকে উদ্ধার করা আমাদের কাজ। এবার প্রথম এবং মেইন পয়েন্ট। রিফাতের অপহরণ যেভাবে হয়েছে, অপহরণকারীরা ভেতরের সব জানত, আমাদের ওপরে হামলা, রুশোর অপহরণ,’ বলে সে নাটকীয়ভাবে থেমে গেল। ‘আগের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে হলে আমাদের ফাংশন করতে হবে। কিন্তু ফাংশন করতে গেলে খুব পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে সরষের ভেতরে ভূত নয়। আমরা চারপাশে ভূতের মাঝে সরষে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তাহলে প্রশ্ন হলো, এমন অবস্থায় আমরা কাজ করব কীভাবে?’

বাশার তাকিয়ে আছে সামিরার দিকে, সামিরাও তাকিয়ে আছে বাশারের দিকে। দুজনেরই দৃষ্টি ছিন্ন জবাব নেই কারো মুখে, বাশার হেসে উঠল। ‘ওই জবাব পাওয়ার জন্যই আমি এখানে এসেছি,’ বলে সে সামিরাকে তার উলটোদিকের হোটেলের প্রবেশপথের দিকে দেখাল।

বাশারের কথা শুনে সামিরা খানিক অবাক হয়েই পেছন ফিরে হোটেলের প্রবেশপথের দিকে তাকাল। সবাণবেলার ব্যস্ত সময়, অনেকেই ঢুকছে বের হচ্ছে,

সিপাহী

সামিরা ঠিক বুঝতে পারল না বাশার আসলে কার কথা বলছে। 'তুমি ঠিক কার কথা—' বাশার নির্দিষ্টভাবে একজন মানুষকে দিকে নির্দেশ করতেই সামিরা মনোযোগ দিয়ে মানুষটাকে দেখে রীতিমতো হতাশ ভঙ্গিতে, সেই সঙ্গে অনিক অবাক হয়েই বলে উঠল, 'ওই ভুঁড়িওয়ালা, খুঁড়িয়ে চলা আংকলের সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছি আমরা?' বলে সে অবাক ভঙ্গিতে দুই পাশে নিজের হাত ছড়িয়ে দিয়ে জানতে চাইল, 'কারণ কি?'

সামিরার কথা শুনে মৃদু হেসে উঠল বাশার। 'ওধু ভুঁড়িওয়ালা, আর বয়স্কই নয়, মানুষটা তুমুল চাপাবাজ এবং সেই সঙ্গে ফাঁকিবাজও,' বলে সে ততোধিক অবাক সামিরার চোখের দিকে তাকিয়ে এক চোখ টিপে উঠে দাঁড়িয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। সামিরা অবাক হয়ে আনমনে কাঁধ ঝাঁকাল, একবার অন্য টেবিলে বসে বোশগল্প করতে থাকা পুলিশদের দিকে দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সেও। সামিরা যখন হোটেল প্রবেশপথের দিকে এগিয়েছে, বাশার ততক্ষণে এটা টেবিলের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ একটু আগে হোটেলের প্রবেশপথ দিয়ে প্রবেশ করা মোটা মানুষটা, এর মধ্যে ভেতরে ঢুকে টেবিলে বসে পড়েছে খাবার জন্য। টেবিলটাতে সে একাই বসেছে পেছন ফিরে, সামনে মেলে রাখা একটা পত্রিকা, সেটাকে দুই হাতে ধরে ব্যাপক চিন্তাচিন্তি করছিল সে ওয়েটার ছেলেটার দিকে। টেবিলের পেছন থেকে ছেলেটাকে সরে যাওয়ার ইশারা করে, বাশার চট করে মানুষটার কাঁধে দুটো টোকা দিয়ে বলে উঠল, 'রমিজ ভাই, কেমন আছেন?'

মোটাসোটা মানুষটা ওয়েটার ছেলেটা চলে যাওয়ার জন্য রওনা দিতেই ব্যাপক রাগ এবং বিরক্তির সঙ্গে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বাশারের গলা শুনে সে থেমে গিয়ে কিরে তাকাতেই মুখটা হাঁ হয়ে গেল। 'স্যার, আইন্নে!'

মানুষটার হাঁ করা মুখের সামনে হাসি হাসি মুখ করে টেবিলটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল বাশার, সামিরাকেও বসার জন্য ইশারা করল। 'কেমন আছেন রমিজ ভাই?' আবারো একই প্রশ্ন করল সে। 'সামিরা উনি রমিজ দারোগা, রিটার্ডার্ড রমিজ দারোগা,' নিজেকে ওধরে নিয়ে বলে উঠল বাশার। 'রমিজ ভাই ও হলো, সামিরা, আমরা একটা কেসে কাজ করছি একসঙ্গে।' রমিজ দারোগা এখনো নিজের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারছে না। 'স্যার আইন্নে মিসিং হবে আইলাইন, আইন্নে না ঢাকা—'

'কাজে এসেছি রমিজ, ভাই। আপনি কেমন আছেন, বলেন,' বাশার ইশারায় ওয়েটার ছেলেটাকে ডাক দিল আবার। 'বলেন, কী খাবেন?'

'আ,' রমিজ দারোগা এখনো তার শক পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারছে না, হঠাৎ এভাবে পুরনো দিনের মানুষের দেখা পেয়ে যাবে, সে ভাবতে পারেনি।

'আচ্ছা, আপনি কি খাবেন, আমি জানি,' বলে সে ওয়েটার ছেলেটাকে খাবারের অর্ডার দিয়ে রমিজ দারোগার দিকে ফিরে তাকাল। 'তো বলেন রমিজ

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

ভাই, কেমন যাচ্ছে আপনার অবসর জীবন?' বলে সে রমিজ দারোগার পায়ের দিকে দেখাল। 'পা-টা তো মনে হয় ভালোই সমস্যা করে,' বলে সে ফিরে তাকাল রমিজ দারোগার মুখের দিকে। হঠাৎই মনে পড়ে যাচ্ছে রমিজ দারোগা, কনস্টেবল আবদুল্লাহ, তৌফিক, সেই সঙ্গে রিফাতকে নিয়ে সমাধান করা সেই কেসের কথা। রিফাতের কথা মনে আসতেই দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর বুক চিরে। 'আমি তো শুনেছিলাম, আপনার পা-টা ভালো হয়ে গেছে। আর শেষবার যখন দেখা হয়েছিল, তখন তো এতটা খারাপ মনে হয়নি,' বলে বাশার একটু থেমে যোগ করল। 'রমিজ ভাই, আপনার পা-টার জন্য আমার এখনো নিজেকে অপরাধী মনে হয়।'

বাশার ভেবেছিল তার কথা শুনে রমিজ দারোগা মন খারাপ করতে পারে বা মুখ কালো করে ফেলবে। কিন্তু হলো একেবারে উলটো। রমিজ দারোগা প্রায় হো হো করে হেসে উঠল। বাশার এবং সামিরাকে অবাক করে দিয়ে সে হেসেই চলল, 'স্যার, কি যে কইন আইন্নে। আমি তো রিটায়ার হইছি সেইদিন। এর বহু আগে আমি আসলে মইরাই গিয়েছিলাম। আপনার লগে ওই কেসে কাম কইরা আমি আসলে আবার জীবন ফিরা পাইছি,' বলে সে নিজের পায়ে একটা খাবা দিয়ে বলে উঠল। 'এই পা-ও তো সেই হিসেবে কিছুই না। এহন বলেন, স্যার আইন্নে এইহানে হঠাৎ এমনে, আপনার নতুন দায়িত্বের কথা হইল্লা কী যে খুশি অইছিলাম, কওনের বাইরে। বলেন স্যার, সবকিছু কেমন চলতাছে?'

'আমি আমার কথা বলব,' বাশার ওয়েটার ছেলেটাকে ইশারায় আবারো চা দিতে বলল। 'আগে বলেন আপনার অবসর জীবন কেমন চলছে?' বলে সে একটা হাত তুলে যোগ করল। 'আমি প্রশ্নটা একটা বিশেষ কারণে জানতে চাচ্ছি।'

রমিজ দারোগা বাশারকে মনোযোগ দিয়ে দেখল, এরপর এক ঝলক দেখে নিল সামিরা এবং অন্য টেবিলে বসে থাকা পুলিশ সদস্যদের। কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করল সে, তারপর মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'স্যার, আইন্নেরে এইহানে দেইখাই আমি বুঝছি আইন্নে এমনে এমনে অসেন নাই। যাক গা, আপনে যা বলবেন তাতে জান হাজির। আমি বালা আছি স্যার। এটু বিরক্ত আরকি। বউ মারা গেছে অনেক আগে আপনে তো জানতেনই। পোলা বাপের কোনো খোঁজ রাহে না, তয় মাইয়া দুইটা বিয়া দেওনের পর সুখী। আমি অগো লগে না থাকলেও দুইটা মাইয়াই কাছাকাছি থাকে। নিজে একলা থাকলেও ওগো বাড়িত যাই, দিনের বেশির ভাগ সময় নাতি-নাতকুরগর লগে খেলি। ওগোরে ফুলে নেই-আনি। খারাপ লাগে না,' বলে সে আনমনে মাথা নাড়ল। 'একটা মজার বিষয় কি জানেন স্যার। সারাজীব কামে ফাঁকি মারছি, কেমনে খালি কাম এড়ামু হেই চিন্তা করছি। আর

সিপাহী

এহন সারাদিন কাম খুঁইজ্জা বেড়াই,' বসে আবারো হেসে উঠল। 'তয় আইন্নের লগে সেই কেসটা অন্যরহম আছিল। ওরম মজা আর পাই নাই,' বলে সে সামিরার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল। 'স্যার কি আপনেনের বলছে হেই কেসটার কথা?'

সামিরা খানিক প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল বাশারের দিকে। কিন্তু বাশার সেই বিষয়ে কিছু না বলে সে রমিজ দারোগার দিকে ফিরে বলে উঠল, 'রমিজ ভাই, আপনি কাজের কথা জানতে চাচ্ছিলেন না। আমার নতুন দায়িত্ব খুব ভালোভাবেই চলছে। আমি আমার প্রথম কেস খুব ভালোভাবেই সম্পন্ন করেছি—'

'আমি জানতাম স্যার, আইন্নে অবশ্যই পারবেন—'

'কিন্তু সমস্যা হয়েছে অন্যখানে,' বলে বাশার খুলে বলল আসলে কী হচ্ছে এবং সে কেন এখানে এসেছে। তার কথা শুনে আনমনে মাথা নাড়ল রমিজ দারোগা। 'বলেন কি স্যার, রিফাত ম্যাডামেরে ধইরা নিছে গা। বলে সে আবারো আনমনে মাথা নাড়ল। 'সময় তো তাইলে খুবই কম। স্যার, আপনি আমারে কি করতে বলেন। আমি স্যার এমনই বাতিল মাল। এহন তো আরো বুড়া অইয়া গেছি। স্যার, আইন্নে আমারে যা বলবেন আমি তাই করব, কিন্তু কথা অইলো আমি কি আইন্নেরে সেইভাবে সাহায্য করতে পারব?' রমিজ দারোগা গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাশারের দিকে।

বাশার বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল তারপর ফিরে তাকাল সামিরার দিকে। 'সামিরা, তুমি জানতে চাচ্ছিলে না, আমি কেন তাকে খুঁজতে এসেছি এবং আমি জানি রমিজ ভাইয়ের মতো তোমার মনেও অনেক প্রশ্ন,' বলে সে ফিরে তাকাল রমিজ দারোগার দিকে। 'আমি দুজনার সব প্রশ্নের জবাব একসঙ্গে দিচ্ছি। রমিজ ভাইয়ের তিনটা জিনিস আছে, যা আমার এই মুহূর্তে প্রয়োজন এবং এই তিনটা জিনিস অন্য কেউ দিতে পারবে না। এক,' বলে ও নিজের আঙুলের কর শুনল। 'রমিজ ভাইয়ের কানেকশন মারাত্মক, এই শহরে এমন কেউ নেই যার সঙ্গে তার মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে না বা সে খুঁজে বের করতে পারবে না। দুই, রমিজ ভাই প্রায় সারাজীবন এই শহর এই এলাকাতেই কাজ করেছেন, কাজেই তিনি এই থেটার ময়মনসিংহ এমনভাবে চেনেন যেটা আর কেউ পারবে বলে আমার মনে হয় না। তিন, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ,' বলে ও ইচ্ছে করেই থামল। 'তাকে আমি বিশ্বাস করি, আমি জানি তিনি জীবন দিয়ে দেবেন কিন্তু বেইমানি করবেন না আমার সঙ্গে। যেটা এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন,' বলে ও বাকি পুলিশদের দেখাল। 'ফোর্সে এই মুহূর্তে কাউকে আমার বিশ্বাস করার উপায় নেই। হয়তো ইনসপেক্টর রবিউলকে

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

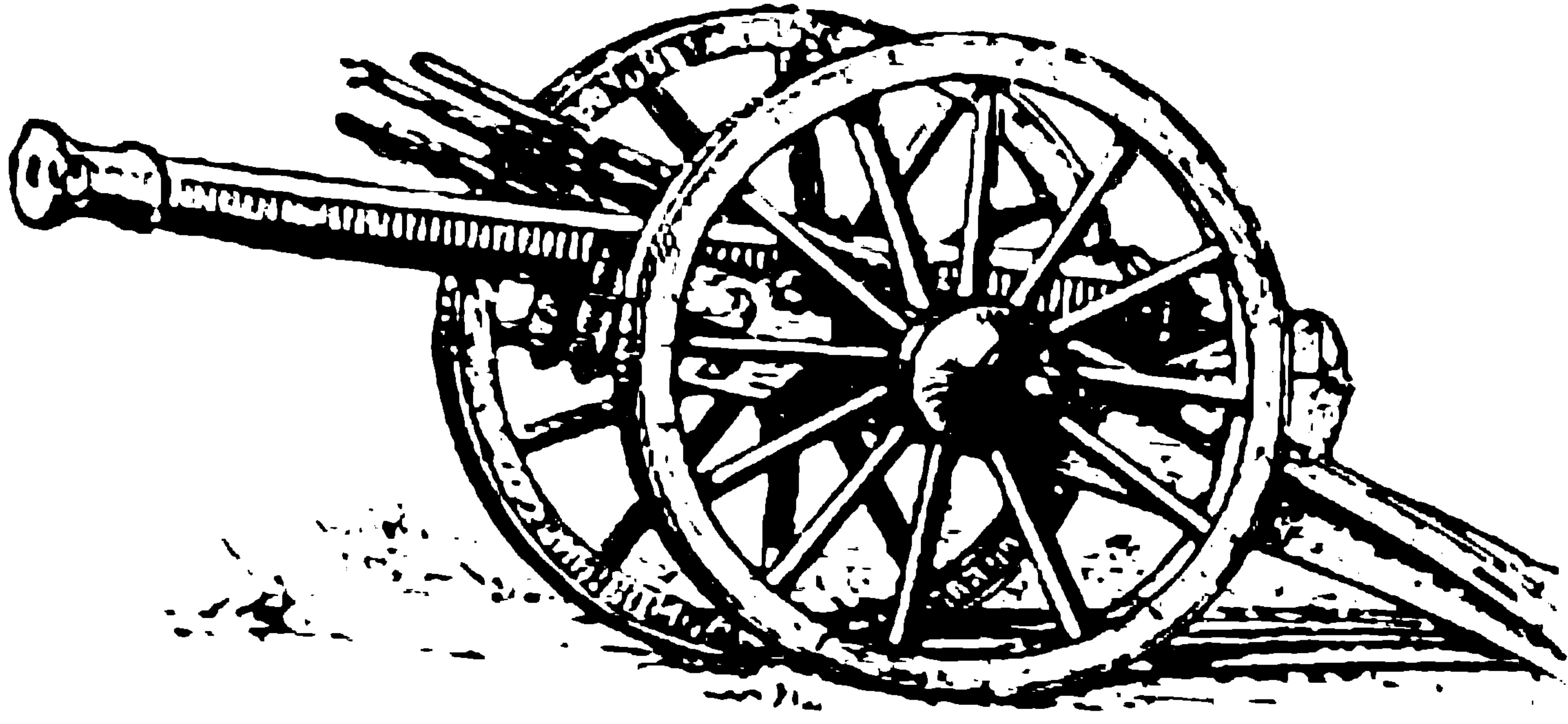
বিশ্বাস করতে পারি আমি, কারণ যেভাবে সে আমাদের বাঁচাল সকালে কিন্তু বাকিরা। অসম্ভব। অদৃশ্য শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইতে হলে আমার বিশ্বাসী লোক লাগবে। এবার বলুন রমিজ ভাই, এই কেসে ভয়াবহ জীবনের ঝুঁকি আছে। বলেন আপনি আসবেন কি না তাও আনঅফিসিয়ালি।’

রমিজ দারোগা হেসে উঠল, তারপর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলে উঠল, ‘আমি তো আইতাম না, কিন্তু আমাকে ছাড়া আইলে তো কিছুই করবার পারবেন না। কাজেই—’ বলে সে হেসে উঠল, সঙ্গে বাশার আর সামিরাও।

সাক্ষাৎ, চলেন কাজে নাহি—’

‘আরে খাড়াইন, আগে খাইয়া লই, তারপর চা-পান খাইয়া, এরপর কামে নামমু,’ ওই এদিকে আয়।

সামিরার দিকে তাকিয়ে বাশার আনমনে মাথা নাড়ল। মানুষের বেসিক আসলে কখনোই বদলায় না, এমনকি রিটায়ারমেন্টের পরেও রমিজ দারোগা আরামি আর ফাঁকিবাঁজই রয়ে গেছে।



অধ্যায় চব্বিশ

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

বদলাপুর সেনানিবাস

অবসরে যাওয়ার পর সব যেন বদলে গেছে, অন্তত কর্নেলের তাই মনে হচ্ছে। 'সবকিছু কতটা বদলে গেছে, তাই না পিটার?' কর্নেল আনমনেই মাথা নেড়ে বলে উঠল। 'প্রায় দশ বছর, আর এর ভেতরে সবকিছু কেমন হয়ে গেল তাই না?' বলে চায়ের কাপে চুমুক দিল কর্নেল। সে মাদুরে বসে থাকা সোলেমান, আর ফটিকের দিকে ইশারায় বলল চা নিতে। সোলেমান তাও স্বল্প হলেও অভ্যস্ত কিন্তু ফটিকের চোখ কপালে উঠে গেল একজন ইংরেজ অফিসার তাকে চা খেতে বলছে তাও পাশে বসিয়ে, নিজের সামনে। যদিও কর্নেল এবং ক্যান্টেন পিটার বসে আছে তেপায়ার আর ওরা বসে আছে মাদুরে। তাও ব্যাপারটা অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য।

'দশ বছর তো আর কম সময় না, স্যার,' আপনি চলে গেলেন এরপর আমরাও সবাই বেরিয়ে পড়লাম নিজেদের মতো করে। আমি টিকে গেছি স্যার, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে উন্নতিও করেছি। কিন্তু অনেকেই পারেনি,' বলে সে ফটিক আর সোলেমানের দিকে তাকিয়ে চা নিতে বলল। এবার ফটিক খানিক ভরসা পেয়ে চায়ের কাপ উঠিয়ে দিল। তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল পিটার। 'স্যার, ওকে দেখে আমার পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। আপনি নিজের লো অ্যাংগেলের অফিসারদের ঠিক যেভাবে ট্রিট করতেন, আমরা ভয় পেতাম, সাহস দিতেও নিজের মতো করে নিতেন। অসাধারণ দিন ছিল,' আনমনে মাথা নাড়ল পিটার। 'স্যার, আপনাকে মিলিটারির পোশাকে কিন্তু ভালো লাগছে, আগের দিনগুলোর মতোই। আপনি এখনো একইরকম ফিট।

মৃদু হেসে উঠল কর্নেল, মনে মনে ভাবল বাইরে থেকে দেখে তাই মনে হলেও আদতে তা নয়। 'হ্যাঁ, সেই সব দিনগুলো। আমি মাঝেমাঝে ভাবি, পিটার আমি

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

‘কি আসলে ঠিক ছিলাম, আমার কি আসলে অধীনদের এতটা অ্যাক্সেস দেওয়া ঠিক হয়েছে, এর কারণেই কি সব হয়েছে?’

‘স্যার বাদ দিন না, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন বলুন আপনি কি করতে চাচ্ছেন?’ পিটার ইশারায় একজন বার্তাবাহককে ডাক দিতেই সে পাশে এসে দাঁড়াল কালি আর পালক আর সাদা কাপড় হাতে, পিটার ইশারা করতেই সে বসে গেল লেখার আয়োজন নিয়ে। ‘স্যার, অফিসিয়াল নিয়ম মানতে হবে। যা বলবেন সেভাবেই সব হবে, কিন্তু রেকর্ডে রাখতে হবে এবং আপনার প্রতিটা পদক্ষেপ জন স্যারকে জানাতে হবে।’

কর্নেল কিছু না বলে মাথা নেড়ে চুপ হয়ে রইল। ‘বুঝতে পেরেছি, সেক্ষেত্রে তুমি আমাকে বলো আমার কীভাবে আগানো উচিত?’ কর্নেল চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সেটা নামিয়ে নিল। সেই তাঁবুতে জেনারেলদের ব্রিফিংয়ের পর ওরা এসে বসেছে জঙ্গলের ভেতরের দিকে, সময় বিকেল গড়িয়ে চলেছে। কর্নেল এসে বসতেই চায়ের আয়োজন নিয়ে আসা হয়, এমনকি এইরকম ঝামেলাও পরিস্থিতিতেও ব্রিটিশ রীতি ভোলেনি সেনানিবাসের লোকেরা। চা দেওয়ার পর পিটারের সঙ্গে বসে কর্নেল তার দুই সঙ্গীকে ডেকে নেয়।

যদিও এখানে বসার পরও কর্নেলের বারবার শুধু ভেতরের আলোচনাই মাথার ভেতরে ঝড়ের মতো বয়ে চলেছিল। ভিক্টরকে মারার কথা বলতেই কর্নেল প্রথমে চুপ হয়ে যায়, তারপর সে খানিক রাগের সঙ্গেই বলে ওঠে, ‘আমি কি খুনি যে আপনারা এখানে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ভিক্টরকে খুন করার জন্য।’

সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল উইলিয়াম মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়, ‘তুমি যা ভাবছো মোটেই তা নয়। ইস্ট ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি তোমাকে আসলে সেভাবে বোঝাতে পারেনি। আমি বুঝিয়ে বলছি। প্রথম কথা হলো, ভিক্টর দিনের পর দিন নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য বিপজ্জনক একজন মানুষে পরিণত হচ্ছে। তার ওপরে ভারতে এখন যে অবস্থা এরকম সময়ে তার মতো এমন প্রতিভাবান এবং বিপজ্জনক মানুষ যদি শত্রুপক্ষের হাতে পড়ে এবং নিজে থেকে হোক বা বাধ্য হয়েই হোক সে যদি তাদের জন্য কাজ করতে শুরু করে, তাহলে এরচেয়ে ভয়ংকর আর কিছু হতে পারে না। প্রথমত, সে আমাদের নিজেদের লোক, বছরের পর বছর ধরে সে ইংরেজ সরকার এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়ে পলিসির কাজ করেছে। সে জানে আমরা কীভাবে ভাবি, আমরা কীভাবে কাজ করি, আমাদের সব রসদ কোথায়—জরুরি অবস্থায় আমরা কী করব। এটা যদি বাদও দিই সে অস্ত্র তৈরি থেকে শুরু করে ছোট-বড় আকারের বোমা ইত্যাদির বিষয়ে ওস্তাদ।’

জেনারেল থামতেই কোম্পানির প্রতিনিধি আবারো বলতে শুরু করল। ‘এর মধ্যেই সে কী করতে পারে তার ছোট উদাহরণ সে দেখিয়েছে। এরপর যদি সে

সিপাহী

দক্ষিণের লোকদের সঙ্গে হাত মেলায় বা মেলাতে বাধ্য হয় তাহলে কী হতে পারে তার ব্যাপারে খানিক ধারণা দিচ্ছি আপনাকে। বলে সে তরুণ এক অফিসারের দিকে ইশারা করল। তরুণ অফিসারের দিকে ফিরে তাকাতেই সে আবারো ম্যাপের দিকে ইশারা করল, এবার ছোট একটা চিকন লাঠি তার হাতে। লাঠিটা হাতে নিয়ে সে সর্বভারতের ম্যাপের ওপরের অংশের একটা দিকে নির্দেশ করলে অনেকটা বৃস্তের মতো দেখাল, তারপর সে লাঠিটাকে ডানে সরিয়ে যেদিকে বাঙ্গাল প্রদেশ সেনিকে দেখাল। দুটো জায়গায় অনেকটা গোল বৃস্তের মতো বানিয়ে সে বলে উঠল, 'আমি গড়পড়তা যে-দুটো জায়গা দেখালাম এই দুই অঞ্চল বর্তমানে সবচেয়ে বেশি বিদ্রোহী সিপাহী এবং ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে,' বলে সে আবারো উত্তরের দিকে নির্দেশ করে বলে উঠল, 'এর ভেতরে উত্তরের দিকের অবস্থা খুব বেশি সুবিধার নয়। এদিককার বেশির ভাগ জায়গায় দিল্লিকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রিত এবং এদিককার বেশির ভাগই বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিশে গেছে স্থানীয় লোকজন, অপরাধী আর ডাকাতরা। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা ধীরে ধীরে না বলা চলে এর মধ্যেই অনেকটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। যে-বৃন্তটা আমরা দেখিয়েছি, এর বাহিরের বিভিন্ন দিক থেকে আমরা সেনাবাহিনী জড় করছি, বাধা সত্ত্বেও—'

'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ হারালেই ধীরে বা জোরে আবারো এসব জায়গা পুনর্নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করবে আমাদের সেনারা,' বলে কর্নেল আনমনে মাথা নাড়ল। এটাই হওয়ার কথা।

'ঠিক, আর বাঙ্গাল প্রদেশের দিকেও ঘটনাপ্রবাহ অনেকটাই কাছাকাছি, ওদিকে হয়তো উত্তরের মতো অবস্থা হবে না, তবে ওদিকেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েই যাবে। সমস্যা হলো এখানে,' বলে সে ম্যাপের দক্ষিণের দিকে নির্দেশ করে বিরাট একটা বৃন্ত আঁকল। 'সম্পূর্ণ উলটো চিত্র এখানে। আমার কাছে দৃঢ়তাবে মনে হয় এই এলাকায় এখন ব্রিটিশ রাজের জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হস্তে যাচ্ছে। দক্ষিণের নিজাম থেকে শুরু মারাঠা এবং সমস্ত বড় বড় গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠী তো বটেই এমনকি ছোট ছোট রাজা-জমিদারেরা একত্রিত হচ্ছে ওই সব এলাকাতে। এমনকি উত্তরের ঝাঁসি বা এসব এলাকাও এর বাইরে নয়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো এই সব রাজা-মহারাজা যদি একসঙ্গে হতে পারে এবং এদের হাতে বড় ধরনের কোনো শক্তি এবং ব্রিটিশরাজের ভেতরের সমস্ত তথ্য থাকে, তাহলে কী হতে পারে একবার ভেবে দেখুন।'

'আর আমাদের বিশ্বাস এটাই করতে যাচ্ছে ভিক্টর।'

'আর এ কারণেই আপনারা ভিক্টরের সন্ধান বের করতে পারবে বা বলতে গেলে বাঘের মুখের ভেতর থেকে হাত দিয়ে তাকে ধরে আনতে পারবে—এমন কাউকে না পেয়ে আমাকে ডেকে এনেছেন,' আনমনে মাথা এবং কাঁধ ঝাঁকাল

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

কর্নেল। 'কিন্তু ডিক্টর এমন কেন করছে বা করবে—এটা আপনারা এখনো পরিষ্কার করতে পারেননি। সে স্বাধীনচেতা হতে পারে কিন্তু স্বজাতির ওপরে তার এত এত ক্ষোভ কেন হবে এটা আমার বোধগম্য নয়।'

কর্নেলের অসম্ভব চেহারার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল জেনারেল। এগিয়ে এসে কর্নেলের কাঁধে হাত রাখল, 'স্যার্স, তোমার এবং তোমার পরিবারের সঙ্গে যা ঘটে গিয়েছিল তা হয়তো আমরা কেউ ফেরাতে পারব না বা পারিনিও। কিন্তু তোমাকে আমরা সবসময়েই সবকাজে খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা করেছি। তুমি যখন ছিলে তখনো আমরা জানতাম তুমি ব্রিটিশ ভারতের সেরা অফিসারদের একজন, এবং এখনো আমরা তাই বিশ্বাস করি। আর আমরা সবাই এটাও জানি যে ব্রিটিশ রাজের প্রতি তোমার ভালোবাসা অপরিসীম এবং এই কারণেই ব্রিটিশ রাজ এবং কোম্পানির বিপদের সময়ে তোমাকে আমাদের প্রয়োজন। আমি জানি তোমার মনে অনেক প্রশ্ন, একই প্রশ্ন আমাদের মনেও। এই জন্য আমি চাই একবার তুমি ডিক্টরকে ফিরিয়ে আনো, সব প্রশ্নের উত্তর তখন জানা যাবে। আমরা বিপদে আছি কিন্তু তোমার যাবতীয় অস্ত্র থেকে শুরু করে যা যা লাগে সব তোমাকে দেওয়া হবে, ঘোড়া লোকবল সব। তুমি জলদি কাজে নামো। পিটার তুমি এখন থেকে সবসময় কর্নেলের সঙ্গে থাকবে এবং তাকে সব দিয়ে সহায়তা করবে। ফিরে আসার জন্য ধন্যবাদ বন্ধু।'

জেনারেলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁরু থেকে বেরিয়ে আসে কর্নেল। বাইরে আসতেই পিটার জানায় চা খাবার আয়োজন করা হয়েছে। এরপর পুরনো দিনের স্মৃতিচারণা চলতে থাকে চা খেতে খেতে।

'তো এখন কীভাবে কি করতে চান কর্নেল, কোথা থেকে শুরু করতে চান?' বলে সে আড়চোখে একবার লিখতে থাকা বার্তাবাহকের দিকে ফিরে তাকাল। 'প্রথমে চা পান শেষ হলে আমি আপনাকে অজ্রাগারের দিকে নিয়ে যেতে পারি। সেখান থেকে বের হলেই আমাদের দল প্রস্তুত থাকবে, আপনার পছন্দমতো সৈনিক এবং অফিসার নিতে পারবেন আপনি। বিশজনের একটা দল তৈরি থাকবে আপনার জন্য।'

পিটারের কথা শুনে মৃদু হেসে উঠল কর্নেল। 'এটা কি তুমি বললে নাকি এটা তোমার ওপরে নির্দেশ বলার জন্য?' বলে সে পিটারের দিকে তাকাল, পিটার খানিক বিহ্বল ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে কর্নেলের দিকে। ভুলটা সে কোথায় বলল ঠিক বুঝতে পারছে না। 'কর্নেল স্যার, কি বলছেন, অস্ত্র ও লোকবল ছাড়া আপনি কাজ করবেন কীভাবে?'

'প্রথম প্রশ্ন, কর্নেল চা শেষ করে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। 'তুমি যাদের আমার সঙ্গে দিতে চাচ্ছে এরা কি ইংরেজ নাকি ভারতীয়?'

সিপাহী

‘স্যার, দুই দলই আছে, আপনি যাদের নিতে চান, দক্ষতা অনুযায়ী আমি আপনাকে—’

ব্রিটিশ রীতি ভুলে পিটারকে কথা বলতে না দিয়ে কথার মাঝে কথা বলে উঠল কর্নেল। ‘এখানে দক্ষতার চেয়ে অন্য একটা প্রশ্ন রয়েছে। প্রথম কথা, তুমি ভারতীয় যাদের আমার সঙ্গে দেবে এদের কি তুমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারবে, বিশেষ করে এই অবস্থায়, আমি কি বলতে চাচ্ছি তুমি বুঝতে পারলে পিটার?’

পিটার চুপ, সে খুব বুঝতে পারছে কর্নেল কি বলতে চাচ্ছে। ‘জি স্যার, সে ঋনিক শক্ত গলায় বলে উঠল, এরা অবশ্যই বিশ্বাসভাজন, কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আমি শতভাগ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারব না, বিশেষ করে সেনানিবাসের বাইরে গেলে নয়।’

‘আর যদি তুমি আমার সঙ্গে সব ইংরেজ অফিসার বা সৈনিক দাও তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে তোমার মতে?’ প্রশ্নটা করে সে টেবিলে রাখা পাইপ আর তামাক ভুলে নিল। ‘এটার জন্য অনেক ধন্যবাদ পিটার,’ পাইপটা দেখিয়ে বলে উঠল কর্নেল। বলেই সে আবারো কাজের কথায় ফিরে এলো। ‘যে-কাজে আমি নামতে যাচ্ছি সেটার জন্য এতগুলো ইংরেজ অফিসার নিয়ে কাজে নামতে গেলে, ব্যাপারটা দেখাবে অনেকটা অন্ধকারে জ্বলন্ত প্রদীপের মতো, যেখানে আমি না চাইলেও সবার নজর পড়বে আমার দিকে, সেই সঙ্গে ধেয়ে আসবে বিপদ।’

‘তাহলে—’

‘প্রায় অসম্ভব এক কাজে নামতে যাচ্ছি আমি, যেখানে বিশ্বাস এবং গোপনীয়তা কেনোটারই ভরসা দিতে পারছো না তুমি, তাহলে বলো পিটার এই দিল নিয়ে আমি কীভাবে কাজে নামব?’

পিটার চুপ, উপস্থিত সবাই চুপ।

‘আগে চলো, অল্প ঠিক করি, তারপর এই পোশাক বদলাতে হবে, তারপর আমি তোমাকে জানাব আমি কোথা থেকে শুরু করতে চাই,’ বলে উঠে দাঁড়াল কর্নেল। তার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সবাই। পিটারকে ইশারায় এই বার্তাবাহককে সরতে বলে কর্নেল রঙনা দিল পিটারের দেখানো পথে।

পিটার গুদের সবাইকে নিয়ে চলে এলো অনেকটা গুহার মতো একটা জায়গায়। জমলের মাঝে টিলার মতো একটা জায়গা উঠে গেছে ওপরের দিকে। ওখানে একটা গুহার মতো জায়গা, গুটার মুখে ভারী দরজার মতো লাগানো, বেটার সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে দুজন পাহারাদার। ‘স্যার, যখন সেনানিবাস অল্প সময়ের ভেতরে সরানোর প্রয়োজন পড়ল তখন বড় একটা সমস্যা দেখা দেয় আমরা অগ্নিগার কোথায় এবং কীভাবে সরাব,’ দরজার মুখে দাঁড়ানো পাহারাদারদের দরজা খোলার নির্দেশ দিয়ে পিটার বলতে লাগল।’

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

খুব স্বাভাবিক, কারণ অন্যসব ফেলে রাখলেও অস্ত্র এমন এক জিনিস যেটার প্রয়োজন নিজেদের পড়বেই। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, এটা শত্রুর হাতে পড়া আরো বেশি বিপজ্জনক। কাজেই অস্ত্রাগার সরানো বড় ধরনের একটা ঝামেলা হওয়ারই কথা।’

ঠিক বলেছেন স্যার, আরো বড় একটা ঝামেলা বাধে এত এত জমানো বারুদ নিয়ে। অস্ত্র তো বটেই এগুলো সরানো আরো বড় ঝামেলা ছিল,’ ওরা ওহার মুখের ভেতরের চিকন করিডরের মতো রাস্তা দিয়ে এগোতে এগোতে বলতে লাগল। কর্নেল বিষয়ের সঙ্গে জায়গাটা দেখতে দেখতে এগোচ্ছে, তার পেছনে ফটিক এবং সোলেমানও বেশ অবাক হয়ে দেখছে। এগোতে এগোতে কর্নেল জানতে চাইল। ‘এই জায়গার সন্ধান পেলে কীভাবে তোমরা?’

স্যার, এমনিতে জঙ্গলের ভেতরে কোথায় কি আছে এটা আমরা মোটামুটি জানতাম, এই ওহার কথাও জানা ছিল, জঙ্গলের বেশ ভেতরে হওয়াতে এদিকে তেমন কেউ আসে না, বিরাট একটা শিয়ালের পাল নাকি থাকত এখানে, কিন্তু আমরা পাইনি,’ করিডর শেষ হতেই ভেতরে গোলমতো একটা জায়গা দেখাল পিটার। সবাই তাকিয়ে দেখল গোলমতো জায়গাটার ওপরের কোনো অজানা উৎস থেকে আসা আলোতে মোটামুটি ভালোভাবেই চোখে পড়ে। সেই আলোতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ধরে ধরে সাজানো নানা ধরনের অস্ত্র। বিভিন্ন ধরনের বন্দুক-পিস্তল থেকে শুরু করে ছুরি, তলোয়ার, বর্শা—এমন কিছু নেই যা এখানে নেই।

‘অসাধারণ, কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে, তোমরা সব বারুদ এই বন্ধ জায়গাতে রেখেছো, যদি কোনো কারণে—’

‘এইটাই তো মজা স্যার, এখানে প্রয়োজনের কয়েক পিপা বারুদ বাদে আর তেমন কিছুই নেই। সব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই টিলার মতো জায়গাটার ছোট ছোট খোপের ভেতরে, তারপর যত্ন সহকারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মুখগুলো,’ বলে সে হাত নেড়ে বলে উঠল, পুরোপুরি নিরাপদ।

‘দারুণ,’ কর্নেল প্রশংসার সুরে বলে উঠল।

‘এখন বলুন স্যার, আপনাদের কী প্রয়োজন?’ বলে সে ইশারায় ওদের সঙ্গে আসা এক সৈনিককে দেখাল। ‘ও সব দিয়ে সাহায্য করবে।’

‘প্রথমেই পিস্তল, আমি যেটা এনেছিলাম সেটা গেছে। আমাদের তিনজনেরই ভালো পিস্তল এবং ছুরি লাগবে। আমি বন্দুকের চেয়ে এটা বেশি প্রেফার করছি, কারণ এগুলো লুকিয়ে রাখা যাবে, এবং যে-কাজে নামছি তাতে আমাদের দ্রুত চলতে ফিরতে সুবিধা হবে।’

‘একটা প্রশ্ন,’ পিটার আড়চোখে একবার ফটিক আর সোলেমানকে দেখতে নিয়ে বলে উঠল। ‘আপনি ওদের সঙ্গে নিচ্ছেন?’

সিপাহী

কর্নেল মৃদু হেসে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, কোনো সমস্যা?'

'স্যার, ওরা সাধারণ সৈনিক, ফটিক তো সৈনিকও নয়, আবার আপনিই আপত্তি করছিলেন ভারতীয়দের নিয়ে। আর ওদের ওপরে ভরসা—'

'আমার শতভাগ ভরসা রয়েছে ওদের ওপরে পিটার। এই দুইটা ছেলে না থাকলে এতক্ষণে আমি জীবিত থাকতাম কি না সন্দেহ ছিল। কাজেই ওরা যাচ্ছে তো বটেই এমনকি ওরাই আমার প্রথম পছন্দ। ওদেরও তাই অস্ত্র দেওয়া হবে, যা আমি নেব।'

পিটারকে দেখে মনে হলো না সে খুব খুশি। 'আমাকে এটা জানাতে হবে ওপর মহলে।'

'জানাও,' এমন সুরে বলে উঠল কর্নেল, সে দুনিয়া উলটে গেলেও এই সিদ্ধান্ত থেকে সরবে না। 'পিঙ্কল দেখাও,' বলে ওরা একটা কাঠের বাক্সের সামনে চলে এলো। ওটার ওপরে কয়েকটা পিঙ্কল রাখা। 'স্যার, এটা বহুল ব্যবহৃত ফ্লিনটপ পিঙ্কল।'

'আহ, ক্লাসিক,' বলে কর্নেল খুশি হয়ে তুলে নিল একটা। এই পিঙ্কলের সঙ্গে তার পুরনো অভ্যস্ততা ও সখ্যতা রয়েছে। দক্ষ হাতে নাড়াচাড়া করে দেখে নিল সে। 'দারুণ।'

'স্যার, ওটা নেওয়ার আগে এটা একটু দেখে নিন, তরুণ সৈনিক কালোমতো ছোট আরেকটা পিঙ্কল দেখাল কর্নেলকে, এটার নল আগেরটা থেকে খানিক ছোট। 'স্যার, এটাকে বলে পারকুশন ক্যাপ পিঙ্কল। সংক্ষেপে ক্যাপ পিঙ্কল, এটা এখন প্রায় সব জায়গায় ব্যবহৃত হয়,' ছেলেটার হাত থেকে আশ্রয় ভরে পিঙ্কলটা নিয়ে নিল সোলেমান। কর্নেল মৃদু হেসে বলে উঠল, 'আমি আগেরটাই রাখব, এটা একটা করে দুটো ওদের দাও।'

'স্যার, ছুরি।'

'আমার লাগবে না,' কর্নেল নিজের কোমরের সঙ্গে রাখা ইংলিশ ড্যাগারটার অস্তিত্ব অনুভব করে স্বস্তি বোধ করল। 'তোমাদের কোনো পছন্দ রয়েছে?'

'আমি এইটা নেব হজুর,' বড় মাথা মোটা ধরনের একটা ছুরি তুলে নিয়ে দেখাল সোলেমান। 'এটাকে কাটার বলে হজুর।' জিনিসটা বেশ আশ্রয় নিয়ে দেখল কর্নেল, এই জিনিস আগে দেখেনি সে, এটার মাথাটা চোখা, কিন্তু নিজের অংশের বোঝানে হাত দিয়ে ধরবে ওটা অনেকটা ইংরেজি অক্ষর এইচের মতো, ওটার মাঝামাঝি ধরে আঁকি দিলে ফলাটা দুই ভাগ হয়ে যায়, এরপর ওটাকে ঠেলে কুটিয়ে দেওয়া হয় শব্দের বুকে। 'নাও। অবশ্যই অবশ্যই সবাই একটা করে তলোয়ার নেবে। পিঙ্কলগুলোর জন্য যথেষ্ট বারুদ নেবে। আর দুই সেট পিঙ্কল ছুরি, আর তলোয়ার আশ্রয় করে নেবে।'

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

‘হজুর কোনো বন্দুক নেবেন না?’

কর্নেল মাথা নেড়ে বলে উঠল, দুইটা নিয়ে নাও।

স্যার আপনার জন্য আমার একটা উপহার রয়েছে।,’ পিটার বলে উঠে সে তার হাতে দল্লি একটা কালো খাপের তলোয়ার এগিয়ে দিল কর্নেলের দিকে। স্যার, আপনার পুরনো তলোয়ারটা।’

‘এটা এতদিন ধরে রেখে দিয়েছে তুমি?’ কর্নেল খুব অবাক হয়ে জিনিসটা হাতে নিয়ে খুলে দেখল। ‘এটা—’ সে রীতিমতো আবেগি অনুভব করছে। তলোয়ারটারটা খাপ থেকে খানিক খুলে ওটার চকচকে ফল্গাটা দেখে পিটারের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখে মৃদু হাসছে পিটার।

স্যার, আপনার বাসভবন পুড়ে যাওয়ার পর আমরা প্রায় কিছুই উদ্ধার করতে পারিনি, পুড়ে যাওয়া জিনিসের ভেতরে স্রেফ ফল্গাটা ছিল। আপনি চলে যাওয়ার পর বহুদিন আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম জিনিসটা আপনার স্মৃতি হিসেবে। তারপর আপনি আসবেন শুনে আবার ওটাকে কামারের কাছে দিয়ে সব ঠিক করিয়ে এনেছি।’

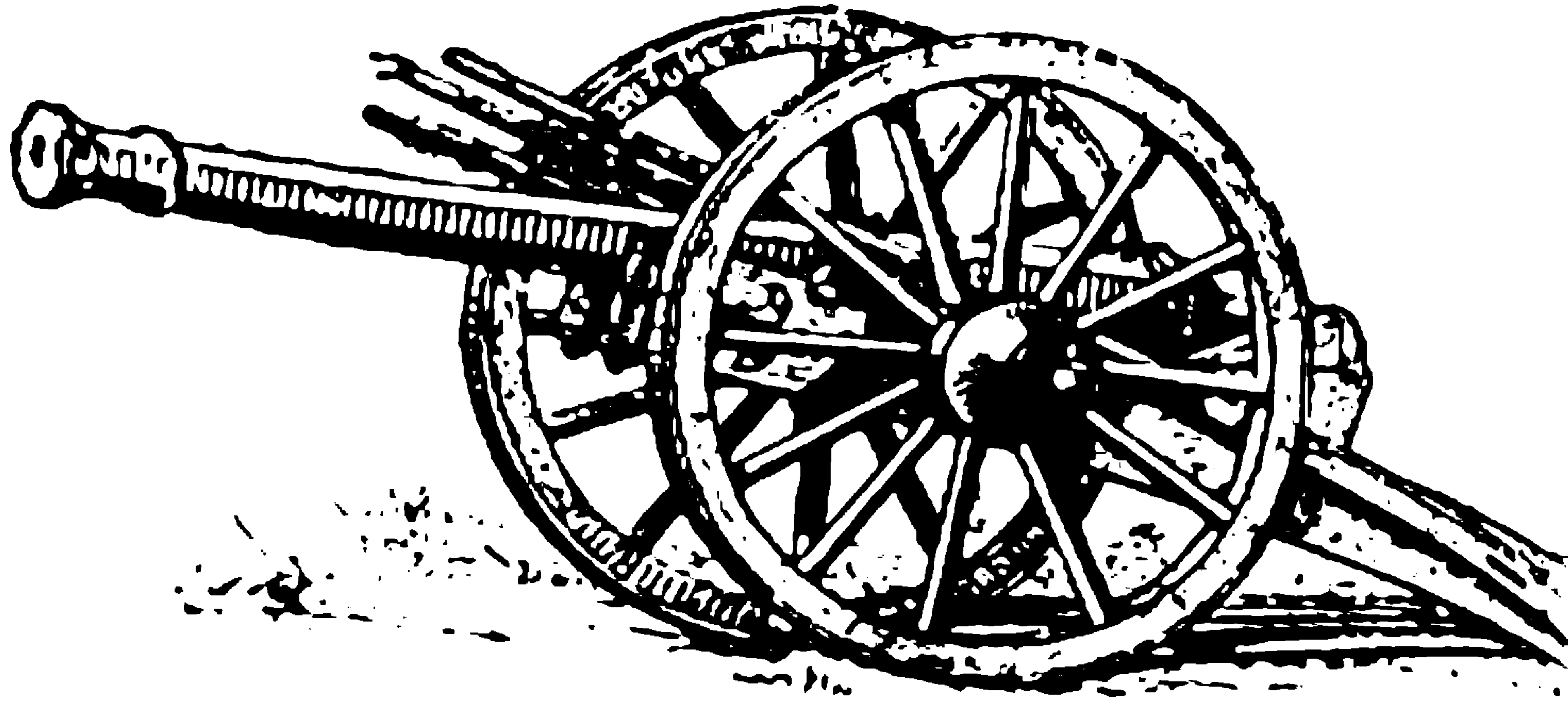
‘অনেক ধন্যবাদ পিটার,’ তলোয়ারটা কোমরে প্যাঁচিয়ে নিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল ফটিক এবং সোলেমান পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সোলেমানের পেছনে দুটো বন্দুক, নল দেখে পুরোপুরি বুঝতে না পেরে কর্নেল অনুমান করল একটা ব্রাইন বেস মাসকেট, অন্যটা সম্ভবত এনফিল্ড। ‘চলো।’

ওরা বাহিরে বেরিয়ে আসতেই দেখল বাহিরে ঘোড়া এবং ঘোড়ার গাড়ি সাজানো রয়েছে। ‘স্যার, এবার কোনদিকে?’

‘আমি ফটিক, সোলেমান এবং তুমি,’ বলে সে পিটারকে দেখাল। ‘আমরা মাতৃগা যাব। তবে তার আগে আমাকে পোশাক বদলাতে হবে। আর আমরা ঘোড়ার গাড়ি না ঘোড়া নেব। এখন সব সন্ধে। আমরা টানা চলব রাতের রাস্তা ধরে, মাঝে হালকা বিশ্রাম এবং ছোট ঘুম দিয়ে নিলে দ্রুত পথ চললে আমরা ভোরে পৌঁছে যাব মাতৃগা।’

‘স্যার, মাতৃগাতে কি?’ পিটার কৌতূহলের সঙ্গে জানতে চাইল।

‘বিশ্বাস, গোপনীয়তা এবং দক্ষতা,’ বলে কর্নেল বড় করে দম নিল। ‘যেটা আমার কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।’



অধ্যায় পঁচিশ বর্তমান সময় কাঁচিঝুলি মোড়, ময়মনসিংহ

‘বিশ্বাস আর গোপনীয়তা আর কানেকশন, এইটা হলো রমিজ ভাইয়ের স্পেশালিটি,’ কথাটা সামিরাকে বলে রমিজ দারোগার দিকে ফিরে বাশার জানতে চাইল, ‘রমিজ ভাই ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করেছেন তো?’ রমিজ দারোগাকে নাশতা খাওয়াতে পেরে কেন জানি বাশারের কাছে বেশ শান্তি লাগছে।

‘জি, স্যার, ঠিকমতো খাইছি। ম্যাডাম আর কিছু খাবাইন?’

‘না, না আমি ঠিক আছি,’ সামিরা বলে উঠল। ‘যথেষ্ট খেয়েছি। আমরা কি এখন থেকে ক্রাইম সিনে যাব?’ সে বাশারের দিকে ফিরে জানতে চাইল।

‘আরেকটা ছোট কাজ বাকি আছে,’ বাশার বলে উঠল। ‘রমিজ ভাই, আবদুল্লাহ কোথায় আছে?’ রমিজ দারোগার সঙ্গে আগের কেসে কাজ করার সময়ে কনস্টেবল একটা ছেলে ওদের সঙ্গে কাজ করেছিল, সদ্য নিয়োগ পাওয়া একেবারে তরুণ এক কনস্টেবল। খুব দক্ষ না হলেও অত্যন্ত অবিডিয়েন্ট এবং বিশ্বস্ত এক ছেলে। ওকেও প্রয়োজন বাশারের, শুধু রমিজ দারোগা দিয়ে কাজ হবে না।

‘আরে স্যার, আইনো জানুইন না, আবদুল্লাহর তো বিয়া,’ রমিজ দারোগার কাছে খবরটা শুনে বাশারের খুশি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে গুণিয়ে উঠল। বিয়ের আসর থেকে তো আর কাউকে উঠিয়ে এনে কাজে লাগানো যায় না।

‘যাক শুনে খুশি হলাম, কবে ওর বিয়ে?’ বাশার বিল দেওয়ার জন্য ইশারা করে, জানতে চাইল, ‘ওর বাড়ি তো মনে হয় ফুলবাড়িয়া, তাই না?’

‘জি, স্যার,’ খাওয়া শেষ করে তরকারির ছোট বাটিতে হাতের আঙুলগুলো ধুয়ে নিতে নিতে বলে উঠল রমিজ দারোগা। ‘আর স্যার, ওর বিয়ে অইবো না, অয়া গেছে। হানিমুনে গিয়েছিল গত সপ্তাহে, মনে অয় আইসাও পড়ছে। আমি কি ওরে কল দেব নাকি স্যার?’

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

বাশার একটু দ্বিধা করল। একটা ছেলে মাত্র বিয়ে করেছে, হানিমুনে গেছে বা ফিরে এসেছে, ওকে এই মুহূর্তে এই ধরনের একটা বিপজ্জনক কাজের জন্য অনুরোধ করতে ওর বিবেকে ঠেকছে। কিন্তু ও আসলে খানিকটা অসহায় এবং কোণঠাসাও। ‘আচ্ছা, কল দেন, দেখেন ও আছে কোথায়, কী করেছে। যদি ফ্রি থাকে, আসতে বলেন,’ বলে বাশার যোগ করল। ‘সঙ্গে যোগ কইরেন, না আসলেও সমস্যা নেই।’

‘ঠিক আছে স্যার।’

‘রমিজ ভাই, আপনি আসেন, আমি ম্যাডামকে নিয়ে বাইরে যাচ্ছি। সিগারেটের দোকানের সামনে পাবেন আমাদের,’ বলে ও সামিরাকে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাকি পুলিশদের জিপে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বাইরে এসে পান-সিগারেটের দোকানের সামনে এসে একটা সিগারেট ধরাল।

‘আমাকেও একটা দাও?’ সামিরা বলে উঠল।

বাশার খানিক ক্র কুঁচকে তাকাল। ‘কী?’ সামিরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানতে চাইল। ‘নাহ, কিছু না, ভাবছিলাম এভাবে ময়মনসিংহ শহরের বুকে ওপেন একটা মেয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে—’

‘তাতে কি,’ সামিরা সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঝাঁজাল গলায় বলে উঠল। ‘লুক দেবে, সেটা তো আর ঢাকাতেও ভিন্ন কিছু নয়। কিন্তু যদি কিছু এসে বলার চেষ্টা করে, দেব একটা বসিয়ে।’

‘আচ্ছা থাক থাক এত কঠিন হতে হবে না। এখন বলো কেসের ব্যাপারে কী ভাবছো?’

‘কেস নিয়েই তো প্রশ্ন,’ সামিরা টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাই ফেলে বলে উঠল। ‘বাশার আর ইউ সার্টেন, এই রমিজ দারোগা, আবদুল্লাহ, এদের নিয়ে তুমি কাজ করতে পারবে? আমাদের এখন শক্ত একটা ফোর্স দরকার, এই রমিজ সাহেব তো—’ নিজের বাক্য শেষ না করে সামিরা কাঁধ ঝাঁকাল।

‘আমি বুঝতে পারছি তুমি কি বলছো, আমি কাজের ব্যাপারে যে খুব কনফিডেন্ট তাদের নিয়ে তা নয়। কিন্তু কাজের চেয়ে আমাদের এখন বেশি প্রয়োজন বিশ্বাস করার মতো মানুষ, আর সেদিক থেকে এরা পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য,’ বলে বাশার অসহায়ের মতো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। ‘আমি আসলে বলতে পারব না আমি কেমন ফিল করছি। একদিকে প্যাচাল এই কেস, তার ওপরে রিফাত ব্যবহৃত, তার ওপরে একটা মানুষ বা একটা পরিস্থিতি সামলানোর মতো একটা মানুষ পাচ্ছি না। ইনসপেক্টর রবিউলকে বড়জোর ভরসা করা যায়। বাকি আমি একটা মানুষ তো বাদই—তেলাপোকাকেও বিশ্বাস করতে নারাজ। এভাবে কাজ করব কীভাবে বলো। তারচেয়ে নিজের মানুষেরা থাক। কাজ তো

সিপাহী

আমরাও করতে পারব। দরকার আছা, আর তা ছাড়া রমিজ দারোগা এক আবদুল্লাহ দুজনেই লোকাল। ওদের থেকে আমরা ভালো রিসোর্স পাব। একবার মাঠে নামলে আমাদের এগুলো লাগবে।’

ঠিক আছে—’

‘স্যার, স্যার, দুইটা খবর আছে। একটা ভালো আরেকটা মন্দ,’ রমিজ দারোগা হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল।

‘আন্তে রমিজ ভাই, আপনি আগে শান্ত হোন। আগে খারাপটা জনি,’ বাশার ক্র কুঁচকে বলে উঠল।

‘না স্যার, আগে ভালোডাই কই,’ বলে সে বাশারের অনুমতির অপেক্ষা করল না। ‘স্যার আবদুল্লাহ হানিমুন খেই ফিরা আসছে। হেয় মমিসিং শহরেই আছে, ছুটিতে আছে, তয় ও হাতের কাম সাইরাই আইতাছে আমগো লগে দেহা করতে।’

‘ভেরি গুড,’ বাশার মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল। ‘আর খারাপটা?’

‘স্যার, আপনেনগো পিছে লোক লাগছে,’ রমিজ দারোগা ফিসফিসি ভঙ্গিতে বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে বাশার এবং সামিরা একে অপরের দিকে দেখল। ‘রমিজ ভাই আপনি নিশ্চিত,’ রমিজ দারোগার নিজের বদ অভ্যাস আছে অকারণে নিজের গুরুত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করার। ‘আপনি—’

‘স্যার, আমি এক শ ভাগ নিশ্চিত, আপনেনরা হোটেল খেইকা বাইর হতেই আমি একজনরে দেবছি আড়াল খেইকা আপনেনগো দেখতে।’

বাশার চট করে আবারো সামিরার দিকে ফিরে তাকাল। ‘সামিরা, রমিজ ভাই যদি নিশ্চিত হয়ে থাকে আমাদের জন্য এটা একটা বেশ ভালো সুযোগ। যদিও ব্যাপারটা বিপজ্জনক, কিন্তু এটা আমাদের জন্য মাঠে নামার আগেই কেসের স্টার্টিং পয়েন্ট হতে পারে যদি আমরা এই সিন্চুয়েশনটাকে কাজে লাগাতে পারি। সবাই নরমাল থাকো,’ বলে বাশার রমিজ দারোগার দিকে ইশারা করল। ‘আপনি সবার আগে স্বাভাবিক হোন,’ বাশার আগের সিগারেটটার মোথা ফেলে দিয়ে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নতুন আরেকটা ধরাতে ধরাতে বলতে লাগল। ‘রমিজ ভাই, আপনি দোকানদারকে একটা পান দিতে বলেন, যেভাবে আপনি খান ঠিক সেভাবে। তারপর সেটা নিয়ে খেতে খেতে আমাকে বলেন কী হয়েছে।’

রমিজ দারোগা ছোট বাচ্চাদের মতো উত্তেজিত হয়ে ছিল, বাশার পানের কথা কলতেই তার পুরো পৃথিবী যেন বদলে গেল। সেই আগের ভঙ্গিতে সে দোকানদারকে প্রায় ধমক দিয়ে সে পান দিতে বলল, কোথায় খয়ের দিতে হবে, সাদা পাতা সেবে কি না, কাঁচা পাস্তি, মিল্লার জর্দা দিয়ে কীভাবে বানাবে, সেটার কিস্করতি বিবরণ বাদ দিল না এতটুকুও। দোকানদার পান এগিয়ে দিতেই সেটা মুখে পুরে দুইবার চিবিয়ে সে বলতে লাগল।

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

‘স্যার, আমি যেই বাইর অইতে নিছি,’ মুখে পান থাকায় তার কথা খুব বিচিত্র শোনাচ্ছে। ‘আমি হোটেল খেইকা বাইর অইয়া, আবদুল্লার লগে ফুনে কথা কইতে কইতে আগাইতাছি—দেখি হোটেলের লগে ঝুপড়ির পিছে খেইকা কেডা জ্বানি উকি মারতাছে। একবার দেহে, আবার সইরা গেল গলির ভেতরে। একবার ভাবলাম ঠিকমতো দেহি, তারপর ভাবলাম আগে আপনেরে জানাই।’

‘ভালো করেছেন,’ বাশার নিজেই উত্তেজনা সামলাতে খানিক হিমশিম খাচ্ছে। ‘আপনি তাহলে একজনকে দেখেছেন, দেখতে কেমন?’

‘বেড়া মানুষ, খালি দেখছি, সাদা শার্ট পিন্দুনে,’ বলে সে পানের পিক ফেলতে ফেলতে আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল। ‘আর কিছু দেখতে পারি নাই।’

‘ভালো করেছেন, আপাতত এতেই চলবে,’ বলে সে দ্রুত সামিরার দিকে ফিরে তাকাল। ‘কোনো সাজেশন?’

সামিরা একেবারে ছির, তার ভেতরে সেরকম উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই। বাশার প্রশ্ন করতেই সে হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বাশার আর রমিজ দারোগাকে দেখে নিয়ে বলে উঠল, ‘যদি রমিজ ভাইয়ের কথা ঠিক হয়ে থাকে, আপাতত ধরে নেওয়া যায় একজন আমাদের ফলো করছে, সে সম্ভবত ইয়াং এবং তার পরনে সাদা শার্ট। সামিরার ছির গলা শুনে অবাক হলো বাশার। এই মেয়ে একেবারেই প্রফেশনাল। ‘ভেরি গুড,’ বলে উঠল সে।

‘এই ক্ষেত্রে আমরা খুব ইজি এবং ইউনিভার্সাল একটা টেকনিক ব্যবহার করতে পারি, টোকে বলে লুপ অ্যান্ড পুশ। মানে যেহেতু আমাদের লোকবল বেশি, আমরা একটা লুপ তৈরি করব, এবং সাসপেক্টকে পুশ করে ওই লুপের ভেতরে নিয়ে এসে লুপটা বন্ধ করে দেব। এটাই বেস্ট হবে এবং দক্ষভাবে কাজ করলে এটাতে কাজ হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি।’

‘ভেরি গুড,’ আবারো বলে উঠল বাশার। ‘আর কিছু?’ ও আসলে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছে। বাশারের প্রশ্ন শুনে সামিরা যত্নের সঙ্গে কিন্তু সংক্ষেপে বলে গেল ও কীভাবে কাজটা করার কথা ভাবছে। ‘তোমরা যেহেতু জায়গাটা চেনো কাজেই আমার মনে হয় এটাই বেস্ট হবে।’

‘ভেরি গুড,’ বাশার পুরনো ক্যাসেটের তার আটকানোর মতো একই কথা বলছে। সে টমিকে তুলে নিয়ে জিপে বসে থাকা ইনসপেক্টর রবিউলকে দ্রুত আসতে বলল। ইনসপেক্টর আসতেই সে সবার দিকে তাকিয়ে দ্রুত বলে গেল কী করতে চায়। সবাই ক্যাজুয়াল থাকো, ইনসপেক্টর আপনি আর রমিজ ভাই এখানেই থাকুন, আমরা এমনভাবে করছি যেন চলে যাচ্ছি, এরপর যা বলেছি ঠিক সেভাবে, বুঝে গেছি?’

সিপাহী

সবাই সম্মতি জানাতেই বাশার যোগ করল, 'দারুণ, লেটস গेट দ্যাট সাসপেক্ট, হু এভার ইট ইজ,' বলেই সে রমিজ দারোগা আর ইনসপেক্টর রবিউলের কাছ থেকে হাত নেড়ে বিদেয় নিয়ে সামিরাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

'যদিও তোমাকে বলার প্রয়োজন নেই, তা-ও, হাঁটতে থাকো একেবারে স্বাভাবিকভাবে,' পাশে হাঁটতে থাকা সামিরাকে বলে উঠল বাশার। 'মনে হয় যেন আমরা কাজের আলোচনা করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, আমরা এখানে এসেছি গাড়িতে করে, আমাদের সঙ্গে লোক আছে,' সামিরা এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাঁটছে, দেখলে মনেই হবে না সে কোনো সিরিয়াস বিষয়ের ভেতরে আছে, বাশার হালকাভাবে খেয়াল করে দেখল কোনো ধরনের দ্বিধা বা অন্য কোনো কিছু তো বাদই—মেয়েটার ভেতরে কোনো ভয়ও নেই, বরং তার চোখে-মুখে উত্তেজনা। এমনটাই তো চাই, মনে মনে বলে উঠল বাশার। 'হ্যাঁ বলো কি যেন বলছিলে?' ক্ষণিকের জন্য নিজের ভাবনার জগতে হারিয়ে সামিরার শেষ কথাগুলো শুনতে পারেনি বাশার।

'বলছিলাম, আমরা এমনভাবে হাঁটছি ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু না, কারণ এসেছিলাম গাড়িতে করে লোকবলসহ, কথা নেই বার্তা নেই এভাবে হাঁটছি,' সামিরা আর গাড়িতে করে লোকবলসহ, কথা নেই বার্তা নেই এভাবে হাঁটছি,' সামিরা আর বাশার রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে মূল রাস্তায় উঠতেই, ওরা সাইডের ফুটপাথের মতো জায়গায় চলে এলো।

'না,' আনমনেই মাথা নাড়ল বাশার। 'খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয়, বা সন্দেহ হওয়ারও কথা নয়, কারণ সামনে যে রাস্তাটা দেখছো এটা সোজা চলে গেছে জয়নুল আবেদীন পার্কের দিকে। কাজেই খেয়াল করে দেখো গাড়ি-রিকশা থাকার পরও প্রচুর মানুষ হাঁটছে।'

'বুঝতে পেরেছি,' ওরা হাঁটতে হাঁটতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। 'কিন্তু প্রশ্ন হলো কতক্ষণ এভাবে হাঁটব আমরা?' সামিরা বাশারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে প্রথমে বাশার বুঝতে পারল না, সে আসলে কী চাচ্ছে। পরমুহূর্তে বুঝতে পেরে ওর হাতে ধরা সিগারেটের বাকি অংশ চাচ্ছে মেয়েটা। সেটা এগিয়ে দিল সে মেয়েটার দিকে।

'আমরা এগোতে শুরু করার একটু পরেই ইনসপেক্টর রবিউল আর রমিজ ভাই পানের দোকানের সামনে থেকে সরে আড়ালে চলে যাওয়ার কথা। এমনভাবে যদি কেউ আমাদের অনুসরণ করে সে খানিক সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবে এবং জোরদার সম্ভবনা সে আমাদেরই পিছু নেবে। রমিজ ভাই আর রবিউল আড়াল থেকে আমাদের ওপরে নজর রাখবে, আর এই রাস্তাটা বেছে নেওয়ার পেছনে কারণ হলো, এটা বেশ চওড়া এবং সোজা চলে গেছে বেশ অনেক দূরে। কাজেই কেউ যদি পিছু নেয় চোখে পড়বেই এবং চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রবিউল আমাদের জানাবে।'

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

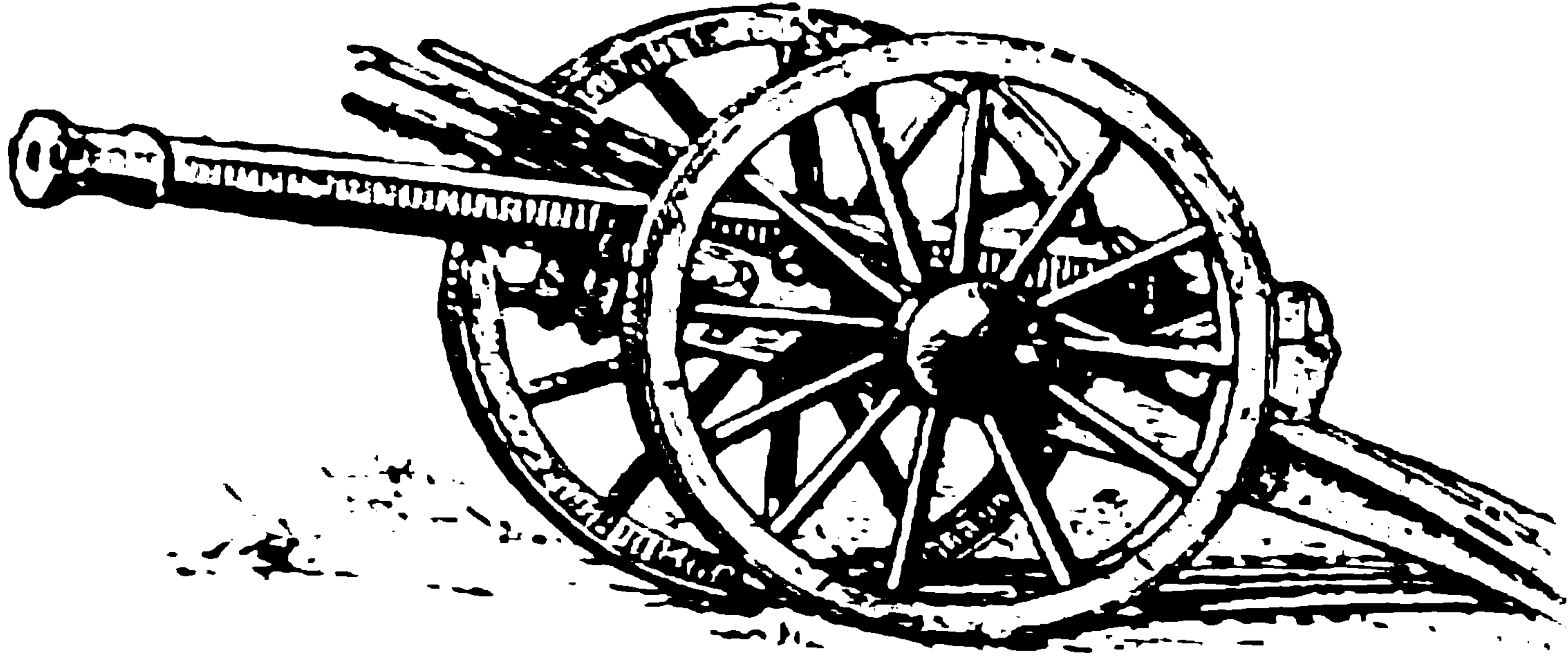
বাশার কথা শেষ করার আগেই বাশারের মোবাইল ভাইব্রেট করে উঠল। চসতে চলতেই সে ওটা বের করে দেখল টেক্সট এসেছে, ক্ষণিকের জন্য চোখ বুলিয়ে নিয়েই সে মৃদু হেসে হাতে ধরা মোবাইলটা সামিরাকে দেখাল। ‘হ্যাঁ, ঠিকই পিছু নিয়েছে একজন।’

‘এখন কি করবে, টিম নিয়ে ধাওয়া করবে?’

‘নাহ,’ বাশার মাথা নেড়ে আনমনে বলে উঠল। দুই পাশে দেখে নিয়ে সামিরাকে বলে উঠল, ‘আমরা এখন রাস্তা পার হবো। একটা রিকশা আসছে সেটা পার হয়ে যেতেই ওরা দুজনে মিলে রাস্তা পার হয়ে আবারো রাস্তার পাশের ধূলিময় জায়গাটা দিয়ে এগোতে লাগল। ‘সাবধান সামিরা, সামনে বাঁকটা দেখা যাচ্ছে, আমার এমনভাবে এগোব যেন সামনের দিকেই যাচ্ছি, কিন্তু ডানের গলিটার পার হয়ে যেতে যেতে চট করে আমরা একেবারে শেষ মুহূর্তে ডানে ঘুরব। আর ডানে ঘুরে কী করতে হবে সেটাও বলে দেব আমি, সতর্ক থাকো।’

দুজনে একেবারে স্বাভাবিক গতিতে এগোচ্ছে গলিটার দিকে, গলিটা চলে এলেও এমনভাবে ওরা এগোতে লাগল যেন পার হয়ে যাবে, গলিটার মাথাটা পার হয়ে গেল, গলিটা পুরোপুরি পার হয়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে বাশার খুব সতর্কতার সঙ্গে বাঁকাভাবে পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা জিপ আসছে। ওটা মূল রাস্তায় ওদের পেছন বরাবর আসতেই বাশার সামিরার হাতে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠল, ‘এইবার,’ সঙ্গে সঙ্গে সে নিজে তো ঘুরে গেলই সামিরার হাতটা ধরে ওদের এমনভাবে ঘুরিয়ে দিল যেন মনে হচ্ছে সামনে এগোতে এগোতে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলে গলিতে ঘুরে পড়ল। যেই ওদের পিছু নিয়ে থাকুক সে যদি ওদের ঘুরতে দেখে থাকে অন্তত তাই মনে করবে, আর যদি পার হতে থাকা জিপের কারণে সে দেখতে না পায় তবে, স্রেফ চোখের সামনে থেকে ওরা গায়েব হয়ে গেছে তার।

গলিতে ঘুরেই বাশার চিৎকার করে উঠল, ‘দৌড় দাও।’



অধ্যায় ছাব্বিশ

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

মাতৃতা, উত্তর ভারতের কোনো এক গ্রাম

‘কর্নেল, আপনি কি নিশ্চিত আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি!’ কথাটা প্রশ্নের মতো করে উচ্চারণ করলেও আসলে সে কি প্রশ্ন করল নাকি সন্দেহ প্রকাশ করল, পিটার নিজেও ঠিক নিশ্চিত নয়। নিজের লালচে মাটিন চপ দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে আশপাশে তাকাল, ভোরের আলো ফুটেছে বললে ভুল হবে, বরং এখনো আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশি। তবে পূর্বের আকাশে খানিক লালচে ভাব ফুটে উঠতে শুরু করেছে। বদলাপুর সেনানিবাস থেকে সন্দের দিকে যাত্রা শুরু করে তারা মোটামুটি দ্রুত গতিতেই ঘোড়া ছুটিয়েছে। গতিটা হয়তো অনেক বেশি নয় আবার একেবারে কমও নয়। দলে চারজন হওয়াতে সুবিধা হয়েছে, তিনজন চারটা ঘোড়া নিয়ে বেশ দ্রুতই পথ চলতে পেরেছে। প্রথমে টানা দু ঘণ্টা পথ চলে ওরা ছোট একটা গ্রামের কাছে থেমেছে। সেখানে খানিক বিশ্রাম নিয়ে তামাক খেয়ে আবার রওনা দিয়ে প্রায় ঘণ্টা তিনেক চলার পর একটা জলার ধারে পৌঁছানোর পর কর্নেল নির্দেশ দেয়, সেখানে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করার। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পথ চলার পর সবাই ভীষণ ক্লান্ত—কোনোমতে সামান্য খেয়ে নিয়েই ঘুমিয়ে গেছে সবাই।

কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে প্রায় মাঝরাতের দিকে আবারো রওনা দিয়েছে তারা। খানিক বিশ্রাম নেওয়াতে এবার তাদের পথ চলার গতি বেড়েছে রাতের চেয়ে। টানা ঘণ্টা তিনেক পথ চলার পর একটা গ্রামের কাছে এসে থেমে যায় ওরা। গ্রামের সায়াহ্নে একটা কুয়ার পাড়ে থেমে ঘোড়াগুলোকে পানি খাইয়ে বিশ্রাম করতে দিয়ে পাইপ ধরিয়ে কর্নেল জানায় এটাই মাতৃতা গ্রাম, জায়গাটা উত্তর এবং মধ্য ভারতের মাঝামাঝি একটা জায়গায়।

‘আমরা আসলে যাচ্ছি কোথায়?’ তামাক খেতে খেতে প্রথমে পিটার জানতে চায়। তাকে অবাক করে দিয়ে কর্নেল জবাব দেওয়ার আগে সোলেমান কথা বলে

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

ওঠে, মুখের ভেতরে গোল করে পাকানো তামাকের ডেলা পুরে দিতে দিতে সে বলে ওঠে, 'হজুর অনুমতি দিলে আমি কই।' পিটার তো বটেই এমনকি কর্নেলও খানিক অবাক হয়ে তাকায় তার দিকে, মুখে খানিক বিস্ময়ে হাসি নিয়েই কর্নেল পাইপ নেড়ে তাকে কথা বলার নির্দেশ দেয়।

'গোস্তাখি মাফ দিয়েন হজুর,' মাটিতে তামাক মেশানো খুতু ফেলল সে। সোলেমান তামাক ধোয়ার আকারে টানে না বরং সাদা পাতা গোল করে পাকিয়ে চিবায় সে। মাঝরাতে সেই জলার পাড় থেকে রওনা দেওয়ার সময়ে সে মাথায় একটা লাল কাপড় জড়িয়েছে, কারণ সে বিশ্বাস করে লাল কাপড়ের দুটিকে তাড়ানোর বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। নিজের লম্বা অবয়ব নেড়ে ছোটোখাটো ইংরেজ পিটারের দিকে তাকিয়ে সে কর্নেলকে দেখিয়ে বলে উঠল। 'হজুর যাইতাছে তার পুরনো এক সঙ্গীর কাছে। হজুর যখন অবসরে চইলা যায়, তার লগের প্রায় সবাই মিলিটারিতে রইয়া গেলেও দুজন সঙ্গী হজুরের লগে লগে মিলিটারি ছাইড়া দিসিল,' কর্নেলের মুখে বিস্ময় মেশানো হাসির জায়গায় ধীরে ধীরে সম্মতির হাসি ফুটে উঠছে। 'ঠিক কইতাছি হজুর?' সোলেমানের প্রশ্নের জবাবে কর্নেল কিছু না বলে চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল।

'হজুরের সেই দুই সঙ্গীর ভেতরে একজন হইল পালোয়ান বাঘা শামসু। আমি যদি ভুল কইরা না থাকি তয় আমরা এখন সেই বাঘা শামসুর ওইখানে যাইতাছি। কারণ আমি যতটুকু জানি বাঘা শামসুর বাড়িই এই মাতুগার এইখানে,' কথা বলা শেষ করে সে নিজের বিশাল শক্তিশালী একটা হাত নেড়ে জানতে চাইল, 'হজুর ঠিক বলছি?'

কর্নেল পাইপের ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে খুবই অবাক হয়ে বলে উঠল, 'তুমি একদম ঠিক বলেছো। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি তুমি এতটা জানলে কীভাবে, আর অনুমানই বা করলে কীভাবে?'

'হজুর, শুধু আপনে আর আপনার কাছের মানুষেরাই না, আপনার পরিবারের ওই ঘটনার পরে আমি-আমার পরিবার এবং আমার পরিবারের মতো অনেকেই জীবন চিরতরে বদলাই গিয়েছিল,' এর বেশি কিছু না বলে সে চুপ হয়ে গেল। বুক চিরে বেরিয়ে এলো দীর্ঘনিঃশ্বাস।

কর্নেলও বড় করে একবার দম নিয়ে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'সোলেমান ঠিকই বলেছে, আমরা পালোয়ান বাঘা শামসুর ওখানেই যাচ্ছি। এই গ্রামের শেষ সীমানায় জংলা এলাকার ওপাশে সে থাকে, তার নিজের ফসলের জমি আর খামার রয়েছে। চলো সবাই,' বলে সে উঠে দাঁড়াতেই অন্যরাও উঠে দাঁড়িয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগল। ফটিকের দিকে তাকিয়ে কর্নেল বলে উঠল, 'ফটিক ক্রান্তি লাগছে?' কর্নেলের সরাসরি প্রশ্নের জবাবে সে সামান্য লাজুক হাসি দিয়ে জোরে জোরে মাথা নেড়ে জানাল তার ক্রান্তি লাগছে না।

সিপাহী

চলো।

সেখান থেকে রওনা দিয়ে ওরা প্রথমে গ্রামটা পার হয়ে এলো। দিনের আলো একেবারেই কোটেনি, কাছেই কোনো মানুষ তো দূরে থাক, এমনকি গ্রামের পথে একটা কুকুরও দেখতে পেল না ওরা। গ্রামটা নির্বিঘ্নেই পেরিয়ে এসে। জংলামতো জঙ্গলটার প্রবেশ করতেই সবার গা ছমছম করতে লাগল। জায়গাটা এমন, বোঝার উপায় নেই কোনদিকে যাচ্ছে, সামনে কী আছে। 'হজুর আপনি নিশ্চিত তো আমরা ঠিক পথেই যাচ্ছি?' পিটার আবারো একই কথা জানতে চাইল।

কর্নেল কিছু না বলে আনমনে মাথা নাড়ল। তার মাথা নাড়ানো দেখে আসলে বোঝার উপায় নেই সে পুরোপুরি নিশ্চিত কি না। পিটার একবার ভাবল, মশাল জ্বালানোর নির্দেশ দেবে কি না। কিন্তু অন্যদের নিঃশব্দে এগোতে দেখে সে কিছু কল না। আরো ঋনিক পথ একইভাবে এগোতে এগোতে সবাই যখন প্রায় অশ্বি বোধ করতে শুরু করেছে পিটার আবারো জানতে চাইল। 'হজুর আমরা কি আরেকটু আলো কোটার জন্য অপেক্ষা করব নাকি?'

কর্নেল কিছু না বলে সামনের দিকে পরখ করার চেষ্টা করেছে মনোযোগ দিয়ে। 'হজুর আপনি কি নিশ্চিত, এখানেই—' পিটার তার প্রশ্ন শেষ করার আগেই কর্নেল একটা হাত তুলে সামনের দিকে দেখাল। কর্নেল দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই সেদিকে কিরে তাকাল সবাই। রাত্রি আর ভোরের সায়াহ্নের এই সময়টাতে দিনের আলো কুটে ওঠে খুব দ্রুত এবং হঠাৎ অন্ধকার থেকে চট করে আলো হতে শুরু করে চারপাশ। কালো থেকে প্রথমে ধূসর, এরপর ধূসর থেকে ধীরে ধীরে সাদা হতে শুরু করে। এখন চারপাশ সেই ধূসর ফরসা হতে শুরু করেছে। সেই আবছা আলোতে সামনের দিকে তাকিয়ে ওরা প্রায় তেমন কিছুই দেখতে পেল না। অন্তত প্রথমে, পিটার অস্থির হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় জংলা জায়গাটার অন্যপাশে আবছা একটা কুটিরের মতো দেখতে পেল সে পরিষ্কার। 'এটা তো কারো বাড়ি মনে হচ্ছে,' আনমনেই বলে উঠল সে।

'একদম ঠিক, চলো,' নিজের ঘোড়াটাকে সামনে এগোতে এগোতে বলে উঠল কর্নেল। তার গলায় স্বস্তির আভাস। কর্নেল এগোতেই বাকিটা ঘোড়া নিয়ে তার পিছু নিল। জায়গাটা ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে কাছেই। কিন্তু অন্ধকার হওয়াতে এক জঙ্গলের ভেতরে হওয়াতে একেবারেই বোঝা যাচ্ছিল না। ওরা কাছে এগোতেই দেখতে পেল জংলার ভেতরে চারকোনা করে পরিষ্কার করে সুন্দর বাগানের মতো করে ঘেরা একটা জায়গা। চারপাশটা জঙ্গলে ঘেরা হলেও পরিষ্কার করা জায়গাটা একদম চকচকে পরিষ্কার এবং সুন্দর মতো ফুলের গাছ দিয়ে ঘেরা। এর ভেতরে ছোট কিন্তু বেশ সুন্দর একটা বাড়ি, খুব বেশি বড় নয় এবং খুবই সাধারণ উপাদানে তৈরি, কিন্তু বেশ পরিষ্কার এবং বাড়িটা এমনভাবে বানানো যে

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

এর সৌন্দর্য দেখার মতো। 'বাহ দারুণ তো,' সোলেমান বিস্মিত গলায় বলে উঠল। 'এই জঙ্গলের ভেতরে এমন জায়গার দেখা পাব এইটা তো ভাবতেই পারি নাই।'

'সেটা তো বুঝলাম কিন্তু মানুষ কোথায়?' পিটার এখনো খানিক অস্থির গলায় জানতে চাইল।

'এই ভোরবেলা মানুষ নিশ্চয়ই বাড়ির আশ্রিনায় মেহমানের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে না,' কর্নেল ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বলে উঠল। 'ভেতরের দিকে চলো সবাই,' বলে সে ফটিকের দিকে ফিরে নির্দেশ দিল, 'ফটিক তুমি থাকো এখানেই। জিনিসপত্র আর ঘোড়াগুলো দেখে রাখো।'

ফটিক মাথা নেড়ে সায় জানতেই ওরা বাড়ির সামনের বাগান পার হয়ে ভেতরের দিকে রওনা দিল। বাড়িটার দরজার কাছে গিয়ে কর্নেল টোকা দিতেই ঝুলে গেল সেটা। 'ওমা, দরজা তো দেখি খোলা,' কর্নেল মৃদু স্বরে ডাক দিলেও কেউ সায় জানাল না। 'ভেতরে যাব নাকি?' কর্নেল বলার আগেই সোলেমান ভেতরে ঢুকে গেছে, মিনিটখানেকের ভেতরে সে ফিরে এলো ভেতর থেকে। 'হজুর ভেতরে কেউ নাই।'

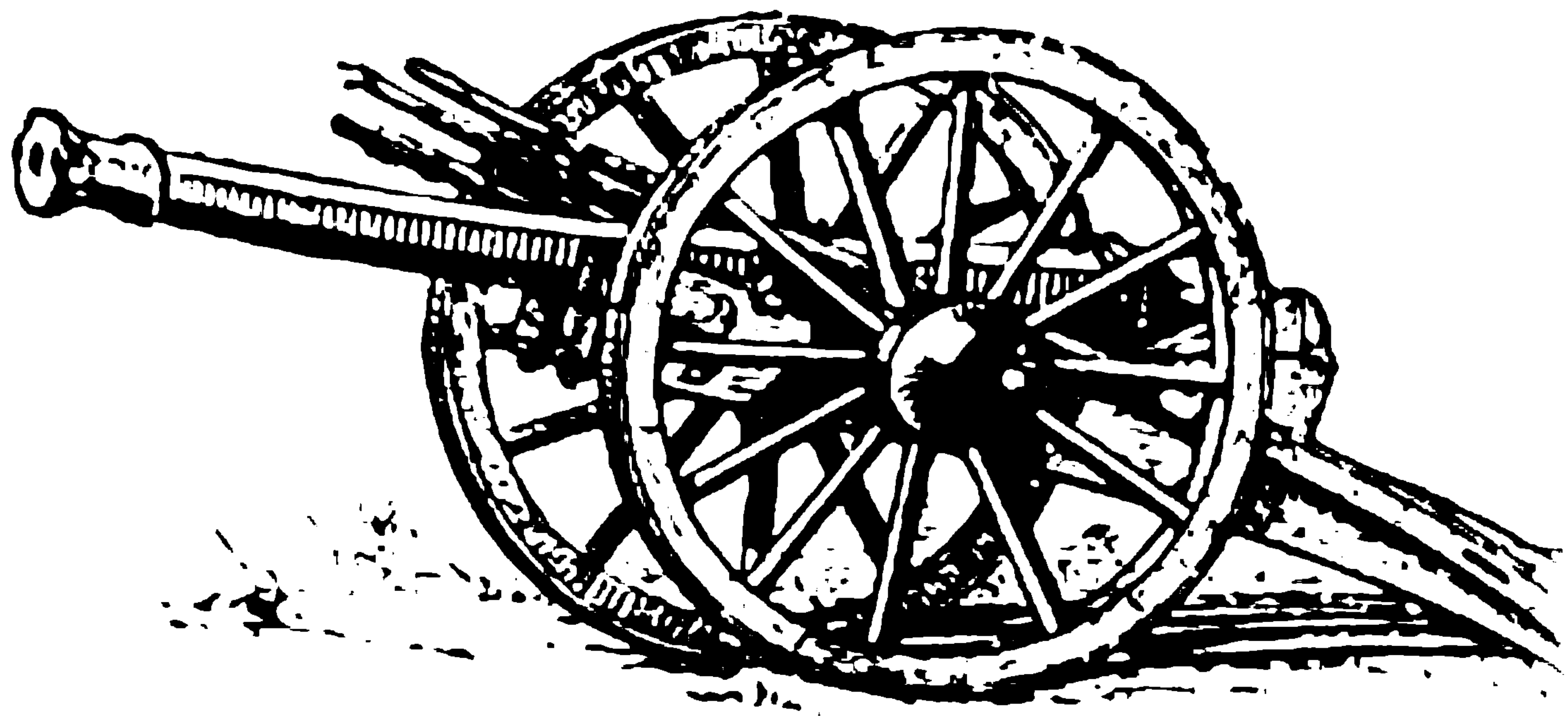
'এক মিনিট, আপনারা কেউ পোড়া গন্ধ পাচ্ছেন?' পিটার নাক কুঁচকে বলে উঠল। বাতাসে সত্যি সত্যি এক ধরনের ভেজা ভেজা পোড়া গন্ধ। 'সত্যি তো একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে,' কর্নেলও গন্ধ টের পেয়ে বলে উঠল।

'আর গন্ধটা আইতাছে বাড়ির পেছন খেইকা,' বলে মুহূর্তের জন্য সোলেমান কর্নেল এবং পিটারকে দেখেই দৌড় দিল বাড়ির পেছন দিকে। তাকে অনুসরণ করল দুজনেই। পিটারের এক হাত পিঙ্কলের খাপের ওপরে, অন্য হাত তলোয়ারের বাঁটে। কিন্তু বাড়ির পেছনে এসে দেখতে পেল, সেখানে স্রেফ ছোট একটা ছাউনির মতো এবং সেটার ভেতরে কিছু একটার সামনে ঝুঁকে বসে আছে সোলেমান। 'কি ব্যাপার—'

'হজুর দেখেন এইখানে কিছু একটা ছিল চুলার ওপরে কেউ পানি—'

বাড়ির সামনে থেকে ভেসে আসা তীক্ষ্ণ চিৎকারে ছট করে সেদিকে ফিরে তাকাল তিনজনেই।

'ফটিক,' আনমনে বলে উঠল কর্নেল, একটানে খাপ থেকে বের করে এনেছে নিজের তলোয়ার।



অধ্যায় সাতাশ বর্তমান সময় কাঁচিঝুলি ও জয়নুল আবেদীন পার্কে মাঝের রাস্তা

বাশার গলির ভেতরে ঢুকে দৌড় দিয়ে দুই শ গজের মতো এগিয়েই থেমে গেল, তার পেছনে পেছনে সামিরাও। বাশার চট করে ওয়াকি-টকিটা মুখের সামনে তুলে ধরে প্রায় ঝড়ের গতিতে ইনসপেক্টর রবিউলকে মনে করিয়ে দিল কী করতে হবে। কথা শেষ করেই সে সামিরার একটা হাত ধরে টান দিয়ে ঘুরে গেল প্রায় তিন শ ষাট ডিগ্রির মতো। ‘জলদি জলদি,’ বলে সে একটা সাদা দেয়ালের সামনে এসে নিচু হয়ে নিজের দুই হাতের তালু উলটো করে ধরে মেলে ধরল সামিরার সামনে। ক্ষণিকের জন্য সামিরা বুঝতে পারল না বাশার আসলে কী করতে চাচ্ছে, তারপর সঙ্গে সঙ্গেই অনুধাবন করে নিজের একটা পা তুলে দিল মেলে ধরা তালুতে। সে পা রাখতেই বাশার জোরে ঠেলা মারল ওপরের দিকে, সামিরার লাফ এবং বাশারের ঠেলা ঝেয়ে সে এক লাফে ধরে ফেলল কোয়ার্টারের দেয়ালের ওপরের অংশ, বেয়ে উঠে এলো ওপরে। সে উঠে আসার কয়েক সেকেন্ডের ভেতরে বাশারও উঠে পড়ল দেয়ালের ওপরে।

দেয়ালের ওপরে উঠেই বাশার, দ্রুত পা ফেলে এগোল একদিকে, সামিরা এখনো পুরোপুরি বুঝতে পারছে না, বাশার আসলে কী করছে। কিন্তু সে অনুসরণ করে চলল বাশারকে। দেয়ালের খানিক সামনে এগোতেই ওরা দুজনেই দেখতে পেল, দেয়ালের ভেতরের দিকের কোয়ার্টার এলাকার একটা গাছের ডাল পাতাসহ ঝাঁকড়া হয়ে এসে পড়েছে দেয়ালের ওপরে। ওটার আড়ালে গিয়ে নিজেকে মোটামুটি আড়াল করে সামিরাকে টেনে বসিয়ে দিল বাশার দেয়ালের আড়ালে। দুজনেই একেবারে আড়াল না হলেও চট করে নিচ থেকে কেউ দেখতে পাবে না ওদের। ‘এবার আমরা অপেক্ষা করব,’ কথাটা ফিস ফিস করে বলে বাশার মুখের সামনে একটা আঙুল তুলে সামিরাকে চুপ থাকার ইশারা করল।

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

এইরকম সিন্চুয়েশনে সবচেয়ে কঠিন কাজ সম্ভবত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা। কারণ এক হাজারটা ঘটনা ঘটতে পারে, আমি একভাবে অপেক্ষা করছি, ঘটনা ঘটতে পারে অন্যভাবে, আমি যাকে ধরার জন্য, যেভাবে ধরার জন্য অপেক্ষা করছি, সেই সময়ে মানুষটা পালাচ্ছে পুরো উলটোদিকে। অনিশ্চয়তা অনেক কিন্তু সম্ভব হওয়ার সম্ভাবনা কম, এরকম সময়ে ধৈর্য ধরে বসে অপেক্ষা করা খুব কঠিন। তবে ওদের ক্ষেত্রে অপেক্ষাটা এতটা কঠিন হলো না। প্রথম মিনিট গেল দ্বিতীয় মিনিট গেল, এমন সময়ে একজনের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল গলিতে। যে কেউ হতে পারে, কিন্তু বাশার আর সামিরা দুজনেই সতর্ক হয়ে গেল কয়েকগুণ, পারলে গাছের ডালের ঝাঁকড়ার আরো ভেতরে ঢুকে যায়, কিন্তু ওরা স্থির হয়ে রইল। পায়ের আওয়াজ এগিয়ে এসেই আবার থেমে গেল। তারপর ধূপধাপ এগোল আরো বেশ খানিকটা। পেছন থেকে বাশার দেখতে গেল একটা কম বয়সি ছেলে, কোনো সন্দেহ নেই এই লোক ওদেরই খুঁজছে। কারণ সাধারণ কেউ হলে এভাবে গলিতে ঢুকে আতিপাতি করত না। আর সুযোগ দেওয়ার বা অপেক্ষা করার কোনো মানেই হয় না। সামিরার দিকে একবার হালকা একটা ইশারা করেই ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল বাশার, নড়ে উঠল গাছের ডাল, দেয়ালের ওপর থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ার আগেই ওর হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তলটা। যখন হাঁটুতে ভর দিয়ে সে মাটিতে স্থির হলো, হাতের পিস্তলটা সোজা তাক করা পেছন ফেরা মানুষটার দিকে। ‘হস্ট, একদম নড়বে না,’ যদিও বুকের ভেতরে ধাম ধাম পিটছে হৃৎপিণ্ড কিন্তু যতটা সম্ভব স্থির এবং কঠিন গলায় বলে উঠল বাশার। তার পাশেই লাফিয়ে নেমেছে সামিরাও।

চূড়ান্ত অবাক ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল সামনের মানুষটা। সঙ্গে সঙ্গে বেশ অবাক হয়ে গেল বাশার এবং সামিরা দুজনেই। একেবারেই অল্প বয়স্ক একটা ছেলে, গায়ে একটা সাধারণ সাদা টি-শার্ট এবং পায়ে ট্রাইজার, চোখে ভারী ফ্রেমের চশমা। ছেলেটার সাদা টি-শার্টকে রমিজ দারোগা শার্ট ভেবেছিল। ক্ষণিকের জন্য অবাক হয়ে গেল বাশার, বলা চলে খানিক চমকেও উঠল। কারণ এরকম কাউকে অন্তত আশা করেনি ও। কিন্তু তাই বলে নিজের পিস্তল নামাল না সে। ‘সামিরা তুমি আমাকে কভার করো,’ বলে সে ছেলেটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ‘এই কে তুমি, আমাদের ফলো করছিলে কেন?’ ছেলেটা এখনো হাঁ হয়ে আছে, সে তার হতভম্ব ডাব কাটিয়ে উঠতে পারছে না কিছুতেই। ‘এই কথা বলো না কেন? নাম কি তোমার?’

কাছে গিয়ে পিস্তলটা একেবারে কাছ থেকে তাক করল বাশার। ‘স্যার, আপনি বাশার স্যার?’ বাক্যের আগেপিছে দুইবার স্যার বললেও তার বাক্যটা ঠিক পরিষ্কার বোঝা গেল না, সে কি আসলে প্রশ্ন করেছে, নাকি মন্তব্য করেছে, না স্রেফ তথ্য দিয়েছে।

সিপাহী

‘আমি কে সেই প্রশ্ন পরে, আগে বলো তুমি আমাদের কলো করছিলে কেন?’ প্রশ্নটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাশার আরেক পা এগিয়ে গেল ছেলেটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটল। ছেলেটার অন্যপাশে গলিটার ভেতর থেকে ইনসপেক্টর রবিউলের জিপটা এসে থামল। জিপ থেকে লাফিয়ে নেমে পিঙ্কল তাক করল ইনসপেক্টর রবিউল। রমিজ দারোগাও নেমে এলো জিপ থেকে, ছেলেটা একবার আতঙ্কের সঙ্গে ওদের দিকে দেখে বাশারের দিকে ফিরে তাকাল আতঙ্কের সঙ্গে। সে পুরোপুরি বুঝতে পারছে না হচ্ছেটা কি আসলে। ‘স্যার, স্যার আমি চোর-বদমাশ কেউ না।’

‘তুমি কুশো,’ কণিকের জন্য বাশারের মনে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে ছেলেটার চেহারা। এই ছেলেটাই অপহরণের সময়ে রিফাতের সঙ্গে ছিল, এই ছেলেটাই আজ সকালে হাসপাতাল থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছিল।

এই ছেলে এখানে ওদের এভাবে অনুসরণ করছিল কেন?

বর্তমান সময়

পিবিআইএস হেডঅফিস, ধানমন্ডি

‘মৌসুমি, তুমি কি ফ্রি আছো?’ ইন্টারকমের ওপাশ থেকে হাবিব আনোয়ার পাশার গলা ভেসে এলো। ‘হ্যাঁ হাবিব আনোয়ার পাশার গলা শুনে খানিক চমকে উঠল মৌসুমি। সে মনোযোগের সঙ্গে একটা কাজ করছিল, আর ইন্টারকমটাও এখানে স্পিকারে দেওয়া ছিল, খেয়াল করেনি সে।

‘স্যার, আমার হাতে একটা কাজ আছে, দুটো ফ্যাক্স পাঠাতে হবে সিলেট আর চট্টগ্রামে। ওই দুটো পাঠিয়ে একটু ফ্রি হবো।’

‘একটা ডাকল এক্সপ্রেসো কফি দিতে পারবে প্রিজ, তোমার স্পেশালটা।’

‘অবশ্যই স্যার, আমি হাতের কাজ শেষ করে দশ মিনিটের ভেতরে নিয়ে আসছি। পিবিআইএসের স্পেশাল উইংয়ের অফিসের অনেকেই কাল রাতে অফিসে যাননি। যদিও মৌসুমি গিয়েছিল। রাতের বেলা বাশার আর সামিরাকে হেলিকপ্টারে তুলে দিয়ে হাবিব আনোয়ার পাশার গাড়িই ওকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ওর মোহাম্মদপুরের বাসায়। তবে এটাও বলে দিয়েছিল আনোয়ার পাশা সকালে অবশ্যই অবশ্যই নয়টার ভেতরে তাকে অফিসে চায় সে। মৌসুমি নিজে গেলেও সে এটা জানে অনেকেই কাল রাতে বাসায় যাননি, বিশেষ করে আনোয়ার পাশা তো অবশ্যই যাননি। হাতের কাজ শেষ করে মৌসুমি, কফি নিয়ে যখন আনোয়ার পাশার কামরায় পৌঁছে নক করল ভেতরে ঢোকার জন্য। ‘স্যার, আসব?’

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

মৌসুমির প্রশ্নের জবাবে আনোয়ার পাশা হাতের ইশারায় তাকে ভেতরে ঢুকতে কল। আনোয়ার পাশার সামনে কফি রাখতে রাখতে মৌসুমি বেশ অবাক হয়েই তাকাল মানুষটার দিকে, কাল রাতে সে ঘুমায়নি, এর আগেও কয়দিন ঘুমায়নি কে জানে! তবে মানুষটার চেহারা বা পোশাকে সেটার কোনো ছাপ নেই। পরনে ছাই কটনের টিপটপ ফরমাল শার্ট, গলায় হালকা করে বাঁধা শ্যাটিং টাই এবং তার ওপরে তার ট্রেন্ডমার্ক ছাই কাপড়ের ডেস্ট।

‘স্যার কি রেস্ট নিতে পেরেছেন?’

‘হুম,’ সামনে বেশ কিছু কাগজ ছড়ানো, পাশের ডেস্কের দুটো মনিটরই নানা ধরনের ডেটা ব্রিংক করছে, সেই সঙ্গে টেবিলের ওপরে রাখা অ্যাসট্রের পাশে রাখা কালো রঙের চিক সিগার থেকে ধোঁয়া উঠছে। মৌসুমির প্রশ্ন শুনে কাগজপত্র থেকে চোখ তুলে সে ঝগিকের জন্য কী জানি ডাবল, তারপর যেন বর্তমানে ফিরে এসে যুঁহু হেসে বলে উঠল, ‘নাহ,’ মৌসুমি দেখল মানুষটার চোখের কোণের দিকে তাকালে বোঝা যায় সে কতটা ক্লান্ত। ‘আমি অফিসেই হালকা শুয়ে শাওয়ার নিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি। তুমি ঘুমাতে পেরেছিলে?’

প্রশ্নটা স্রেফ করার জন্যই করা, সঙ্গে সঙ্গে সে প্রসঙ্গ বদলে কাজের কথা চলে এলো। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে সে বলে উঠল, ‘রিফাত কেসের আপডেট ক’নেকো?’

মৌসুমি মাথা নেড়ে বলে উঠল, ‘জি স্যার, ওরা তো ভয়াবহ অবস্থার ভেতরে পড়েছিল। শুড লাক যে ওরা উদ্ধার হয়েছে।’

‘লাক নয়, বাশার আছে, সামিরা আছে ওরা একটা লিড বের করেই ফেলবে। প্রশ্ন হলো, আমরা কি রিফাতের অপহরণকারীদের থেকে এখনো কিছু শুনেছি?’

কফির কাপ হাতে নিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল আনোয়ার পাশা। ‘এই বিষয়টা নিয়ে আমি চিন্তিত নই। এরা কারা, চাচ্ছেটা কি, এবং অপহরণের এতটা সময় পার হয়ে গেল, এত আয়োজন করে অপহরণ করল, কিন্তু কোনো ডিমাভ নেই কেন, দ্যাটস হোয়াট আই অ্যাম ওরিড অ্যাবাউট।’

‘স্যার-’

‘এক মিনিট সামিরা, সিলেট এবং চট্টগ্রামের আপডেট বলো।’

‘স্যার ওরা প্রস্তুতি নিচ্ছে আপনার নির্দেশ পেলে যেন যেকোনো সময়ে বেরিয়ে পড়তে পারে।’

‘হোল্ড করো ওদের,’ আনোয়ার পাশা গম্ভীর সুরে বলে উঠল। ‘প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে বলো। কিন্তু আমার নির্দেশ ছাড়া কোনো অবস্থাতেই যেন অপারেশন শুরু না করে,’ আনোয়ার পাশা এখনো ভাবছে। ‘একবার ফেইক গ্রুপের ওপরে আক্রমণ হয়েছে। এখন চুপচাপ থাকলে শত্রুরা কনফিউজড হবে।’

সিপাহী

‘জি স্যার,’ মৌসুমি গভীরভাবে তাকিয়ে আছে আনোয়ার পাশার চোখের দিকে। বোঝার চেষ্টা করছে কী চলছে মানুষটার মস্তিষ্কের ভেতরে। সিলেট, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ—দেশের বাইরে-ভেতরে মিলিয়ে কী পরিমাণ চাপে আছে সে এটা সম্ভবত একমাত্র মৌসুমি জানে।

‘নো স্ট্রিং অ্যাটাচড,’ অনেকটা আনমনেই বলে উঠল আনোয়ার পাশা।

‘সরি, স্যার,’ মৌসুমি ঠিক বুঝতে পারেনি আনোয়ার পাশা আসলে কী বলল।

আনোয়ার পাশা কোনো উত্তর দিল না মৌসুমির কথার। এমন মনোযোগের সঙ্গে কক্ষি বাচ্ছে যেন এর ওপরেই তার সব সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে। কক্ষিতে কয়েক চুমুক দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল কাপটা টেবিলে রেখে। অ্যাসট্রে থেকে তুলে নিল সিগারটা। ‘আমি নিজেই অর্থরিটি, কিন্তু আমার স্বীকার করতে এক বিন্দু দ্বিধা নেই যে আমি নিজেই অর্থরিটির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার ওপরে আর পুরোপুরি ভরসা করতে পারছি না। কাজেই তানভীর এবং শারিয়ারকে পুরোপুরি ওদের ওপরে ছেড়ে দিতে হবে আমার। আমি আগে ভেবেছিলাম স্রেফ অফিসিয়াল যোগাযোগটা থাকবে না, বাকি সব আমাদের সঙ্গেই কানেক্টড থাকবে ওরা। কিন্তু সেটাও করা যাবে না। মনে হচ্ছে। ভাবছি স্রেফ আমি যোগাযোগ রাখব ওদের সঙ্গে।’

‘মানে স্যার, সিলেট থেকে জেড মাস্টার এবং চট্টগ্রাম থেকে মিস্টার ইউকে ঢাকার এনে ইন্টারপোলের হাতে তুলে দেওয়ার যে-মিশন সেটা তানভীর এবং শারিয়ারের স্রেফ নিজেদের টিম নিয়েই করতে হবে, আমাদের থেকে কোনো সাপোর্ট পাবে না ওরা, ঠিক?’

‘হুম, ওদের সঙ্গে কথা বলাও আমাকে। আর্জেন্ট,’ আনোয়ার পাশা তাড়া দেওয়ার মতো করে বলে উঠল। মৌসুমি উঠে যাচ্ছিল কমিউনিকেশন সেকশনের দিকে, আনোয়ার পাশা আবারো তাকে থামাল। ‘এক মিনিট মৌসুমি, আমার আজকে বাকি শিডিউল কি?’

‘স্যার, আপনার ইন্টারপোলের সঙ্গে একটা মিটিং আছে অনলাইনে, আমাদের টিম আলকা সেকশনের ফাইনেশিয়ার, মানে শারিয়ারের চাচা মিস্টার মাহবুব এবং তার রাইট হ্যান্ড মানে হামিদ সাহেবের সঙ্গে জরুরি একটা মিটিং আছে—’

‘দুটোই পেছাও,’ আনোয়ার পাশা জরুরি ভঙ্গিতে বলে উঠল, ‘ইন্টারপোলের সঙ্গে মিটিংটা এক ঘণ্টা পর, ওদের বলো আমি মিটিংটা দুই ঘণ্টা পর করব। আর মাহবুব ভাইয়ের সঙ্গে মিটিং করব ইন্টারপোলের পর।’

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে মৌসুমি বলে উঠল, ‘তাহলে স্যার এর আগের দুই ঘণ্টা?’

‘প্রথমে তানভীর আর শারিয়ারের সঙ্গে কথা বলব আমি এখনি, আর ইন্টারপোলের সঙ্গে মিটিংয়ের আগে আমাকে প্রফেসর ইফতেখারের সঙ্গে কথা

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

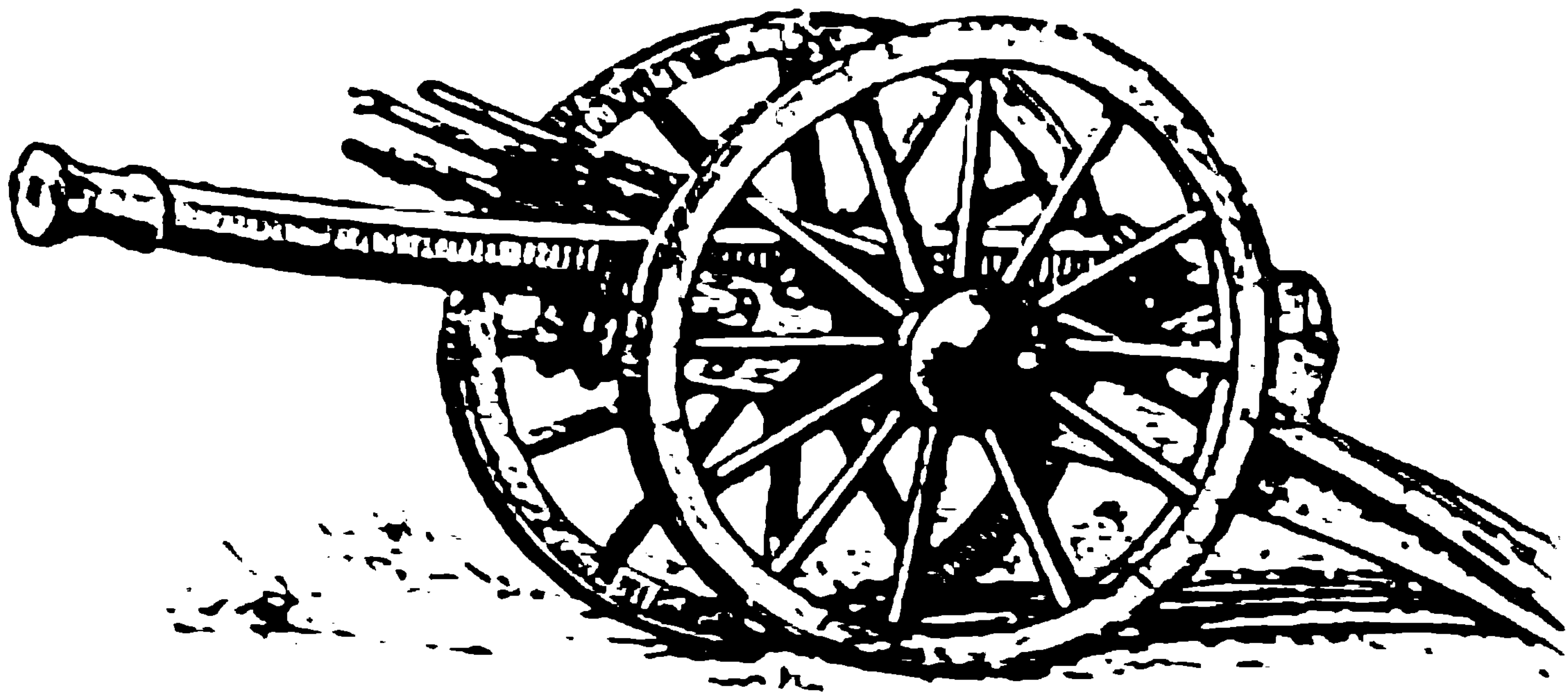
ক্লান্ত হবে,' এই পর্যন্ত শুনে মৌসুমির চোখ কুঁচকে উঠল। 'আমরা অজানা শত্রুর বিরুদ্ধে অন্ধকারের ভেতরে লড়াই করে চলেছি। এভাবে জেতা তো দূরে, টিকে থাকাই সম্ভব হবে না। কাজেই সবকিছুর আগে আমাকে কিছু প্রশ্নের জবাব জানতে হবে। যেটা রয়েছে একমাত্র প্রফেসর ইফতেখারের কাছে। কী হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে বুঝতে হবে আমাকে, নেত্রপলিস, রেলিক—এরা কারা আমি জানি। কিন্তু জেড মাস্টার, আল্ট্রা ম্যান, এরা কেন এবং কীসের পেছনে লেগেছিল পুরোপুরি জানা নেই আমাদের। খুব স্বাভাবিকভাবে এরকম ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল নিয়ে ইন্টারপোলের আশ্রয় থাকবে এটাও স্বাভাবিক, কিন্তু ওদের ব্যাপারে ইন্টারপোলে এমনকি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রও অনেক বেশি আশ্রয়ী, কেন? তারচেয়ে বড় কথা বাশার কিশোরগঞ্জ থেকে যা উদ্ধার করে এনেছে সেগুলো আসলে কি, কেন এবং কীভাবে সেগুলো সেখানে গেল এবং এই পুরো ঘটনার সঙ্গে ওগুলোর এবং যে কালেক্টর দুজন ধরা পড়েছে—ওগুলোর সংযোগ কি? এসব জানতে হবে আমার।'

'ওকে স্যার তাহলে শিডিউলটা দাঁড়াচ্ছে, আপনি তানভীর এবং বাশারের সঙ্গে কথা বলে ওদের কিছু নির্দেশনা দেবেন। এরপর প্রফেসর ইফতেখারের সঙ্গে দেখা করবেন, এরপর ইন্টারপোল, মাহবুব স্যারের সঙ্গে মিটিং—'

'আরেকটা আইটেম যোগ করো, যদি সেটা আজ না হয়, তবে কাল,' বলে সে একটু থামল, মৌসুমি অপেক্ষা করে আছে। আনোয়ার পাশা বলে উঠল, 'বাশারের কিশোরগঞ্জ অপারেশনে কালেক্টর যে দুজন ধরা পড়েছে, ওদের সঙ্গে আমি কথা বলব।'

'ওকে স্যার।'

পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, আরো ভয়ংকর হওয়ার আগে সব বুঝতে হবে তাকে।



অধ্যায় আঠাশ

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

মাতুল গ্রাম, উত্তর ও মধ্য ভারতের মাঝামাঝি

পরিস্থিতি হঠাৎই এমন ভয়ংকর হয়ে উঠবে ওরা কেউই বুঝতে পারেনি।

‘এই ছাড়ো ওরে ছাড়ো কলতাহি,’ রীতিমতো চিৎকার করে উঠল সোলেমান, সম্মুখের দিকে তাকিয়ে। সামনের দৃশ্যটা অত্যন্ত ভয়ংকর। মাথা-মুখ ঢাকা কালো একটা মূর্তির মতো বিশালদেহী মানুষ পিচ্চি কটিকের গলা জড়িয়ে ধরে প্রায় শূন্য তুলে কেনেছে, সেই সঙ্গে অন্য হাতে মুঠি করে ধরে রেখেছে তার চুল। আর ওদের ঘিরে অসংখ্য পাঁচ-ছয়টা ভয়ংকর দর্শন কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

‘করা তোমরা?’ জলদ গম্ভীর গলায় ধমকে উঠল ছায়াঢাকা মূর্তিটা। ‘আমার বাড়িতে কী করো? পরিষ্কার জবাব দাও না হলে এর ঘাড় ভাইঙা দেব।’

‘কবরদার, কিছু করবা না,’ আগে ওরে ছাড়ো তারপর তোমার কথার জবাব দেব,’ বলে সোলেমান অস্থির হয়ে মাথা নেড়ে ভয়ংকর দর্শন কুকুরগুলোকে দেখল। ‘আর এইগুলোও সরাও।’

‘আগে পরিষ্কার উত্তর দেও—’

‘এই ভূমি সরো,’ সোলেমানের পেছন থেকে ধমকে উঠল কর্নেল স্যাভার্স। ‘শামসু, আমি স্যাভার্স,’ বলে কর্নেল সোলেমানকে ঠেলে সরিয়ে একেবারে সামনে নিয়ে দাঁড়াল মূর্তিটার। ‘চিনতে পেরেছো আমাকে?’ বলে সে নিজের তলোয়ারটা চুকিয়ে কোল খাপের তেতরে। মূর্তিটা ঋনিক হির হয়ে গেছে, কুকুরগুলো একই ভঙ্গিতে ঘেউ ঘেউ করছে, কপিকের সোলেমানের মনে হলো সবার সামনে থাকা, কর্নেলের পায়ের কাছে জান দিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে থাকা কুকুরটা বুঝি ঝাঁপিয়েই পড়বে তার ওপরে। কিন্তু হলো একেবারেই উলটো। কপিকে জন্য হির থেকেই মূর্তিটা প্রথমে কটিককে ছেড়ে দিল, তারপর বিচ্ছিন্ন একটা শব্দ উচ্চারণ করে জোরে ধমকে উঠল কুকুরগুলোকে। সবাই অবাক হয়ে দেখল, কুকুরগুলো ধমক খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চূপ হয়ে তো গেলই, একেবারে জায়গায় বসে গেল।

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

হৃদয় কুকুরগুলোর দিকে কেউ দেখছে না, সবাই তাকিয়ে রয়েছে কুকুরের মস্তকের দিকে। ফটিককে ছেড়ে দিতেই সে সরে গিয়ে, নিজের ঘাড় আর গলা ভেঁতে তরু করেছে। আর বিশালাকায় মূর্তিটা এগিয়ে এসে খেঁমে গেল কর্নেলের সামনে। এই প্রথমবারের মতো তাকে সবাই ভালোভাবে দেখতে পেল। বিশালদেহী একজন মানুষ, এতটাই বিশাল যে ছয়ফুটের ওপর লম্বা কর্নেলকে তার সামনে ছোট দেখাচ্ছে। কর্নেলের সামনে এসে মানুষটা তার শরীরের পেছনে রাখা প্রায় সাত ফিট লম্বা লাঠিটা মাটিতে গেঁথে রাখল, এটা যে তার সঙ্গে ছিল কেউ দেখতেই পারনি এই লাঠিটা। লাঠিটা মাটিতে রেখে মাথার আবরণ আর মুখের কালো পটি খুলে ফেলল সে। চকচকে টাক মাথা আর মুখ ভরা লাল দাড়ি উন্মোচিত হলো সবার সামনে, সেই সঙ্গে বাজ পান্থির ঠোঁটের মতো চোখা এবং বাঁকা একটা নাক। কয়েক মুহূর্ত কর্নেলের দিকে তাকিয়ে থেকে সে তামাক খেতে খেতে খয়ে যাওয়া ভ্রমুজের বিচির মতো দুই সারি দাঁত বের করে সে হাসি দিয়ে বলে উঠল, 'কর্নেল, স্যার, সত্যিই তুমি!' বলে সে অন্যদের দেখল, তারপর আবারো বিশালদেহী মানুষটা শিত্তর মতো ঝলঝল করে হেসে উঠে আরো এক পা এগিয়ে এসে ছাড়িয়ে ধরল কর্নেলকে, তারপর খুশির চোটে শূন্য তুলে ফেলল তাকে। 'কর্নেল, আমি ভাবতে পারি নাই এই জীবনে তোমারে আবার দেখব, হা-হা,' কর্নেলকে কোলাকুলির নামে রীতিমতো নিম্পত্তি করতে করতে মানুষটা হেসেই চলে।

'কেমন আছো তুমি পালোয়ান?' কর্নেল কোনোমতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জানতে চাইল। কিন্তু পালোয়ান তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অন্যদের দেখিয়ে জানতে চাইল, 'তোমার পরিবার?'

'পিটারকে তো তুমি চেনো,' কর্নেল পিটারকে দেখাল। মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে তাকেও ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু পিটার ভয়ে পিছিয়ে গেল দেখে সে আবারো ঝলঝল করে হেসে উঠল। 'ও তোমার বন্ধু ইউসুকির ছেলে, সোলেমান,' সোলেমানকে দেখিয়ে কর্নেল বলে উঠতেই পালোয়ার ঝট করে তার দিকে ফিরে তাকাল। 'তোমার বাপে সত্যিকারের বাহদুর আছিল। তুমি বাপের মতো শক্ত মরদ হইছো তো?' সোলেমান কিছু না বলে আনমনে মাথা নাড়ল। বেশি কিছু বলার সাহস পেল না, যদি আবার পালোয়ান তার মরদগিরি পরখ করতে চায়। 'আর ও, তুমি যাকে আরেকটু হলে দিয়েছিলে পিষে, ও ফটিক, আমাদের সহিস।'

'আর এরা আমার পরিবার,' বলে সে মাটিতে বসে থাকা ভয়ংকর দর্শন কুকুরগুলোকে দেখাল। 'ও কালু, ও বাতেন, ও মটলু, ও সাহেব, ও বটল, আর ও বাহাদুর,' কুকুরগুলো ওদের দিকে দেখে এমনভাবে মাথা নাড়তে লাগল যেন তারা পরিচিত হয়ে খুশি।

সিপাহী

‘তুমি ভালো আছো দেখে খুশি হলাম পালোয়ান, আমরা খুব জরুরি একটা কাজে আসছি,’ বলে কর্নেল সরাসরি তাকাল তার চোখের দিকে। ‘তোমার সাহায্য প্রয়োজন আমাদের। কর্নেলের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল পালোয়ান। ‘বাড়ির পেছনে চলো কর্নেল, সকাল হই গেছে, খাইতে খাইতে কথা বলি।’

পালোয়ানের সঙ্গে ওরা চলে এলো বাড়ির পেছনে। পানি ঢেলে নিভিয়ে দেওয়া চুলা আবার ধরিয়ে ওদের সবার জন্য বসার ব্যবস্থা করে সে খাবার প্রস্তুত করতে করতে টুকটাক কথা বলল। তারপর খাবার হয়ে গেলে খেতে বসল সবাই গোল হয়ে। ওদের চারপাশে কুকুরগুলোও বসে আছে। ভুট্টার আটার মোটা রুটি আর আঠালো ঝোলের মতো কিছু একটা খেতে দিল ওদের সে। ঝোলের মতো জিনিসটার ভেতরে নানা সবজি আর মুরগির মাংস দেওয়া অনেকটা স্যুপের মতো। ‘কর্নেল বলো তো এইটা কি খাইতে দিলাম তোমারে?’

কর্নেল ঘ্রাণ নিয়ে ঠিক ধরতে পারল না। কর্নেলের মনে পড়ল ফৌজে থাকার সময়ে তো বটেই সবসময়ই পালোয়ানের খাবারের প্রতি নেশা ছিল সেইরকম। সত্যি কথা বলতে গেলে দুনিয়াতে তার দুইটা নেশা, খাওয়া আর মারামারি করা। দুটোই অবশ্য সে খুব ভালো পারে। ‘বুঝতে পারছি না তো,’ সে এক চুমুক দিয়ে বলে উঠল, ‘খেতে তো মজা।’

‘হা হা, মজা তো হবেই, আমি নিজে বানিয়েছি,’ বলে সে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘তোমরা ইংরেজরা কী যে আলবাল খাও, তোমগো খাওয়া দেখলে আমার হাসি পাইত। এরপর একদিন ম্যাডাম, জেনি খাওয়াইলো, সুপ না কি যেন—’

‘স্টু, চিকেন স্টু,’ কর্নেল বলে উঠল।

‘হয় হয় ওইটাই, খাইয়া পাগল হয় গেলাম। এরপর যখন বাড়ি ফিরা আসলাম, নিজে বহুং চেঁটা করছি অয় নাই। এরপর আমার এইখানে একটা পোলা আইল কাম করতে ওই উত্তরের পাহাড়ের দেশ থেইকা, ও খাওয়াইল থুকপা। এইবার থুকপা আর সেই ইস্টু মিলায়া বানাইলাম এইডা। গত আট বছর প্রতিদিন খাই সকালে,’ বলে সে বিরাট এক চুমুক দিল নিজের বিরাট বালতির মতো আকারের বাটিতে।

‘আমি চলে যাওয়ার পরে তুমি কৌজ ছেড়ে গ্রামে চলে আসো, তাই না?’ কর্নেল খেতে খেতে জানতে চাইল। ‘বিগত বছরগুলো কেমন গেছে তোমার?’

‘ভালোই আছি কর্নেল, গ্রামে চলে আইসা দেখি পরিবারের তেমন কেউই নাই, গ্রামে অভাব, মানুষে ভাত পায় না, অত্যাচার ডাকাতি। নিজের গ্রামের মানুষের জন্য কাম করা শুরু করলাম। প্রথমেই দেখলাম সব সমস্যার মূলে পানি, কঠিন পরিশ্রম করতে পারে এমন পোলাপান এক কইরা গ্রামে অনেকগুলো কুয়া বানাইলাম

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

পুকুর দিলাম, খাল খুদলাম, পানির ব্যবস্থা করতেই পার হয়া গেল কয়েক বছর—
এরপর মনোযোগ দিলাম ফসল আর খামার করতে। আশপাশের দশ ক্রোশের
ভেতরে আমগো গ্রাম এখন সবচেয়ে দাবলম্বী। পানি আছে, ফসল হয় ভালো, গরু,
ছাগল, মুরগির ভালো মজুদ আছে। একটা লাঠিয়াল বাহিনীও আছে, কাজেই
ডাকাইত আর এগুলার ভয়ও কম। আমি আমার গ্রাম ভালোই আছে,' বলে সে ঢক
ঢক করে তার বালতি আকারের পাত্রটা গলায় ঢেলে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে জানতে
চাইল, 'এবার কও কর্নেল তোমরা এইখানে ক্যান, কি কাম তোমার? তুমি অনেক
ওকায়্যা গেছ কর্নেল, গত দশ বছর তুমি ভালো ছিলা না দেখলেই কইতে পারি। তয়
আগের চায়াও তুমি শক্তিশালী অইছো। হা-হা।'

'সেই কৃষ্টি আমি এখনো রোজ করি,' বলে হেসে উঠে খাবারের পাত্র নামিয়ে
রেখে কর্নেল পাইপ বের করে ধরাতে ধরাতে বলে উঠল, 'পালোয়ান, আমি একটা
বিশেষ কাজে ভারতে আসছি। আমি ভারতে একজনরে খুঁজতে আসছি। এই
কাজেই তোমার সাহায্য প্রয়োজন।'

'কর্নেল, তুমি এই ভারতে আর কোনোদিন ফিরা আসবা আমি ভাবি নাই,'
পালোয়ান তার ছোট রান্নাঘরের তাক থেকে বিরাট একটা পানের বাটা নামিয়ে
সেটা থেকে পান সাজিয়ে নিজের মুখে পুরে, বাটা এগিয়ে দিল অন্যদের দিকে।
তারপর বাঁশের চোঙের মতো বিরাট একটা মশালের মতো বের করে সেটার এক
মাথায় আগুন ধরিয়ে চিমনির মতো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অন্যদের দিকে দেখল।
সবাই বুঝতে পারল এই বাঁশের চোঙের মতো বিরাট জিনিসটা আসলে তার তামাক
খাওয়ার হুকো। এরকম হুকো এর আগে কেউ দেখেছে বলে মনে হয় না। গলগল
করে সে বেশ কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছেড়ে কর্নেলের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'সেই তুমি
ভারতে ফিরা আসলা এমন এক সময়ের যখন পুরা ভারতে আগুন জ্বলতাকে। এইটা
কেমন কথা? কে সে লোক যারে খুঁজতে আসছো তুমি?'

কর্নেল তাকিয়ে রয়েছে পালোয়ানের দিকে। এই লোকটার যে-ব্যাপারটা তার
ভালো লাগে, পালোয়ান লোকটা গায়ের শক্তিতে দানবীয় হলেও বেশ বুদ্ধিমান সে।
সাধারণত অতিরিক্ত শক্তি যাদের, এদের ভেতরে বুদ্ধিমত্তার অভাব থাকে।
পালোয়ান এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। 'ভিক্টরের কথা মনে আছে তোমার? আমার বন্ধু
ভিক্টর?'

'মনে আছে, জয়সলমিরের মুরাতে আমরা তিনজনে উটপাখি ধরতে
গেছিলাম। ভয়ংকর শিকার অভিযান ছিল সেইটা, তুমি আমি আর এই তোমার
বন্ধু। অসম্ভব সাহসী এবং বুদ্ধিমান মানুষ। আমার দেখা সবচেয়ে সাহসী এবং
বুদ্ধিমান মানুষ তুমি কর্নেল। তোমার এই বন্ধু ক্ষেত্রবিশেষে তোমার চাইতেও
বেশি,' বলে সে আনমনে মাথা নাড়ল। 'ব্রিটিশ সরকার কি হেরে নিয়া বিপদে
পড়ছে?'

সিপাহী

আবারো এই লোকটার বুদ্ধির প্রশংসা করল কর্নেল মনে মনে। 'ঠিক, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে কোম্পানির, সরকার এবং তার নিজের জন্যও।'

কর্নেলের শেষ কথা শুনে জোরে হেসে উঠল পালোয়ান। 'কোম্পানি তার নিজের ছাড়া আর কারো চিন্তা করে নাকি, এমনকি তোমাগো ইংরেজ শাসনের পরোয়া করে না ওরা। আর ভিক্টর সাব নিজের লাইগা বিপজ্জনক কি না—সেইটা ওরা ভাবব না। নিশ্চয়ই হেরে নিয়া কোনো ঝামেলায় পড়ছে হেরা যেইটা সামলাইতে পরতাছে না, বা সামলানির ক্ষমতা নাই তাগো, এই জন্য তোমাতে ডাইকা আনছে, কারণ হেনে তুমি ছাড়া এই রাতে আর কেউ পাকরাইতে পারব না।'

কর্নেল অবাক হয়ে অনুধাবন করল, লোকটা একেবারে পয়েন্টে পয়েন্টে কথা বলছে এবং ঠিক তার মনের কথা। কর্নেল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই পালোয়ান বলে উঠল, 'কিন্তু আমার প্রশ্ন হইল, তুমি কেন আসলা ভারতে, তুমি তারে কেন খুঁইজা বাইর করতে চাও?' পালোয়ান তাকিয়ে রয়েছে কর্নেলের দিকে। কর্নেলও কিছু না বলে তাকিয়ে রইল তার দিকে। দুজনেই নীরবে ধোঁয়া উদ্গীরণ করছে।

'কিছু না বুঝেও বুঝতে পারছি,' বলে সে তার ধোঁয়ার হুকোতে আরেকটা টান দিয়ে সাগরকলার মতো মোটা তার তর্জনি তুলে বলে উঠল, 'তারে খুঁইজা বের করতে হইলে তোমার একজন মানুষের লাগব। ত্রিলোক, ত্রিলোক কুমার দেব।'

কর্নেল আনমনে মাথা নেড়ে সায় জানাল। 'তোমার সঙ্গে দেখা করার পরই আমার ত্রিলোকের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল। আমি জানি ভারতের এই অংশ থেকে কাউকে খুঁজে বের করতে হলে ত্রিলোক ছাড়া উপায় নেই। প্রশ্ন হলো তাকে আমি পাব কোথায়?'

'ভুল প্রশ্ন কর্নেল, তারে কই পাবা সেইটা গুরুত্বপূর্ণ না,' পালোয়ান খানিক চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে উঠল। 'তারে আদৌ পাবা কি না সেইটা হইল প্রশ্ন।'

'কারণ কি?'

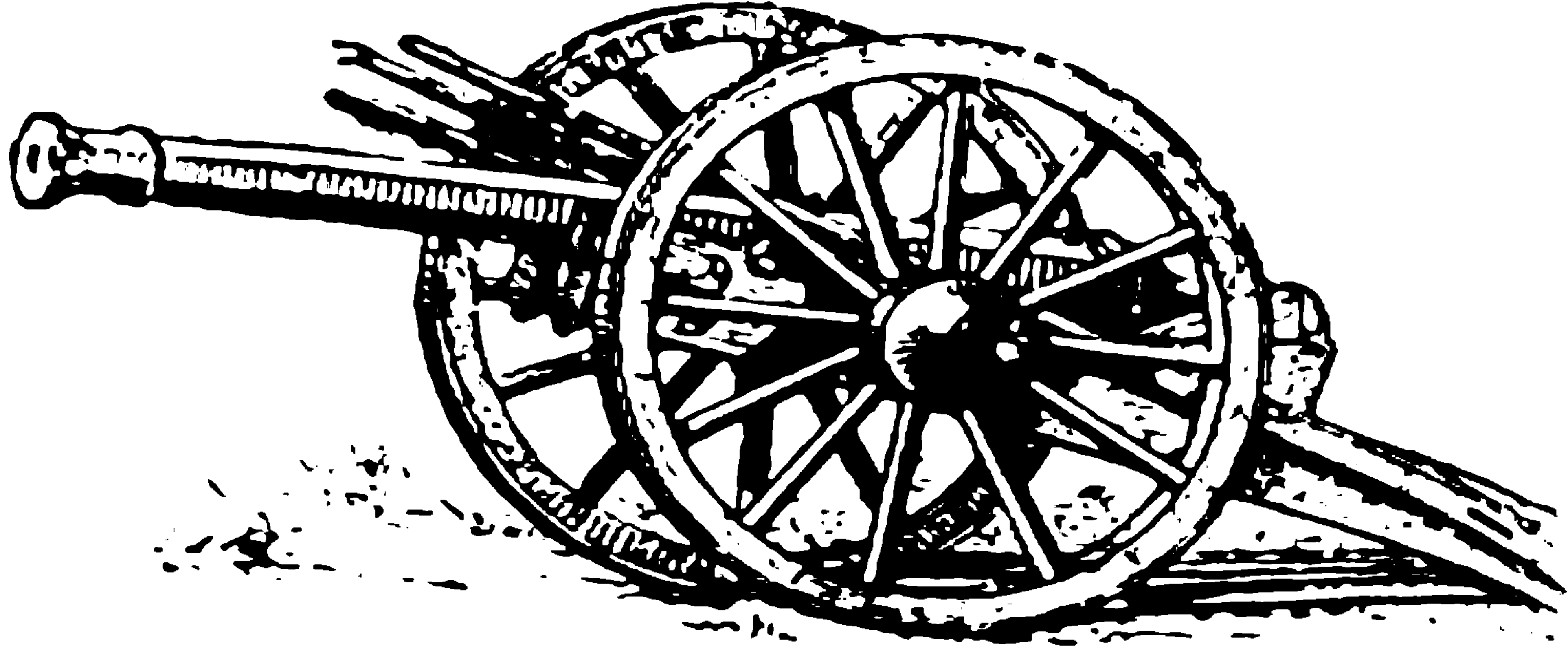
'তুমি ভারত ছাড়ার পর আমি যেমন ফৌজ ছাইড়া গ্রামে আইসা বসবাস করা শুরু করলাম, ঠিক একইভাবে ত্রিলোকও ফৌজ ছাইড়া দেয়। সে তার এলাকা মিরাতে কিয়া গিয়া, সংসারি হয়, নিজের ব্যবসা খুলে। ভালোই ছিল, এই বিদ্রোহের আগুন লাগার আগ পর্যন্ত। এই এলাকাতে দিল্লির পরে সবচেয়ে অবস্থা ভয়াবহ মিরাতে। আইজ খেইকা সাতদিন আগে আমি তার খোঁজে লোক

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

পট্টাইল্লিাম, ফিরতি বার্তায় সে আমারে জানায়, সে যেকোনো সময়ে পরিবারসহ শহর থেকে পলানির পরিকল্পনা করতাকে। কারণ তার ব্যবসা এবং পরিবারের ওপরে হামলা হইতে পারে যেকোনো সময়ে। এইটা পাঁচ দিন আগের ঘটনা।

‘তাহলে ত্রিলোককে পেতে হলে আমাদের দ্রুত তার ওখানে যেতে হবে,’ কর্নেল তাড়া দিয়ে বলে উঠল। ‘এখন ভোরবেলা, আমার হিসেব বলে আমরা দ্রুত এগোলে সঙ্গে বা রাতের সায়াফে মিরাতে পৌছে যেতে পারি। কি বলো?’ যাবে তো নাকি আমাদের সঙ্গে?’ কর্নেল জ্র কুঁচকে জানতে চাইল।

‘তুমি কর্নেল আমারে নরকে যাইতে কইলে আমি তাও যাইতে রাজি, আর এত নিজের প্রিয় মানুষের সঙ্গে দেখা করতে যাব,’ বলে পালোয়ান খল খল করে হেসে উঠল। ‘এই চলো সবাই সবাই, জলদি যাইতে হবে।’ পিটার সোলেমান সবাই দাঁড়িয়ে গেছে যাওয়ার জন্য। কর্নেল খুশি হয়ে উঠল, তবে মনে মনে সে ভবছে দ্রুত গেলেও কি আদৌ কাজ হবে। এমনিতেই এক অসম্ভব সম্ভব করতে নেমেছে সে। তার ওপরে ত্রিলোককে না পেলে কাজ অসম্ভব হয়ে যাবে।



অধ্যায় উনত্রিশ
বর্তমান সময়
কাঁচিঝুলি ও জয়নাল আবেদীন পার্কে মাঝামাঝি,
ময়মনসিংহ শহর

‘এই ঠিক করে বল তুই এখানে কী করতাহোস?’ ইনসপেক্টর রবিউল এগিয়ে এতে পিস্তল দিয়ে একটা খোঁচা মারল ছেলেটার কাঁধে।

‘এক মিনিট,’ বাশার নিজের পিস্তল নামিয়ে অন্যদেরও পিস্তল নামানোর ইশারা করল। ‘ওর সঙ্গে শান্ত হয়ে কথা বলতে হবে আমাদের। এই তুমি এখানে কী করছো, আগেই বলো। হাসপাতালে কী হয়েছিল?’

‘স্যার, আমি আসলে কী বলব বুঝতে পারছি না,’ ছেলেটার চোখ-মুখ চেহারা এমন বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে বলার বাইরে।

‘বাশার, একে আগে শান্ত করা দরকার, আমাদের নিজেদেরই শান্ত হওয়া দরকার,’ সামিরা শান্ত গলায় বলে উঠল। তার কথা শুনে অবাকই হলো বাশার। ও ভেবেছিল এই মেয়ে সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠবে, কিন্তু ওই সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা রয়েছে।

‘তোমার সঙ্গে কেউ রয়েছে?’ বাশার আশপাশে দেখে নিল একবার। দুয়েকজন অতি উৎসাহী পথচারী ছাড়া আর কেউ নেই আশপাশে।

ছেলেটা কথা বলার জন্য দুইবার মুখ খুলেও আবার বন্ধ করে ফেলল, দুই পাশে মাথা নেড়ে সে জানাল কেউ নেই। বাশার তাকিয়ে দেখল ছেলেটার কাঁধের ব্যান্ডেজ থেকে রক্ত পড়ছে। ‘আমি যা বলি মনোযোগ দিয়ে শোনো সবাই। আমরা প্রথমে এই ছেলেটারে কাছের কোনো ডিসপেন্সারি বা লোকাল কোনো ডাক্তারের চেয়ারে নেব। আমার ধারণা কাঁচিঝুলি মোড়েই পাওয়া যাবে। একে ঠিকঠাক করে, ফ্রেশ করে কাপড় বদলাতে দিতে হবে। এরপর আমরা কোথাও বসে শান্ত হয়ে কথা বলব। ‘আর তুমি,’ বলে সে ছেলেটার দিকে দেখিয়ে বলে উঠল, ‘তোমার সঙ্গে

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

সিরিয়াস কথা আছে আমার। কঠিন কিছু ব্যাখ্যা দিতে হবে তোমার। ঠিকঠাক ব্যাখ্যা দিতে না পারলে খবর আছে। সবাই জিপে ওঠো।’

সবাই এগোতে শুরু করতেই ও ইনসপেক্টরকে ডেকে নিয়ে রবিউলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘আপাতত ওকে খুঁজে পাওয়ার খবর অফিসিয়াল করার প্রয়োজন নেই। চলো সবাই।’

মিনিট চল্লিশেক পর ওরা সবাই বসে আছে সেই পাখি ভাইয়ের হোটেলের পেছনের অংশে। এই অংশটা হোটেল থেকে খানিক আড়াল করা। প্রায় ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে টেবিলের ঠিক মাঝখানে মাথা নিচু করে বসে থাকা ছেলেটার দিকে তাকাল বাশার। তার ব্যাভেজ্ঞ বদলানো হয়েছে। মুখ-হাত-পা ধোয়ার ব্যবস্থা করে নতুন একটা শার্ট পরতে দেওয়া হয়েছে। এখন খানিক পরিচ্ছন্ন এবং ফ্রেশ লাগছে তাকে দেখতে। কিন্তু চেহারা আর চোখে-মুখে তার একইরকম বিহ্বল ভাব। পরোটা আর ভাজি দেওয়া হয়েছিল, খুব সামান্যই খেয়েছে সে, চায়ের কাপ সামনে নিয়ে বসে আছে। তাকিয়ে রয়েছে সামনের দিকে কিন্তু কিছু দেখছে বলে মনে হচ্ছে না ওদের কাছে।

বাশার ছেলেটার দিকে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সামিরার দিকে তাকাল, সামিরা অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল, বাশার রমিজ দারোগা আর রবিউলের দিকে একবার করে দেখে নিয়ে ছেলেটার দিকে ফিরে তাকাল। ‘তোমার নাম কি যেন বলেছিলে, রুশো তাই না?’ ছেলেটা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। ‘শোনো রুশো, আমরা বুঝতে পারছি তোমার ওপর দিয়ে কী ধরনের ঝড় বয়ে গেছে এবং যে সেন্স অব ইনসিকিউরিটির ভেতর দিয়ে তুমি গেছো সেটা বোঝাও অসাধ্য নয়। কিন্তু তোমাকে কথা বলতে হবে এবং পরিষ্কারভাবে বলতে হবে। প্রথমে বলো গতকাল ওখানে হয়েছিল কি? যদিও আমরা মোটামুটি জানি। কিন্তু তোমার মুখ থেকে যতটা সম্ভব বিস্তারিত বলবে।’

ছেলেটা প্রথমে একটা দ্বিধা করলেও একবার বলতে শুরু করার পর গড়গড় করে বলে গেল। ছেলেটার বলা শেষ হলে সে মন থেকেই প্রশংসার সুরে বলে উঠল, ‘তুমি যথেষ্ট সাহস এবং বুদ্ধিমত্তা দেখিয়েছো। হাসপাতালে নেওয়ার পর কি হলো?’

রাতের বেলা হাসপাতালে নেওয়ার পর যা যা হয়েছে বলে গেল ছেলেটা, ইনসপেক্টর রবিউলের দিকে তাকিয়ে বাশার মাথা নাড়ল। ছেলেটা যা করছে সেটা নার্সের ব্যানার সঙ্গে মিলে গেছে পুরোপুরি। ‘এরপর সকালে এমন কি হলো যে তোমাকে হাসপাতাল ছেড়ে পালাতে হলো?’ প্রশ্নটা সরাসরি এভাবে করাটা ঠিক হলো কি না বাশার ঠিক বুঝতে পারছে না। কারণ ওরা এখনো পুরোপুরি নিশ্চিতভাবে জানে না যে ছেলেটা আদৌ পালিয়েছিল নাকি অন্য কিছু হয়েছিল।

সিপাহী

‘স্যার, আমাকে অপহরণের চেষ্টা হয়েছিল,’ ছেলেটা এতক্ষণ মাথা নিচু করে কথা বলছিল, বাশার প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাশারের দিকে চোখ তুলে তাকাল। ‘আমি কি করব?’ ছেলেটা এবার অন্যদের দিকে দেখল। ‘আমি কি করব বলেন, আগের দিন রাতে গুলি খেলাম, রিকাত ম্যাডামকে ধরে নিয়ে গেল, পরের দিন আমার মনে হচ্ছিল যারা আমাকে পাহারায় রেখেছে তারা বিষয়টা গায়েই লাগাচ্ছে না, অন্যদিকে আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমার ওপরে কেউ না কেউ নজর রাখছে। ঠিকই পুলিশ যারা পাহারা দিচ্ছিল, ওরা বেরিয়ে যেতেই আমি প্রথমে দেখলাম, কে জানি একবার কেবিনের দরজা দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হচ্ছিল খারাপ কিছু হবে। আমি কোনোমতে হাতে লাগানো নল-টল খুলে জিনিসপত্র ফেলে পুরনো জানালাটার খিল বাঁকিয়ে কার্নিশে গিয়ে দাঁড়লাম, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতরে কয়েকজন ঢুকল।’

‘তুমি কার্নিশের দাঁড়িয়ে ছিলে, ওরা কামরায় ঢুকল, কিন্তু তুমি কই আছো টের পেল না?’ ইনসপেক্টর রবিউল রাগের সঙ্গে বলে উঠল। ‘আর তুমি আহত অসুস্থ শরীর দিয়ে একহাতে খিল বাঁকিয়ে ওখানে গেলে কীভাবে?’

‘খিলটা আলগা ছিল, আমি দেখেছি,’ বাশার বলে উঠল। ‘কিন্তু তুমি কাউকে ডাকলে না, বা ওরাও টের পেল না তুমি কাছাকাছির ভেতরে রয়েছে?’ বাশার ভ্রু কঁচকে জানতে চাইল।

‘আসলে ওরা সময় পায়নি, ওরা ঢোকার একটু পরেই বাইরে শব্দ হয় এবং মনে হয় আমার দায়িত্বে ছিল যে নার্স সেও কিছু একটা সন্দেহ করছিল। তাই ওরা ভেতরে ঢুকে ভালোভাবে সার্চ করার আগেই সরে পড়তে বাধ্য হয়।’

‘এরপর তুমি কি করো?’ এবার সামিরা জানতে চাইল।

‘আমি ওখানে ছিলাম কিছুক্ষণ, লোকগুলো চলে যেতেই রুমে এসে দেখি কেউ নেই, আমি রুম থেকে চট করে বের হয়ে প্রথমে বাথরুমে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকি, এরপরে সুযোগ বুঝে হাসপাতালের বেঞ্চে কাপড় মুড়ি দিয়ে বসেছিলাম। কী করব, কাকে বিশ্বাস করব, কোথায় যাব বুঝতে পারছিলাম না। এমন সময় আপনাকে দেখি, হাসপাতালে ঢুকতে,’ শেষ কথাটা সে বাশারকে উদ্দেশ্য করে বলেছে।

‘তুমি আমাকে চিনলে কীভাবে?’

‘আমি রিকাত ম্যাডামের সঙ্গে কাজ করতাম, আপনার এবং আপনাদের অন্তত কয়েক হাজার ছবি দেখেছি আমি, আর ম্যাডামের কাছে আপনার কথা এত অনেক, দেখামাত্র চিনতে সমস্যা হয়নি।’

‘যদি চিনলেই তবে তখন এগিয়ে এলে না কেন,’ বাশার ঠান্ডা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মুখ বাঁকিয়ে ফেলল। ‘এরকম লুকোচুরি করার কারণ কি?’

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

স্যার, আমি আসলে ভরসা করতে পারছিলাম না কারো ওপরে, বিশেষ করে পুলিশের কারো ওপরে,' বলে সে আড়চোখে একবার ইনসপেক্টর রবিউলকে দেখল তারপর গলা নিচু করে যোগ করল। 'হাসপাতালে আপনাদের যখন দেখলাম আপনারা বের হচ্ছেন, একটা টমটম নিয়ে আপনাদের জিপের পিছু নিয়ে চলে জুসি। এখানে আপনারা খেতে বসেন, আমি আড়াল থেকে নজর রাখছিলাম, ভেবেছিলাম একবার পুলিশ কিংবা অন্যদের থেকে দূরে সরলেই গিয়ে কথা বলব। এরপর আপনারা বের হলে, পার্কের দিকে রওনা দিলাম, বাকিটা তো জানেন,' গলা নিচু করে বলে উঠল সে।

'তোমার পরিবারের কে আছে?' বাশার জানতে চাইল। 'ফোন নম্বর দাও, আমি কথা বলে আসতে বলি, আর তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করছি আমি, তবে অরেকবার আমি বিস্তারিত শুনব—'

স্যার, আমি আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই,' সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল ছেলেটা। 'রিফাত ম্যাডাম আমার বড় বোনের মতো ছিল, তাকে এভাবে আমার সামনে থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেল, আমি ব্যাপারটা কিছুতেই মানতে পারছি না,' বলে সে ছল ছল চোখে বাশারের দিকে দেখল। 'স্যার, আপনি আমার পরিবারের লোকজনের কথা বলছিলেন, আমি এতিমখানায় বড় হওয়া ছেলে, দ্বীর্ঘনেও কারো ভালোবাসা পাইনি। বাবা-মা, ভাই-বোনের আদর পাইনি, এই মানুষটার আগ পর্যন্ত,' ছেলেটার চোখ ছলছল করছে। 'সেই মানুষটাকে আমার সামনে থেকে নিয়ে গেল, কিছুই করতে পারলাম না। আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে চাই।'

'দেখো ভূমি—'

স্যার, আপনি বলছিলেন না গতকাল কী ঘটেছে, আমি শুধু বলা না, একেবারে স্পটে গিয়ে দেখিয়ে দিতে পারব কীভাবে কী হয়েছে। আমি একজন প্রফেশনাল আর্কিওলজিস্ট, আমি জানি না, রিফাত আপু কেন অপহৃত হয়েছে, এর সঙ্গে আদৌ আর্কিওলজির কোনো সংযোগ আছে কি না, কিন্তু যদি থেকে থাকে আপনাদের তো একজন প্রফেশনাল আর্কিওলজিস্টের হেল্প বা সাপোর্ট লাগবেই, কাজেই আমি সেই সাপোর্ট দিতে পারব। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমি আপনাদের সঙ্গে থাকলেই বেশি নিরাপদ বোধ করব।'

বাশার কিছু না বলে চুপচাপ ভাবছে। এমনিতেও সে ফোর্সের ওপরে ভরসা বা বিশ্বাস কোনোটাই রাখতে পারছে না। অন্যদিকে, ও একদিকে চাচ্ছিল নিজের মানুষদের নিয়ে একটা বিশ্বস্ত দলের মতো করতে, তার ওপরে ও কেসটা শুরু করতে চাচ্ছিল রুশো ছেলেটার সঙ্গে কথা বলেই। আর এটাও ও ভাবছে যে আর্কিওলজি বিষয়ে কোনো সাহায্য লাগলে ছেলেটা হেল্প করতে পারবে ওদের। বাশার ইনসপেক্টর রবিউলের দিকে দেখল, রবিউল মাথা নেড়ে মানা করছে,

সিপাহী

বাশার কিছু বলার আগেই সামিরা কথা বলে উঠল, 'আমার মনে হয় ও আমাদের সঙ্গে থাকতে পারে,' বলে সে অন্যদের দিকে দেখল।

বাশার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ছোট আলাদা করা কামরাটার কাপড় সরিয়ে কেউ একজন বলে উঠল, 'আমি রমিজ স্যার, আর বাশার স্যারকে খুঁজতেছি।'

গলাটা শুনে সবাই সেদিকে তাকিয়ে দেখল পাঞ্জাবি পরা সুন্দর একটা ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে, মুখে চাপ দাঁড়ি থাকার পরও তার চেহারা থেকে বাচ্চাসুলভ ভাবটা পুরোপুরি কাটেনি, অত্যন্ত শিশুসুলভ এবং মায়াবী চোখ তার।

'আবদুল্লাহ,' বলে উঠে দাঁড়াল বাশার। বাশারকে দেখে চেজারে একটা স্যান্ডিট হুকতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু তার আগেই তাকে জড়িয়ে ধরল বাশার। 'ভালো আছো তুমি?'

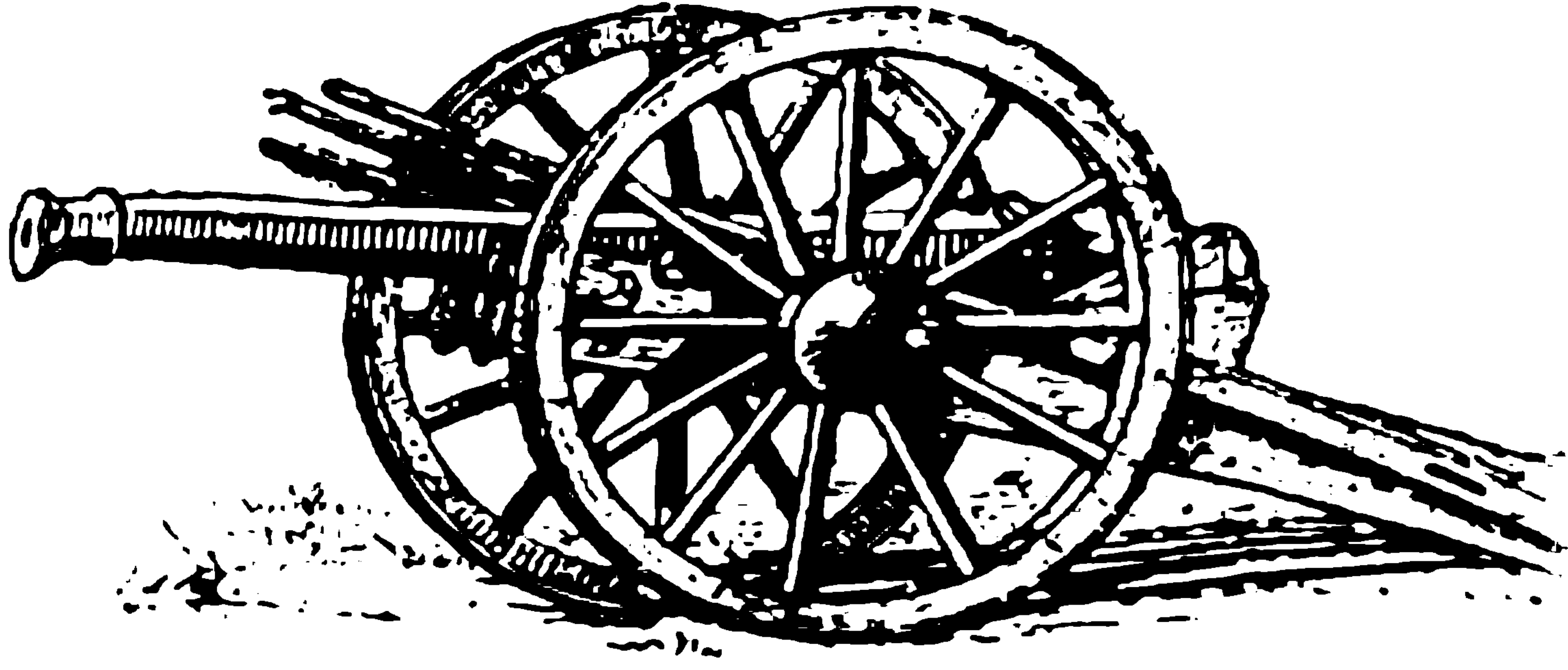
'জি, স্যার,' বলে সে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে অন্যদের দেখল। বাশার হেসে উঠল তার আচরণ থেকে ছেলেটার বয়স যত তারচেয়ে অনেক কম দেখায়, তাই আগে গৌফ রেখে সে একটু বড় ভাব ধরার চেষ্টা করত, এখন দাড়ি রেখে সেই বার্থ চোট চানিয়ে যাচ্ছে সে, কনস্টেবল হিসেবে জয়েন করে প্রমোশন পেয়েছে, বিয়ে করেছে কিন্তু চেহারা থেকে সেই ভাবটা যায়নি। 'তোমার বিয়ের খবর শুনে খুব খুশি হয়েছি আমি।'

'ধন্যবাদ স্যার, রমিজ স্যার বলল রিফাত ম্যাডাম নাকি কিডন্যাপ হয়েছেন, আপনার নাকি হেল্প দরকার?' কনস্টেবলের চোখে কৌতূহল।

'তা দরকার কিন্তু তোমার মাত্র বিয়ে হয়েছে—'

'স্যার, আমি হাজির। আমি এইখান থেইকাই আপনার সঙ্গে কাজে নামব,' বলে সে আবারো লাজুক হাসি দিল।

বাশার অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আমাদের দল তৈরি,' বলে সে নিজেই দেখাল তারপর সামিরার দিকে দেখিয়ে বলে উঠল, 'আমি, এই কেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার, পিবিআইএসের স্পেশাল উইংয়ের কমান্ডার, স্পেশাল অফিসার সামিরা, এক্সপার্ট ইনভেস্টিগেটর এবং ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন এক্সপার্ট। রমিজ ভাই পারসোনালি আমাদের হেল্প করবেন, কনস্টেবল আবদুল্লাহ,' বলে সে কনস্টেবলের দিকে তাকিয়ে উঠল, 'তোমাকে ছুটি থেকে ফিরিয়ে ডিউটিতে এই কেসে নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে, ইনসপেক্টর রবিউল, ফোর্স থেকে আমাদের কোম্পানিয়ন এবং সাপোর্ট, সেই সঙ্গে তুমি,' আর্কিওলজিস্ট ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল সে। 'রুশো, আমি আশা করব তুমি নিজেই প্রমাণ করতে পারবে। বিনিময়ে তোমার সিকিউরিটি আমার দায়িত্ব,' বলে সে সবার দিকে একবার দেখে নিয়ে যোগ করল। 'এবার কাজে নামব আমরা, পূর্ণ শক্তি নিয়ে।'



অধ্যায় ত্রিশ

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
মিরাত শহরের প্রান্তে, উত্তর ভারত

‘ব্যাপার কি, আমি তো ভেবেছিলাম দুনিয়ার মানুষ পাহারায় থাকবে শহরের দ্বারপ্রান্তে, এখানে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না,’ খানিক বিন্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল কর্নেল।

‘সেইটাই তো অবাক হইতাই,’ কর্নেলের পাশ থেকে পালোয়ান বলে উঠল।

‘এভাবে তো শহরে ঢোকাটাও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে,’ পিটার অনেকটা মন্তব্য করার মতো করে বলে উঠল। কর্নেল, পিটার, সোলেমান এবং পালোয়ান এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিরাত শহরের দ্বারপ্রান্তে। পালোয়ানের বাড়ি থেকে মোটামুটি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস এবং খাবার গুছিয়ে নিয়ে পালোয়ান তার বাড়ি আর খামারের দায়িত্ব গ্রামের নিজের মানুষদের বুঝিয়ে দিয়ে রওনা দিয়েছে খুব দ্রুতই। অস্ত্রশস্ত্র, ইত্যাদি তো ঠিক করাই ছিল—পালোয়ান শুধু নিজের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে নিয়েছে। বলবান নামে তার নিজের একটা ঘোড়া আছে, তার মতোই বিরাটাকা ঘোড়াটাই একমাত্র তাকে বহন করতে পারে। বলবানকে প্রস্তুত করে দিয়েছে তার খামারের ছেলেরা।

নিজের বিরাট লাঠিটা নিয়ে আর কুকুরগুলোকে নিয়ে সে প্রস্তুত। কুকুরগুলোকে নেওয়ার বিষয়ে অবশ্য কর্নেল ঠিক রাজি ছিল না, কিন্তু পালোয়ান ওদের ছাড়া যাবে না। কাজেই ওদের নিতেই হয়েছে। ওরা রওনা দেওয়ার পর দুই ঘণ্টা করে টানা চলে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়েছে, এরপর টানা দুই ঘণ্টা। এভাবে করে সন্দের পর মিরাতের কাছে বাজারে এসে থেমেছে ওরা এবং প্রথম ধাক্কাটা খেয়েছে সেখানেই। পুরো বাজার এলাকা খালি। সেখানে কেউই নেই। এরপর ঘোড়া আর রসদ ফটকের দায়িত্বে রেখে নিজেদের অস্ত্র আর সন্দের কুকুরগুলোকে নিয়ে ওরা এসে পড়েছে শহরের মূল ফটকের কাছে। ততোধিক অবাক হয়ে উপলব্ধি করেছে

সিপাহী

সেখানেও কেউই নেই। পিটার, কর্নেল এবং পালোয়ান যখন আলোচনা করে, সেই সময়ে সোলেমান কুকুরগুলোর সঙ্গে তাদের ঠিক পেছনেই বসে রয়েছে।

‘গোস্তাখি না নিলে একটা কথা বলি,’ হঠাৎ পেছন থেকে বলে উঠল সোলেমান। কর্নেল কিছু না বলে তাকে ইশারায় কথা বলার নির্দেশ দিল। কর্নেলের ইশারা পেয়ে পালোয়ানের একটা কুকুর নিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ‘হুজুর, আমি এখানে এইভাবে চুপচাপ বইসা থাকার পক্ষে না, আপনে অনুমতি দিলে আমি গুর নিয়ে,’ সে ইশারায় তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কুকুরটাকে দেখাল। ‘ফটকের সামনে যাইতে চাই।’

‘আমরা অন্যদিক দিয়ে চেষ্টা করে দেখব নাকি?’ পিটার বলে উঠল।

‘সেটা করতে পারলে ভালো হতো কিন্তু এখানকার পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, আমাদের দেরি করা উচিত হবে না। কারণ ফটক বা অন্য কোথাও কেউ না থাকলেও হঠাৎ খেয়াল করে দেখো, হালকা একটা গুল্লনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে ভেতর থেকে,’ বলে কর্নেল ভেতরের দিকে ইশারা করল। সবাই কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে, কর্নেল বলে উঠল, সোলেমান যাও, তবে সাবধান। সবাই প্রস্তুত হও।’

সোলেমান উঠে দাঁড়িয়ে নিজের শরীরের ওপরের অংশে প্যাঁচানো চাদরের মতো কাপড়ের টুকরোটা খুলে ওটাকে মাথাসহ প্যাঁচিয়ে ঢেকে ফেলল নিজের অস্ত্রসম্বল—তারপর কুকুরটাকে পাশে নিয়ে জোর কদমে এগিয়ে গেল শহরের মূল ফটকের দিকে। কর্নেল ইশারা করতেই বাকি সবাই প্রস্তুত হয়ে গেল। কর্নেল এক হাতে বের করে আনল পিস্তল, অন্য হাত তলোয়ারের বাঁটে, পালোয়ান ডান হাতে ধরে আছে বিরাট লাঠিটা, পিটারের হাতে বন্দুক। সবাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সামনের দিকে।

সোলেমান বীরদর্পে ফটকের দিকে এগিয়ে গিয়ে খোলা ফটকের ভেতরের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, সবাই টানটান হয়ে আছে। সোলেমানের কোনো সাহায্য প্রয়োজন হলেই তাকে সাহায্য করবে। সোলেমান কী ধরনের পরিস্থিতির সামনে পড়বে সেখানে কে জানে। সোলেমান একবার ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে ক্ষণিক ভেতরের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর এগিয়ে গিয়ে মেলে ধরল ফটকের দরজা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ের ওপরে ছিটকে এসে পড়ল একজন।

‘সর্বনাশ, ওকে সাহায্য করতে হবে,’ বলেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফটকের দিকে দৌড় দিল কর্নেল, প্রাণপণে দৌড়ে এগোচ্ছে সে, বাকিরা আসছে কি আসছে না, জানার কিংবা দেখার উপায় নেই। তবে পায়ের আওয়াজে সে বুঝতে পারছে তার সঙ্গে এগিয়ে আসছে অন্য সঙ্গীরা। অস্ত্রত পালোয়ানের পায়ের ধপ ধপ শব্দে

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

স্বাতিমতো ছোট ছোট ভূমিকম্প হচ্ছে মাটিতে। কিন্তু ফটকের দরজার কাছে পৌছে যা দেখল তারা, সেটা মোটেই আশা করেনি তারা।

সোলেমান বালুর ওপরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে, তার পাশে ঘেউ ঘেউ করছে কুকুরটা, ওরা আসতেই সেটার সঙ্গে যোগ দিল বাকি কুকুরগুলো। সোলেমানের কোলে পড়ে আছে শুকনো এক লোক, রক্তাক্ত চেহারা আর অবয়ব দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় লোকটা মৃত্যুশয্যা।

কর্নেল একবার ওদের দেখল তারপর ফিরে তাকাল আধখোলা ফটকের ভেতরের দিকে। তারা বাইরে থেকে শুধু শুনতে পেলেও ফটকের ভেতরে দেখার উপায় ছিল না, কিন্তু এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, ভেতরে জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বলছে, আগে শোনা শুধু এখানে মানুষের কোলাহলে রূপ নিয়েছে। ‘কি হচ্ছে সোলেমান এখানে?’

‘হুজুর, এই লোকটা,’ সোলেমান বলতে শুরু করার আগেই লোকটা একটা হেচকি তুলে মুখ থেকে এক ঝলক রক্ত ঝরিয়ে নেতিয়ে পড়ল। সোলেমান সাবধানে নামিয়ে রাখল মানুষটাকে পথের ধারে ঘাসের ওপরে। ‘হুজুর এই শহরে আগে বিদ্রোহীরা আত্মনা করছিল, তারপর বিগত পাঁচদিন ধইরা সেনারা ঘেরাও দিয়া রাখছে। অবশেষে আইজ সন্ধ্যায় সেনারা শহরে ঢোকা শুরু করতেই বিদ্রোহীগো লগে তাগো লড়াই বাইধা যায়। সম্মিলিত সেনাগো সামনে আইলে বিদ্রোহীরা টিকতেই পারে নাই এরপরে শুরু হয় খুনাখুনি আর লুটতরাজ।’

‘মানে কর্নেল আমার লোকেরা বার্তা নেওয়ার দিন বা পর দিনই শহর ঘেরাও হয়, ত্রিলোক সম্ভবত শহরের ভেতরেই আছে, এবং তার পরিবারের সাহায্য দরকার,’ বলে সে মাথার ওপরে বিরাট লাঠিটা দুইপাক ঘোরাল।

‘সাবধান, সবাই সাবধান থাকো, পাগলামি করা যাবে না,’ কর্নেল দ্রুত ভাবছে। ‘পালোয়ান, পিটার তোমরা আমার সঙ্গে আসো, আমরা ভেতরের দিকে এগোব, সোলেমান তুমি জলদি দৌড়ে গিয়ে বাজারের কাছ থেকে ঘোড়াগুলো নিয়ে আসো। ফটকের কাছে বাড়তি যে-ঘোড়াটা আছে সেটাসহ আনবা, আর ফটিককেও প্রস্তুত থাকতে বলবা,’ কর্নেলের কথা শেষ হওয়ার আগেই একবার মাথা নেড়ে দৌড় দিল সোলেমান। সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের দিয়ে ভেতরের দিকে এগোতে শুরু করল কর্নেল। ফটকের ভেতরে নরক গুলজার চলছে। লোকজন এদিকে-সেদিকে দৌড়াদৌড়ি করছে, এখানে সেখানে আগুন জ্বলছে।

‘পালোয়ান তুমি ত্রিলোকের বাড়ি চেন?’

‘জি, আমি দুই বছর আগে আসছিলাম, আশা করি ভুল হবে না,’ বলে সে সামনের দিকে এগোতে লাগল, তার পেছনে অন্যরা। ওরা দৌড়ে শ-খানেক গজ এগোনোর আগেই সামনে একটা দল দেখতে পেল, ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে,

সিপাহী

শত্রু-মিত্র বাছ-বিচারের উপায় নেই, আর এরা এভাবে এলে একেবারে গায়ের ওপরে এসে পড়বে, ওরা সরে গেল রাস্তার পাশে। ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, এরা কি বিদ্রোহী নাকি ইংরেজ সেনাবাহিনী—সেটা বোঝার উপায় নেই। 'কর্নেল এভাবে এগোতে গেলে তো আমরাই মারা পড়ব,' পিটার চিৎকার করে বলে উঠল।

'উপায় নেই খামা যাবে না—'

'হজুর, ও চলে এসেছে,' পালোয়ান চিৎকার করে উঠে বলতেই সবাই তাকিয়ে দেখল, একাধিক ঘোড়া ছুটিয়ে পুরো পথজুড়ে এগিয়ে আসছে সোলেমান। 'জলদি জলদি,' কর্নেল নিজের ঘোড়াতে লাফিয়ে উঠেই অন্যদের নিজেদের মতো ঘোড়ায় ওঠার সময় দিল, তারপর চিৎকার করে পালোয়ানকে বলল সামনের দিকে এগোতে। 'পালোয়ান তুমি পথ দেখাও, মনে রেখো বিদ্রোহী কিংবা সেনা, আমরা কারো পরোয়া করব না,' বলে সে নিজের তলোয়ার বের করে আনল টান দিয়ে। 'আমাদের লক্ষ্য ত্রিলোককে খুঁজে বের করে তাকে তার পরিবারসহ নিরাপদে উদ্ধার করা। যেকোনো মূল্যে আমরা সেটা করব। চলো চলো।'

'ইয়া ইলাহি,' বলে ঘোড়ায় বসে মাথার ওপরে নিজের লাঠিটা দুইবার দুইপাক ঘোরাল পালোয়ান। 'দেখি কে আটকায়!!' বলে সে নিজের ঘোড়ার পিঠে খোঁচা দিতেই সেটা লাফ দিয়ে আগে বাড়ল। বাকিরা অনুসরণ করতে শুরু করল তার। কর্নেল পালোয়ানের ঠিক পেছনে, তার ঠিক পেছনেই অন্য দুজন।

পালোয়ানের ঘোড়া এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে, অন্যরা জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করছে তার সঙ্গে তাল রাখার। খানিক এগিয়েই সামনে বাঁক নিল পালোয়ানের ঘোড়া। বাঁক ঘুরতেই সামনে দেখতে পেল খণ্ড যুদ্ধের মতো চলছে। ওদের এগোতে দেখে দুই পক্ষই চমকে উঠল, কিন্তু ওদের এসব দেখার সময় নেই, ঝড়ের বেগে দানবীয় গতিতে ওদের দিকে ধেয়ে গেল দৈত্যের মতো বিশালাকায় পালোয়ান এবং তার ঘোড়া। জান বাঁচাতে যে-যেদিকে পারল ছিটকে পড়ল যুদ্ধরত লোকেরা। পালোয়ানের ঘোড়া এগিয়ে যেতেই বাকিরা এগোল তার পিছু।

'হা-হা,' করে জোরে হেসে উঠল সোলেমান। 'এমনিতেই আগাইতে অইবো।' পথের পাশের একটা ছাউনি থেকে পুড়তে থাকা জ্বলন্ত কাঠের চেলা একটা তুলে নিয়ে মাথার ওপরে ঘোরাল সে। ওদের পথের সামনে একটা গরুর গাড়ি ভরা খড়ের ভূপ আলগোছে কেলে রাখা হয়েছে সম্ভবত রাস্তা আটকানোর জন্যই। পালোয়ান এমনকি দ্বিধাও করল না, ঘোড়ার পাছায় লাথি দিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেল ওটা। একে একে বাকিরা অনুসরণ করল তাকে। ওটার পরেই আরেকটা খালি গাড়ির মতো ছিল, ওটাও পার হয়ে গেল লাফিয়ে। ওটা পার হয়ে যেতেই চেলা কাঠের জ্বলন্ত অংশটা ছুড়ে দিল খড়ের গাদাটার ওপরে। শুকনো খড়ের আগুন ধরে গেল ওদের যদি কেউ ধাওয়া করার চেষ্টাও করে, আর পারবে না, অস্ত্র এদিক থেকে না।

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

সকল গলিটা পার হয়ে দুই রাস্তার মোড়ের কাছে এসে থেমে গেল পালোয়ানের ঘোড়া, রাস্তা দুটোকে একবার দেখে নিয়ে সে চিৎকার করে বলল, ‘এদিকে,’ আবারো ঘোড়া ছোটাল সে। শ পাঁচেক গজের মতো এগিয়ে অন্ধকার গলির ভেতরের অংশে একটা লাল রঙের পোড়া মাটির দরজার সামনে গিয়ে থেমে গেল সে। ‘এইটাই, হুজুর,’ বলে লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নামল সে, অন্যদের নামার ইশারা করে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল কর্নেল।

‘সবাই জলদি চলো, পালোয়ান তুমি নিশ্চিত তো এই বাড়িই?’

মাথা নেড়ে সায়েজ জানিয়ে দরজায় করাঘাত করতে যাবে, আলগোছে খুলে গেল দরজাটা। অবাক হয়ে একে একে ভেতরে পা রাখল সবাই। বাড়ির ভেতরে একেবারে সুনসান নীরবতা, বাইরের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ আর আগুয়াজ থেকে হঠাৎ ভেতরে ঢুকতেই ওদের মনে হতে লাগল ভীষণ এই নীরবতা যেন কানে পীড়া দেয়। কবরের নীরবতাও কি এমনই হবে, কিছু না হতেই কেন জানি গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল কর্নেলের। আলগোছে হাতে বের করে আনল সে পিস্তলটা। বাড়ির ছোট সদর দরজাটা পার হয়ে ওরা পা রাখল বাড়ির আঙিনার ভেতরে।

‘ব্যাপার কি! বাড়িতে তো কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না,’ আনমনেই বলে উঠল কর্নেল। বলেই সে ইশারায় সোলেমান আর পালোয়ানকে ইশারায় বাড়ির ভেতরে দেখতে বলল।

‘আমরা কি দেরি করে ফেললাম?’ কর্নেলের পাশ থেকে পিটার বলে উঠল।

‘দেখা যাক,’ কর্নেল অস্থির না হয়ে শান্ত সুরেই বলল। যেটা ভবিষ্য সেটা মনে নিয়েই সামনের পরিকল্পনা করতে হবে। এতক্ষণ তার মাথার ভেতরে খেলছিল কীভাবে ত্রিলোককে পরিবারসহ এই নরককুণ্ড শহর থেকে বের করে নিয়ে যাবে, এখন ভিন্ন কিছু খেলতে শুরু করেছে। ‘কিছু পেল?’

সোলেমান আর পালোয়ান, দুজনেই বেরিয়ে এসেছে বাড়ির ভেতর থেকে, ছোট বাড়ি, দেখতে কতক্ষণই বা আর লাগে। ‘না, হুজুর, কাউকেই তো দেখলাম না।’

‘আমরা কি দেরি করে ফেলছি?’ সোলেমান অনমনে বলে উঠল, তার মনেও পিটার এবং অন্যদের মতো একই কথা ঘুরছে।

‘কিন্তু কথা হইল, হিসাব বলে আমার লোক যেদিন আসছিল, ওই দিনই বা তার পরের দিনই শহর বন্ধ হয়,’ পালোয়ান চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে উঠল। সে মনে মনে হিসেব করছে। ‘তাইলে হেরা গেল কবে?’ প্রশ্নটা সে উচ্চারণ করেছে তার সবচেয়ে বড় সাদা রঙের কুকুর বাতেনের দিকে তাকিয়ে। পালোয়ান প্রশ্নটা উচ্চারণ করতেই বাতেন ঘেউ ঘেউ করে উঠল। সে অস্থির হয়ে নড়াচড়া করছে।

‘এবার তাহলে আমাদের পরিকল্পনা—’

পিটার করণীয় ঠিক করতে চাচ্ছিল, কর্নেল এক হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল। 'এক মিনিট—'

'হুজুর—'

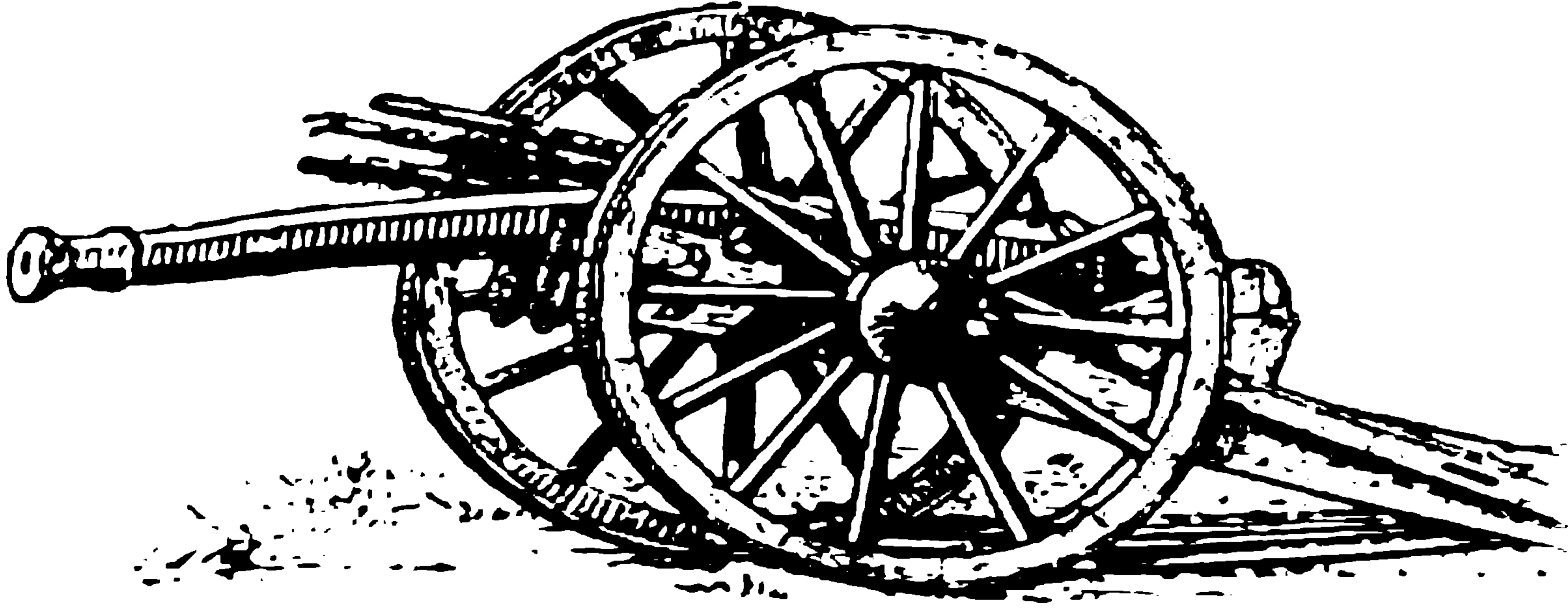
'চুপ,' বলে পালোয়ানের কুকুরটার দিকে ইশারা করল। 'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছে,' বাইরে এত গুগুগোল কিন্তু ভেতরে অস্বাভাবিক নীরবতা এবং,' বলে সে কুকুরটার দিকে একটা আঙুল তুলতেই পালোয়ান ওটাকে ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা আঙিনার কোনো দিকে উঁচু কিছু একটার সামনে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। 'চলো,' বলেই কর্নেল আবারো পিস্তলটা বের করে এনে কুকুরটার পেছনে ছুটল। বাকিরাও অনুসরণ করল তাকে।

কুকুরটা মাটি লেপা ছোট গোল একটা বৃত্তের মতো হাতে বানানো আকৃতির সামনে গিয়ে ধেমে গেছে। ওটার মাটির পাড় ধরে ঘেউ ঘেউ করছে। 'ইদারা—'

কথাটা সোলেমান বললেও কর্নেল বুঝতে পারল জিনিসটা আসলে কি, স্থানীয় ভাষায় কুয়াকে ইদারা বলে। এসব অঞ্চলে পুকুর বা কুয়া অঞ্চলভিত্তিক বানানো হলেও, অনেকের বাড়িতে যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা নিজেরাও বাড়ির পেছনে ছোট ডোবা বা পুকুর কিংবা বাড়ির আঙিনার কোণে ছোট কুয়া খনন করে রাখে। এ-ধরনের অনেক কুয়াতেই সারা বছর পানি থাকে না, শুধু সিজনে পানি থাকে। কর্নেল কুয়াটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এ-ধরনের কুয়াতে সাধারণত দড়ি এবং বালতি লাগানো থাকে পানি টেনে তোলার জন্য, অনেক কুয়াতে কপিকল লাগানো পুলিও থাকে। এটাতে কিছুই নেই, কুয়ার কিনারাটাও শুকনো। কর্নেল পিস্তল খাপে রেখে, কুকুরটাকে টেনে সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিল।

'শাবাশ,' বলে সে মৃদু হেসে উঠে বলে উঠল। 'ত্রিলোক, উঠে এসো, আমি কর্নেল স্যার্স,' বলে অন্যদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করতেই তারা এগিয়ে এসে দেখল সিজনাল কুয়াটা শুকনো, এবং সেটার ভেতরে মোটা দড়ির জাল বিছিয়ে সেটার মধ্যে গুঁটিসুটি মেরে বসে আছে কয়েকজন মানুষ। সর্বাঙ্গে বর্শা হাতে দাঁড়ানো ভিত সজ্জা মানুষটা, যাকে তারা খুঁজতে এসেছে।

ত্রিলোক কুমারকে খুঁজে পেয়েছে ওরা।



অধ্যায় একত্রিশ বর্তমান সময় বেগুনবাড়ি, ময়মনসিংহ

জিপ থেকে নেমে গভীরভাবে একবার বুক ভরে দম নিল বাশার। শুকনো আবহাওয়া কিন্তু বাতাসে ভেজা ভেজা একটা ভাব। দিন মাত্র শুরু হতে চলেছে। ওয়েদার রিপোর্টে বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিলেও এখনো দিন একেবারে পরিষ্কার। জিপ থেকে নামতেই বাতাসের ভেজা ভাবটার জন্য সামান্য চিন্তিত বোধ করল বাশার।

বাশার সামিরা আর রুশো জিপ থেকে নেমে চারপাশটা জরিপ করছে ইনসপেক্টর রবিউল আগে চলে গেল তার দুই সঙ্গী নিয়ে। ‘মুক্তাগাছা থেকে সরিয়ে এখানে কেন এবং কখন আনা হয়েছে পাতাল মন্দিরের মূল পথটা?’ বাশার প্রশ্নটা করেছে রুশোকে লক্ষ্য করে।

এই জায়গা থেকেই অপহৃত হয়েছে রিফাত। পাতালের কালীমন্দিরের প্রবেশপথ ওরা আবিষ্কার করেছিল মুক্তাগাছা থেকে, এরপরে এটার মূল প্রবেশপথ সরিয়ে নিয়ে আসা হয় ময়মনসিংহের বেগুনবাড়ির কাছাকাছি। বাশার এখানে আগে কখনো আসেনি, তাই তার এই জিজ্ঞাসা। সত্যি কথা হলো সে মন্দিরটা আবিষ্কার করার পর ওই ঘটনার, মানে কেসটার যখন সমাপ্তি হলো, এরপরে আর কখনোই এখানে আসেনি সে।

‘স্যার—’

‘এক মিনিট,’ রুশো ছেলেটা বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সামিরা তাকে থামিয়ে দিল। ‘রুশো আমাদের স্যার, ম্যাডাম ডাকার প্রয়োজন নেই। যেহেতু আমরা একসঙ্গে কাজ করব তুমি বাশারকে ভাই এবং আমাকে আপু ডাকতে পারো। এতে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে,’ বলে সে বাশারের দিকে

সিপাহী

তাকাল। 'আমার মনে হয় বাশারেরও এতে ভেমন কোনো আপত্তি থাকার কথা না,' সামিরা এটুকু বলতেই বাশার মাথা নেড়ে সায় জানাল।

রুশো ছেলেটা মৃদু হেসে উঠল সামিরার কথা শুনে, 'ঠিক আছে,' তাকে এখন খানিকটা পরিচয় এবং নির্ভরও দেখাচ্ছে। 'আসলে এই প্রজেক্ট শুরু করার আগে প্রথমে এটার প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় রিফাত আপুকে, মানে ম্যাডামকে। এরপর অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে প্রথম নিয়োগ ছিল আমার। এটা প্রায় মাস কয়েক আগের। এরপর সাইটের মূল কাজ শুরু করার আগে,' রুশো কথা বলতে বলতে বাশার এগোতে শুরু করেছে দেখে বাকিরাও তার সঙ্গে এগোচ্ছে। 'চারশাশ জরিপ করে দেখা যায় এই জায়গাতে মন্দিরের খুব কাছ থেকে একটা এন্টি পয়েন্ট পাওয়া যায়। এই জায়গাটা চয়েজ করার পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল।'

ওরা প্রথম সিকিউরিটি পয়েন্টের কাছে চলে আসতেই থেমে গেল। সিকিউরিটি পয়েন্টে ডিউটিরত গার্ড ওদের পরিচয় জানতে চেয়ে টকিতে ভেতরে কথা বলল, তারপর ওদের ভেতরে যাওয়ার জন্য ইশারা করল। প্রথম সিকিউরিটি পয়েন্ট পার হতেই বাশার আবার ছেলেটাকে বলার জন্য ইশারা করল। 'প্রথমত এই জায়গা শহর থেকে তুলনামূলক কাছে। ফলে এখানে সেটাপ দাঁড় করানোর জন্য সবকিছু আনতে সুবিধা হয়েছে। আবার, এখান দিয়ে নেমে মন্দিরে যেতে সুবিধা, যেটা মুক্ত গাছের পথ দিয়ে যেতে অনেক অসুবিধা হতো। তো সবমিলিয়ে এই সব কারণেই এইদিকে এন্টি পয়েন্টটা করা হয়।'

বাশার দেখতে পেল অনেকটা গ্রিনহাউসের মতো দেখতে একটা বাড়ির আকৃতির প্রাস্টিকের শেডের গেটের সামনে ইনসপেক্টর রবিউল দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজনকে নিয়ে। বাশার এগোতেই সে পরিচয় করিয়ে দিল, 'স্যার, তিনি স্থানীয় ইনসপেক্টর শহীদুল, বর্তমানে পুরো স্পট তার দায়িত্বেই রয়েছে। প্রাস অন্য কোর্স থেকে কমান্ডোও আনা হয়েছে এটাকে সিকিউর করার জন্য,' বলে সে বাশার-সামিরা থেকে শুরু করে রমিজ দারোগা, কনস্টেবল আবদুল্লাহ, রুশো সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিল।

'ইনসপেক্টর এই ছেলেটা ঘটনা ঘটার সময়ে স্পটে ছিল, ওকে নিয়ে আমরা পুরো স্পটটা রেকি করব, আপনার কোনো আপত্তি নেই তো,' ইনসপেক্টর সায় জানাল এবং সেই সঙ্গে জানতে চাইল বাশারদের কোনো হেল্প লাগবে কি না। বাশার সঙ্গে থাকতে বলল তাকে, কারণ আপাতত হেল্প না লাগলেও তার হেল্প লাগবে বলে মনে হচ্ছে। সবাইকে নিয়ে বাশার প্রেক্সিগ্রাস বসিয়ে বানানো পথটা ধরে মাটির নিচে চলে এলো। 'এখানে সুন্দরভাবে পথ বসিয়ে একেবারে মাটির নিচ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে,' রুশোই ওদের পথ দেখিয়ে মাটির নিচ পর্যন্ত নিয়ে গেল। মাটির নিচে নেমে বাশার খুবই অবাক হলো।

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

স্টেডিয়ামে খেলার সময়ে যে-ধরনের ফ্লাড লাইট লাগায়, সে-ধরনের ছোট আকারের চারটা লাইটের কারণে ভেতরে বিন্দুমাত্র অন্ধকার নেই। নিচে নেমে বাশার খুব অবাক হয়ে চারপাশটা দেখল। এর আগেরবার যখন এসেছিল সে, তেতরে কেমন সোঁদা পচা একটা গন্ধ ছিল, পুরো জায়গাটা বালু আর কাদাতে স্নাতসেঁতে হয়েছিল। সেগুলোর কিছুই নেই। যদিও গত সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া সংঘাতের কারণে খানিক এলোমেলো—কিন্তু তার পরও বোঝাই যায় বিগত কয়েক মাসে এখানে বিপুল পরিমাণ কাজ করা হয়েছে। বাশার নীরবে একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল।

সেই পুরনো জায়গাই কিন্তু যেন একেবারে নতুন পোশাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গাতে পরিণত হয়েছে। চোখ বুলিয়ে বাশার বুঝল এর আগে সে যেদিক দিয়ে এসেছিল, সেটার ঠিক বিপরীত দিক দিয়ে প্রবেশ করেছে এবার। মন্দিরটা ওদের থেকে সামনে বামে, ওটা যে জলধারা দিয়ে আলাদা ছিল, সেটা বিলুপ্ত হয়েছে। সেখানে ছোট একটা ব্রিজের মতো বসানো হয়েছে মাটির নিচের মূল জায়গার সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য। অন্যপাশে ছোট একটা কামরার মতো দেখে সে বুঝল এটা অস্থায়ী অফিসঘর।

সিকিউরিটি বুথগুলো থেকে শুরু করে সব জায়গায় গ্রহণা দেখে বাশারের মনে হলো চোর পালানো বুদ্ধি বাড়ে প্রবাদটা আসলে কখনো পুরনো হবে না। চারপাশটা দেখে নিয়ে সে হাতের ইশারায় সবাইকে কাছে ডাকল।

‘এই পাতালের সব জায়গা কি বের করা গেছে?’ আনমনে জানতে চাইল বাশার।

‘আরে নাহ, খুব অল্পই জানা গেছে এখানকার,’ রুশো বলে উঠল। ‘এটুকু করতেই জান বের হয়ে গেছে সবার।’

ভালোভাবে চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল বাশার সবাইকে, আর রমিজ দারোগা আর আবদুল্লাহকে কাছে ডেকে কয়েকটা নির্দেশনা দিতেই ওরা বিদেয় নিয়ে বেরিয়ে গেল প্রবেশপথ দিয়ে। বাশার দেখল উপস্থিত মানুষদের ভেতরে রয়েছে, সামিরা, ইনসপেক্টর রবিউল, স্থানীয় ইনসপেক্টর শহীদুল, রুশো এবং দুজন কনস্টেবল। ‘সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, কারণ যদিও আগে করা হয়েছে তার পরও আমরা পুরো জায়গাটা খানাতল্লাশ করব একবার। ইনসপেক্টর আপনি আমাদের সিকিউরিটির বিষয়গুলো দেখাবেন এবং রুশো তুমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখো তৎকালীন সময়ে কী ঘটেছিল। সবাই বুঝতে পেরেছো?’ বলেই সে পুরো টিম নিয়ে প্রবেশপথের কাছে চলে এলো, সেখান থেকে ইনসপেক্টর প্রথমে বুঝিয়ে দিল কীভাবে ওরা ফোর্সের লোক সঙ্গে সিকিউরিটি বুথে এসে আক্রমণ চালায় এবং কয়েকজনকে আহত এবং নিহত করে ভেতরে প্রবেশ

সিপাহী

করে, তারপর ভেতরে ঢুকে সোজা যুদ্ধ লাগিয়ে দেয়। ওরা পরিপূর্ণ যুদ্ধের প্রতীতি নিয়ে এসেছিল এবং এখানকার সিকিউরিটি ছিল খুবই সাধারণ, ফলে এইখানকার সিকিউরিটি টিকতেই পারেনি ওদের সামনে। 'এরপর ওরা এই গেট দিয়েই ভেতরে প্রবেশ করে,' ইনসপেক্টর শেষ করতেই এবার রুশো বলতে শুরু করল।

প্রথমে তারা কোথায় ছিল, কীভাবে বের হয়ে এলো এবং ওদের মুখোমুখি হওয়া থেকে শুরু করে সে ওদের অফিস ঘরটা দেখাল। রিফাতের বসার ডেস্ক ওদের দুজনার বাঁধানো ছবিটা দেখে বাশারের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল, আবেগের একটা স্রোত গলা বেয়ে নেমে আসছিল কিন্তু সেটাকে দমন করে দিয়ে সে কাজে মনোযোগ দিল। কাজে নেমেই আবেগি হলে সর্বনাশ। এরপরে রুশো দেখাল বাইরে কোথায় কী কী হয়েছিল এবং সবশেষে সে জানাল কোনদিক দিয়ে ওপরে উঠে যায় এবং মুক্তাগাছার মন্দিরে ওঠার পর কী ঘটে। এরপর তার আর কিছু জানা নেই।

এবার আবার ডিউটি ইনসপেক্টর শহীদুল জানায় তারা কীভাবে কোন পথে বেরিয়ে গেছে। 'বের হয়ে যাওয়ার বিষয়টা কীভাবে কনফার্ম করেছেন আপনারা বাশার জানতে চাইল। সামিরাকে অনুরোধ করেছিল পুরো ব্রিফিংটা রেকর্ড করে রাখতে মোবাইলে, সে ভিডিও করে নিয়েছে।

'স্যার, ওরা বেশির ভাগ সিসিটিভি ফুটেজ নষ্ট করে দিয়েছে। এর ভেতরে কিছু আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি সেখানে আবছাভাবে কিছু জিনিস পাওয়া গেছে। আর পাবের ছাপও তাই বলে।'

'তুড, এন্ট্রি থেকে শুরু করে বের হওয়া সিসিটিভি সবকিছুতে একটাই বিষয় প্রমাণিত যে—' বলে সে অন্যদের দিকে ফিরে মাথা নাড়ল।

'ভেতরের কেউ জড়িত ছিল এবং বেশ বড় আকারের কেউ,' বাশারের মুখের কথাটা রুশো ছেলেটা পূরণ করে দিল। চশমার ভারী লেন্সের ভেতরে তার চোখ জোড়া চক্চক্ করছে।

'যাই হোক,' বাশার তার কথা থামিয়ে দিল। 'যার কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত আমাদের হাতে নেই, সেটার কথা ভেবেও লাভ নেই। বরং আমাদের কাজে নামতে হবে। ইনসপেক্টর শহীদুল,' সে স্থানীয় ডিউটি অফিসারকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল। 'অপহরণকারীরা বাইরে বের হওয়ার পর সরে পড়ল কীভাবে?'

'স্যার, এইটা একটা রহস্য,' ইনসপেক্টরকে বিহ্বল দেখাচ্ছে। 'ওরা রুশোকে মুক্তাগাছার পকেটের ওখানে গুলি করে ফিরে আসে আবার এখানে। এরপর সম্ভবত ম্যাডাম রিফাতকে নিয়ে যেদিক দিয়ে প্রবেশ করেছিল সেদিক দিয়েই বের হয়ে গাড়িতে ওঠে এবং,' বলে সে খানিক থেমে সবার দিকে দেখল। 'ওখান থেকে স্রেফ গায়েব হয়ে যায়।'

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

বাশার খুব অবাক হয়ে ফিরে তাকাল তার দিকে। ‘কি বলেন, আমাকে তো বলা হয়েছে ওরা সেখান থেকে সরে পড়েছে। তাহলে আপনি গায়েব হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন কেন?’ বাশার খুব অবাক হয়ে সামিরা এবং ইনসপেক্টর রবিউলকে দেখল।

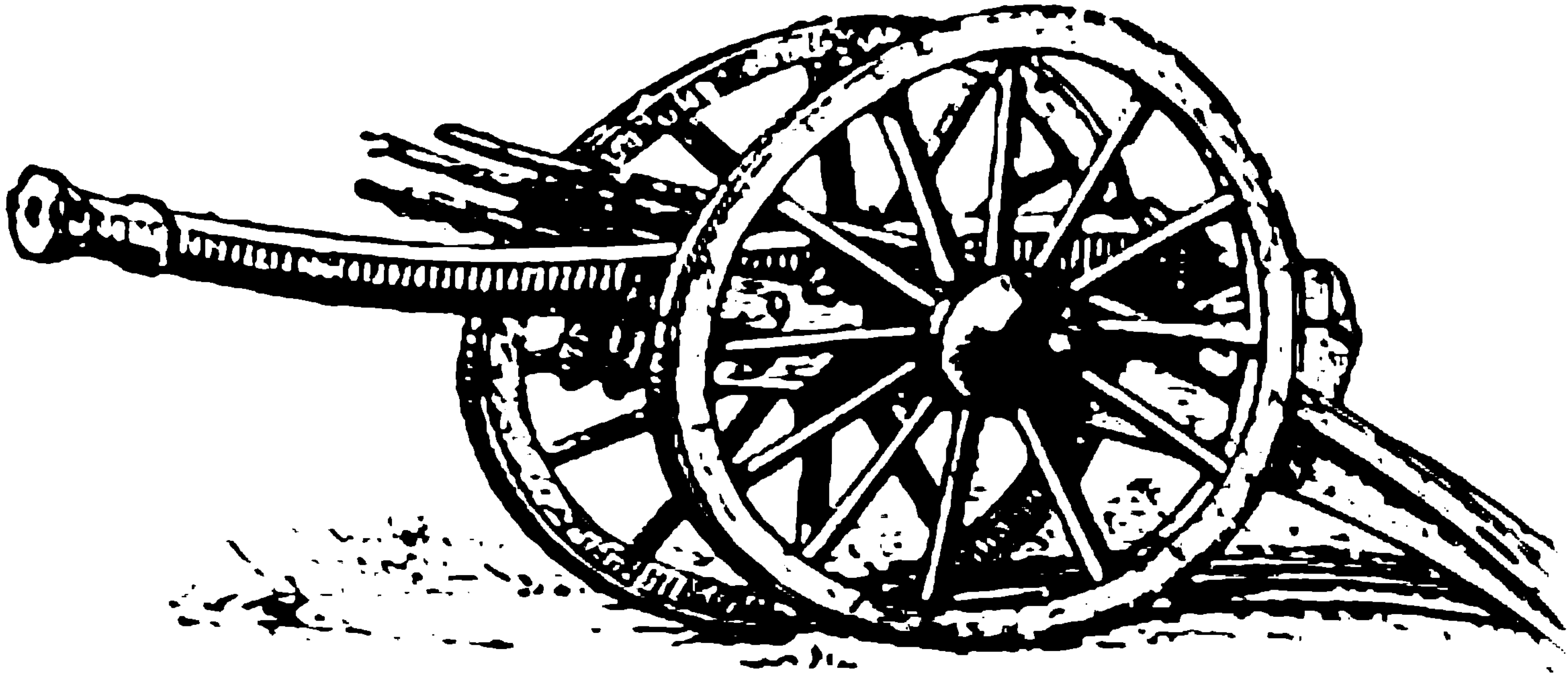
ইনসপেক্টর রবিউল অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। ‘স্যার, এটা আমিও এখানে আসার পর জানতে পেরেছি।’

‘স্যার, আপনাদেরকে করা ব্রিফিংয়ে ভুল ছিল না। কারণ প্রাথমিকভাবে এটাই ধারণা করা হয়েছিল। কারণ এটাই স্বাভাবিক পন্থা। কিন্তু গতকাল রাত থেকে এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটা ব্যাপার ঘটেছে—যেটার কারণে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি ওরা এখান থেকে রিফাত ম্যাডামকে নিয়ে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে গাড়িতে ওঠে এবং এরপরে স্রেফ গায়েব হয়ে যায়। কারণ গতকাল রাতে অ্যালাট জারি করার পর থেকে এরকম কোনো গাড়ি বা এমনকিছই কোনো রোডব্লক বা চেকিংয়ে ধরা পড়েনি।’

‘এটা স্বাভাবিক না,’ বারের পাশ থেকে সামিরা বলে উঠল। ‘কারণ, আপনারা অ্যালাট জারি করেছেন ওরা বের হওয়ার অনেক পরে। এর ভেতরে হয়তো ওরা সরে পড়েছে।’

‘ঠিক বলেছেন ম্যাডাম এবং এই কারণেই প্রাথমিক ব্রিফিংয়ে বলা হয়েছিল ওরা পালিয়েছে কিন্তু কাল রাত থেকে এখানকার আশপাশের সমস্ত জায়গার সব সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে কিছুই পাওয়া যায়নি,’ বাশার কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল তার আগেই তাকে ধামিয়ে দিল ইনসপেক্টর শহীদুল। ‘স্যার আমি একটু শেষ করি। এটা গ্রাম এলাকা হলেও এখানে বেশ কয়েকটা ব্যাংক আছে, এটিএম বুথ আছে, সেগুলোতে কিছু নেই। সব স্বাভাবিক, আর সবচেয়ে বড় কথা এখান থেকে বের হলে একটু পরেই মোবাইল ফোন কোম্পানির বিরাট একটা টাওয়ার, ওদের তিন শ ষাট ডিগ্রি ক্যামেরাতেও কিছু নেই। শুনতে বোকার মতো শোনায় কিন্তু সত্যি কথা হলো—সম্ভবত অপহরণকারীরা এখান থেকে বের হয়েছে, এরপরে তাদের আর কোনো হদিস নেই।’

বাশার খুব অবাক হয়ে সামিরার দিকে তাকাল এ-কেমন অপহরণ কেস, এখানে অপহরণের পর এক দিন পার হয়ে যাচ্ছে কোনো র্যানসম বা দাবি-দাওয়া চাওয়া হয়নি, তার ওপরে অপহরণকারীরা ল্পট থেকে বের হয়ে গায়েব হয়ে গেছে। এরকম আতঙ্কার ব্রাইডলম্পটে কীভাবে ফোকাস করবে ওরা।



অধ্যায় বত্রিশ

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
মিরাত, উত্তর ভারত

কুয়ার নিচ অঙ্ককার ধরনের হলেও ওপরটা বাইরের আলোতে অনেকটাই আলোকিত, বিশেষ করে পুরো শহরে যখন আগুন জ্বলছে। সেই আলোতে কর্নেল পরিষ্কার দেখতে পেল ত্রিলোকের অহসায় চোখে একদিকে অবিশ্বাস। ‘কর্নেল, সত্যিই আপনি!’ শুধু চোখেই নয় ত্রিলোকের গলাতেও অবিশ্বাস।

‘উঠো ত্রিলোক, সত্যিই আমি,’ বলে সে অন্যদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিয়ে যোগ করল। ‘জলদি উঠে না এলে আমাকে চলে যেতে হবে,’ বলে সে সোলেমানের দিকে ইশারা করতেই সে কুয়ার কিনারায় গিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। ত্রিলোক প্রথমে নিজের হাতের বর্শাটা ধরিয়ে দিল, তারপর সে উঠে এলো। ‘কর্নেল, সত্যিই, অবিশ্বাস্য,’ বলে সে একরকম ছুটে এসে কর্নেলকে জড়িয়ে ধরল। ‘আপনি মানুষ না, ষোদ ভগবান হয়ে আসছেন,’ বলে সে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

‘খালি কর্নেলের প্রশংসা করলে হইবে!’ কথা নয় যেন বজ্রপাত হলো কর্নেলের পাশ থেকে। কর্নেল থেকে পাশ ফিরে পালোয়ানকে দেখে চমকে উঠল ত্রিলোক। ‘পালোয়ান, তুমি?’

‘আরে গাধা!’ বলেই সে ত্রিলোককে বুকে টেনে নিয়ে নিষ্পেষিত করতে লাগল। ‘আমি না হলে ওদের এইখানে আনল কে।’

কর্নেল পিটার এবং সোলেমানের দিকে ফিরে ইশারা করল কূপের ভেতরে যারা আছে তাদের বের করে আনার জন্য, যদিও সোলেমান এর মধ্যেই সেই কাজ শুরু করে দিয়েছে, তাকে সাহায্য করছে পিটার। ‘ত্রিলোক, আমাদের জলদি করতে হবে। প্রথমে তুমি আমাদের এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাও, গত কয়েকদিন

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

এখানে হয়েছে কি এবং তোমরা কখন থেকে কীভাবে লুকিয়েছো। এরপর আমরা বাইরে কী দেখে এসেছি সেটা জানাচ্ছি,' বলে সে তার হাতের পিস্তল নেড়ে যোগ করল। 'আগেই বলে নিচ্ছি আমি একটা বিশেষ প্রয়োজনে এখানে এসেছি, তোমার সাহায্য প্রয়োজন আমার। তবে আগে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তুমি আমার সঙ্গে কাজ করো না করো, আমাকে সাহায্য করো না করো—বিষয়টা এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আগে তোমার পরিবারের নিরাপত্তা। কাজেই যাই করি না কেন আমাদের দ্রুত করতে হবে।'

ত্রিলোক যা জানাল সেটা অনেকটা এমন, ব্যারাকপুর থেকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার পর প্রথমে এই শহর খুব বেশি নড়াচড়া পড়েনি। কিন্তু দিল্লি দখলের পর খুব দ্রুত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। দিল্লির বিদ্রোহীদের একটা অংশ এই শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হলে শহরে থাকা ইংরেজদের ছোট একটা বাহিনী তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে, খণ্ড একটা যুদ্ধের মাধ্যমে সব ইংরেজদের নিকেশ করে প্রথম চৌকিটা দখল করে নেয় বিদ্রোহীরা। শহরবাসী তখন খুশিই হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পার হওয়ার পরই বিদ্রোহীদের সঙ্গে স্থানীয় গুণাপাণ্ডা আর জেল-পালানো কয়েদি থেকে শুরু করে আশপাশের সমস্ত ডাকাত আর খুনিরা যোগ দিতে শুরু করে। ঠিক দিল্লির মতোই শুরুতে শাসন থাকলেও ধীরে ধীরে তা ভেঙে পড়ে এবং শুরু হয় লুটতরাজ আর অত্যাচার। ধীরে ধীরে ঝামেলা বাড়তে থাকলে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে শহরবাসী। পরিস্থিতি অনেক খারাপ হয়ে গেলে গোলযোগ যখন তুঙ্গে, এর মধ্যে বাইরে থেকে ইংরেজ বাহিনী শহর বন্ধ করে দিলে বিদ্রোহী আর ডাকাতরা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। এটা পাঁচ দিন আগের ঘটনা।

'এরপর তুমি ঝামেলায় পড়ল ক্যামনে?' প্রশ্নটা পালোয়ান উচ্চারণ করেছে, কর্নেল সোলেমান আর পিটারের দিকে তাকিয়ে দেখল তারা ত্রিলোকের পরিবারের প্রায় সবাইকে বের করে নিয়ে এসেছে।

'প্রথমে বিদ্রোহীরা যখন শহর দখল করে ওরা আমাকে বলছিল ওদের সঙ্গে যোগ দিতে, আমি রাজি হই নাই। ওরা আমাকে নিতে চাইছিল আর সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞতা আর অস্ত্রের দক্ষতার কারণে। এরপরে যখন হেরা বিপদে পড়ে, আবার আমার কাছে আসছিল। এবারও মানা করার পর ওরা ক্ষেপে উঠে আমার পরিবারের ক্ষতি করার হুমকি দিলে এবার আমার অস্ত্রের সংগ্রহ প্রায় পুরোটাই ওদের দিয়ে দেই। কিন্তু আজ যখন বিকেলে ইংরেজ বাহিনী শহর অবরোধ করে মূল ফটক দিয়ে প্রবেশ করতে শুরু করে তখন ওরা কিছুই করতে পারেনি। পারবে না জানা কথাই ছিল। কিন্তু ওরা প্রথমে পিছিয়ে পড়লে ইংরেজ বাহিনী শহরে ঢুকে পড়ে এবং আমি খবর পাই শহর একবার দখল হয়ে গেলেই ইংরেজ বাহিনী শহরে যারাই বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছে, ওরা ভেতরে ভেতরে তাদের তালিকা বানিয়ে রেখেছে

সিপাহী

এক তার ভেতরে আমিও আছি। আমি ভয় পেয়ে পরিবারকে নিয়ে কী করব বুঝে না পেরে দ্রুত ঘরের ভেতরেই লুকানোর ব্যবস্থা করি।

‘আমার ধারণা শহরে এখন যেই যুদ্ধটা হচ্ছে, সেটা বিদ্রোহীরা প্রথমে শিখিয়ে গেলেও ইংরেজ বাহিনী শহরের মাঝামাঝি পৌছে গেলেই ওরা আবার সংগঠিত হয়ে অক্রমশ চালাচ্ছে,’ কথাটা কর্নেল বলে উঠল। সে মনে মনে সময়ের হিসাব করছে। ‘অথবা সেনারা শহরের অনিগলিতে ঝুঁজে ঝুঁজে বিদ্রোহীদের মারছে উভয়ক্ষেত্রেই এই যুদ্ধ বেশি সময় স্থায়ী হবে না। আর একবার সেনারা যেই ধরতে পারবে ওরা বেশির ভাগ দখল আয়ত্ত করতে পেরেছে, সঙ্গে সঙ্গে ওরা শহর চিরুনি তল্লাশি শুরু করবে, প্রতিটা মানুষকে ধরার এবং সম্ভবত তাদের এক্স ব পরিবারসহ শাস্তি দিয়ে উদাহরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে যাতে, বাকি শহর ব বিদ্রোহীদের আত্মনাস্ত্রনা সতর্ক হয়ে যায়। কাজেই এই সময়ের ভেতরেই আমাদের তোমার পরিবারকে শহরের বাইরে বের করতে হবে,’ কর্নেলের দৃষ্টি পুনরায় কাজ শুরু করেছে। ‘এই তোমার পরিবার?’

কর্নেল দেখল দুজন স্ত্রীলোক, সে অনুমান করল ত্রিলোকের স্ত্রী এবং যা হবে, একজন স্ত্রী এক ছোট দুটো শিশু ছয় থেকে আট বছর বয়সের ভেতরে হবে। ‘পাঁচজন,’ অনমনেই বলে উঠল সে। ‘ঘোড়ায় করে সম্ভব না,’ কর্নেল দ্রুত ভেবে বের করার চেষ্টা করছে পালানোর অপশন। ‘কোন বুদ্ধি?’ সবাই চুপ। কেউই ধরতে পারছে না কর্তব্য কী? ওরা বা ঘোড়া নিয়ে এসেছে সেগুলোতে করে এতগুলো মানুষকে সরানো সম্ভব হবে না। তাহলে নিজেদের লোক পেছনে ফেলে যেতে হবে। ‘ওদের ঘোড়া দিয়ে বাইর কইরা নিলে, পরে আমরা কোনোভাবে—’

পালোয়ানকে কথা শেষ করতে দিল না কর্নেল। ‘সম্ভব না, কারো জন্য কারো জীবনের ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়। আর এখন থেকে পালাতে হলে মেরে-কেটে বের হতে হবে। সবার সাহায্য লাগবে। অন্যকিছু—’

‘হজুর অনুমতি দিলে একটা কথা বলি—’

সোলেমানের কথায় খুবই বিরক্ত হলো কর্নেল, জরুরি সময়ে এসব ভরং তার গহন নয়। ‘জবদি বলো।’

‘হজুর আমগো লগে চাইরটা ঘোড়া আর একটা কুস্তা আছে। বাইরে ফটকের কাছে আরো ঘোড়া আর দুইটা কুস্তা আছে, যদিও ওইগুলো কোনো কামে লাগবে না—’

‘সহকেন সোলেমান—’

‘জি, হজুর,’ সোলেমান মাথা নেড়ে বলে উঠল। ‘এইখানে আমরা চাইরজন এক ত্রিলোকের তিনটা ঘোড়ায় চড়ে পারব। পালোয়ানের বড় ঘোড়াটা অন্য কামে লাগায় ত্রিলোকের পরিবারকে বাইর করতে পারব।’

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

‘কি সেটা কীভাবে?’ এবার পিটার প্রশ্ন করল। সবাই এতক্ষণে আত্মহী হয়ে ফিরে সোলেমানের কথায়।

হুজুর আমরা এইখানে আসার সময়ে একটা গাড়ির ওপরে খড়ের মধ্যে আগুন হুজুর পক্ষ বন্ধ কইরা আসলাম না। ওইটার ঠিক পরেই রাস্তায় একটা চাক্কাওয়ালা গাড়ির মতো ছিল। আমার ভুল না অইলে ওইটা গরু বা ঘোড়ার গাড়ি। আমরা হেঁটা যদি আনতে পারি, পালোয়ানের বড় ঘোড়াটা ওইটার লগে জুইড়া দিলে, তেলেকের পরিবারের পাঁচজনরে টানতে পারব। আর আমরাও পাহারা দিয়া বাইর হুয়া যাইতে পারব।’

‘ওইটা ঘোড়ারই গাড়ি,’ ত্রিলোক বলে উঠল। ‘আগে মাল বহন করত, শহর দখলের পরে বিদ্রোহীরা ঘোড়া নিয়া গেলে গাড়ি পইড়া রইছে।’

‘আমাদের কাজ চলবে, কর্নেল এক বাক্যে ঘোষণা দিল। ‘সোলেমান দারুণ ভবছো তুমি, এই অল্প সময়ে একমাত্র এটাতেই কাজ হতে পারে। পিটার আর সোলেমান তোমরা দুজন যাও, পালোয়ানের বড় ঘোড়াটা নিয়ে যাবে, ওটাতে গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে নিয়ে আসবে। পালোয়ান ত্রিলোক আর আমি এদিকটা গুছিয়ে রাখব। তোমরা এলেই রওনা দেব খুব দ্রুত। ত্রিলোক এদিক দিয়ে শহরের ফুল ফটক এড়িয়ে বের হওয়ার কোনো রাস্তা আছে?’

‘জি, হুজুর আছে। একবার আমরা রওনা দিলে মোটামুটি একটা রাস্তা আছে যেইটা দিয়ে সবার চোখ এড়ানো পলানি যাইতে পারে। কারণ এখন যুদ্ধ চলত আছে শহরের ভেতরে। বাইরের অবরোধ না থাকারই কথা।’

‘নেই, কারণ আমরা ঢুকতে পেরেছি এবং ঢোকার সময়ে দেখিনি,’ বলেই কর্নেল তুড়ি বাজাল, ‘সবাই জলদি কাজে নামো।’

‘কই কাউরেই তো দেখি না,’ সোলেমান গলির মুখ থেকে উঁকি দিয়ে বাইরের দিকে একবার চোখ বুন্ডিয়ে নিয়ে বলে উঠল।

‘তাহলে এত হাঙ্গামা হচ্ছেটা কোথায়?’ পিটার জানতে চাইল পেছন থেকে। দুজনেই অন্ধকারের ভেতরে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। দুজনেরই মুখ ঢাকা এবং পিটারের হাতে পিস্তল আর সোলেমানের হাতে সেই চারকোনা হাতলওয়ালা ছুরি কাটার। ত্রিলোকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ওরা সোজা বাঁক নিয়ে চলে এসেছে গলির মুখে, এখান থেকে আরেক বাঁক নিয়ে সামনে এগোলেই সেই জায়গা, যেখানে ওরা গাড়ির ওপরে রাখা খড়ের আগুন দিয়েছিল। ওটার পেছনেই সেই ঘোড়ার গাড়িটা থাকার কথা। সোলেমান একবার পেছনে দেখল, খানিক দূরেই

সিপাহী

পালোয়ানের বিরাট ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে এসেছে ও। এত বড় ঘোড়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন সেই সঙ্গে যেখানে গাড়িটা আছে, সেখানে পরিস্থিতি কি না বুঝে সে ঘোড়াটাকে ওখানে নিতে চাচ্ছিল না। ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে সে গলির অন্য মাথার দূরত্ব হিসেব করল একবার। ঘোড়াটা অস্থির হয়ে পা নাড়ছে। 'এক কাজ করেন পিটার হুজুর, আপনে গলির মাথায় গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখেন গাড়িটার কী অবস্থা, যদি সব ঠিক থাকে, আমাদের শিস বাজায়ে আওয়াজ দেবেন, আমি ঘোড়াটারে নিয়ে আসব। আর যদি ঠিক না থাকে তাইলে আপনে কিরা আসলেই হবে।'।

'ঠিক আছে,' বলেই পিটার অন্ধকারের ভেতরে সন্তর্পণে রওনা দিল গলির মুখের দিকে, সোলেমানের মনে হলো এই সিদ্ধান্তে মানুষটা সেই খুশি হয়েছে, কারণ তাকে এই বিরাট ঘোড়া সামলাতে হবে না। সোলেমান ঘোড়ার কাছে ফিরে এসে রাস্তার পাশের এক বাড়ির বন্ধু দরজার হাতলের সঙ্গে বাঁধা ঘোড়ার দড়িতে এক হাত রেখে ঘোড়াটার কেশরে হাত রাখল। বিরাট দৈত্যের মতো একটা প্রাণী। একেবারে কুচকুচে কালো পাহাড়ের মতো। যেমন মালিক, তেমনি ঘোড়া, দুটোই—মনের ভাবনা শেষ করতে পারল না সোলেমান, তার আগেই তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ ভেসে এলো গলির ওপাশ থেকে।

'শাক্ষাশ,' বলেই একটানে দড়িটা খুলে সে একবার ডাবল ঘোড়াটার ওপরে চড়ে বসবে কি না, সেই ধারণা বাতিল করে দিয়ে ওটাকে টেনে নিয়ে রওনা দিল গলির মুখে। যদিও সে শিসের শব্দ শুনছে, তার পরও গলির মুখে এসে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সোলেমান। ওরা খড়ের ওপরে যে-আশুন দিয়েছিল সেটা আরো কিছুটা লাভ করেছে কিন্তু সেটা অন্যদিকে। ওরা এখন যেখানে আছে সেখান থেকে একটা গলি চলে গেছে সামনের দিকে, অন্যটা ডানে বাঁক নিয়েছে, এটাতেই দাঁউ দাঁউ করে আশুন ছলছে অন্যদিকে। আশুনের এপাশে চাকাওয়ালা গাড়িটা দেখতে গেল সোলেমান, আর সেটার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছে পিটার। আশুনের অন্যপাশ থেকে তুমুল সংঘর্ষ আর হটগোলের শব্দ ভেসে আসছে।

'জলদি কর্তে হবে,' তার স্বভাবসুলভ ভাঙা স্থানীয় ভাষায় বলে উঠল পিটার। 'ওপাশে কী হচ্ছে বোঝা মুশকিল।'

সোলেমান গাড়িটার সামনে এসে ঘোড়াসহ থেমে গেল। এটাকে ঘোড়ার গাড়ি না বলে মালটানা গাড়ি বললেই ভালো। পেছনে দুটো চাকা, ওই অংশটা চওড়া, আগেই জায়গা থেকে সরু হয়ে মাথাটা চলে এসেছে সামনের দিকে, যেটা ঘোড়ার সঙ্গে আটকানো হয়। সোলেমান মনে মনে দ্রুত হিসেব করল, এটাতে পাঁচজন

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

কোনো কঠিন হবে তবে সম্ভব। 'পিটার হুজুর, আপনি এটা ধরেন, বলে সে গাড়ির চিকন অংশটা দেখাল। পিটার ওটা ধরতেই সে ঘোড়ার শরীরের সঙ্গে বাঁধা দড়িটার একটা অংশ টান দিয়ে খুলে সেটাকে ডোর আটকানো জিনের দড়ির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিল। কয়েকবার টেনে নিজে রীতিমতো খুলে পড়ে দেখল, বাঁধন যথেষ্ট শক্ত হয়েছে। 'চলবে, জলদি চলেন,' বলে সে পিটারকে ইশারা করল গাড়িটার ওপরের অংশে উঠে বসার জন্য। পিটার উঠে বসতেই সোলেমান ঘোড়ার দড়িটা ধরল নিজেকে টেনে ওপরে তোলার জন্য, সঙ্গে সঙ্গেই সে আগুনের ওপাশের দৃশ্য দেখে জমে গেল। 'সর্বনাশ!' আপনাতেই বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে।

অবসরের আগের জীবনে তেমনভাবে ব্যবহার না করলেও ইংল্যান্ডের জীবনে ঘড়ির ব্যবহারে মারাত্মকভাবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল কর্নেল। ইংল্যান্ড থেকে আসার সময়ে সে ঘড়িটা নিয়েও এসেছিল, কিন্তু এরপরে বোম্বে বন্দরের ঘটনার সময়ে হারিয়ে গেছে ওটা। আজ এখানে আবার সেই পুরনো তার পকেট ঘড়িটার কথা খুব মনে পড়ছে। কারণ সময় এমনভাবে প্রবাহিত, প্রতিটা মুহূর্ত তার কাছে মনে হচ্ছে এক-একটা ঘণ্টার মতো। সোলেমান এবং পিটার বেরিয়ে যেতেই পালোয়ান আর ত্রিলোক মিলে খুব দ্রুত ত্রিলোকের পরিবারকে গুছিয়ে নিয়েছে। কর্নেল পরিষ্কার মানা করে দিয়েছিল কিছুই নেওয়া যাবে না সঙ্গে, স্রেফ মশকে করে পানি নিতে পারে, অথবা খুব জরুরি কাপড় ছাড়া আর কিছুই না। এমনকি কোনো দামি জিনিসও নেওয়া যাবে না। একদিকে এটাতে পথে পথে বিপদে পড়তে পারে, আবার যেটা দিয়ে এবং যেভাবে ওদের শহর থেকে বের করার পরিকল্পনা করছে ওরা, তাতে করে এটা পরিষ্কার যে অনেক ঝামেলা হবে তাতে যেকোনো বাড়তি জিনিস স্রেফ বিপদই বহন করে আনবে। পালোয়ান আর ত্রিলোক যখন ওদের প্রস্তুত করছে, সেই সময়ে কর্নেল ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করে ফেলেছে যাত্রার জন্য, সেই সঙ্গে সে পাহারাও দিচ্ছিল যাতে যে কেউ আসামাত্রই সাবধান হতে পারে, আবার সোলেমানরা এলে যাতে দ্রুত বেরোতে পারে।

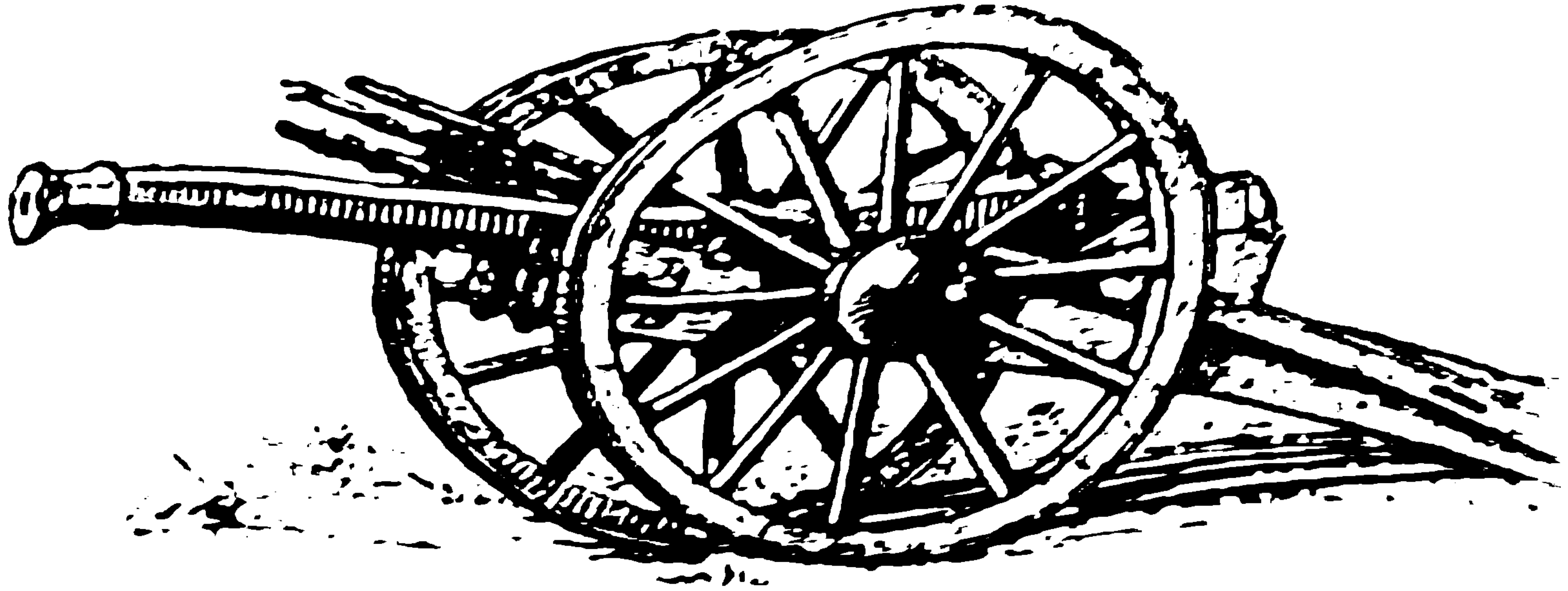
ত্রিলোক আর পালোয়ান ওদের নিয়ে কাজ শুরু করতেই কর্নেল প্রথমে চলে এলো দরজার কাছে। ঘোড়াগুলোকে একটু দূরে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সেগুলোকে একে একে খুলে সে একেবারে দরজার কাছে নিয়ে এসে অন্যপাশে বেঁধে রাখল। বাঁধলও তুলনামূলক আলাগা করে, যাতে একটানে ওগুলোকে খুলে রওনা দিতে

সিপাহী

পারে। ঘোড়াগুলোকে বাঁধা হতেই একবার গলিতে চোখ বুন্ডিয়ে নিয়ে চলে এলো ভেতরে। ভেতরে ঢুকে সে মনে মনে খুশি হয়ে উঠল, ওদের পরিবার মোটামুটি অল্প সময়েই প্রস্তুত হয়ে গেছে। 'তোমরা প্রস্তুত?' প্রশ্নটা করেই সে খুব দ্রুত একবার চোখ বুন্ডিয়ে নিয়ে আবারো খুশি হয়ে উঠল, সাধারণত এসব ক্ষেত্রে যা হয় এখানে তেমন হয়নি। ওরা একেবারেই কোনো অতিরিক্ত জিনিস নেয়নি, শ্রেষ্ঠ কাপড় আর মশক করে কিছু পানি ছাড়া।

'শাবাশ, ওরা এলেই—' বাইরে ঘোড়ার আগুয়াজ্ঞ শুনেই খুশি হয়ে উঠল কর্নেল। 'আমার ধারণা ওরা চলে এসেছে, আমরা বের হই। পালোয়ান পথ দেখাও,' বলে কর্নেল নিজের অস্ত্র রেখে ত্রিলোক ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে নিল। 'জলদি জলদি,' যদিও সে পালোয়ানকে বলেছে, তাও বাড়ির কটক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো কর্নেল। প্রথম এবং সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল সে। বাইরে দুজন না বরং একদল ঘোড়সওয়ার এসেছে এবং সোলেমান ও পিটার এদের ভেতরে নেই।

এই লোকগুলো যে ভালো উদ্দেশ্যে আসেনি সেটা বলাই বাহুল্য।



অধ্যায় তেত্রিশ বর্তমান সময় বেগুনবাড়ি ময়মনসিংহ

‘আমি ঠিক বুঝলাম না, এটা কীভাবে সম্ভব?’ বাশার খুবই অবাক হয়ে বলে উঠল। সবাই তাকিয়ে রয়েছে বাশারের দিকে, আর বাশার তাকিয়ে রয়েছে স্পটের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ইনসপেক্টর শহীদুলের দিকে। ‘আপনার কাছে কি মনে হয়, কীভাবে ঘটতে পারে ব্যাপারটা?’

ইনসপেক্টর শহীদুল অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। ‘সরি স্যার কিন্তু আমি আসলে এই বিষয়ে খুব একটা হেল্প করতে পারছি না,’ বলে সে ভরসার আশায় একবার ইনসপেক্টর রবিউলের দিকে দেখল। ‘কারণ প্রথমত আমি এখানকার মানুষ নই, ঘটনা ঘটার পর আমাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে স্পট সামলানোর জন্য, আর আসার পর থেকে আমি মূলত স্পট নিয়েই বিজ্ঞি ছিলাম। এটুকু বের করতে পেরেছি এটাই বেশি। আর এই ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য ঢাকা থেকে আসা টিমের জন্য অপেক্ষা করছিলাম,’ শেষ কথাটা বলে সে বাশারের দিকে ইঙ্গিত করল।

সঙ্গে সঙ্গে বাশারের মেজাজ চূড়ান্ত ঝারাপ হয়ে গেল। এই লোক যেকোনোভাবে নিজের গা বাঁচাতে চাইছে, কড়া একটা ধমক দিতে গিয়েও খেমে গেল ও। এর সঙ্গে রাগ করে কোনো লাভ নেই। তারচেয়ে একে কীভাবে কাজে লাগানো যায় শুকে সেটা ভাবতে হবে। বাশার দেখল সামিরার চোখ লাল হয়ে গেছে সে শুধু কিছু বলার আগেই বাশার তাকে থামিয়ে দিল। ‘থাক,’ কথাটা সামিরাকে উদ্দেশ্য করে খুব হালকাভাবে বলে সে ফিরে তাকাল ইনসপেক্টর শহীদুলের দিকে, তারপর বলে উঠল, ‘আপনি ভালো কাজ করেছেন ইনসপেক্টর। স্পটের ব্যাপারে যেকোনো আপডেট পেলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। আর আপনার কিছু ফোর্স আমরা ধার করতে পারি?’

सिपाही

‘অবশ্যই, স্যার যেকোনো সময়ে,’ বলে সে একবার মাথা ঝুঁকিয়ে চলে গেল। সেই সঙ্গে এটাও বুঝিয়ে দিয়ে গেল, আসলে তার কাছ থেকে খুব বেশি কিছু প্রত্যাশা করে কোনো লাভ নেই।

‘তুমি লোকটাকে এভাবে—’

বাশার এক হাত তুলে ধামিয়ে দিল সামিরাকে। ওরা এখনো অবস্থান করছে যেই স্পট থেকে রিফাতকে অপহরণ করা হয়েছে, সেই স্পটের পাতালের মন্দিরের প্রবেশপথের কাছে। এখানে আসার পর স্পট রেকি করতে গিয়ে স্থানীয় ইনসপেক্টর যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্পটের তার কাছ থেকে সে জানতে পারে, অপহরণকারীরা এখান থেকে বের হয়ে স্রেফ গায়েব হয়ে কোনো ট্রেস, কোনো সিসিটিভি বা অন্য কোনো ক্যামেরাতে ধরা পড়েনি। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি অপহরণকারীরা স্পট থেকে বেরিয়ে স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে, বাশার স্থানীয় একজন গা-বাঁচানো রেসপন্স দিল।

ইনসপেক্টরের কাছ থেকে হেল্প চাইলে সে একরকম গা-বাটানো রোগী মনে পড়ে।
'শোন,' বাশার শান্ত গলায় বলে উঠল। 'আমরা সবাই মিলে স্পটটা আরেকবার
রেকি করব, বাই চান্স যদি কিছু ছুটে গিয়ে থাকে। এরপর আমাদের বাইরে বের
হতে হবে। সোজা মাঠে নেমে কাজ শুরু করতে হবে,' বলে সে একটু খেমে সবার
দিকে দেখিয়ে বলে উঠল। 'যেকোনো কেসে প্রাথমিক যে-ব্যাপারটা ঘটে সেটা
অনেকটা এমন, কোনো কু থেকে তদন্ত শুরু হয়। আমাদের কেসেও এমনি দুটো
প্রাথমিক খুব শক্তিশালী কু রয়েছে। কেউ বলতে পারবে সেগুলো কি?' বাশার একে
একে দেখল সামিরা, রুশো আর ইনসপেক্টর রবিউলের দিকে। সবাই চুপ, হঠাৎ
রুশো ছেলেরা বলে উঠল, 'এই যে অপহরণকারীরা এভাবে গায়েব হয়ে গেছে
এটাই কু, এটা একটা শক্তিশালী পয়েন্ট হতে পারে কেসটা শুরু করার, কারণ
এভাবে কারো পক্ষে গায়েব হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়,' মোটা লেন্সের চশমার অন্যপাশে
তার চোখজোড়া চকচক করছে।

তার চোখজোড়া চকচক করছে।
ছেলেটার দিকে খুব অবাক হয়ে তাকাল বাশার, সে খানিকটা খুশি হয়েছে
এক এই প্রথমবার মনে হলো ছেলেটাকে নিয়ে এসে সে ভুল করেনি। 'ভেরি গুড
ক্রশো। আর দ্বিতীয় কু,' সে মৃদু হেসে সামিরার দিকে তাকাল। এটা সামিরার জন্য
খানিকটা চ্যালেঞ্জ। কিন্তু সামিরাকে সে অবশিষ্টে ফেলে দিল কি না—যখন বুঝতে
পারছে না বাশার-সামিরা ঠিক তখনি মাথা নেড়ে জবাব দিল।

‘যদি প্রথম কু থেকে চিন্তা করি এবং ওই প্যাটার্নে ভাবি তাহলে এই কেসের আরেকটা শক্তিশালী কু হলো র‍্যানসম—’

‘র্যানসম কি?’ ক্রনো অবাক ভঙ্গিতে জানতে চাইল।

‘মুক্তিপন,’ বাশার আবারো খুশি হয়ে উঠল। সে সামান্য মাথা নেড়ে প্রশংসার ভঙ্গিতে, তারপরে সামিরার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘একদম ঠিক বলেছো তুমি।

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

এককম একটা হাই ভোল্টেজ কেসে, এত আয়োজন করে অপহরণকারীরা একজন আকিওলজিস্টকে তুলে নিল, অথচ একবেলা পার হয়ে গেলেও কোনো মুক্তিপণ বা কোনো দাবি-দাওয়া নেই। কেন? কী কারণ থাকতে পারে এর পেছনে। এই কেস বুঝতে হলে এবং সলভ করতে হলে এই দুটো প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে আমাদের। প্রথমত, অপহরণকারীরা কীভাবে গায়েব হয়ে গেল, দ্বিতীয়ত, কোনো দাবিদাওয়া নেই তবে কেন এই অপহরণ। লেটস গো এভরিওয়ান, লেটস স্টার্ট।’

পরবর্তী আধাঘণ্টার ভেতরে ওরা পুরো পাতাল মন্দির এলাকাটার নির্দিষ্ট অংশটা রেকি করে বের হয়ে এলো বাইরে। ‘আমি তো বুঝতে পারছি না, এই জায়গা আসলে কত বড়?’ সামিরা কপালের ঘাম মুছে জানতে চাইল।

‘আমি তো আগেই বলেছি পাতালের এই জায়গা আসলে কত বড় এটার কিছুই বের করতে পারিনি আমরা। এখানে এই কর্ডনের বাইরে কত গলি-ঘুপচি আছে, কে জানে?’ সবাই ঘেমে উঠেছে।

‘সবাই বাইরে চলো,’ বাশার ভাবতে ভাবতে বলে উঠল। ‘আমাদের ওপরে উঠে আসল কাজ শুরু করতে হবে। এখানে নষ্ট করার মতো সময় নেই। জলদি চলো।’

বাইরে বের হয়ে মূল সিকিউরিটি গেটের দিকে এগোচ্ছে সবাই মিলে রমিজ দারোগার কল পেয়ে বাশার, ওদের গেটের কাছে আসতে বলল, তারপর সামনে এগোতে এগোতে রুশোর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, ‘তুমি মন্দির এলাকাটাকে এখানে শিফট করার পেছনে কিছু কারণ বলেছিলে, এই এলাকার কি আরো কোনো বৈশিষ্ট্য রয়েছে?’

রুশো এক মুহূর্ত ভাবল। বাশার বড় করে দম নিতে গিয়ে অনুভব করল বাতাসে ভেজা গন্ধের পরিমাণ বেড়েছে, আকাশ খানিক মেঘলা। এখন বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা একেবারে বাতিল করে দেওয়া যাচ্ছে না।

‘ভাই এই এলাকার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এখানকার ভুলপথের সঙ্গে পানিপথের সংযোগ। এখান থেকে খুব কাছেই ব্রহ্মপুত্রের একটা বড় শাখা বয়ে গেছে, ওটা দিয়ে যোগাযোগ এবং মালামাল আনা-নেওয়া অনেক সহজ হয়েছে, এটাও এই জায়গায় শিফট করার পেছনে বড় একটা কারণ।’

ওরা প্রায় মূল গেটের কাছে চলে এসেছে, এমন সময় রুশোর কথাটা ক্লিক করল বাশারের মাথার ভেতরে। ‘তারমানে তুমি বলতে চাচ্ছ এই এলাকা পানিবিধৌত?’ হঠাৎ তার মনের ভেতরে ঝিলিক দিয়ে উঠল বিষয়টা, সঙ্গে সঙ্গে সে খানিক লজ্জা পেল। নিজের নানাবাড়ির এলাকা অথচ সে নিজেই ধরতে পারেনি বিষয়টা এতক্ষণ, ভেজা ভাবটার কারণ আর কিছুই না খুব কাছেই বড় কোনো জলধারা, আর সেটা যে ব্রহ্মপুত্র ছাড়া আর কিছু না, সেটা বোঝার ক্ষমতা তার

সিপাহী

রয়েছে। বাশারের মনের ভেতরে একটা সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে উঠতে চলেছে, এমন সময় সে দেখতে পেল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে রমিজ দারোগা আর কনস্টেবল আবদুল্লাহ। পাতালে নামার আগে সে ওদের পাঠিয়েছিল আশপাশে একটু খোঁজ লাগাতে।

‘রমিজ ভাই কিছু পেলেন?’ গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরল বাশার। সামিরা আর রুশোও এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পাশে। সামিরাকে সিগারেট দেখিয়ে ইশারায় জানতে চাইল ও খাবে কি না, মাথা নেড়ে মানা করল সামিরা।

‘স্যার, হালকা কথাবার্তা হইল, খুব বেশি কিছু জানতে না পারলেও এইটা জানতে পারছি এই এলাকাতে ইদানীং অনেক কিছু পরিবর্তন হইছে,’ রমিজ দারোগা বলে যাচ্ছে আর বাশার যতটা সম্ভব ঘাড় ঘুরিয়ে এলাকাটা দেখার চেষ্টা করছে। ‘কয়েক বছর আগেও এইখানে নাকি খালি বেগুনবাড়ি বাজারটা বাদে আর কিছুই ছিল না, বিগত কয়েক বছর আগে সরকার এইখানে বেশ কিছু প্রজেক্ট নেয়, এরপরে এলাকা অনেক উন্নতি হইছে।’

‘জি, স্যার,’ রমিজ দারোগা থামতেই তরুণ কনস্টেবল আবদুল্লাহ বলে উঠল, ‘এইটা আমিও জানি। আমি একসময় এই এলাকাতে ডিউটি করছি। এইখানে প্রথম দুইটা মোবাইলের টাওয়ার হইল, ছোট একটা মার্কেট উঠল, এরপরে একটা ব্যাংক আইলো। এরপরে আর এইটা হইল। এখন নাকি একটা ছোট ক্লিনিক হইতাকে, নদীর একপাশে চর উঠায়া ওইখানে গৃহহীনগো গ্রাম বানাইছে, আবার নদীপথে মালসামান আনা-নেওয়া করার একটা স্টেশন, একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র—’

কনস্টেবল আবদুল্লাহ বলে যাচ্ছে বাশার সিগারেট টানতে টানতে পরিমাপ করছে। কনস্টেবল থামতেই সে বলে উঠল, ‘তোমরা অল্প সময়ে ভালো তথ্য সংগ্রহ করে এনেছো। এগুলো কাজে লাগবে।’

‘তুমি কি কিছু ভেবেছো?’ বলে নিজেকে সংশোধন করে নিল সামিরা, ‘মানে পেয়েছো?’

বাশার কোনো জবাব দিল না, সে এখনো চারপাশ দেখছে।

‘স্যার আপনারা কি কিছু জানতে পেরেছেন?’ কনস্টেবল আবদুল্লাহ জানতে চাইল।

বাশার বলে গেল ওরা কী কী জানতে পেরেছে। বিশেষ করে অপহরণকারীদের গায়েব হয়ে যাওয়ার বিষয়টা এবং ওদের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ দুটো বিষয়।

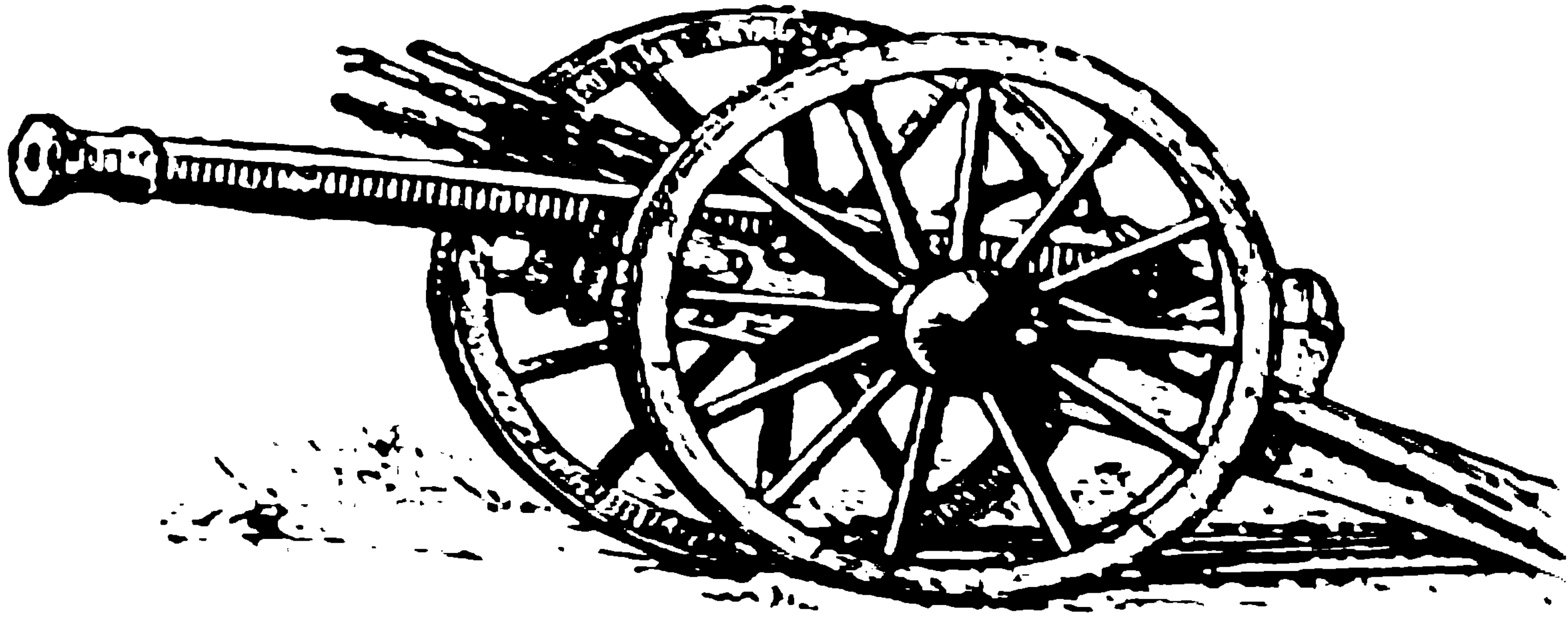
‘স্যার, একটা কথা জিজ্ঞাসিত পারি?’ বাশারের কথা শেষ হতেই রমিজ দারোগা বলে উঠল। ‘এইটা কীভাবে সম্ভব, এতোগুলো মানুষ স্রেফ গায়েব হয়ে গেল এইখান খেইকা?’

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

‘এইটাই প্রশ্ন এবং—’ বলে সে নিজের একটা হাত তুলে গেটের একপাশে দেখাল। ‘ওইটা মোবাইল টাওয়ার এখান থেকে শ তিনেক গজ দূরে, আর ওদিকে,’ বলে সে পুরো উলটো ঘুরে গেল। ‘ব্যাংকের অফিস এবং এটিএম। এবং এই দুটো জায়গার ভেতরের রেডিয়াস হবে ছয় শ থেকে আট শ গজ, মানে আধা মাইলের কাছাকাছি, কিংবা কিছু কম-বেশি। আমরা এখানে আছি ছয়জন,’ বলে সে মোটা গোর্ফ ইনসপেক্টর রবিউল, সামিরা, রমিজ দারোগা, রুশো এবং তরুণ কনস্টেবল আবদুল্লাহর দিকে দেখল।

‘স্যার, আরো লোক লাগলে আনাব?’ ইনসপেক্টর রবিউল মোটা গোর্ফে তা দিয়ে বলে উঠল।

‘আপাতত নয়, আপাতত আমরা ছয়জন দুজন করে তিন দলে ছড়িয়ে পড়ব এবং এই আট শ থেকে হাজার গজের প্রতিটা কোনা ভালোভাবে পরখ করব। অপহরণকারীরা এই জায়গার ভেতর থেকেই গায়েব হয়েছে এবং ওরা কীভাবে গায়েব হয়েছে, এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে এই আট শ গজের ভেতরেই,’ বলে সে জোরে একটা তালি দিয়ে বলে উঠল, ‘জলদি কাজে নামো সবাই।’



অধ্যায় চৌত্রিশ

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
মিরাত, উত্তর ভারত

ত্রিলোকের ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে তার বাড়ির দরজায় বেরিয়ে কণিকের জন্য খেমে গেল কর্নেল। প্রায় একদল ঘোড়সওয়ারে ভরে গেছে ত্রিলোকের বাড়ির দরজার বাঁ পাশটা। একটু আগে ওদিকেই ঘোড়াগুলো বেঁধে রেখেছে কর্নেল। কর্নেলরা এসেছিল ডান পাশ থেকে, আর ঘোড়সওয়ারেরা এসেছে ডান থেকে, সোলেমানরাও গেছে বাঁ পাশে ঘোড়ার গাড়ি আনতে। কর্নেল অনুমান করল, যেহেতু এরা বিপরীত দিক থেকে এসেছে কাজেই, এদের সঙ্গে সোলেমান বা পিটারদের দেখা হয়নি।

মানুষগুলোকে দেখেই ত্রিলোকের ছেলেটাকে নামিয়ে দিল কর্নেল, এবং নিজের শরীরের সঙ্গে আড়াল করে ফেলল। তার ইচ্ছে কোনোভাবে ছেলেটাকে ঠেলা দিয়ে বাড়ির ভেতরের দিকে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দেবে পেছন থেকে, যাতে ভেতরে যারা আছে তারা অন্তত বুঝতে পারে বাইরে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। কিন্তু সে করতে পারল না, সে ছেলেটাকে নিচে নামাতেই ভেতর থেকে কড়ের মতো বেরিয়ে এলো পালোয়ান, তার কোলে ত্রিলোকের বড় মেয়ে এবং অন্য হাতে কিছু জিনিস, আর ঠিক পেছনেই ত্রিলোক আর তার পরিবার। বাইরে বেরিয়ে তারাও সামনের দৃশ্য দেখে জমে গেল।

কর্নেল বুকল আর লুকানোর চেষ্টা করে লাভ নেই, সে সোজা হয়ে ফিরে তাকাল লোকগুলোর দিকে এবং দেখেই বুঝতে পারল ইংরেজ সেনাদলের সদস্য এরা, প্রায় আট-দশজন সবাই অস্ত্রসজ্জিত এবং তাদের সবার অগ্রভাবে লম্বা তরুণ এক অফিসার, হাতে খোলা পিঙ্কল, পোশাক এবং চোখে-মুখে লাল ছিটে, মানে রক্ত লেগে রয়েছে। সে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে আছে, কর্নেলও তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে কিছু বলার আগেই কর্নেল কথা বলে উঠল, 'তোমরা কারা,

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

নিজের পরিচয় দাও অফিসার,' প্রশ্নটা সে ইচ্ছে করেই ইংরেজিতে করেছে। কর্নেল লক্ষ্য একদম শান্ত এবং পুরোপুরি কর্তৃত্বের ভাব, যেন অধীনস্থ অফিসারের কাছে কোনো বিষয়ে রিপোর্ট চাচ্ছে।

কর্নেলকে দেখে হঠাৎ থেমে গেল দলটা। প্রথম দেখায় আগুন, ধোঁয়া আর আধো অন্ধকারে তারা ঠিক বুঝতে পারেনি সামনের মানুষটা সাদা চামড়ার। সবার অগ্রভাগে থাকা অফিসার ভালোভাবে পরখ করল কর্নেলকে তারপর সে নিজের গ্রাউন এবং ফ্যানট্রির নাম বলে নিজেকে পরিচয় দিল মেজর হিসেবে, 'আমি মেজর এড, উইথ ডিউ রেসপেক্ট, আপনি কি মিলিটারির কেউ?'

'আমি কর্নেল স্যামুয়েলসন,' কর্নেল নিজের পরিচয় দিল যথাসম্ভব সংক্ষেপে এবং খুব বেশি কিছু বলল না, নিজের পরিচয় সে ধোঁয়াশা রাখতে চাচ্ছে কিন্তু সেটা পারল না সে। 'আপনি রিটায়ার্ড কর্নেল স্যামুয়েলসন,' বলে সে এক পা এগিয়ে এলো, কর্নেলকে প্রথম দর্শনে সে নিজের হাতের অঙ্গুষ্ঠটা নামিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু এবার সেটাকে তাক না করলেও খানিক ওঠাল সে সামনের দিকে।

'হ্যাঁ, আমি রিটায়ার্ড কর্নেল স্যামুয়েলসন,' বলে সে নিজের মাথা উঁচু করল খানিকটা। 'তবে আমি আর অবসরে নেই। এই মুহূর্তে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে ভারতে একটা বিশেষ মিশনে রয়েছি,' বলে সে মেজরকে খুব বেশি ভাবার সময় না দিয়ে বলে উঠল, 'তোমরা এখানে কি প্রয়োজন?'

'স্যার,' তরুণ মেজর এখনো সম্মানের সঙ্গেই কথা বলছে। 'আপনার উপস্থিতির কোনো খবর আমাদের জানা নেই। কোনো নির্দেশনাও নেই, আপনি হয়তো শহরের পরিস্থিতি জানেন। বিদ্রোহীদের সঙ্গে আমাদের খণ্ডযুদ্ধ চলছে। শহরের বেশির ভাগ অংশের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর আমরা বিদ্রোহী এবং তার দোসরদের খুঁজে বের করছি,' বলেই সে আরো এক পা এগিয়ে এলো কর্নেলের দিকে। 'আপনার পেছনে থাকা ওই লোকটা,' নিজের হাতের অঙ্গুষ্ঠ তুলে ত্রিলোকের দিকে দেখাল সে। 'বিদ্রোহীদের বেআইনিভাবে অস্ত্র সংগ্রহের অপরাধে তাকে এবং তার পরিবারকে ধরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা আছে আমাদের ওপরে। ইংরেজ সরকার ও কোম্পানির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে আজ ভোরে অন্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে তাকে।'

'তা হচ্ছে না অফিসার,' ত্রিলোক এবং পালোয়ানের দিকে এক পলক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে ওদের আর ইংরেজ অফিসারদের মাঝে দেয়ালের মতো দাঁড়াল কর্নেল। তরুণ অফিসারের সঙ্গে তার দূরত্ব দুই ফিটেরও কম। 'তোমাকে আমি আগেই বলেছি, আমি ইংরেজ সরকারের অনুরোধে বিশেষ মিশনে রয়েছি। আর আমার মিশনের জন্য এই মানুষটাকে আমার প্রয়োজন,' তরুণ অফিসার কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল তার আগেই কর্নেল একটা আঙুল তুলে তাকে থামিয়ে দিল,

সিপাহী

সে আড়চোখে একবার পলক বুলিয়ে নিল অফিসারের পেছন দিকের অন্যদের দিকে। সবাই খানিক দ্বিধামস্ত, এই সুযোগটাই নিতে হবে। 'তোমাকে আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি, এই লোক নিজেও একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার, ইংরেজ সরকারের অস্ত্রাগারে কাজ করত। আমি নিশ্চিত, তাকে খেণ্ডার এবং শাস্তি দেওয়ার কোনো দাপ্তরিক কাগজ তুমি দেখাতে পারবে না,' কর্নেল মনে মনে খুশি হলো এই পয়েন্টটা বলতে পেরে, কারণ সে জানে এদের কাজে কোনো দাপ্তরিক কাগজ নেই। কিন্তু তার মনের খুশি মনেই রয়ে গেল, ভেতরে ভেতরে চুপসে গেল সে তরুণ অফিসারের পরের কথা শুনে।

'অবশ্যই স্যার, বিদ্রোহীদের সঙ্গে আমাদের খণ্ড যুদ্ধ প্রায় শেষের দিকে। শহর নিয়ন্ত্রণে এলে এবং শহরের কেন্দ্রে গিয়ে আজই সবাইকে ফাঁসি দেওয়া হবে। আপনি যদি সত্যিই ইংরেজ সরকারের নির্দেশে কাজ করে থাকেন, তবে আমাকে আমার কাজ করতে দিন, একে খেণ্ডারের পর আমার সঙ্গে চলুন, শহরের প্রাণকেন্দ্রে গেলেই আপনাকে আমি বিদ্রোহীদের তালিকা দেখাতে পারব, যাদের নামে ফাঁসির নির্দেশনা জারি করা হয়েছে, এর ভেতরে,' বলে সে ত্রিলোকের দিকে নামে ফাঁসির নির্দেশনা জারি করা হয়েছে, এর ভেতরে,' বলে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল কর্নেলের দিকে। 'অন দ্য দেখাল, 'এর নামও রয়েছে,' বলে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল কর্নেলের দিকে। 'অন দ্য আদার হ্যান্ড স্যার, আপনি আমাকে দাপ্তরিক কাগজ দেখান যেখানে এই লোকটাকে আপনার বিশেষ মিশনে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে কোম্পানি বা ইংরেজ সরকার। বিশেষ শব্দটা সে এমনভাবে উচ্চারণ করল, তরুণ অফিসারের কয়েকজন সঙ্গী হেসে উঠল।

কর্নেল দ্রুত ভাবছে, সে কোণঠাসা হয়ে আসছে, দ্রুত কমছে তার এবং তাদের সরে পড়ার সুযোগ, আগেই সে শুনে নিয়েছে এখানে কয়েকজন, এদের সঙ্গে লড়াই সম্ভব নয়, তারা মাত্র তিনজন, আবার ত্রিলোকের পরিবার আছে। আর যত যাই হোক নিজের কাজের গুরুত্বই সে নিজের লোকদের সঙ্গে লড়াই হত্যা বা খুন এড়াতে চাচ্ছে—এতে স্রেফ কাজেরই অসুবিধা হবে। আরো বড় বিপদও ডেকে আনতে পারে সে, শুধু নিজের ওপরে নয়, বরং নিজের দলের লোকদের ওপরে। তরুণ অফিসারের জবাব শুনে কবিকের জন্য ঘাবড়ে গেলেও নিজেকে খুব দ্রুত সামলে নিল কর্নেল, কড়া গলায় সে বলে উঠল, 'অফিসার, তোমার কি মনে হয় না, নিজের সিনিয়রের সঙ্গে তোমার আরেকটু সাবধানে এবং সম্মানের সঙ্গে কথা বলা উচিত। দেখো—'

'আপনি আমার সিনিয়র নন,' তরুণ অফিসারের গলায়। 'ছিলেন, আর ভারতীয় মিলিটারিতে আপনার আর কোনো অবস্থান নেই, বরং আপনার বিষয়ে কী ধরনের উদাহরণ দেওয়া হয় আপনার কোনো ধারণা নেই। কাজেই—'

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

সত্যিকারের রোগে উঠল কর্নেল, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল সে। ‘অফিসার মতিই তোমার নিজের জিহ্বাটাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, ব্রিটিশ সরকার তো অনেক পরে, আমি তোমার ভালোর জন্যই বলছি। আর যদি সরকার, মিলিটারি বা কোম্পানির কথা বলো, তবে তাদের সব ক্ষমতা নিয়ে তারা যখন ব্যর্থ সেই সময়ে আমাকেই ডেকে পাঠাতে হয়েছে তাদের। কাজেই সাবধান অফিসার, যে-মিলিটারিতে তুমি কাজ করো না, সেই মিলিটারির যখন ভিত্তি রচনা করছিলাম আমি, তুমি তখন ল্যাংটো হয়ে নিজের হাণ্ড-মুতুতে গড়াগড়ি খেতে।’

অফিসারের রক্তমাখা চেহারা পুরোপুরি লাল হয়ে গেছে। তার দলের লোকেরাও সবাই চুপ। আনমনেই সে সবার দিকে এক পলক দেখে নিয়ে সে ফিরে তাকাল কর্নেলের দিকে। ‘আমি আমার বন্দিকে নিয়ে যাব,’ সে সরাসরি তাকিয়ে রয়েছে কর্নেলের চোখের দিকে। এর জন্য যা করা প্রয়োজন সব আমি করব, আপনি কেন, যে কেউ বাধা দিলে আমি গুনব না,’ বলেই সে নিজের সৈন্যদের দিকে ইশারা করল ত্রিলোককে নিয়ে আসার জন্য।

‘আর যেকোনো মূল্যে আমি তাকে নিতে দেব না,’ কর্নেল এক টানে বের করে নিয়ে এসেছে নিজের তরবারি। তরুণ অফিসার তার বন্দুক তোলার আগেই কর্নেল তার তলোয়ারের ডগাটা ঢুকিয়ে দিল অফিসারের বন্দুকের নলের ভেতরে। অফিসার বন্দুক তুলতে গিয়েও সেটার নল সোজা করতে ব্যর্থ হলো। ঠিক তার পেছন থেকে রীতিমতো এক গর্জন করে সামনে বাড়ল পালোয়ান, মাথার ওপরে কয়েক পাক ঘোরাল বিরাট লাঠিটা। এমনকি কয়েক ফুট দূরত্বে থেকেও কর্নেল সেটার বাতাসের ধাক্কা টের পেল। তার ঠিক পাশেই সবগুলো দাঁত বের করে গর্জন করেছে তার পোষা কুকুর বাহাদুর, ‘দেখি কে নিয়ে যায়—’

পালোয়ান কথা শেষ করতে পারল না, কর্নেল আর তরুণ অফিসার কেউই নিজেদের অস্ত্র আলাদা করতে পারল না, তার আগেই গলির অন্য মাথা থেকে রীতিমতো ভূমিকম্পের গর্জন শুনে ফিরে তাকাল সবাই সেদিকে। সঙ্গে সঙ্গে যা দেখল, শত্রু-মিত্র সবার চোখ কপালে উঠে গেলে সেটা দেখে।

ঘোড়ার গাড়িটাকে ঘোড়ার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এক লাফে যখন ঘোড়ার ওপরে চড়ে বসল, নিজেকে রীতিমতো রাজা মনে হচ্ছিল সোলেমানের। সে আসলে ভাবতে পারেনি পালোয়ানের এই হাতির মতো আকৃতির ঘোড়াটাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কিন্তু চড়ার পর সে বুঝতে পারল আকৃতি দানবের মতো হলেও নিজের মালিকের মতোই বুদ্ধিমান এবং শান্ত ঘোড়াটা। সোলেমান পিটারকে গাড়িতে উঠতে

সিপাহী

বলতেই সে লাফিয়ে উঠে বসল গাড়িতে। ঘোড়াটাকে গাড়িসহ টান দিতে যাবে, সোলেমান দেখতে পেল গাড়িটার একটা অংশ ঝড়ের গাদাটার আড়ালে কিছু একটার সঙ্গে বাঁধা। সে পিটারকে বলতে যাবে ওটাকে খোলার জন্য, এমন সময় আগের ঝড়ের গাদাতে ধরে থাকা প্রায় নিভে আসতে থাকা আগুনের ওপাশ থেকে ঘোড়া নিয়ে লাফিয়ে এপাশে চলে এলো একাধিক ঘোড়সওয়ার।

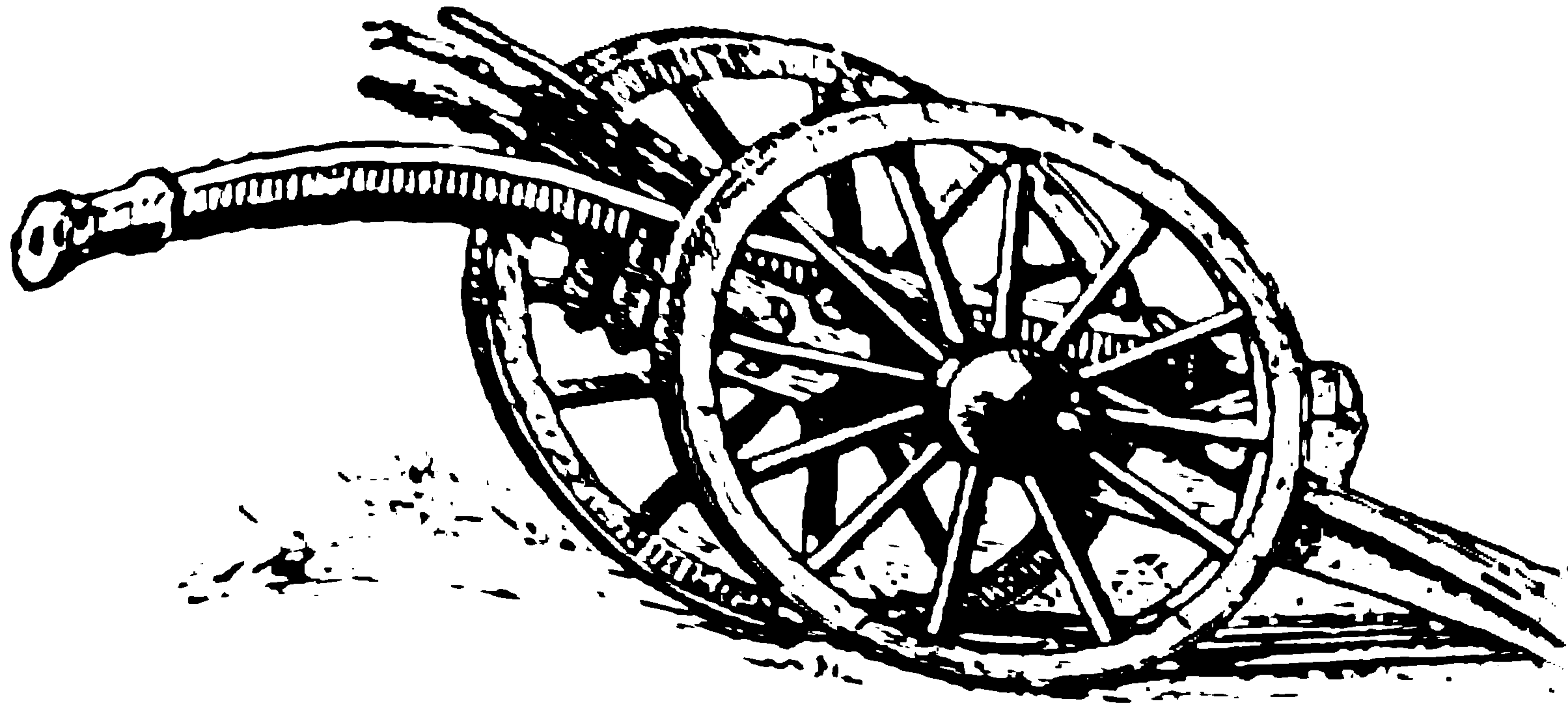
সোলেমানরা যেমন ওদের আশা করেনি। ঠিক তেমনি ওরাও সোলেমানদের আশা করেনি। দুই দলই পরস্পরকে দেখে থমকে গেল। প্রথম দুই ঘোড়া সওয়ার আগুন পার হয়ে খেমে যেতেই বাকিরাও তাদের পেছনে খেমে গেল। সোলেমান দেখল প্রায় আট-দশজনের দল এবং এদের পোশাক দেখেই বোঝা যায় এরা বিদ্রোহী এবং এরা আসলে শহরের অন্যদিক থেকে তাড়া খেয়ে এদিকে এসেছে লুকানোর জন্য, একেকজনের চেহারা বিধ্বস্ত পরাজিত, রক্তাক্ত। ওরা মোটেই আশা করেনি এদিকে কোনো মানুষ থাকতে পারে, সোলেমানদের দেখে খেমে গেল ওরা। ‘এই তোরা কারা, এইহানে—’ দলের অগ্রভাগে থাকা নেতা প্রশ্নটা করতে গিয়েও খেমে গেল পিটারকে দেখে। এখানে মানুষই আশা করেনি, সাদা চামড়ার কাউকে তো অনেক পরে, তা-ও আবার মিলিটারি না, সাধারণ পোশাক পরে থাকা একজনকে দেখে তাদের বীভৎস চেহারায় আগুন জ্বলে উঠল, ‘ওই একটা ইংরেজ কুস্তা, ধর ধর—’ বলে সামনে এগোনোর জন্য ইশারা করতেই সোলেমান নড়ে উঠল দলনেতার আগেই। সে বিরাটাকায় ঘোড়াটার পেছনে পায়ের তক্তা জুতো দিয়ে জোরে একটা লাথি মারল। সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ঘোড়াটা বেধড়ক ব্যথা পেয়ে প্রথমে চিৎকার করে উঠল, এরপরে একলাফে প্রথমে সামনের দুই পা শূন্যে উঠিয়ে দৌড়াতে শুরু করল ঝড়ের বেগে।

সোলেমান প্রথমে ভেবেছিল পড়েই যাবে, কোনোমতে ঘোড়ার কেশর খামচে ধরে নিজেকে সামলে নিল। ঘোড়াটা দৌড় শুরু করতেই, পিটার আর নিজেকে সামলাতে পারল না, সে একটানে বের করে এনেছিল নিজের পিস্তল, সেটা দিয়ে তুলি করতে পারার আগেই সে তীব্র টান খেয়ে পড়ে গেল গাড়িটার ওপরে। অন্যদিকে ঘোড়াটা চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা টান খেল, এবং গাড়ির সঙ্গে বাঁধা দড়িটা বাঁধা ছিল, ঝড়ের গাদাগুলোকে সামলে রাখা খুঁটিতে, এমনিতেই পুরনো হয়ে আবার কিছু অংশ আগুনে পুড়ে ওটা দুর্বল হয়ে ছিল, শক্তিশালী ঘোড়ার টান খেয়ে ওটা গোড়া থেকে ভেঙে গেল। ওটা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই আগুনের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া বাকি ঝড়ের চারকোনা চাঁইগুলো গড়িয়ে পড়ল ঘোড়সওয়ারের ওপর আর তাদের পায়ের কাছে জ্বলতে থাকল আগুনের ওপরে। নিভতে থাকা আগুন ধপ করে জ্বলে উঠল আবারো। ঘোড়াগুলো লাফিয়ে উঠল

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

অনেকে পড়ে গেল, সামনের লোকগুলো রাগের সঙ্গে চিৎকার করে পিছু নিল সোলেমানদের।

সোলেমানের এতকিছু দেখার সময় নেই, সে বিরাট ঘোড়ার পিঠে নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত। ঘোড়া তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে, সেই সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে পেছনের চাকাওয়ালা গাড়ি এবং পিটারকে। পিটার কোনোমতে উঠে বসল গাড়িতে, টেনে নিল নিজের পিস্তলটা, উঠেই সে দেখল ওদের ধাওয়া করতে থাকা দলের নেতা প্রায় ধরে ফেলেছে তাকে, সে পিস্তল তুলে গুলি করল, সরে যেতেই পেছনের একজন গুলি খেয়ে পড়ে গেল। রাগের সঙ্গে চিৎকার করে দালালটা আরো জোরে ধাওয়া করল ওদের। সোলেমান দেখতে পাচ্ছে সামনের ত্রিলোকের বাড়ির কটকের কাছে জটলা। আর সে ঘোড়াটাকে টেনে থামানোর চেষ্টা করছে কিন্তু ওটা কোনোভাবেই থামছে না দেখে সে চিৎকার করে সরতে বলছে অন্যদের—কিন্তু কতটা কাজ হলো সে বুঝতে পারল না, সে নিজেকে সামলানোর বা ঘোড়াকে থামানোর আগেই দলটার দিকে ধেয়ে গেল ঘোড়া আর ঘোড়ার গাড়ি, সেই সঙ্গে পেছনের ধাওয়ারত দলটা।



অধ্যায় পঁয়ত্রিশ বর্তমান সময় বেগুনবাড়ি, ময়মনসিংহ

‘আট শ থেকে হাজার গজ কিন্তু একেবারে কম জায়গা নয়,’ সামিরা বলে উঠল আনমনেই। কি মনে হয় বের করা সম্ভব হবে?’ বাশারের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে সে জ্ঞানতে চাইল।

‘প্রশ্নটা আসলে পারব কি পারব না, সেটার ভেতরে আর সীমাবদ্ধ নেই,’ বাশার সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়া কাজের ধরন এবং অ্যাংগেলটা ধরার চেষ্টা করছে। মনে মনে পুরো ব্যাপারটা ঝালাই করে নিয়ে সে নিজেদের যেখান থেকে শুরু করার কথা সেখানে চলে এলো। ‘প্রশ্নটা হলো, আমাদের পারতেই হবে,’ বলে সে হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে শার্ট আর জ্যাকেটের হাতা সামান্য গুটিয়ে জায়গাটা পরখ করতে শুরু করল। ‘শার্লক হোমস হওয়ার সময় এসেছে। তুমি তো ইনভেস্টিগেশনে আছো লম্বা সময়। আমি দেখে যাব, আমি যেসব এলাকা কভার করব তুমি সেগুলো রি-চেক করবে, যাতে কোনোকিছুই আমাদের চোখ এড়িয়ে না যায়।’

‘আমরা আসলে নির্দিষ্টভাবে কী খুঁজছি?’ সামিরা বোঝার চেষ্টা করছে আসলে কী ধরনের ক্লু খোঁজার কথা ভাবছে ওরা।

‘আমি আসলে সঠিকভাবে জানি না,’ বাশার মাথা নেড়ে মানা করল। সে এর মধ্যেই আশপাশে দেখতে শুরু করেছে। ওপরে মেঘের ডাক আরো বেড়েছে, আকাশের দিকে তাকিয়ে বাশারের মনে হলো, যেকোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। ‘যেকোনো কিছু, যেকোনো অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে দেখতে হবে আমাদের। যেটাই সামান্য সন্দেহের উদ্বেক করে সেটাই পরখ করে দেখতে হবে,’ বলে বাশার টকিটা ভুলে নিয়ে সেটাতে কথা বলে উঠল, ‘সবাই জায়গামতো পৌঁছে গেছো? গুড জলদি

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

করো, কারণ বৃষ্টি চলে আসবে যেকোনো সময়, আর একবার বৃষ্টি এলে কাজ আরো কঠিন হয়ে যাবে। তবে কোনোকিছু বাদ দেবে না,' বলে সে বিস্তারিত বলে গেল সামিরাকে যা বলেছে।

'লেটস স্টার্ট,' বলে বাশার কাজ শুরু করে দিল। বাশার আর সামিরার ভাগে যে-জায়গাটা পড়েছে সেটা খুবই সাধারণ বাংলাদেশের যেকোনো জায়গার মতো ঘেসো এলাকা, একটা বন্ধ চায়ের দোকান দেখল, ওরা আর কয়েকটা দোকানঘর। ওগুলো এখনো চালু হয়নি। পরবর্তী আধাঘণ্টা ধরে পুরো জায়গাটা চম্বে ওরা ফিরে গেল গেটের কাছে। গেটের কাছে গিয়ে দেখল অন্যরা এর মধ্যেই চলে এসেছে। হালকা শীতের সময় হলেও বৃষ্টি ভাবের কারণে ভ্যাপসা আবহাওয়া এবং গরম। স্যার, কিছুই তো পাইলাম না,' রমিজ দারোগা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলে উঠল। 'এখন করবাম কি?'

'আমাদের আবার পরখ করতে হবে পুরো জায়গাটা,' বাশার বলে উঠল, খানিক চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে, কপালে চিকন ঘাম।

'স্যার, বেশ ভালোভাবেই তো দেখা হলো পুরো এলাকা, আপনি কি নিশ্চিত—' ইচ্ছে করেই নিজের প্রশ্নটা পুরোটা উচ্চারণ না করে ইনসপেক্টর রবিউল সমর্থনের আশায় অন্যদের দিকে তাকাল। কেউ কিছু বলে ওঠার আগে কনস্টেবল আবদুল্লাহ বলে উঠল, 'আমি জানি না এইখানে কিছু আছে কি না। তবে যদি বাশার স্যারে কয় এইখানে সারাদিন ঘোরাঘুরি করতে পারব।'

'আমিও,' রমিজ দারোগা যোগ করল তাদের সঙ্গে। আন্তরিক খুশি হলো বাশার। সে মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বলে উঠল, 'সারা দিন ঘোরাঘুরি করতে হবে না, তবে আমরা আরেকবার পরখ করব পুরো এলাকা। চলো শুরু করি।

এবারে দলে কিছু রদবদল করল বাশার, তারপর ইনসপেক্টর রবিউলকে নিয়ে চলে এলো ওর নিজের এলাকাতে। এবার অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তার আর ইনসপেক্টর রবিউলের বরাদ্দকৃত এলাকার প্রতিটা ধূলিকণা এবং প্রতিটা ঘাস-পাতা উলটে পরখ করার চেষ্টা করল কিন্তু প্রায় হতাশ হয়ে যখন শেষ দিকে চলে এসেছে এমন সময় টকিতে কথা বলে উঠল সামিরা, 'বাশার, তুমি আমাদের এদিকে আসবে একটু?'

বাশার একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে ওরা কিছু পেয়েছে কি না—কিন্তু সেটা না করে সে ইনসপেক্টর রবিউলকে নিয়ে দ্রুত রওনা দিল সেদিকে। সামিরা আর রুশো এবার একদলে, ওদের এলাকাটা পড়েছে পাতাল মন্দিরে যাওয়ার এলাকাটার গেট থেকে বেরিয়ে সর্বোচ্চ বামে যেখানে মোবাইল টাওয়ার এলাকা শুরু হয়েছে সেখানে। এটাই সেই আট শ গজের শেষ মাথা। সেখানে গিয়ে দেখল রমিজ দারোগা আর আবদুল্লাহও চলে এসেছে। 'কি পেয়েছো?'

সিপাহী

সামিরা তার গ্রাভস পরা ডান হাতের দুই আঙুলে ধরে আছে কিছু একটা। কাছে গিয়ে জিনিসটা দেখে ড্র কুঁচকে উঠল বাশারের। 'সিগারেটের মোথা?'

'উহ,' মাথা নেড়ে মানা করল সামিরা। 'সিগারেটের মোথা,' বলে সে কাঁধ ঝাঁকাল। 'অবশ্য এটাকে সিগারের মোথা বলে কি না জানা নেই। খাওয়া সিগারের শেষ অংশ বলতে পারো,' সামিরার মুখে খানিক হাসি।

এগিয়ে এসে জিনিসটা হাতে নিল বাশার। 'খুব স্বাভাবিকভাবেই এটা এখানকার মানুষজন স্মোক করার কথা না, আবার এমনও নয় যে ময়মনসিংহের মানুষ সিগার খেতে পারবে না।'

'অবশ্যই,' বলে সামিরা আরেকটু দাঁত বের করল। 'কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গাতে। আমি তো কঠিন বিড়িখোর—এটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছো।'

'তা আর কইতে!' রমিজ দারোগা হঠাৎ করে বলেই দাঁত কাটল জিভে। কিন্তু সামিরা পজ্জিটিভভাবেই নিল বিষয়টা। 'রমিজ ভাই ভুল বলেননি। যাই হোক শুধু বিড়ি না আমি খুব শখ করে মাঝেমাঝে দেশি-বিদেশি সিগারেট খাই। সে-অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এই সিগারটার নাম বেনিংটন সিগার। খেয়াল করে দেখো অন্য সিগারের মতো এটায় নিচের দিকে কোনো লেবেল নেই, বরং এনামেড করা মার্কিং আছে। আর এই সিগার একটা কারণে খুবই বিখ্যাত,' বলে সে নাটকীয়ভাবে একটু থামল। 'এটা পুরো দুনিয়ায় মিলিটারি পারসোন্যাল এবং মার্সেনারিদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় একটা ব্র্যান্ড।'

'আর গতকালের আক্রমণের কথা মাথায় রাখলে,' বাশার নিজের বাক্য শেষ করল না। 'এটা পেয়েছো কোথায়?' সামিরা ইশারায় বন্ধ দোকানের মতো দেখাল। 'এটা কি মার্কেট বা—'

'স্যার, এটা সরকারি কাজের একটা জায়গা,' কনস্টেবল আবদুল্লাহ বলে উঠল। 'আমি আর রমিজ ভাই যখন খোঁজ নিচ্ছিলাম তখন জেনেছি এখান দিয়ে সরকারি এজেন্টের একটা রাস্তা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু পরে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তাই বছরখানেক ধরে এটা বন্ধ রয়েছে।'

বাশার সিগারেটের গোড়াটা ইনসপেক্টর রবিউলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে উঠল। 'ইনসপেক্টর এটা ময়মনসিংহের ল্যাবে টমি বা পাটোয়ারি স্যারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করে এটাকে ল্যাব টেস্ট করতে বলেন,' ইনসপেক্টর রবিউল সম্মতি জানিয়ে চলে গেল বাশার এগিয়ে গেল ছাপনাটার দিকে।

'স্যার সরকারি জায়গায়, ঢুকতে আবার অনুমতি—'

বাশার পান্ডাও দিল না। ছোট বন্ধ দোকানঘরের মতো জায়গাটার কাছে গিয়ে নিচের দিকে দেখে ফিরে তাকাল অন্যদের দিকে। 'দেখো,' সামিরা এগিয়ে গিয়ে দেখল, একটা পুরনো মসচে পড়া তালু ভেঙে পড়ে রয়েছে। বাশার একটানে তুলে

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

কেন্দ্র শাটারটা। অন্যপাশে কিছু নির্মাণের জিনিস পড়ে রয়েছে, সবই পুরনো, মূল্যবান কিছু নেই চোরে নেওয়ার মতো কিন্তু আধো আলোতে ওরা খুবই মূল্যবান কিছু বুজে পেল। নির্মাণাধীন আকৃতির আধাপাকা বালিময় মেঝেতে অসংখ্য পায়ের ছাপ।

‘কি মনে হয়, এগুলো কি—’ সামিরার প্রশ্নটা শেষ করতে দিল না বাশার। সে ত্রানমনে বলে উঠল, ‘এখানে পায়ের ছাপ যেকোনো হতে পারে,’ যদিও পায়ের ছাপগুলোতে মিলিটারি বুটের পায়ের ছাপ পরিষ্কার। ‘সামনে এগোবো আমরা সবাই সাবধান, সবাই প্রস্তুত থাকো। কিন্তু ছোপ বা অ্যাভিডেন্স যেন নষ্ট না হয়,’ বাশারের বুকের ভেতরে ধূপপুক করছে, জ্যাকেটের ভেতরে শরীরের ঘাম টের পাচ্ছে সে। উদ্বেজনাটা কি স্রেফ সম্ভাব্য কু খুঁজে পাওয়ার কারণে, নাকি ভয়ে, না সম্ভাব্য শত্রুর মুখোমুখি যাওয়ার সম্ভাবনায়, ঠিক বুঝতে পারছে না বাশার। নিজের পিঙ্কলের ওপরে একটা হাত রেখে মনোযোগের সঙ্গে পরখ করতে করতে সামনে এগোল সে। তার পাশে সামিরা এবং পেছনে অন্যরা।

ছোট আকৃতিটার অন্যপাশের মাটিতে নেমে থেমে গেল বাশার। এখানে মাটিতে দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে লোকগুলোর পায়ের ছাপ দেখা গেছে, তারা এখানে এসে নেমেছে। মাটিতে বসে পড়ল বাশার। বেশির ভাগ পায়ের ছাপই মিলিটারি বুটের—শুধু একটা ভিন্ন পায়ের ছাপ। বাশারের বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা একটা লাফ দিল, কিন্তু নিজেকে কোনো আশার বাণী শোনালা না সে মনে মনে। মাটিতে বসে আলগোছে পায়ের ছাপগুলো একবার দেখল সে। খানিক মাটির পরেই শুরু হয়েছে এলোমেলো ঘেসো এলাকা। ঘাসের ওপরে গিয়ে হারিয়ে গেছে পায়ের ছাপগুলো। মাটি থেকে সোজা হয়ে সে ফিরে তাকাল ঘাসের দিকে। ঘেসো এলাকা ছড়িয়ে পড়েছে সামনে, ও ঠিক ধরতে পারছে না, সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ‘আবদুল্লাহ, এই এলাকা আসলে কীসের এবং সামনে কী রয়েছে?’ বাশার প্রশ্ন শেষ করতে পারল না, তার আগেই তুমুল শব্দে বজ্রপাত হলো।

‘স্যার, ভালো করে দেখেন, এইদিকে এগিয়ে গেলে ওই যে বামে ওখানে একটা হেলথ কেয়ার সেন্টার বানানো হবে, এদিক দিয়ে এগিয়ে গেলে একটা গ্রাম পড়বে যেখানে গৃহহীনদের বা দেউলিয়া এরকম লোকজনকে নিয়ে একটা গ্রাম বানানো হয়েছে।’

‘আর এই যে দেখা যাচ্ছে রাস্তার মতো, এটা কি?’ সামনে ঘেসো এলাকার পরেই ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। আর সেটার পরে একটা মোটা কাঁচা রাস্তার মতো আকৃতি দেখা যাচ্ছে।

‘স্যার, এইটা একটা রাস্তা আগে এইখান দিয়ে বানানো কথা ছিল। ওর জন্যই এইটা বানানো হইছিল, পরে নদীর কি জানি সমস্যার কারণে না কি কারণে পথ পরিবর্তন করা হয়।’

সিপাহী

‘এইটা গেছে কোনদিকে?’ বাশার কৌতূহলী হয়ে পরিমাপ করছে জায়গাটা।

‘স্যার, এইটা আধমাইলের মতো সামনে গিয়ে বাঁক নিয়ে তারপর আরো আধা মাইলের মতো সামনে গেলেই একটা পাকা ঘাটের মতো স্টেশন বানানো হইতেছিল, সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের পর ওইটারও কাজ বন্ধ আছে বছরখানেক।

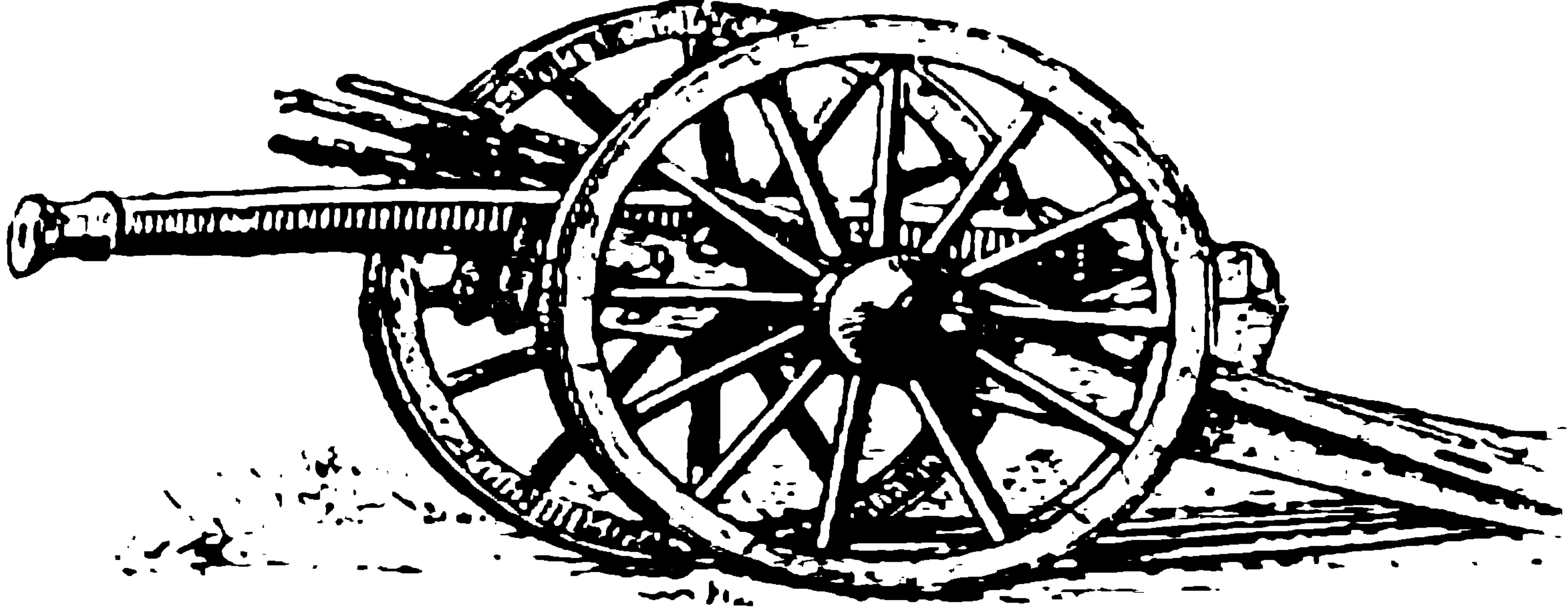
আবদুল্লাহর কথা শুনে উদ্বেজনায প্রায় লাফিয়ে উঠল। ‘যদি ওরা এখন দিয়ে পালিয়ে থাকে তবে অবশ্যই ওদিকে গেছে।’

‘স্যার এদিক দিয়ে—’

বাশার কথা না শুনে এগিয়ে গেল ঝোপজঙ্গলের মতো জায়গার দিকে, ওটার কাছে গিয়ে আবারো থেমে গেল সে। ‘দেখো,’ সবাই দৌড়ে এসে দেখল ঝোপের মতো জায়গাটার ওপাশে আবারো বেলে মাটি, সেখানে পরিষ্কার টায়ারের দাগ, অন্তত দুটো গাড়ি চলে গেছে ওখান থেকে উলটোদিকে। অন্তত টায়ারের দাগ তাই বলছে। ‘জলদি চলো,’ বাশার কথা শেষ করতেই বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল। ‘জলদি জলদি, বৃষ্টিতে টায়ারের দাগ মুছে যাবে।’ যদিও সে অনুমান করতে পারে কোন দিকে যাবে টায়ারের দাগ তাও ঝুঁকি নিতে চাইছে না বাশার। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির ভেতর দিয়ে টায়ারের দাগ ধরে দৌড়ে চলল সে, যদিও বাকিরাও আসছে পেছনে, কিন্তু সেদিকে দেখার সুযোগ নেই। একমনে দৌড়ে চলেছে বাশার, ওর ঠিক পাশেই আবদুল্লাহ। ‘স্যার, সামনে বামে,’ আবদুল্লাহ না বললেও চলত। কারণ টায়ারের দাগও ওদিকেই বাঁক নিয়েছে। বাঁক ঘুরতে ঘুরতে বৃষ্টির বেগ আরো বাড়তে লাগল, বাঁক ঘুরে আরো জোরে দৌড়াতে লাগল বাশার। কোয়ার্টার মাইলের মতো এগোতেই সামনেই নদী দেখতে পেল বাশার, বৃষ্টির ভেতরে দেখতে খানিক ধূসর লাগল। আর নদী চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে সামনে নদীর কিনারায় একপাশে সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে একটা অর্ধনির্মিত ভবনের মতো, আসলে ভবন না বলে বলা উচিত ঘাট কিংবা মালামাল লোড-আনলোড করার স্টেশনের মতো। আরেকটু এগোতেই থেমে গেল বাশার, বৃষ্টির ভেতরে মনোযোগ দিয়ে সামনের দিকে দেখতে দেখতে নিজের পিস্তল বের করে আনল।

অপেক্ষা করছে অন্যদের আসার। সামিরা, রুশো আর একটু পরে হাঁপাতে হাঁপাতে রমিজ দারোগা এসে হাজির হলো পাশে। ‘কি অইলো থামলাইন ক্যা, স্যার?’ দম নিতে নিতে সে জ্ঞানতে চাইল। একে তো বৃষ্টি তার ওপরে পায়ে সমস্যা নিয়ে জোরে এগোতে গিয়ে জ্ঞান বের হয়ে গেছে তার।

বাশার কিছু না বলে বৃষ্টির ভেতরে সামনের দিকে দেখাল। ‘আমাদের প্রথম কুয়ের সঠিক উত্তর দেখা যাচ্ছে সামনে। ওরা কীভাবে ওই এলাকা থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছিল সেই উত্তর,’ বলে সামনে দেখাল বাশার।



অধ্যায় ছত্রিশ

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

মিরাট, উত্তর ভারত

এগিয়ে আসতে থাকা উস্তাল স্রোতটাকে দেখে কর্নেল থেমে গেল ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু অভিজ্ঞ মস্তিষ্ক কয়েক মুহূর্তের ভেতরে হিসেব করে বের করে ফেলল আসলে কী এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠল সে, একটানে নিজের তরবারির মাথাটা বের করে নিল তরুণ অফিসারের বন্দুকের নলের ভেতর থেকে। ওটাকে বের করে নিয়েই সে নিজে একপাশে সরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পালোয়ানের চাদরের এক অংশ ধরে টান দিয়ে তাকেও সরিয়ে নিয়ে এলো ফটকের কাছে। এতে করে দুটো ব্যাপার ঘটল, একে তো নিজেরাও সরে এলো এগিয়ে আসতে থাকে ঘোড়া এবং ঘোড়ার গাড়ি থেকে, সেই সঙ্গে তারা দুজনে এমনভাবে দাঁড়াতে পারবে যাতে করে, ত্রিলোকের পরিবারের ওপরে কোনো আঘাত না আসে। কিন্তু সে টানলেও পালোয়ান সরে এলো না, ক্ষণিকের জন্য থমকে গেল কর্নেল, কিন্তু দেরি না করে সরে এলো সে নিজে। পালোয়ানও বুঝতে পেরেছে সামনে থেকে কী আসছে এবং কর্নেল কী করতে চেয়েছে, কিন্তু সে তাকিয়ে রয়েছে সবচেয়ে ঘেউ ঘেউ করতে থাকা তার কুকুর বাহাদুরের দিকে। বিপদ দেখলেও পিছিয়ে আসার পরিবর্তে সে কুকুরটার দিকে লাফ দিল, ওটাকে এক হাতে ধরে যখন পেছাতে শুরু করল তখন প্রায় চলে এসেছে সোলোমান আর তার বিরাট ঘোড়াটা, সেটার পেছনে চাকাওয়ালা গাড়িতে বসা পিটার এবং গাড়ির পেছনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা খড়ে লেগে থাকা আগুন। ফলে দেখে মনে হচ্ছে ওদের দিকে ছুটে আসছে কোন আগুনে দানব।

ছুটে আসা আগুনে দানবের দিকে তাকিয়ে ক্ষণিকের জন্য থমকে গেলেও যখন গায়ের ওপরে প্রায় চলে এসেছে প্রায়—এমন সময়ে চিৎকার করে উঠল ইংরেজ অফিসারদের নেতা। সঙ্গে সঙ্গে আগে-পিছে থাকা যেকোনো পারল লাফিয়ে সরে গেল রাস্তার এদিক-সেদিকে। আর যারা দুয়েকজন সরতে পারল না, দৈত্যাকার

সিপাহী

ঘোড়ার সামনের অংশে বাড়ি খেয়ে পলকা পুতুলের মতো ছিটকে পড়ল একপাশে। ঘোড়াটাও প্রায় চলে এসেছে, পালোয়ান তখনো তার কুকুর বাহাদুরকে দেখলেও সরে দাঁড়াতে পারেনি, কর্নেল সরে গেছে আগেই, আর ইংরেজ অফিসারে ছিটকে পড়েছে এদিক-সেদিকে। নিজের মালিককে দেখে সর্বশক্তি দিয়ে ডাক ছেড়ে নিজের দুই পা উঠিয়ে খেমে যাওয়ার চেষ্টা করল ঘোড়াটা। তীব্র এই ধাক্কা সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ল সোলেমান, তার পেছনে গাড়িটা বাঁকা হয়ে উলটাতে উলটাতে সোজা হয়ে রইল কিন্তু টিকতে পারল না পিটার, সে সোলেমানের মতোই ছিটকে দুজনেই একজনের গায়ে অন্যজন বাড়ি খেয়ে তালগোল পাকিয়ে গিয়ে পড়ল কর্নেলদের ওপরে। ত্রিলোকের পরিবারকে ঠেলে সরিয়ে দিল না কর্নেল, দুজনে গিয়ে ফটকের ওপরে বাড়ি খেয়ে খেমে গেল।

কৃষিকের জন্যে খেমে গেল সব, সবাই সবার জায়গায় ছির। কর্নেল আর ত্রিলোক আগলে রেখেছে ত্রিলোকের পরিবারকে, পালোয়ান একহাতে ধরে রেখেছে তার কুকুরটাকে, অন্য হাতে তার বিরাট লাঠি, ঘোড়াটা খেমে গেছে তার পাশে, ইংরেজ অফিসাররা ছিটকে পড়া থেকে উঠে বসার চেষ্টা করেছে। এমন সময়ে সোলেমানদের পিছু নিয়ে আসা বাহিনীটা ঝড়ের বেগে এগোতে এগোতে এই জটলা আর হট্টগোল দেখে খেমে গেল ওখানে।

দৃশ্যটা হলো দেখার মতো।

একদিকে, ইংরেজ অফিসাররা খানিক ছির হয়েছে, অন্যদিকে বিদ্রোহীদের দলটা ধাওয়া করতে করতে একেবারে সামনে এসে পড়েছে ইংরেজদের একটা প্রাটুনের মুখোমুখি। ইংরেজ আর বিদ্রোহী দুই বাহিনীই কৃষিকের জন্যে ছির হয়ে রইল, পরমুহূর্তে দাঁতে দাঁত চেপে ঝাঁপিয়ে পড়ল একে অপরের ওপরে। ছোট গলিটা মুহূর্তের ভেতরে নারকীয় রূপ ধারণ করল দুই বাহিনীর চিৎকার আর আক্রমণে, অস্ত্রের ঝনঝনানি এবং ভয়ংকর শব্দশ্রাব্যে। আজীবনের তীব্র ঘৃণা নিয়ে একে অপরের সঙ্গে ঝুনে লড়াইয়ে লিপ্ত হলো দুই বাহিনী।

ঠিক অন্যদের মতোই প্রথমে চমকে উঠলেও এবং বিরতিতে থাকার পরেই এখানে সবচেয়ে বেশি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা কর্নেলের এবং সবচেয়ে ঠান্ডা মাথাও তারই। কাজেই সবার আগে সেই সামলে নিল নিজেকে। প্রাথমিক ধাক্কার ঠিক পর দিয়ে সবার আগে সেই সচেতন হয়ে উঠল। সোলেমান আর পিটার ত্রিলোকের বাড়ির ফটকের কাছে ছিটকে পড়েছে, ঘোড়াটাও খেমে গেছে তার মালিকের সামনে—কিন্তু ওটার পেছনে জুড়ে দেওয়া গাড়িটা এসে খেমেছে ঠিক ওদের সামনেই। কর্নেল দেখল এইটাই সুযোগ এবং সম্ভবত একমাত্র সুযোগ, সে পলকের ভেতরে ঝট করে ত্রিলোকের দিকে ফিরে তাকাল।

ত্রিলোকও বুঝতে পেরেছে কর্নেল আসলে কী করতে চাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই নড়ে উঠল একসঙ্গে। যে-ছেলেটাকে নামিয়ে দিয়েছিল সে, ওটাকে একটানে তুলে ফেলল গাড়ির ওপরে, সেই সঙ্গে চিৎকার করে প্রথমে পালোয়ানকে

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

সাবধান করে দিয়ে সে-ই ছুটল সোলেমান আর পিটারের দিকে। দুজনেই তখন উঠ বসার চেষ্টা করছে, কর্নেল দৌড়ে তাদের কাছে পৌঁছেই প্রথমে একটানে পিটারকে তুলে ফেলল। সোলেমান ততক্ষণে নিজেকে তুলে ফেলার চেষ্টা করছে। কর্নেল দুজনকেই নির্দেশ দিল ফটকের পাশেই বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলোকে নিয়ে আসার জন্য। বলেই সে ফিরে এলো ত্রিলোক আর গাড়িটার কাছে, ত্রিলোক প্রায় তার পরিবারের লোকদের তুলে ফেলেছে গাড়িতে। কিন্তু পালোয়ান আর তার ঘোড়ার মধ্যে চলে এসেছে সেই তরুণ অফিসার, পালোয়ান তাকে দেখতে পেয়েই নিজের লাঠি ওঠাল কিন্তু লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করতে হলে পালোয়ানকে এগোতে হবে, তার আগেই তাকে গুলি করবে, কর্নেল নিজের পিস্তলে হাত দেবে কিন্তু সে ভয় পাচ্ছে পিস্তল বের করে গুলি করতে করতে দেরি হয়ে যাবে, পিস্তল বের করতে করতে আপনাতেই এক পা সামনের দিকে এগিয়ে গেল সে। তরুণ অফিসার পালোয়ানকে গুলি করতে যাবে, দুই লাফে পলকের ভেতরে ঠিক সাপ যেভাবে ছোবল মারে, সেভাবে এগিয়ে গিয়ে অফিসারের উরু কামরে ধরল পালোয়ানের কুকুর, অফিসার চিৎকার করে উঠে আপনাতেই ট্রিগার চেপে দিল। নিশানাবিহীন বন্দুকের গুলি ছুটে গেল খোলা আকাশের দিকে। পালোয়ান এগিয়ে এসে কাঁধ বরাবর এক বাড়ি মেরে মাটিতে গুইয়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল নিজের ঘোড়াতে। কর্নেল তাকিয়ে দেখল ত্রিলোকের পরিবার উঠে পড়েছে গাড়িতে, সোলেমান আর পিটার দৌড়ে নিয়ে আসছে ঘোড়াগুলো। ত্রিলোক এক হাত তুলে ইশারা করে বুঝিয়ে দিল ওরা প্রস্তুত, কর্নেল নিজের হাত তুলে ইশারা শেষ করার আগেই চিৎকার করে ঘোড়ার লাগাম ধরে টান দিল পালোয়ান। সে এক টানে ঘোড়াটাকে সামনে এগোতেই ওটার টানে ঘুরে গেল গাড়িটা।

মুহূর্তের জন্য কর্নেল ভয় পেল গাড়িটা ছুটে যাবে কিংবা ঘোড়ার তীব্র টানে ত্রিলোকের পরিবারের কেউ ছিটকে পড়ে যাবে। কিন্তু ছোট গাড়িতে এমন ঠাসাঠাসি করে বসেছে ওরা, সেটা হলো না। কর্নেলের ভয়কে অমূলক প্রমাণ করে দিয়ে সামনের পা শূন্যে তুলে দিয়ে ঝড়ের বেগে সামনে বাড়ল ঘোড়া। উন্মাদের মতো লড়তে থাকা একাধিক মানুষকে পিষে দিয়ে বা বাড়ি মেরে ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে, সঙ্গে টেনে নিয়ে চলল গাড়িটাকে, গাড়ির বাড়ি খেয়ে পড়ে গেল আরো একজন, একটু হলে কর্নেলও ওটার সঙ্গে বাড়ি খেতে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে।

পালোয়ানের ঘোড়া আর গাড়ি দুটো সামনে বাড়তেই লড়াইরত দুই বাহিনীই ফিরে তাকাল ওদিকে। ওরা ধরতে পেরেছে তাদের লড়াইয়ের সুযোগ নিয়ে পালাচ্ছে কর্নেলের বাহিনী। সামনে থাকা একজন বন্দুক তুলতে যাচ্ছিল, কর্নেলের গুলি খেয়ে পড়ে গেল, হাতের বন্দুকটাকে ফেলে নিয়ে তলোয়ার বের করল সে, এগিয়ে আসা একজনকে তলোয়ারের খোঁচায় ফেলে দিয়ে সে এক হাতে ধরে ফেলল সোলেমানের ছুড়ে দেয়া ঘোড়ার দড়ি। ওটাকে ধরে একটানে ঘোড়াটাকে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই লাফিয়ে এগিয়ে গেল ওটার দিকে। একটানে নিজেকে

সিপাহী

তুলে ফেলল ঘোড়ার ওপর। ত্রিলোক অন্য ঘোড়ায় আর সোলেমান পিটার এক ঘোড়ায় চড়ে বসেছে আগেই। 'প্রয়োজনে মেরে কেটে এগোতে হবে,' কথাটা চিৎকার করে বলেই সে নিজের ঘোড়ার লাগামে ধরে জোরে টান দিল। একসঙ্গে তিনটে ঘোড়া এগোতে শুরু করল সামনের দিকে।

কর্নেলের এক হাত লাগামে, অন্য হাতে ধরা খোলা তলোয়ার। ঘোড়া চলতে শুরু করেছে, সবার সামনে পালোয়ান এগিয়ে চলেছে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া গাড়ি নিয়ে, তার ঠিক পাশেই দৌড়াচ্ছে কুকুরটা, পালোয়ানের ঠিক পেছনেই ত্রিলোক আর সোলেমানদের ঘোড়া। আর কর্নেল সবার শেষে। তাকে নিয়ে পেছন থেকে আসা যেকোনো বিপদ ঠেকিয়ে দলটাকে সাবধানে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে যাওয়া—কিন্তু একটা সমস্যা চোখে পড়ল, সবার সামনে পালোয়ান কিন্তু সে তো শহর থেকে বের হওয়ার রাস্তা চিনতে পারবে না, কর্নেল চিৎকার করে ত্রিলোককে সামনে এগোনোর জন্য বলল, সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের গতি বাড়াতে শুরু করে।

কর্নেল খুশি হয়ে উঠল। এবার পুরো দলটা লাইনে এসেছে, সবার সামনে ত্রিলোক, তার পাশেই পালোয়ান, ওদের পরেই সোলেমান পিটার এবং সবার শেষে কর্নেল। 'ইয়াহা,' বলে চিৎকার করে গতি বাড়ানোর নির্দেশ দিল কর্নেল। সামনেই একবার পেছন ফিরে দেখল কেউ এগিয়ে আসছে কি না, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র গতিতে কিছু একটা এসে লাগল তার কাঁধে। কী লাগল বুঝতে পারল না, কিন্তু এটা বুঝতে পারল তার হাত ছুটে গেল লাগাম থেকে, কিন্তু নিজের তলোয়ারটা ছাড়ল না। সে বুঝতে পারছে মাটিতে পড়ে গেলেও এটা তার লাগবে। ঘোড়া থেকে পিছলে নেমে আসতে আসতে সে তলোয়ারটা ঢুকিয়ে দিল খাপের ভেতরে, সঙ্গে সঙ্গে পুরো শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে কিন্তু পা-টা লাগামের সঙ্গে আটকে পড়ে যেতে যেতেও আটকে রইল সে। কিন্তু শরীর পুরোপুরি ভারসাম্যহীন, মাটি থেকে ফুটখানেক ওপরে তার মাথা, যেকোনো সময় ছিটকে পড়বে সে মাটিতে আর একবার পড়লে সোজা ঘাড় ভেঙে যাবে। দুইবার হাত তুলে সে লাগাম ধরার চেষ্টা করল কিন্তু কাজ হলো না, বরং বিপজ্জনক ভঙ্গিতে শরীর পিছলে চলেছে মাটির দিকে।

এর ভেতরেও বড় কিছু একটার অস্তিত্ব টের পেলে, শত্রু-মিত্র জানা নেই, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করার আগেই একটা ধরে ফেলল শূন্যে ঝুলে থাকা হাতটা টেনে সোজা করে দিল তাকে খানিকটা। ওই টুকুই দরকার ছিল কর্নেলের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে টেনে সোজা করে ফেলেই দুটো জিনিস দেখতে পেল সে। প্রথমত ঠিক তার ঘোড়ার পাশেই সোলেমানদের ঘোড়া, আর ওদের থেকে আট দশ হাত সামনেই তীক্ষ্ণ একটা বাঁক। 'সাবধান,' বলেই সে খপ করে নিজের ঘোড়ার লাগাম দুই হাতে ধরে ছুটন্ত ঘোড়ার বেগ কমিয়ে আনতেই ঘোড়ার মাথাটাকে ঘুরিয়ে দিল বাঁক পার হওয়ার জন্যে, ঘোড়া তীব্র টানে ভয়াবহ হ্রাস ধ্বনি ছাড়লেও, নিরাপদেই পার হয়ে এলো বাঁকটা। গলি এখানে একেবারে সরু

হয়ে গেছে। কোনোমতে এগিয়ে চলেছে দুটো ঘোড়া পাশাপাশি। সামনে থেকে পালোয়ানের তীব্র চিৎকারের সঙ্গে কিছু একটা ভাঙার শব্দ টের পেল ওরা। উড়ন্ত টুকরো টুকরো কাঠ আর বাঁশ ছিটকে পড়ল চারপাশে।

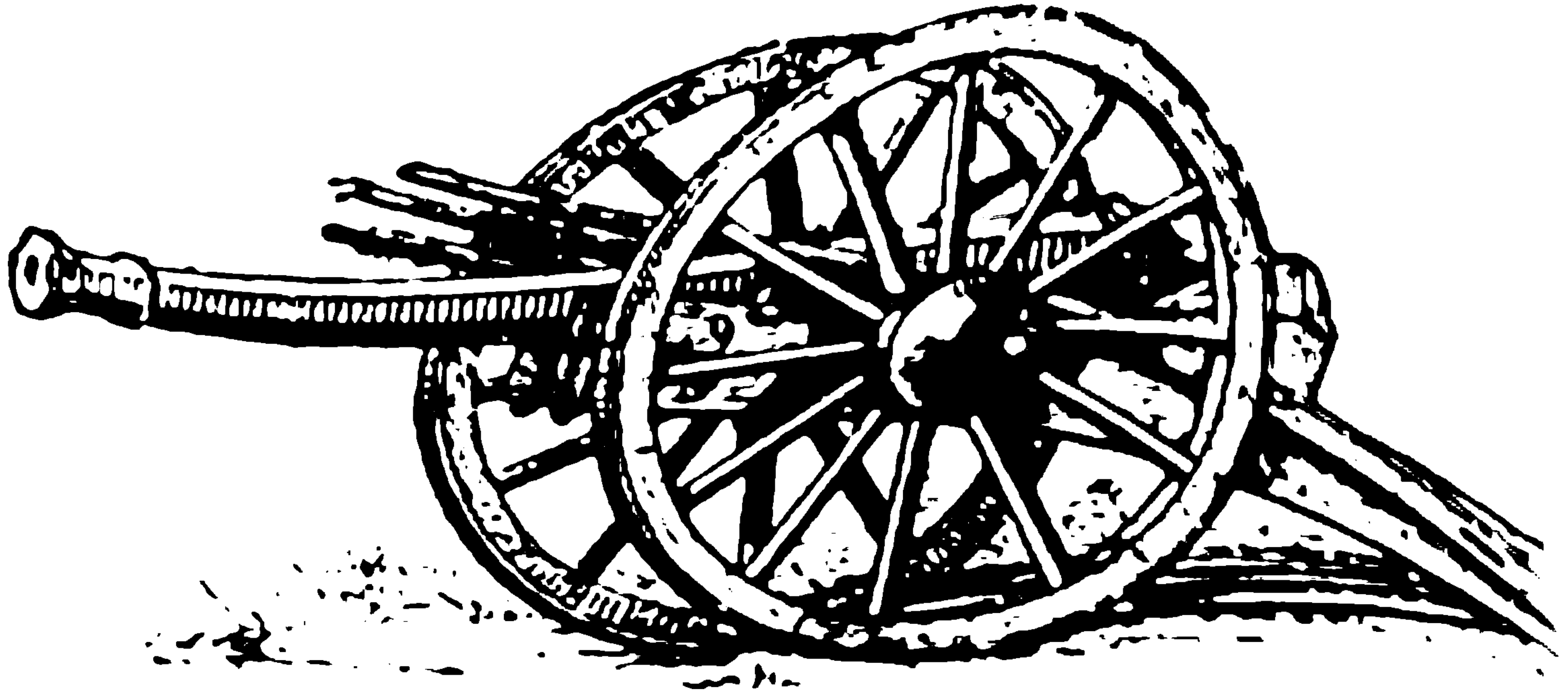
ছিটকে আসা বাঁশ আর কাঠের টুকরো থেকে কোনোমতে নিজেদের বাঁচিয়ে বন্দুকের নল থেকে যেরকম গুলি ছুটে বের হয়, সেভাবে গুলির মাথায় ভেঙে পড়া ছোট ফটক দিয়ে খোলা মাঠে বেরিয়ে এলো ওরা।

‘সামনে সামনে,’ ত্রিলোকের পেছন থেকে পালোয়ান দেখিয়ে দিল কোন দিকে যেতে হবে। আধো অন্ধকারের ভেতরে খোলা মাঠ পার হয়ে শহরের পাশের জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। আরো প্রায় টানা দশ মিনিট ঘোড়া চালিয়ে ওরা পৌঁছে গেল জঙ্গলের ভেতরে—যেখানে ফটক অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। প্রথম ত্রিলোক আর পালোয়ান ঘোড়া থামিয়ে ফেলল, এরপর কর্নেল, আর সঙ্গে সঙ্গে সোলেমানরাও এসে থামল। ঘোড়া থামিয়ে কিছুক্ষণ দম নিল কর্নেল তারপর ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে ধাম করে মাটিতে পড়ে গেল কর্নেল। অন্য পাশ থেকে দৌড়ে আসা ফটক এগিয়ে এসে ধরে ফেলল কর্নেলকে, মাটিতে থেকে টেনে তুলে বসিয়ে দিল একটা গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে।

গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বড় বড় করে দম নিতে লাগল কর্নেল, দিনের আলো ফরসা হতে শুরু করেছে, পূর্বের আকাশে সূর্যের লালিমা, সেই লাল ভাবটাকে আরো বাড়িয়ে দিয়ে পুরো রক্তাক্ত করে ফেলেছে জ্বলন্ত মিরাত শহরের আশ্রয়। জ্বলছে শহর, মরছে মানুষ, কর্নেল চোখ ফিরিয়ে ঘুরে তাকাল নিজের লোকদের দিকে। সে ভাবতে পারেনি এই শহর থেকে পরিবারসহ বের করে আনতে পারবে ত্রিলোককে—কিন্তু পেরেছে। নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কর্নেল হঠাৎই হেসে উঠল পালোয়ান, এমনকি তার চোখ-মুখ চেহারাও বিক্ষম দেখাচ্ছে।

‘কি হলো, হাসো কেন?’ কর্নেল জানতে চাইল পালোয়ানের কাছে। তার প্রশ্নের জবাবে হেসে উঠল ত্রিলোক এবং তার সঙ্গে পিটার এবং সোলেমান। না বুঝে ফটকও হাসতে লাগল। ওরা হেসে চলল, ত্রিলোকের পরিবার বুঝতে পারছে না, ওরা হাসছে কেন।

হাসতে হাসতেই কর্নেল ভালোভাবে দেখল নিজের লোকদের। আবার সেই আগের দিনগুলোর মতোই লাগছে তার কাছে। যেন ফিরে গেছে সেই দশ বছর আগে। নিজের লোকদের দেখে কর্নেল উপলব্ধি করল, তার দলগঠন হয়ে গেছে, এবার কাজে নামতে হবে, মূল কাজ যেটার জন্য ভারতে এসেছে সে।



অধ্যায় সাইত্রিশ বর্তমান সময় ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে, বেগুনবাড়ি এলাকা

বৃষ্টির বেগ এখন মৃদু থেকে ভারি হতে শুরু করেছে। বড় বড় ফোঁটার কারণে সামনে প্রায় অদৃশ্য দেখাচ্ছে। হালকা শীতের ভেতরে বড় ফোঁটার বৃষ্টি এবং নদীর পাড়ের বাতাসে প্রায় কাঁপ ধরিয়ে ফেলার জোগাড়। বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে গাড়ি দুটো দেখে খেমে গেছে বাশার। ওর এক হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল, অন্য হাতে ওয়াকি-টকিটা তুলে সে ইনসপেক্টর রবিউলকে ব্রিফ করে ফোর্স নিয়ে আসার জন্য নির্দেশনা দিল।

‘আমরা কি ওদের জন্য অপেক্ষা করব স্যার?’ কনস্টেবল আবদুল্লাহর প্রশ্ন।

‘অবশ্যই নয়,’ বলে বাশার এগোনোর আগেই সামিরা পিস্তল হাতে এগিয়ে যেতে শুরু করল গাড়িগুলোর দিকে। বাশার অন্যদের ইশারা করল কীভাবে এগোবে। ক্রশোকে সবার পেছনে সরিয়ে দিয়ে অনেকটা ভি আকৃতির মতো একটা আকৃতি নির্মাণ করল ওরা, তারপর দ্রুত পায়ে এগোল গাড়ি দুটোর দিকে। ওদের থেকে সিকি মাইলের মতো দূরত্বে গাড়িগুলো, সেটার কাছাকাছি পৌঁছে ওরা দেখল দুটো গাড়ি, একটা জিপ, অন্যটা অনেকটা পুলিশ বা মিলিটারি ভ্যানের মতো, দুটো গাড়ি অনেক পুরনো এবং প্রায় বাতিলের মতো, তবে চলার মতো অবশ্যই যেহেতু এগুলো চলিয়েই এখানে এসেছে ওরা। গাড়িগুলো থেকে কয়েক শ গজ দূরেই সেই নির্মাণাধীন স্টেশন বা ঘাটের মতো। এটা দেখলেই বোঝা যায় এটা মানুষ চলাচল নয়, বরং মালামাল আনা-নেওয়া করার জন্য এটা বানানো হচ্ছিল।

গাড়িগুলো থেকে গজ দশেক দূরে থাকতেই সবাইকে থামার নির্দেশনা দিল থামার জন্য। ওদের ভেতরে শুধু বাশার আর সামিরার কাছে অস্ত্র আছে, অন্যদের কাছে কিছুই নেই। কাজেই ওদের থাকতে বলে দুদিক থেকে বাশার আর সামিরা

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

দুজনে এগিয়ে গেল গাড়িদুটোর দিকে। সতর্কতার সঙ্গে প্রাথমিকভাবে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ওরা বুঝতে পারল কেউ নেই, তবে থাকবে আশাও করেনি। বাশার আর সামিরা দুদিক থেকে ঘুরে এসে থেমে গিয়ে অন্যদের এগিয়ে আসার নির্দেশনা দিল। সামিরাকে প্রহরায় রেখে বাশার প্রথমে দ্রুত জিপটাতে চোখ বুলিয়ে নিল। তেমন কিছুই নেই জিপে, আর যা কিছু ছিল পুরনো জিপের ভেতরে বৃষ্টির পানি ঢুকে সব ধুয়ে-মুছে গেছে।

‘ওটা দেখতে হবে, বলে ও রমিজ দারোগা আর রুশোকে জিপের সামনে রেখে, চলে এলো ভ্যানটার কাছে। সামনে কিছুই নেই, আবারো সামিরাকে পিছু হাতে পাহারায় থাকতে বলে, বাশার চলে এলো ভ্যানটার দরজার কাছে। সামিরার দিকে একবার ইশারায় সতর্ক থাকতে বলে কবজা খুলে মেলে ধরল ভ্যানটার দরজাটা। বৃষ্টির ভেতরেও পুরনো ভ্যানের দরজা খুলে গিয়ে ধাম করে বাড়ি খেল অন্য পাশে। ভেতরে ফাঁকা, লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল বাশার। ভেতরে ধুলো-ময়লা ছাড়া তেমন কিছু নেই। ভেতরের সিটগুলোকে মেরামত করা হয়েছে সম্প্রতি, একটা সিটের সঙ্গে লাগানো পুরনো একটা হাতকড়া দেখতে পেল সে। এ ছাড়া সিটের নিচে উঁকি দিয়েও কিছু দেখল না। কড়াটা হাতে নিয়ে বাইরে চলে এসে দেখাল অন্যদের।

‘এবার মূল জায়গা, আমরা ডকে ঢুকব, সবাই সাবধান,’ যদিও জানা কথা ওখানে কেউ বসে নেই ওদের জন্য কিন্তু এটা পরিষ্কার যে বিপদ কোনদিক থেকে আসবে সেটাও জানা নেই, কাজেই সাবধান থাকারও কোনো মার নেই।

‘আমরা কি ইনসপেক্টরের জন্য অপেক্ষা করতে পারি?’ এবার রুশো জানতে চাইল, তাকে দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সে ভয় পাচ্ছে। খুবই স্বাভাবিক।

‘না পারি না, তুমি এখানে থাকতে পারো,’ বলেই নিজের সিদ্ধান্ত বদল করল বাশার। ‘না, এখানে থাকা আরো ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তুমিও আমাদের সঙ্গে আসো। আমরা আবার আগের প্যাটার্নেই এগোব। সবাই চলো,’ বলেই বাশার আগে বাড়ল সামিরাকে ব্যাকআপে থাকতে বলল। ডক স্টেশনের মতো জায়গাটার কাজ ষাটভাগ করেই বাদ দেওয়া হয়েছে, তাই পুরো আকৃতি এবং দেয়াল থেকে শুরু করে রেলিং ইত্যাদি থাকলেও আবার একটা অসম্পূর্ণতার আভাস দেয়। বৃষ্টির বেগ এতটাই বেড়েছে সামনে দেখতে রীতিমতো সমস্যা হচ্ছে। বাশার সাবধানে, তবে যতটা সম্ভব দ্রুত সরে এলো স্টেশনটার ছাদের নিচে। প্রথমেই দেখতে পেল ঢালু স্লোপের মতো একটা পাথরওয়ালা উঠে গেছে ওপরের দিকে। সে অনুমান করল এদিক দিয়ে সম্ভবত মাল ওঠানো বা নামানোর জন্য বানানো হচ্ছিল এটা। ওটা দিয়ে সে উঠে এলো ওপরে, ইশারা করতেই তাকে অনুসরণ করল সামিরা, তারপর একে একে অন্যরা।

সিপাহী

স্টেশনের ওপরের অংশে রাজ্যের ধূলাবালি আর আধা-ভাঙাচোরা নানা ধরনের জিনিস পড়ে রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর ফাঁক দিয়ে খুব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে একাধিক পায়ের ছাপ পরিষ্কার চলে গেছে স্টেশনের অন্য অংশে। এই পায়ের ছাপ যে আগের মানুষগুলোরই সেটা অন্ধও বুঝতে পারবে, আর ওরা তো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুলিশ। 'স্যার, একই পায়ের ছাপ মনে হচ্ছে,' রমিজ দারোগা বলে উঠল।

'তা আর বলতে,' বলে বাশার পায়ের ছাপগুলো ধরে এগিয়ে যেতে লাগল সামনের দিকে। ভাঙাচোরা জিনিসগুলোর ফাঁক দিয়ে খানিক সামনে এগোতেই অন্যপাশের অংশে সে পরিষ্কার গুনতে পেল কেউ নড়াচড়া করছে। মুখের সামনে একটা আঙুল তুলে অন্যদের চুপ থাকার নির্দেশ দিয়ে সে এগিয়ে যেতে শুরু করল, সামনের দিকে যত সামনে এগোচ্ছে নড়াচড়ার আওয়াজ আর ঘসানোর আওয়াজ আরো পরিষ্কার হচ্ছে। 'ওপাশের অংশে কেউ রয়েছে,' পেছন থেকে রুশো বলে উঠতেই, রাগের সঙ্গে তার দিকে ফিরে তাকাল বাশার, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ছেনেটা। 'সবাই চুপ এবং খুব সাবধান, সামিরা আমাকে ব্যাকআপ করো,' বলে বাশার আরেক পা সামনের দিকে এগোতেই সামনে থেকে ধূপ ধূপ মতো আওয়াজ ভেসে এলো। ওপাশে যেই থাকুক না কেন ওদের নড়াচড়া এবং কথা বলার আওয়াজ তার কানে গেছে এবং সে যে এদিকেই এগিয়ে আসছে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। 'সবাই সাবধান,' সামনের কামরায় কে আছে, কয়জন আছে জানা নেই, শত্রু না মিত্র জানা নেই। বাশার থেমে গিয়ে পিঙ্কল তুলল সামনের দিকে। বৃষ্টির আওয়াজ ভেদ করে পরিষ্কার মৃদু ধূপ ধূপ আওয়াজ ভেসে আসছে এবং আওয়াজটার গতি বাড়তে বাড়তে দৌড়ে রূপ নিয়েছে। এমন সময় দুটো ঘটনা ঘটল।

আওয়াজধারী প্রায় দরজার কাছে চলে এসেছে, বাশারও থেমে গিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে কেলছে, নিজেকে সম্ভাব্য আক্রমণ বা পরিস্থিতি থেকে সাবধান করার জন্য ঝানিকটা নিচু করে কেলছে সে, এমন সময় পেছন থেকে বেশ জোরেসোরে আওয়াজ ভেসে এলো। আওয়াজটা মানুষের, না বাহনের না কারো পায়ের আওয়াজ বুঝতে পারল না বাশার। কিন্তু পেছন থেকেও কেউ আসছে, সে-ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই।

কপিকের জন্য দ্বিধায় পড়ে গেল বাশার, সামনের দিকে ঠেকাবে, নাকি পেছন দিকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে স্টেডি করে ফেলল। এ ধরনের টিলেমি কত ভয়ংকর কণ্ঠ করতে পারে, সেই অভিজ্ঞতা তার জীবনে একবার হয়েছে, দ্বিধার কারণে নিজের বন্ধুকে গুলি করে। কাজেই যত কিছুই হোক না কেন নিজের স্টেডি অবস্থান থেকে এক চুল নড়ল না, বরং দৃঢ় গলায় বলে উঠল, 'সারির পেছনে কভার করো। সামনের পায়ের আওয়াজ প্রায় কাছে চলে এসেছে, বাশার ডান হাতের

প্রথম অংশ : শেষ মৃতদের প্রতিনিধি

পিস্তলের গোড়ায় নিজের অন্য হাত স্টেডি করে, আলতোভাবে সেফটি অব করে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সামনের দরজায় উদয় হলো আগন্তুক।

বাশারের হাতে এই মুহূর্তে যে-ধরনের পিস্তল রয়েছে, এটার ট্রিগারকে বলে টাচ সেনসিটিভ। খুব হালকা স্পর্শে যাতে জরুরি মুহূর্তে গুলি করতে পারে সেইজন্য এই ধরনের ট্রিগারের আবিষ্কার। বাশার এতটাই সেনসেটিভ হয়েছিল যে অল্পের জন্য তার মনে হলো সে কোনোভাবেই পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে যাওয়া ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু স্রেফ অভিজ্ঞতা আর মনের জোরের কারণে সে গুলি তো ঠেকালোই সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের নলটাকে তুলে ফেলল ওপরের দিকে। কারণ ওপাশের অংশের দরজা দিয়ে কোনো মানুষ বা সেরকম কেউ বের হয়ে আসেনি। একটা গোবদা-গাবদা কিসিমের শিয়াল বেরিয়ে এসে মুখে কিছু একটা কামড়ে ধরে। দরজার এপাশে বাশার তাকে দেখে যতটা অবাক হয়েছে, সেও কোনো অংশে কম হয়নি। দুজনেই দুজনার দিকে ক্ষণিকের জন্য চমকে তাকিয়ে রইল, এরপরে শিয়াল এবং বাশার দুজনেই ঘুরে গেল উলটোদিকে। শিয়ালটা দৌড়ে পালান, আর বাশার পেছনের আওয়াজের উত্থের দিকে ফিরে তাকাল যদি সামিরার কোনো হেল্প লাগে। কিন্তু সেদিকে তাকিয়েও সে শান্ত হয়ে নামিয়ে নিল পিস্তল। আওয়াজটা আর কিছু না, ইনসপেক্টর রবিউল তার বাহিনী নিয়ে চলে এসেছে। কিন্তু ওরা এসেছে এমন এক সময়ে আরেকটু হলে হার্ট অ্যাটাক হতো বাশারের।

‘স্যার, কিছু পেলেন?’ ইনসপেক্টর রবিউল কাক ভেজা হলেও হাসিমুখে জানতে চাইল। বাশার স্রেফ সামিরার দিকে তাকিয়ে আনমনে একবার মাথা নাড়ল। ‘ছড়িয়ে পড়ুন সবাই, অন্য অংশটা দেখতে হবে,’ বলে সে পায়ের ছাপ ধরে অন্যপাশে চলে এলো, ওপাশের তুলনায় এপাশটা অনেক ছোট এবং ঘাটের মতো জায়গাটা স্টিলের ডকের সঙ্গে, পানিবাহিত বাহন ভেড়ানোর ব্যবস্থা, অন্যপাশটা নেমে গেছে মাটিতে। বাশার অনুমান করল শিয়ালটা ওদিক দিয়েই পালিয়েছে। আশপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বাশার ধুলোমাটিতে পায়ের ছাপ দেখিয়ে ইনসপেক্টর রবিউলকে বলে উঠল, ‘কীভাবে সরে পড়েছে ওরা দেখেন। এখানে কোনো জলবাহিত বাহন ছিল।’

‘তারমানে কি ওরা এদিক দিয়েই এসেছিল?’ সামিরা জানতে চাইল।

‘হুমম,’ বাশার আনমনে বলে উঠল। ‘আমার ধারণা ওরা এই অপহরণের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল অনেক আগেই। বা ওদের এরকম সেটাপ আছেই। ওরা বড় কোনো ট্রলার বা এমন কিছুতে করে এসেছিল, হয়তো গাড়ি দুটো এখানেই ছিল অথবা ওরা নিয়ে এসেছিল। এই ডকে ওরা নেমেছে ব্রহ্মপুত্র ধরে এসে, এখান থেকে গাড়িদুটোতে করে ওখানে গেছে কাজ শেষ করে এসে গাড়ি দুটো ফেলে

সিপাহী

পালিয়েছে। নদীপথে ওরা কোথায় গেছে বের করা খুব কঠিন হবে। কারণ এখান থেকে ইন্ডিয়া পর্যন্ত যাওয়া যায়, আর দেশের ভেতরের অংখ্য নদীপথের সঙ্গে সংযুক্ত এই জলপথ।’ বলে সে ইনসপেক্টর রবিউলের দিকে তাকাল। ‘গাড়ি দুটো সিজ করে ল্যাব বা ওয়ার্কশপে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। এ ছাড়া আর কোনো কু নেই আপাতত। আর—’

পেছন থেকে চিংকার শুনে ফিরে তাকাল ওরা। রুশো ছেলেটার চিংকার, বাশার এবং বাকিরা দৌড়ে গিয়ে দেখল ছোট একটা ব্যাক-ফ্যাক কাম হ্যান্ডব্যাগের মতো ধরে রেখেছে রুশো হাতে। বাশার দেখেই চিনতে পারল এটাই মুখে কামড়ে ধরে বের হয়েছিল শিয়ালটা। ‘কি এটা?’

‘স্যার, রিকাত আপুর হ্যান্ডব্যাগ,’ রুশোর কথা শুনে রাগের একটা হলকা বয়ে গেল বাশারের শরীরে, রাগটা নিজেই ওপরে। আশপাশে এত মনোযোগ দিচ্ছিল মূল বিষয়ই চোখে পড়েনি ওর। এটা চেনা উচিত ছিল ওর।

এগিয়ে গিয়ে এক টানে ব্যাগটা হাতে নিয়ে নিল বাশার। ওটার চেইন খুলে হাত দিল ভেতরে। একেবারে ফাঁকা, না কিছু একটা আছে হাতে। একটা খাম। সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে বাশারকে।

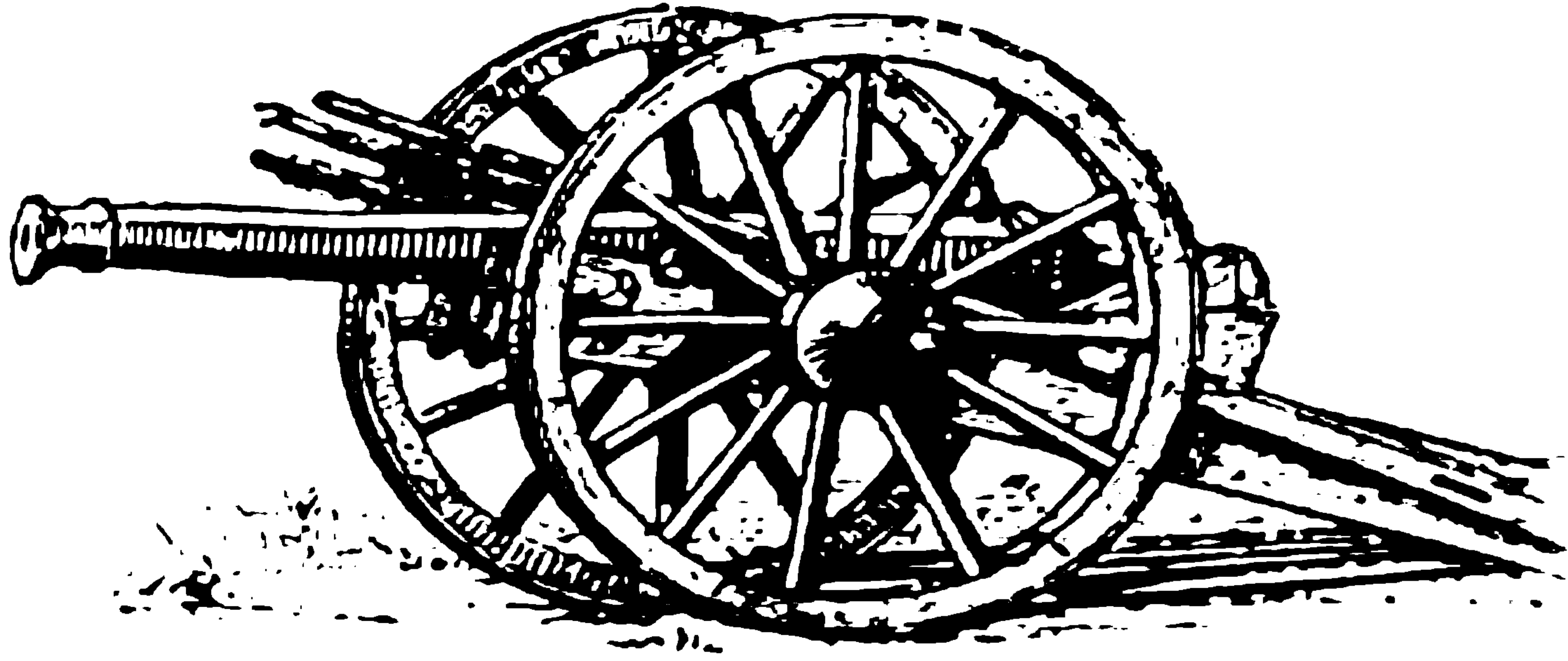
‘আশ্চর্য, এটার ওপরে তোমার নাম লেখা,’ বিন্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল সামিরা।

‘আমাদের দ্বিতীয় প্রব্লেম উত্তর কেন কিডন্যাপাররা কোনো র‍্যানসম দাবি করেনি,’ বলে সে খামটা খুলতেই ভেতর থেকে চকচকে কিছু একটা বেরিয়ে এসে বাশারের হাত পিছলে টুং করে মাটিতে পড়ে গড়িয়ে রুশোর পায়ের কাছে চলে গেল।

জিনিসটা তুলে ধরে নিজের ভারী লেন্সের চশমার সামনে তুলে ধরল রুশো। ‘একটা রিং,’ বলে সে জিনিসটা তুলে ধরল চোখের সামনে। ভীষণ মোটা এবং ভারী তামা বা এরকম কিছু একটা তৈরি রিং, ওটার গায়ে নানা ধরনের প্রতীক চিহ্ন আঁকা।

আনমনে মাথা নাড়ল বাশার, তারপর ও অন্যদের দিকে দেখে নিয়ে বলে উঠল, ‘আমার ধারণা, আমি বুঝতে পারছি কেন রিকাতকে অপহরণ করা হয়েছে, কেন কোনো মুক্তিপণ বা কোনো দাবিদাওয়া চায়নি ওরা,’ বলে ও নিজের পিঙ্ক খাপে ঢুকিয়ে বড় করে দম নিল একবার। ‘আমাকে ঢাকায় কথা বলতে হবে। আমাদের মূল কাজ শুরু হতে যাচ্ছে এখন।’

দ্বিতীয় অংশ
একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ



অধ্যায় আটত্রিশ

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

উত্তর ভারতের কোনো এক অজানা নদীর কিনারায়

মানুষটা ঠিক তার সমানই লম্বা, তবে সেটা খুব আশ্চর্যের কিছু নয়, কারণ তার সমান লম্বা মানুষের কোনো অভাব নেই পৃথিবীতে। আশ্চর্যের বিষয় যেটা—সেটা হলো, তার সামনে উপবিষ্ট মানুষটা প্রায় তার মতোই দেখতে। কর্নেল খুব অবাক হয়ে ছেলেটাকে ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করল, এমনকি হতে পারে এটা তারই তরুণ বয়সের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু ভালোভাবে দেখে সে আবারো নিশ্চিত হলো, এটা তার তরুণ বয়সের প্রতিচ্ছবি নয়, কারণ এই ছেলেটার চেহারা প্রায় তার মতো হলেও বেশ কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। আর সেই ব্যতিক্রমগুলোও এতটাই পরিষ্কার যে, সে একদম বুঝতে পারছে এটা সে নয়। তবে এটা কীভাবে সম্ভব যে সে সামনে উপবিষ্ট একটা মানুষ দেখছে যে-কি না তার সমান লম্বা, দেখতে প্রায় তার মতোই। মানুষটা ঠিক তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে, কিছু বলছেও না করছেও না। কর্নেল একবার আনমনেই ভাবল তার কি কিছু জানতে চাওয়া উচিত।

এমন সময়ই ব্যাপারটা চোখে পড়ল কর্নেলের, মানুষটার মুখে এবং চুলে এমন এক বৈশিষ্ট্য যেটা তাকে রীতিমতো চমকে দিল। মানুষটার মুখের ডান চিবুকে ছোট একটা জারুল এবং মানুষটার সবকিছু কর্নেলের মতো হওয়ার পরও চুলগুলো একটু আলাদা, কটা রঙের। বৈশিষ্ট্যগুলো ধরতে পারার সঙ্গে সঙ্গে কর্নেলের মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠল, এটা তার জী জেনির বৈশিষ্ট্য, ঠিক এই রঙের চুল, একই জায়গায় জারুল। কর্নেল চট করে চোখ তুলে তাকাল মানুষটার দিকে, এটা তার ছেলে। তার ছেলে মারা গিয়েছিল ছোটবেলায়, সে বড় হলে যেমন হতো, এই মানুষটা ঠিক তার মতো। কথাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে সামনে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখতে পেল কর্নেল, তার সামনের মানুষটা ছোট হতে শুরু করেছে। তার বয়স কমতে শুরু করেছে। কমতে কমতে ঠিক যেই বয়সে তার ছেলেটা মারা গিয়েছিল সেই বয়সে এসে ছিন্ন হলো সে, কর্নেল হাত বাড়িয়ে দিতেই, তার ছেলে বলে উঠল, 'বাবা, তুমি আমাদের মরতে দিলে!' সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার সমস্ত শরীরে

সিপাহী

আন্তন ধরে গেল। কর্নেল চিৎকার করে উঠল, অনেক কিছুই বলতে চাইল, সে বলতে চাইল, বাবা আমি চাইনি, আমি কারো কৃতি করতে চাইনি। কিন্তু কিছু বলার আগেই ছেলেটা চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ঘামতে ঘামতে উঠে বসল কর্নেল।

নদীর কল কলে পানির শব্দে সে বুঝতে পারল তাদের অস্থায়ী ক্যাম্পেই রয়েছে সে। নিজেদের হাতে বানানো শুকনো নলখাগড়ার বিছানার ওপরে সোজা হয়ে বসল সে, গায়ের নিচের পাতলা কাপড়টা তুলে নিয়ে সেটাকে গায়ে জড়িয়ে আশপাশে তাকিয়ে দেখল অন্যরা প্রায় সবাই ঘুমাচ্ছে। বেলা পড়তির দিকে হলেও সূর্যের তেজ একেবারে কম নয়। গাছের ছায়ায়, নদীর পানির ধারায় বেশ আরামেই ঘুমাচ্ছে সবাই। অবশ্য ক্রান্তিও একটা বড় কারণ। ক্ষুধা যেমন খাবারের স্বাদের পেছনে অন্যতম ভূমিকা রাখে, ঠিক তেমনি ক্রান্তিও আরামদায়ক ঘুমের পেছনে, কেমন বিছানা, কোন জায়গা এগুলো অনেক পরের বিষয়। কর্নেল বিছিয়ে রাখা কাপড়টা ভালোভাবে জড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে নদীর পাড়ে চলে এলো। একটা নদীর পাড়ে পড়ে থাকা একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির ওপরে বসে পড়ল সে।

‘খারাপ স্বপ্ন দেখতেছিলেন, তাই না?’ আচমকা প্রশ্নটা শুনে একটু অবাক হয়েই ফিরে তাকাল সে পাশে, নদীর কিনারায় পানিতে সামান্য পা ডুবিয়ে বসে ছোট একটা কচ্ছির মাথায় কিছু একটা লাগিয়ে ছেলেটা সম্ভবত মাছ ধরছে, তার ধারণা সত্যি প্রমাণ করে দিয়ে সে দেখতে পেল, এর মধ্যেই তার পাশে রাখা বাঁশের খালইতে ঝটপট করছে কিছু মাছ। কর্নেল মাথা নেড়ে সায় জানাল সোলেমানের কথায়, কিছু বলল না মুখে।

‘আপনের ছেলেরে দেখতে ছিলেন?’

এবার সোলেমানের প্রশ্নে সে ঝট করে আবারো ফিরে তাকাল সে তার দিকে। ‘তুমি কীভাবে বুঝলে?’ প্রশ্নটা সে করতে চায়নি স্রেফ আপনাতেই বেরিয়ে গেছে তার মুখ দিয়ে।

কর্নেলের প্রশ্ন শুনে মৃদু হেসে উঠল সোলেমান। ‘আপনের যেমন ঘুম তাই ভা পেছে আমারও হেমনে ঘুম তাই ভা যায় মাঝেমধ্যে। বাপুর্নে আমি স্বপ্নে দেখি। কত কী কম সে আবারে,’ বলে সে চট করে কর্নেলের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘একটা মজার কথা শুনেছেন? গতকাল রাইতে ওই শহরে আমরা যখন পলাইতে ছিলাম—’

কর্নেল বড় করে একবার দম নিয়ে সোলেমানের কথার মাঝে বলে উঠল, ‘তোমাকে অনেক ধন্যবাদ সোলেমান, ছোড়া নিয়ে যাত্রা শুরু করার সময়ে আমি যখন পড়ে যাচ্ছিলাম, তুমি না ধরলে ওই শহর থেকে আর জীবিত বের হয়ে আসতে পারতাম না আমি।’

কর্নেলের কথা শুনে নিজের হাঁটুতে একটা চাটি মারল সোলেমান। ‘মজার বিষয় কি জানেন, আমিও এইটাই বলতে চাইতেছিলাম। অবশ্য আপনে কিছুটা ভুল

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

কলছেন, আমি আপনেনে ধরি নাই, আমি ঘোড়াটা ঘুরাই আনছিলাম, আপনেনে ধরছিল পিটার। কিন্তু আজব ব্যাপার, কাইল রাইতে ঘুমের ভেতরে বাপু আমারে ধন্যবাদ জানাইছে আপনেনে সাহায্য করার জন্য। বাপু বলছে, কিরণ তুই—’

সে কথা শেষ করার আগেই তার ছিপে টান পড়ল। সে ঝট করে মাছ ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কর্নেল খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ‘তুমি কি তোমার বাবাকে খুব ভালোবাসতে?’

‘ধুর শালা!’ কর্নেলের সামনে গালি বকে সে জিভ কাটল। ‘মাফ করেন হজুর মাছ ছুইটা যাওয়াতে মেজাজ খারাপ হয় গিয়েছিল,’ বলে সে বড় করে দম নিল। ‘হজুর আমার বাপ আছিল আমার দুনিয়া, সে চইলা যাওয়ার পরে আমিও মইরা গেছি আমার বাব-মায়ের লগে। খালি বাইচা আছি একটা কারণে—’ বলে সে কর্নেলের দিকে ফিরল। কিন্তু সে আবারো কিছু বলার আগেই চট করে টান পড়ল ছিপে। ‘এইবার আর ছাড়তেছি না,’ বলে সে ছিপে টানাটানি করে একটা বেশ বড় মাছ উঠিয়ে নিয়ে এলো। কর্নেল হেসে উঠল তার খুশি দেখে।

সোলেমানকে তার মাছের সঙ্গে রেখে কর্নেল রওনা দিল তাদের অস্থায়ী ক্যাম্পের দিকে। এই ক্যাম্পটা তৈরি করা হয়েছে আজ দুপুরের ঠিক আগ দিয়ে তাদের বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। জায়গাটা মিরাত আর দিল্লির মাঝামাঝি কোথাও। অন্তত পালোয়ান এবং ত্রিলোকের কথায় তাই মনে হয়েছে কর্নেলের কাছে। জায়গাটা মূল রাস্তা থেকে সরে এসে জঙ্গলে এলাকার বেশ অনেকটা ভেতরে, নদীর পাড়ে। মূল রাস্তা থেকে দূরে হওয়াতে, এটা মোটামুটি নিরাপদ, জঙ্গলে কিন্তু খুব ঘন জঙ্গল না হওয়াতে, নিরাপদ আবার ছায়াও রয়েছে, আর নদীর পাড়ে হওয়াতে পানি রয়েছে এবং সোলেমানের মাছ ধরা দেখে কর্নেলের কাছে মনে হলো তাদের খাবারের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।

ত্রিলোকের পরিবারকে উদ্ধার করার পর মিরাতের বাইরের জঙ্গলে তারা খুব বেশি দেরি করেনি। সবাই মিলে সেখান থেকে সব গুছিয়ে দ্রুত রওনা দিয়েছে। প্রথমেই তারা সরে এসে বাজার এলাকা পার হয়েছে তারপর মোটামুটি নিরাপদ একটা জায়গা দেখে পরিচছন্ন হয়ে সঙ্গে নিয়ে আসা হালকা খাবার খেয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রথমেই সিদ্ধান্ত নেয় ফটিককে দিয়ে ত্রিলোকের পরিবারকে সরিয়ে দেবে, আর এই মুহূর্তে তাদের থাকার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা পালোয়ানের বাড়ি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ত্রিলোক অবশ্য আপত্তি করেছিল, কারণ সে ভাবছিল কোনো আত্মীয়ও বাড়িতে পাঠাবে কি না। কিন্তু পরে দেখা যায়, সেরকম কোনো আত্মীয়র কথা সে ভাবতেও পারছে না। আবার সবাই মিলে তাকে অনুরোধ করার পর সে আর মানা করেনি, বিশেষ করে পালোয়ান বারবার বলেছে তার ওখানে ত্রিলোকের পরিবার গেলে এবং থাকলে সুবিধা হবে, তার খামার এবং বাড়ির জন্য। সবমিলিয়ে এরপর ফটিককে ঠিকানা বুঝিয়ে দিয়ে

সিপাহী

দুটো ঘোড়ার সঙ্গে সেই গাড়িটা জুড়ে দিয়ে ফটিক রওনা হয়ে যায় পালোয়ানের গ্রামের উদ্দেশ্যে। ফটিক চলে যাওয়ার সময়ে কর্নেলের খানিক খারাপ লাগছিল, বোধে বন্দরে এই ছেলেটা না থাকলে সে হয়তো আরব সাগরের পানি থেকে উঠতেই পারত না, সেখানেই সলিলসমাধি হতো তার। সে যাওয়ার আগে কর্নেল ভালোভাবে তাকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের খেয়াল রাখতে বলেছে। আর এটাও জানিয়েছে সে তার কাজ সেরে ফিরে গেলে ফটিকের সঙ্গে তার ভবিষ্যতের বিষয়ে ভালোভাবে কথা বলবে। কর্নেল মনে মনে ঠিক করে রেখেছে সে যদি তার কাজে সফল হয়, কিংবা নাও হয় ছেলেটার কাজের একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করবে সে। তবে ফটিক চলে যাওয়াতে কর্নেলের খানিক স্বস্তিও লাগছিল, কারণ যে-ভয়াবহ অবস্থার ভেতর দিয়ে তারা যাচ্ছে এবং সামনে আরো কী ধরনের বিপদ অপেক্ষা করছে কে জানে। পালোয়ানের খামারে ছেলেটা অন্তত নিরাপদ থাকবে, সেই সঙ্গে হয়তো ওখান থেকে তার বাকি জীবনের কোনো ব্যবস্থাও হয়ে যেতে পারে।

কর্নেল ক্যাম্পে ফিরে এসে পাইপ ধরাল, সময় বিকেল গড়িয়ে সন্দের দিকে রওনা দিয়েছে। ‘উঠে গেছ, কর্নেল?’ পালোয়ানের প্রশ্নের জবাবে মৃদু হাসল। ‘অন্যদের ডেকে তোল, অনেক কাজ সামনে, জরুরি আলোচনায় বসতে হবে।’

‘তা তো বুঝলাম কর্নেল,’ পালোয়ান বিরস মুখে বলে উঠল। ‘কিন্তু পেটের ভেতরে তো ইঁদুর নাচানাচি করতেছে। এই নাচুন নিয়ে তো মাথায় কিছু ঢুকব না।’

‘এই যে তোমার ক্ষিধার ব্যবস্থা,’ ওদের পেছন থেকে খালুই ভর্তি মাছ দেখিয়ে বলে উঠল সোলেমান। ‘খোদা, কর্নেল ছেলেটারে এখন দরকার ছিল আমগো।’

‘আমি তোমারে সাহায্য করতামি,’ বলে পালোয়ান ফিরে তাকাল সোলেমানের দিকে। ‘এই সুযোগে তোমার বাপের বিষয়ে আলাপও করতে পারব। ও তুমি কি জানো ইউসুফি মারাত্মক রান্না করতে পারত।’

‘পালোয়ান,’ কর্নেল মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে বলে উঠল। ‘তুমি খাবার বানাতে যাওয়ার সময়ে ত্রিলোক আর পিটারকে বলো আমার কাছে আসতে। তোমরা খাবার বানাতে বানাতে আমি ওদের সঙ্গে কিছু আলোচনা করব।’

সোলেমান আর পালোয়ান খাবার বানাতে গেলে কর্নেল পিটার আর ত্রিলোককে নিয়ে বসল। বিশেষ করে ত্রিলোক সঠিকভাবে কিছুই জানে না, কর্নেল আসলে কী করতে এসেছে এবং কেন তার ত্রিলোককে প্রয়োজন। কর্নেল মোটামুটি শুরু থেকে তাকে সব খুলে বলল। কর্নেল বয়ান করার সময়ে পিটার মাঝেমধ্যে তাকে সাহায্য করল সার্বিক পরিস্থিতি এবং এই পরিস্থিতিতে তাদের কাজের ভূমিকা কি ইত্যাদির বিষয়ে। কর্নেল আর পিটারের বয়ান শেষ হতে হতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় পার হয়ে গেল। এর ভেতরে সোলেমান এবং পালোয়ান খাবার প্রস্তুত করে ফেলল। আলোচনা চলল খেতে খেতে।

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

খাওয়া শেষ হওয়ার পর পালোয়ান তার পান, সোলেমান তামাক চিবুতে লাগল। কর্নেল ধরাল তার পাইপ এবং ত্রিলোক এরকম কিছুই খায় না, কাজেই তার কোনো ঝামেলা নেই।

‘এবার বলো, তোমার বক্তব্য কি?’ কর্নেল জানতে চাইল ত্রিলোকের দিকে তাকিয়ে। ত্রিলোক দেখতে হ্যাংলা-পাতলা, শ্যামবর্ণ চেহারা, খুবই মধ্য ভারতীয় ধরনের চেহারা তার, এক মাথা কোঁকড়ানো চুল। শারীরিকভাবে তাকে ঠিক মিলিটারি বলে মনে হয় না। তবে ত্রিলোকের চেহারার সবচেয়ে সুন্দর বৈশিষ্ট্য তার চোখ দুটো। একমাথা কোঁকড়ানো চুলের নিচে, ভাসা ভাসা সুন্দর দুটো চোখ, খুবই বুদ্ধিদীপ্ত। ত্রিলোক যখন মিলিটারিতে কাজ শুরু করে, তখন সে একেবারেই অল্প বয়স। সেই সময়ে আফগান যুদ্ধের ঠিক আগ দিয়ে কর্নেল তার বিশেষ বাহিনী প্রস্তুত করছিল, যেটার জন্য সে সৈনিক থেকে শুরু করে অফিসার খুঁজছিল, সেই দলে সে ত্রিলোককে নিয়েছিল এক ইংরেজ অফিসারকে বাদ দিয়ে। এ-নিয়ে অনেক হাস্যময় হয়েছিল। কিন্তু মাঠে নেমেই ত্রিলোক তার বুদ্ধিমত্তা প্রমাণ করে দুটো ক্ষেত্রে সে সূত্র ধরে শত্রুর সন্ধান বের করতে ভীষণ পটু ছিল, সেই সঙ্গে দূরপাল্লার অস্ত্রে তার দক্ষতা ছিল অপরিসীম। কর্নেল দেখল প্রায় দশ বছর সময় পার হয়ে গেছে, অথচ ত্রিলোক যেন ঠিক আগের মতোই রয়েছে। শুধু জুলফির কাছে কয়টা পাকা চুল বাদে তার বয়স একেবারেই থমকে গেছে এক জায়গায়।

‘কর্নেল স্যার,’ বলে সে ঘাসের ওপরে আধশোয়া হলো। ‘আপনার কাছে সব তইনা তো খুব ভালো মনে অইতাছে না। প্রথম কথা হইল, ভিক্টর সে যে দিল্লি থেইকা পলাইছে, এইটার নিশ্চয়তা কি?’

এই প্রশ্নটা কর্নেলের মনের ঘুরপাক খাচ্ছিল, এটার শতভাগ নিশ্চয়তা কেউই দিতে পারেনি। ‘এটা আমারও প্রশ্ন, তোমার কি মনে হয়?’

‘প্রথম কথা, সেও তো ওই বিস্ফোরণে মরতে পারে,’ বলে ত্রিলোক পিটারের দিকে ফিরে তাকাল। ‘ওই ঘটনার পরে কি কেউ তারে দেখছে?’

‘না, তাকে কেউই দেখেনি। কিন্তু—’

‘স্যার, কেউ যদি চর্ম-চোক্ষে না দেখে থাকে এবং সেই দেখা মানুষটা যদি নির্ভরযোগ্য কেউ না হয়, তইলে এর কোনো ভরসা নাই।’

‘সেইক্ষেত্রে, আমাদের তার মৃত্যুর ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে হবে এবং—’ কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল পিটার।

‘আমার আরো অনেক প্রশ্ন আছে, বিশেষ কইরা কেন তারে দরকার আমি তনছি কিন্তু কারণ ঠিক পুরাপুরি পরিষ্কার না আমার কাছে,’ ত্রিলোক তাকিয়ে আছে কর্নেলের দিকে, কর্নেলও তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।

‘তুমি কি বলো?’ আমাদের কোথা থেকে শুরু করা উচিত?’ কর্নেল জানতে চাইল। কথাটা বলে সে অন্যদের দিকে ফিরে তাকাল, ‘অন্য কারো কোনো মতামতও থাকলে বলতে পারো,’ সবাই চুপ।

সিপাহী

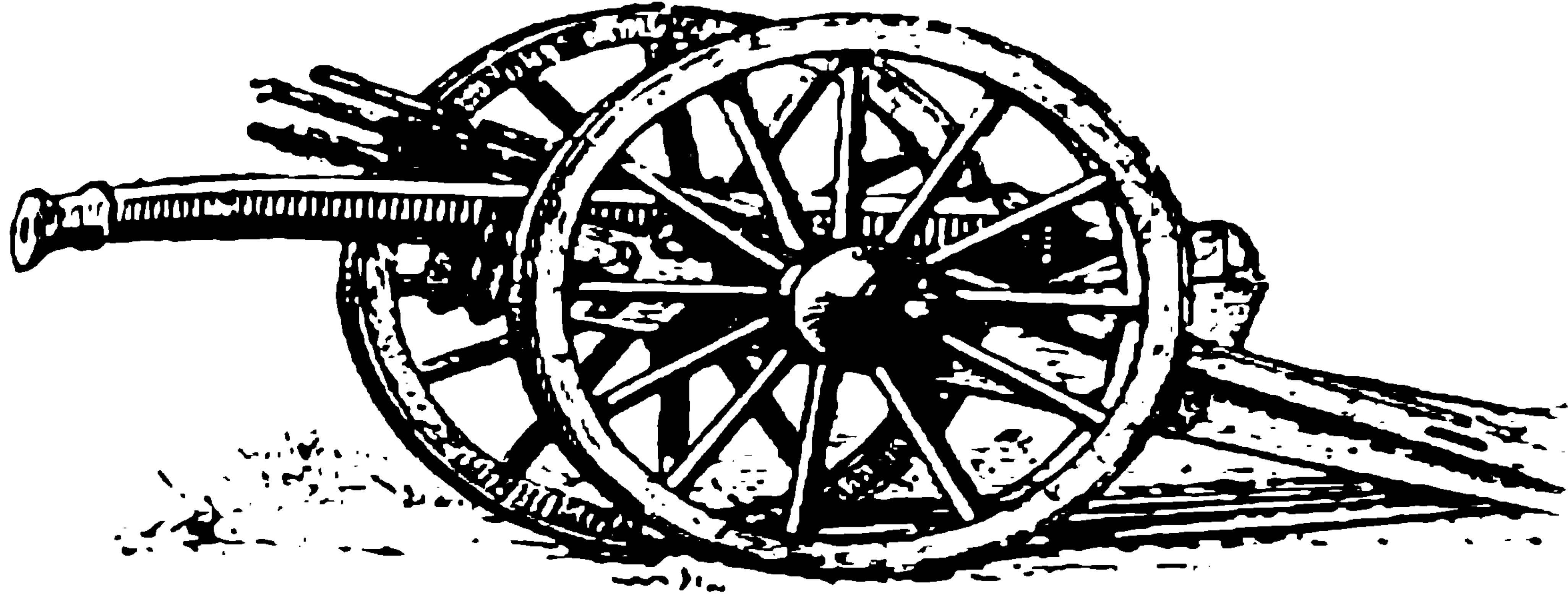
‘কর্নেল আপনার কি কোনো পরিকল্পনা আছে?’ ত্রিলোক উলটো জানতে চাইল কর্নেলের কাছে।

কর্নেল আনমনে মাথা নাড়ল। ‘সবাই মন দিয়ে শোন, ভিক্টর আমার বন্ধু, আমি ভারত ছাড়লেও দায়িত্ববোধ ছাড়িনি। আমি জানি আমাদের কাজে অনেক অজানা এবং অন্ধকার জায়গা রয়েছে,’ কর্নেল একবার ত্রিলোক এবং পালোয়ানকে দেখে নিয়ে পিটারের দিকে দেখল, তারপর সোলেমানের দিকে আবার ফিরে তাকিয়ে বলতে লাগল, ‘আমি জানি না সরকার বা কোম্পানি কেন ভিক্টরকে খুঁজছে, মানে যদি আমরা তাদের দাবি মেনে নিই, তবে তাকে খুঁজে বের করা খুবই জরুরি, তার নিজের জন্য, অর্থরিটির জন্য এবং ভারতের জন্যও। আর যদি সেটা পুরোপুরি মেনে নাও নেই, তাও আমি বন্ধু এবং সহৃদয় হিসেবে তাকে খুঁজে বের করতে চাই দুটো কারণে। প্রথমত, ভিক্টরের মতো একজন মানুষ মানবতার মঙ্গলে কাজ করে গেলে সর্বদা, সে এখন মানবতার জন্য ঝুঁকি কেন আমাকে জানতে হবে। তারচেয়ে বেশি হলো, সে আমার বন্ধু এবং—’ বলে কর্নেল থামল, সে পাইপ নামিয়ে রেখে বড় করে দম নিল।

‘আমি নিজেকে প্রমিষ্ট করেছিলাম, আর কখনোই ভারতে আসব না। কিন্তু এসেছি আমার আরেক সহৃদয় জনের অনুরোধে। তবে মূল কারণ হলো...যেটা প্রায় কেউই জানে না, ভিক্টর এমন এক মানুষ যে-আমাকে জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর সময়ে সবচেয়ে বড় মানসিক সহায়তা করেছিল। ভিক্টর না থাকলে আমি হয়তো—’ কর্নেল আবারো খেমে গেল। ‘যাই হোক, আমি ভিক্টরকে যেকোনো মূল্যে খুঁজে বের করব এবং সেটা করতে হলে আমার বিশ্বাস দিল্লি থেকেই শুরু করতে হবে,’ বলে সে নিজের পাইপটা তাক করল ত্রিলোকের দিকে। ‘যদি সে দিল্লি থেকে পালিয়েও থাকে, শেষবার তাকে সেখানেই দেখা গেছে, আর যদি সে মারাও গিয়ে থাকে, তবে ওখানেই রয়েছে তার বিষয়ে অজানা সব প্রশ্নের জবাব। আর এখানেই দেখা দেবে তোমার ভূমিকা,’ কথাটা সে ত্রিলোককে বলল। ‘এখানে আমাদের ভেতরে দিল্লি সবচেয়ে ভালো চেনো তুমি এবং তোমার লোক রয়েছে ওখানে যার থেকে আমরা খবর বের করতে পারব, আমরা সেখান থেকেই শুরু করব।’

ত্রিলোক মাথা নেড়ে সায় জানাল। ‘সেটা সম্ভব হবে আমার পক্ষে,’ বলে সে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল। ‘প্রশ্ন হলো, দিল্লি এখন উত্তপ্ত উনুনের চেয়েও খারাপ। সেখানে যাওয়াটাই ভয়ংকর ব্যাপার, যখন সেখান থেকে সবাই পালিয়েছে। আর আমরা উলটো সেখানে গিয়ে কীভাবে—’ নিজের প্রশ্ন শেষ করল না ত্রিলোক।

এই প্রশ্নের জবাব কারো জানা নেই। কিন্তু সবার চোখে-মুখে উত্তেজনা। কর্নেল ঠিক এটাই খুঁজছিল এবং দিল্লি থেকেই শুরু হবে তার তদন্ত।



অধ্যায় উনচল্লিশ বর্তমান সময় পিবিআই এস ল্যাব, নতুন বাজার

বিষয়টা আসলে কি, বলো তো?’ প্রশ্নটা সবারই তবে সেটা উচ্চারণ করল সামিরা।

বাশারকে দেখতে খানিকটা অস্থির লাগছে। সে কামরার মাঝখানে পায়চারি করতে করতে সিগারেট টানছে। ওরা এই মুহূর্তে বসে আছে নতুন বাজারে পিবিআইএসের ল্যাব কাম স্থানীয় অফিসের কেন্টিনে। ওরা বেগুনবাড়ি থেকে ময়মনসিংহ শহরে চলে আসে সেই সাইট থেকে পাওয়া এভিডেন্সগুলো নিয়ে। সেই সঙ্গে ইনসপেক্টর রবিউলের নেতৃত্বে পুলিশি কর্ডন করে সিল করে দেওয়া হয় সেই এলাকা। ওরা শহরে এসে একটা টিম পাঠায় সেখানে, আরো অ্যাভিডেন্স কালেক্ট করার জন্য। সেই সঙ্গে নদীপথের সব সম্ভাব্য জায়গার কোস্ট গার্ড এবং নৌ-পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া হয় অপহরণের বিবরণ দিয়ে। কারণ ওরা সেই নির্মাণাধীন ঘাট থেকে যা আবিষ্কার করেছে সেটাতে দুটো বিষয় পরিষ্কার। ওরা নদীপথেই এসছিল এবং নদীপথেই পালিয়েছে। আর যাওয়ার সময় সেই ব্যাগটা এবং জিনিসগুলো বাশারকে উদ্দেশ্য করেই দিয়ে গেছে।

এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এই রিং এবং এই রহস্য কীসের। শহরে ফিরেই ওরা প্রথমে দেখা করে পাটোয়ারির সঙ্গে, এরপরে টিমের কাছে সব বুঝিয়ে দিয়ে ওরা চলে যায় ওদের জন্য বরাদ্দ কোয়ার্টারে, এরপরে কাপড় বদলে ফ্রেশ হয়ে এসে জানতে পারে টিম এবং পাটোয়ারি দুজনেই ব্যস্ত। টিমকে টিমের সঙ্গে পাঠানো হয়েছে সেই স্টেশনে, অন্য কারো ওপরে সেভাবে ভরসা করতে পারেনি পাটোয়ারি, সেজন্য তার নিজের অ্যাসিস্ট্যান্টকেই পাঠিয়েছেন স্পটে।

‘সেটা তো বুঝতে পারছি না কিন্তু এটা বুঝতে পারছি যে এই বিষয়টা যাই নিয়ে হোক না কেন, সেটার সমাধান করতে হবে আমাকে,’ বলে সে সামিরার

सिपाही

দিকে তাকিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যোগ করল। 'ঐ কারণেই ওরা এখনো কিছুই দাবি করেনি।'

‘ওরা জানত যে রিফাতকে অপহরণ করা হলে তুমি এতে ইনভলভড হবে। আর যদি তুমি নাও হও তবে ওরা পরিষ্কার তোমার নাম লিখেই রেখেছে,’ বলে সায়িরা মাথা নাড়ল। ‘এরপরে তো আর প্রশ্নই আসে না, তোমাকে ইনভলভড হতেই হতো,’ বলে সে আবারো মাথা নাড়ল। ‘প্রাথমিক যে দুটো প্রশ্ন ছিল আমাদের কাজের শুরুতে সেগুলোর সমাধান তো হয়েছে।’

‘হ্যাঁ, এটা একটা প্রমোশন,’ বাশার মৃদু হেসে বলে উঠল। ‘ওরা কীভাবে এসেছিল এবং কীভাবে গায়েব হয়ে গিয়েছিল, সেটার একটা উত্তর পাওয়া গেছে; বাশার টোকা দিয়ে অ্যাশট্রেতে ছাই ফেলল। ‘এবং রিফাতকে অপহরণের পরেও কেন কোনো মুক্তিপণ বা এমন কিছু দাবি করেনি,’ বলে বাশার ড্র কুঁচকে বলে উঠল, ‘কারণ ওরা এই রিংটাকে আমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে চাচ্ছিল বা আমার হাতে এটাতে পৌঁছে দিতে চাচ্ছিল।’

‘কিন্তু কেন?’ সামিরা জানতে চাইল। ‘এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, রিফাতকে অপহরণইবা কেন, এবং তোমাকেই ইনভলভড করার প্রচেষ্টা কেন? তোমার কোনো আইডিয়া?’

‘আইডিয়া?’

‘নো ফাকিং কু, একটা ব্যাপার আমি ভাবছি এই রিংয়ের কি—’

‘স্যার, আপনার জন্য কল এসেছে ঢাকা থেকে,’ ক্যান্টিনে প্রবেশ করেছে

অফিসের মোটা লেন্সের চশমা পরা ছেলেটা দৌড়ে এসে জানাতেই উঠে দাঁড়াল

দুজনেই। বাশার এখানে এসে প্রথমেই ঢাকায় কথা বলার চেষ্টা করেছিল, বিশেষ

করে পাশা স্যারের সঙ্গে কথা বলাটা খুব জরুরি। কিন্তু সে পাশা স্যার কিংবা তার

সেক্রেটারি মৌসুমি কাউকেই পায়নি তবে মেসেজ দিয়ে রেখেছিল। সামিরাকে

অপেক্ষা করতে বলে বাশার চলে গেল কমিউনিকেশন রুমে। তবে তার বস হাবিব

আনোয়ার পাশার সঙ্গে কথা বলতে পারল না। কথা হলো মৌসুমির সঙ্গে।

মোটামুটি সব বিস্তারিত বলে সে একটা ছোট রিপোর্ট দিল, এরপর পাশা স্যারের

সঙ্গে সুযোগ হলেই কথা বলার অনুরোধ জানিয়ে করিডরে বের হতেই আবাবো সেই

মোটো লেন্স এসে জানাল, সবাই মিটিংরুমে আছে, সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে

তাকে পাটোয়ারি স্যার।

বাশার খন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল সেই পুরনো মিটিংরুমে। রমিড দারোগা, ইউনিকর্ম পরে এসেছে কনস্টেবল আবদুল্লাহ, সেই সঙ্গে উপস্থিত রয়েছে ইনসপেক্টর রবিউল, আর্কিওলজিস্ট রুশো এবং সামিরা তো আছেই। আর সবার অগ্রভাবে, পাটোয়ারি স্যার, আরাম করে বসে একটা ল্যাপটপে চোখ বুলাচ্ছে এবং পান চিবুচ্ছে, আর তার ঠিক পাশেই প্রজেক্টর সাজিয়ে অপেক্ষা করছে টিম। সবার

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

দিকে চোখ বুলিয়ে পাটোয়ারির উদ্দেশ্যে সামান্য মাথা নেড়ে, সে টমির দিক তাকিয়ে মৃদু হাসি দিল। টমির পরনে থাকি হাফপ্যান্ট, মাথায় ক্যাপ, দুই চোখ টকটকে লাল, বাশার অনুমান করল বৃষ্টির ভেতরে কাজ করার ফল। আর তার পরনের হাড়ির রং দেখলে রনভীর সিং লজ্জা পেয়ে যাবে। চূড়ান্ত চকমকে হুডিটার দিকে তাকিয়ে বাশারের মনে হলো, সবজি ভর্তি গাড়িতে বাজ পরার পর সেটার ওপরে যদি একপাল লাল আর নীল রঙের গরু লড়াই করে, তবে এমন ডিজাইন হলে হতেও পারে।

‘কংগাচুলেশঙ্গ বাশার,’ বসতে বসতে হঠাৎ পাটোয়ারির গলা শুনে খুবই চমকে উঠল বাশার। প্রথমত, এই লোক কখনোই গুরু ভাষা বলে না, দ্বিতীয়ত, এই লোক কখনো কারো প্রশংসা করে না, আজ এই ব্যতিক্রমের কারণ কি। বাশার ধন্যবাদ জানাবে কি না ভেবেও সে থেমে গেল, পরিস্থিতি বুঝতে না পারলে চুপ থাকাই শ্রেয়, বহু আগেই শিখেছে সে বিষয়টা।

‘তুমি ভালোই কাম করছো আইজকে, এক বেলা গড়ানোর আগেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস বাইর করতে পারছো,’ পাটোয়ারি কথা বলছে কিন্তু তার চোখ ন্যাপটপে এবং মুখ জাবর কাটার মতো নড়ছে ক্রমাগত পান চিবোনের কারণে। ‘এইটা ভালো ঘটনা কিন্তু সমস্যা হইল। এই ভালো ঘটনাটা আবার আমগোরে আরো বড় রহস্যের মধ্যে নিয়া ফালাইছে,’ বলে সে টমির দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারা করল কথা বলার জন্য।

‘ধন্যবাদ স্যার,’ বলেই টমি তার ভুঁড়ি দুলিয়ে প্রজেক্টর অন করতেই স্ক্রিনে আলো জ্বলে উঠল, কিন্তু এখনো সেটা ফাঁকা। ‘প্রথমেই আমি বলে নিই, আমরা সেই স্টেশনের স্পটে আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাইনি। বাশার ভাইরা যা এনেছিল, এর বাইরে আর কিছুই ছিল না। এরমানে দুটো ব্যাপার হতে পারে। হয় যারা এখানে এসেছিল তারা চায়নি দেখে কিছুই নেই, অথবা বৃষ্টির পানিতে সব ধুয়ে গেছে।’

‘ওই পায়ের ছাপটাও পাওয়া যায়নি, তাই না?’ বাশার জানতে চাইল আত্মহের সঙ্গে। মিলিটারি বুটগুলোর ভেতরে অন্য একটা ছাপ, যেটা ছিল সেটার ব্যাপারে জানতে চাইল বাশার।

‘না বাশার ভাই,’ টমি আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল। বৃষ্টিতে কিছুই নেই আর। এরপরে, আমি ইনসপেক্টর রবিউলকে ধন্যবাদ জানাব কোস্ট গার্ড থেকে শুরু করে নৌ পুলিশ, রোড ব্লক সব জায়গাতে অ্যালাট জারি করেছেন তিনি,’ টমির কথা শুনে সামান্য মাথা নাড়ল ইনসপেক্টর রবিউল, মোটা গোফে তা দিল সে। ‘এরপরে,’ টমি বলে চলেছে। ‘এটা তো জানাই গেছে কীভাবে ওরা এসেছিল কেন ওরা কোনো মুক্তিপণ চায়নি। প্রশ্ন হলো এই রিং এবং বাশার ভাইয়ের নাম

সিপাহী

লেখা নোট। এখনকার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন,' বলে সে বাটন চাপতেই রিংটার ছবি ফুটে উঠল জিনে। 'আজব এবং অদ্ভুত রহস্যময় এক রিং,' বলে সে সবার দিকে ফিরে তাকাল। 'আপনারা হয়তো ভাবছেন, একটা সামান্য রিংয়ে আবার রহস্যের কী রয়েছে। প্রথমেই বলি রিংটা নিয়ে আমি খুব বেশি সময় কাজ করতে পারিনি। কিন্তু এর ভেতরেই যা দেখেছি আমি এবং পাটোয়ারি স্যার, আমাদের কাল ঘাম ছুটিয়ে ছেড়েছে এটা।'

'তুমিগোরে একটা কথা কই,' পাটোয়ারি ল্যাপটপের জিন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্যদের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল। 'আমি জীবনে এত কালাপানি ঘাটছি আর এত খাচ্চর লোকজনের লগে চলছি, যে আমি সহজে আর অবাক অই না। কিন্তু আমি কইতে বাধ্য হইতেছি এই রিং,' বলে সে এভিডেন্স ব্যাগ উঁচু করে ধরল। 'এইটার মতো আজব জিনিস আমি দেহি নাই আর।'

'আশ্চর্য কাণ্ড!' আর থাকতে না পেরে সামিরা বলে উঠল। 'কি এমন আছে এই রিংয়ে?' সে বাশারের দিকে তাকিয়ে দেখল তার ড্র কুঁচকে উঠেছে এবং সবাই কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে টমি আর পাটোয়ারির দিকে।

সামিরার প্রশ্ন শুনে টমি হেসে উঠল, 'একদম ঠিক কথা বলেছেন ম্যাডাম। কি রয়েছে এটা দিয়েই শুরু করি তাহলে, অডিয়েন্সের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন, একটা রিং আসলে কি?'

'একটা জুয়েলারি,' ইনসপেক্টর রবিউল বলে উঠল।

'একদম ঠিক,' টমির জবাব। 'হয় ছেলে বা মেয়েরা পরে, তাই না, মানে এটা গলার হার বা এমন কিছু নয় যে শুধু মেয়েরাই পরবে, কেউ পরতে পারে ডিজাইনের ওপরে ভিত্তি করে। এবার আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, রিংয়ের মূল জিনিসটা কি?'

'এটার ধাতু বা, যেটা দিয়ে এটা তৈরি, মোটা ফ্রেমের চশমা নেড়ে রুশো বলে উঠল। বাশারের মনে হলো ছেলেটা ভেতরে ভেতরে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, কিন্তু নিজেকে চেপে রেখেছে সে।

'একদম ঠিক,' টমি বলে উঠল। 'যদিও আমি কেমিক্যাল বা ধাতু বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু প্রাথমিক দেখায় এটা আমি প্রায় নিশ্চিত বুঝতে পেরেছি, এই ধাতুটার বিষয়ে আমার একেবারেই অভিজ্ঞতা,' বলে সে প্রজেক্টরে রিংটা দেখাল, ওটাকে কয়েকটা অ্যাংগেল থেকে ঘুরিয়ে দেখাল।

'রিংয়ের গায়ের এই সিঙ্কলগুলো কীসের?' বাশার কিউরিয়াস হয়ে জানতে চাইল। যদিও সে প্রশ্নটা করেছে টমিকে উদ্দেশ্য করে কিন্তু সে তাকিয়ে রয়েছে রুশোর দিকে, ছেলেটাকে দেখে খুবই উত্তেজিত মনে হচ্ছে তার কাছে। রুশো ছেলেটা হাতে একটা ট্যাব নিয়ে খুবই উত্তেজনার সঙ্গে সেটাকে ঘাঁটাঘাঁটি করছে। বাশার ফিরে তাকাল টমির দিকে।

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

‘সত্যি কথা বলতে আমি জানি না,’ টমি তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। ‘বিশেষ করে প্রথমে যা ভেবেছিলাম এই সিফলগুলো সেটা নয়। এগুলো আমার একেবারেই আয়ত্তের বাইরে।’

‘আমি জানি এগুলো কি এবং এই রিংটা কি,’ সবাই হঠাৎ বেশ জোর গলায় কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। কথাটা বলেছে রুশো।

‘আমারও মনে হচ্ছিল তুমি কিছু বলতে চাও,’ বাশার বলে উঠল। ‘যা জানো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারো।’

রুশো তার ট্যাবটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে চলে গেল, টমির সঙ্গে কথা বলে প্রজেক্টরে কিছু সেটাপ করে সে ফের তাকাল সবার দিকে। ‘প্রথমেই একটা কথা বলে নিই। আমি যা বলছি এগুলো আমার অ্যাকাডেমিক নলেজ, নিজের আত্মহ এবং প্রচলিত মিথ, যা বলে সেগুলোকে মিলিয়ে বলছি। আমাদের হাতে যা রয়েছে এটা শ্রেফ অবিশ্বাস্য এক ব্যাপার।’

‘মানে?’ পাটোয়ারি জানতে চাইল পাশ থেকে।

‘স্যার, এই রিংয়ের অস্তিত্ব বাস্তবে আছে, এটা যদি কেউ জানতে পারে, বাংলাদেশের সঙ্গে যুদ্ধও লেগে যেতে পারে অনেক দেশের,’ বলে রুশো অন্যদের দিকে ফিরে তাকাল। ‘আমি শ্রেফ উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলিনি। মিন করেই বলেছি। এই জিনিস, ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ের একটা সাধারণ ব্যাগের ভেতরে ছিল, এটা শ্রেফ অবিশ্বাস্য।’

বলে সে বড় করে দম নিল। ‘রিংটা আসলে কি এবং আমরা কি নিয়ে ডিল করছি সেটা পরে বলছি, রিংটার বৈশিষ্ট্য নিয়েও আসলে কথা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, বা আমি সব জানিও না। রিংটার একটা দিক উদাহরণ হিসেবে বলি,’ বলে সে রিংটাকে জুম করে সিফলগুলোকে ফোকাস করল, তারপর ঘোরাতে শুরু করল খ্রিডি অ্যাঙ্গেলে। ‘পুরো রিংজুড়ে ভেতরে এবং বাইরে বেশ কিছু সিফল, রিংটা দেখে মনে হয় জিনিসটা হাতে বানানো হয়েছে কিন্তু হাতে বানানো এত সূক্ষ্ম ডিজাইন এবং কারুকাজ আমি এর আগে দেখিনি। সিফলগুলো খেয়াল করে দেখেন একেকটা একেক ধরনের। তবে বেশির ভাগই মূল বেইজের ওপরে বসানো এবং প্রতিটা ডিজাইন রঙে এবং আকৃতিতে ভিন্ন। আমি ভেবেছিলাম ডিজাইনগুলো সরল এবং বোঝার মতো। কিন্তু সেটা মোটেই ঠিক নয়। যেমন এই সিফলটা দেখাই,’ বলে সে রিংটার খ্রিডি মডেলের একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে ফোকাস করল। ‘এই সিফলটা দেখেন, একটা স্যান্ড ক্লককে খাড়াভাবে না রেখে মাটির সমান্তরালে রাখলে বা শুইয়ে দিলে যেমন দেখায় অনেকটা তেমন। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এটা স্যান্ড ক্লক,’ সে পাশের ক্রিনে একটা স্যান্ডক্লকের ইমেজ ওপেন করে দেখাল। ‘পরে পাশাপাশি শোয়ানোর পর দেখি না এটা ইনফিনিট লুপ,’ এবার সে একটা

সিপাহী

ইনফিনিটি লুপ ওপেন করে দেখাল। 'কিন্তু যখন ভালোভাবে জুম করলাম, দেখি ডিজাইনটার গায়ে খুব সূক্ষ্ম কারুকাজ রয়েছে। আমি ভেবেছিলাম, এটা স্রেফ ডিজাইন বা কারুকাজ কিন্তু পরে আবিষ্কার করি এগুলো স্রেফ কারুকাজ নয়। প্রতিটার অর্থ রয়েছে। বামের লুপটা দেখেন, এটার একটা জায়গায় খুব সূক্ষ্মভাবে সার্কেলটা একে অপরকে ক্রস করেছে, এটাকে এশিয়ান মিথের ভাষায় বলে রেড সার্কেল, বা ডেসটিনি সার্কেল, মানে দুজন মানুষের ডেসটিনি যদি লেখা থাকে, তবে তারা একে অপরকে ক্রস করবেই। আবার ডানের এই লুপটাতে যদি চোখ বুলাই এখানে দেখেন লুপটার এক জায়গায়, একটা প্রাণীর মাথার মতো রয়েছে। লুপটা এমনভাবে অন্য অংশটাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে মনে হচ্ছে মাথাটা এর বাকি অংশটাকে খেয়ে ফেলছে।'

'অরোবোরোস,' অস্ফুটে বলে উঠল সামিরা।

'মানে খুব সাধারণভাবে যদি বলি এই রিংয়ের একটা ছোট সিম্বলের ভেতরে কতগুলো আইকনকে এক করা হয়েছে। কারণ কি জানেন?' সবাই চুপ রুশোর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সাধ্য কারো নেই।

'কারণ হলো এই সব মিথের আদির সঙ্গে সংযোগ রয়েছে এই রিংয়ের।'

'কি বলে এটাকে?' বাশার জানতে চাইল।

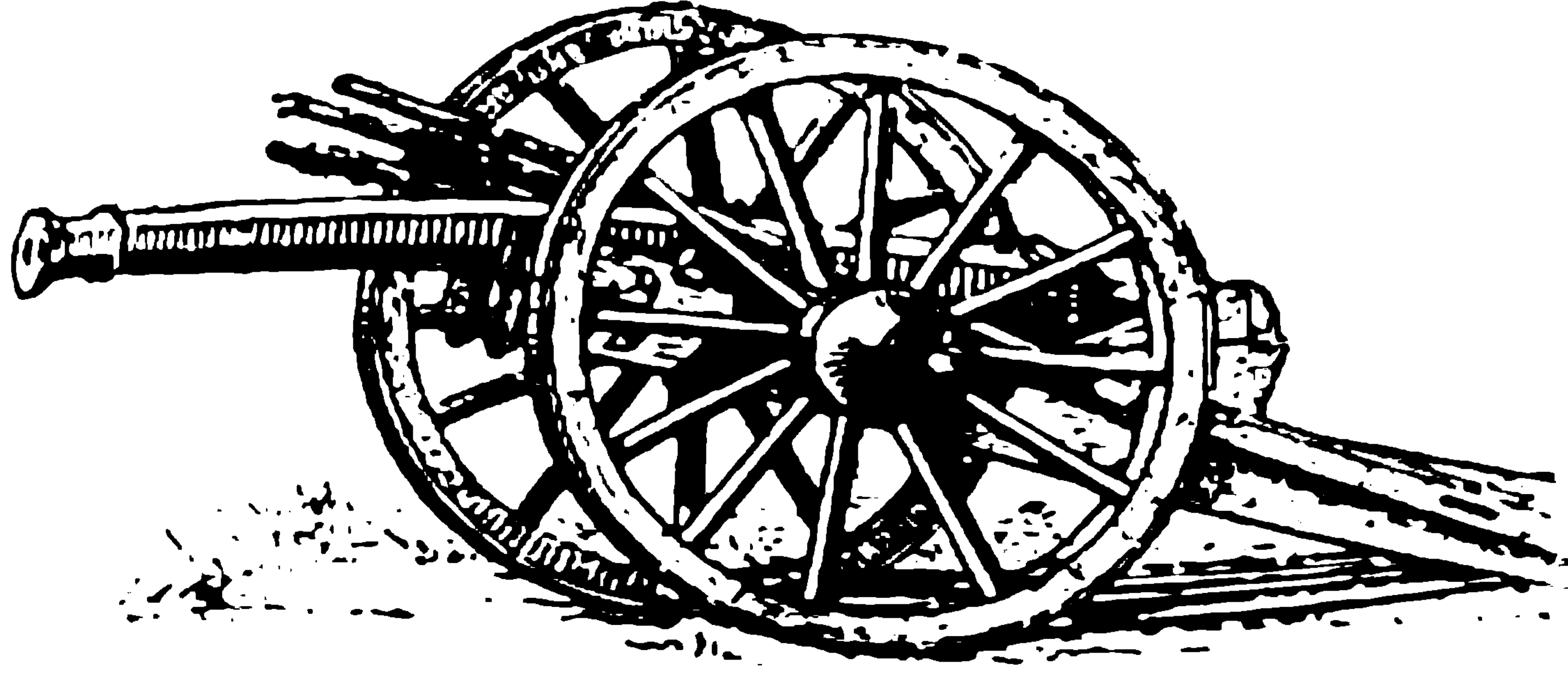
'দেখাচ্ছি,' বলে রুশো একটা ট্যাব ওপেন করল ব্রাউজারে। 'আমি আর্কিভজির স্টুডেন্ট হিসেবে খুব অল্পই জানতাম বা স্রেফ মিথটাই তনেছিলাম, আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে একটা আর্টিকেল পড়ে এটার ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারি। এই সেই আর্টিকেল, আমি এটাকে বড় জিনে রাখছি, আপনারা সবাই পড়েন, তাহলে আমাদের বাকি অংশ নিয়ে আলোচনা করতে সুবিধা হবে।

আর্টিকেলটার টাইটেল পড়ল বাশার, 'সার্পেন্টস এনিগমা রিং, শুধুই মিথ নাকি বাস্তবতা?' টাইটেলের নিচে লেখা লেখকের নামটা দেখে অস্ফুটে শব্দ করে উঠল বাশার। রীতিমতো হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে সে, দৃষ্টিতে খানিকটা অবিশ্বাস্যও।

'কি ব্যাপার কি হলো স্যার?' পেছন থেকে কেউ একজন জানতে চাইল।

'অসম্ভব,' কেউ কোনো একটা প্রশ্ন করল তাকে কিন্তু বাশারের কানে ঢুকছে না। সে এখনো তাকিয়ে রয়েছে আর্টিকেলটার লেখকের নামের দিকে। 'আমাদের কেসের তৃতীয় অজানা প্রশ্নের উত্তর আমি জানি,' বলে সে ফিরে তাকাল অন্যদের দিকে। 'এখন আমি জানি কেন আমাকে ইনভলভড করা হয়েছে এই কেসের সঙ্গে। কারণ এই কেসের সঙ্গে এমন একজনের সংযোগ রয়েছে যাকে আমি আর রিফাত মিলে বেশ কয়েক বছর আগে জেলে ভরেছিলাম এই ময়মনসিংহ শহরের ঠগিদের নিয়ে একটা কেস সমাধান করতে গিয়ে,' বাশার খেমে বড় করে একবার দম নিল।

'সাংবাদিক জয়া সরকার।'



অধ্যায় চল্লিশ

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

দিল্লি শহরের সায়াহ্নে, উত্তর ভারত

এই সেই দিল্লি, যে দিল্লি ছিল তার প্রিয় শহর, প্রায় গাঢ় অন্ধকারের ভেতরে কর্নেল নিজের প্রিয় শহরের দিকে তাকিয়ে রীতিমতো কষ্ট পেল। যে-শহরে সে নিজের পরিবার নিয়ে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়টা কাটিয়েছিল, যে-শহরটা ছিল তার হৃদয়ময়ী মায়ের মতো সেই শহর যেন রোগে-শোকে ভুগে রীতিমতো জীর্ণ কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কর্নেল অনুমান করল ভোর হতে আর খুব বেশি বাকি নেই, বড়জোর আর ঘণ্টাখানেকের পরেই দিন পরিষ্কার হতে শুরু করবে। এই রাতের অন্ধকারের ভেতরে ঢুকে যেতে পারলে আসলে ভালো হতো। কিন্তু যখন কিছু করার নেই তখন নিজের শরীর আর মস্তিষ্কে বিশ্বাস দেওয়াই সেরা উপায়, এটা বহু আগেই উপলব্ধি করেছে কর্নেল। কখনো কখনো যেটা ভবিতব্য ঠাণ্ডা মাথায় সেটার প্রকৃতি নেওয়াই সেরা পন্থা।

কর্নেল ফিরে এলো পিটার আর পালোয়ানের কাছে। 'শেষবার তোমরা কবে আসছিলো এখানে?' কর্নেলের ইচ্ছে হচ্ছে পাইপ ধরাতে কিন্তু এই অন্ধকারের ভেতরে আগুন ধরানো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। শহরে যতই গুগুগোল চলুক আর যাই হোক না কেন, কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ অবশ্যই পাহারাতে রয়েছে এবং বিদ্রোহী হোক কিংবা সরকারের লোক, কারো চোখে পড়ার ইচ্ছেই কর্নেলের নেই।

'আমার ইয়াদ নাই কর্নেল,' পালোয়ান বলে উঠল, সে তার পাশে বসা কুকুরটার মাথায় হাত বুলাচ্ছে। অন্য কুকুরগুলোকে ফটিকের সঙ্গে ফেরত পাঠালেও, বাহাদুরকে সে নিয়ে এসেছে সঙ্গে। কর্নেলের প্রাথমিকভাবে সামান্য আপত্তি থাকলেও, পরে সে মেনে নিয়েছে। কারণ পালোয়ান এটাকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, খুবই ভালোভাবে কাজে তো লাগেই বিপদের সময়ে সাহায্য করে

সিপাহী

আবার চুপ থাকতে বললে একেবারে চুপ থাকে। যেমন দিল্লি শহরে কাছে এসেই প্রথমেই কাজে লেগেছে কুকুরটা।

সেই নদীর পাড় থেকে রওনা দিয়ে তারা আগের মতোই প্রায় টানা দুই ঘণ্টা করে পথ চলেছে তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করেছে। এভাবে পথ চলতে চলতে ওরা যখন দিল্লি শহরের কাছাকাছি এসে পৌঁছায় ত্রিলোক জানায় তার পরিচিতি একজন দিল্লি শহরের বাইরে তবে কাছেই থাকে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে সে প্রথম, তারপর সে যদি সাহায্য করে তবে তাকে নিয়ে শহরের খোঁজ নিয়ে এসে অন্যদের নিয়ে যাবে। এই সময় পিটার ওদের জানায় দিল্লি শহর এখনো নামে বাহাদুর শাহ জাফর চালালেও এই শহর ভাঙনের দ্বারপ্রান্তে, পুরো শহরে ছড়িয়ে রয়েছে বিদ্রোহীরা এবং তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া ডাকাত আর অপরাধীরা ইচ্ছেমতো লুটতরাজ চালাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ এবং যেকোনো সময়ে শহরে বড় ধরনের ভয়ংকর বিপর্যয় নামতে পারে। আর এটা নিশ্চিত যে ইংরেজ বাহিনী পুরো দিল্লিকে ঘিরে রেখেছে নিজেদের সেনা দিয়ে। ওরা শ্রেষ্ঠ সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে যেকোনো সময়ে শহরটা ভেতর থেকে আরেকটু ভেঙে পড়তেই ওরা শহরে আক্রমণ চালিয়ে দখল করে ফেলবে। এবার আক্রমণে তারা কোনো ছাড় দেবে না, সব ধ্বংস করে আগে নিজেদের অবস্থান শক্ত করবে তারপর বাকি সব। আর এই অবস্থাতেই ওরা হানা দিতে চলেছে এই উত্তম নগরীতে।

একদিকে শহর ঘিরে থাকা ইংরেজ বাহিনী অন্যদিকে, শহরের ভেতরে থাকা বিদ্রোহী সবাইকে এড়িয়ে কীভাবে শহরে প্রবেশ করবে এবং কীভাবে জায়গামতো গিয়ে পৌঁছাবে এটা একটা বিরাট প্রশ্ন, আর সবটাই প্রাথমিকভাবে নির্ভর করছে ত্রিলোকের শহরের বাইরের ওই লোকটাকে খুঁজে পাওয়ার ওপরে। ওরা শহর থেকে বেশ ঋনিক দূরে নিজেদের ঘোড়াগুলো বেঁধে রেখে, প্রয়োজনীয় সবকিছু নিয়ে অন্ধকারের ভেতরে হাঁটতে শুরু করে। এই সব এলাকা ত্রিলোকের জন্য নিজের হাতের তালুর মতোই চেনা এলাকা, কাজেই ওদের এগোতে কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু শহরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এমন সময়ে ওদের সঙ্গে থাকা পালোয়ানের কুকুরটা গড় গড় করতে শুরু করে। সবাইকে চুপ থাকতে বলে নিজের বন্দুক হাতে সামনে এগিয়ে গিয়ে জঙ্গলের বড় একটা গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে ত্রিলোক দেখতে পায় সামনে ইংরেজদের বিরাট একটা বাহিনী জঙ্গলের ভেতরে গা-ঢাকা দিয়ে নিজেদের অস্থায়ী আবাস বানিয়ে পাহারায় রয়েছে। কুকুরটা যদি ওদের সাবধান না করত তাহলে আরেকটু হলে ওরা গিয়ে অন্ধকারের ভেতরে সোজা কোম্পানি সেনাদের গায়ের ওপরে গিয়ে পড়ত।

পিটার অবশ্য এখানে আসার আগে জানিয়েছিল তার কাছে সেই চিঠি এবং অনুমতিপত্র রয়েছে তাতে ওরা যেকোনো সময় যেকোনো সেনা বা যেকোনো ব্রিটিশ

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

বাহিনী বা কোম্পানির লোকদের থেকে সাহায্য নিতে পারবে। কিন্তু কর্নেল সেটা মনা করেছে। পিটারের সঙ্গে থাকা এই বিশেষ অনুমতিপত্র ওদের কাছে দেবে কোনো না কোনো সময়ে, কিন্তু কর্নেল সেটা ব্যবহার করতে খুব বেশি আগ্রহী নয়। কারণ এতে অনেক ব্যাখ্যা দিতে হবে এবং তাতে অনেক বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, যেটার সমাধান করতে গিয়ে তাদের আরো অনেক বেশি সময় এবং লোকবল ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে এই অস্থির সময়ে যখন কারোরই অন্য কাউকে ভরসা করার উপায় নেই।

কর্নেলরা কোম্পানির সৈনিক বাহিনীকে দেখে ঘোরাপথে এগিয়ে শহরের একপাশের যমুনা নদীর তীরের ছোট একটা আবাসস্থলে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে নদীর পাড়ের কুমারপল্লিতে ত্রিলোকের পরিচিত এক কুমোর রয়েছে, সে পেশায় কুমোর হলেও সেনাবাহিনী এবং মোগল হারেমে নানা ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য যেমন ভাঙ, সিন্ধি থেকে শুরু করে চণ্ড ইত্যাদির জোগান দিয়ে থাকে। এই লোকের কাছে ব্রিটিশ বাহিনী থেকে শুরু করে দিল্লির সব বড় ব্যবসায়ী এমনকি মোগলদের স্তার সব খবর থাকে। এই মুহূর্তে ওদের শহরের ভেতরে ঢোকানোর ব্যবস্থা যদি কেউ করতে পারে তবে একমাত্র এই লোকই পারবে। এই কুমোরের বাড়িতে গিয়ে তাকে ডেকে তোলার পর ছোটোখাটো দাঁড়িওয়ালা চোখা চেহারার মানুষটা ত্রিলোককে দেখে খুবই অবাক হয় এবং তার সঙ্গে লোকদের দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে যায়। কিন্তু ত্রিলোক তাকে ঠান্ডা মাথায় জানায় তার কী প্রয়োজন এবং সে তার ব্যবস্থা করতে পারবে কি না।

রাত নামের লোকটা ওদের জানায় বিগত এক সপ্তাহে শহরে পরিস্থিতি এতটাই নিচে নেমেছে যে, এমনকি সেও শহরের আশপাশে ভিড়ছে না। এমনভাবে সে আদৌ সাহায্য করতে পারবে কি না এমনকি সেও বলতে পারছে না। ত্রিলোক কর্নেলের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বোঝায় সে আসলে আরো বেশি টাকা দাবি করছে। কর্নেল তাকে আশ্বাস দিয়ে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেয় তাকে। সেই সঙ্গে এও আশ্বাস দেয় যে, যদি সে ওদের জায়গামতো পৌঁছে দিতে পারে তবে এরকম পয়সা সে আরো পাবে। এবার রাত খানিক চিন্তায় পড়ে যায়, তারপর সে ওদের সবাইকে নিয়ে চলে আসে শহরের অন্যপাশের এক জঙ্গলে খাড়িতে। সেখানে পৌঁছে, সে অন্যদের অপেক্ষা করতে বলে ত্রিলোককে নিয়ে ভেতরে যাওয়ার রাস্তা পরখ করতে চাইলে কর্নেল বাধা দেয়। এই লোকের সঙ্গে সে ত্রিলোককে একা যেতে দেবে না। সে সোলেমানকেও ভিড়িয়ে দেয় ওদের দুজনার সঙ্গে। তিনজন মিলে শহরের প্রান্তের দেয়ালের কাছের ঝোপ-জঙ্গলে গায়েব হয়ে যাওয়ার পরে থেকে কর্নেল পালোয়ান আর পিটার অপেক্ষা করছে অন্যদের জন্য।

সিপাহী

‘আমি এখানে শেষবার এসেছিলাম বছর দুই আগে,’ কর্নেলের প্রশ্নের জবাবে পালোয়ান মানা করার পর, পিটার বলে উঠল। কর্নেলের মনে পড়ে গেল, সে এখানে শেষবার এসেছিল একযুগেরও আগে। সে যখন এসেছিল, তখন ব্রিটিশ সেনাদের এক বিশেষ উৎসব চলছিল, তার স্ত্রী জেনি আর ছেলেকে নিয়ে সে খুবই উৎসববহুল পরিবেশে এখানে এসেছিল এবং কর্নেলের মনে পড়ল, সেইবারের ছুটিটা ছিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ছুটিগুলোর একটা। জেনি আর নিজের ছেলের কথা মনে পড়তেই বুক চিড়ে বেরিয়ে এলো বিরাট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস। সময় এবং স্মৃতি কখনো কখনো ভয়ংকর বেদনাদায়ক।

‘আমি—’ কর্নেল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ওদের সামনে ঝোপের ভেতর থেকে শব্দ ভেসে এলো। কর্নেল নিজের পিঙ্কল ডুঙ্গল এক পালোয়ান তার লাঠি, কিন্তু ওদের কুকুরটা কিছু বলছে না দেখে নিজের সতর্কতা কমিয়ে দিল দুজনেই। ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো প্রথমে সোলেমান, তারপর রাত্ত এবং সবার শেষে ত্রিলোক।

‘কাজ হয়েছে?’ তিনজনই এগিয়ে এসে ঘাসের ওপরে আসন গেড়ে বসে গেল।

‘অইছে আবার অয় নাই,’ রাত্ত লোকটাকে কর্নেলের কেন জানি ভালো লাগছে না তরু থেকেই। এর কথা খুব প্যাচালো।

‘শোন যদি আমার থেকে পুরস্কার পেতে চাও, তাহলে পরিষ্কার করে কথা বলবে এখন থেকে,’ কর্নেল পিঙ্কল নেড়ে বলে উঠল। তার খানিক মেজাজ খারাপ হয়েছে।

‘রাত্ত যে-পথে যাতায়াত করে,’ বলে বিশেষ ইশারা করল ত্রিলোক, মানে বুঝিয়ে দিল তার বিশেষ ধরনের যাতায়াত। ‘সেই পথে যাওয়া সম্ভব না, ভেতরের গ্রহরীরা ওই পথ সবার আগে বন্ধ করে দিচ্ছে। আর বাইরেও আমগো বজুগোর গ্রহরা। কারণ ওই পথ সবাই চেনে।’

‘তাহলে এখন উদার?’ কর্নেল জানতে চাইল।

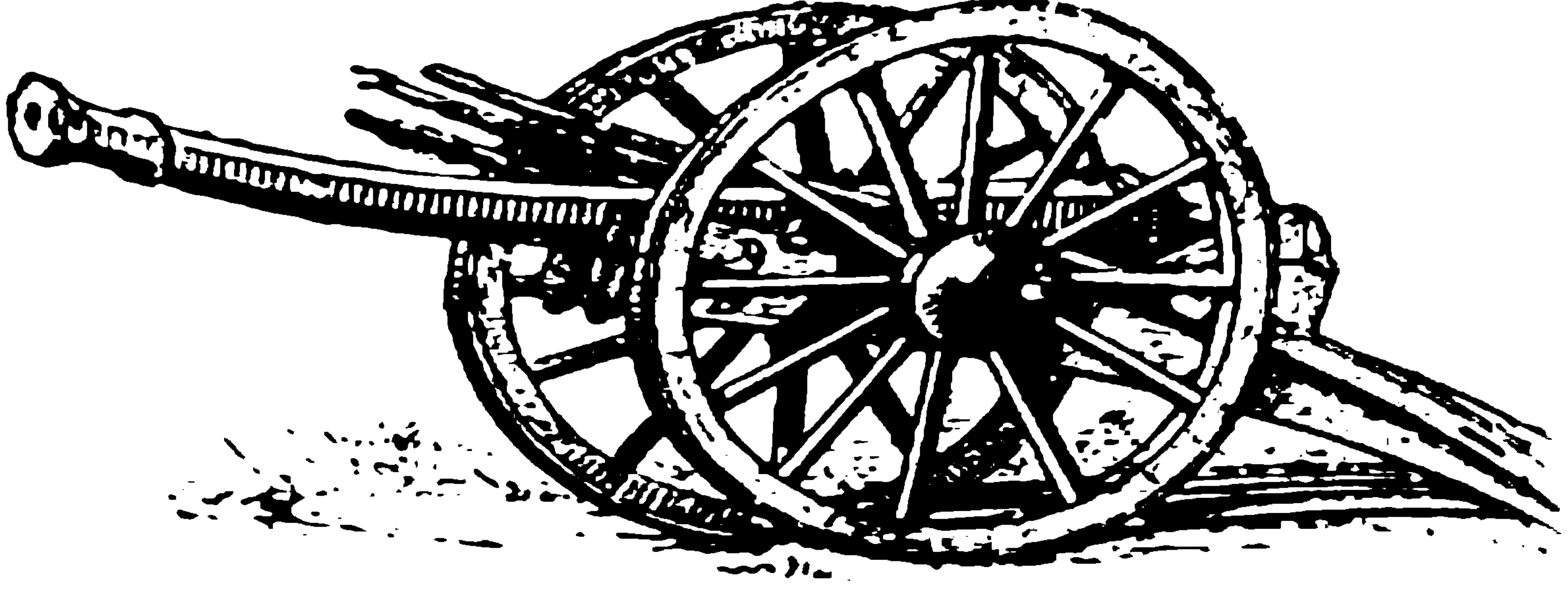
‘পথ আরেকটা রয়েছে, ওইটাও পরখ করে আসছি আমরা,’ সোলেমান বলে উঠল এবার। ‘পথটা ভালো কিন্তু দুইটা সমস্যা আছে। এক, খুবই বাজে পথ, দুই এই পথ সোজা গেছে চাঁদনি চকবাজারের ভেতরে। ওইখানে ঢুকলেও লোকজনের চোখ এড়িয়া যেইখানে বাইতে চাই সেইখানে যাওয়া খুব কঠিন হবে।’

‘কিছু করার নেই, শহরে আমাদের ঢুকতেই হবে,’ কর্নেল অনেকটা আনমনে বলে উঠল। তার কথার সাথ জানাল অন্যরা। ‘কিন্তু প্রশ্ন হলো এরপরে?’ শেষ অংশটা সে উচ্চারণ করেছে ত্রিলোকের উদ্দেশে।

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

কর্নেলের প্রশ্নটা শুনলেও ত্রিলোক সরাসরি কোনো জবাব দিল না, সে ভাবছে। 'কুস্প,' করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল সে। 'দিন্লি শহরে একজন লোক আছে,' যেন মনে মনে ভাবছে। 'খলিফা,' বলে সে মুখ বাঁকা করল। 'এই লোকের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো পেশায় সে দর্জি হলেও সব নায়েবদের সঙ্গে সংযুক্ত। ভিক্টর স্যারে দ্বিত্বিতে যদি থাইকা থাকে, আর শহরে থাকতে হইলে দাগুরিক কোনো কাজে কইরা থাকে, যেইটার সম্ভাবনা আছে। তাহলে খলিফার কাছে তার খবর থাকবই। দ্বিত্বিতে ঢুকতে পারলে তার কাছেই যাইতে হবে খবরে জন্য। যদি ব্যাটা এহনো বাঁইচ্চা থাকে আরকি।'

চলো, আমরা এখুনি রওনা দেব পথ যতই খারাপ হোক আর বিপজ্জনক হোক, আগামী আধাবেলার ভেতরে আমার ভিক্টরের খবর চাই। আর সেটা করতে হলে খলিফা হোক, আর যেই হোক, তার কাছেই যাব আমরা চলো।'



অধ্যায় একচল্লিশ বর্তমান সময় পুলিশলাইন জেলখানা, ময়মনসিংহ

শেষ পর্যন্ত জয়া সরকারের কাছে যেতে হচ্ছে তার।

জিপের পেছনে মুখ ভার করে বসে থাকা বাশারের ভারি চেহারার দিকে তাকিয়ে সামিরা কিছু বলার কথা ভাবল, কিন্তু কী বলবে ঠিক বুঝতে না পেরে সে একবার রমিজ দারোগা, আরেকবার কনস্টেবল আবদুল্লার দিকে দেখল। ইনসপেক্টর রবিউল জিপের সামনের অংশে বসে টকিতে কথা বলছে কারো সঙ্গে। আর ওদের জিপ অপেক্ষা করছে পুলিশ লাইন জেলখানার গেটে। বিশেষ অপরাধী, যাদের মামলা চলছে বা যাদের বিষয়ে ফাইনাল রায় হয়নি বা সিদ্ধান্ত হয়নি এ-ধরনের অপরাধীদেরকে এখানে রাখা হয়। জয়াও সেরকই একজন এবং এখানকার মহিলা সেকশনে রাখা হয়েছে তাকে। অবশ্য তাকে মহিলা না পুরুষ সেকশনে রাখা এটা নিয়ে খানিক সমস্যা রয়েছে। কাজেই তাকে মহিলা সেকশনে রাখা হলোও, তার জন্য আলাদা কামরা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটা অবশ্য বাশার জানতে পেরেছে অথরিটির সঙ্গে যোগাযোগ করার পর। জয়ার সঙ্গে দেখা করার বিষয়টা যদিও ব্যাপারটা বাশারের জন্য খুব খুশির বা সুবিধার না।

রুশোর ওপেন করা আর্টিকেলটা খোলার পর বাশার খুবই অবাক হয়ে আবিষ্কার করে এই আর্টিকেলের লেখিকা সাংবাদিক জয়া সরকার, যাকে ঠগীদের কেসে বন্দি করে জেলখানায় ভরেছিল সে আর রিফাত মিলে। সেই আর্টিকেলের সঙ্গে সংযুক্ত আরো বেশ কয়েকটা আর্টিকেলের হাইপার লিঙ্কে ক্লিক করে দেখা যায় জয়া সরকারই সবগুলোর লেখক। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ জয়া সরকার যে পত্রিকায় কাজ করত সেটার আর্কিওলাজিক্যাল সেকশন কভারই করাই ছিল তার দায়িত্ব। কাজেই এ-ধরনের লেখা সে লিখতেই পারে। কিন্তু এই বিষয়ের ওপরে একমাত্র তারই লেখা থাকা এবং সেটা এভাবে এই সময় সামনে এসে হাজির হওয়া

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

এক রিফাতের অপহরণকারীদের এই জিনিসটাই বাশারের হাতে ধরিয়ে দেওয়া অবশ্যই কিছু না কিছু মিন করে।

‘এটা কো-ইন্সিডেন্স হতেই পারে না,’ অনেকক্ষণ চুপ থেকে হঠাৎ বলে উঠল বাশার। নতুন বাজারের অফিসে এই নাম আবিষ্কার হওয়ার পর বাশার খুব সংক্ষেপে জানায়, তার আগের কেসে জয়া সরকারের ইনভলভমেন্ট এবং সেই সঙ্গে এটাও জানায় যে এই কেসে জয়া সরকারের নাম আসা মানে অবশ্যই তাকে দেখা করতে হবে এই মহিলার সঙ্গে। সেই সঙ্গে এটাও জানায় এটা তার পুলিশি ক্যারিয়ার এবং ব্যক্তিগত জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ হতে যাচ্ছে, কিন্তু রিফাতের কেস সমাধানের জন্য এটা তাকে করতেই হবে। পাটোয়ারি স্যারকে জয়া সরকারের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করতে বলে বাশার আরো কিছু অনুরোধ জানায়। এভাবে দেখা করা কিংবা অনুরোধ জানানো কোনোটাই খুব সহজ ব্যাপার নয়, কিন্তু বাশার পাটোয়ারিকে যেকোনোভাবে করার অনুরোধ করে ক্যান্টিনে গিয়ে অন্যদের নিয়ে লাঞ্চ করে নেয় ওরা। বাশার জানত পাটোয়ারি পারবেই, ওরা লাঞ্চ করতে করতে ঘণ্টাখানেকের ভেতরে পাটোয়ারি ওদের মোলাকাতের ব্যবস্থা করে ফেলে সেই সঙ্গে বাশারকে এটাও জানায়, সে রীতিমতো নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে এবং বিগত এক ঘণ্টায় সে অসম্ভব সম্ভব করেছে বাশারের অনুরোধ রাখতে গিয়ে। বাশারও তাকে মন থেকে ধন্যবাদ দিয়ে রওনা দেয় পুলিশলাইন জেলখানার দিকে। সবচেয়ে কঠিন কাজটা করতে হবে তাকে এখন, মোলাকাত করতে হবে জয়া সরকারের সঙ্গে, ভাবতেই জয়া সরকারের চেহারাটা ভেসে ওঠে বাশারের মনের পটে, সেই সঙ্গে আরো কিছু ভয়াবহ স্মৃতি।

‘সে আর বলতে,’ সামিরা বলে উঠল। ‘এতটা কোইন্সিডেন্স কোনোভাবেই হতে পারে না। কারণ ঢাকা থেকে রওনা দেওয়ার সময় থেকেই এ-ধরনের একটা আনুমান আমরা করেছিলাম যে প্রতিটা ঘটনা যেগুলো ঘটছে এর সবগুলোই কানেক্টেড। তোমার আগের কেসের সমাধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিফাতের অপহরণ এবং তার সঙ্গে তোমাকে টেনে আনা এবং তোমার অতীতের কেসের সঙ্গে এর সংযোগ থাকা সেটাই প্রমাণ করে। আমার প্রশ্ন হলো,’ সামিরা বাশারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সরাসরি। ‘এই সব আসলে কি প্রমাণ করে, আমরা আসলে যাচ্ছি কোনদিকে এবং এই মহিলা,’ বলে সামিরা মাথা ঝাঁকাল। ‘তার ব্যাপারে যা শুনলাম তাতে তো খুব একটার সুবিধার চরিত্র মনে হচ্ছে না তাকে। এই মহিলা তোমাকে সাহায্য করবে আদৌ?’

‘করবে,’ বাশার নাগের ডগা চুলকালো। ‘আমি জানি তাকে কীভাবে রাজি করাতে হবে। আমি তাকে এমন অফার দিব,’ বলে বাশার হেসে উঠল। ‘যাতে তার মেজাজ খারাপ হয়। আর বাকিটা দেখা যাক,’ বলে সে সামনে দেখাল।

সিপাহী

পোস্টের ওপাশ থেকে সেন্টি এগিয়ে এসে জানাল ওদের জিপ ভেতরে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বাশারদের জিপ ভেতরে যেতে যেতে বাশার খানিক অবাক হয়েই দুইপাশে দেখতে লাগল। মজার বিষয় হলো এই এলাকাতেই তার শৈশব কেটেছে, সে বড় হয়েছে। কিন্তু কোনদিন তার এই পুলিশ লাইন জেলখানার ভেতরে যাওয়া হয়নি। মূল সড়ক ধরে যাতায়াত করার সময় চিরকাল দেখেছে এই উঁচু দেয়াল। বাশারের মনে আছে, এই জেলখানার গেটের বাইরে একটা হাতে বানানো জিনিসপত্রের দোকান ছিল। এখন সেটা আর নেই, বাশার দেখল ওদের জিপ জেলখানার মূল আকৃতির বাইরে গিয়ে থামল। ওদের জিপ থামতেই একজন সেন্টি এসে জানাল জেলার ওদের জন্য অপেক্ষা করছেন। বাশার রমিজ দারোগা আর আবদুল্লাহকে বাড়িতে বসতে বলে ইনসপেক্টর রবিউল আর সামিরাকে নিয়ে সোজা চলে গেল জেলারের অফিসে।

জেলার লোকটা একেবারে সিনেমায় দেখা টিপিক্যাল জেলার চেহারার মানুষ। ছোটোখাটো, তবে শক্ত আকৃতি, পরিপাটি ইউনিফর্ম, মাথার চুল ইচ্ছেমতো নারকেলের তেল দিয়ে ভাগ করা। ওদের কেন জানি কোনো কারণ ছাড়াই খুব তড় নারকেলের তেল দিয়ে ভাগ করা। ওদের কেন জানি কোনো কারণ ছাড়াই খুব তড় মুখে বসতে বলল। তার সামনে একটা ফাইল রাখা, বাশার ওটার দিকে না তাকিয়েই অনুমান করতে পারল এটা জয়া সরকারের ফাইল। নিশ্চয়ই সে ওদের সঙ্গে এভাবে দেখা করার অনুরোধ পাবার পরে পরীক্ষা করে দেখেছে কে এই বন্দি যার সঙ্গে দেখা করার জন্য এত তোড়জোড়। ‘আপনাদের পরিচয়পত্র দেখতে পারি?’ সে খুব ভালো করেই জানে, দেখা করতে এসেছে। আর গেটে ওদের পরিচয়পত্র পরীক্ষাও করা হয়েছে। কাজেই এটা স্রেফ একটা দাপট খাটানো ছাড়া আর কোনো কারণ নেই। ওরা পরিচয়পত্র দেখাল, সে ইচ্ছেমতো সময় নিয়ে দেখল। তারপর একে একে ওদের দেখল, বিশেষ করে সামিরার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ, তারপর জানতে চাইল, ‘আপনারা আমার বন্দির সঙ্গে কেন দেখা করতে এসেছেন?’

‘আপনাকে কেউ বলেনি, এটা বিশেষ কেস?’ সামিরার রিপ্লাই শুনেই বাশার বুঝতে পারল তার দিকে এমন অসভ্যের মতো তাকিয়ে থাকার ব্যাপারটা সে খুব ভালোভাবে নেয়নি। বাশার একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল। সেইসঙ্গে সামিরার প্রশ্ন শুনে জেলারও খুব তেলতেলে হাসি দিয়ে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল, বাশার তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিল।

‘স্যার, আমি জানি এটা আপনার এলাকা এবং আপনার জেলখানা এবং আমরা এখানে মেহমান হিসেবে এসেছি,’ জেলার আবারো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, আবারো তাকে থামিয়ে দিল বাশার, বেশ রুঢ়ভাবেই। একজন পদবলে জুনিয়র

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

হিসেবে এটা কেউ করতে পারে না। কিন্তু জেলারের আচরণ দেখে ওর মনে হচ্ছে এই লোকের সঙ্গে একটু নরম হলেই খবর আছে, বরং শক্ত হলে কাজ হতে পারে। কিন্তু আমরা খুবই সিরিয়াস, জরুরি এবং ইন্টারন্যাশনাল গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িত একটা কেসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিষয়ে আপনার একজন বন্দির সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। পারমিশন লেটার তো আপনি দেখেছেন। এখন যদি দেরি করান বা দেখা করতে ঝামেলা করান, সেক্ষেত্রে আমাদের ওপরে কথা বলতে হবে। আর যদি আরো ঝামেলা—’

বাশারের বাক্য শেষ হওয়ার আগেই আবারো সেন্ট্রিকে ডেকে জেলার লোকদেরকে নিয়ে যেতে বলল। তার দৃষ্টি দেখে মনে হলো পারলে চোখ দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। বাশার তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে টেবিলের ওপর থেকে আইডিগুলো তুলে নিল। ‘চলো।’

সামিরা মৃদু হেসে উঠতে যাচ্ছিল, ইনসপেক্টর রবিউলের মুখেও হাসি, দুজনকেই ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল বাশার। বাইরে বেরিয়ে অবশ্য নিজেও খানিক হেসে উঠল। ‘বিস্টের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে গেছে এবার বিউটির সঙ্গে মোলাকাতের সময়।’

সেন্ট্রি ওদের নিয়ে একটা ছোট কামরায় বসাল, ওখানে তিন-চারটে টেবিল আর কিছু চেয়ার রাখা। বসে কথা বলার জন্য জায়গাটা মোটেও উপযুক্ত কিছু না। কিন্তু এখানেই বন্দিদের সঙ্গে বিশেষ কাজে আসা লোকজন দেখা করে এবং কথা বলে, বাশার অনুমান করল।

‘স্যার, আপনারা উনার সঙ্গে কথা বলুন,’ ইনসপেক্টর রবিউল বাশারকে অনুরোধের ভঙ্গিতে বলে উঠল, ‘আমার একটু কাজ আছে, কথা বলতে হবে।’

বাশার খুশি হয়ে অনুমতি দিল তাকে। জয়া সরকারের সঙ্গে কথা বলার সময়ে ইনসপেক্টর রবিউল না থাকলেই ভালো হবে। তবে সামিরা থাকলে খারাপ হবে না। ‘ওরা কিন্তু সামিরা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাইরে গালাগালির শব্দ শুনে বাশার মৃদু হেসে বলে উঠল, ‘ওই যে ম্যাডাম চলে আসছেন,’ বাশারের বাক্য শেষ হওয়ার আগেই দরজার দুজন গার্ডের সঙ্গে দেখা দিল একজন মহিলা।

মহিলা হলেও তার আকৃতি এবং চলন-বলন সবই ছেলেদের মতো। এমনকি, আগে লম্বা চুল থাকলেও সেগুলো এখন একেবারেই মিলিটারি লোকদের মতো ত্রু-কাট করে কাটা। আরো অদ্ভুত ব্যাপার হলো তার পরনে জেলখানার মেয়েদের পোশাক নয়, বরং পুরুষের পোশাক পরনে। ‘আরে আরে, এ-দেখি বিয়ার আগেই হোগা মারা সারা,’ ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে দরজায় দাঁড়িয়ে গেছে জয়া সরকার। বাশার তাকে দেখে ঠিক যতটা ঠান্ডা, বাশারকে দেখে সে ঠিক ততটাই অবাক হয়েছে। বিস্তী কথটা বলেই সে তার পাশের তরুণ সেন্ট্রির দিক তাকিয়ে বলে উঠল, ‘এই পিচ্চি পোলা, দেখসোছ আমাদের নায়র আসছে,’ বলে সে তরুণ

সিপাহী

সেদ্বিক্কে ঠেলা দিয়ে একপাশে সরিয়ে ঢুকে পড়ল কামারার ভেতরে। শব্দ করে চেয়ার টেনে বসে পড়ল বাশারের মুখোমুখি।

‘কারবার দেখছো, এ-দেখি আসলেই তুমি! ও বাব্বা, লগে আবার নাটিকাও আছে,’ বলে সে ফিরে তাকাল সামিরার দিকে। ‘ও বাবা, এ-দেখি আবার নতুন আরেকটা। এইটা তো দেখি আগেরটার চাইতেও ভালো,’ বলে সে আবার বাশারের দিকে ফিরে তাকাল। ‘কি নায়ক সাহেব আগেরটা পুরান হয়ে গেছে, তাই এই নতুনের আয়োজন নাকি?’ বল সে আবার সেই তরুণ সেদ্বিক্কে দিকে ফিরে তাকাল, ‘বুঝছোস, আমগোর নায়কের আবার সামনে-পিছে দুইটা হইলে চলে না, সরি ডাইনে-বামে দুইটা। ওই পোলা, তুই তো এহনো আবাল, কিছু বুঝছোস আমি কি কলছি,’ বলে সে আবার বাশারের দিকে ফিরে তাকাল। ‘তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছো, এইটা কীভাবে সম্ভব,’ সে তাকিয়ে আছে বাশারের দিকে।

বাশারও তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে, বাশারের মুখে মৃদু হাসি। সে আরো রাফ ইন্ট্রোডাকশন আশা করেছিল, সেই হিসেবে জয়া সরকারের সঙ্গে মোলাকাত এখনো ভালোই আছে। এই মহিলা আরো যা তা ভাষায় কথা বলে। কিন্তু সামিরার দিকে তাকিয়ে দেখল রাগে ফুলতে শুরু করেছে সে। ইশারায় তাকে শাস্ত থাকতে বলে সে ফিরে তাকাল জয়া সরকারের দিকে। ‘কেমন আছো, জয়া?’

বাশারের শাস্ত ভাব এবং তার প্রশ্ন শুনে জয়া সরকার খানিক চমকেই গেল, সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বাশারের দিকে। বাশারও তাকিয়ে আছে তার দিকে। বাশার দেখল, জয়া সরকারের চেহারা একেবারেই বিধ্বস্ত। এই অল্প সময়ে তার বয়স বেড়েছে প্রায় দশ বছর। ছোট করে ছাঁটা চুল, এমনিতেই সে ভারী ছিল, শরীর আরো ভারী হয়েছে, কিন্তু কেমন জ্ঞানি জীর্ণ একটা ভাব। দুই পাশের জুলকিতেই পাক ধরেছে চুলে। ‘তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছো, আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না। বড় কিছু না হইলে—’

‘ব্রিকাত অপহরণ হয়েছে জয়া,’ বাশার এক দমে বলে উঠল। ‘তোমার সাহায্য প্রয়োজন আমার,’ বলে সে ধেমে গেল, তাকিয়ে রয়েছে জয়া সরকারের দিকে। জয়া সরকারও তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।

‘শালা মাদারবোর্ড!’ জয়া নিজের দুই হাত টেবিলে ওপরে রেখে ধাম করে বাড়ি মারল এককার টেবিলে। ‘তুমি আমারে জেলে ভরছো, আমার জীবন শেষ করে দিছো। আর তুমি আসছো আমার কাছে সাহায্য চাইতে, এমন বলদ ওই পিচ্চি পোলা প্রথমবার বউরে করতে গেলে হবে না,’ বলে সে অল্প বয়স্ক সেদ্বিক্কে দেখিয়ে বলে উঠল।

‘আপনার আসলে নিজের জিহ্বাটাতে খানিক সংযত করা উচিত,’ রাগের সঙ্গে কোঁস করে বলে উঠল সামিরা।

‘বাশার, তোমার মাতারিরে বলো—’

‘দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

‘একদম চোপ—’ সামিরা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বাশারের মনে হলো সে যেকোনো সময় নিজের পিছুল বের করে আনবে।

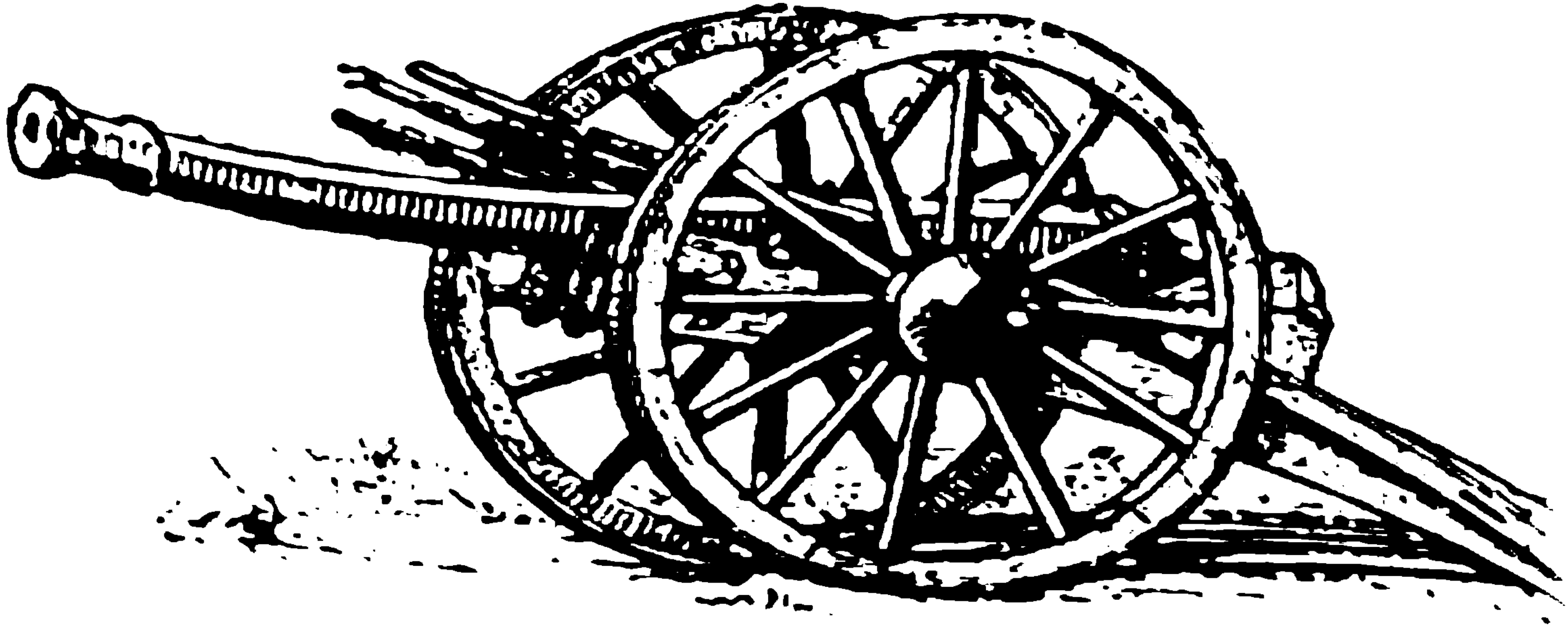
‘শক্তি শক্তি। জয়া আমাকে যা ইচ্ছে বলো, কিন্তু অন্যদের প্রতি তোমার সম্মান বজায় রাখতে হবে। আমি এখানে কাজে এসেছি,’ বলে নিজের মাথাটাকে খানিক সামনে এগিয়ে দিল বাশার। ‘আর তুমি বলছো আমি তোমার জীবন শেষ করেছি। তুমি নিজেই সেটা করেছে। আর তুমিও সেটা জানো। আর আমি ফাও তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। আমি এখন স্পেশাল সেলে কাজ করি, তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো আমি তোমার জন্য ব্যবস্থা করব,’ বলে বাশার টেবিলের ওপরে দিয়ে একটা প্যাকেট এগিয়ে দিল জয়ার দিকে।

বাশারের কথা শুনে জোরে হেসে উঠতে যাচ্ছিল জয়া সরকার, বেনসনের প্যাকেটটা দেখে সে অস্থির হয়ে উঠল। সাপ যেভাবে ছোবল মারে, ঠিক সেরকম ছোবল মেরে সে টেবিলের ওপর থেকে নিয়ে নিল প্যাকেটটা। বাশার মৃদু হেসে একটা লাইটার এগিয়ে দিল তার দিকে। সেক্সের আগে অস্থির হয়ে পুরুষ-নারী যেভাবে কাপড় খোলে ঠিক একই অস্থিরতার সঙ্গে প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট ধরাল জয়া সরকার। তারপর নীরবে কিছুক্ষণ টানতে লাগল সিগারেট। মাতালের মতো নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে দেখে মনে হচ্ছে জয়া সরকার আসলে সিগারেট টানছে না, তার অর্গাজম হচ্ছে। বাশার মৃদু হেসে উঠল তার দিকে তাকিয়ে, সামিরা এখনো রাগে লাল হয়ে তাকিয়ে আছে।

‘আগে বিড়ি আনাইতাম, এরপরে শালা ছাগলের লাদ জেলাররে একদিন চড় মারার পর থেকে আর সিগারেট আনতে পারি না। কিছুই করতে পারি না’ বলে সে আবারো জোরে একটা টান দিল। ‘উফফ কতদিন পর ভালো তামাক,’ বলে সে নেশাতুর চোখে বাশারের দিকে ফিরে তাকাল। ‘ধন্যবাদ বাশার,’ বলে সে বড় করে দম নিল একবার। ‘ভালোভাবে কথা বলছি, এরমানে মনে করো না আমি তোমাকে সাহায্য করব,’ বলে সে সিগারেটটা ঠিক পিছুলের মতো তাক করল বাশারের দিকে। ‘তুমি আমার জীবনটা স্রেফ নষ্ট করে দিছো,’ জয়ার চোখে পুরনো আগুন। বাশার কিছুই বলল না, ও মোটামুটি জানে কীভাবে জয়া সরকারকে হ্যান্ডেল করতে হবে। সে স্রেফ তাকিয়ে রইল তার দিকে।

‘গড ড্যাম ইট, এরকম ছাগলের মতো তাকিয়ে না থেকে বলো কি বলতে এসেছো,’ বাশার তাও তাকিয়েই রইল। এবার পুরোপুরি রেগে উঠল জয়া সরকার। ‘ফাজলামো করো তুমি আমার সঙ্গে!’ বাশার এখনো চুপ। জয়া সরকার আবারো রেগে উঠতে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে। ‘আচ্ছা, বলো কি ব্যাপার, আমি শুনছি।’

এবার খানিক এসে উঠল বাশার। ‘তোমার জন্য একটা কাজের অফার নিয়ে এসেছি আমি।’



অধ্যায় বিয়াল্লিশ

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

দিল্লি শহরের প্রান্তে, উত্তর ভারত

‘সিরিয়াসলি এইটার ভেতর দিয়ে যেতে হবে আমাদের?’ কর্নেল সামনের নোংরা নালাটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কর্নেল কিছু বলার আগেই তার পেছন থেকে ছপ ছপ করে আধা ভেজা কাদাটে নালাটার ভেতরে নেমে গেল পালোয়ান, তার ঠিক পাশেই কুকুর বাহাদুর একবার কর্নেলকে দেখে নিয়ে নেমে গেল। পালোয়ান কর্নেলের দিকে তাকিয়ে খানিক মজার ছলে বলে উঠল, ‘কর্নেল তুমিই না একটু আগে বলতামিলা, যা করা লাগে করব, এখন নালাতে নামতেই এত কষ্ট,’ বলে সে আরেকটা হাসি দিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। কর্নেল আনমনে মাথা নাড়ল একবার, এই কেসে আরো কত কী যে করতে হবে তার, কে জানে। ওরা একটু আগে দেয়ালের বাইরে থেকে রওনা দিয়ে জঙ্গুলে এলাকা পার হয়ে চলে আসে দেয়ালের কাছে।

দেয়ালের কাছে এসে একেবারে ওটার গা-ঘেঁষে এগোতে থাকে ওরা। এক জায়গায় এসে দেয়ালের দুটো অংশ মিলে গেছে একে অন্যের সঙ্গে ওখানে একটা ফাঁক, কোনোমতে একজন মানুষ ঢোকানো যতো। কর্নেল খুব অবাক হয়ে জানতে চায় এককম ফাঁক এখানে থাকার কারণ কি। রাত খুব আনন্দের সঙ্গে বলতে শুরু করে এই ফাঁক আসলে কীভাবে হয়েছে, বা কীভাবে বানানো হয়েছে—সেটার বিবরণ শেষ করে থেমে যায়, কেন এই ফাঁক বানানো হয়েছে সেটা আর বলে না। কর্নেল একবার জুঁকুচে দেখল রাতকে। রাত পরিস্থিতি বুঝতে পেরে আবারো হাঁটতে শুরু করেছে। সেই ফাঁক দিয়ে ওরা তো কোনোমতে ঢুকে পড়ল কিন্তু আটকে গেল পালোয়ান। বহু কষ্টে তাকে টেনে ভেতরে ঢোকানো হলো। ভেতরে চারপাশে আবদ্ধ ছোট একটা সরু গলির মতো, সেটাও আবার একেবারে অন্ধকার,

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

সেই অন্ধকার গলি পার হয়ে ওরা এসে পড়ল একটা নালার সামনে। নোংরা সেই নালার সবাই একে একে পার হয়ে গেলেও কর্নেল খানিক দ্বিধা করছে।

‘চলেন, স্যার,’ কর্নেলের পাশে এসে দাঁড়াল পিটার। ‘এতে করে দুটো সুবিধা হবে। এক, কাপড় নোংরা হয়ে গেলে কেউ বুঝতে পারবে না আমরা আসলে কারা।’

‘আমরা এক অদ্ভুত সমাজে বাস করি, যে-সমাজে নোংরা পোশাক পরা মানুষদের অন্যরা ঘেন্না করে, আর নোংরা কাজ করা মানুষদের সমাজ চালাতে দেয়া হয়।’

‘ঠিক, নোংরা পোশাক পরা মানুষদের দিকে সমাজ দ্বিতীয়বার ফিরে তাকায় না,’ বলে কর্নেল নেমে গেল কাঁদাপানিতে, ছপ ছপ করে শ পাঁচেক গজ হেঁটে সামনে এগোতেই দেখতে পেল একটা সুড়ঙ্গের মতো। রাঙকে হামাগুড়ি দিয়ে ওটা দিয়ে ঢুকতে দেখে পিটারকে ওদিকে দেখিয়ে কর্নেল বলে উঠল, ‘এবার তোমার স্বপ্ন পুরোপুরি পূরণ হয়েছে চলো।’

সবাই মিলে সুড়ঙ্গ দিয়ে গজ বিশেক এগোতেই সকালের রোদের ভেতরে জ্বলা একটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো। জীবনে আরেকবারের মতো কর্নেল উপলব্ধি করল, সকালের আলোর একটা আলাদা শক্তি আছে যেকোনো ধরনের পঙ্কিলতাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার। যদিও তার সারা গায়ে নোংরা এবং ময়লা তাও পৃতিগন্ধময় অন্ধকার দেয়ালের ফাঁকের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসে কর্নেল সকালের মৃদু আলোয় বুক ভরে দম নিল। শরীরের বাইরেটা নোংরা হলেও ভেতরটা রীতিমতো পরিচ্ছন্ন মনে হলো তার কাছে। ‘এখান থেকে কতদূরে জায়গাটা; যেখানে যাব আমরা?’ প্রশ্নটা কর্নেল উচ্চারণ করল রাত্তির উদ্দেশে।

‘হজুর, আমরা প্রায় চইলা আসছি,’ বলে সে ইশারায় সামনের পুষ্টিভূত এলাকার দিকে দেখাল। ‘ওইগুলো বাজারের শুদামঘর। ওইগুলো পার হইলেই মূল বাজার এলাকা আর সেটার অন্যপাশেই খলিফার কাপড়ের দোকান,’ বলে সে সামনে এগোল, অন্যরা অনুসরণ করল তাকে। বাজার এলাকার কাছাকাছি এসে এক জায়গায় পানির উৎস থেকে সামান্য পরিচ্ছন্ন হয়ে নিয়ে নিজেদের চেহারা আর অস্ত্রগুলো কাপড়ে জড়িয়ে হালকা ছদ্মবেশের মতো নিয়ে নিল। তারপর দুজন-তিনজন করে দুই দলে ভাগ হয়ে ওরা প্রবেশ করল বাজার এলাকার ভেতরে। বাজারে প্রবেশ করে কর্নেল খানিক অবাক হয়ে গেল। সে ভেবেছিল শহরের এই উত্তপ্ত অবস্থায়, যখন মানুষের জান নিয়ে টানাটানি—এমন অবস্থায় বাজার এলাকা হয়তো ফাঁকাই থাকবে। কিন্তু রাতের আঁধারের মিরাত এলাকার বাজার আর দিশির বাজারের মধ্যে যে অনেক পার্থক্য থাকবে—সেটা কর্নেল পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেনি।

সিপাহী

বাজার এলাকা রীতিমতো সরগরম। হয়তো একেবারে স্বাভাবিক অবস্থার মতো উচ্ছল নয়, কিন্তু তাই বলে ভিড়েরও কমতি নেই। মানুষজন বাজার করছে খোলা দোকান থেকে, রাস্তার পাশের খাবারের দোকানে তৈরি হচ্ছে সকালের খাবার, মানুষজন ভিড় করে কিনছে, জিনিসপত্রের দামাদামি, হাঁকাহাঁকি কোনোকিছুরই কমতি নেই। ওরা বাজার এলাকার সামনে এগোতেই বাজারের ভেতর দিয়ে, একদল ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে। কর্নেল নিজের মাথার কাপড় আরো ভালোভাবে জড়িয়ে নিয়ে রাস্তার পাশে স্বাভাবিকভাবেই দাঁড়িয়ে রইল, এখানে স্বাভাবিক কিছু করলেই সমস্যা। কর্নেল রাস্তার অন্যপাশে থাকা তিনজনের বাকি দলটাকেও চোখের ইশারায় সাবধান থাকতে বলল।

ঘোড়সওয়ারের দলটা কোনো ঝামেলা ছাড়াই ওদের পার হয়ে চলে গেল বাজার এলাকার ভেতরের দিকে। রাও আবারো ওদের সামনে এগোনোর জন্য ইশারা করল। খোলা বাজার এলাকা পার হয়ে ওরা চলে এলো স্থায়ী বাজার এলাকার দিকে। এখানে খোলা বাজারের মতো দোকান নয়, বরং পাকা দোকান রয়েছে, বেশির ভাগ রাস্তার দুইদিক জুড়ে। রাও চোখের ইশারায় গলির মাঝামাঝি একটা দোকান দেখিয়ে বলে উঠল, 'ওইটাই,' কর্নেল ফিরে তাকিয়ে দেখল আসরে রাও না দেখালেও চলত, কারণ একমাত্র ওই দোকানটার সামনেই নানা ধরনের পোশাক ঝোলানো, আর সে-হিসেবে ওটাই খলিফা বা দর্জির দোকান হওয়ার কথা। রাও দোকানটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল কর্নেল। 'নাহ, আমরা এখুনি ঢুকব না দোকানে। সোলেমান তুমি পিটারকে নিয়ে পারলে দোকানটার আশপাশে চোং বুলিয়ে আসো, দেখো বিপজ্জক কিছু চোখে পড়ে কি না,' বলে সে ফিরে তাকাল রাওর দিকে। 'আমরা এখানে রাস্তার অন্যপাশে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব, যতক্ষণ ওরা ফিরে না আসে। এই সময়ের ভেতরে দোকানের সামনের অংশে নজরও রাখা যাবে,' বলে সে সোলেমানদের থেকে বিদেয় নিয়ে অন্যদেরসহ চলে এলো রাস্তার অন্যপাশে, এমনভাবে অপেক্ষা করতে লাগল যেন কারো আসার জন্য বসে আছে। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর সোলেমান আর পিটার পেছনের অংশ থেকে ফিরে এসে দর্জির দোকানের প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে ইশারায় জানাল স্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি।

কর্নেল অন্যদের নিয়ে দোকানে প্রবেশ করল। ভেতরে আর দশটা দর্জির দোকানের মতোই, তবে বেশ বড়, সেলাইয়ের কাজ করছে সারি সারি কর্মীরা। ওরা ভেতরে প্রবেশ করতেই পাছাবি পরা বয়স্ক একজন লোক এগিয়ে এসে জানতে চাইল ওদের কী প্রয়োজন, যদিও এগিয়ে আসার পরই রাওকে দেখে তার চোখ ছোট হয়ে গেল, কর্নেল দেখল রাও আর পাছাবি পরা লোকটার ভেতরে ইশারা বিনিময় হলো চোখে চোখে। রাও ওদের দোকানের সামনের অংশে অপেক্ষা করতে

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

বলে পাজ্জাবিওয়ালার সঙ্গে চলে গেল ভেতরে। কর্নেলের খুব ভালো অনুভূতি হচ্ছে না বিষয়টা নিয়ে, কিন্তু কিছু করার নেই, কারণ কিছুক্ষণে অন্য মানুষের সঙ্গে কাজ করতে গেলে, অন্যদের ওপরে ভরসা করতেই হবে, সবক্ষেত্রে নজরদারি সম্ভব নয়। 'তোমার এই রাগ ডোবাবে না তো আমাদের?' কর্নেল ফিস ফিস করে বললেও, আশপাশের সবাই তার ভাঙা ইংরেজি আর স্থানীয় ভাষা বুঝতে পারছে। কর্নেল দেখল দোকানের কর্মীরা চোখাচোখি করছে। কর্নেল ফিরে তাকিয়ে দেখল দোকানে স্থানীয় কাপড়ের সঙ্গে নানা ধরনের সুটও রয়েছে। তারমানে এখানে নিয়মিত ইংরেজ খরিদার আসে, কিন্তু এখন সম্ভবত পরিস্থিতির কারণে দোকানের ভেতরে ইংরেজ উপস্থিতি অত্যন্ত ভয়ংকর বিষয়। ত্রিলোকও আশপাশে তাকিয়ে দেখছিল, কর্নেলের প্রশ্ন শুনে সে মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'ওর এত সাহস হবে না, তবে একটা ব্যাপার তো জানেনই, বিশেষ অবস্থায় বিড়ালও বাঘ হয়ে যায়, আর সে তো সুযোগসন্ধানী একজন মানুষ। আর তাকে যথেষ্ট অর্থ দেওয়া হয়েছে। কাজেই—'

ত্রিলোক কথা শেষ করার আগেই দোকানের ভেতরের অংশ থেকে বেরিয়ে এলো সেই পাজ্জাবিওয়ালো, 'হজুর, আপনেনগো ভেতরে যাইতে বলছে,' কথাগুলো ওদের উদ্দেশ্যে বলে সে দোকানের কর্মচারীকে উদ্দেশ্য করে একটা শক্ত ধমক দিয়ে ওদের নিয়ে রওনা দিল ভেতরের দিকে। ত্রিলোক একবার কর্নেলের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভেতরে যাওয়ার ইশারা করল। সারি সারি কাপড়ের ছুপ বা প্রস্তুতকৃত কাপড়ের ঝোলানো সারির ভেতর দিয়ে ওরা ভেতরে এগোচ্ছে। কর্নেল অবাক হয়ে আবিষ্কার করল দোকানটা ভেতর থেকে যত ছোট মনে হয় আসলে তারচেয়ে অনেক বড়। পাজ্জাবিওয়ালো লোকটা ওদের নিয়ে ছোট গোল একটা কামরার মতো জায়গায় নিয়ে এলো। জায়গাটায় পৌঁছানোর পর কর্নেল উপলব্ধি করল, এটা আসলে কামরা নয়, কাপড়ের গুদামের একটা অংশ সরিয়ে মাঝে গোল জায়গা করা হয়েছে, আর সেখানে গদি বিছিয়ে, সেটার ওপরে একটা কাঠের ছোট চৌপায়া বসিয়ে পালকের কলম দিয়ে কাগজে কিছু হিসেব করছিল হ্যাংলা-পাতলা সাদা লুপ্তি আর সাদা পাজ্জাবি পরা এক লোক।

'আসেন, হজুরেরা,' বলে সে চোখ তুলে তাকাল ওদের দিকে, তারপর মৃদু হেসে বলে উঠল, 'হামজা খলিফার দোকানে আপনাদের স্বাগতম,' বলেই সে তার নিজের লোকটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'এই যা মহিষের দুধ নিয়ে আয়।'

আবারো কর্নেলদের দিকে তাকিয়ে সে মৃদু হেসে উঠল, 'হজুর, খলিফার দোকানে আপনারা নিরাপদ, মস্তকাবরণ সরাতে পারেন।' লোকটার কথায় নয়, কর্নেলের কাছে এই মাথা প্যাঁচিয়ে রাখা খুব বিরক্তিকর লাগছে। সে মাথার কাপড় সরিয়ে ধন্যবাদ জানাল সরু চতুর চেহারার লোকটাকে, তারপর একবার দেখে নিল

সিপাহী

তার পাশেই বসে থাকা রাত্তর দিকে।

‘হজুরেরা, কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি,’ সে তার হিসেবের খাতা বন্ধ করে কর্নেলের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে উঠল। ‘এই সময়ে আপনারও এই দিল্লি শহরে আইসা কিছু সাহসের পরিচয় দিছেন,’ বলে সে একবার রাত্তর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। ‘অনেক সময় বেশি সাহসের অপর নাম কিছু বোকামি।’

‘তুমিও তো দোকান বন্ধ করোনি, তাহলে কি তুমিও একই কাতারে পড়ো নাকি?’ কর্নেল ঙ্গ কুঁচকে বলে উঠল। সে ভাবল লোকটা তার কথার ত্যাড়া উত্তর দেবে, কিন্তু সে হেসে উঠল। ‘আপনার নাম আমি জানি হজুর, আপনার সাহসের গল্পও, আর ত্রিলোক তো কাছের মানুষ,’ সে বলতেই ছোট ছোট কাসার ঘটতে করে সেই পান্নাবিওয়ালা দুধ রেখে গেল ওদের সামনে। কর্নেল একটা ঘট তুলে চুমুক দিল। দুধ সত্যিই বেশ ঘন এবং সুস্বাদু। ‘বেশ ভালো দুধ।’

‘জি হজুর, একেবারে খাঁটি,’ বলে সে অন্যদেরকেও নেয়ার ইশারা করে জানতে চাইল, ‘বলেন হজুর কি খেদমত করতে পারি আপনাদের?’

‘ভিক্টর,’ কর্নেল দুধের ঘট নামিয়ে রেখে বলে উঠল। ‘তুমি ভিক্টর কানিংহামকে চেন?’

কর্নেলের প্রশ্নের জবাবে আবারো হেসে উঠল খলিফা, ‘তারে কে না চেনে হজুর। বিশেষ কইরা অগ্নাগারের ঘটনার পরে।’

‘তাকে ঝুঁজতেছি আমরা,’ কর্নেল ছির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে লোকটার চোখের দিকে। কেন জানি লোকটার দৃষ্টি ভালো লাগছে না তার কাছে।

‘তারে তো সবারই দরকার,’ আবারো মৃদু হেসে বলে উঠল সে।

‘সেটা তো প্রশ্ন নয়,’ এবার ত্রিলোক বলে উঠল। ‘প্রশ্ন হলো তাকে পাওয়া যাবে কীভাবে, ঝুঁজে বের করা যাবে কীভাবে?’

বড় করে একবার দম নিল খলিফা, ‘হজুর, আমি অইজ খলিফার কাজ করি প্রায় চল্লিশ বছরের ওপরে। আমি দশ বছর বয়সে আমার চাচার লগে এই দোকানে কাম শুরু করছিলাম, আজ দিল্লি শহরে আমার এরকম তিনটা দোকান আছে। কিন্তু এইটা আমার মূল পেশা না, আপনেও জানেন আমিও জানি,’ খলিফা তাকিয়ে রয়েছে কর্নেলের চোখের দিকে। ‘আমি ইংরেজ স্যারেরা, তাগো অনেক স্বজাতির চাইতেই বেশি ভালোভাবে জানি। আমার প্রশ্ন আপনার কাছে, তারে আপনার কেন প্রয়োজন?’

কর্নেলও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে খলিফার চোখের দিকে। ‘সেটা জানার কোনো প্রয়োজন নেই তোমার। তুমি বলো জানো কি না, তাকে কোথায় পাওয়া যাবে,’ দুজনের দৃষ্টির লড়াই এখনো বিদ্যমান। খলিফা কর্নেলের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। ‘হজুর, আমি তো আপনাকে বলছি, এই জীবনে অনেক ইংরেজের চেয়েও

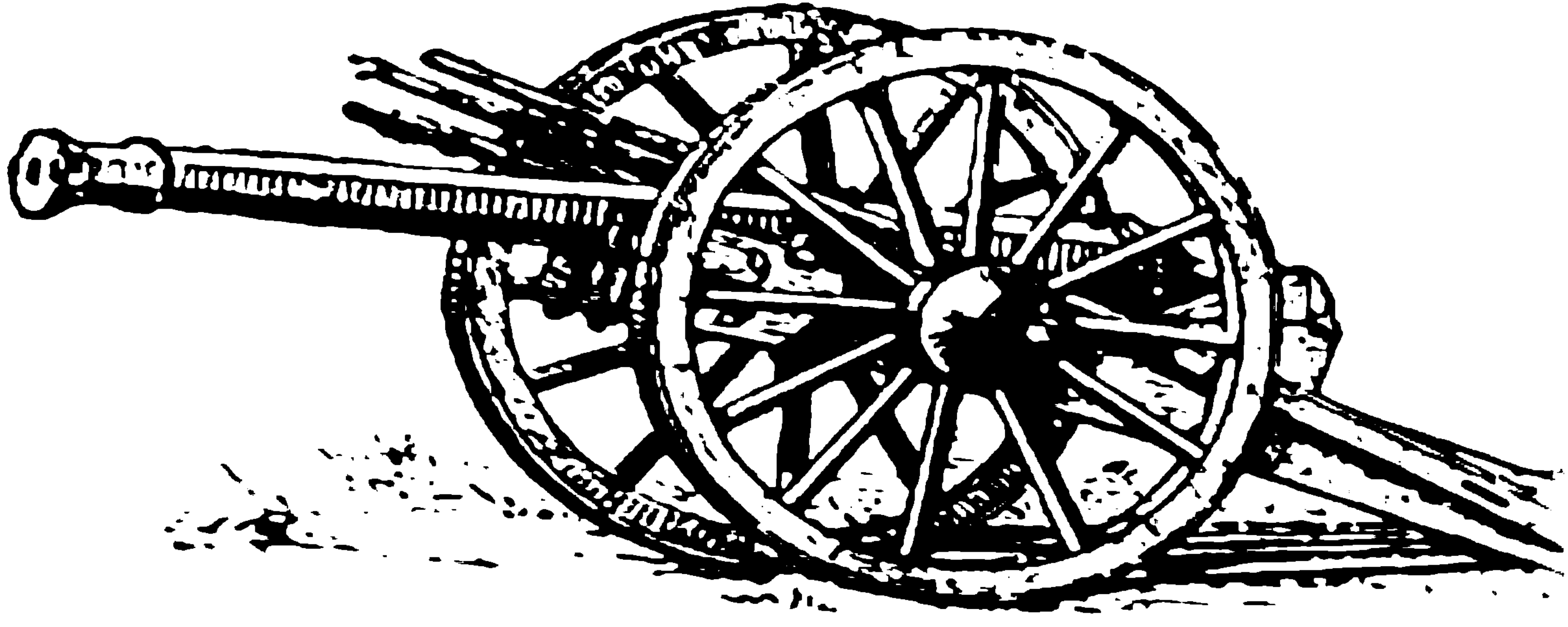
দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

বেশি ইংরেজগো লগে মিশছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি আপনার বন্ধু ভিক্টরের মতো মানুষ আমি এর আগে দেখি নাই,’ কর্নেল খলিফার কথা শুনে সামান্য ভাবছে। এই লোককে সে বলেনি যে ভিক্টর তার বন্ধু, কিন্তু এই লোক আগেই সেটা জানত, কীভাবে সম্ভব বিষয়টা। কর্নেল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই খলিফা আবারো বলে উঠল, ‘হজুর, আপনার বন্ধু ভিক্টর এমন একজন মানুষ যে নিজেকে খেইকা না চাইলে আপনে আসলে তারে খুইজা বের করতে পারবেন না। এইটা ইংরেজ সরকার বাহাদুর এবং কোম্পানিও জানে, আর এই কারণেই তারা আপনাকে ডাইকা আনছে।’

‘আর যেহেতু তারা আমাকে ডেকে এনেছে, কাজেই আমি তাকে খুইজে বের করবই। প্রশ্ন হলো তুমি আমাদের সাহায্য করবে কি করবে না?’ বলে কর্নেল নিজের কোমর থেকে একটা ছোট খলে বের করে এগিয়ে দিল তার দিকে। ‘এর ভেতরে এক শ স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে, আর তুমি জানো এই বাজারে সব মুদ্রা যখন পড়তির দিকে, তখন স্বর্ণমুদ্রার কত দাম!’

খলিফা চকচকে চোখে তাকিয়ে রয়েছে খলেটার দিকে, তারপর হঠাৎই তার দৃষ্টি স্তান হয়ে গেল।

‘দুঃখিত হজুর,’ খালি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। ‘টাকার লোভ আমার অনেক, কিন্তু আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না,’ বলে সে খলেটা ঠেলে দিল কর্নেলের দিকে।



অধ্যায় তেতাল্লিশ বর্তমান সময় পুলিশলাইন জেলখানা, ময়মনসিংহ

‘আমি একটা জিনিস ভাবার চেষ্টা করছি বাশার,’ জয়া সরকার তার ধরানো দ্বিতীয় সিগারেটের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে বাশারের দিকে। ‘তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো, আমাকে সুবিধা দিতে চাইছো,’ জয়া সরকারের দৃষ্টি সরু হয়ে রয়েছে। ‘বিষয়টা তোমার জন্য কতটা কঠিন হতে পারে। তুমি ঠিক কতটা ভেসপারেট হলে এরকম একটা কাজ করতে পারো।’

‘আমাকে নিয়ে তোমার ভাবার প্রয়োজন কি?’ বাশার একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিল সামিরার দিকে। সামিরা ঠোটে একটা সিগারেট ধরিয়ে জয়ার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘আপনি আপনার সুবিধার কথা চিন্তা করেন,’ বলে সে সিগারেটে আগুন দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলতে লাগল। ‘অনেকটলি আপনাকে দেখে তো মনে হয় না, আপনি অন্য কারো ব্যাপারে চিন্তা করার মতো মানুষ।’

‘বাহ বাহ,’ সামিরাকে সিগারেট ধরাতে দেখে এবং কট কট করে কথা বলতে দেখে জয়া সরকার মাথা নেড়ে বলে উঠল। ‘ছেমরি দেহি পুরা আমার প্রতিফলন, বালি দেখতে একটু ভালো আরকি। শোন ছেমরি, তোমারে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, বাশারকে তুমি যা চিনো আমি তারচেয়ে অনেক বেশি চিনি। আর এইখানে কী ঘটতাকে সেটাও তোমার চেয়ে বেশি জানি।’

‘তাহলে নিজের সুবিধার দিকে ফোকাস করেন দেখি—’ সামিরা ছির ভঙ্গিতে বলে ওঠাতে বাশার খুশি হলো। মেয়েটা আগের মতো আর রেগে যাচ্ছে না জয়ার ওপরে, এটা একটা ভালো দিক। এই দুই পাগল সামলে নিয়েই কাজ করতে হবে ওকে, কাজেই এদের সামলানোর স্ট্র্যাটেজি যত ভালো বুঝতে পারে ততই ভালো হবে ওর জন্য।

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

‘শোন জয়া, আমার ওপরে তোমার অনেক ব্যক্তিগত আক্রোশ রয়েছে, আমি জানি,’ বাশার মাথা নেড়ে বলে উঠল। ‘কিন্তু তোমার ওপরে আমার কোনো ক্ষোভ-আক্রোশ কিছুই নেই। কারণ আমি জানি আমি করেছি সেটা ছিল আমার ডিউটি, তুমি যদি একটা ঠান্ডা মাথায় ভাবো তাহলে তুমিও বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারবে। আর রিফাতের কথা যদি বলি তবে ওই বেচারির সঙ্গেই তুমি এবং তোমরা সবচেয়ে বেশি অন্যায় করেছো,’ বলে বাশার ইচ্ছে করেই থামল। ‘কাজেই যদি ন্যূনতম মানবতা থেকে থাকে, এবং সত্যিকার অর্থেই নিজের ভালো চাও তাহলে আমাকে হেল্প করো,’ বাশার আবার ফিরে তাকাল জয়া সরকারের চোখের দিকে। ‘আমাকে হেল্প করো, কথা দিচ্ছি, আমি তোমাকে কিছু হলেও সুবিধা আদায় করে দেব।’

জয়া সরকার বুক ভরে দম নিল, তারপর ধোঁয়া আর নিঃশ্বাস একসঙ্গে ছাড়তে ছাড়তে সে বলে উঠল, ‘তুমি তো আমার ব্যাকখাউন্ড জানো,’ সেও তাকিয়ে রয়েছে বাশারের দিকে, একেবারে সরাসরি তার চোখের দিকে। ‘আমি কে এবং আমি কি, সম্ভবত আমার নিজের পরে তুমি সবচেয়ে ভালো জান,’ বাশার খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছে জয়া সরকার কী মিন করছে। সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, জয়া সরকার তাকে ইশারায় থামিয়ে দিল। ‘আমি শেষ করি প্লিজ,’ সে আবারো টান দিল সিগারেটে। ‘আরো একটা বড় বিষয় হলো, আমার আবেগ ইত্যাদি মারা গেছে অনেক আগেই। কিন্তু তোমাদের ওই ফাকিং কেসে আমি ইমোশনালি জড়িয়ে গিয়েছিলাম তোমাদের সঙ্গে। আর সেটার জন্যই মারাটা খেয়েছি। একই ঝুঁকি আমি আর নিতে পারব না বাশার। সরি, সাহায্য করতে পারলে ভালো লাগত কিন্তু আমি পারব না। ওড লাক।,’ বলে উঠে দাঁড়াল জয়া সরকার। বাশার এবং সামিরা দুজনার দিকে ফিরে তাকিয়ে বিদেয় নেয়ার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে সে ঘুরে দাঁড়াল।

বাশার দ্রুত ভাবছে, জয়া সরকার ক্লক একজন মানুষ হতে পারে, সে অপরাধী হতে পারে কিন্তু তার ভেতরে রাজ রক্ত রয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা সে একজন ভালো সাংবাদিক। বিশেষ করে পুরনো আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে সে দারুণ কিছু ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের কাজ করেছে। কাজেই এই গোলক ধাঁধা কেসে তার হেল্প লাগবেই। ‘সিগনেট রিং,’ বাশার শব্দটা উচ্চারণ করতেই থেমে গেল জয়া সরকার। ‘দ্য সার্পেন্টস এনিগমা, এই বিষয়ে কী জানো তুমি?’

জয়া সরকার হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ‘এই রিং নিয়ে তুমি কৌতূহলী কেন?’ ভ্রু কুঁচকে বলে উঠল জয়া সরকার। ‘আর আমার কাছেই বা জানতে চাচ্ছে কেন তুমি?’

বাশার মনে মনে হেসে উঠল, সে যা ভাবছে কাজ হতে চলেছে। ‘রিফাতের কেসের সঙ্গে এই রিংয়ের সংযোগ রয়েছে।’

সিপাহী

‘অসম্ভব!’ জয়া সরকার তার জায়গা থেকে প্রায় চিৎকার করে উঠল। ‘হতেই পারে না। এটা স্রেফ একটা মিথ, বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। আর এরকম একটা হাই প্রফাইল সিরিয়াস কেসে এসব আজগুবি গল্পের কোনো জায়গা থাকতেই পারে না।’

বাশার উঠে দাঁড়াল। ‘আমি যদি বলি বাংলা ভাষা তো বটেই এই বিষয় নিয়েই প্রায় তেমন কোনো লেখা নেই। একমাত্র তুমি এই বিষয় নিয়ে লিখেছো, তাও খুব বেশি না। একটা সিরিজ লেখার একটা অংশে এসেছে তোমার এই বিষয় নিয়ে। পুরো ব্যাপারটাই একটা মিথ এবং বলা যায় সবচেয়ে সিক্রেটিভ মিথগুলোর একটা। এর মানে তুমি এ-নিয়ে অবশ্যই কিছু না কিছু জানো।’

‘এরকম বহু মিথ আছে দুনিয়ায়, তাতে কী হয়েছে—’

‘মিথ তো টুইন কালীরও ছিল,’ বাশার ছিন্ন ভঙ্গিতে বলে উঠল। ‘যে পর্যন্ত আমরা সেটা আবিষ্কার করে প্রমাণ না করলাম যে, ওটা আসলে আদৌ কোনো মিথ নয়। একই ঘটনা সিলেটে ঘটেছে, আমি কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি থেকে কী আবিষ্কার করেছি তোমার কোনো আইডিয়া নেই। কাজেই তুমি হয়তো এই লাইনের লোক, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় আমি যা দেখছি, তাতে এটা পরিষ্কার যে মিথ শুধুই মিথ নয়, এর সঙ্গে অনেক বাস্তবতাও জড়িয়ে রয়েছে। আর রিফাতের কেসে এই সিগনেট রিংয়ের গুরুত্ব অপরিসীম এবং এর একমাত্র লিড দেখতে পাচ্ছি আমি তোমাকে।’

‘বাশার,’ জয়া সরকার বাশারের দিকে এক পা এগিয়ে এলো। ‘তুমি বুঝতে পারছো না, ওই আর্টিকলে যা লেখা হয়েছে ওগুলো স্রেফ গালগল্প, এসব জিনিসের বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই। কাজেই তুমি যদি আশা করো, আমি তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে, এসব গালগল্পের পেছনে ছুটব, দেন ইউ আর ফাকিং রং,’ জয়া সরকারের গলা রীতিমতো চিৎকারে পরিণত হয়েছে শেষ দিকে এসে।

বাশার হেসে উঠল। ‘আর যদি আমি বলি তোর ওই সিগনেট রিং,’ বলে ও সামিরার দিকে ফিরে তাকাল। ‘কি জানি নাম সার্পেন্টস এনিগমা, ভাইরে ভাই কি নাম,’ বলে ও ফিরে তাকাল আবার জয়ার দিকে। ‘তোমার ওই রিং বর্তমানে আমার কাছে রয়েছে,’ বলে ও পকেট থেকে স্বচ্ছ এভিডেন্স ব্যাগের ভেতরে রাখা ভারী রিংটা দেখাল।

‘অসম্ভব,’ জয়া সরকার আরো একধাপ এগিয়ে এসেছে বাশারের দিকে। ‘ফেইক, অবশ্যই ফেইক, আসল হতেই পারে না,’ জয়া সরকার এখনো চিৎকার করছে।

‘সেটা তোমার জানার দরকার নেই,’ জয়া যত চিৎকার করছে বাশার তত শান্ত গলায় কথা বলছে। ‘তুমি তো এই কেসে কাজই করতে আগ্রহী নও,’ ও সামিরা দিকে ফিরে আবারো মৃদু হাসি দিল।

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

‘বাশার,’ জয়ার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বাশার তারে কনভিন্স করার জন্য নয়, বরং সে বাশারকে কনভিন্স করার চেষ্টা করছে। ‘তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না। তোমার হাতে যেটা রয়েছে, সেটা সিগনেট রিং হতেই পারে না। সিগনেট রিং স্রেফ একটা মিথ ছাড়া আর কিছুই নয়।’

‘দেখো জয়া, এই রিং সিগনেট না অন্যকিছু আমার জানার প্রয়োজন নেই। এই রিং আসল না নকল আমার জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমি স্রেফ জানতে চাই রিফাত অপহরণের সঙ্গে এই রিংয়ের সম্পর্ক কি। দ্যাটস, ইট আর তুমি এটা করতে আমাকে সাহায্য করবে কি না বলো?’

জয়া সরকার চুপ হয়ে আছে। ‘বাশার তোমার কোনো আইডিয়া নেই, ওটা যদি তোমার হাতে সত্যি থেকে থাকে তবে ওটা কত বড় একটা ব্যাপার, রিফাত মজুমদার, তুমি-আমি আমাদের যেকারো চেয়ে ওটার গুরুত্ব অনেক বেশি।’

‘আমার কাছে নয়, বাশার মাথা নেড়ে বলল। ‘আমার কাছে এটা স্রেফ একটা এভিডেন্স, একটা পসিবল ক্লু যেটা ব্যবহার করে আমি রিফাতকে ফিরিয়ে আনতে পারব,’ বলে ও ফ্র নাচাল। ‘আর ইউ ইন অর আউট?’

‘আমাকে বেইল দিতে হবে, প্রায় কোনো শর্তবিহীন,’ বলে জয়া ভাবতে লাগল। ‘আমার কেসগুলো বাতিল করে দিতে হবে।’

‘সব না, তবে শিথিল হবে,’ বাশার সংশোধন করে দিল। ‘বিশেষ সহায়তার বলে।’

‘যতদিন কেস চলে আমার থাকা-খাওয়া, আনলিমিটেড সিগারেট—’

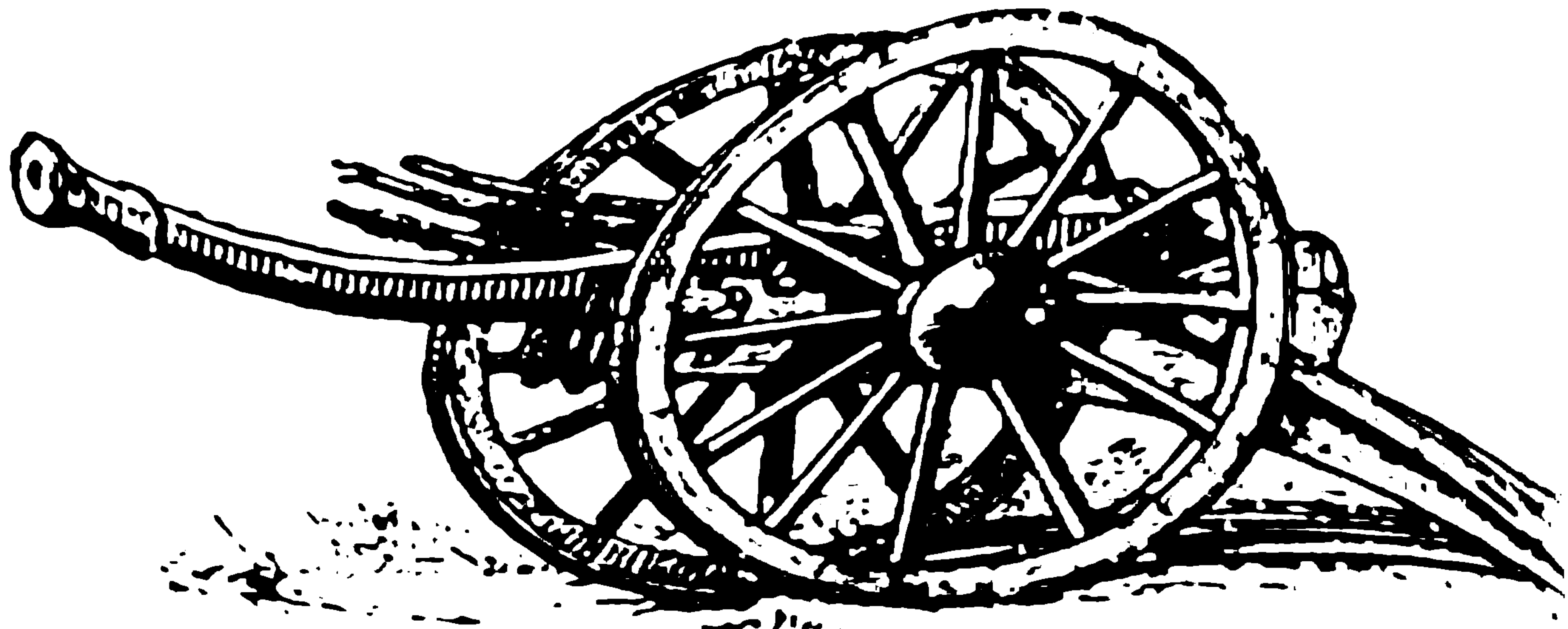
‘তুধু তাই না, তোমাকে স্যালারি দেওয়া হবে—’

‘আমাকে র‍্যাংক দিতে হবে।’

‘এটা মনে হয় পসিবল হবে না। তবে আমি চেষ্টা করব,’ বলে ও হাত বাড়িয়ে দিল। ‘ডিল?’

‘ডিল, এবার বলো তুমি এটা কোথায় পেলো কীভাবে পেলো এরপর আমি কলতে শুরু করব আমি কী জানি।’

‘এখানে নয়,’ আমরা তোমাকে নিয়ে নতুন বাজারে ল্যাভে যাব, সেখানে তোমাকে সব রিপোর্ট দেওয়া হবে এবং সেখান থেকে তুমি আমার টিমের মেম্বর হিসেবে কাজ শুরু করবে,’ বলে বাশার থামল, তারপর বলে উঠল, ‘ওয়েলকাম টু দ্য টিম জয়া সরকার।’



অধ্যায় চুয়াল্লিশ

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
দিল্লি, উত্তর ভারত

খলিফার চোখের দিকে তাকিয়ে কর্নেল আর কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়াল, তারপর সামান্য মাথা নেড়ে বলে উঠল। ‘আপনার আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ, বলে ও ত্রিলোকের দিকে ইশারা করল স্বর্ণমুদ্রার পোটলাটা তুলে নেওয়ার জন্য। ত্রিলোক ওটা তুলে নিচ্ছে কর্নেল অন্যদের দিকে ফিরে ইশারা করল ওঠার জন্য। তারপর আবারো ফিরে তাকাল খলিফার দিকে। ‘আপনার কাছে কিছু জানতে পারলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু আমরা একটা না একটা উপায় বের করেই নেব। ধন্যবাদ।’

কর্নেল ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল খলিফা কথা বলে উঠল। ‘পোটলাটা রাখুন, আমি অস্বীকার করব না যে আমি কিছু জানি। তবে সেটা আপনাদের কাজে লাগবে কি না সেটা আমার জানা নেই। আর ওই সামান্য তথ্যের বিনিময়ে আপনারা আদৌ তথ্যবিনিময় করবেন কি না সেটাও আমার জানা নেই।’

কর্নেল ত্রিলোকের দিকে ইশারা করতেই সে থেমে গেল। কর্নেল ইচ্ছে করেই কাজটা করেছে খলিফাকে লোভ লাগানোর জন্য। ‘আপনি তথ্য বলুন, ওই অর্থ আপনার জন্যই এনেছি, মনে করুন ওটা আমার তরফ থেকে আপনাকে উপহার।’

খলিফা বড় করে একবার দম নিল। ‘প্রথমে একটা ওয়াদা চাই। আপনাদের আমি যা জানাব সেটা যেন কোনোভাবেই কেউ জানতে না পারে, কে সেটাও বলি। আপনারা তো জানেন আমি সবার সঙ্গেই কাম করি। ভারতীয়, ইংরেজ, এইটা এমন একটা বিষয় যেইটা নিয়া কথা বলতে গেলে বা জানাজানি হইলে এখন দুই দলেরই সমস্যা।’

‘আমি কিংবা আমরা, আমাদের কথা শুনে কি মনে হয় আমরা গল্প করার জন্য দিল্লিতে আসছি?’ এই প্রথমবারের মতো আলোচনার মাঝখানে কথা বলে উঠল

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

শালোয়ান। তার ভারী গলা, বিশাল আকৃতি এবং বলার ধরনে হঠাৎ কেমন জ্ঞানি ঘাবড়ে গেল খলিফা। 'না আমি সেইটা বলি নাই।'

'তথ্যটা কি খলিফা?' কর্নেল জ্ঞানতে চাইল। হঠাৎ তার তামাকের পিপাসা পেয়েছে।

'আমার দিল্লির ওপরের স্তরের লোকজনের সঙ্গে যেমন নানা ধরনের বাণিজ্য বিনিময় রয়েছে, ঠিক তেমনি কর্ম বিনিময় রয়েছে সমাজের নিচু স্তরের লোকজনের দিকে। ফলে আমি আমার ওপরের স্তরের খবর নিচের স্তরে পৌছাই কখনো কখনো, আবার নিচের স্তরের খবর ওপরের স্তরে পৌছাই প্রয়োজন মতে।'

'আর এই মধ্যমা বিবেচক হিসেবে তুমি হয় তোমার নিজের পাওনা অথবা তোমার সুবিধা তুমি বুঝে নেও, ঠিক কি না?' ত্রিলোক বাঁকাভাবে বলে উঠল।

'হি, হজুর,' বলে সামান্য হেসে উঠল খলিফা। 'আপনারা ঠিকই বলেছেন।'

'প্রশ্ন হলো তুমি তোমার ব্যবসায়িক গোমরের গল্প কেন করছো আমাদের সঙ্গে। এমনকি আমরা যেখানে তোমার কাছে জানতেও চাইনি,' কর্নেল সামান্য ঘাড় বাঁকিয়ে নিজের চোখা গোঁফে তা দিল। 'যেখানে কোনো ব্যবসায়ীই তার গোপন কথা ফাঁস করতে চায় না। সেখানে তুমি ইচ্ছে করে তোমার ব্যবসায়িক রহস্য ফাঁস করছো, কারণটা কি?'

'কারণ তো অবশ্যই রয়েছে হজুর,' খলিফাকে এবার বেশ সিরিয়াস দেখাচ্ছে। 'প্রথম কারণ হলো, এর সঙ্গে আপনাদের ভিক্টর হজুরের কিছু বিষয় জড়িয়ে আছে,' বলে খলিফা উঠে দাঁড়াল। 'আপনেরা আমার সঙ্গে আসেন,' বলে সে গোলমতো জায়গাটার পেছন দিকে একটা ঘরের মতো দেখতে জায়গার দরজা খুলে মেলে ধরল।

ত্রিলোক একবার কর্নেলের দিকে দেখাল, তারপর কর্নেল মাথা নেড়ে সায় জ্ঞানাতেই অন্যদের নিয়ে এগোনোর ইশারা করল। খলিফা ওদের নিয়ে ভেতরের আরো বড় একটা কামরায় চলে এলো। 'হজুর, আমার এইখানে বিলাত থেইকা শুরু কইরা হিন্দুস্থানের বহুত জায়গা থেইকা কাপড় আসে,' বলে সে মেলে ধরে রাখা কাপড়ের সংগ্রহ দেখাল। ওরা চারপাশে তাকিয়ে দেখল সত্যি সত্যি নানা ধরনের স্যুটের কাপড় থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনীর উর্দি এমনকি নানা ধরনের রেশমি কাপড় আর মসলিনও মজুদ রয়েছে এখানে।'

'ভালো ব্যবসা কিন্তু আমরা জেনে কী করব?'

খলিফা তার কাপড়ের কালেকশন থেকে ফিরে তাকাল ওদের দিকে। 'আমার দোকানে একদিন এক ফকির আসে,' কর্নেলের ঙ্গ কুঁচকে উঠছে দেখে খলিফা একটা হাত তুলল। 'এই ফকির সেই ফকির না যারা ডিস্কা কইরা খায়,' বলেই সে নিজেকে শুধরে নিল। 'মানে এরাও ডিস্কা কইরা খায় কিন্তু ঠিক সেই ফকির না—'

সিপাহী

‘ফকির দরবেশ—’ এই প্রথমবারের মতো সোলেমান কথা বলল দোকানে প্রবেশ করার পর।

‘জি, হুজুর ঠিক বলছেন,’ বলে সে ভ্রু কুঁচকে সোলেমানকে দেখল, কথার তালে একে হুজুর বলে ফেলেছে দেখে নিজেকে মনে মনে অভিশাপ দিল সে। ‘তো অনেক ফকির-দরবেশেরে আমি চিনি। এদের অনেকেরই মারাত্মক এলুম আছে আমি জানি। কাজেই এগুলো আমি সবসময় সম্মান করি। তো এই ফকির আসার পরেও আমি খাওয়া পানি দিলাম কিন্তু সে ঠিক খাইল না। তার হাবভাবে বুঝলাম সে আসলে কামে আসছে। সে আমারে একটা বিশেষ কাপড় দেখাইল, এইটা আছে কি না আমার কাছে জানতে চাইল। আমি খুবই অবাক হয়ে গেলাম, কারণ এই ধরনের কাপড় একটা নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহার করা হয়, কাজটা কি আমি জানি না, তবে এটা জানি এই ধরনের কাজের সঙ্গে এরকম ফকিরদের কোনো সংযোগ নেই, থাকার কোনো কারণ নেই। কারণ এ-ধরনের ফকিরেরা কীভাবে এবং কী ধরনের জীবনযাপন করে আমার মোটামুটি ধারণা আছে। কাজেই আমি তাকে জানালাম আমি কাপড়ের ব্যবস্থা করব এবং তার আরো কিছু লাগবে কি না। সে আমাকে খুব অবাক করে দিয়ে একেবারে অন্য কিছু লাগবে না জানিয়ে চলে গেল। এই ব্যাপারটা এরকম ফকিরদের জন্য বিরল।

কারণ এরা মানুষের কাছ থেকে খেয়েই অভ্যস্ত এবং এদের যেকোনো কিছু দেওয়ার ইচ্ছে পোষণ করলে এরা না তো করেই না উলটো আরো বেশি আদায় করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই ফকির একেবারেই ভিন্ন। যাই হোক ফকির আবার সাতদিন পর আসবে বলে বিদেয় নিল এবং আমি আমার কাজ শুরু করলাম। দুইদিকে লোক লাগিয়ে একেবারেই দুই ধরনের খবর পেলাম। প্রথমত, এই ফকির কোনো সাধারণ ফকির নয়, এরা একটা বিশেষ গোত্রের লোক, অন্যদিকে, যে কাপড় সে নেয়ার ইচ্ছে পোষণ করেছে সেটাও একটা বিশেষ কাজে ব্যবহার করা হয়,’ বলে খলিফা ধেমেল গেল। সে তার নানা ধরনের কাপড়ের সংগ্রহ থেকে এক টুকরো হলদে ধরনের কাপড় টেনে বের করল। ওটাকে চোখের সামনে তুলে ধরে সে কর্নেলের হাতে দিল।

কর্নেল হাতে নিয়ে দেখল কাপড়টা বেশ সূক্ষ্ম এবং অনেকটা রেশমি ধাঁচের। আবার ঠিক রেশমি কাপড়ের মতো মোলায়েম হলেও কর্নেলের মনে হলো এটা শোষণ ক্ষমতা বেশ ভালো হবে। কর্নেলের কাছে কাপড়টা চেনা মনে হলেও ঠিক চিনতে পারল না। কর্নেলের অভিব্যক্তি দেখে হেসে উঠল খলিফা। ‘চেনা মনে হচ্ছে অথচ চিনতে পারছেন না, তাই না? এই কাপড় আমরা অনেকেই ব্যবহার করেছি, বিশেষ কাজে। মানে ঠিক আমরা ব্যবহার করিনি, আমাদের ওপরে ব্যবহার করা হয়েছে, চিকিৎসার প্রয়োজনে।’

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

কর্নেল কাপড়টার দ্রাণ নিল একবার।

সাতদিন পর সেই ফকির ফিরে এসে কাপড় দেখে খুশি হয়ে উঠল। আমি জানতে চাইলাম তার কতটুকু প্রয়োজন, যে পরিমাণ সে বলল, আমি খুবই অবাক হলাম এবং ভেতরে ভেতরে কৌতূহলে মরে গেলেও মুখ খুললাম না। কারণ আমি জানতাম একে হাজারবার জিজ্ঞেস করলেও বলবে না। কাজেই আমি সেই পছায় গেলামই না। আরো অদ্ভুত এক ব্যাপার ছিল এই সন্ন্যাসীর ভেতরে—

‘তুমি একবার তাকে ফকির বলছো, আবার তাকে সন্ন্যাসী বলছো, কারণটা কি?’ ত্রিলোকের প্রশ্নটা কর্নেল পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও এই আলোচনায় এটার ওকতু রয়েছে এটা বুঝতে পারছে সে। তাই কিছু না বলে চুপ হয়ে রইল।

‘হজুর, এইটাই এই ফকির বা সন্ন্যাসী যাই বলেন কেন এর মূল বিষয়। আমি তো ময়দানে আছি আইজ্ঞ নতুন না, বহুবছর। আগেই বলছি সমাজের সব স্তরেই আমার লোক আছে। সব স্তরেই আমার ওঠাবসা আছে। এই কারণেই আমি বহু ফকির-সন্ন্যাসীদেরও চিনি। সবারই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো দেখলে এগোরে চেনা যায়। কিন্তু এই লোক বাহ্যিকভাবে ওগোর মতো দেখাইলেও এর কাজ-কর্ম ইত্যাদি একেবারেই আলাদা।’

‘কেমন?’ এবার কর্নেল জানতে চাইল।

‘যেমন হজুর প্রথমেই বলি, এরা বেশির ভাগই নোংরা থাকে, অঘোরী কন আর নাগা—এরা সবাই নোংরা থাকব খালি গা থাকব, কিন্তু কাম করব, নিজেগোরে সবার খেইকা আলাদা প্রমাণ করার চেষ্টা করব। অবশ্যই সবাই একে-অপরের খেইকা আলাদা, তাও সেইটা এরা জাহির করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই লোক লম্বা চুল-দাড়ি গোফের অইলেও একেবারেই পরিষ্কার। এরপরে এরা কথা বেশি বলে, আজব কথা বলে মানুষের চমকাইয়া দেওয়ার বা ভয় দেখানোর চেষ্টা করব, কিন্তু এই লোক সেইটাও করে না—’

‘আচ্ছা বুঝেছি, পরে বলো।’

‘যাই হোক, আমি এই লোকের হাবভাব দেইখাই বুঝছি, এই লোক কথা বলবে না। আমি চাপাচাপিও করলাম না। আদর-আপ্যায়ন করলাম, সন্ধ্যা হইলে সিদ্ধি খাইতে দিলাম। সিদ্ধি খাইয়াও সে চুপ, তবে আগের চেয়ে কিছু কথা বলতাকে। তেমন কিছু জানতে পারলাম না। শুধু জানতে পারলাম, এই কাপড় চাইছে এক ইংরেজ,’ বলে খলিফা ফিরে তাকাল। ‘হজুর গোল্ডাখি নিয়েন না, জীবনে বহুত আজব-গজব কথা শুনছি, কাম করছি কিন্তু ফকির-সন্ন্যাসীগো লগে ইংরেজগো খাতির আছে, এমন শুনি নাই। এমনকি ইংরেজগো ঠগি দলেও যোগ দিতে শুনছি কিন্তু ফকিরগো লগে খাতির করতে শুনি নাই। বিশেষ কইরা ভারতে প্রথম ইংরেজগো লগে বিদ্রোহ করছিল হেরাই। কাজেই হেগো লগে হজুরগেম,’

সিপাহী

বলে সে আবার থেকে এক ঢোক পানি খেয়ে নিয়ে বলতে লাগল। 'আমি বুঝলাম ঘটনা ছোট কিছু না। বড় ব্যাপার, এইটাও জানতাম যে হেরে জিগাইলে কিছু কইবো না। কাজেই আমি হের ফরমাশ নিলাম এবং জানতাম একটাই উপায় আছে ভেতরের কিছু জানার। যেদিন কাপড়ের ফরমাশ পাঠানির কথা সেই দিন সুযোগটা নিলাম। আমি ভাবছিলাম ফকির বাবা টাহা দেবে না, এরা কখনোই দেয় না। কিন্তু এই লোক এইখানেও ভুল প্রমাণ করল আমগোরে। সে টাকা নিয়া আইসা হজির। আরো লোকও আনছে মাল নিয়া যাওয়ার জন্য। আমি এই সুযোগে মাল পৌছাই দেওয়ার জন্য হেগো লগে আমার এক লোক ভিড়াই দিলাম। এইবার ঘটল আরো আজব ঘটনা।'

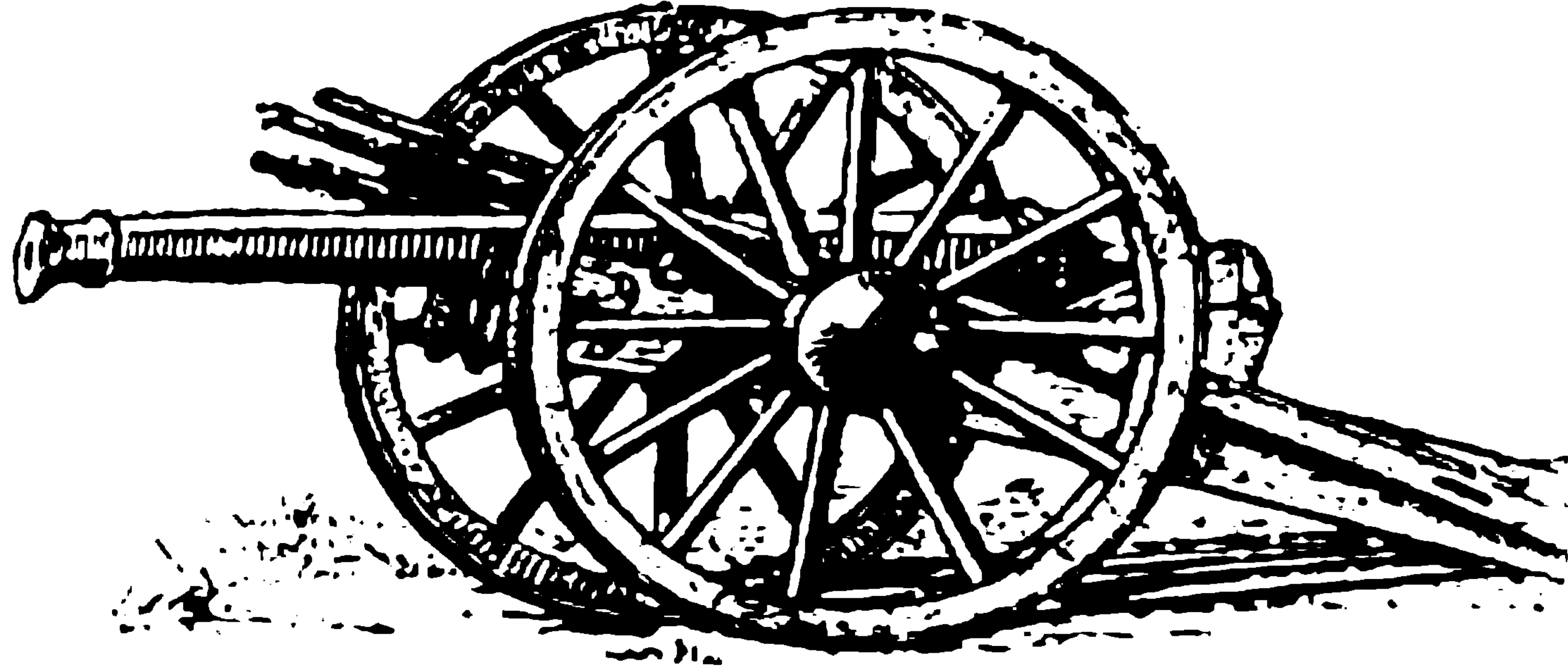
সবাই চুপচাপ তাকিয়ে রয়েছে, তার দিকে। 'হেরা মাল নিয়া গেল দিল্লির মূল ব্যাংকসংলগ্ন এক বাড়িতে।'

এই পর্যন্ত বলতেই পিটার নড়েচড়ে উঠল। 'ব্যাংকে, যেইটারে পরে বিদ্রোহীরা লুট করছে,' পিটারের প্রশ্ন শুনে খলিফা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। পিটার ঝট করে ফিরে তাকাল কর্নেলের দিকে, 'এই ব্যাংক প্রাক্কণ খেইকাই সে পলাইছিল। এইখানেই তারে দিল্লিতে শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল। শুনে কর্নেলের ড় কুঁচকে উঠল। 'এরমানে ভিক্টরের সঙ্গে ওই জায়গার গভীর কোনো সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের—'

কর্নেল তার বক্তব্য শেষ করতে পারল না। ধূপখাপ শব্দ করে কেউ একজন দৌড়ে এসে চুকল ওদামের মতো জায়গাটাতে। সেই পাঞ্জাবি পরা কর্মচারী। 'হজুর, জরুরি কথা আছে, গোপন ফরমান আসছে।'

ত্রিলোকের মনে হলো খলিফা লোকটা বিরক্তই হয়েছে তার কর্মচারীর এই ব্যবহারে। একে তো জরুরি আলোচনার মধ্যে সে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছে, তার ওপরে সে সবার মাঝে আড়ালে কথা বলতে চাইছে খলিফার সঙ্গে। জরুরি ফরমান শুনে খলিফা আর বাধা দিল না, একপাশে সরে তার উত্তেজিত কর্মচারীর কথা শুনল। শোনা শেষ হতেই সেই একইরকম উত্তেজিত ভঙ্গিতে ফিরে এলো কর্নেলদের কাছে। 'হজুর ভয়াবহ খবর আছে। আপনাদের এখন থেকে সরে পড়তে হইবে।'

কর্নেল ত্রিলোক আর পালোয়ান চোখাচোখি করল, কি এমন হয়ে গেল কিছুক্ষণের ভেতরে।



অধ্যায় পঁয়তাল্লিশ বর্তমান সময় পিবিআইএস ল্যাব, নতুন বাজার

‘জিনিসটা কি সত্যি সিগনেট রিং?’ জয়া সরকার তার সাগর কলার মতো মোটা মোটা আঙুল দিয়ে ধরে রেখেছে রিংটা। বাশারের কাছে মনে হলো রিংটা বেশ বড় হলেও জয়ার হাত এবং আঙুলের হিসেবে একদম ঠিক আছে। ‘আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না, আমি সত্যি সত্যি হাতে একটা সিগনেট রিং ধরে আছি। অবিশ্বাস্য, তাও আবার সার্পেন্টস এনিগমা রিং, অসম্ভব।’

‘তারচেয়েও অসম্ভব ব্যাপার হলো এটাকে কেউ একজন দিয়ে গেছে আমাদের কাছে,’ কথাটা বলে উঠল জয়া সরকারের পাশে ছোট বাচ্চাদের মতো উত্তেজিত হয়ে নড়তে থাকা রুশো। ‘আপনি যা বলছেন সেটা তো অসম্ভবই তারচেয়েও বড় অসম্ভব ব্যাপার মনে হচ্ছে আমার কাছে এটা। যেখানে এরকম একটা সিগনেট রিংয়ের মূল্য অপরিসীম।’

‘আর আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে কেন?’ বাশার প্রশ্ন করল। সে আর সামিরা একটা টেবিলে হেলান দিয়ে জয়া রুশো আর টমির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

‘আমারো একই প্রশ্ন,’ এবার সামিরা যোগ করল বাশারের সঙ্গে সঙ্গে। ‘একটা অপহরণের কেসে, একদল ভয়ংকর শক্তিশালী অপরাধী দল, একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে অপহরণ করে কোনো মুক্তিপণ দাবি না করে ইনভেস্টিগেশন টিমের হাতে ধরিয়ে দিল একটা মিথিক্যাল রিং। কেন?’

সবাই চুপ, একেকজনের মনে একেক প্রশ্ন, প্রায় কারো মাথার ভেতরেই কোনো জবাব নেই।

জয়া সরকার মাথা নাড়ল। ‘এর অনেক মানে হতে পারে। হয়তো কেউ একজন চাচ্ছে—’

সিপাহী

‘আমরা এই সিগনেট রিংয়ের রহস্যের সমাধান করি,’ রুশো বলে উঠল।
‘তাই নাকি!’ বাশার প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠল। ‘এই রিংয়ের কোনো রহস্য
আছে নাকি?’

‘ওহ ইয়েস, একটা না হাজার হাজারো রহস্য এবং ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে এই
সিগনেট রিংয়ের সঙ্গে। হত্যা, যুদ্ধ, কেমিস্ট্রি, মিথোলজি, এমন কিছু নেই, যা
জড়িয়ে নেই এই সিগনেট রিংয়ের সঙ্গে। শুধু একটা উদাহরণ দিই। অনেকে বলে,
মানেও এটা স্রেফ মিথ, কোনো প্রমাণ নেই, জাস্ট কথিত রয়েছে, জে অফ
টলকিনের লর্ড অব দ্য রিংয়ের বিষয়টাও নাকি এই সিগনেট রিং দ্বারা অনুপ্রাণিত
ছিল,’ বলে জয়া কাঁধ ঝাঁকাল। ‘মানে এটার মিথ দ্বারা, কারণ ইতিহাসে সিগনেট
রিং কেউ দেখেছে বলে কোনো প্রমাণ নেই।’

‘আর এই সিগনেট রিং, যা কোনোদিন কেউ দেখেনি, যার দ্বারা ইতিহাসের
সর্বশ্রেষ্ঠ ক্যান্টাসি লেখক তার সেরা লেখাটা রচনা করেছেন, যার সঙ্গে যুদ্ধ, মৃত্যু
হাবিজাবি জড়িয়ে রয়েছে, যার দামের সঙ্গে দুনিয়ার যেকোনো দামি জুয়েলারি
কেইল হবে, সেই সিগনেট রিং কেউ একজন আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে এমনি,
আর সেটা নিয়ে আমরা বসে আছি এই ময়মনসিংহের নতুন বাজারে,’ বলে বাশার
কাঁধ ঝাঁকাল। ‘গালগল্পের তো একটা সীমা থাকা উচিত! জয়া, ও না হয় ছোট
মানুষ, বলে বাশার রুশোকে দেখাল। ‘তুমি তো ম্যাচিউর একজন মানুষ। তোমার
কাছ থেকে—’

‘বাশার তোমার মনে আছে কি,’ জয়া তার স্বভাবসুলভ রাগী বা উত্তেজিত ভঙ্গি
নয় বরং বেশ শান্ত সুরে কথা বলে উঠল। ‘আমরা যখন ইনিশিয়ালি ঠগিদের সঙ্গে
সংশ্লিষ্ট কেসটা নিয়ে কাজ শুরু করি, টুইন কালী পুরনো সিন্দুক এসব গল্প শুনে
কিন্তু একইরকম মনে হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে পরে আমরা কী দেখলাম, ওই ঠগি,
ব্রিটিশ ভারতের গল্প, ওদের বিচিত্র আচার-আরাধনা-হত্যা, সেই শশীলজ,
ময়মনসিংহের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বিরাজমান সুড়ঙ্গ। সেই পাতাল নদী,
এতলোর অস্তিত্ব সত্যি রয়েছে এবং আমরাই এতলোর বড় প্রমাণ। কি পাইনি
বলো?’ জয়ার কাছ থেকে এরকম ঠান্ডা আক্রমণ বাশার আশা করেনি।

‘তার ওপরে আমি আরেকটু যোগ করি,’ রুশো বলে উঠল। ‘সিলেট শহর
থেকে ব্র্যাক বুন্সার মূর্তি উদ্ধার, চট্টগ্রামের সেই কেস,’ বলে সে বাশারের দিকে
দেখাল। ‘আপনি বারোভূঁইয়াদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেসে কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি
দুর্গের সামনের পুকুর থেকে রীতিমতো একটা গুপ্তধনের বা হারানো সম্পদের
পাহাড় উদ্ধার করেছেন। কাজেই—’ বলে সে কাঁধ ঝাঁকাল।

‘আচ্ছা বুঝেছি, বাশার ঠিক বলেনি,’ সামিরা এগিয়ে এলো বাশারের
সাপোর্টে। ‘অ্যান্টিক বা এসবের বিষয় তো আর নতুন কিছু নয়। মিলিয়ন ডলারের

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

ইন্ডাস্ট্রি, কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো যে বাংলাদেশের মানুষ অ্যান্টিক কি ঠিকমতো চেনেই না। যে দেশে শো-পিস আর অ্যান্টিকের পার্থক্য করার মতো মানুষের সংখ্যা খুবই কম, বলতে গেলে হাতে গোনা। যেই দেশে কোনোদিন অ্যান্টিক নিয়ে এমন কোনো নাড়াচাড়াই ছিল না, সেখানে হঠাৎ করে অ্যান্টিক নিয়ে এত বড় বড় ঘটনা ঘটছে, কারণ কি? আর তারচেয়েও বড় কথা সার্বিকভাবে আমি এই সিগনেট রিইয়ের ব্যাপারটা জানতে চাই। আরো বিশেষ করে এই কেসের সঙ্গে এর সম্পৃক্ততা। কেন কেউ এমন একটা জিনিস ক্ষিতে কারো হাতে ধরিয়ে দেবে।’

বাশার মাথা নেড়ে সায় জানাল সামিরাকে পয়েন্টে কথা বলার জন্য।

‘মিলিয়ন নয়, বিলিয়ন,’ জয়া সরকার বলে উঠল।

‘মানে,’ সামিরা ঠিক বুঝতে পারেনি জয়ার কথাটা। যেহেতু তার কথার পরিস্থিতিতেই জয়া বলেছে, কাজেই সে বুঝতে না পেরে জানতে চাইল।

‘কলহিলাম, মিলিয়ন নয়, বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি,’ জয়া সরকার বলে উঠল। ‘তুমি বলছিলে না, অ্যান্টিক মিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি, আসলে মিলিয়ন নয়, বিলিয়ন এবং বলা যায়, বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি। ট্রাস্ট মি, আমি দীর্ঘদিন এই লাইনে কাজ করেছি। বৈধ-অবৈধ দুই ধরনের কাজই করেছি। কাজেই আমার কথার ওপরে বিশ্বাস রাখতে পারো,’ সে কোনো ধরনের অনুমতির ধার না ধরেই সামিরাকে সরাসরি তুমি বলেছে দেখে সামিরার একটা ড্র কুঁচকে উঠল, আর বাশার মৃদু হেসে উঠল। সে তো জানে জয়া সরকারের অভ্যাস। সামিরা রাগের সঙ্গে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই বাশার থামিয়ে দিল তাকে।

‘আমরা কাজের কথায় আসি, জয়া এবং রুশো তোমাদের পয়েন্ট আমি বুঝতে পেরেছি। এখন বলো কোথা থেকে কীভাবে শুরু করব এবং আমাদের পরের স্টেপ কী হতে পারে?’

‘যেহেতু আমরা এখনো জানি না রিফাতের অপহরণকারীরা আসলে কী চাচ্ছে এবং তারাই আমাদের এই রিং ধরিয়ে দিয়েছে, কাজেই আমার মনে হয় এই রিং দিয়েই শুরু করা উচিত।’

‘আই লাইক দ্যাট, এতক্ষণে কাজের কথা হচ্ছে দেখে সামিরা খুশি হয়ে উঠল। ‘আমাদের কি এই রিংয়ের ইতিহাস ইতিবৃত্ত জানা উচিত, মানে ওখান থেকে শুরু করা উচিত।’

‘অবশ্যই,’ সামিরার কথায় সায় জানাল জয়া সরকার। ‘প্রথমত, আপনারা কি জানেন সিগনেট রিং আসলে কি?’ সবাই চুপ কেউই জানে না, শুধু রুশো ছোট বাচ্চাদের মতো হাত তুলে বোঝাল সে জানে। ক্লাসে শিক্ষক যেভাবে বাচ্চাদের পড়া বলতে বলে, জয়াও সেভাবে হাত নেড়ে তাকে বলে যেতে বলল।

‘সিলমোহর ব্যাপারটা চেনেন তো আপনারা?’

সিপাহী

বাশার মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, কখনো কোনোকিছু যখন নির্দিষ্ট করার জন্য বা বন্ধ করার জন্য সিল লাগিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়, সেটাকেই সিলমোহর বলে।'

'হ্যাঁ, একদম ঠিক। সিগনেট রিং হলো ওই সিলমোহরের আদি পুরুষ বা বলতে পারেন এখনো প্রচলিত বংশধর, অনেক জায়গাতে। সাধারণত একটা রিং আসলে কি জুয়েলারি, কিন্তু প্রাচীনকালে একটা রিং আসলে শুধু জুয়েলারি ছিল না, বিশেষ করে ইংরেজদের ক্ষেত্রে অনেক সময় তাদের পাঠানো বার্তা বা চিঠি বা নির্দেশনামা, ঘোড়ারি পরোয়ানা ইত্যাদিতে মোম গলিয়ে বা আঠাল তরল গলিয়ে সেটাতে বিশেষভাবে বানানো রিং থেকে মোহর বা ছাপা লাগিয়ে দেওয়া হতো ওটাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য। এসব ক্ষেত্রে যে ধরনের রিং ব্যবহার করা হতো সেটাকে বলা হতো সিগনেট রিং। মানে যেসব রিং শুধু জুয়েলারি নয়, এটা আরো গুরুত্বপূর্ণ পারপাস রয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে এটার বিশেষ পারিবারিক, ঐতিহাসিক বা ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে কিংবা এটা কোনো নির্দিষ্ট লিগেসি বহন করে সেটাকেই সিগনেট রিং বলা হয়।'

'সেক্ষেত্রে আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে, বাশার বলে উঠল। 'তুমি বা জয়া সরকার যে কেউ এটার উত্তর দিতে পারো। সিগনেট রিং যদি সিলমোহর লাগানোর রিং হয়েই থাকে, তবে যে সিগনেট রিং আমাদের হাতে রয়েছে—'

'সার্পেন্টস এনিগমা,' জয়া তাকে নির্দিষ্ট করে বলে দিল। 'এটা একটা বিশেষ রিং, সিগনেট রিং শব্দটা আসলে অনেকটা কমন নাউনের মতো, ধরো ফল বা ফুট হলো প্রসার নাউন, আর আম হলো ফলের ভেতরে নির্দিষ্ট একটা ফল। এই রিংটা সিগনেট রিং হলেও এটা আসলে নির্দিষ্ট একটা রিং।'

'বুঝেছি,' বাশার হাত নেড়ে বলে উঠল। 'আমার কথা হলো সিলমোহর দিতে হলে সেই রিংয়ের একটা বিশেষ আকৃতি থাকা উচিত যেটার টপে,' সে তার আঙুলে পরা তার মায়ের আঙটিটা দেখাল। 'যেমন অনেকটা এরকম হওয়া উচিত। কিন্তু এটা তো ফ্ল্যাট বা বলা যায় গোল একটা রিং। এটা সিগনেট রিং হয় কীভাবে, বা সিগনেট হলেও এটাকে সেই পারপাসে ব্যবহার করা হতো কীভাবে?'

'এই প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই,' বলে জয়া সরকার রুশোর দিকে তাকাতে সেও কাঁধ নেড়ে মানা করল। 'দেখো, আজকের আগে সেভাবে নির্দিষ্ট করে সিগনেট রিং কেউই দেখেনি। এটার অস্তিত্ব আদৌ আছে কি না সেটা কেউ জানত না।'

'তাহলে এবার আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, এটাকে তাহলে তোমরা সিগনেট রিংই বলছো কেন কিংবা এটা যে সার্পেন্টস কি জানি বললে, সেটাই বা বলছো কীভাবে?' সে জয়া সরকার এবং রুশো দুজনকেই দেখে নিল একবার করে।

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

‘আমি বলি,’ রুশো আগে বলে উঠল। ‘আপনি কি জয়া ম্যাডামের আর্টিকেলটা পড়েছেন?’

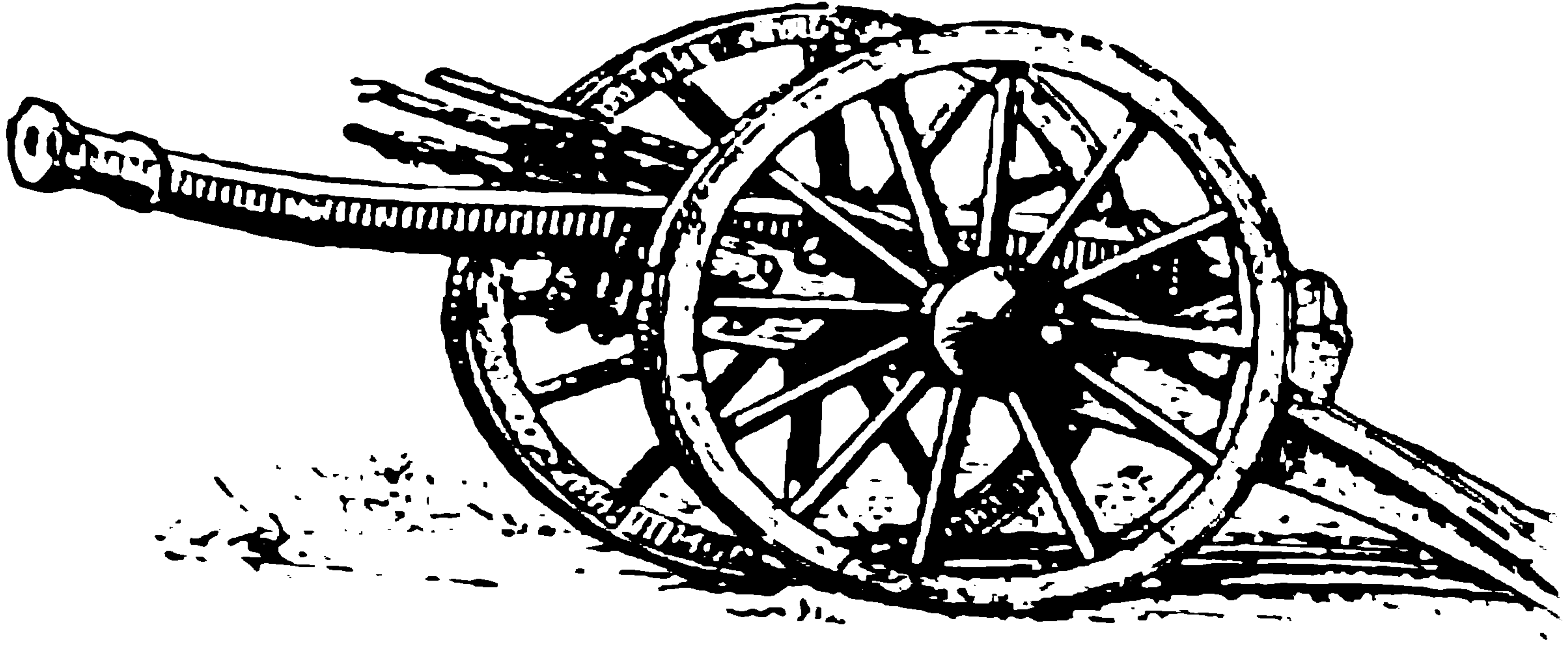
‘চোখ বুলিয়েছি,’ বাশার হাত নেড়ে বলে উঠল। আসলে সে ঠিকমতো পড়েনি, এটা এখানে বলতে চাচ্ছে না।

‘আচ্ছা, যদি পড়ে থাকেন তাহলে প্রথমেই এটা বলে নিই, যদি মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস জানেন বা মানেন বা নাও মানেন, কিংবা ধর্মীয় বিষয়গুলোও মেনে নেন, সেক্ষেত্রেও একটা বিষয় আমরা জানি সবকিছু প্রাথমিক চারটা এলিমেন্ট দিয়ে তৈরি,’ বলে রুশো হাতের আঙুলের কড়ে গুনে দেখাল। ‘মাটি, পানি, আগুন, হাওয়া।’

‘এটা তো বুলশিট,’ সামিরা বলে উঠল। ‘এটা অনেক আগেই বিজ্ঞান ভুল প্রমাণ করেছে—’

রুশো মৃদু হেসে উঠল। ‘ম্যাডাম, আমাকে কথা শেষ করতে দিন। এটা আমরা এখন জানি। কিন্তু আগের মানুষ এটাই মানত, অন্তত বেশির ভাগ ধর্মীয় ক্রিপচার তাই বলে। আপনারা কি জানেন, এই চারটা উপাদানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কাকে ধরা হয় বা মানা হয়, বা বলা যায় মানা হতো?’ সবাই চুপ এরও উত্তর কারো জানা নেই। রুশো আবারো হেসে উঠল। ‘ম্যাডাম বলবেন?’

‘আমি যা বলতে যাচ্ছি সেটা খুবই অদ্ভুত বিষয়, কাজেই বাকল ইয়োরসেসক।’



অধ্যায় ছেচলিশ

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
দিল্লি, উত্তর ভারত

‘অদ্ভুত খবর,’ খালিকাকে খানিক অস্থির দেখাচ্ছে, যেন সে অল্প-বিস্তর ঘোরের মধ্যে রয়েছে।

‘কি ব্যাপার?’ কর্নেল ভারী গলায় জানতে চাইল খালিকার কাছে। ‘কী খবর নিয়ে এসেছে আপনার লোক?’

‘হজুর দিল্লি শহরের বর্তমান অবস্থার খবর তো আপনারা মনে হয় জানেন, তাই না?’

ওরা সবাই মাথা নেড়ে সায় জানাল। ‘আমরা খুব ভালোই ওকাবিহাল রয়েছি পরিস্থিতি নিয়ে, তুমি তোমার খবর বলো,’ পালোয়ান প্রায় ধমকে উঠল। এমনিতেই বন্ধ জায়গাতে পালোয়ানের দম বন্ধ হয়ে আসে, বিগত কিছু সময় ধরে সে এই কাপড়ের বন্ধ জায়গাতে থাকতে থাকতে এমনিতেই অস্থির হয়ে উঠেছে। তাকে হাতের ইশারায় শান্ত থাকার নির্দেশ দিল কর্নেল।

‘খালিকা, আমাদের সার্বিক পরিস্থিতি জানার প্রয়োজন নেই তুমি আমাদের কি খবর এসেছে সেটা জানাও।’

‘হজুর দিল্লি শহরে খবর ছড়ায় গেছে, আজই যেকোনো সময়ে দাঙ্গা লাগতে পারে। শহরে আতঙ্ক ছড়াইতে শুরু করেছে, এমনিতেই শহরের অবস্থা খারাপই ছিল, এহন কী হবে কেউই বলতে পারতাকে না। আমার মতে আপনারা এহনই এই শহর ছাড়েন। আমার দোকান ষটেই আর কোনো জায়গাই নিরাপদ না আপনালো জন্য, বিশেষ করে আপনারা দুজন,’ সে কর্নেল আর পিটারের দিকে দেখাল। ‘আগে খেইকান শহরের অবস্থা খারাপ, এর ভেতরে আবার যদি হিন্দু-মুসলমানের ভেতরে লাগতে শুরু করে পুরা শহর শ্রেক নরক হয় যাবে।’

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

‘দাস্তার কারণ কি?’ ত্রিলোক জানতে চাইল। ‘মানে হঠাৎ এই সম্ভাবনা কেন দেখা দিল?’

বড় করে একবার দম নিল খলিফা। ‘ঘটনা হইল হজুর, শহরের অবস্থা তো খুবই খারাপ। সম্রাট বৃদ্ধ মানুষ তারে কোনোমতে পুতুলের মতো বসায়া বিদ্রোহী সিপাহী আর ডাকাইতেরা যা খুশি তাই করতাকে। শহর থেইকা যারা পারছে পলাইছে। যারা পারে নাই, তারা তো আছেই। এর ভেতরে লুটতরাজ আর রায়জানি ইচ্ছেমতো চলতাকে। বিদ্রোহীরা ইংরেজ যাগো পাইছে মারছে, ইচ্ছামতো ফাঁসি দিচ্ছে দিল্লির বাজারের মধ্যে। বিগত কিছুদিন আগে হিন্দু এলাকায় গুরু জবাই নিয়া গণ্ডগোল হইছিল। আইজ আবার খবর ছড়ায় পড়ছে, গুরু জবো হইতে পারে, যেকোনো একটা দাস্তা লাগানি স্রেফ সময়ের বিষয়।’

‘খবরটা ছড়াইল ক্যামনে?’ ত্রিলোক জানতে চাইল।
খলিফা চুপ করে রয়েছে।

‘কি ব্যাপার, কথা কওনা ক্যান?’ পালোয়ান তার বিরাট লাঠিটা দিয়ে মাটিতে একটা বাড়ি মারতেই খলিফা রীতিমতো কঁপে উঠল।

‘হজুর আমি ছোট মানুষ, হজুরগো সামনে ক্যামনে কি বলি?’

‘খবরটা ইংরেজ সেনাদের লোকেরা ছড়িয়েছে, তাই না?’ বলেই কর্নেল বড় করে একবার দম নিল। ‘এরমানে ওরা খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে, শুধু শহরের বাইরে অবস্থানে নেই আর। তাই না?’

খলিফা কর্নেলের চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ‘জি, হজুর আইজ সকালেই তারা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই অবস্থান নিছে। গৌরি শংকর নামের একজন শহর ছাড়া উচিত আর না হয় লুকানি উচিত।’

‘শান্ত হও, এত অস্থির হওয়ার কিছু নেই,’ এখানে আমরা কেউই ছোট বাচ্চা না। শহরে কী ধরনের ঝুঁকি রয়েছে, সেটা জেনেই আমরা এখানে এসেছি এবং যে কাজে এসেছি, সেটা না করে আমরা শহর তো দূরে এই এলাকায় ছাড়ব না,’ বলে কর্নেল খানিক থেমে যোগ করল। ‘তুমি বরং এক কাজ করো, তুমি আমাদের এখান থেকে সেই ব্যাংক এলাকায় কীভাবে যেতে হবে সেটা জানিয়ে দাও।’

খলিফা এক মুহূর্ত ভাবল। ‘এক কাজ করতে পারেন,’ বলে সে আরেকটু ভেবে যোগ করল। ‘আপনেরা যদি দিয়া আসছেন, সেই বাজার এলাকা দিয়া বাইর না হইয়া, আমার লোকেগো লগে এই দোকানের পেছন দিয়া বাইর হয়ে যান, এরপরে সাবধানে যেইহানে যাইতে চান যান। আর যদি মনে করেন, শহর ছাড়বেন বা, লুকায় পড়বেন আপাতত, তাইলে সেই ব্যবস্থাও করতে পারি আমি।’

‘তোমার এত কথার প্রয়োজন নেই,’ কর্নেল বলে উঠল। ‘তুমি তোমার লোক দাও, আর বাকি ব্যবস্থা আমরাই করে নিতে পারব। খলিফা বেরিয়ে গিয়ে একটু

সিপাহী

পরে ফিরে এলো সঙ্গে দুজনকে নিয়ে। 'হুজুর, ও হইল বদু, আর ও মনা, এরা দুজনে আপনাদের নিয়া দোকানের পেছন তো বটেই বাজারের নির্জন গলি দিয়া ব্যাংক এলাকায় দিয়া আসব। এরপরে বাকিটা আপনোগো নিজ্জোগোর হিসাব।'

'ধন্যবাদ খলিফা,' বলে কর্নেল তার হাত এগিয়ে দিল খলিফার দিকে।

'আপনারাও সাবধানে থাকবেন,' খলিফা হাত মেলালেও চোখ মেলাল না। ব্যাপারটা কেমন জানি লাগল কর্নেলের কাছে কিন্তু এই মুহূর্তে আসলে এতকিছু ভাবলে চলবে না। কাজে নামতে হবে। সে একে একে পিটার, পালোয়ান, পালোয়ানের কুকুর, যেটা এতক্ষণ শান্ত ভঙ্গিতে বসে লেজ নাড়ছিল পালোয়ানের ডাকে উঠে দাঁড়িয়েছে, ত্রিলোক আর সোলেমানের দিকে দেখে নিয়ে সবাই প্রস্তুত আছে কি না—জানতে চেয়ে নিজের মাথা আর মুখ খুব ভালোভাবে আলোয়ানের মতো একটু টুকরো কাপড় দিয়ে ভালোভাবে পেঁচিয়ে নিল। অল্পগুলো ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নিল। তারপর বদু আর মনার দিকে ফিরে সামনে এগোনোর ইশারা করল। কর্নেলের ইশারা পেয়ে দুজনেই ওদের নিয়ে চলে এলো ওদামের মূল জায়গাটা পার হয়ে একটা ছোট কামরার মতো জায়গায়—তারপর ওদের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে বলে টান দিয়ে ছোট একটা দরজা খুলে ফেলতেই রোদেলা দিনের আলোতে চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলল ওরা। 'হুজুরেরা আসেন,' বলে ওরা দুজনেই বাইরে বের হয়ে গেল।

সবার আগে বদু আর মনা, তাদের পেছনে কর্নেল পালোয়ান আর তার পেছনে পিটার আর ত্রিলোক, সবার পেছনে সোলেমান, এভাবে সামনে এগোল ওরা। খলিফার দোকানের পেছনের অংশ থেকে বাইরে বের হয়ে ওরা প্রথমেই পা রাখল বাজারের পেছনের একটা নোংরা গলিতে, সেখান থেকে বের হয়ে ডানে মোড় নিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল খোলা একটা ময়দানের মতো জায়গায়। সেটা পার হয়ে আবারো প্রবেশ করল লোকালয়ে। ওরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আশপাশে খেয়াল করে কর্নেলের মনে হলো শহরে অবশ্যই কিছু না কিছু একটা হচ্ছে। কারণ দেখা না গেলও অদৃশ্য একটা টানটান ভাব শহরে। কিছু না কিছু হওয়ার লক্ষণ এবং নির্দেশনা মোটামুটি অদৃশ্যভাবে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

'কর্নেল,' হাঁটতে হাঁটতে কর্নেলের পাশ থেকে পালোয়ান বলে উঠল। 'শহরে কেমন জানি তুমোট একটা ভাব লাগতাত্বে না? দেখো মানুষজন রাজায় নাই বলতে গেলে। দোকানপাটও খালি খালি আর সবখানে কেমন জানি—'

'বাদ দাও, এখন আমাদের সামনে এগোতে হবে, সেখান থেকে যেকোনোভাবে উদ্ধার করতে হবে—ভিক্টর আসলে কীসের সঙ্গে জড়িয়েছিল নিজেকে এবং সেটা করতে পারাটাই এখন আমাদের মূল উদ্দেশ্য এবং একবার আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল করে ফেলতে পারলে শহর নিয়ে আমাদের আর না

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

ভবলেও চলবে। কারণ শহর নিয়ে ভাবা আমাদের কাজও না, আর শহর নিয়ে ভাবতে গেলে আমরা যেকাজে এসেছি সেটা হবে না।’

‘হজুর, সামনেই শহরের বড় বাজার এলাকাগুলার আরেকটা, এরপরেই গুরু হইবে, অফিসার আদালত, মস্তব্ব এলাকা, ওইখানেই পুরান কিল্লার কাছেই সেই জায়গা, যেইখানে আপনারা যাওয়ার পরিকল্পনা করতাহেন।’

‘চলো,’ পালোয়ান এবং অন্যদের ইশারায় সাবধান করে দিয়ে দুজন্যর পেছনে এগোতে লাগল কর্নেল। আবাসিক এলাকা পার হতেই দেখা গেল সামনে শহরের কেন্দ্রের বাজার এলাকা। কর্নেল অনুমান করতে পারছে এই জায়গাটা পার হওয়াই সবচেয়ে কঠিন বিষয় হবে। বড় করে দম নিয়ে তারা খোলা রাস্তায় পা রাখল। বাজার এলাকা গুমোট হওয়ার পরেও সরগরম, জায়গায় জায়গায় লোকজন জটলা করে আলাপে ব্যস্ত। কর্নেল খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পারছে লোকজন আসলে কী নিয়ে কথা বলছে। মূল শহরে না হলেও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতে মিনিটারি ঢুকে পড়া এমন কোনো ভালো লক্ষণ নয়। যেকোনো সময়ে যেকোনো পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কর্নেল দেখল প্রত্যেকেই সশস্ত্র এবং বেশ তাড়ার ওপরে আছে বলে মনে হলো কর্নেলের কাছে। সে আরো মনোযোগ দিয়ে দেখল বদু আর মনাও কেমন জানি অস্ত্রের আচরণ করছে। সে ইশারায় ডাক দিল ওদের। ‘কি ব্যাপার, কোনো সমস্যা?’ কর্নেল জানতে চাইল।

‘হজুর, মনায় ডরাইতাছে,’ বল কী বলে হেসে ফেলল বদু। কর্নেল কড়া চোখে তাকাতেই আবারো সে সামনে ফিরে হাঁটতে শুরু করল, মনা ভয়ে ভয়ে অনুসরণ করতে লাগল তাকে। কর্নেল যেই ভয় পেয়েছিল, সেটাকে অমূলক প্রমাণ করে বাজার এলাকা ওরা খুব ভালোভাবেই পার হয়ে এলো। বাজার এলাকা পার হয়ে ওরা পা রাখল দাপ্তরিক এলাকার ভেতরে এবং সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠল প্রায় সবাই। দাপ্তরিক এলাকার ভেতরে একটা পাহারা চৌকি বসানো।

মনে মনে প্রমদ গুনল কর্নেল। চৌকিটা এমনভাবে বসানো হয়েছে যে, চাইলেই এটাকে এড়ানো খুবই মুশকিল হবে।

কর্নেল দেখল ওদের সামনে থাকা বদু আর মনাও চুপ হয়ে গেছে। থেমেও গেছে, ব্যাপারটা আরো ঝুঁকিপূর্ণ মনে হলো তার কাছে। ওরা থেমে গেলেও চট করে কর্নেল এগিয়ে গেল সামনের দিকে। ‘থেমো না সামনে এগোতে থাকে,’ বলে সে আশপাশে দেখল। রাস্তাঘাটে লোকসংখ্যা একেবারেই কম, কাজেই এখানে এরকম পাঁচ-ছয়জনের একটা দল চোখে পড়ার সম্ভাবনা আরো বেশি বলতে গেলে।

‘হজুর ওই যে ব্যাংক,’ বদু ইশারায় দেখাতে আরো বেশি আতঙ্কের সঙ্গে কর্নেল উপলব্ধি করল, ব্যাংক এলাকায় প্রবেশ করতে হলে এই চৌকি এড়ানোর

সিপাহী

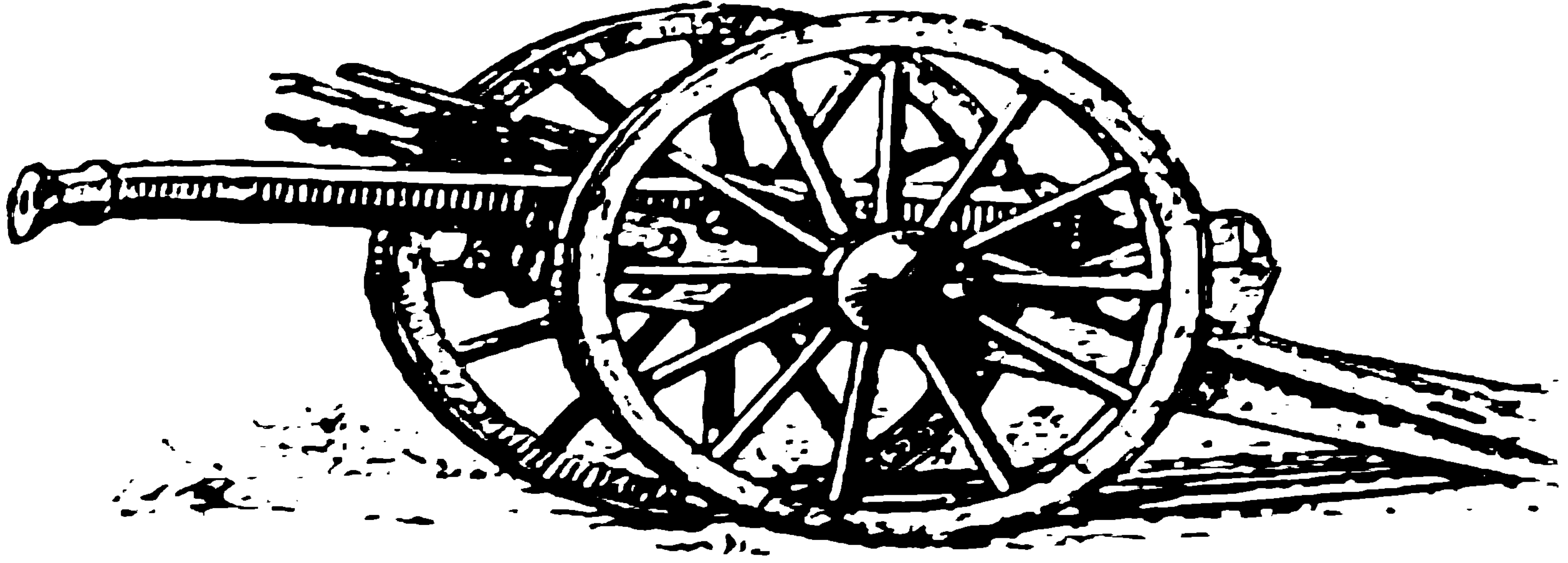
কোনো উপায়ই নেই বলতে গেলে। কর্নেল পেছন ফিরে দেখল ওদের দাঙ্গাঃ লোকজন প্রায় খেমে গেছে। খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কর্নেল বদুকে ঠাক করে বলে উঠল, 'খেমো না, সামনে এগোও,' বলে একটু খেমে সে যোগ কর 'এক কাজ করো। আগে আমরা সৈনিক চৌকিটা পার হয়ে যাই, এরপরে সামনে এগিয়ে প্রয়োজন হলে পেছন দিয়ে বা অন্যদিক দিয়ে প্রবেশ করতে হবে ব্যাংক এলাকায়। এগোও এগোও।'

পুরো দলটা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল। কর্নেল অনুধাবন করতে পারছে সে নিজেই দ্বিধার সঙ্গে ছড়োসড়ো হয়ে আছে, কাজেই অন্যদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক আচরণ আশা করাটাই বৃথা। কিন্তু যদি তারা স্বাভাবিকভাবে এগোতে পারে, একমাত্র তাহলেই এই বিপদ পার হয়ে সামনে এগোনো সম্ভব। ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হলেও অন্যরা যতটা সম্ভব শান্ত ভাব বজায় রেখে কর্নেলই এগিয়ে গেল বদু আর মনাকে ছাড়িয়ে, তাকেই উদাহরণ স্থাপন করতে হবে।

চৌকিটা বসানো হয়েছে রাস্তা বরাবর আড়াআড়ি। চৌকিটা দেখেই কর্নেল আন্দাজ করতে পারল, এই চৌকি এমনভাবে বসানো হয়েছে এবং যে বসিয়েছে তার অবশ্যই সামরিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। কারণ চৌকি বসানোর ধরনেই পরিষ্কার যে এটাকে বসানো হয়েছে যাকে হেঁটে চলার পথ পরিষ্কার দেখা যায়, আবার ঘোড়া বা বাহন চলার মূল রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ না হয় কিন্তু খুব দ্রুত বা চোখ এড়িয়ে পার হয়ে যাওয়াও সম্ভব না হয়। কর্নেল আড়চোখে দেখে আরো অনুমান করতে পারল যেখানে চৌকি বসানো হয়েছে, সেখান থেকে প্রায় বৃত্তাকার জায়গাটার মূল ভাগ থেকে শুরু করে বেশির ভাগ অংশই চোখে পড়ে। মনে মনে সে চৌকি স্থাপনকারীর প্রশংসা না করে পারল না। বিদ্রোহী হলেও এরা সামরিক প্রশিক্ষণ একেবারে ভুলে যায়নি।

সবার আগে কর্নেলই মূল পথের পাশ দিয়ে চৌকি পার হয়ে হাঁটা রাস্তায় পা রাখল। চৌকি পার হয়ে যেতেই সে গতি খানিক কমিয়ে দিল। একটু পরেই তার পাশে এসে যোগ দিল বদু এবং মনা। আর অল্প কিছুক্ষণের ভেতরেই পালোয়ান। কর্নেল হুঁচকি সঙ্গে অনুভব করল সোলেমান এবং পিটারও পার হয়ে যাচ্ছে চৌকির পাশের অংশ, আর মিনিটখানেকের ভেতরেই ওরাও পা রাখবে হাঁটা পথে, এর পরেই ওরা খানিক দূরে প্রবেশ করতে পারবে ব্যাংক এলাকায়।

সোলেমান চৌকি পার হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিতেই পিটারকে চৌকি থেকে ডাক দিল প্রহরারত এক সৈনিক। সঙ্গে সঙ্গে সোলেমান থেকে শুরু করে বাকি সবার মুখের হাসি গায়েব হয়ে গেল।



অধ্যায় সাতচল্লিশ

বর্তমান সময়

পিবিআইএস ল্যাব, নতুন বাজার, ময়মনসিংহ

হুসি তো দূরে জয়া সরকারের মুখ খুবই গম্ভীর হয়ে আছে। ‘আমি যা বলতে চাচ্ছি সেটা নিয়ে বলতে গেলে আগে অ্যান্টিক নিয়ে খানিক ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। সবার যত্ন পরিসরে জানা উচিত অ্যান্টিক আসলে কীভাবে কাজ করে,’ জয়া সরকার যত্ন চলেছে। ‘আগেই বলেছি, এগুলো পুরনো দিনের মিথ বা ধারণা—যেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক আবার ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই এগুলোকে ঘিরে যা প্রচলিত রয়েছে সেগুলোকে দ্রুত সত্য বলে ধরে নেয়ার কোনো কারণ নেই। তবে এগুলো আপনি ফেলেও দিতে পারবেন না। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই পুরনো বিশ্বাস থেকেই বর্তমান বিজ্ঞানের জন্ম এবং এগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে,’ জয়া সরকার সবার দিকে ফিরে তাকাল। বিষয়টা হলো মানুষের বিশ্বাস। বলে না—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, অ্যান্টিকের ব্যাপারটা অনেকটা এমন। একটা উদাহরণ নিই। হলিউড অভিনেতা হ্যারিসন ফোর্ড অভিনয়ে নামার আগে কাঠমিষ্টির কাজ করত। তো এক লোক একদিন আবিষ্কার করল তার বাড়ির একটা দরজা হ্যারিসন ফোর্ড বানিয়েছিল। এটা জানার পরে সে ওই দরজা খুলে ওটা ক্ষেমে বাঁধাই করে নিজের বাড়ির ছয়িংক্রমে সাজিয়ে রাখে। তার মৃত্যুর পর তার সন্তানেরা ওই দরজা অনেক টাকায় নিলামে বিক্রি করে, এখন প্রশ্ন হলো, যদি আপনি ওই কাঠের দরজার বস্তুগত দাম বিবেচনা করেন, তাহলে সেটা কিছুই না। কিন্তু ওটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে ব্যক্তি বা ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে, সেটার যদি আলাদা কোনো সাবজেক্টিভ ভ্যালু থাকে এবং বহু মানুষ সেটা বিশ্বাস করে, তাহলে সেই জিনিসের দাম বেড়ে যায় এবং কোথায় গিয়ে ঠেকে সেটার কোনো ঠিক নেই,’ বলে সে টেবিল থেকে একটা কলম তুলে দেখাল।

সিপাহী

‘এই কলমের তেমন কোনো দাম নেই। কিন্তু যদি আপনি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন যে এই কলম দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা লেখত, বহু মানুষের কাছে এটার অনেক দাম হবে। আর আপনি যদি সেই মানুষগুলোকে এক করে নিলাম করতে পারেন, সেটা লিগ্যালি হোক বা ইলিগ্যালি, তাহলে এটার দাম কোথায় গিয়ে ঠেকবে সেটার কোনো ঠিক নেই। যাই হোক,’ বলে জয়া সরকার কাঁধ ঝাঁকাল। ‘এটা হলো অ্যান্টিক বিজনেস, আমি নামে অ্যান্টিক রিলেটেড কলামিস্ট হলেও, আমি আসলে এই ধাক্কাই করতাম। নানা ধরনের অ্যান্টিকের খোঁজ বের করে সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতাম, বিনিময়ে কখনো কমিশন আবার কখনো আমি নিজে সরাসরি কেনাবেচার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতাম। এভাবেই সেই ঠগী কেসে—হোয়াটএভার—’

বাশার মৃদু কাশি দিল। ‘তোমার বেসিক এলিমেন্ট ও রিংগুলো নিয়ে কথা বলার কথা ছিল।’

‘আচ্ছা, ধন্যবাদ বাশার,’ বাশার মৃদু হেসে উঠল পুরনো জয়া সরকারের খোঁচা মারার ভঙ্গিতে কথা শুনে। ‘এটা তো বললাম অ্যান্টিকের সাবজেক্টিভ ভ্যালু নিয়ে। এবার বলি অ্যান্টিকের বস্তুগত ভ্যালু নিয়ে। একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে শুরু করি, পুরনো ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে জমি বা রাস্তার কোনো বা মাপ নির্ধারণ করার জন্য এক ধরনের ছোট ছোট পিলার দেওয়া হতো। এখনো যেকোনো জায়গায় বা রাস্তায় বা সরকারি জমিতে দেখতে পাবেন এ ধরনের নিশানাকারী পিলার। এটাকে পাথরও বলা হতো। একান্তরের যুদ্ধের পর হঠাৎ দেখা গেল ইউরোপ থেকে আসা অনেকেই এই ধরনের নিশানা পাথর বা পিলার বেশ দাম দিয়ে কিনতে আগ্রহী। আমাদের দেশের গ্রামগুলো তখন অনেকেই এ-ধরনের পুরনো পিলার হঠাৎ অনেক দামে বিক্রি করেছে। এখন প্রশ্ন হলো এটা একটা অ্যান্টিক, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু পরে জানা গেল এটাকে নিছক সংগ্রহের জন্য কেনা হয়নি। এই পিলারগুলো এক ধরনের বিশেষ বিস্ফোরক পিষ্টল দিয়ে বানানো হতো, যেটা এখন বিলুপ্ত প্রায়। যে কারণে এটার এত চাহিদা। আবার ধরেন পুরনো অনেক দেবদেবীর মূর্তি দেখতে পাবেন কষ্টিপাথরের তৈরি। সাধারণ একটা কষ্টিপাথরের মূর্তিও দেখা যায় কোটি টাকার ওপরে, যদি আপনি সঠিক বায়ারের কাছে বেচতে পারেন। এটার কারণ হলো এগুলোর অ্যান্টিক ভ্যালু তো আছেই সঙ্গে, এটার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কষ্টিপাথর এক ধরনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারপাস রয়েছে, অনেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডায়মন্ডের মতো। কাজেই অ্যান্টিকের সাবজেক্টিভ ভ্যালুই শুধু নেসেসারি নয়, এটার ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ভ্যালুও যে থাকবে না, তা নয়।’

অডিয়েন্স অস্থির হয়ে উঠেছে দেখে সে একটা হাত তুলল। ‘আমি প্রসঙ্গে আসছি। আসল প্রসঙ্গে আসতে গেলে এ-বিষয়গুলো বোঝানো জরুরি ছিল। আগেই বলেছি বহুকাল মানুষের বিশ্বাসের কেন্দ্রে ছিল, সৃষ্টির সবকিছু তৈরি আসলে মাটি,

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

পানি, আগুন বাতাস দিয়ে। বিষয়টা এ-যুগে শুনতে হয়তো একটু অদ্ভুত শোনায় কিন্তু এটাতেও যে বিজ্ঞান একেবারেই নেই তা নয়। যেমন অনেক ধর্মেই আছে আমরা মানুষেরা মাটির তৈরি। এখন এই কথাটাকে যদি রূপক অর্থে নিয়ে আমি অন্যভাবে রিপ্রেজেন্ট করি। তাহলে বিষয়টা এমন দাঁড়ায়, ধরো মানুষের জন্ম কোথা থেকে, মাতৃগর্ভ থেকে। মানে খুব প্রেইনভাবে বলতে গেলে মায়ের গর্ভে সৃষ্টি হয় এবং বেড়ে ওঠে একজন মানুষ তার জন্ম না হওয়া পর্যন্ত। মায়ের শরীর পুষ্ট হয় কী থেকে—পুষ্টি থেকে। একজন মানুষ পুষ্টি পায় যতগুলো সোর্স থেকে, তার মধ্যে অন্যতম মাটি থেকে পাওয়া খাবার এবং ফসল। একেবারে সব না হলেও বেশির ভাগ প্রোটিন বা ভেসজ উৎস কিন্তু মাটি। একভাবে বলতে গেল মাটির পরিবর্তিত রূপই আমাদের শরীর।’

‘আমরা যা খাই তাই আমরা—,’ টমি বলে উঠল ফোড়ন কেটে।

‘কিন্তু আমাদের শরীরের পুষ্টির উৎস তো শুধু মাটি নয়। সূর্যের আলোও আছে—’

‘একদম ঠিক,’ জয়া সরকার আঙুল তুলে সামিরার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। ‘সেটাই লাইট বা একভাবে বলতে গেলে ফায়ার, যেটাকে পরে আমরা আবিষ্কার করেছি সূর্যের উপাদান থেকে। যাই হোক আমার পয়েন্ট হলো, এই সিগনেট রিং যা রিপ্রেজেন্ট করে, সেটা একদিকে মিথিক্যাল রহস্যময় এবং এটার বস্তুগত এবং সাবজেক্টিভ দুই ধরনের ভ্যালুই রয়েছে। এবার বলি সেই প্রাচীন বিশ্বাসের বাকি দুটো উপাদান নিয়ে। মাটি-পানি-আগুন-বাতাস এই চারটা মূল, কিন্তু এই দুটোর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে আরো দুটো। যেটাকে বলা হয় সময় এবং কনটেক্সট।’

‘সময় না হয় বুঝলাম, সবকিছুই কোনো না কোনো সময়ে এক্সিস্ট করে, কিন্তু কনটেক্সট বিষয়টা কি?’ এবার প্রশ্ন করল ইনসপেক্টর রবিউল। সে এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। কিন্তু এবার তার প্রশ্ন করা শুনে বোঝা যায়, এবার সেও ইন্টারেস্ট অনুভব করতে শুরু করেছে।

‘আমি আবারো বলছি, দেখেন এসব মিথের বা বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যে একেবারে নেই তা নয়। যেমন দেখেন সিগনেট রিংয়ের এই বিষয়গুলো কিন্তু কিছুটা, হয়তো খুব স্বল্প পরিসরে হলেও রিলেটিভির সঙ্গে যায়। যাই হোক কনটেক্সট ব্যাপারটা হলো যেকোনো এলিমেন্ট, সেটা আসলে পরিস্থিতির ওপরে নির্ভর করে। যেমন সবচেয়ে প্রচলিত উপাদানের কথাই বলি। পানি, গরম করলে ফুটন্ত থেকে বাষ্প, ঠান্ডা করলে বরফ মানে কঠিন, আবার স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণ তরল পানি। এক কেমিক্যালের সঙ্গে অন্যটা মেললে এবং সেটা কোনো অবস্থায় কীভাবে মেলানো হচ্ছে—সেটার ওপরে নির্ভর করে এই উপাদান। সাধারণত প্রতিদিনের রান্না থেকে শুরু করে সবকিছু কি সেটাই নয়।’

সিপাহী

‘আমি মনে হয় বিষয়টা বুঝতে পেরেছি, এই সিগনেট রিং আসলে সৃষ্টির সব উপাদান রিপ্রেজেন্ট করে এবং সঙ্গে সেটার ধারক বাহককেও। ঠিক?’ বাশারের প্রশ্ন শুনে মাথা নেড়ে সায় জানাল জয়া এবং রুশো। ‘তাহলে আমার প্রশ্ন হলো, আমাদের কাছে যে রিংটা রয়েছে, সেটা কি পুরো এই সার্কেলটাকে রি-প্রজেন্ট করে?’

‘এখানেই মজা এবং কনফিউশন,’ রুশো বলে উঠল। সে নিজের একটা হাত তুলে কড়ে আঙুল গুনতে শুরু করে জয়ার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘আমার ভুল হলে শুধরে দেবেন,’ বলে সে আবার অন্যদের দিকে ফিরে তাকাল। ‘সিগনেট রিং আসলে একটা নয়। মোট ছয়টা,’ বলে সে আঙুলের কড়ের প্রথমটা গুনল সাইফার রিং, বলা হয়ে থাকে এটাতে এমন সব সিম্বল আঁকা রয়েছে—ইতিহাসের সেরা জ্ঞানীরা নাকি এগুলো অঙ্কন করেছে, আর সব সিম্বল একেকটা গোপন রহস্যকে ধারণ করে,’ বলে সে তার আঙুলের আরেকটা কড় গুনল। ‘দুই, লিগ্যাসি রিং, এটা নামি বিশেষ এক ধরনের ধাতু দিয়ে তৈরি—যেটা নাকি কোনো এক ধূমকেতুর লাভা থেকে তৈরি,’ বলে রুশো কাঁধ ঝাঁকাল। ‘আসলে নাকি প্রতিটা রিংই বিশেষ ধাতু দিয়ে তৈরি।’

‘এরপর,’ বাশারের কিছু একটা মনে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সামিরা প্রশ্ন করাতে সেদিকে মন দিল বাশার।

‘সার্পেন্টস এনিগমা তো আমাদের হাতেই রয়েছে,’ বলে রুশো টেবিলের ওপরে থাকা এভিডেন্স ব্যাগের ভেতরে থাকা রিংটা দেখাল। ‘এরপর রয়েছে, এয়ারলুমস ব্যান্ড। এই রিংটার সঙ্গেও গ্রহ-নক্ষত্রের বিষয় জড়িয়ে রয়েছে। কোনো একটা নাক্ষত্রিক ঘটনার সময়ে এটা বানানো হয়েছে, যে কারণে এটার নাকি বিশেষ পাওয়ার রয়েছে। এটা নাকি কোনো একটা গোত্র বংশধরা সঙ্গে পাস করেছে। যে কারণে এটাকে এয়ারলুমস ব্যান্ড বলে। পরেরটা, আর্কটিক সার্কেল। এটা নামি সময়ের ধারক ও বাহক, কে বা কারা বানিয়েছে সেটা জানা নেই, তবে এটার সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন সিম্বল এবং সবসময়ই বিশেষ এক গোত্রের ব্যাপারে বলা হয় এটার সঙ্গে। পঞ্চমটা হলো নিওফিলিক ল্যুপ, বলা হয়ে থাকে সেটা নাকি স্বয়ং দেবতারা বানিয়েছিল তাদের পরিচায়ক হিসেবে, সঠিকভাবে জানা না গেলেও আধা মানুষ আধা দেবতাদের নাম জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে। আর সবশেষটা হলো সলিসটিক রিং, বলা আমাদের বর্তমান সভ্যতারও আগের হারানো কোনো এক সভ্যতাকে রিপ্রেজেন্ট করে এই রিং—’

রুশোকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বাশার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই জয়া সরকার থামিয়ে দিল দুজনকেই। ‘এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি। পরে ভুলে যেতে পারি। যে নামগুলো বলা হয়েছে এগুলো ইংরেজি নাম, মানে

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

এগুলোকে ওয়েস্টে বা পপুলার কালচারে এই সব নামে ডাকা হলেও এগুলোর মিথ ছড়িয়ে রয়েছে প্রায় সব সভ্যতা, কালচার এবং ভাষায়। যেমন উদাহরণ হিসেবে দুয়েকটার ভারতীয় নাম আমি বলতে পারি। এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ায় হারলুমস ব্যান্ডকে ক্লা হতো রামিস সমৃদ্ধি—’

লিগ্যাসি রিংকে সুরিয়াভানশি প্যাচ—

সার্পেন্টস লিগ্যাসিকে নাগা রহস্য আত্মুষ্টি—’

‘আচ্ছা বুঝেছি, ব্যাপক জ্ঞান প্রাপ্তি হলো। প্রশ্ন হলো—এই রিংগুলো নিয়ে তোমরা প্রথমে বললে এগুলো নানা এলিমেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করে। এরপরে নানা নাম বললে, কোনটা কোন জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করে, সেটা বোঝার উপায় কি?’

‘এটা আসলে নির্দিষ্টভাবে জানা নেই। এগুলো সে বাস্তবে আছে, সেটাই তো জানা ছিল না।’

‘মানুষ এসব গালগল্প বিশ্বাস করে?’ ইনসপেক্টর রবিউল বলে উঠল।

‘মার্ভেলের সিনেমা দেখেছেন?’ রুশো মৃদু হেসে বলে উঠল। ‘দুনিয়ার লাখ লাখ তরুণ-বুড়োকে ইনফিনিটি স্টোনের গল্পো শুনিয়ে ওরা যদি বিলিয়ন বিলিয়ন জ্বালের ব্যবসা করতে পারে। তাহলে আর্কিওলজি ও অ্যান্টিকের জগতে গল্প প্রচলিত থাকতে সমস্যা কোথায়, আর এই জগৎ কীভাবে কাজ করে তার ব্যাপারে ঋনিক ধারণা তো জয়া আপা দিয়েছেই।’

‘আমার প্রশ্ন সেটা নয়,’ বাশার ওদের কথা শুনতে শুনতে তার হাতে থাকা ছোট ডায়েরিতে কিছু একটা লিখছিল। ‘আমি একটা সিরিয়াস পয়েন্ট আবিষ্কার করেছি। সবাই মন দিয়ে শুনবেন, আমার ধারণা এখন আমি জানি রিফাতের অপহরণকারীরা কেন এই রিং আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে,’ বলে সে মাথা নাড়ল। ‘আমার বিলিভ, ওরা চায় আমরা বাকি রিংগুলো খুঁজে বের করি এই সংশ্লিষ্ট কিছু একটা রয়েছে—যেটা খুঁজে বের করার জন্যই সম্ভবত ওরা রিফাতকে অপহরণ করেছে এবং সেটাই আমাদের বের করতে হবে। প্রশ্ন হলো—কীভাবে?’ বাশার ড্র নাচিয়ে জানতে চাইল সবার কাছে। বিশেষ করে জয়া সরকারের কাছে।

সবাই চুপ, করণীয় জানে কিন্তু কীভাবে করতে হবে—সেটা জানা নেই, এমন বিষয় তো মানবসভ্যতায় নতুন কিছু না। ‘একটা ওয়ে হতে পারে। আমি জেলে গেছি তো খুব বেশিদিন হয়নি, আমি আমার অ্যান্টিকের কন্টাক্টগুলোতে একটু নাড়াচাড়া করে দেখতে পারি। খবর ছড়িয়ে দিতে পারি যে একটা সিগনেট রিং মার্কেটে এসেছে, সেটাকে টোপ হিসেবে ধরে—’

‘আপনাকে এত কষ্ট করতে হবে না,’ ওদের অবাক করে দিয়ে টমি বলে উঠল। ‘আপনারা যখন আলোচনা করছিলেন, আমি এরই মধ্যে ঠিক সরাসরি না হলেও ওই ধরনের একটা কাজই করেছি,’ বলে টমি চোখ তুলে তাকালে।

সিপাহী

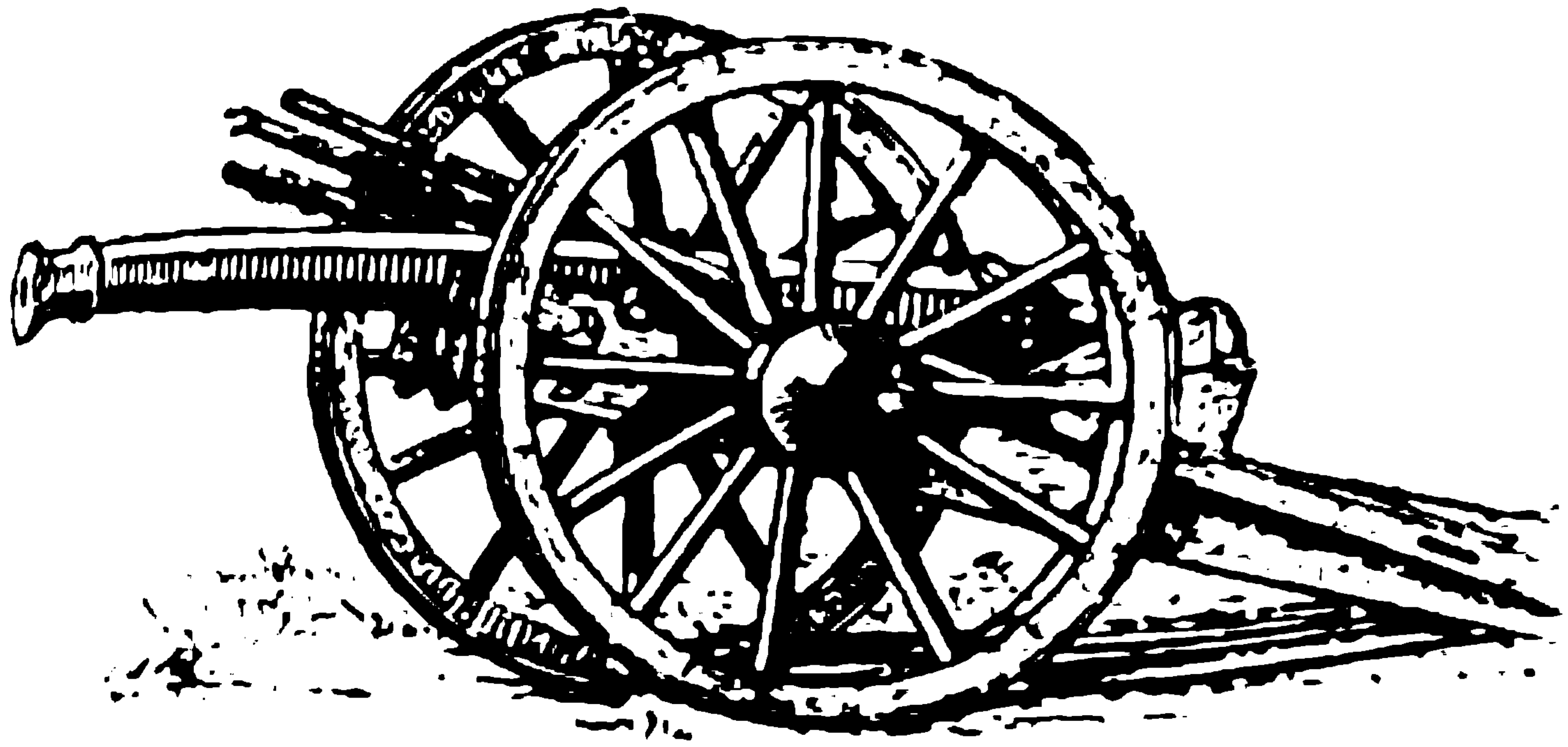
‘ব্যাপারটা জটিল কিন্তু অত বিস্তারিত যাব না—কিন্তু আপনারা তো জানেন ডার্কওয়েবে কী কী হয়। অ্যান্টিক চোরাচালানির একটা বড় অংশ কিন্তু ওখানেই ঘটে। আপনারা নামগুলো বলার সময়ে সেগুলো নোট করে নিয়ে খানিকটা জাল বিছিয়েছি আমি। ওখানে নানা ধরনের আইডেনটিটি বানানো আছে আমার। মজার বিষয় হলো আমি ভেবেছিলাম অনেক ঘাটতে হবে আমাকে এবং অনেক কষ্ট করতে হবে এবং সময় লাগবে কিন্তু ঘাটতে গিয়ে শুরুতেই একটা নাম পেয়ে যাই—যেটা এগুলোর ব্যাপারে বেশ আগেই থেকেই আমরা জানি এবং সমস্ত ব্লু একটা নামের দিকেই নির্দেশ করছিল। সেখান থেকে নামটা নিয়ে আরেকটু ঘাটতে তাকে উদ্ধার করতে আমাদের খুব বেশি সমস্যা হয়নি। দেখুন—’ বলে সে ল্যাপটপটা ঘুরিয়ে দিল ওদের দিকে।

তার জিনে টাক মাথা সাদা চামড়ার একজন মানুষের চেহারা দেখা যাচ্ছে। চেহারাটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাশারের গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। ‘ডেভিড।,’ বলেই সে জয়া সরকারের দিকে তাকাল। জয়াও একইভাবে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। বেন ভূত দেখছে।

‘ডেভিড কে?’ খুব অস্থির হয়ে সামিরা জানতে চাইল।

‘ডেভিড হলো সেই লোক—আজ থেকে বেশ কিছুদিন আগে বাশার যার লাশ ময়মনসিংহের পুকুরের নিচ থেকে উদ্ধার করেছিল। যেটা থেকে এসব ঘটনার শুরু।’

‘এখন বুঝলাম কেন রিফাত অপহৃত হয়েছে এবং কেন এই কাহিনি আবার ময়মনসিংহে ফিরে এসেছে।’



অধ্যায় আটচল্লিশ

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
দিল্লি শহর, উত্তর ভারত

ঠিক যেই মুহূর্তে পিটারকে সৈনিকদের পাহারা চৌকির ভেতর থেকে ডাক দিল, সেই মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য প্রমদ গুনল কর্নেল। শেষ রক্ষা হতে হতেই আর হলো না। পিটার থেমে গেছে, তার মাথা আর শরীরের উর্ধ্বাঙ্গ ভালোভাবে কাপড় দিয়ে প্যাচানো হলেও তার চোখ দুটো খোলা। কর্নেল দেখল সে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকেই। ব্যাপারটা আরো সন্দেহজনক এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল দেখল সেই সৈনিক পিটারের দৃষ্টি অনুসরণ করে ওদেরও দেখতে দেখতে তার পাশের জনকে ইশারায় কিছু বলতেই সেই লোকটাও ফিরে তাকাল পিটারের দিকে। কর্নেল দেখল এভাবে হলে পুরো চৌকি সতর্ক হয়ে যাবে। কর্নেল ইশারায় পিটারকে না থেমে এগোতে বলল। পিটারও যেন ডাক শুনতে পায়নি এমনভাবে এগোতে লাগল ওদের দিকে।

কিন্তু এতে করে সৈনিকটা আরো সতর্ক হয়ে গেল এবং এবার আরো জোরে ডাক দিল পিটারকে থামার জন্য। কর্নেল দেখল চৌকির প্রায় সবাই সতর্ক হয়ে গেছে এবং প্রথম সৈনিক আলগোছে কাঁধ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসছে তার বন্দুক। পুরোপুরি দিশেহারা হয়ে এক পা আগে বাড়ল কর্নেল, সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করল পালোয়ান পেছন থেকে একটা হাত রাখল তার কাঁধে। ইশারা পরিষ্কার, পিটার যদি পড়ে সে একা পড়বে, কর্নেল এগোলে ওরা সবাই মারা পড়বে। এমন সময় এগিয়ে এলো সোলেমান। সে খানিক পিছিয়ে গিয়ে পিটারকে ধরে ঘুরিয়ে দিল, তারপর জোর করে ঠেসে বসিয়ে দিল মাটিতে। কর্নেল থেকে শুরু করে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে, সোলেমানের দিকে, করছে কী ছেলেটা। সে পিটারকে মাটিতে বসিয়েই এক দৌড়ে চলে গেল চৌকির কাছে। ওরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে হাত নেড়ে নেড়ে পিটারকে দেখিয়ে সে কিছু বলছে—কিন্তু সৈনিকদের হাবভাবে মনে

সিপাহী

হচ্ছে না তারা খুব একটা খুশি সোলেমানের কথা শুনে। হঠাৎ কর্নেল দেখল হেসে উঠল প্রথম সৈনিক, সে হাত নেড়ে পিটারকে দেখিয়ে কিছু একটা বলল, অন্যদের দেখাল তাকে, ঠিক সেই মুহূর্তে কর্নেল দেখল সোলেমান হাতের ইশারায় কর্নেলের দিকে দেখাল।

প্রমাদ গুনল কর্নেল, করছে কি ছেলেটা। বিপদের ঘোড়কে মাথায় তুলছে কেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে ততোধিক অবাক হয়ে দেখল চৌকির সৈনিকেরা সবাই পিটার আর তার দিকে দেখিয়ে হাসাহাসি করছে। প্রথম সৈনিক হাত নাড়তেই সোলেমান দৌড়ে এসে পিটারকে ধরে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ওদের কাছাকাছি আসতেই সোলেমান তাড়া দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'হাঁটো হাঁটো জলদি হাঁটো, একবার ছাড়া পাইছি পলাইতে হবে।'

'কিন্তু তুমি বললেটা কি ওদের?' কর্নেল যতটা সম্ভব দ্রুত বেগে হাঁটতে শুরু করেছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে মরে যাচ্ছে কৌতূহলে।

'আমি বলছি ওর চন্দ্রমার রোগ হইছে,' সঙ্গে সঙ্গে এই বিপদের মুহূর্তেও কর্নেলের মুখে হাসি চলে এলো। চন্দ্রমার একটা যৌনবাহিত রোগ, খুবই ছোঁয়াচে এই রোগ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার মিলিটারিতে রীতিমতো ভয়ংকর ব্যাপার। এখন সে বুঝতে পারছে, কেন ওরা পিটারকে সন্দেহ হওয়ার পরেও পরীক্ষা না করেই ছেড়ে দিয়েছে। মুখ টিপে হেসে উঠল কর্নেল।

'আমি খালি তার কথা না, বলছি আপনারও এই রোগ হইছে,' সোলেমান আর অন্যদের চাপা হাসি শুনে কর্নেলের মুখের হাসি গায়েব হয়ে গেল, সে কড়া গলায় সোলেমানসহ অন্যদের ধমক দিতে যাবে এমন সময় ঘটল ঘটনাটা।

চৌকি পার হয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত এগোনোর জন্য আড়াআড়িভাবে রাষ্ট্র পার হচ্ছে ওদের দলটা, এমন সময় একদল টহলরত ঘোরসওয়ারের দল অবগত হলো একেবারে ওদের সামনে। দলটা এমনভাবে বাঁক পেরিয়ে অন্যপাশের গলি থেকে বেরিয়ে এসেছে, ওরাও দলটাকে দেখতে পায়নি, দলটাও ওদের দেখতে পেল একেবারে শেষ মুহূর্তে। কলে দুটো দলই বলতে গেলে একেবারে শেষ মুহূর্তে দেখতে পেল একে-অপরকে। সবার সামনের ঘোড়সওয়ারের একেবারে মুখোমুখি এসে পড়ল কর্নেলের। ঘোড়ার ওপরে থাকা সৈনিক, যথাসম্ভব চেষ্টা করল কর্নেলকে বাঁচানোর জন্য। সর্বশক্তিতে রাশ টেনে ধরতেই ঘোড়াটা সামনের পা শূন্যে তুলে প্রাণপণ শক্তিতে ডাক ছাড়ল। কর্নেলের গায়ে না লাগলেও ঘোড়া এবং সওয়ারির তীব্র বাতাসের ধাক্কায় তার মাথা এবং মুখের আবরণ পুরোটাই খুলে গেল। ক্ষণিকের জন্য পুরো দলটা তাকিয়ে রইল সাদা চামড়ার কর্নেলের দিকে, সবচেয়ে অবাক হয়ে গেছে সামনের ঘোড়সওয়ার।

সবার আগে চমক কাটিয়ে উঠল কর্নেল, সে পিছিয়ে এলো দুই পা। কিন্তু ততোক্ষণে সামনের ঘোড়সওয়ার তার ঘোড়ার মতোই সর্বশক্তি দিয়ে চোঁচিয়ে

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

উঠছে। তার দলটা তো বটেই চৌকিতে থাকা সৈনিকরাও সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। সবে সবে। সবার আগে কাজে নামল অবশ্য কর্নেলই, পলকের ভেতরে একবার দলের অন্যদের দিকে তাকিয়ে সে পিস্তল বের করে সোজা গুলি করল প্রথম ঘোড়সওয়ারকে। লোকটা চোঁচিয়ে উঠেই পড়ে গেল, আর গুলির শব্দে ভড়কে গিয়ে ঠলঠল লাফ দিল ঘোড়াটা, সোজা গিয়ে পড়ল তার পেছনের জনের ওপরে। পালোয়ান ছিল ঠিক কর্নেলের পেছনে। কর্নেল সক্রিয় হতেই সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠেছে সে। তার মাথা ঢেকে রাখা বস্ত্রখণ্ডটা ফেলে দিয়ে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে রীতিমতো এক গর্জন ছেড়ে সামনে এগোল, মাথার ওপরে তুলে ধরেছে নিজের বিরাট লাঠিটা।

কেউ সাবধান হওয়ার আগেই সে লাঠিটা চালান সামনের দিকে। পালোয়ানের ঠিক বরাবর সামনে থাকা ঘোড়সওয়ার লাঠিটার বাড়ি এড়ানোর চেষ্টা করে শুয়ে পড়ল ঘোড়ার ওপরে, কিন্তু সে বুঝতে পারেনি পালোয়ান আসলে তাকে নয়, ঘোড়াকেই আঘাত করেছে। পালোয়ানের লাঠিটা সোজা গিয়ে আঘাত করল ঘোড়াটার শরীরের একপাশে, ভীষণ ব্রহ্মাধ্বনি ছেড়ে একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেল। আর তার ওপরে থাকা সৈনিকটা গিয়ে পড়ল তার পাশের ঘোড়সওয়ারের ওপরে। সোলেমান, পিটার আর ত্রিলোক তিনজনই অস্ত্র বের করে এনেছে। সোলেমান গুলি ছুড়ল সামনের দিকে, ত্রিলোক, পিটার আর কর্নেল গুলি করল চৌকির দিকে। ক্ষণিকের জন্য কর্নেল দেখতে পেল ওদের সামনের এবং পেছনের দুই দলই নিজেদের সামলাতে ব্যস্ত, সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে উঠল, 'সবাই দৌড়াও, ব্যাংকের দিকে,' বলেই সে নিজের হাতের ছোট বন্দুক পিঠের ওপরে চাপিয়ে প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করল ব্যাংকের দিকে। তাকে অনুসরণ করল অন্যরা।

কর্নেল জান দিয়ে দৌড়াচ্ছে। সে খুব ভালো করেই জানে প্রাথমিকভাবে তারা দুটো দলকে চমকে দিতে পারলেও ওদের আসলে খুব বেশি সময় লাগবে না নিজেদের সামলে নিতে, এই সময়ের ভেতরে ওদের সরে পড়তে হবে যতটা সম্ভব। কর্নেল এক দৌড়ে রাস্তাটা আড়াআড়ি পার হয়ে চলে এলো ব্যাংক ভবনের ফটকের কাছাকাছি। লাফিয়ে উঠে ধরে ফেলল আটকে রাখা ফটকের ওপরের অংশ। নিজের শরীরটাকে টেনে তুলছে এমন সময় পেছন থেকে গুলি হলো। কর্নেল দেখল তার ডান হাতের তিন ইঞ্চি দূরে গুলিটা লেগে চলটা ওঠাল কাঠের ফটকের। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ছেড়ে দিল সে, মাটিতে পড়ে গেল। ব্যথা পেলেও, সেটার মাত্রা খুব বেশি না। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে গড়ান দিয়েই শুয়েই পরিস্থিতি জরিপ করে নিল সে। ওদের দলের অনেকেই চলে এসেছে কাছাকাছি, কিন্তু শত্রুরাও প্রস্তুত হয়ে গেছে। চৌকি থেকে গুলি চালাতে চালাতে বেরিয়ে আসছে সৈন্যরা, আর অন্য দলটাও এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। কর্নেল, প্রমাদ ওনল, সময় নেই, তাদের অস্ত্র

সিপাহী

গুলিও নেই। এই অবস্থায় ছির হয়ে গুলি করতে গেলে মরতে হবে। এখন একটাই উপায়—পালাতে হবে। ‘সবাই ফটকের ওপাশে চলো, যেভাবে পারো,’ বলেই সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই ফটকের ওপরের অংশ ধরে ফেন্সল আবারো। এখন সেভাবে গুলি আসছে না। হয় ওরা গুলি ভরতে ব্যস্ত আর না হয় হাতেনাতে ধরতে চাচ্ছে ওদের।

কর্নেল দেখল এটাই সুযোগ, সে লাফ দিয়ে ফটক ধরেই শরীরটাকে টেনে তুলে ফেন্সল ওপরে। নিজের শক্তি দেখে নিজেই খানিক অবাক হয়ে গেল, আসলে জানের ভয় মানুষকে দিয়ে কী না কি করিয়ে নিতে পারে। ফটকের ওপরে উঠে কোনোমতে নিজেকে টেনে তুলেই ওপাশে প্রায় ছেড়ে দিল সে। ফটকটা খুব উঁচু নয়, তার ওপরে সে পড়েছে বালিমাটির ওপরে, ফলে ব্যথা পেলেও নিজেকে দাঁড় করিয়ে ফেন্সতে খুব বেশি সমস্যা হলো না কর্নেলের। উঠে দাঁড়িয়েই সে একবার ফটকের দিকে দেখল তারপর ফিরে তাকাল ব্যাংক ভবনটার দিকে। রিক্ত পরিত্যক্ত ভবনটা যেন তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। একে একে নেমে আসছে তার লোকেরা। এখন ওপাশ থেকে চিংকার-চোঁচামেচি ভেসে এলো, গুলির শব্দ আর শোনা যায়নি। নিজের লোকদের দিকে একবার ইশারা করেই কর্নেল দৌড়াতে শুরু করল ভবনটার দিকে। বাকিরাও যে এগিয়ে আসছে সেটা সে বুঝতে পারছে কিন্তু দেখার উপায় বা সময় নেই। ভবনটার দেউরির কাছে পৌঁছে সে ভেতরে ঢুকে পড়ল। আধো অন্ধকারের ভেতরে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। হাঁটু গেড়ে বসে দম নিতে লাগল। সোলেমান আরো আগেই পৌঁছে গেছে, পালোয়ানও, পিটার আর ত্রিলোককে দেখে স্বস্তির সঙ্গে দম নিতে নিতে হাত নেড়ে কাছে আসার নির্দেশ করল কর্নেল।

‘ওই ছেলেদুটো কই, বদু আর মনা?’ সে দম নিতে নিতে জানতে চাইল।

‘ওরা শুরুতেই পালাইছে,’ সোলেমান বলে উঠল। ‘আমগো ওপরে আক্রমণের সময়ে প্রথমেই ওরা পাশের আরেক গলিতে ঢুইকা গিয়েছিল।’

‘ভালো, ওদের কোনো বিপদ না হোক,’ কর্নেল অনেকটাই দম ফিরে পেয়েছে। ‘সবাই মন দিয়ে শোন এবং দ্রুত কাজ করতে হবে আমাদের,’ বলে সে বাইরের দিকে দেখাল। ‘ওরা আসবেই এবং আসতে খুব বেশি সময় লাগবে না। খুব অল্প সময় আছে আমাদের হাতে, এর ভেতরেই এই ভবনে দ্রুত চোখ বুন্ডিয়ে আমাদের সরে পড়তে হবে পেছনের রাস্তা দিয়ে।’

‘এত বড় ভবন, এই অল্প সময়ে অল্প কয়জন লোক নিয়ে কীভাবে পরখ করা সম্ভব?’ পিটার প্রশ্ন করল। অন্যদের চোখে-মুখেও একই জিজ্ঞাসা।

কর্নেল দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছে। ‘এক কাজ করো। আমার ধারণা, এই ব্যাংক ভবনের প্রথম দুই তলা মূল ব্যাংক ছিল। মূল ব্যাংকে ডিক্টরের থাকার বা সংশ্লিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম।’

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

‘আমি শুনেছি, ওরা ব্যাংক ভবন নিরাপদ বলে ব্যাংকের ওপরের দুই তলায়
ব্রহ্ম নিয়েছিল,’ আবারো পিটার বলে উঠল।

‘ভেরি ওড, আমরা ওপরের দুই তলায় খুঁজে দেখব,’ বলেই সে হাত নেড়ে
দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিল। ‘জলদি জলদি, যেকোনো কিছু চোখে পড়লে
আমাকে জানাবে,’ বলতে বলতে কর্নেল দৌড়াতে শুরু করেছে। পুরনো ব্যাংক
ভবনটা দেখে মনে হচ্ছে এখানে এক সময় খুব সুন্দর সাজানো-গোছানো
অফিসভবন থাকলেও এখন এটার ওপর দিয়ে স্রেফ ঝড় বয়ে গেছে। কর্নেল পুরনো
কিন্তু মজবুত ভবনটার সমান সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দিকে প্রায় দৌড়ে উঠতে লাগল।
তৃতীয় তলায় পৌঁছে, সর্বাধিক ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়ে সে নিজেও দেখতে শুরু
করল চারপাশে। এই তলাটা প্রায় পুরোটাই বসবাসের জায়গা ছিল, সম্ভবত ভবনের
কর্মচারীরা বসবাস করত এখানে। এখানে যে অনেক মানুষ ছিল, এটা দেখেই
মোটামুটি অনুমান করা যাচ্ছে, সেই সঙ্গে এটাও অনুমেয় যে এখানকার মানুষেরা
খুব দ্রুত এবং অল্প সময়ের ভেতরে জায়গাটা ছেড়ে পালিয়েছে। প্রথম কামরাটায়
কিছু না পেয়ে কর্নেল পরেরটায় গেল, সে পায়ের আওয়াজে বুঝতে পারছে, সবাই
একটার পর একটা কোনা দেখে বোঝার এবং খোঁজার চেষ্টা করছে। কয়েকটা
কামরা দেখে কর্নেল রীতিমতো হতাশ হয়ে পরের কামরায় প্রবেশ করল, তার সঙ্গে
সঙ্গে অন্যদিক থেকে ঢুকল পিটার। কর্নেল ভেতরে ভেতরে ঠিক যতটা হতাশ বোধ
করছিল, পিটারকে দেখে ঠিক ততটাই উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। সে এগিয়ে এসে
কর্নেলের হাতে কিছু একটা ধরিয়ে দিল।

‘কি এটা?’ প্রশ্নটা করেই কর্নেল বুঝতে পারল জিনিসটা কি। এক টুকরো
কাপড়, জিনিসটা বিশেষ কিছু না, কিন্তু এই কাপড়ের টুকরোটাই প্রমাণ করে
ভিক্টর এখানে ছিল, সেই সঙ্গে এটাও প্রমাণিত যে খলিফা মিথ্যা কথা বলেনি।
কারণ এই বিশেষ ধরনের কাপড়টাই খলিফা ওদের দেখিয়েছিল। কর্নেল কাপড়ের
টুকরোটা দেখে শিস দিয়ে উঠল। ‘এটা প্রমাণ করে ভিক্টর এখানে ছিল। কিন্তু
আমাদের আরো বেশি কিছু বের করতে হবে। দুজন মিলে কামরা থেকে বেরিয়ে
আসছে, কেউ একজন চিৎকার করে উঠল। ‘ত্রিলোক,’ বলেই দুজনে দৌড়ে তৃতীয়
তলায় কিছু না পেয়ে চলে এলো চতুর্থ তলায়।

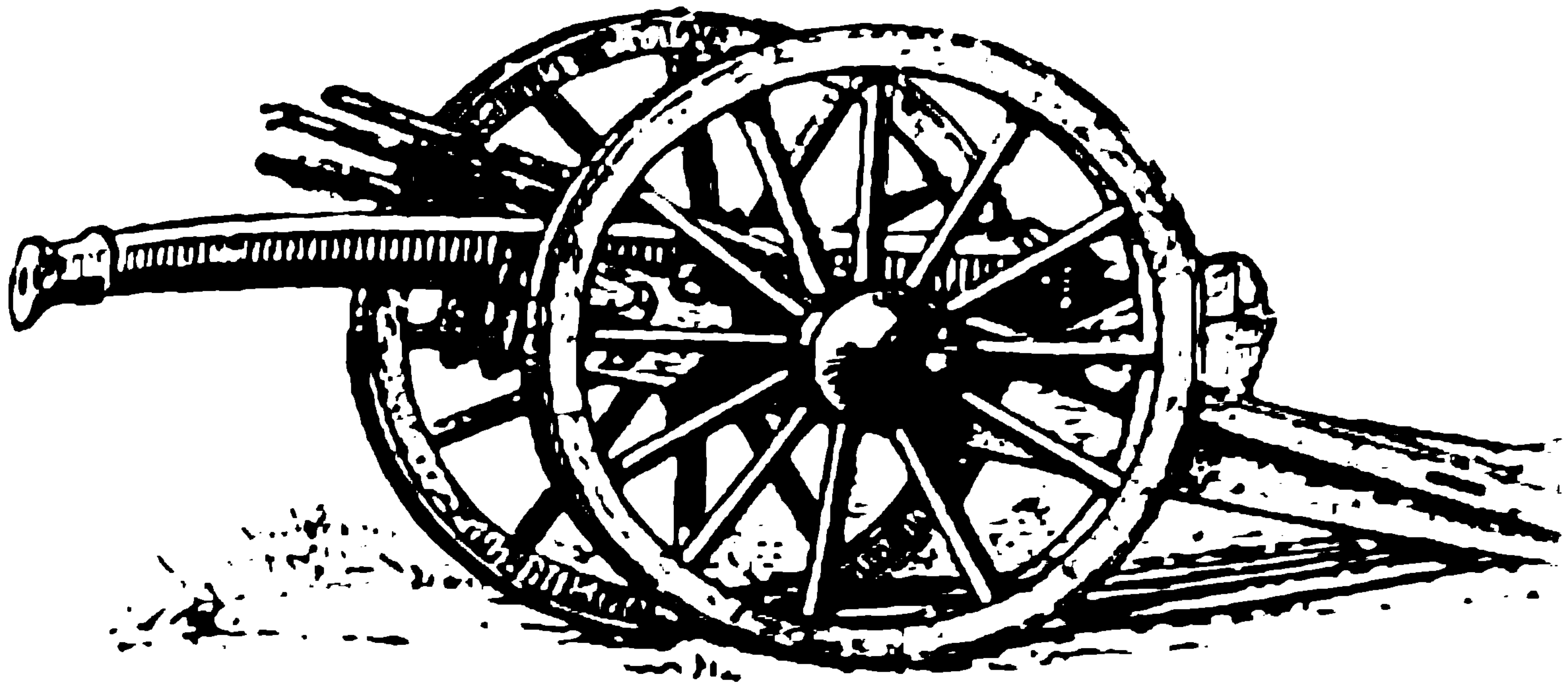
‘কোথায় তোমরা?’ কর্নেল চতুর্থ তলায় উঠে চিৎকার করে জানতে চাইল ওরা
আছে কোথায়। ত্রিলোকের গলার স্বর শুনে সেদিকে দৌড়ে গিয়ে বড় একটা
কামরায় প্রবেশ করল ওরা। এই কামরাটা দেখেই বোঝা যায়, এখানে অনেকেই
ছিল এবং সম্ভবত, একটা বড় দলের মানুষের চিকিৎসা চলছিল এখানে। কারণ

সিপাহী

এখনো নানা ধরনের চিকিৎসার সরঞ্জাম ছড়িয়ে রয়েছে এখানে-সেখানে। 'ভিক্টর এখানেই ছিল এবং সে এখানে আশ্রয়প্রাপ্তদের চিকিৎসা করছিল,' কর্নেল আনমনে বলে উঠল, সে তখনো নিচের দিকে দেখছে, এমন সময় পিটার কর্নেলের কনুই বামচে ধরল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে কর্নেল সামনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল, সবাই তাকিয়ে রয়েছে কামরার বড় দেয়ালের দিকে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কর্নেল, যেই মুহূর্তে জিনিসটা আবিষ্কার করতে পারল সে।

কি এইটা? কেউ একজন জানতে চাইল।

কর্নেল এখনো তাকিয়ে রয়েছে দেয়ালের দিকে। সে আনমনেই বলে উঠল, 'ভিক্টর জানত আমি আসব তাকে খুঁজতে, সে আমার জন্য বার্তা রেখে গেছে।'



অধ্যায় ঊনপঞ্চাশ বর্তমান সময় মিরবাড়ি সড়ক, কলেজ রোড ময়মনসিংহ

‘তুমি কি নিশ্চিত, এই বাড়িই?’ বাশার জানতে চাইল তার পাশে বসা জয়া সরকারের দিকে।

‘দুই শ ভাগ নিশ্চিত এইটাই,’ জয়া সরকার তার নাক-মুখ দিয়ে চিমনির মতো ঝোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে যেতে লাগল। যদিও তার গলায় ভয়াবহ রকমের ক্লকিডেন্ড কিন্তু তার পরেও সে চিপের অন্যপাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে একবার বাড়িটা দেখে নিল। ‘আমরা নামব?’ বলে জয়া সরকার শেষ হয়ে আসতে থাকা সিগারেটে শেষ টান দিয়ে মোথাটা ছুড়ে ফেলে দিল জিপের বাইরে।

‘এক মিনিট,’ বলে বাশার তাকে থামতে বলে ইশারায় আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগাকে নামতে বলল। দুজনেই মাথা নেড়ে নেমে গেল জিপ থেকে। ‘ওরা হালকা রেকি করে আসুক, এরপর আমরা নামব,’ জয়া সরকার মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে থেমে গেল। ‘এখন আমরা খানিক অপেক্ষা করব।’

বলে বাশার বাইরের দিকে দেখল। কলেজ রোড এলাকাতেই বেড়ে উঠেছে সে, কিন্তু সেই সময়ের কলেজ রোড আর আজকের কলেজ রোডে অনেক পার্থক্য। ওরা যখন হামিদ উদ্দিন রোডে থাকত, এই এলাকার প্রতিটা মানুষ পরিচিত ছিল। রাত্তর বের হলে অনন্দমোহন কলেজে নতুন আসা স্টুডেন্টরা বাদে একটা অপরিচিত চেহারা দেখা যেত না। আর এখন পরিচিত কোনো মানুষই নেই। এত এত বাড়িঘর আর দোকান হয়েছে, মানুষ হাঁটার জায়গা নেই। রাত্তর বের হলে কেমন জানি মনে হয় বিভিন্ন সব মাথার ওপরে ঢলে পড়বে। এই নতুন কলেজ রোডে কেমন জানি দম বন্ধ লাগে বাশারের। জিপ থেকে নেমে রাত্তর ওপরে দাঁড়াল বাশার। সময় বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতে যাচ্ছে মাত্র। বিকেলের শেষ আলো

সিপাহী

বিদেয় নিয়ে সন্দের অঙ্ককার নেমে আসছে প্রিয় কলেজ রোডের বুকে। ওরা এখন যেখানে অবস্থান করছে, এই জায়গাটা আনন্দ মোহন কলেজ পার হয়ে অ্যাকাডেমির দিকে এগোতে হাতের বামে। এদিক দিয়ে সোজা আরেকটু এগোলেই রেললাইন পড়ে। বাশারের মনে পড়ে গেল, এই সব রেললাইনে বসে স্কুল-কলেজ ফাঁকি দিয়ে কত আড্ডা দিয়েছে ওরা। সেই সব দিন আর সেই সব মানুষ কোথায় হারিয়ে গেল সব। অথবা কে জানে, সবই আছে আগের মতো, হয়তো সে হারিয়ে গেছে অন্য কোথাও।

কনস্টেবল আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগাকে ফিরে আসতে দেখে বাশার বর্তমানে ফিরে এলো। 'কি অবস্থা?'

'স্যার, সব ঠিকঠাক আছে, কোনো সমস্যা চোখে পড়ল না। কিন্তু যা শুনলাম, তাতে তো মনে হলো খুব একটা কাজ হবে না,' আবদুল্লাহ বলে উঠল।

'কেন?' বাশার ড্র কুঁচকে জানতে চাইল।

'কারণ, হয় তো এইখানে নাই,' রমিজ দারোগা বলে উঠল।

'নেই মানে?' জিপের ভেতর থেকে নেমে এসেছে জয়া সরকার।

'এই প্রফেসর নাকি দেশেই নাই,' রমিজ দারোগা জানাল।

জয়া সরকার চোখ তুলে ফিরে তাকাল বাশারের দিকে। 'উপায় কি এখন, তবে কি একটা মেজর কু হাতছাড়া হয়ে গেল।'

নতুন বাজারের অফিসে, টমি এই সিগনেট রিংগুলোর সঙ্গে ডেভিডের সংযোগ আবিষ্কার করার পর পুরো কেসটা ভিন্ন একটা অ্যাংগেল পায়। এই ডেভিড হলো সেই লোক যার মাধ্যমে বহুবছর আগে এসব ঘটনার সূত্রপাত। ডেভিড একজন আন্তর্জাতিক অ্যান্টিক চোরাচালানি, বলা যায় অন্যতমদের একজন। তার পেছনে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বড় বড় অথরিটি রয়েছে। নেত্রপলিস এবং রেলিকের সবচেয়ে শক্ত খুঁটিদের একজন সে। এগুলো সবই অবশ্য অনেক পরে জানা যায়। সে নিজেই একজন আর্কিওলজিস্ট হিসেবে পরিচয় দিয়ে এক শিক্ষকের মাধ্যমে জয়া সরকার এবং পরে রিকাত মজুমদারের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তাদের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন দেখিয়ে ময়মনসিংহের স্থানীয় এক জাদুঘরের এক্সিবিশনের আয়োজন করে, যেটার দায়িত্বে ছিল রিকাত। সেখানে ভয়াবহ ডাকাতি হয় এবং সেখান থেকে একটা পুরনো কালীমূর্তি হারিয়ে যায় এবং ডেভিড নিজেও হারিয়ে যায়। পরে বাশার তাকে খুঁজে পায় ময়মনসিংহের এক পুকুরের নিচ থেকে, বহু বছর পর। সেই কেসে বাশার এবং রিকাতের পরিচয় এবং সেখান থেকে জয়া সরকারের সঙ্গেও পরিচয়। কেসের এক পর্যায়ে ওরা জানতে পারে, ডেভিড আসলে নিজেই মিউজিয়াম থেকে জিনিসগুলো বের করিয়ে সে নিজেই ডাকাতি করিয়েছিল। আর্কিওলজিস্ট সেজে সে আসলে বহু পুরনো এক কালীমন্দির খুঁজে

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

বের করার জন্য ময়মনসিংহে এসেছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বহুবছর আগে ডেভিড যা জেনেছিল, ব্যাপার আসলে তারচেয়ে গভীর এবং বড়।

ডেভিডের সংযোগ আবিষ্কার করার পর বাশার প্রথম জয়াকে প্রশ্ন করে। 'তুমি ডেভিডের ব্যাপারে কি জানো?'

জয়া সরকার কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানায়, সে যা জানে সবই বাশার জানে। এর বাইরে এমনকি সে নিজেও আসলে খুব বেশি জানে না।

'সেক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন ডেভিডের সঙ্গে তোমার আগে পরিচয় হয়েছিল না রিফাতের?'

'আমার,' জয়া সেই পুরনো অতীত মনে করার চেষ্টা করছে।

'আচ্ছা, আমি এটা জানি রিফাতের সঙ্গে ডেভিডের পরিচয় হয়েছিল একজন শিক্ষকের মাধ্যমে। তোমার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল কীভাবে?' বল বাশার মাথা নাড়ল। 'আমি তোমাকে প্রশ্নটা বুঝিয়ে বলি। ডেভিড একজন আন্তর্জাতিক অ্যান্টিক ডোরাচালানি দলের অন্যতম প্রভাবশালী লোক, এটা তো পরিষ্কার। কিন্তু সে যখন বাংলাদেশে ঢোকে, সে কোনো না কোনো মাধ্যমে তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। সেই সোর্সটা কি?'

'আমি তোমার প্রশ্ন প্রথমেই বুঝতে পেরেছি। সেই সোর্সটা খুব পরিষ্কার এবং ক্রিয়ার,' বলে সে একটু থামল। 'রিফাতের সঙ্গে ডেভিড যেই মানুষটার মাধ্যমে পরিচিত হয়েছিল, আমার সঙ্গেও সে একই মানুষের মাধ্যমে পরিচিত হয়েছিল। হুদলোক আনন্দমোহনের একজন শিক্ষক। ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।'

'নাম কি তার?' বাশার জানতে চাইল।

'প্রফেসর হামিদুর রহমান,' জয়ার কথা শুনে বাশার টমির দিকে ইশারা করল হুদলোকের ডিটেইল বের করার জন্য। জয়া বলে চলেছে। 'তার ডিটেইল বের করার প্রয়োজন নেই। তাকে ময়মনসিংহ শহরের সবাই চেনে। পরিচিত মানুষ।'

'তাহলে এই সব কাহিনি এর আগে যখন হলো, সেই সময়ে এই মানুষটার কথা তো কখনোই শুনলাম না,' বাশার একটু অবাক, কারণ এই মানুষটার নাম এর আগে কখনোই শোনেনি ও কোনো কেসে।

'তার কারণ প্রয়োজন পড়েনি,' জয়া সরকার বলে উঠল। 'আর উনার মাধ্যমে স্রেফ পরিচয় হয়েছিল আমাদের। এর বাইরে উনার কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে আমরা কেউই ভাবিনি আসলে।'

'আগের কথা বাদ দাও,' সামিরা বলে উঠল। 'ডেভিড কি মৃত, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই তো?'

'দুই শ ভাগ নিশ্চিত, আমি নিজে তার লাশ তুলে এনেছিলাম এক পুকুরের নিচ থেকে। তবে তার একটা কাজিন রয়েছে, জন, যে আগের কেসে ধরা পড়েছিল।'

সিপাহী

‘তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়াল? আবাবো সামিরা জানতে চাইল। ‘আমরা তাহলে কোন অ্যাংগেল ধরে সামনে এগোব? এই প্রফেসর, নাকি, ডেভিডের পরিচিত ওই লোক।’

‘আমার মনে হয় দুটোই করতে হবে,’ বাশার বলে উঠল। ‘একদিকে স্বোচ্চ লাগাতে হবে জনের বিষয়ে, তাকে কোনো কারাগারে রাখা হয়েছে নাকি, এক মিনিট তার অ্যাংগেল ভুলে যেতে হবে, কারণ সে ইন্টারপোলের লিস্টেড অপরাধী ছিল, আর সম্ভবত তাকে ইন্টারপোলের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে অনেক আগেই। তবুও নিশ্চিত হতে হবে।’

‘প্রয়োজন নেই বস,’ টমি বলে উঠল। ‘তাকে বহু আগেই ইন্টারপোলের হাতে ভুলে দেওয়া হয়েছে। আমি নিজে ইনভলভড ছিলাম ওই প্রসেসের সঙ্গে।’

‘তাহলে বাকি রইল আনন্দমোহনের এই প্রফেসর,’ বাশার তুড়ি বাজিয়ে বলে উঠল। ‘এই লোকের কাছে অবশ্যই কিছু না কিছু পাওয়া যেতে পারে।’

‘আমি তার বাসা চিনি, কলেজ রোডের মির বাড়ি সরকে তার নিজের বাড়ি রয়েছে।’

‘ভেরি গুড, চলো তাহলে,’ বলে ওরা মোটামুটি প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কলেজ রোডের উদ্দেশে। এরপর এখানে পৌঁছে আগে আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগাকে পাঠায় কথা বলার জন্য।

‘শোন, এত কথা বলে বুঝে লাভ নেই কাজে নামতে হবে,’ জয়া সরকার বলে উঠল। ‘চলো দেখি হামিদ স্যার আছে কি নেই।’

জয়া এগিয়ে যেতে শুরু করতেই বাশার ইশারা করল অন্যদের নেমে যাওয়ার জন্য। জয়া সামনে এগোচ্ছে, বাকিরা অনুসরণ করল তাকে। দুটো বাড়ি পার হয়ে তিন নম্বর বাড়িটার সামনে গিয়ে গেটে নক করতেই দারোয়ান এসে গেট খুলে দিল। ‘হামিদ স্যার আছেন?’ দারোয়ানের কাছে জানতে চাইল জয়া সরকার।

‘স্যারে তো দেশে নাই, তার মেয়ে থাকে কেনাডা, সেও ওইখানে চইলা গেছে অনেক আগে। আপনারা কারা? স্যারের কি প্রয়োজন?’

দারোয়ানের কথার জবাব না দিয়ে জয়া সরকার বাশার আর সামিরার দিকে তাকিয়ে একবার কাঁধ ঝাঁকাল। ‘এখন উপায় কি?’ রুশো প্রশ্ন করল।

বাশার দ্রুত ভাবার চেষ্টা করছে। ‘এক কাজ করি, আমরা আসলে উনার কাছে কী বুজতে এসেছি? ডেভিডের ব্যাপারে তথ্য, রাইট। উনি যেহেতু নেই সেক্ষেত্রে দুটো উপায় থাকতে পারে। এক, উনার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম থাকলে, দারোয়ানের থেকে সেটা নিয়ে উনার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে,’ বলে বাশার থামল। অন্যদের মতামত বোঝার চেষ্টা করছে সে। ‘আরেকটা উপায় হতে পারে, যদি আমরা তাঁর ফ্ল্যাট নিজেরাই খুঁজে দেখতে পারি। প্রশ্ন হলো উনি কি

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

এখানেই থাকতেন বা উনার জিনিসপত্র সব কি এখানেই আছে কি না?’

‘উনি এখানেই থাকতেন,’ জয় বলে উঠল। ‘আমি উনার এই বাসাতেই অসংখ্যবার এসেছি। কিন্তু এখন এখানে উনার কোনোকিছু আছে কি না কে জানে। তোমরা অপেক্ষা করো আমি দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলে আসি।’

জয়া সরকার চলে যেতেই বাশারের দিকে তাকিয়ে সামিরা বলে উঠল। ‘কি মনে হয় কোনো কাজ হবে?’

বাশার প্রথমে কিছু বলল না। ‘দেখা যাক, এটাতে কাজ না হলে অন্য রাস্তা বের করতে হবে,’ বলে সে মোবাইল বের করে সময় দেখল, শুধু মনে হচ্ছে সময় নষ্ট হচ্ছে। রিফাত কী অবস্থায় আছে কে জানে। বাশার চোখ তুলে দেখল জয়া ফিরে আসছে। ‘কি অবস্থা, কি বলল দারোয়ান?’

‘হামিদ স্যার কানাডা গেছে বেশ কয়েক বছর। তবে, স্যার চলে গেলেও উনি কিংবা উনার পরিবারের লোকজন বছর বছর আসেন এবং এলে এখানেই থাকেন। উনাদের একটা ফ্ল্যাট খালিই রাখা থাকে এই জন্য।’

‘মানে যদি আমরা আশা করি, হামিদ স্যার বা ওই সংক্রান্ত কিছু বের করার চেষ্টা করতে চাই, তাহলে উনার ওই ফ্ল্যাট সার্চ করতে হবে। কিন্তু সেটা কীভাবে আয়োজন করা সম্ভব। উনার বিরুদ্ধে তো কোনো ইস্যু নেই যে আমি সার্চ ওয়ারেন্ট আনতে পারব। আর সেটা করতেও সময় লাগবে আবার সেটা না হলে আরো—’

‘আমরা স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখতে পারি উনি যদি অনুমতি দেন তবে—’

‘যদি না দেন তাহলে কী করবেন?’ রুশো ঠান্ডা গলায় জানতে চাইল। ‘যদি উনি মানা করে দেন তো একেবারেই খেমে যাবে সব।’

‘স্যার, অনুমতি দিলে আমি একটা ব্যবস্থা করি,’ রমিজ দারোগ বলে উঠল।

‘আপনি, কীভাবে?’ বাশার খানিক অবাক হয়েই জানতে চাইল।

‘আরে স্যার, আপনার এত কথা জানার কাম কি?’ রমিজ দারোগা হেসে বলে উঠল।

বাশার কাঁধ ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিল, ‘উলটা-পালটা কিছু কইরেন না,’ রমিজ দারোগা দারোয়ানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বাশার পেছন থেকে বলে উঠল। রমিজ দারোগা উলটো হাত নেড়ে জানাল উলটা-পালটা কিছু করবে না সে।

বাশার, জয়া, সামিরা, আবদুল্লাহ আর রুশো দাঁড়িয়ে রয়েছে গেটের বাইরে। ভেতরে রমিজ দারোগা তা বলছে, একটা পুলিশের জিপ এসে থামল ওদের সামনে। ওটা থেকে ল্যাফ দিয়ে নেমে এলো ইনসপেক্টর রবিউল। ‘গরম খবর আছে স্যার, এখানে কি অবস্থা?’

সিপাহী

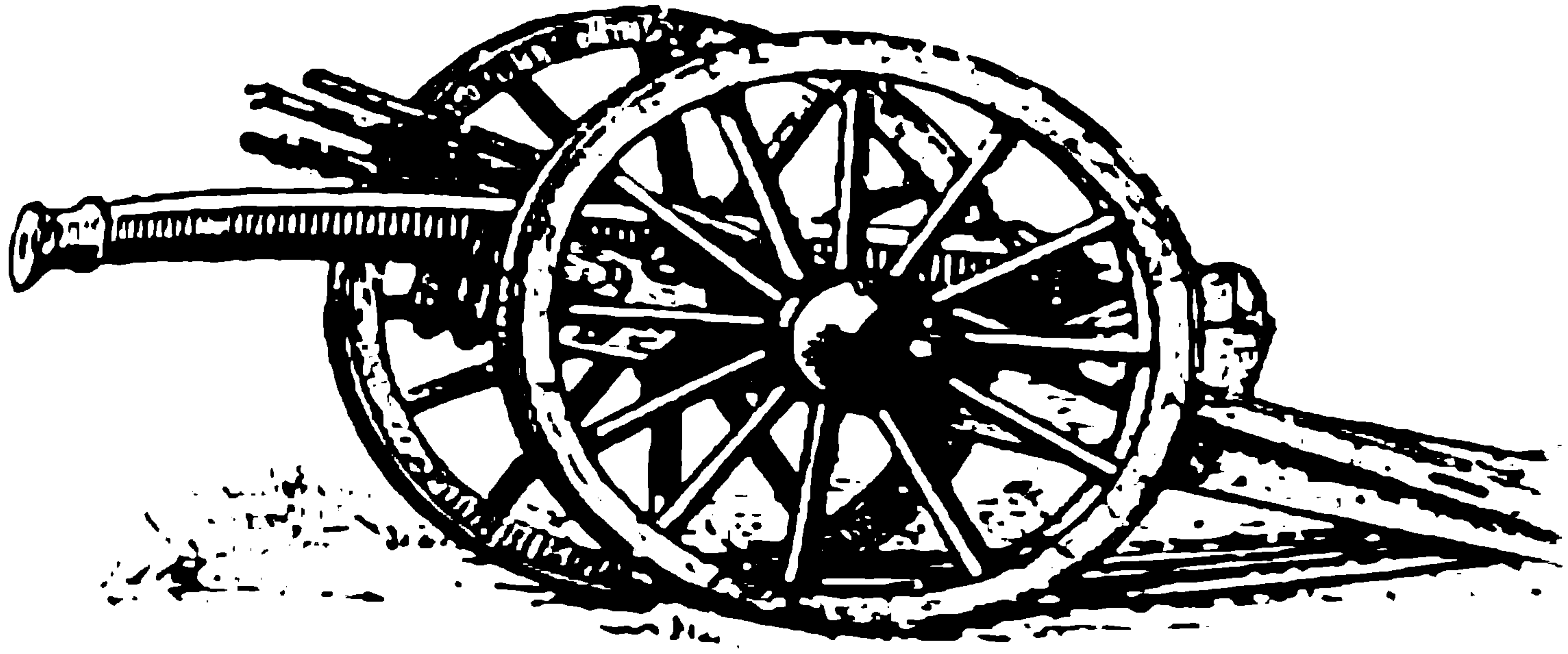
‘এখানকার অবস্থা ভালো না,’ বাশার বলে উঠল। ‘যার খোঁজে এসেছি সে কানাডা চলে গেছে বহু আগে।’

‘বলেন কি, তাহলে উপায় কি?’ ইনসপেক্টর রবিউলের প্রশ্নের জবাবে বাশার কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, হাসিমুখে রমিজ দারোগা এসে উপস্থিত হলো সেখানে, কিছু না বলে তার হাতের একটা চাবি দেখাল সে। ‘চলেন।’

‘কিন্তু কীভাবে?’ যে জয়া সরকার সবকিছুতেই তাচ্ছিল্যের ভাব দেখায় সে নিখাদ কৌতূহলের সঙ্গে জানতে চাইল।

‘আরে রমিজ মিয়া থাকতে আসলে কোনোকিছুর চিন্তা আছে নাকি,’ বলে সে বাশারের দিকে দেখিয়ে বলে উঠল। ‘বাশার স্যারেরে জিগান, মমিসিং শহরে—’

‘হয়েছে হয়েছে, চলেন,’ বাশার হাসিমুখে মৃদু ধমক দিয়ে বলে উঠল, আত্মরিক খুশি হয়েছে সে রমিজ দারোগার ওপরে।



অধ্যায় পঞ্চাশ
সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
দিল্লি শহর, উত্তর ভারত

এরকম টানটান উত্তেজিত অবস্থাতেও সবাই তাকিয়ে রয়েছে বিরাট হলঘরের মতো কামরাটার দেয়ালের দিকে। চুনকাম করা সাদা দেয়ালের বুকে বড় করে একটা চিহ্ন আঁকা। চিহ্নটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কর্নেল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন পুরোপুরি বিহ্বল হয়ে গেছে।

‘কর্নেল, স্যার, কি এইটা?’ ত্রিলোক প্রশ্ন করল। কর্নেল এখনো বিহ্বল ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে চিহ্নটার দিকেই।

‘স্যার, আমাদের পলাইতে হবে,’ বলে সোলেমান জানালা দিয়ে নিচের দিকে দেখাল। ওদিকে উঁকি দিয়ে সবাই দেখতে পেল, দেয়ালের বাইরের চৌকি আর ঘোড়ায় থাকা সৈনিকেরা খুলে ফেলেছে ব্যাংকের বাইরের ফটক এবং সেখান দিয়ে পিল পিল করে সৈনিকেরা ঢুকে পড়ছে ভবনের প্রাঙ্গণে এবং অনেক সৈনিক এরই মধ্যে ব্যাংক ভবনের ভেতরেও ঢুকে পড়েছে।

‘আমি জানি কী করতে হবে,’ কর্নেল এখনো সেই বিহ্বলের মতোই কথা বলছে।

‘স্যাভার্স! কী বলছো তুমি?’ ইংরেজিতে জানতে চাইল পিটার। ‘আমাদের পলাতে হবে।’

‘আর্থার, আর্থার নামের একজনকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের,’ বলেই কর্নেল ফিরে তাকাল অন্যদের দিকে। ‘আমাদের পলাতে হবে এখান থেকে, যেকোনো মূল্যে বের হতে হবে এই ভবন থেকে। চলো চলো,’ বলেই সে নড়ে উঠল। অন্যরা আরো আগেই নড়তে শুরু করেছে। ‘সবাই একসঙ্গে না দুই দলে ভাগ হয়ে দুই দিক দিয়ে চলো। ওরা নেমে এসেছে চতুর্থ থেকে তৃতীয় তলায়।’

সিপাহী

কিন্তু তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় তলায় নামার আগেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে থাকা লোকজনের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল পরিষ্কার। ‘অন্যদিকে সিঁড়ির কাছে নৌছেও ওরা আবার দৌড়াতে শুরু করল দ্বিতীয় তলার অন্যদিকে। ওদিকে দৌড়ে দেখল অন্য সিঁড়ির গোড়ার পিল পিল করে উঠে আসা সৈনিকেরা, এরই মধ্যে সোলেমান আর পালোয়ান লড়াই করছে তাদের সঙ্গে, কর্নেল তার সঙ্গে থাকা অন্যদের দিয়ে উলটো ঘুরে রওনা দিল দ্বিতীয় তলার উলটোদিকে। কিন্তু মাঝামাঝি পর্যন্ত যাওয়ার আগেই আবিষ্কার করল পুরোপুরি ঘিরে ফেলা হয়েছে তাদের। তার সঙ্গে সঙ্গীরা অস্ত্র তুলতে যাচ্ছিল তার আগেই কর্নেল মানা করল দুজনকেই। এখন অস্ত্র তুলতে গেলে মেরে ফেলা হবে তাদের। মাথার পাশে দুই হাত তুলে আত্মসমর্পণ করল কর্নেল। ধরা পড়ে গেছে তারা, কিন্তু তাই বলে বোকামি করার কোনো অর্থ হয় না।

কর্নেলদের বন্দি করে প্রথমেই তাদের নিরস্ত্র করা হলো। কাজটা করা হলো খুবই দক্ষতার সঙ্গে। এমনকি তাদের টুকটাক আঘাত করা হলেও তেমনভাবে আহত কিংবা কোনোভাবেই অপমানজনক কিছু করা হলো না। সোলেমান এবং পালোয়ান জোরাজুরি করাতে তাদের নিরস্ত্র করে বেঁধে ফেলা হলো কিন্তু অন্যদেরকে এমনকি বাঁধাও হলো না। নিরস্ত্র করে, তাদের হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেওয়া হলো মেঝেতে। বিভিন্ন পোশাকের সৈনিকেরা, ওদের ঘিরে রয়েছে, তাদের ভেতর থেকে একজন এগিয়ে এলো ওদের দিকে।

‘আপনারা কারা?’ কর্নেল চোখ তুলে দেখল, কালো পোশাক এবং মাথায় কালো পাগড়ি পরা একজন ছোটোখাটো মানুষ, মুখে লম্বা দাড়ি এবং চোখে সুরমা দেওয়া এক সৈনিক। নিজের জীবনের একটা বড় অংশ কর্নেল মিলিটারিতেই কাটিয়েছে। একভাবে বলা যায় তার রক্তের প্রতিটি কণিকাতেই মিলিটারি বিষয়গুলো দৌড়ে বেড়াচ্ছে। সাদা না কালো, মোটা না পাতলা, লম্বা না রোগা যেকোনো মানুষকে দেখলে সবার আগে কর্নেল বলে দিতে পারে—এই লোক আত্মজনতা নাকি মিলিটারির লোক। যেমন তার সামনে যে মানুষটা রয়েছে তাকে দেখেই কর্নেল বলে দিতে পারে এই লোক মিলিটারির সৈনিক।

‘আমার নাম কর্নেল স্যান্ডার্স, অবসরপ্রাপ্ত,’ দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল কর্নেল।

‘আপনি কর্নেল, সেনাবাহিনীর,’ লোকটার চেহারা বা কণ্ঠে তেমন কোনো ভাব নেই। কিন্তু কর্নেলের মনে হলো লোকটা যেন ভীষণ ক্লান্ত। ‘আপনার সঙ্গে এরা কারা?’ লোকটা শুধু কুঁচকে জানতে চাইল। তার গলায় প্রকৃত কৌতূহল।

‘এরা আমার সঙ্গী এবং আমরা একটা বিশেষ কাজে এখানে এসেছি, দেখুন—’

‘আমি কি জানতে পারি, আপনার সেই বিশেষ কাজটা কি এবং আপনারা আমার লোকদের ওপরে আক্রমণ চালাবেন কেন?’

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

বোম্বের বন্দরের বাইরে যখন সোলেমানের সঙ্গে পরিচয় হয়, তখন যারা কর্নেল এবং ফটিককে আক্রমণ করেছিল, তাদের আর এই লোকগুলোর ভেতরে জালাল আর পাতালের পার্থক্য। বিদ্রোহী সিপাহী শুনে কর্নেল যা ভেবেছিল, যেমন ভেবেছিল—এই লোকগুলো মোটেও তেমন নয়। ‘দেখুন আপনি—’

‘আমি দুঃখিত কর্নেল,’ লোকটা সামান্য মাথা নেড়ে বলে উঠল। ‘আমি আমার পরিচয় দিইনি। আমার নাম খন্দকার, আমি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক ছিলাম,’ ব্রিটিশ সেনাবাহিনী উচ্চারণ করার সময়ে তার গলার স্বরে ভিন্ন একটা ভাব ফুটে উঠল, যেটাকে ঘৃণা বলা যায়, উত্তাপ বলা যায় আবার টিটকিরি বললেও অতুষ্টি হবে না।

‘খন্দকার, আমিও একজন সৈনিক, এরা আমার সঙ্গীরা, সবাই সৈনিক,’ বলে কর্নেল তার সঙ্গের সবাইকে দেখাল। ‘দেখুন, আমি আগেই বলেছি একটা বিশেষ কাজে এখানে এসেছি, আমাদের সঙ্গে বিদ্রোহ বা ইংরেজ বাহিনীর সরাসরি কোনো সংযোগ নেই।’

‘কর্নেল আপনি দাবি করছেন, আপনার সঙ্গের সবাই সৈনিক, আপনি নিজেও, তাহলে এক সৈনিক আরেক সৈনিকের কাছে মিথ্যে বলবে কেন?’ বলে সে হাতের ইশারায় একজনকে দেখাতেই সে ওদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া একটা বন্দুক এগিয়ে দিল খন্দকারের দিকে। ‘কর্নেল এটা এবং আপনাদের সঙ্গে থাকা প্রতিটা অস্ত্র মিলিটারি ইস্যু,’ বলে সে অন্যদের হাতে রাখা ওদের অস্ত্রগুলো দেখিয়ে বলে উঠল। ‘আপনি কি সেটা অস্বীকার করেন?’

‘দেখুন খন্দকার—’

‘জনাব, আমি জানি না আপনারা কারা এবং এখানে কী করছিলেন,’ কিন্তু আমি এটা জানি আপনি সত্য গোপন করছেন,’ বলে নিজের লোকদের দেখাল। ‘আমি জানি না আপনি কি জানেন, কিন্তু আমরা এখানে সত্যের জন্য লড়াই,’ বলে সে নিজের লোকদের দেখাল। ‘আমার প্রতিটা সঙ্গীই তাই।’

‘তোমাদের সত্য জানা আছে আমাদের,’ পিটার বলে উঠল তেজের সঙ্গে। ‘তোমরা বিদ্রোহের নামে স্রেফ লুটেরা ছাড়া আর কিছু নও।’

কর্নেল ইশারায় পিটারকে চুপ থাকতে বলল। কিন্তু সে ভেবেছিল খন্দকার লোকটা উত্তেজিত হয়ে উঠবে পিটারের কথা শুনে। কিন্তু সে সেরকম কিছু হলো না বা করল না। সে শান্তভাবে ফিরে তাকাল তার দিকে। ‘জনাব, আমরা লুটেরা, আর আপনারা বছরের পর বছর ধরে যা করছেন সেটাকে কি বলবেন? আজ আমরা নিজের ভূমিতে পরগাছা। আর আমরা লুটেরা—’

‘খন্দকার শুনুন, আমি আমার সঙ্গীর হয়ে ক্ষমা চাইছি,’ কর্নেল শান্ত গলায় বলে উঠল। ‘দেখুন আমি মিলিটারি ছেড়েছি দশ বছর,’ বলে সে শান্তভাবে দম

সিপাহী

নিল। 'ব্রিটিশ ভারতের মিলিটারিতে কী হয় আমি জানি। আর ভারতীয় সৈনিকদের জন্য আমার সহমর্মিতা রয়েছে কিন্তু আজ—'

'জনাব, আপনাদের সহমর্মিতার আমাদের আর প্রয়োজন নেই, আমাদের পথ আমরা বেছে নিয়েছি,' বলে সে নিজের সঙ্গীদের দিকে ফিরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই একযোগে চিৎকার করে সায় জানাল তার কথায়।

'অমরা সবাই সিপাহী জনাব, আমি, আপনি, আপনার লোকেরা, আমার লোকেরা,' স্বন্দকারের গলায় কেমন জানি দুঃখী একটা সুর। 'এই পুরো গল্পই সিপাহীদের। পার্থক্য হলো আমরা যার যার নিজেদের লড়াই লড়ছি।'

'স্বন্দকার,' কর্নেলের গলা এখনো শান্ত। 'তুন। এখানে আমরা যারা আছি আমাদের সঙ্গে সরাসরি মিলিটারির সংযোগ নেই,' বলেই সে নিজেকে ওধরে নিল। পিটার আর সোলেমান বাদে, বাকি সবাই আমরা মিলিটারি ছেড়েছি আজ বহুবছর। আমরা মিলিটারির থেকে সাহায্য নিচ্ছি স্রেফ একজন বন্ধুকে খুঁজে বের করার জন্য। দেখুন—'

'জনাব, পুরো ভারতে আগুন জ্বলছে, দিল্লি এখন উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরি, আর আপনি এই দিল্লিতে প্রবেশ করেছেন একদল মিলিটারির লোক নিয়ে তাও—স্রেফ একজন বন্ধুকে খুঁজে বের করার জন্য,' বলে সে মৃদু হেসে উঠল। 'ব্রিটিশরা মিথ্যে বলে, তাই বলে এমন,' স্বন্দকারের সঙ্গে তার সঙ্গীরাও হেসে উঠল। 'জনাব, আমি বলছি, আপনারা ছদ্মবেশে কেন শহরের এই অংশে প্রবেশ করেছেন। আপনারা এখানে এসেছেন আমাদের অবস্থান এবং পরিস্থিতি বুঝতে পেরে নিজের জাতিভাইদের গোপনে খবর পাচার করার জন্য,' কর্নেল বুঝতে পারছে এই লোক অত্যন্ত ঠান্ডা মাথার এবং বেশ ভালো বুদ্ধি-বিবেচনা রাখে। সে যা বলছে যুক্তির বিবেচনায় সেটাই ভাবা উচিত তার অবস্থানের যেকোনো বুদ্ধিমান মানুষের।

'দেখুন আপনি যা বলছেন, সেটাই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু—'

'জনাব, আমি মিথ্যে চাই না, আপনাদের কারণ যাই হোক না কেন—সেই বিবেচনা বা বিচার আমার হাতে নয়। আপনাদে বন্দি করা আমার দায়িত্ব ছিল, সেটা পালন করেছি আমি। এরপর যা হবে সেটা সার্বিক বিবেচনায় জানানো হবে আপনাদের,' বলে সে তার সঙ্গীদের ইশারা করতেই তাদের উঠিয়ে নিচে রওনা হলো। পুরো দলটা ফলো করতে করতে নিচে এলো। ওদের সবার অগ্রভাবে কর্নেল এবং সঙ্গীরা।

নিচে নেমে ফটকের বাইরে বেরিয়েই প্রচার করে দেওয়া হলো, দুই সাদা ইংরেজসহ একদল গোপন গুপ্তচর ধরা পড়েছে। এরা ইংরেজদের হয়ে শহরের এই অংশে গোপনে গুপ্তচরগিরি করতে এসে ধরা পড়েছে। কর্নেলদের চৌকিতে নিয়ে

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

হুঁদী করে রাখা হলো বেশ কিছুক্ষণ। তারপর খন্দকার এবং তার আরো কিছু সঙ্গীসহ এসে উপস্থিত হলো ওদের সামনে।

‘জনাব, সার্বিক বিবেচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে আমাদের চৌকি থেকে আপনাদের শহরের প্রাণকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে আর কিছুক্ষণের ভেতরেই। সেখানে গুপ্তচরগিরির অপরাধে আপনাদের দুজনকে,’ সে কর্নেল আর পিটারকে দেখাল। ‘ফাঁসি দেওয়া হবে জনসমক্ষে। আর অন্যদের চাবুক পেটা করা হবে।’

‘আত্মপক্ষ সমর্থনের—’

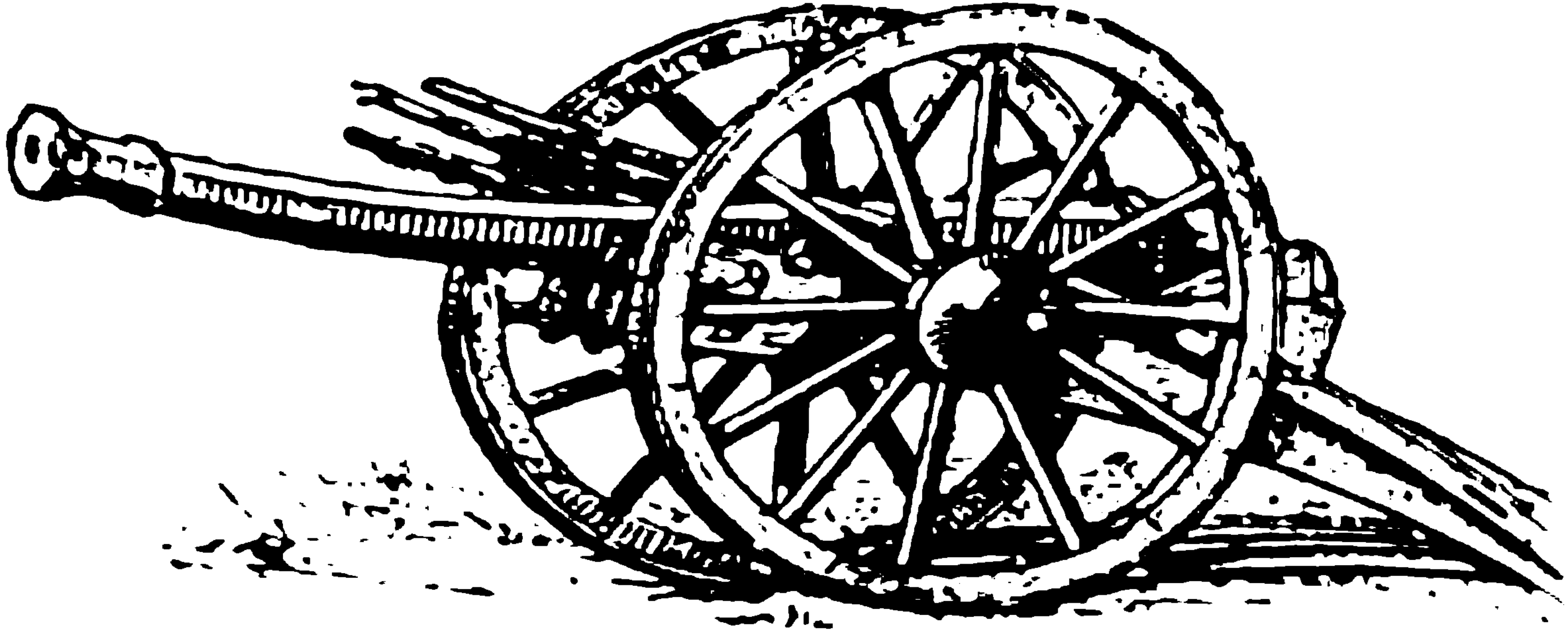
কর্নেলের কথা শুনে হেসে উঠল খন্দকার এবং তার সঙ্গীরা। ‘হজুর,’ তার গলায় ব্যঙ্গ—এশ বছরে আপনারা কখনো কাউকে কিছু বলার সুযোগ দিয়েছেন?’

‘এটা সত্যি নয়—’

‘হজুর, সত্যিটা কি আমি আপনাকে বলি,’ খন্দকার এগিয়ে এলো কর্নেলের দিকে। ‘আপনারা যে কাজেই এসেছিলেন সেটা এখন আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। খবর প্রচার হয়ে গেছে একদল ইংরেজ গুপ্তচর ধরা পড়েছে। এই শহর এখন এমনিতেই একটা আসন্ন যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে। ইংরেজ বাহিনী চলে এসেছে আমাদের গলার কাছে। আমাদের সৈনিকেরা হতবিহ্বল আর দিশেহারা, মানুষ আতঙ্কিত। এমন অবস্থায় শহরের কেন্দ্রে জনসম্মুখে দুজন ইংরেজেরে ফাঁসি সবার মনোবল বৃদ্ধির জন্য কতটা সহায়ক হবে আপনি ভাবতে পারেন,’ বলে সে হেসে উঠল।

‘আপনাদের শেষবারের মতো খাবার আর পানির আয়োজন করা হয়েছে,’ বলে সে ইশারা করল। ‘খেয়ে নিন, এরপর আমরা শহরের কেন্দ্রের দিকে রওনা হবো। বিকেলের আগেই আপনাদের ফাঁসি কার্যকর হবে,’ বলে সে চলে গেল। কর্নেল হতাশ ভঙ্গিতে ফিরে তাকাল নিজের সঙ্গীদের দিকে।

এই জন্য তারা এই শহরে এসেছিল,
গুপ্তচর হিসেবে ফাঁসিতে ঝোলার জন্য।



অধ্যায় একান্ন বর্তমান সময় কলেজ রোড ময়মনসিংহ

প্রফেসর হামিদের ফ্ল্যাটের তালা খুলে দরজাটা মেলে ধরতেই অনেকদিনের বন্ধ বাসার ভ্যাপসা ভাবটা প্রায় সবার নাকে বাড়ি মারল। কিন্তু ওরা যতটা ভেবেছিল ততটাও নয়। এরমানে কেয়ারটেকার নিয়মিত বাসা পরিষ্কার করে এবং সম্ভবত এখানে মাঝেমাঝে লোকজন যাতায়াতও করে।

‘আপনেরা ভেতরে যান, দামি কিছু নাই ভেতরে,’ কেয়ারটেকার দরজাটা মেলে ধরে বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটু গরম চাহনি দিল বাশার, ‘তোমার কি মনে হয় আমরা পুলিশের লোক হয়ে এখানে চুরি করতে এসেছি!’

বাশারের কথা শুনে ফিক করে হেসে ফেলল জয়া সরকার। ‘ওরে বকা দিয়ে লাভ কি, আইনের লোকেরাই বেশি বেআইনের কাজ করে দুনিয়াতে,’ বলে সে বাশারের গরম দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। ‘আচ্ছা আচ্ছা ভেতরে যাও।’

ওরা সবাই মিলে ভেতরে প্রবেশ করতেই কেয়ারটেকার লাইট জ্বালিয়ে দিল। দরজার ভেতরে ছোট একটা করিডর, ওটার বামে ড্রইংরুম, ডানে ছোট একটা কামরা, কামরার সঙ্গে লাগোয়া বারান্দা। ‘এক কাজ করো সবাই ছড়িয়ে পড়ে, দেখতে শুরু করো,’ বলে সে ফিরে তাকাল কেয়ারটেকারের দিকে। ‘তুমি বাইরে অপেক্ষা করো,’ বলে সে গলা খানিক কঠিন করে যোগ করল। ‘ভয় পেও না আমরা কিছু চুরি করব না, বা সরাব না।’

‘জে না, স্যার—’ বাশারের কঠিন দৃষ্টি দেখে সে থেমে গেল, একবার মাথা নেড়ে বাইরে চলে গেল। ‘সবাই, খুব ভালোভাবে দেখবে, তবে সাবধানে, কোনো জিনিস নষ্ট করো না বা সরিয়ে না। কাজে নামো,’ বলে বাশার অন্যদেরকে যার যার মতো কাজ করতে দিয়ে সে চলে এলো করিডরের সঙ্গে লাগোয়া কামরাটায়,

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

প্রথমেই কামরাটা পার হয়ে বারান্দা থেকে নিচে উঁকি দিল। মিরবাড়ি সড়কের রাস্তা দেখা যায় নিচে। কামরাটায় ফিরে এসে চারপাশে চোখ বুলাল সে। দেখেই মোটামুটি বোঝা যায়, এটা একটা ছোট গেস্টরুম। সম্ভবত গ্রাম থেকে আসা বা এ-ধরনের লোকজনের থাকার জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখানে কিছুই থাকবে না। কামরাটা থেকে বের হয়ে ড্রইংরুমে ঢুকল বাশার। সামিরা মোটামুটি পরীক্ষা শেষ করে সে দেয়ালের একটা ছোট র‍্যাকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওটা ভর্তি নানা ধরনের অ্যান্টিক আর আর্টিফ্যাক্ট। ‘এই প্রফেসরেরও দেখি ভালোই অ্যান্টিকের শখ।’

বাশার তাকিয়ে দেখল দেয়ালের ছোট র‍্যাকটাতে, মাউইদের মূর্তি থেকে শুরু করে, চায়নিজ শেপড এলিফেন্ট, আসল প্রেয়িং হুইল সবই রয়েছে। বাশার কোনো এক্সপার্ট নয়, কিন্তু কিছু জিনিস সে নিজে মোটামুটি চেনে। ‘ভালোই তো কালেকশন। তবে এখানে এরচেয়ে বেশি কিছু আছে বলে মনে হয় না। চলো ভেতরের দিকে যাই,’ বলে ও সামিরাকে নিয়ে ফ্ল্যাটের ভেতরের দিকে রওনা দিল।

‘আমরা আসলে খুঁজছি কি?’ সামিরার গলায় সামান্য দ্বিধা।

‘সত্যি কথা বলব,’ বাশার ফিরে তাকাল সামিরার দিকে। ‘আমি জানি না। তবে এমন কিছু, যা প্রফেসর এবং তার সংযোগ নির্দেশ করে ডেভিড বা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারো দিকে। দেখি কী পাওয়া যায়।’

ওরা দুজনে মিলে করিডর পার হতেই সামনে দেখতে পেল ডাইনিংরুম। ‘কিছু পেলে?’ সে জানতে চাইল আবদুল্লাহর দিকে তাকিয়ে।

‘না, ওই পাশে পড়ার রুম, আর ওইটা বেডরুম,’ বলে সে তার পেছনে দু পাশে দুটো দরজা দেখাল। ‘এইখানে কিছুই পাই নাই। দেখে উনারা কিছু পায় কি না।’

বাশার ওদের রেখে বেডরুমে চলে এলো। ইনসপেক্টর রবিউল আর কনস্টেবল আবদুল্লাহ বেডসাইড টেবিলে ড্রয়ার লাগিয়ে সোজা হলো। ‘স্যার, এই দুটো বাদে আর তেমন কিছু দেখার নেই এখানেও,’ ইশারায় সে দেয়ালজোড়া বড় একটা আলমারি আর অন্যপাশে একটা কাঠের পুরনো ভারী ওয়ার্ডরোব দেখাল। ‘বাদ দেন এমনিতেই অনুমতি ছাড়া ঢুকে এভাবে সব ঘাটছি, এটাই এক ভয়াবহ ক্রাইম, আর পাল্লা ভারী করা ঠিক হবে না। আর এগুলোর ভেতরে কিছু থাকার সম্ভাবনা খুবই কম—’

বাশার আরো কিছু বলার আগেই ডাইনিংরুম থেকে সামিরার ডাক শোনা গেল, বাশার ডায়নিং রুমে বেরিয়ে এসে দেখল, সামিরা স্টাডির দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, বাশার এগোতেই তাকে হাতের ইশারায় ভেতরে যেতে বলে সে ঢুকে গেল। ‘তোমরা এখানেই থাকো,’ বলে বাশার ঢুকে গেল স্টাডির ভেতরে।

সিপাহী

ছোট স্টাডি, খুব বড় না। কিন্তু স্টাডির ভেতরের জায়গা প্রায় পুরোটাই কাজে লাগানো হয়েছে। বড় বড় তিনটা বইয়ের র‍্যাক রাউন্ড করে রাখা, ওটার সামনে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, একপাশে জানালা। জানালার পাশে একটা ইজিচেয়ার রাখা। একপাশের খোলা দেওয়ালভর্তি ছোট ছোট বাঁধানো ছবি। সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার দিকে তাকিয়ে বাশার বুঝতে পারল জয়া সরকার তার কথা শোনেনি। বাশার বলেছিল কোনোকিছু না সরাতে, কোনো ধরনের ক্ষতি না করতে। কিন্তু জয়া ইচ্ছেমতো জিনিস বের করে এনেছে, ইচ্ছেমতো সে কাগজপত্র আর বই ছড়িয়েছে। এখন সামিরা আর জয়া সরকার দুজনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই বাঁধানো ছবিগুলোর সামনে।

বাশার খানিক রাগের সঙ্গেই এগিয়ে গেল তাদের দুজনার দিকে। ‘কি ব্যাপার জয়া, আমি না বলেছি—’ বাশারকে কথা বলতে না দিয়ে জয়া করার দেয়ালের দিকে দেখাল। সেখানে বেশ কিছু ছবি এবং বিভিন্ন ছবিতে পাতলা লম্বা চুল ঝুঁটি করা হালকা পাতলা দাড়ি-গোফহীন একজন মানুষকে দেখে বাশার আন্দাজ করল এটাই প্রফেসর হামিদ হবেন। দেয়ালজোড়া ছবিতে, ভদ্রলোকের জীবনের বিভিন্ন সময়ের প্রতিফলন। সাদা-কালো একটা ছবিতে তাকে দেখা যাচ্ছে তরুণ অবস্থায় কনভোকেশনের গাউন পরা অবস্থায়, আরেকটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একজন মহিলা আর ছোট একটা মেয়ে বাচ্চার সঙ্গে সমুদ্রসৈকতে। ‘কি ব্যাপার—’

‘এই ছবিটা দেখো,’ বলে জয়া সরকার একটা ছবি দেখাল। সম্ভবত কোনো এক পার্টিতে এবং জোরদার সম্ভাবনা পার্টিটা দেশের বাইরের কোনো পার্টি হবে, কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রচুর সাদা চামড়ার মানুষ দেখা যাচ্ছে। ছবিটাতে কয়েকজন মানুষ, মানুষের দুজনেরই হাতে ওয়াইনের গ্লাস, একজন প্রফেসর হামিদ, তাঁর লম্বা চুল ঝুঁটি করা নেই, বরং পেছনে খোলা, আর তাঁর সঙ্গের চকচকে টাক মাথার ষাট্‌বান সাদা চামড়ার মানুষটা আর কেউ নয়, ‘ডেভিড—’ অক্ষুটে বলে উঠল বাশার।

‘এক প্রফেসর হামিদ,’ জয়া বলে উঠল। ‘কিন্তু আমি যা দেখাতে চাচ্ছি এটাও মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় হলো ছবিটাকে ভালোভাবে দেখো, এতে আরো একাধিক মানুষ রয়েছে,’ বলে সে দেয়াল থেকে খুলে আনল ছবিটা। ‘দেখো—’

ছবিটাতে সাদা চামড়ার মানুষদের দলের ভেতরে আপাত দৃষ্টিতে কয়েকজন মানুষ দেখা যাচ্ছে, যারা পুরো দলটা থেকে একেবারেই আলাদা, ‘প্রফেসর ইকতেখার মাহমুদ,’ বলে বাশার ঝট করে সামিরার দিকে দেখল, এই প্রফেসর ইকতেখারকে খুঁজে বের করার কেসটা সমাধান করেছে ওর আগের কেসে বাশার।

‘সেটাও ইন্টারেস্টিং নয়,’ এবার সামিরা বলল। ‘তুমি কি অফিসার শারহান শারিয়ারের চটখাম কেসের কথা শুনেছো, ওখানে পুরো কেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

ঘটেছে, তার সবটাই শুরু হয়েছিল একজন মানুষের মৃত্যুর মাধ্যমে। এটা সেই মানুষ, সামিরা টাকা দিয়ে দেখাল ছবিটাতে। বাশার ছবিটা ফ্রেমসহ হাতে নিতে নিতে, বাশার আনমনে বলে উঠল, 'প্রফেসর আবদেল। প্রফেসর ইফতেখারের পার্টনার। অবাক করা বিষয়—এরমানে ডেভিড, প্রফেসর ইফতেখার এবং এই প্রফেসর হামিদ আগে থেকেই পরিচিত ছিল। মানে এর আগে ময়মনসিংহে এবং চট্টগ্রামে যা ঘটেছে সেটা তো বটেই, আমার ধারণা বাকি যে এতগুলো ঘটনা একসঙ্গে ঘটতে শুরু করেছে এর সব গোড়া আসলে অনেক আগে থেকেই সংযুক্ত। সর্বনাশ! আমরা যা ভেবেছি এই গল্পের শুরু আসলে তারো অনেক আগে থেকে।'

'ছবিতে আরো একজন বাদামি চামড়ার মানুষ রয়েছে, এটা কে?'

'ছবিটার তারিখ দেখো তো,' সামিরা বলে উঠল।

বাশার টান দিয়ে ছবিটা ফ্রেম থেকে ছুটিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ওটার ছবিটার ফ্রেম আর ছবির পেছন থেকে এক টুকরো কাগজ পড়ে গেল মাটিতে। 'এটা আবার কি?' মাটি থেকে কাগজটা উঠিয়ে নিতে নিতে বাশার চানতে চাইল। 'এটা তো আমার কাছে একটা পাজলের মতো মনে হচ্ছে,' বলে সে ছবিটা নিজের হাতে রেখে ওইটা কাগজটা জয়াকে দেখানোর জন্য পেছন ফিরল। কিন্তু জয়া সরকার নেই ওদের পেছনে।

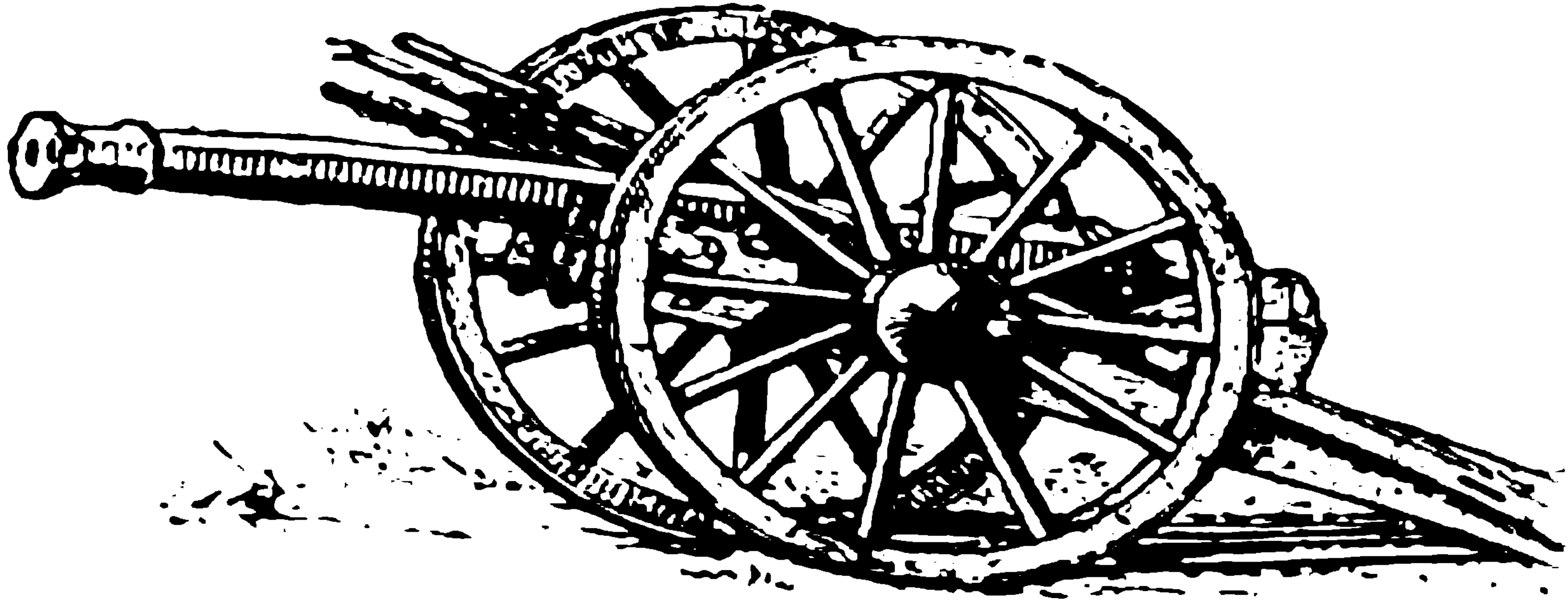
'কি ব্যাপার জয়া কোথায়?' বাশার একটু অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'এখানেই তো ছিল,' সামিরাও বলে উঠল, সে এবং বাশার দুজনেই এত ময় হয়ে ছবি দেখছিল, খেয়ালই করেনি জয়া সরকার নেই ওদের পেছনে বা কখন সরে পড়েছে সে। বাশার ছবি আর কাগজটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। ইনসপেক্টর রবিউল, কনস্টেবল আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা আর ক্লশো দাঁড়িয়ে গল্প করছে। 'জয়া কোথায়?' বাশার জানতে চাইল।

'ম্যাডাম তো বাইরে বেরিয়ে গেল,' ইনসপেক্টর রবিউল ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'মাত্র বেরিয়ে গেল,' বলেই সে বাশারের চেহারা দেখে সতর্ক হয়ে উঠল। 'কি ব্যাপার স্যার?'

বাশার কিছু না বলে দৌড়ে চলে এলো সেই গেস্টরুমের বারান্দায়। নিচের দিকে ঊঁকি দিয়ে এদিকে-সেদিকে দেখতেই সে অবাক হয়ে দেখল গেট দিয়ে বের হয়ে দ্রুত পায়ে গলির উলটোপাশে হন হন করে হেঁটে চলেছে জয়া সরকার। 'শিট,' বলেই সে দৌড়ে এলো ডায়নিংরুমে। সবার অবাক হয়ে থাকা মুখের দিকে তাকিয়ে বাশার চট করে বলে উঠল।

'জয়া সরকার আমাদের ধোঁকা দিয়ে পালিয়েছে।'



অধ্যায় বায়ান্ন
সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
দিল্লি শহর, উত্তর ভারত

জমা হওয়া ভিড়ের দিকে তাকিয়ে কর্নেলের মনে হলো জমায়েত জনতা ঠিক তার মতোই বিধাবিহীন। কর্নেল ঠিক বুঝতে পারছে না, আসলে কী ঘটছে চারপাশে। প্রথমে তাদের বন্দি করার পর চৌকিতে এসে খন্দকার জানায় তাদের এই বেলার ভেতরেই ফাঁসি দেওয়া হবে শহরের কেন্দ্রে নিয়ে। খন্দকার তাদের কারণও জানায় কেন ফাঁসি দেওয়া হবে তাদের, বিশেষ করে সাদা চামড়ার দুজনকে, আর অন্যদের চাবুকপেটা করা হবে। পুরো ব্যাপারটাই ঘটানো হচ্ছে এবং দিল্লিতে প্রচার করা হয়েছে যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এবং কোম্পানির হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করার সময়ে পাঁচজনকে বন্দি করা হয়েছে এবং তাদের ভেতরে দুজন ইংরেজকে ফাঁসি দেওয়া হবে অল্প সময়ের ভেতরে দিল্লি শহরের মূল কেন্দ্রে। কাজেই জনতাকে সমাবেশ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ওদের বন্দি করে রাখা হলেও একসঙ্গে রাখা হয়নি, ফলে নিজের লোকদের সঙ্গে সেভাবে কথাও বলতে পারেনি কর্নেল। সে একাধিকবার চেষ্টা করেছিল ওদের বোঝানোর জন্য যে সেনাবাহিনী কিংবা কোম্পানির সঙ্গে ওদের কোনো সরাসরি সংযোগ নেই। কিন্তু তাতেও খুব একটা কাজ হয়নি। সবশেষে কর্নেল আরেকটা চেষ্টা করেছিল। সে প্রহরারত একজনকে জানিয়েছে সে ওপরে মহলের কারো সঙ্গে কথা বলতে চায়, সম্ভব হলে স্ম্যাট জাফর বা সরাসরি তার অধীনস্থ কারো সঙ্গে কথা বলতে চায় সে। কিন্তু তাতেও খুব একটা কাজ হয়নি। কর্নেল বা ওদের সঙ্গে থাকা পাহারাদারেরা দুয়েকবার এর-তার সঙ্গে কথা বললেও এরপরে তারা আর এমনকি আর নড়েওনি।

এদের সামগ্রিক অবস্থা এবং পরিস্থিতি দেখে কর্নেল অনুমান করেছে এদের আসলে চেইন অব কমান্ড বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এরা তাদের ধরে ফাঁসি

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

দিচ্ছে শ্রেফ একটা জমায়েত করার জন্য। জনতাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য, সম্ভাব্য দাঙ্গা এবং দিল্লির ভেতরে ব্রিটিশ সৈন্যদের ঢুকে পড়ার কারণে যে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে ঠান্ডা করার জন্য। এভাবে এরা কতদিন টিকতে পারবে। দিল্লির পতন এখন শ্রেফ সময়ের ব্যাপার। প্রশ্ন হলো তারা এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবে কীভাবে।

চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সৈনিকেরা একসঙ্গে হতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল বুঝতে পারল সময় উপস্থিত। 'সময় হয়ে এসেছে, জনাব,' খন্দকার ওদের চৌকির কাছাকাছি এসে বলে উঠল। কর্নেল কোনো জবাব দিল না, সরাসরি তাকালও না। ভেতরে ভেতরে মারাত্মক মরিয়া বোধ করলেও সে ওপরে ওপরে একেবারেই শান্ত থাকার চেষ্টা করছে। সে নিজের দলের লোকদের দিকে তাকিয়ে জোর গলায় বলে উঠল, 'সবাই শান্ত থাকো। উপায় একটা হয়ে যাবেই।'

কর্নেলের কথা শুনে হেসে উঠলে আশপাশের সৈনিকরা। কিন্তু খন্দকারের মুখে কোনো হাসি নেই। সে চুপচাপ তাকিয়ে রয়েছে কর্নেলের দিকে। 'সময় সাহসীদের সঙ্গে থাকে জনাব,' আপনার কথা এবং সাহসিকতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি,' বলে সে আঙুলে ইশারা করতেই কর্নেলদের টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল অন্যরা। 'তবে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এইবার সময় আর আপনার সঙ্গে নেই। কারণ আপনি খারাপের সঙ্গে আছেন।'

'আর তোমরা একেবারে ফেরেশতা, তাই না?' কর্নেলের পাশ থেকে পালোয়ান বলে উঠল রাগের সঙ্গে।

'না, জনাব, আমি মোটেই এমনকিছু নই,' বলে সে নিজের আঙুল তুলে ওপরের দিকে দেখাল। 'সেই সব, আমি শ্রেফ উছিলা,' বলে সে নিজের লোকদের পাশে চলে গেল। 'পালোয়ান কি করবা?'

'হুজুর, যেভাবে বানছে কিছুই তো করার নাই,' বলে সে আপনাতেই একবার চোখ মটকাল। পালোয়ানের চোখ মটকানো দেখে কর্নেল খানিকটা ভরসা পেল। পালোয়ানের সঙ্গে তার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অনেক এবং এর আগেও সে এ-ধরনের খেলা একেবারে দেখায়নি তা নয়। পুরোপুরি ভরসা না করলেও সে খানিকটা হলেও স্বস্তি পেল, আশা একেবারেই নেই তা নয়। কর্নেল ফিরে তাকাল ত্রিলোকের দিকে, ত্রিলোকও বুঝতে পেরেছে পালোয়ান কিছু একটা করার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু তাদের অপর পাশে সোলেমান আর পিটার একেবারে ভেঙে পড়েছে। কিন্তু দুজনার প্রতিক্রিয়া একেবারেই ভিন্ন। পিটার কেমন জ্ঞানি ভেঙে পড়েছে, আর সোলেমানকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন থলের ভেতরে বন্দি সাপের মতো ফুঁসছে। বারবার নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।

সিপাহী

কর্নেল তাকে ইশারায় শান্ত হতে বলেও থেমে গেল। সবাই বেশি শান্ত থাকলে কোনো সন্দেহ করতে পারে। কাজেই যে যার মতো থাকুক। আর পালোয়ান কী করতে যাচ্ছে সে সঠিকভাবে জানেও না। কারণ পালোয়ানের পদ্ধতিতে কাজ নাও হতে পারে। কর্নেল জনতার দিকে মনোযোগ দিল। যদিও সে নিজেই এবারের ঘটনার বন্দি, কিন্তু তার পরও যেহেতু সে একাধিকবার যুদ্ধের সময় নেতৃত্ব দিয়েছে, আবার মিলিটারিতে ছিল সে বরাবরই—যখন বড় কোনো ঘটনা ঘটে সেই সময়ে জনতা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় সেটা সে খুব মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে। প্রশ্ন হলো আজকের ঘটনায় এবং অবস্থায় কী ঘটছে—সেটা দেখে তার মনে হচ্ছে জনতা আসলে ঠিক বুঝতেই পারছে না ঘটছেটা কি। মানুষের চোখে দ্বিধা।

তারা আসলে বিদ্রোহীদের সপক্ষে থাকবে, নাকি আসলে সাদা ইংরেজদের ঘৃণা করবে সেটা উপলব্ধি করা খুব মুশকিল তাদের পক্ষে। কর্নেল দেখল তাদের নিয়ে রওনা দেওয়া দলটা প্রায় শহরের প্রাণকেন্দ্রে চলে এসেছে। বাজারের মাঝে গোল বৃস্তের মতো একটা কাঠের মঞ্চের সামনে। সেটার ওপরে আয়োজন দেখে বুঝল এখানেই ফাঁসি দেওয়া হয়েছে আগেও ধরে আনা ইংরেজ থেকে বিভিন্ন লোকজনকে। কর্নেলদের নিয়ে মঞ্চের সামনে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেওয়া হলো। মঞ্চটাকে ঘিরে আছে নানা লোকজন। কিন্তু লোকজনের চেহারায় যে ধরনের উচ্ছ্বাস বা আনন্দ থাকার কথা সেরকম কিছু নেই।

কর্নেলদের সারি করে বসিয়ে, একজন কর্নেলের গলায় একটা দড়ির মতো পরিয়ে দিল তারপর তাকে মঞ্চ নিয়ে যাওয়ার জন্য ওঠানোর চেষ্টা করতেই খন্দকার তাতে হাতের ইশারায় থামতে বলল। ‘আগে ফাঁসি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ওইটা দেখতেই আসছে সবাই। আগে এইটারে তোল মঞ্চের ওপরে।’

সোলেমানকে মঞ্চের ওপরে টেনে তোলা শুরু করতেই, প্রথমবারের মতো নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারাল কর্নেল, বসা অবস্থা থেকে সোজা উঠে দাঁড়াল সে, বোকার মতোই বলা যায় এগিয়ে গেল সোলেমান এবং মঞ্চের দিকে। কিন্তু তার গলায় দড়ি বাঁধা থাকায় সেটা ধরে টান মারল একজন সৈনিক, সঙ্গে সঙ্গে মাথা বাঁকা হয়ে গেলেও সেটার পরোয়া না করে সে জোরে টান মারল, শক্তিশালী টান খেয়ে লোকটাই উলটো পিছলে পড়ল। কর্নেল সামান্য ফাঁকা পেয়ে দৌড়ে উঠে গেল মঞ্চের ওপরে, প্রায় পৌছে গেছে সে সোলেমানের কাছাকাছি, কেউ একজন চাবুক চালান কর্নেলের পা বরাবর। কর্নেল ধারণা করল এই চাবুকটা সোলেমানকে মারার জন্য আনা হয়েছিল। কর্নেলের পায়ে চাবুকের মাথা জড়িয়ে যেতেই হোঁচট খেল সে। সোজা গিয়ে পড়ল সোলেমানের বরাবর। সঙ্গে সঙ্গে রীতিমতো সৈনিকদের ছোট দুটো দল টেনে তুলে বসিয়ে দিল দুজনকে। সোলেমান সমানে চিৎকার করছে।

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

প্রায় সবাই যখন ব্যস্ত কর্নেল আর সোলেমানকে নিয়ে এই ফাঁকে নিজের সাগর ক্লার মতো মোটা মোটা আঙুল দিয়ে উলটো করে বেঁধে রাখা হাতের দড়ি টেনে খুলে ফেলেছে সে। কর্নেল আর সোলেমানকে বসিয়ে দিতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। কেউ সেভাবে টের পাবার আগেই সামনের এক সৈনিকের হাতের বন্দুক কেড়ে নিয়ে সেটা বরাবর তাক করল মঞ্চের দিকে, হট্টগোল শুনে সবাই ফিরে তাকাতে শুরু করেছে, পালোয়ান সোজা গুলি করল মঞ্চ কর্নেলকে ধরে ধাকা লোকটাকে কিন্তু অবাক হয়ে সে অনুভব করল গুলি ফুটল না। দুয়েকবার চেষ্টা করেও কাজ না হওয়াতে, রাগে বন্দুক মাথার ওপরে তুলে ওটার নল ডান হাতে চেপে মাথার ওপরে দুই পাক ঘুরিয়ে সে কাত করে দিল সামনের তিনজনকে। আবারো বন্দুক মাথার ওপরে তুলে বাড়ি বসাতে যাবে কেউ একজন গুলি করল তার হাতে, কিন্তু গুলি লাগল তার বন্দুকে, সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে ছুটে গেল ওটা। হাতের অস্ত্র হারিয়ে পালোয়ান পলকের জন্য দ্বিধা করল কিন্তু, পায়ের কাছে দুটো গুলি লাগতেই থেমে গেল সে। কর্নেল দেখল মঞ্চ থেকে একাধিক সৈনিক অস্ত্র তুলছে কর্নেল চোঁচিয়ে উঠল, ক্ষণিকের জন্য কর্নেলের চোখের সামনে যেন সময় থমকে দাঁড়াল। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে এতগুলো সৈনিকের গুলি পালোয়ানের দেহে লাগলে তার বুক স্রেফ ঝাঁজরা হয়ে যাবে, এই মুহূর্তে সে যে অবস্থায় রয়েছে, তাতে তার ফেরানো তো দূরে, কিছুই করার নেই।

কর্নেল চিৎকার করে উঠতেই, পালোয়ানও ফিরে তাকাল তার দিকে। গুলি করার স্রেফ আর সেকেন্ডের ভগ্নাংশের বাকি, মাথার ওপর দিয়ে আগুনের গোলার মতো কিছু একটা ছুটে এলো, মঞ্চের একাংশ মানুষজনসহ উড়ে গেল। কর্নেল টের পেল সে ছিটকে পড়েছে আবার মাটিতে। ক্ষণিকের জন্য সে কিছুই দেখতে পেল না। মুখ-চোখ ঢেকে গেল ধুলোয়, শরীরে মনে হচ্ছে কেউ হাজার হাজার পিন কুটিয়ে দিয়েছে। উঠে বসা তো দূরে থাক নড়ারও শক্তি নেই।

কর্নেল চোখ তুলে সামনে দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু সফল হলো না, মুখে বালি ঢুকে গেছে, আর চোখে ঝাপসা দেখছে সে। কেউ তার কানের কাছে ফিস ফিস করে কিছু বলল, তবে সে কিছুই বুঝতে পারল না। অনুভব করতে পারল কেউ একজন তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলেছে। শত্রু না মিত্র বোঝার উপায় নেই। বাধা দেওয়ার শক্তি নেই, নিজেকে স্রেফ সপে দিল কর্নেল। চারপাশের ভয়াবহ হট্টগোল আর যুদ্ধাবস্থার ভেতরেও সে অনুভব করতে পারল তাকে সরিয়ে নিয়ে কোথায় হেলান দিয়ে বসিয়ে বা গুইয়ে দেওয়া হলো।

সিপাহী

কেউ একজন পানির ঝাপটা মারল কর্নেলের চোখে-মুখে, একবার না, দুইবার। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ-মুখ পরিষ্কার হয়ে এলো এবং হঠাৎ যেন ঘুম থেকে উঠে বসল সে। সঙ্গে সঙ্গে সামনে প্রথম যে দৃশ্যটা দেখতে পেল সেটা রীতিমতো ভয়াবহ। একের পর এক আগুনে গোলা এসে পড়ছে এবং সামনে চূড়ান্ত লড়াই চলছে দুই দলের মধ্যে। সামনে চলমান লড়াইয়ের কোনো আগা-মাথা নেই। লাল পোশাক পরা সৈনিকরা আর কালো পোশাক পরা বিদ্রোহী দুই দলই পরস্পরের রক্ত নেয়ার জন্য ভয়াবহভাবে লেগেছে। গুলি চলছে, করুণ এদিকে-সেদিকে পালাচ্ছে, তলোয়ারের ঝনঝনানি, চিৎকার আর্তনাদে পুরো জায়গাটা যেন নরকে পরিণত হয়েছে। ‘হচ্ছেটা কি?’ যদিও সে বুঝতে পেরেছে তাও কর্নেল মোটামুটি অনুধাবন করতে পারছে কী হচ্ছে।

‘হজুর আমাদের ফাঁসির খবর ছড়িয়ে পড়ার পরেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা ইংরেজ বাহিনী সতর্ক হয়ে পড়ে এবং ফাঁসি দেখতে জড়ো হওয়া সৈনিকেরা শহরের গ্রহরা আলগা করে সম্মুখের কেন্দ্রের দিকে জমা হতে থাকে। সেই সুযোগে লর্ড ক্যানিং এবং ক্যান্টেন ইয়ংঙের নেতৃত্বে দুটো দল সৈনিকদের ওপরে আক্রমণ চালায়। ওরা যখন আপনাদের ফাঁসির কাজে ব্যস্ত সেই সময়ে ওরা নিজেদের পরিসর ছোট করে এনে প্রথমে এলোপাতাড়ি গোলাবর্ষণ করতে থাকে এরপর তো দেখতেই পাচ্ছেন।’

কে বলল কথাগুলো কর্নেল পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারছে না। সে শুধু সামনে তাকিয়ে সামনের ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী লড়াই দেখছে। ‘আমাদের, লোকেরা সবাই ঠিক আছে?’ কিছুক্ষণ পরে জানতে চাইল সে।

‘সবাই ঠিক আছে কর্নেল,’ পালোয়ান বলে উঠল কর্নেলের অন্যপাশ থেকে। কর্নেল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ত্রিলোক, পিটার, সোলেমান, পালোয়ান সবাই সরে আসতে পেরেছে মূল গুপ্তগোলের জায়গা থেকে।

‘আমরা কী করব হজুর?’ ত্রিলোক জানতে চাইল।

‘আমরা আরো সরে যাব, আরেকটু নিরপদ জায়গায়,’ কর্নেল আনমনে বলে উঠল।

‘আমরা যুদ্ধে—’ পালোয়ান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কর্নেল তাকে থামিয়ে দিল।

‘আমার কাছে আমার লোকদের নিরাপত্তা সবার আগে,’ বলে সে উঠে দাঁড়াল।

‘আর এই যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের কোনো সংযোগ নেই। আমি জানি সামনে কী

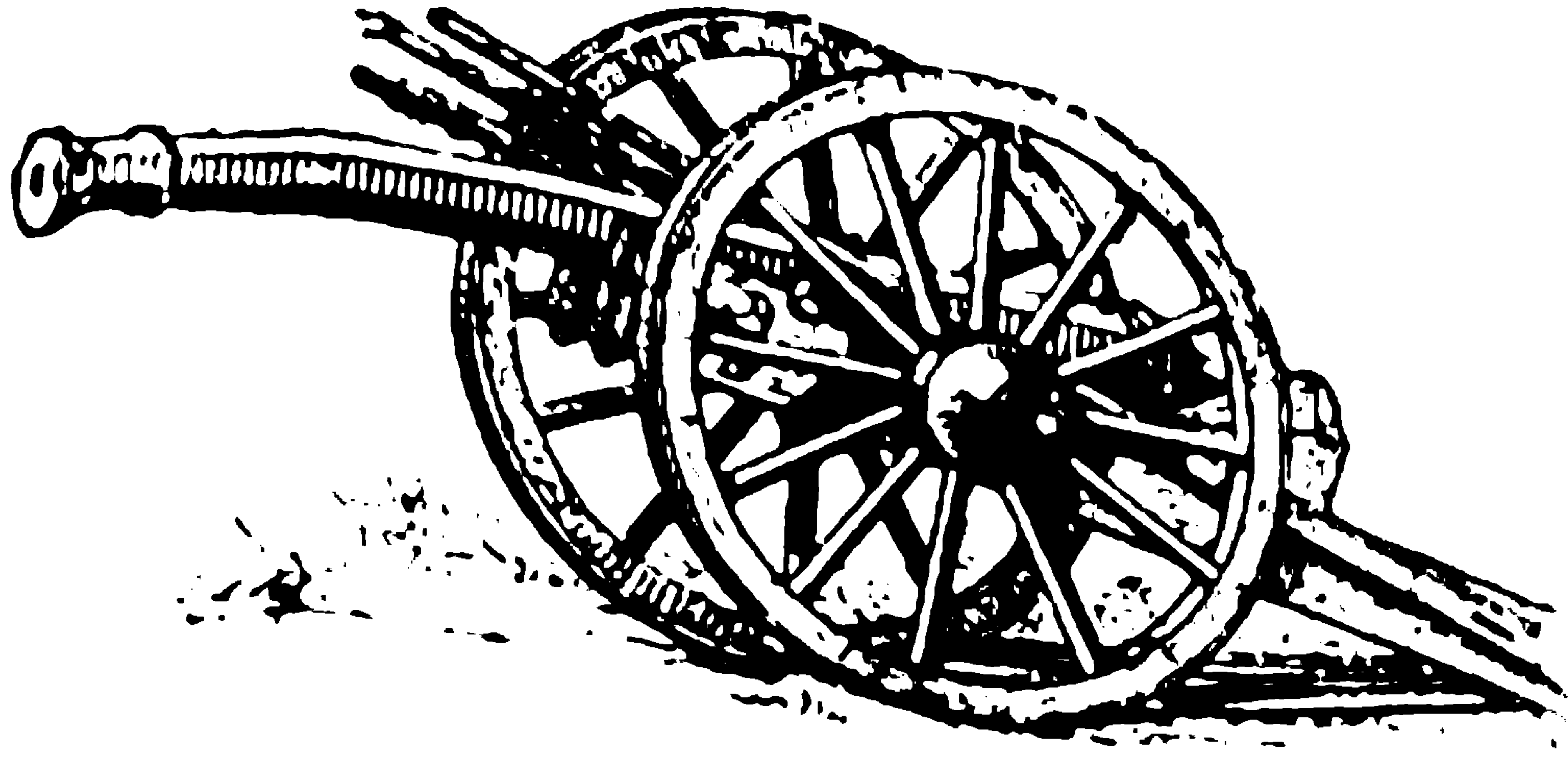
দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

করতে হবে। আমরা আরেকটু সরে পড়ব এরপরে পরিস্থিতি অবলোকন করে সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেব।’

বলে কর্নেল খানিক থামল। ‘যদি ব্রিটিশ সরকারের বাহিনী জেতে, তবে আমরা তাদের থেকে মদদ নেব, আর যদি তারা শহর দখল করতে না পারে তাহলে আমরা স্রেফ নীরবে সরে পড়ব শহর থেকে, এরপরে আমরা আমাদের মতো কাছে এগোব,’ বলে সে আবারো থেমে নিজের শরীর পরীক্ষা করে নিল। তারপর নিজের লোকদের দিকে দেখে নিয়ে বলে উঠল। ‘আমরা আজ মৃত্যুর খুব কাছে চলে গিয়েছিলাম। আর এ-জন্য পুরো দায়ভার আমার। এরপর থেকে আমাদের কাজের ক্ষেত্রে আরো সাবধান হতে হবে। সামনে আরো ভয়াবহ পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে, সেটা এই রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধে যেই জিতুক। কাজেই সবাই চলো,’ বলে কর্নেল সোলেমানের পিঠে হাত দিয়ে সামনের নরকযজ্ঞ থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে তাকাল।

তার পেছনে শাসক, শোসক, প্রভু-দাস সবাই পরস্পরের রক্তপাত ঘটানোর জন্য হিংস্র জানোয়ারের মতো লড়ে চলেছে।

যেই লড়াইতে কারো জিত নেই, রয়েছে সবারই পরাজয়।



অধ্যায় তেপান্ন
বর্তমান সময়
মিরবাড়ি সড়ক, কলেজ রোড, ময়মনসিংহ

ডাইনিংরুমে এসে যেইমাত্র বাশার সবাইকে জানাল জয়া সরকার পালিয়েছে, সবার আগে গালি দিয়ে উঠল সামিরা। সে আর রুশো প্রফেসর হামিদের স্টাডি থেকে বেরিয়ে এসেছে। রুশোর হাতে ওদের পাওয়া ছবি থেকে শুরু করে বাকি সব জিনিসপত্র। সেগুলোকে সাবধানে সামলে রাখতে বলে, অন্যদের দিকে শ্রেণী একবার ইশারা করে বাশার দৌড় দিল ফ্ল্যাটের মূল দরজার দিকে। ফ্ল্যাটের মূল দরজার সামনে এসে এক টানে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল দুই-তিন ধাপ একবারে পার হয়ে।

দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল বাড়ির দারোয়ান, বাশার আরেকটু হলে তার গায়েই বাড়ি মারত দরজার পাল্লার। দারোয়ান দেখল প্রথমে ঝড়ের বেগে বাশার এবং তারপর একে একে অন্যরা বেরিয়ে এলো। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা দারোয়ান ভাবতে লাগল লোকগুলোর হঠাৎ হলোটা কি।

চারতলা বাড়ি থেকে নেমে যতই চেষ্টা করুক না কেন দ্রুত বের হওয়ার। চাইলেও আসলে এরচেয়ে দ্রুত সম্ভব না। বাশার তাও মোটামুটি কয়েক মিনিটের ভেতরে নেমে এসে বোতলের ছিপির মতো গেট দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো বাড়ির বাইরের সামনের রাস্তায়। এসেই ক্ষণিকের জন্য সে দিশেহারা বোধ করল, কারণ সামনে কেউই নেই। বাশারের ইচ্ছে করল সে ঝেড়ে দৌড় দেয় যদিকে জয়া সরকারকে যেতে দেখেছে। কিন্তু সে দৌড় না দিয়ে নিজেকে স্থির রাখল, মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করল। অন্যদের জন্য অপেক্ষা করছে। বাশার এই এলাকা খুব ভালোভাবেই চেনে, সে জানে এই গলিটার সামনে গিয়ে মিশেছে রেললাইনের সঙ্গে এবং ওর যতটুকু মনে পড়ে এই গলিটার কয়েকটা মুখও রয়েছে। যে কয়টা মুখই

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

ধাক না কেন, সেগুলো, আর রেললাইনের সঙ্গে গিয়ে যেখানে মিলেছে সেখান থেকে অন্তত কয়েক হাজার ডিরেকশনে যাওয়া সম্ভব, কাজেই জয়া সরকার যদি সত্যিই পালাতে চায়, তবে একা তাকে কোনোভাবেই ধরা সম্ভব নয়। কাজেই অন্যদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে তাকে এবং এখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে সংঘবদ্ধভাবে খুঁজতে হবে তাহলেই সম্ভব হবে তাকে ধরা।

আরো মূল্যবান কয়েক মিনিট পার করে অন্যরা বেরিয়ে এলো একে একে। সবাই মন দিয়ে শোন, আমরা সবাই মিলে গলি ধরে সামনে এগোব, সবাই নজর রাখবে চারপাশে, জয়া সরকার যেকোনো দিকে পালাতে পারে। আর কেউ যদি দেখে তাকে তবে হয় চিৎকার করবে আর না হয়, যাদের কাছে পিস্তল আছে, ফাঁকা ফায়ার করে জানান দেবে। এখান থেকে গলির কয়টা মুখ বেরিয়েছে? বাশার প্রশ্নটা করেছে কনস্টেবল আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে।

‘স্যার তিনটা,’ জবাবটা দিল রমিজ দারোগা।

‘ইনসপেক্টর রবিউল আপনি অ্যালাট জারি করেন, রেললাইনের উলটোদিকের গলিগুলোতে এবং এখান থেকে বেরিয়ে যে দুইদিকে রেললাইন শেষ হয়েছে, সেই দুইদিকেও ফোর্স পাঠান। আর আমরা সামনে এগিয়ে যেখান থেকে গলির মুখগুলো ছড়িয়ে যাবে, সেখান থেকে আমরাও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করব। জলদি চলো সবাই,’ বলেই বাশার সামনে এগোল।

সরু গলি হওয়াতে সবাই অনেকটা সারি ধরেই এগোল, সবার সামনে বাশার, সে প্রথমে হাতে অস্ত্র বের করে নিয়ে এলেও, এখন সেটাকে আবার জ্যাকেটের ভেতরে ঢুকিয়ে রেখেছে। কারণ পাবলিক প্রেসে এভাবে অস্ত্রের প্রদর্শনী করাটা ভালো কোনো বিষয় নয়, এতে করে অতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে পারে। তার পরও এতগুলো মানুষকে একসঙ্গে এগোতে দেখে আশপাশের লোকজন তাকিয়ে রয়েছে।

সরু গলি বিকেলের সময়, দোকানগুলোকে, পুরি, সমুচা বিকেলের নাশতা ভাজা হচ্ছে, চায়ের দোকানগুলোতে বৈকালিক আড্ডার ভিড়, এর ভেতর দিয়ে আবার সরু গলি হলেও দু-চারটা রিকশাও যাচ্ছে। ফলে এতগুলো মানুষ মিলে এগোনো এবং চারপাশে নজর রাখা প্রায় অসম্ভব কঠিন একটা বিষয়। কারণ একজনমাত্র মানুষ এতগুলো মানুষের ভিড়ে যেকোনো জায়গায় হারিয়ে যেতে পারে, লুকিয়ে পড়তে পারে। কোনো দোকানের ভেতরে ঢুকে বসে পড়তে পারে বা পেছন দিয়ে সরে পড়তে পারে। কিংবা দেয়াল টপকে কোনো বাসার বাউন্ডারির ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে।

‘সব আমার দোষ,’ মৃদু স্বরে বিড়বিড় করে বলতে লাগল বাশার। সামনে গলিটার মুখ ছড়িয়ে পড়ছে দেখে বাশার সবাইকে দলে ভাগ করে দিল। ও আর রমিজ দারোগা এগোলো বরাবর, বাকিরা দুই দলে ভাগ হয়ে দুই পাশের গলি দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। ‘রমিজ ভাই, আপনি ডানে দেখেন, আমি বামে দেখব,’

সিপাহী

বলে বাশার দেখতে লাগল যতটা সম্ভব ভালোভাবে দেখে এগোনোর চেষ্টা করছে
কিন্তু প্রতিমুহূর্তে ওর কাছে মনে হচ্ছে,

কোনো অংশ বাদ পড়ে গেল কি?

জয়া সরকার কি কোনোভাবে অমেখা কোনো জায়গাতে লুকিয়ে পড়ল।

বাশার এগিয়ে যাচ্ছে আবার খেমে যাচ্ছে কারণ চাইলেও রমিজ দারোগা বেশি
এগোতে পারছে না। কাজেই বাশার আঙুলেই এগোচ্ছে, এতে করে একটা সুবিধা
হচ্ছে, ও নিজে এগোলে হয়তো আরো দ্রুত এগোত কিন্তু হয়তো অনেককিছু মিস
হয়ে যেত। এখন ধীরে এগোনোতে সবকিছু ভালোভাবে দেখে এগোতে পারছে।
এগোতে এগোতেই ওরা গলির শেষে রেললাইন দেখতে পেল।

‘রমিজ ভাই, সামনে তো রেললাইন চলে এসেছে,’ খানিকটা অসহায়ভাবেই
বলে উঠল বাশার। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রমিজ দারোগা চিৎকার করে উঠল,
‘স্যার, সামনে বরাবর ডাইনে দেখেন কোনোকুনি রেললাইন বরাবর।’

রমিজ দারোগা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বাশার সেদিকে ফিরে তাকাল কিন্তু রমিজ
দারোগা বরাবর এবং ডানে দুটো বলাতে একটু দ্বিধাবিভূত হয়ে গিয়েছিল, বাশার
ফিরে ওর দিকে তাকাতে একটু দেরি হলো। রমিজ দারোগা যেদিকে দেখাল
সেদিকে তাকিয়ে বাশারের মনে হলো, অন্ধকারে ভেতরে জয়া সরকারের শার্টের
একটা ফলক দেখতে পেল কিন্তু আবার গলির মুখ দিয়ে একটা রিকশা ঢুকতে শুরু
করাতে আবার গলির ওপাশটায় রেললাইনের জায়গাটা ঝাপসা হয়ে গেল। ‘আপনি
আসেন, আমি এগোচ্ছি,’ বলেই বাশার দৌড় দিল সেদিকে, আপনাতেই ওর হাতে
বেরিয়ে এসেছে অস্ত্র।

এরকম গলিতে চাইলেও আসলে চট করে দৌড় দেওয়া বা দ্রুত এগোনো সম্ভব
নয়, কিন্তু ওর হাতে অস্ত্র দেখে অনেকেই চমকে গেল, আবার অনেকে পথও ছেড়ে
দিল। ‘সরেন সরেন,’ বলতে বলতে বাশার দৌড়াতে দৌড়াতে আরেকটু হলে সেই
রিকশার গায়ে বাড়ি খেত, নিজেকে কোনোমতে সামলে নিয়ে লোকজনের ভিড়ের
কাঁক দিয়ে ড্রেনের ওপরের লাইন ধরে দৌড়ে ও বেরিয়ে এলো গলির শেষে যেখান
থেকে রেললাইন শুরু হয়েছে সেখানে। বাশার বাইরে বেরিয়ে প্রথমে ডানে তাকাল,
যেদিকে জয়া সরকারকে দেখেছিল, সেদিকে দেখল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।
জয়া সরকার কি আবারো কোনো গলিতে ঢুকে গেল। ডানে চেক করেই বাশার
ফিরে তাকাল বাঁ দিকে, জয়া সরকারের কোনো চিহ্নও নেই।

রমিজ দারোগাও বেরিয়ে এসেছে, বাশার আবারো অসহায়ের মতো কাঁধ
ঝাঁকাল তার দিকে তাকিয়ে। ‘রমিজ ভাই—’ আবারো সে কথা শেষ করতে পারল
না, তার আগেই রমিজ দারোগা আগের মতোই একইভাবে চিৎকার করে উঠল।
‘স্যার, ওইটা কি,’ বলতেই বাশার আবারো ফিরে তাকাল সেই ডান দিকেই।

দ্বিতীয় অংশ : একটি সময়ের ব্যবচ্ছেদ

দুঃখের জন্য বুঝতে পারল না রমিজ দারোগা আসলে কী বলছে। সামনে ট্রেনের দেওয়াল পাওয়া যাচ্ছে, ট্রেন এগিয়ে আসছে অ্যাকাডেমির দিক থেকে। আধো অন্ধকারে ওটার আলোয় উজ্জ্বলিত চারপাশ। এর ভেতরেই বাশার পরিষ্কার দেখতে পেল একজন মানুষ রেললাইন বরাবর সোজা এগিয়ে চলছে দ্রুত আসতে থাকা ট্রেনের দিকে। মানুষটা যে জয়া সরকার সেটা বলে দেওয়ার দরকার নেই।

বাশার অনেক কিছু ভেবে রেখেছিল কিন্তু এরকম কিছু দেখতে পাবে সে কল্পনাও করেনি। সে দেখল রমিজ দারোগার চোখও বড় বড় হয়ে গেছে। বাশার মনে মনে হিসেব করে দেখল, ট্রেনটা যে গতিতে এগিয়ে আসছে এবং সে যেখানে অবস্থান করছে তাতে করে জয়া সরকারকে থামানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

কিছু কিছু সময় থাকে যখন হিসাব-কিতাব শিকের উঠিয়ে স্রেফ কাজ করতে হয়, বাশারও তাই করল, সে প্রথমেই বেশ শান্তভাবেই পিঙ্কলটা নিজের হোলস্টারে রেখে দিল, তারপর প্রাণপণে দৌড় দিল জয়া সরকার আর ট্রেনের দিকে। জায়গাটা অন্ধকার, সুরু এবং বিপজ্জনক হলেও বাশার চেষ্টা করল প্রাণপণে দৌড়ানোর জন্য, কিন্তু প্রাণপণে দৌড়েও জয়ার কাছাকাছিও পৌছাতে পারবে বলে মনে হলো না ওর কাছে। চিৎকার করে উঠল বাশার, দৌড়ের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করছে, তার পরও পৌছাতে পারত না সে, কিন্তু ট্রেনের ড্রাইভারও সম্ভবত লাইনের ওপরে দাঁড়ানো জয়া সরকারকে দেখতে পেয়েছে, কয়েকবার হর্ন বাজাল সে, এখন অনেকেই সচকিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে, বাশার দৌড়ে গতি আরো বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল।

আর বিশ-ত্রিশ ফিট বাকি, বাশার কোনোভাবেই পৌছাতে পারবে না, এমন সময় ট্রেনের ড্রাইভার ইমার্জেন্সি ব্রেক চেপে ধরল, কিন্তু এত বড় ট্রেন এই অল্প সময়ে থামা সম্ভব নয়, ট্রেনের গতি কমে গেলেও জয়া সরকারকে চাপা দেবেই, গতি কমাতে, ট্রেন একটু পিছিয়ে গেলেও, চলে এসেছে প্রায় জয়া সরকারের ওপরে, এমন সময় বাশার পৌছে গেল তার কাছে, দৌড়াতে দৌড়াতে চার-পাঁচ ফিট বাকি থাকতেই সে লাফ দিল। জয়া সরকারকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল লাইনের অন্যপাশে, ট্রেনটা পার হয়ে চলে গেল ওদের ছাড়িয়ে। গতি কমেও আবার ধীরে ধীরে গতি বাড়তে শুরু করেছে ওটার।

জয়া সরকারের মোটা শরীরের সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে গেলেও পড়ে গিয়ে ভীষণ ব্যথা পেয়েছে বাশার। লাইনের পাশে থাকা ছোট পাথর আর ওপর পাশের লাইনের লোহার সঙ্গে কাঁধে বাড়ি খেয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে উঠে দাঁড়াল সে। জয়া সরকারও উঠে বসেছে, সে লাইনের সঙ্গে একটা হাত রেখে থাম ধরে বসে রয়েছে, এগিয়ে গিয়ে ঠাস করে তাকে একটা চড় মারল। বাশার, 'মাথা গেছে তোমার?' বলেই আবারো নিজের কাঁধ চেপে ধরল।

সিপাহী

জয়া সরকারের চোখ দিয়ে দর দর করে পানি ঝরছে, তার দিকে তাকিয়ে খেমে গেল বাশার। জয়া সরকারের চেহারার দিকে তাকানো যাচ্ছে না, এমনভাবে কাঁদছে সে, মনে হচ্ছে যেন তার পুরো পৃথিবী ভেঙে পড়েছে। মেয়েটার পালানো থেকে শুরু করে রেনলাইনের ওপরে দাঁড়ানো পর্যন্ত, সবকিছুতে রাগের হলকা বয়ে যাচ্ছিল বাশারের শরীরে, এই প্রথমবারের মতো তার দিকে তাকিয়ে রাগ পানি হয়ে গেল বাশারের। কেন জানি ভীষণ মায়া লাগল ওর মেয়েটার দিকে তাকিয়ে।

‘কেন বাঁচালে আমাকে বাশার?’ জয়া সরকারের গলায় কোনো রাগ নেই, অভিমান নেই, স্রেফ আক্ষেপ। ‘আমার নিজের জীবন আর সহ্য হচ্ছে না, কেন বাঁচালে আমাকে ফুঁপিয়ে উঠল সে। ‘আমি যা জেনে এসেছি এই জীবনে, যা হতে চেয়েছি, সবই ভুল সবই মিথ্যে,’ প্রায় বিলাপ করে উঠল জয়া সরকার।

বাশার এগিয়ে এসে একটা হাত রাখল তার মাথায়, ‘শান্ত হও। শান্ত হও জয়া।’

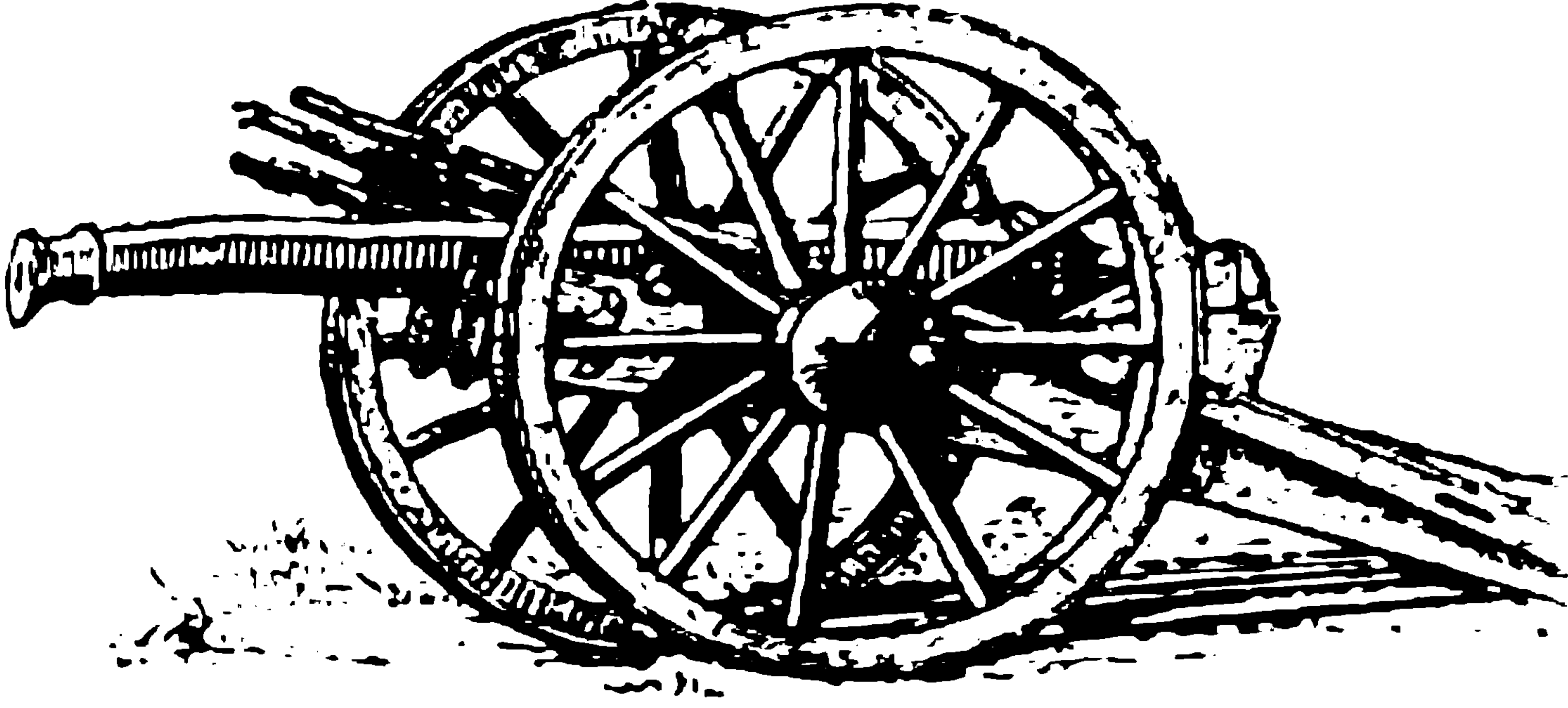
কেন বাঁচালে আমাকে বাশার!’ বাশার বসে পড়ল জয়া সরকারের পাশে। ‘শান্ত হও জয়া,’ পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষ যখন ভেঙে পড়ে তখন তাকে সাহুনা দেওয়া খুব কঠিন কাজ। বাশার বারবার একই কথা বলে চলেছে।

‘বাশার তুমি জানো না তুমি আমি, আমরা কীসের ভেতরে ফেঁসেছি,’ বলে সে চোখ তুলে তাকাল বাশারের দিকে। ‘আমরা যা জানি, যা ভাবছি সবই মিথ্যে। এই কেস রিক্রাত, তুমি আমি আমাদের চেয়েও অনেক বড় অনেক অনেক বড়,’ বলে সে আবারো ফুঁপিয়ে উঠল। ‘আমাকে বাঁচানোর কোনো দরকার ছিল না, আমি আর লোড নিতে পারছি না, বাশার আমি আর আমার জীবনের লোড নিতে পারছি না।’

‘খাক, কিছু ভাবতে হবে না, বাশার তার পাশে বসে রইল, ট্রেনটা পার হয়ে গেছে, ওদের দুজনকে ঘিরে লোক জমা হতে শুরু করেছে। বাশার জয়া সরকারের পাশে স্থান মতো বসে রইল। ট্রেনটা পার হয়ে যেতেই রমিজ দারোগা অন্যদের নিয়ে ভিড় টেলে উপস্থিত হলো। ‘কি ব্যাপার, কি হয়েছে,’ সামিরা জানতে চাইল। ‘বাশার, তুমি ঠিক আছো?’

বাশার কিছু না বলে চুপচাপ বসে রইল ছির হয়ে।

তৃতীয় অংশ
একরকম মৃত্যুর খেলা



অধ্যায় চুয়ান্ন

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

মধ্য ভারতের কোনো এক গহিন জঙ্গলে

মৃত্যু নিয়ে খেলা করাই তাদের কাজ।

কিন্তু সেটা অন্যদের মৃত্যু, নিজের মৃত্যু নয়। তবে আজ তাকে নিজের মৃত্যু নিয়ে খেলতে হচ্ছে। আর সেটাও রীতিমতো ভয়ংকর এক পাপের শাস্তি হিসেবে। কানিয়া সমাজের সবচেয়ে বড় আর ভয়ংকর পাপ, প্রেমে পড়া।

কিন্তু এই মুহূর্তে তার এসব কিছুই নিয়ে ভাবার সময় নেই, আসলে সে নিজের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত। বিগত এক ঘণ্টা ধরেই নিজের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত সে। সবকিছু ঠেলে উগড়ে আসতে থাকা মৃত্যুর প্রতিনিধিদের ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে সে প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল। ‘আর কতক্ষণ! আর কতক্ষণ!’ খুব স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুর প্রতিনিধিরা যদি নিজেদের মৃত্যুখেলার আয়োজন করে তবে সেটা সবচেয়ে ভয়ংকর হবে, এ আর এমনকি। এটা সে নিজে জানত কিন্তু এতটা ভয়ংকর হবে, এটা ভাবতে পারেনি।

মৃত্যুকে ঠেকাতে ঠেকাতে সে যখন ভাবছে এবার বুঝি মুক্তি—ঠিক সেই সময়ে সে সামনে দেখতে পেল তার মৃত্যুর প্রকৃত চেহারা, এবার সে বুঝতে পারল এতক্ষণ ধরে যা করতে দেওয়া হয়েছিল, এটা ছিল শ্রেফ খেলা, এই শেষ আয়োজনের জন্য তাকে প্রস্তুত করা, এবার তার শেষ এবং আসল পরীক্ষা শুরু হবে, এবার যদি সে উতরে যেতে পারে তবেই সে টিকে যেতে পারবে, অন্যথা নয়।

কানিয়ারা খুনি, একেবারে জাত খুনি, এরা জন্ম নেয় হয় খুন করার জন্য অথবা খুন হওয়ার জন্য। এর কোনো বিকল্প নেই, এরা সংসার করে না, প্রেম করে না, এরা সমাজ-সামাজিকতা এবং পরিবারের ধার ধারে না। এরা শুধুই খুনি এবং সবচেয়ে ভয়ংকরতম খুনি এবং সবচেয়ে সুন্দরীতম খুনি। কারণ এরা মনে করে খুন

সিপাহী

সবচেয়ে পবিত্রতম কাজ। বিষয়টা হলো আপনার-আমার কাছে এটা জনতে অন্যরকম এবং বিচিত্র লাগতে পারে, কিন্তু কানিয়াদের সবই ভিন্ন ব্যতিক্রম এবং প্রচলিত সমাজ কিংবা ধারণার একেবারে বাইরে।

প্রথমেই আসে, মানব জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর এবং নিষ্ঠুর সত্য জন্ম এবং মৃত্যু নিয়ে। আমরা যেভাবে বিশ্বাস করি, জন্ম আমার হাতে নেই কিছুটা পরিসরে মৃত্যুও আমার হাতে নেই। কানিয়ারা এটা বিশ্বাস করে না এবং মানে না। তারা মানে, তাদের জন্ম তাদের হাতেই এবং তাদের মৃত্যুও তাদের হাতেই। কেন তারা এমনটা বিশ্বাস করে এর পেছনে সঠিক এবং শক্তিশালী কিছু যুক্তি রয়েছে। প্রথমত, যেহেতু কানিয়া সমাজে প্রেম-ভালোবাসা-মায়া বলে কিছু নেই কাজেই বিয়ে বা ইত্যাদির প্রশ্নই আসে না। আর সেক্ষেত্রে তাদের সমাজে নিষিদ্ধ এবং শুধুই খুন করার বাহন। মানে কাউকে খুন করার এবং খুনি হিসেবে প্রস্তুত করার প্রয়োজন হিসেবে যদি সেক্ষেত্রে দরকার হয় তবেই সেক্ষেত্রে করতে পারে তারা। এ ছাড়া সেক্ষেত্রে তাদের ভেতরে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। প্রশ্ন রয়ে যায়, বিয়ে সেক্ষেত্রে ইত্যাদি যদি নিষিদ্ধই হয় তবে তাদের সমাজে শিশু জন্ম হয় কীভাবে। তারা শিশু চুরি করে আনে।

গৃহস্থের বাড়ি, মেলার মাঠ থেকে শুরু করে সবখান থেকে তারা শিশু টার্গেট করে, সুস্থ সবল এবং শক্তিশালী কোনো বাচ্চা যদি তাদের পছন্দ হয়, তবে সেটাকে তারা টার্গেট করে এবং যেকোনো মূল্যে চুরি করে নিয়ে আসে তাদের মাঝে। কিন্তু বাচ্চা চুরি করাটা তাদের কাছে বাচ্চা জন্মদান নয়, তাদের বাচ্চা জন্মদান শুরু হয় বাচ্চা চুরি করে আনার পর। একক কঠিন এবং ভয়ংকর প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এক যুগ ধরে যেসব শিশু টিকে থেকে নিজেদের ভয়ংকর এক অস্ত্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারে এবং তাদের নির্দিষ্ট বয়েসের পরে কানিয়াদের ভাষায় যেটাকে তারা জন্মদান বলে সেই দুর্ধর্ষ মৃত্যুর খেলার ভেতর দিয়ে টিকে যেতে পারে, তাদের তারা নিজেদের একজন হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। দীর্ঘ বারো বছরের প্রশিক্ষণ এবং মৃত্যুকরী লড়াইয়ে টিকে থাকার পর যেসব শিশু টিকে যায় এদের তারা নিজেদের একটা নাম দেয়, এর আগ পর্যন্ত এদের অস্তিত্ব শুধুই একটা প্রতীক চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর সেই মুহূর্তে এদের নাম দেওয়া হয়, সেই সময় থেকে শুরু হয় খুনি হিসেবে এদের প্রকৃত প্রশিক্ষণ। তাদের প্রশিক্ষণের তিনটে ধরন থাকে এবং পাঁচটা স্তর থাকে। তিনটে ধরনের ভেতরে রয়েছে বিদ্যা শিক্ষা, অস্ত্র শিক্ষা এবং কলা শিক্ষা। আর ছয়টা স্তরের ভেতরে রয়েছে আলাদা প্রয়োগ, প্রকৃত প্রয়োগ, মিশ্র প্রয়োগ, তীব্র প্রয়োগ এবং স্রষ্টা প্রয়োগ। তিনটা ধরনের বিষয়ে কোনো মাফ নেই তিনটা ধরনে এরা সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্জন করার পর এদের প্রয়োগের ধরনের ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। মূল বিষয়টা হলো তিনটা ধরনে এরা যা শিখে সেটাকে

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

প্রয়োগের ভিত্তিতে যে ক্ষুরে নিয়ে যেতে পারে, সেই হিসেবে তাদের প্রস্তুত করা হয়। যেমন কেউ হয়তো ছুরি বিদ্যা খুব ভালো শিখেছে কিন্তু সেটাকে বাস্তবিক প্রয়োগের ক্ষুরে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে, যে পর্যন্ত সেটা করতে না পারবে তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হবে না। যাই হোক তিনটা ধরনের পর তিনটা প্রয়োগের স্তর পার করতে পারলেই একমাত্র তাদের খুনি হিসেবে ময়দানে নামানো হয়। আর বাকি দুটো প্রয়োগ তারা সারাজীবন ধরে শিখতে থাকে। মানে বিষয়টা হলো, তারা মূলত সারা জীবন শিক্ষা এবং ক্রমাগত উন্নয়নের ভেতর দিয়ে যেতে থাকে মৃত্যুর অঙ্গ পর্যন্ত। আর প্রতিটা শিশুর একজন করে গুরু থাকে, মূলত সেই তার বাবা, তার মা এবং তার একমাত্র আত্মীয়।

যেহেতু তাদের জন্য থেকে আলোচনা শুরু হয়েছিল এবার সেটা শেষ করতে হবে মৃত্যু দিয়ে। তাদের অন্যসব যেমন আলাদা, ঠিক তেমনি মৃত্যুর ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা তাদের ভেতরে। যেমন জন্মকে তারা যেমন নিজের মতো করে তৈরি করে, মৃত্যুকেও তারা ঠিক তেমনি মনে করে। এরা কখনো মৃত্যুকে প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেয় না। তাদের বিশ্বাস নিজেদের কাজ মানে খুন করার সময়ে, যদি তাদের মৃত্যু হয়, তবে সেটাই তাদের জন্য সবচেয়ে সুন্দর মৃত্যু, তারা কখনো ধরা পড়লেও তাদের নখের সঙ্গে আটকানো বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করবে। আর যদি কাজের সময়ে মারা না যায়, তবে এরা বয়স্ক হলে বিরাট আয়োজনের মাধ্যমে রীতিমতো উৎসব করে নিজে যেচ্ছামৃত্যু বেছে নেবে।

এরা কখনো কারো কাছে কিছুই বলবে না। কখনো, কোনো তথ্য ফাঁস করবে না। না নিজেদের বিষয়ে, না অন্য কারো বিষয়ে। সত্যি কথা হলো নির্দিষ্ট কিছু মহল বাদে এদের অস্তিত্বের ব্যাপারে জানেই না। আর যারা এদের ব্যাপারে জানে, এরা রাজ-রাজা থেকে শুরু করে দেশ-দুনিয়া পৃথিবী পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, আর সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য এদের ব্যবহার করে। এদের কোনো অস্তিত্ব নেই, এদের কোনো রং-রূপ চেহারা নেই, এরা সবার সঙ্গে সবার মাঝে মিশে গিয়ে যেকোনো উপায়ে নিজেদের কাজ হাসিল করে। এরা ইতিহাস তথা ভারতবর্ষের সবচেয়ে ভয়ংকরতম খুনির দল। আর সেই দলের সদস্য হয়েই প্রেমে পড়ে গিয়েছিল সে।

ঘটনাটা ঘটে আজ থেকে কয়েকমাস আগে, যখন তাকে বিশেষ এক কাজ পাঠানো হয়েছিল ভিন্ন এক শহরে। তার ওপরে দায়িত্ব ছিল মাথুরার এক ভূপতি রাজা বিক্রম সিংকে হত্যা করার। কাজটা তার জন্য তেমন কোনো কঠিন কাজই ছিল না। সেই ভূপতির হাজার লাঠিয়ালের বাহিনী তার জন্য কোনো বাধা হতে পারেনি। কারণ দীর্ঘদিনের নজরদারির পর বাড়ির কাজের লোক সেজে সে ঢুকে গিয়েছিল সেই ভূপতির বাড়িতে, তারপর ঠিকই নিজের কাজ হাসিল করে বেরিয়ে

সিপাহী

যাচ্ছিল, কিন্তু গোল বাধে সেই সময়ে সেই দিনই শহরে ঢুকে পড়ে বিদ্রোহী সিপাহীদের দল। আর তাদের সঙ্গে গোল বেধে যায় শহরে অবস্থানরত ইংরেজদের ছোট একটা বাহিনীর। এরকম খণ্ডযুদ্ধ তার জন্য কিছুই না, কিন্তু সে বেমক্কা পড়ে যায় এক খণ্ডযুদ্ধের মাঝে এবং ছুটে আসা গুলিতে ভয়বহ আহত হয়ে পড়ে যায় নদীতে। আর সেখান থেকে তাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় উদ্ধার কয়েকজন বেদে। সেখানেই ঘটে তার জীবনের সবচেয়ে বাজে ঘটনা। প্রেমে পড়ে যায় সে, যখন ভাবছে সব ফেলে পালিয়ে যাবে, নিজের গোত্র হানা দেয় তার জন্য, সেটারও প্রস্তুতি ছিল তার, কিন্তু সে জানতে পারে যার প্রেমে পড়েছে সেও তার মতোই আরেক খুনি গোত্রের লোক, বেদের ছদ্মবেশে সেও খুন করতেই গিয়েছিল মাথুরা।

অনেক অনেক হান্সামার পর তাকে ফিরিয়ে আনা হয় ঘরে। লম্বা সময় বন্দি থাকার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাকে আরেকবার সুযোগ দেওয়া হবে কিন্তু তাকে দ্বিতীয়বার জন্ম নিতে হবে। যদি সে পারে, তবে তাকে আবারো নতুন নাম দিয়ে নতুন গুরুর অধীনে দিয়ে আবারো সে নতুন জীবনে ফিরতে পারবে। এরকম জন্মান্বানের প্রক্রিয়ায় কী ঘটে সে জানে। জীবন বাজি রেখে এমনকিছু কাজ করতে হবে যা প্রায় অসম্ভব, তার ক্ষেত্রে বেছে নেয়া হয় সবচেয়ে পুরনো পন্থা, লড়াই।

এরা প্রাচীনত্বে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে প্রাচীন পন্থাই সেরা পন্থা। তার ক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হয় প্রাণীর লড়াই। এদের একটা বিশ্বাস হলো, মানুষ ভয়ংকরতম প্রাণীদের সঙ্গে লড়াই করে টিকে গিয়েই আজ পৃথিবীর অধিশ্বর। কাজেই সে যদি প্রাণীদের সঙ্গে লড়াইয়ে টিকে থাকতে পারে, তবেই নবজন্ম নিতে পারবে সে। অন্ধকার এক গুহায় এক মশাল আর একটা বর্শা দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাকে। বিগত এক ঘণ্টায় সে দুটো মেছোবাঘ আর তিনটে হায়নার সঙ্গে লড়াই করে টিকে গেছে। হায়নাদের হত্যা করার পর রক্তাক্ত শরীর নিয়ে সে যখন। সোজা হয়ে দাঁড়াল মৃদু হিস হিস শব্দে বুঝতে পারল তার শেষ পরীক্ষাটা আসলে কি। জঙ্গলের সবচেয়ে শান্ত আবার হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে লড়াইতে হবে তাকে। অজগর।

অজগর সাপ আসলে খুবই নিরীহ প্রাণী যদি তার পেট ভরা থাকে। আর যদি সে ক্ষুধার্ত থাকে তবে এরচেয়ে হিংস্র এবং শক্তিশালী প্রাণী পৃথিবীতে আর নেই। গুহায় অন্ধকার কোণ থেকে ফিসফিসে ধ্বনি শুনে সে বুঝতে পারল, সাপটাকে এখন কোনো ফোকড় দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জঙ্গলের লড়াইতে তার অভিজ্ঞতা নতুন নয়, সে সাপটার নড়াচড়াতেই বুঝতে পারছে এটা কমপক্ষে বিশফুট অজগর এবং এটাকে দীর্ঘ সময় না খাইয়ে রেখে এই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। অস্থির নড়াচড়া করতে করতে সাপটা ধীর লয়ে, তার থেকে দশ ফুট সামনে ছিন্ন হলো। গুটার খুতনি মাটিতে রাখা, লেজও মাটিতে শরীরের মধ্যের অংশ ক্রমাগত নড়াচড়া করছে। তীব্র ক্ষুধা আর আক্রোশের লক্ষণ।

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

তার রক্তাক্ত বর্শাটা সে মাটিকে খাড়াভাবে রেখে সোজা হলো। সাপটা তার প্রতিটা নড়াচড়া পরখ করছে। বর্শাটা রেখে সে ওপরের দিকে দেখল, খুব ভালোভাবেই জানে, ওপর থেকে তাকে তার লোকেরা সবাই দেখছে। তারা পুরো লড়াই দেখেছে। ওপরের দিকে দেখে নিয়ে সে বুক ভরে দম নিল তারপর ওহার মাটি একমুঠো ভরে নিয়ে দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মেখে নিল, তারপর বর্শাটাকে তুলে ওটার ফলাটার গোড়া হাঁটুকে রেখে সর্বশক্তি দিয়ে চাপ দিয়ে ভেঙে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সাপটার মাথা শূন্যে উঠে গেল তিনফিটের মতো। বর্শার ফলাটা দাঁতে কামড়ে ধরে, সোজা ছুটল সে সামনের দিকে, সাপটা এটা আশা করেনি, খানিক চমকে গেছে। তিনফিট থাকতেই সে শূন্যে লাফ দিল, ইচ্ছে যেকোনোভাবে সাপটার ওপরে নেমে ওটার চেন্টা নাকের ওপরে বসিয়ে দেবে দাঁতে ধরা ফলাটা।

কিন্তু ভাবলেই তো হবে না, সেটাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। তার শরীরটা ছিল অনেকটা ধনুকের বাঁকানে জ্যার মতো, যখন সে দৌড়াচ্ছিল। আর সেখান থেকে সে যখন সোজা হলো চিত্রটা হয়ে গেল পুরো উলটো। জ্যা থেকে সে বদলে গেল তীরে। অল্প দিনের অনায়াস সাধন তো নয়, দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম, আর যাতনার ভেতর দিয়ে নিজেকে নিয়ে যেতে যেতে যখন শরীর আর মন ভাবে যে আর কোনো উপায় নেই, সামনে কোনো পথ খোলা নেই, সেই সময় প্রতিবার সে আবিষ্কার করেছে এবার তাকে আবারো উঠে দাঁড়াতে হবে, আবারো শক্তিশালী হয়ে মোকাবেলা করতে হবে সবকিছুর, আর এ-কারণেই সে সেরাদের সেরা। কিন্তু কোনোকিছুতেই কাজ হলো না।

শরীরটা মুক্ত তীরের মতো শূন্যে উঠে গেছে, এক ফুট-দুই, ফুটি-তিনফুট উঠে এবার খানিক সামনে এগোতে তারপর শরীরটা নামতে শুরু করবে, আর সেটা করার সময়ে এক ফাঁকে মুখ থেকে নিয়ে নেবে ছুরিটা—আর সেই সঙ্গে শরীরটা নামতে নামতে ওটাকে বসিয়ে দেবে জায়গামতো। কিন্তু শূন্যে থাকা অবস্থাতেই সে এমনকি পলক ফেলার আগেই সাপটার মাথাটা আবারো নেমে গেল বেশ অনেকটা শরীরের মধ্যের অংশ একটু না নড়ে লেজটা একবার শূন্যে মুক্ত হয়ে ছুটে এলো তার দিকে। কোমর আর পেটের মাঝামাঝি পালকের মতো পলক বুলিয়ে ওটা চলে গেল তার পায়ের দিকে। শূন্যে থাকা অবস্থাতেই তার গোড়ালি ধরে টান মারল নিচের দিকে।

যেখানে সমান্তরালভাবে উড়ে গিয়ে সাপটার পেছনে বা মাঝামাঝি নামার কথা ছিল তার, সেখানে শূন্যের ওপরেই ভারসাম্য হারাল সে। মুখ থেকে ছুটে গেল ছুরিটা, আর যাত্রাপথ থেকে ছুটে গেল সে নিজে। পুরোপুরি ভারসাম্য হারিয়ে আছড়ে পড়ল বেলে মাটিতে, নাকটা বাড়ি খেয়ে গলগল করে বেরিয়ে এলো রক্ত, তীব্র ব্যথার চোটে জ্ঞান হারাতে হারাতে সচেতন রইল সে। সচেতন না থেকেও

সিপাহী

উপায় নেই, কারণ লেজটা তাকে টেনে নামিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, ওটা হরহর করে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে নিজের দিকে। সে ভালোভাবেই জানে এরপর কী ঘটবে, সাপটা তাকে নিজের দিকে টেনে নিতে নিতে ধীরে ধীরে শরীরের ভাঁজ খুলতে শুরু করেছে। একবার নিজের পরিধির ভেতরে নেওয়া মাত্রই প্যাঁচিয়ে ধরবে তাকে, তারপর মোচড় দিয়ে হাড়গোড় ভেঙে স্রেফ মণ্ড বানিয়ে ফেলবে তাকে, এরপর ধীরে ধীরে গিলতে শুরু করবে তার হ্যাংলা-পাতলা শরীরটাকে। ওপর থেকে দেখতে থাকা তার গোত্রের খুনিরা স্রেফ দেখবে, লড়াইয়ে হেরে যাওয়ার কারণে, সামান্য দুয়ো দেবে তাকে, তারপর ভুলে যাবে একমাসের ভেতরেই।

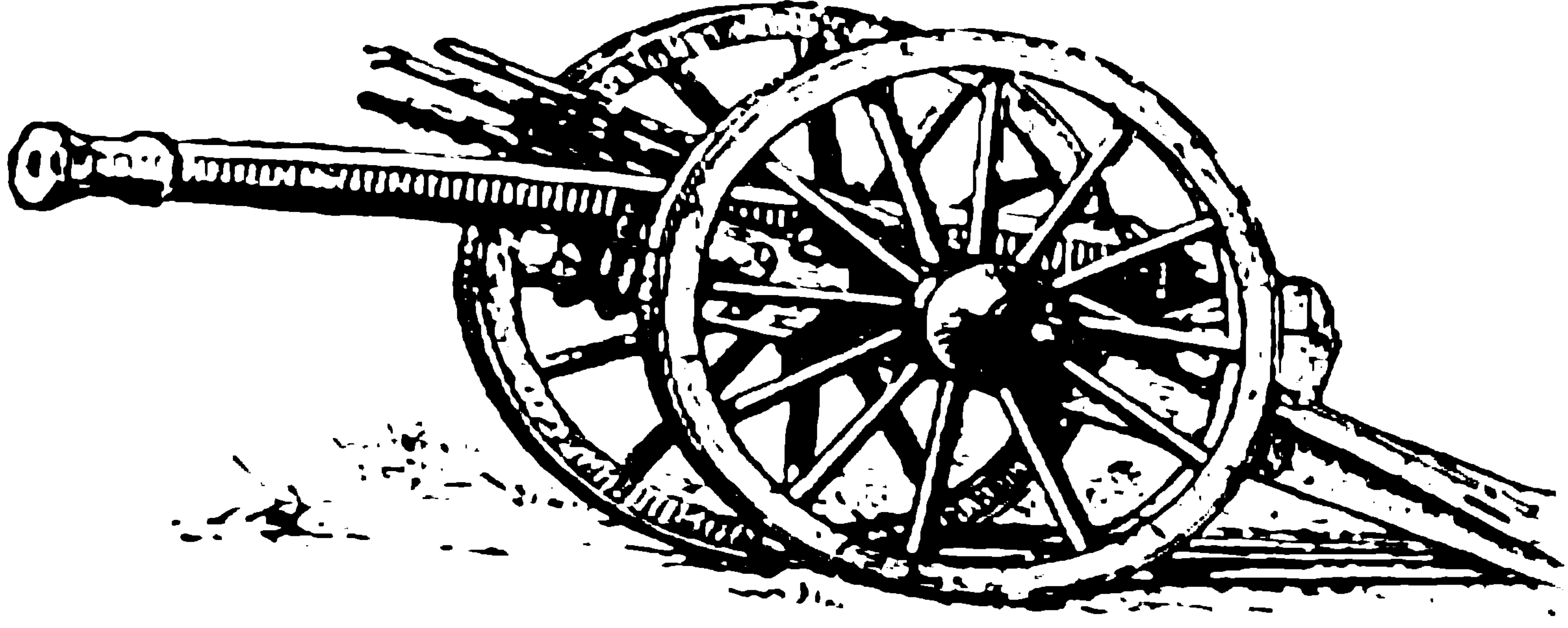
কিন্তু সে তো সেটা হতে দিতে পারে না, এজন্য তো তার জন্য হয়নি। চোখ ঘোলা হয়ে আসছে, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। নিজে রক্ত বের হতে থাকা নাকটা সর্বশক্তি দিয়ে আবারো বাড়ি মারল সে মাটিতে। সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল, তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল সে। ওপর থেকে পা দিয়ে লাথি মারল লেজ, কিছুই হলো না, টেনে নিয়ে চলেছে তাকে। সে চোখ মেলে দেখল ছুরিটা পড়ে আছে অন্যপাশে, ওটার কাছে যাওয়ারও উপায় নেই। মাটিতে হাতড়ে পাতড়ে ধরার চেষ্টা করল সে, কিছুই পেল না। আর ফুটদুয়েক রয়েছে। মাথা ঘুরিয়ে দেখল সাপটার জিভ বের হচ্ছে আর ঢুকছে, চোখে সম্মোহনী দৃষ্টি, শরীরটাকে ঢিলে করে দিল সে। সাপটা আরেক টানে অনেক দূরে দিয়ে গেল, যখন আর আট-দশ ইঞ্চি বাকি, শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে সাপটার দিকে পা বাড়াল সে, তার খোলা পায়ের গোড়ালি সোজা গিয়ে লাগল সাপটার এক চোখে। সঙ্গে সঙ্গে ভড়কে গেল সাপটা, সামান্য আলগা হয়ে গেল পায়ের বাঁধন। নিজেকে ছাড়ানোর পরিবর্তে সে উলটো লাফিয়ে পড়ল সাপটার শরীরের ওপরে। নড়তে থাকা মোটা গাছের গুঁড়ির মতো শরীরটার ওপর দিয়ে ধরে ফেলল সাপটার ঘাড়ের কাছটায়, চেপে ধরল সাপের দুই চোখ। এই বিশেষ প্রজাতির সাপের সবচেয়ে দুর্বল পয়েন্ট।

চোখের ওপরে চাপ খেয়ে সাপটা প্রথমে নরম হয়ে গেল, তারপর রাগের সঙ্গে ঝাপটা মারল, নিজেকে সামলাতে গিয়েও একপাশে ছিটকে পড়ল, সাপটা আবারো চেপে ধরার চেষ্টা করল তার পা, এবার আর সেই সুযোগ দিল না, যেখানে মাটিতে পড়েছে সেখানই পড়ে রয়েছে বর্ষার ফলাটা, সেটা উঠে নিয়ে বাঁ হাতে চেপে ধরে লাফ দিল সে এগিয়ে আসতে থাকা লেজটার দিকে, ওটার শক্তিশালী অংশটা এগোনোর জন্য মাটিতে গড়ান দিল, একবার-দুইবার গড়ান দিয়ে ওটার শরীরের দুই অংশ এগিয়ে চলে এলো একেবারে মাথার কাছে, সাপটার হাঁ করে থাকা মুখের কাছটায় ঘাড় চেপে ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু হাক ফসকে গেল, একবার দুবার,

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

সেটার শরীর গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে, প্যাঁচিয়ে ধরছে তাকে, চাপ বাড়তে শুরু করেছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে তার, আর অল্প সময় এর পরেই দম হারাবে সে, আর যাবে শরীরের হাড়গোড়, শেষবারের মতো একবার পা-হাত দিয়ে চেপে ধরল হাতটা। বা হাতে নামিয়ে নিয়ে এলো ছুরির মতো বর্শার ফল্গাটা, ঠিক দুই চোখের মতো গুঁথে গেল গুটা। হিস হিস শব্দের সঙ্গে মোচড়াতে শুরু করল। শরীরের চাপ বড়ছে, চাইলেও ঠেলে নড়াতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত কি মৃত সাপের চাপেই মারা যাবে সে। কিন্তু সেটার আগেই কেউ একজন টেনে বের করে নিল তাকে। শুইয়ে নিল মাটিতে, কতক্ষণ ওভাবে পড়ে ছিল সে জানে না। চোখ মেলে দেখল পরিচিত কিছু চেহারা চোখের সামনে কারো মুখে হাসি নেই, তবে সবার চোখে নীরব প্রশংসা।

নবজন্ম হয়েছে তার, টিকে গেছে সে পরীক্ষা। 'প্রতিশোধ,' বিড়বিড় করে বলে উঠল সে। 'রাজা বিক্রম আর মিস্ত্রি।'



অধ্যায় পঞ্চদশ
বর্তমান সময়
পিবিআই এস হেডকোয়ার্টার, ঢাকা

কমিউনিকেশন রুম থেকে বের হয়ে আসা হাবিব আনোয়ার পাশার চেহারা দেখে মৌসুমি আন্দাজ করতে পারল, ইন্টারপোলের সঙ্গে আনোয়ার পাশার মিটিং খুব একটা ভালো হয়নি।

‘স্যার, কেমন—’

অন্য কোনো বস হলে রেগেমেগে বা মুখ ভার করে কিছু একটা বলত, কিন্তু হাবিব আনোয়ার পাশা সেরকম কিছু করল না, সে থেমে দাঁড়িয়ে মৌসুমির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিল। ‘খুবই ভালো মিটিং হয়েছে, এতটাই ভালো যে এখন তোমার সেই বিশেষ কফি না খেলে আর মুড ঠিক হচ্ছে না।’

‘শিওর স্যার,’ বলে মৌসুমি উঠে দাঁড়াল। কিছু মানুষ থাকে, যাদের হাসি দেখলে আপনার হাসি উবে যাবে, কিছু মানুষ আছে যাদের হাসি আপনাকে ভাবাবে, আর কিছু মানুষ রয়েছে যাদের হাসি আপনার মুখে হাসি এনে দেবে। আনোয়ার সেরকম শেষ গোত্রের একজন মানুষ। মৌসুমি কফি বানিয়ে ফিরে এসে দেখল সে তার ডেস্কের গায়ে হেলান দিয়ে সিগার টানছে। ‘স্যার আপনার কফি,’ মৌসুমি কফির মগ এগিয়ে দিয়ে তার চেয়ারে বসে পড়ল।

‘স্যার, আপনার দিন তো পুরোপুরি ম্যাসাকার হয়ে গেছে,’ সে আনোয়ার পাশার দৈনিক রুটিনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল।

‘উপায় কি এক কাজের ভেতরে অন্যকাজ করতে হচ্ছে, যে মিটিং শেষ হওয়ার কথা ছিল আধা ঘণ্টায়, সেটা লাগছে দুই ঘণ্টা। মানুষ দেখা করার জন্যে বসে রয়েছে, আর মন্ত্রী-এমপিদের সঙ্গে আজাইরা প্যাঁচাল পাড়তে হচ্ছে,’ বলে সে কফিতে চুমুক দিয়ে কিছুক্ষণ সিগার টানল। মৌসুমি কিছু বলল না, কারণ সে জানে

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

আনোয়ার পাশা তার কথা শেষ করেনি। 'শোন,' বলে সে তার ঘড়িতে সময় দেখল। 'এক কাজ করি, আমরা শিডিউলগুলো আবার ফিক্স করি।'

'জি, স্যার,' বলে মৌসুমি তার ট্যাব ওপেন করল। 'স্যার, হিসেবে এতক্ষণে আপনার আমাদের ফাইন্যান্সিয়ার মাহবুব স্যার এবং তার রাইট হ্যান্ড ম্যান হামিদ স্যারের সঙ্গে মিটিং হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সেটা হয়নি কারণ প্রথমে আপনার শিডিউল দেরি হলো আবার আপনার অ্যাডেইলেবল টাইমে উনাদের সমস্যা ছিল। তবে, উনারা বলেছেন আগামী দুই ঘণ্টা উনারা অ্যাডেইলেবল আছেন।'

'গ্রেট, তারপর,' মৌসুমি জানে আনোয়ার পাশা আগে সব শুনবে, তারপর বলবে কোনটা কোনটা করবে সে।

'স্যার এরপর, আপনার সিলেটে তানভীর স্যার এবং চট্টগ্রামে শারিয়ার স্যারের সঙ্গে কথা বলার কথা ছিল—'

আনোয়ার পাশা আরেকবার ঘড়ি দেখল। 'এটা এখুনি করব আমি, কারণ আরেকটু পর হলেই ওরা আর অ্যাডেইলেবল থাকবে না,' বলে সে কমিউনিকেশন রুমের সামনে থাকা ছেলেটাকে ডেকে কিছু নির্দেশ দিল। 'এরপর বলো।'

'স্যার, ইন্টারপোলের সঙ্গে আপনার মিটিং তো হয়েই গেছে—'

'উফফ, আর বলো না, ওটার কিছু ফলো আপ রয়েছে, ওগুলো আমার তানভীর শারিয়ার আর বাশারকে জানাতে হবে। বাশারের আপডেট বলো।'

মৌসুমি দ্রুত বলে গেল। 'যাক কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে, কিন্তু—শোন,' সে সিগারেটান দিয়ে বলে উঠল। 'বাশার যা করছে করুক তুমি বাইরের ফোর্সগুলোকে বলো আরো অ্যাকটিভ হতে, ওদের নদীর কোস্টাল লাইন ধরে এগোতে বলো। বাশারের সঙ্গেও আমার কথা বলতে হবে, তবে সেটা ওদের পর। এরপর বলো—'

'স্যার, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা প্রফেসর ইফতেখারের সঙ্গে আপনার মিটিং—'

'ওটা হলো না কেন?' আনোয়ার পাশাকে খানিক বিরক্ত মনে হলো মৌসুমির কাছে।

'স্যার, উনার শরীর হঠাৎ খারাপ করাতে, শিডিউলটা রাখা যায়নি, আপনিও ব্যস্ত হয়ে যাওয়াতে জানানো যায়নি।'

'হঠাৎ খারাপ বলতে কি আবার তার ওপরে কোনো ধরনের আক্রমণ হলো না তো, বা তাকে কোনো মেডিসিন দিয়ে অসুস্থ করে—'

'না, স্যার উনি একদম সিকিউরড প্রেমিসে রয়েছেন, উনার আসলে অতিরিক্ত স্ট্রেসের কারণে উনার শরীর হঠাৎ কল্যাপস করেছে।'

'এক কাজ করো, উনাকে আর্মি হাসপাতালে ট্রান্সফার করো, উনার মেয়ে পৃথাকেও থাকতে বলো তার সঙ্গে থাকতে। এতে দুজনেই নিরাপদ থাকবে। আমি প্রথমে বাশার, তানভীর আর শারিয়ারের সঙ্গে কথা বলব। এরপর মাহবুব ভাইয়ের

নিপট

স্বপ্ন, দেশেই যদি থাকতেন তবে দেবা তার কথা কান্ট চাই, যাঁর চাঁদ
কিন্তু তার চাঁদ এই কোন সন্ধ্যার চাঁদটা আর এর ভেতর দিকের সন্ধ্যা
কিন্তু কোন কোন আশ্রয় আসার সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবে। ১৯৮৮
যদি সে কখনও কখনও শের চুকত দিয়ে নিশাটটা আশ্রিতে দেয় নিশাট
কিন্তু কখনও কখনও নিজে এগোল জানতারা পাশা।

নিব্বায়েএন ল্যাব

নতুন বাজার, ময়মনসিংহ

‘জান কি অবস্থা?’ বাপার হাঁটতে হাঁটতে ল্যাবের অ্যানিসট্যাট ছেলের কাছ
জানতে চাইল। মোটা লেন্সের ওপাশ থেকে ছেলের চোখের নীচে নেড়ে বসে উঠে
‘স্যার, উনার একজন চাকরির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। প্রথম কথা দরজা
সম্পূর্ণ খোঁচায়ে ছানার করা হবে কিন্তু আপনাকে কথা জেনে নিশাটের টিউব
কমপক্ষে সেটা করা হয়নি। কিন্তু ভাঙার দেখে নিশাটের দিগে গেছেন, আর এক
করতক একজন নার্স রয়েছে।

‘নিশাটের দেওয়া হয়েছে কত আগ?’ মোবাইলে সময় দেখতে দেখতে বাপার
জানতে চাইল।

‘স্যার, কতকালেক আগে,’ ছেলেরা জানাল।

‘বাক, আসো। কেমন রাখা, নার্স তো রয়েছেই সেই সঙ্গে তার কবজ
বাইরে নিশাটের দিগে রাখা করে। ‘আর আমি যা যা বলেছিলাম করা হয়েছে?’

‘জি, স্যার টিবি স্যার আর ইনসপেক্টর রবিউল সব ব্যবস্থা করেছেন, কবজ
স্যার, আবদুল্লাহ ভাই, নার্সরা ম্যাডামসহ বাকিরাও সবাই রয়েছে ল্যাবের
দরজাখন করে।’

‘তব, ধন্যবাদ তোমাকে,’ বলে বাপার মৃদু হেসে যোগ করল, ‘তোমাদের
একটা জায়গার কাজ করতে হচ্ছে সেজন্য আমি দুঃখিত।’

‘না, স্যার,’ ছেলেরা কে সেখান থেকে বনে দালো সে লজ্জা পেয়েছে। ‘এমনিতে
সময়কাল রেজিস্টার ডিউটির বাইরে একাইটি কিছু থাকেই না, এখন উদ্বেজনা
কিছুজান পুরো অফিসে, বজা লাগছে বেশ।’

বাপার হেসে নিজের শার্টের কাঁচ লিঁক ঠিক করতে করতে হাতে ধরা
জ্যাকেটটা পরে নিল। কলকাতা রোডে জয়ার আশ্রয়ত্যাগ চেষ্টার কাহিনীর পরে ও
ল্যাবে ফিরে আসা করে শাওয়ার নিয়েছে। তারপর কাপড় বদলে ভালোভাবে ধোয়ে
নিয়ে এরপর ফিরছে ল্যাবে। তবে ল্যাবে ফিরেই সে কিছু নির্দেশনা দিয়েছিল।

তৃতীয় অংশ : এককম মৃত্যুর কেল্লা

কিছু চেষ্টা হলে নেবে নিজে তাকে কাজ শুরু করতে হবে। ল্যাভের দরজার
খোঁচ খোঁচ বড় ভয় নয় নিলি বাশার। হঠাৎ ক্রান্ত লাগছে। শেষবার করে
চেষ্টা চুটিয়েছিল বনই নেই। সেই বারোতুইয়াদের কেস থেকে শুরু করে
একটু বরফ এই কেস, আর শুধু কেস তো নয় একটার পর একটা উত্তেজনা
এ লক্ষ্য নয় ঘটনা, শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্রান্ত করে তুলেছে ওকে।
এই প্রকল্প কোনটাই নয়, কারণ এককম ক্রান্ত হওয়ার এবং ক্রান্ত হয়েও দিনের
কোন খণ্ড কাজ করে যাওয়ার অভ্যাস রয়েছে ওর।

সেই অন্য জায়গাতে। আসলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বোধ করছে সে।
কিন্তু কাজ হার দেড় দিন পার হলে যাওয়ার পরেও রিকাতের কী হয়েছে সেটা সে
কোন পরিস্থিতিতে বের করতে পারেনি। অপহরণের সঙ্গে খুব শক্তিশালী কেউ
জড়িত এবং তারা আসলে রিকাতকে অপহরণ করে কিছু একটা করতে চাচ্ছে
এমন নিয়ে। মনে হচ্ছে এখন অবধি তারা সঠিক পথেই এগোচ্ছে কিন্তু প্রশ্ন হলো,
কোন কি তাই। তারচোরে বড় কথা ওরা কী চাচ্ছে সেটা পুরোপুরি পরিষ্কার নয়
এক দিন তারা বিস্ময়টার সমাধান করতেও পারে তাহলে কি আদৌ রিকাতকে
ছাড়বে—না অন্যকিছু। বাশার মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে কেসের সঙ্গে
এগোচ্ছে কিন্তু তাকে এর সঙ্গে আরো কিছু বের করতে হবে। পুরোপুরি ওদের
শিরের চলনে হবে না। কথা বলতে হবে তাকে হাবিব আনোয়ার পাশার সঙ্গে।

বুক ভরে বড় করে দম নিয়ে ল্যাভের ঘোলা কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে
পড়ল কশার। ল্যাভের ভেতরে সবাই উপস্থিত, ইনসপেক্টর রবিউল বাদে প্রায় বাকি
সবাই রয়েছে। রুশো আর টিমি খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলতে বলতে ল্যাভের
দরজার কাছে ল্যাপটপ আর ট্যাব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে, সামিরা, রমিজ দারোগা
আর আবদুল্লাহ কথা বলছিল, ওকে দেখে ফিরে তাকাল। টিমি আর রুশোও হাত
নড়ল।

‘টিমি ঠিক আছে?’ সামিরা জানতে চাইল।

‘বেটার, বাট নট ওকে,’ বলতেই বাঁ হাতে ধরে ডান কাঁধে সামান্য মোচড়
নিল ও, জরাকে বাঁচাতে গিয়ে ওটাকে বেশ ভালোই আঘাত পেয়েছে। ওষুধ
খেলও সামান্য ব্যথা করছে ওখানে। ‘আপডেট কি?’ বাশার জানতে চাইল।

‘স্যার, অনেক আপডেট রয়েছে,’ টিমি খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে উঠল।
‘তার আগে একটু বলে নেই, এই ছেলেরা, বলে সে রুশোকে দেখাল। ‘এই
ছেলেটা একটা রক্ত, ও না থাকলে অনেক জিনিস বুঝতেই পারতাম না আমি। তবে
যাই হোক আমরা বেশ কিছু জিনিস বের করতে পেরেছি, সেগুলো নিয়ে সবাই মিলে
বলতে হবে। জর্যা আপার কি অবস্থা?’

সিপাহী

বাশারের সঙ্গে এর আগে কাজ করার সময়ে টমিও জয়ার সঙ্গে কাজ করেছিল, আছেই জয়ার সঙ্গে একসময় কারো মোটামুটি পরিচয় এবং ভালো একটা সম্বন্ধ ছিল। বাশার বলে গেল জয়ার আপডেট কি।

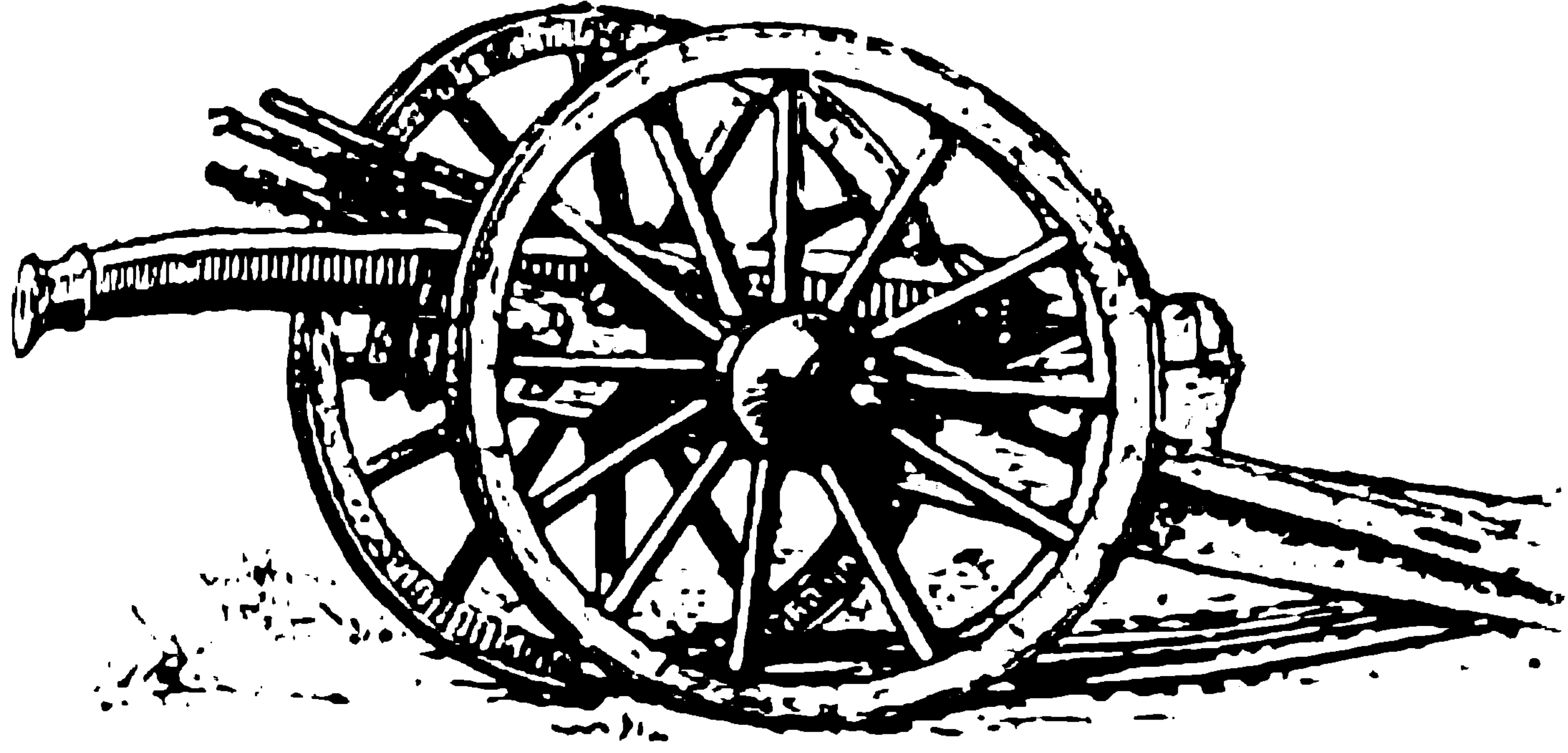
‘তাহলে, তো উনাকে মনে হয় আজ রাতে আর পাওয়া যাচ্ছে না,’ টমি বলে উঠল। বাশারের মনে হলে টমি অনেক চিন্তিত।

‘কোনো সমস্যা? বাশার জানতে চাইল।

‘হুমম, সমস্যা বলতে কি কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো উনি থাকলে ঝংক করতে আমাদের সুবিধা হতো।’

‘নেই যেহেতু কাজেই আমরাই শুরু করব। লেটস বিগিন,’ বলে সে একটা চেয়ার টেনে বসে গেল।

‘চলো দেখি কী এমন পেয়েছো তোমরা পুরো কেসের গতি পান্টে যেতে বসেছে।’



অধ্যায় ছাপান্ন

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

মধ্য ভারতের কোনো এক এলাকা

বহুরের এই সময়টা তাদের জন্য সবচেয়ে কষ্টের, কারণ এই সময়টাতেই তাদের যে মাতা, নদী মাতা, তার সবচেয়ে উত্তাল সময়। বিষয়টাকে তারা এভাবে দেখে এই সময়টাতে নারী-মাতা সবচেয়ে বেশি উত্তাল থাকে, কারণ এই সময়টার পরেই সে সবচেয়ে বেশি ফলবতী হয়ে ওঠে। ঠিক যেন নারী দেহের মতোই। নারী দেহ যেমন ঋতুস্রাবের সময় অস্থির উত্তাল হয়ে ওঠে, আবার এর মাধ্যমেই সে ফলবতী হয়ে থাকে, ঠিক প্রকৃতি মাতাও তেমনি। বিশেষ করে তাদের পরম পূজনীয় নদী মাতা।

দুনিয়াতে মানুষ অনেক ধরনের দেব-দেবীতে বিশ্বাস করে, আর তারা একমাত্র নদী মাতার পূজায় বিশ্বাস করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে ভূমিতে তারা বিচরণ করে, যে মাটিতে তারা বসবাস করে, যে জীবন তারা ধারণ করে—এর পুরোটাই নদী মাতার প্রদান। আজ থেকে কয়েক শ বছর আগে এক শুষ্ক ভূমি থেকে তারা পাড়ি জমিয়েছিল এই সুজলাসুফলা ভূমিতে। যেখান থেকে তারা এসেছিল সেই ভূমির সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ ছিল এক নদী মাতা, পুরো পৃথিবী তাকে নীলের নামে চেনে। আর সেই নীলের অববাহিকা ছেড়ে তাদের যখন বিশেষ কারণে পাড়ি দিতে হয়েছিল হাজারো মাইল, পথ চলতে চলতে একে একে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল তাদের সবকিছু ঠিক তখনই তারা এই সবুজ ভূমিতে নদী-নালায় আশ্রয়ে স্থান পেয়েছিল নতুন জীবন ধারণ করার। এই ভূমির নদী-নালাতে এসে তারা বুঝতে পেরেছিল নদী মাতার আশীর্বাদেই সবকিছু হচ্ছে। নদীমাতার আশীর্বাদেই তারা আবারো নদীমাতৃক এই দেশে।

একবার টিকে যাওয়ার পরেই তারা ধীরে ধীরে নিজেদের স্থান করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। নতুন দেশ নতুন জায়গা নতুন ভূমি। নতুন সমস্যা, সনাতন

সিপাহী

নিয়ম, নতুন সমাধান। কালের আবর্তে কয়েক শ বছরের ব্যবধানে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে এই ভূমির সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে গোপন এক গোত্র হিসেবে, যাদের নাম বলতে গেলে কেউই জানে না। কিন্তু তারা সবখানেই রয়েছে, তারা সবই জানে এবং তারা সবার মাঝে মিশে যেতে পারে। তারা বিশ্বাস করে নদী যেমন মাটিকে ভিজিয়ে বসবাসের এবং কাজের উপযোগী করে তোলে, আর সেই ভেজা মাটিতে বিচরণ করে প্রাণবৈচিত্র্য, ঠিক তেমনি তারাও সেই সব ক্ষুদ্র প্রাণবৈচিত্র্যের মতোই বিচরণ করে অনেকটা পোকাকার মতো।

তাদের নাম আরোঘী। এই গোত্রের মানুষেরা সৃষ্টির আদি থেকে যেখান থেকে এখানে পাড়ি জমিয়েছিল, সেই নীল নদের অববাহিকায় থেকে তারা বহন করে এনেছিল এক বিচিত্র গোপন রহস্য। আর তাই আরোঘী গোত্রের সন্ন্যাসীদের জীবনের লক্ষ্য দুটো—নদী মাতার সন্তুষ্টি, আর সেই গোপন রহস্যকে ধারণ করা, লালন করা। হাজারো বছর ধরে তারা নানা ঝড়ঝাপটা মোকাবিলা করে ঠিকই পালন করে আসতে পেরেছে যা চায় তারা।

আরোঘীদের সমাজে কোনো নারী নেই। প্রশ্ন হলো তাহলে তারা নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে কীভাবে। প্রক্রিয়াটা খুবই ভয়ংকর। তারা মানুষ অপহরণ করে আনে। তারা নদীর মানুষ, নদীর বুকে বিচরণ করে বেড়ায়। নানা রূপে নানা বেশে, নদীর বুক থেকেই তারা উঠিয়ে নিয়ে আসে নারীদের। তারপর তাদের ডেরায় বন্দি করে রেখে বাচ্চার জন্ম দেয়। যদি মেয়ে হয়, যা আর মাকে বিশেষ আয়োজনের মধ্য দিয়ে নদীতেই বলিদান করা হয়। আর যদি ছেলে হয় তবে, ছেলেকে নিজেদের একজন হিসেবে নিয়ে নিয়ে মাকে ছেড়ে দেওয়া হয় কোনো না কোনো লোকালয়ে। তারপর ছেলেকে বড় করে তোলা হয় তাদের একজন হিসেবে। আরোঘীদের গোত্রে চারটা মূল বাহিনী রয়েছে। নেতা, যারা সবচেয়ে বয়স্ক এবং নিজেদের কাজ থেকে অবসর নিয়ে তারা এখন শুধু সিদ্ধান্ত নেয়ার এবং নির্দেশ দেওয়ার কাজ করে। আর বাকি তিনটা হলো সৈনিক, কর্মী এবং খুনি। এর ভেতরে সৈনিকদের কাজ হলো তারা নিজেদের গোত্রের লোকদের পাহারা দেয়, কর্মীরা সব ধরনের কাজ করে এবং এরা মূলত ছোটবেলা থেকে নানা ধরনের কাজ শিখে গোত্রের জন্য টাকা আয় করে আনে। কামার-কুমোর থেকে শুরু করে বাঁশের কাজ, নৌকা নির্মাণ সবই তারা পারে। এরা গোত্রের বাইরের আবরণ হিসেবেও কাজ করে।

আর গোত্রের সবচেয়ে ভয়ংকর হলো খুনিরা। তাদের বিশেষ প্রক্রিয়ায় জন্ম দেওয়া শিশুদের ভেতরে ছোটবেলা থেকে যারা সবচেয়ে বেশি হিংস্র এবং শক্তিশালী, এদের ছোটবেলা থেকে গড়ে তোলা হয় খুনি হিসেবে। এরা মূলত তাদের গোত্রের সবচেয়ে মূল্যবান রহস্য রক্ষা করে, নারীদের অপহরণ করে আনা থেকে শুরু করে প্রয়োজনমত যেকোনো কাজ সারে এরা।

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

আরোঘীদের গোত্রের ভেতরে বিয়ে নেই, নারীদের সঙ্গে বসবাস নেই, কিন্তু তাদের নারী অবগাহন মানা নেই। নানা জায়গা থেকে হয় এরা নারী ধরে আনে, জম্বা গণিকালয়ে গমন করে। এদের বাৎসরিক দুটো মূল উৎসব রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে মাসিক আলোচনা ভোজন এবং উৎসব। কিরাদের গোত্রে কিছু বিষয়ে ভুলের কোনো মাফ নেই, কিছু বিষয়ে এরা যা ইচ্ছা করতে পারে এবং যেকোনো বিষয়ে তাদের বড়দের কথা মেনে নিতে হয়। আজ তাদের সেই মাসিক উৎসব এবং শান্তি প্রদানের দিন। কারণ বহু যুগ এবং বছর পর একজন তাদের মাঝে ভুল করেছে। আজ সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন।

তাদের মাসিক উৎসবের আয়োজন করা হয়ে নদীর মাঝের কোনো ছোট দ্বীপে, যেসব জায়গাতে তাদের গোপন আস্তানা রয়েছে, কিন্তু তারা ছাড়া অন্য কারো যাতায়াত নেই। আজ মাসিক আয়োজন এবং বিচার উপলক্ষে পনেরো নৌকা ভর্তি মানুষ এক হয়েছে। প্রথমেই নদী-মাতার জন্য বিশেষ পূজো দিয়ে শুরু হবে তাদের আয়োজন, পূজো শেষে শূকর বলি দেওয়া হবে, আর সেই বলীকৃত শূকর তক্ষণের মধ্যে দিয়ে তাদের উৎসব শেষ হবে। আর উৎসব শেষে বসবে আলোচনাসভা এবং আজকে বিশেষভাবে সেই আলোচনার সঙ্গে চলবে বিচার আয়োজন।

তাদের উৎসব শেষ হওয়ার পর, গোল হয়ে বসল তারা। আরোঘীরা বিশেষ এক ধরনের জল শৈবাল শুকিয়ে সেটা পুড়িয়ে নেশা করে, এটাকে তারা বলে পুরিয়া। ঠিক কোন কোন জায়গাতে এই বিশেষ ধরনের শৈবাল পাওয়া যায়, এটা ওরা জানে। সেখান থেকে এই বিশেষ শৈবাল উঠিয়ে এনে রোদে শুকানো হয়। শুকানোর পর এটাকে গুঁড়ো করে এটার সঙ্গে মেশানো হয় শূশানের মরা পোড়ানো ছাই, বিষাক্ত এক ধরনের মাকড়শার অস্ত্র, সেই সঙ্গে তাদের বলি দেওয়া শূকরের শুকনো রক্ত। তারপর এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে গুঁড়ো করে, মোড়ানো পাতার ভেতরে ভরে পাকানো হয় দড়ির মতো। তারপর সেটাকে আবারো শুকানো হয় লম্বা সময় ধরে। তারা বিশ্বাস করে সারা মাস কাজ করার পর এই বিশেষ খাবার এবং এই পুড়িয়া হলো তাদের জন্য নদী-মাতার আশীর্বাদ। পুরিয়া ধরিয়ে টানতে টানতে চলে তাদের আলোচনা।

আজকের আলোচনার বিশেষ বিষয় হলো ভারতের বর্তমান অবস্থা এবং এই অবস্থায় তাদের করণীয়। যদিও তারা সাধারণত আড়ালেই থাকে, কিন্তু এবার বিশেষ কারণে বিশেষ অবস্থায় তারা চলে এসেছে লোক চক্ষুর সামনে। তাও আবার সাধারণ নয়, সাদা চামড়ার একজনের মাধ্যমে। সেটাও ঘটেছে তাদের একজনের কারণে। আর তাই বিশেষ অবস্থা এবং সেই বিশেষ অবস্থায় সেই ভুল করা মানুষটার পরিণতি এবং সেখান থেকে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে চলবে আলোচনা।

সিপাহী

খাবার ভক্ষণের সময়ে প্রথমে সবাই গোল হয়ে বসেছিল অগ্নিকে ঘিরে। প্রাথমিক কিছু আলোচনার পর তারা গোল অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াল, অগ্নিকে কেন্দ্র করে প্রথমে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল, সঙ্গে বিচিত্র রব তুলছে কথার সঙ্গে সঙ্গে। ঘুরতে ঘুরতে তারা প্রায় নিখুত একটা বৃত্ত সৃষ্টি করল, বৃত্তটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে চারজন বয়স্ক সদস্য আপনাতেই আলাদা হয়ে যায় বৃত্ত থেকে, বৃত্তের আরেকটা অংশ ঘুরতে ঘুরতে চলে গেল পেছন দিকে। এখন আকৃতিটা এমন দাঁড়াল, প্রথমে আগুন, আগুনের পরেই চারজন বয়স্ক সদস্য, এরা মূলত আজকের এই বিশেষ সভার মূল আলোচক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। তাদের মুখোমুখি সেই মানুষটা, যার বিচার হবে, তার পরেই অর্ধবৃত্তাকারে বসা দেড়ডজন কীরা। বৃত্তটা নিখুতভাবে আলাদা হয় নির্দিষ্ট আকৃতিতে আসতেই, দলের সবচেয়ে বয়স্ক সদস্য হাত তুলতেই সবাই থেমে গেল। সে হাতের কবজি নেড়ে বিশেষ ইশারা করতেই সবাই বসে পড়ল যার যার জায়গায়। সারিতে থাকা দলের প্রথম সদস্য, একে একে বলে গেল দোষীর সব দোষগুলো। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। প্রথমত, সে দলের নিয়ম ভঙ্গ করেছে, আরোঘীদের নিয়ম হলো কোনো কারণে এবং কোনো সময়ে দলের কেউ আহত হলে তাকে মেরে পানিতে ফেলে পালাতে হবে, কিন্তু সেটা সে করেনি। তার দলের একাধিক সদস্য আহত এবং অসুস্থ হওয়ার পর সে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। আর সেটা করতে গিয়ে সে পুরো গোত্রের ওপরে বিপদ টেনে এনেছে। যেটা আজ অবধি কেউ করেনি। আর এই পুরো ব্যাপারটাই সে ঘটিয়েছে, বিশেষ একটা কারণে যেটাও গোত্রের অন্যতম নিয়ম ভঙ্গের একটা মাধ্যম।

এই ক্ষেত্রে প্রথমে দোষীর বক্তব্য শোনা হয়, আর তারপর বয়স্করা সিদ্ধান্ত জানায়। কিন্তু দলের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটা হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিল। পুরিয়ার প্রভাবে টকটকে লাল চোখ তুলে সে তাকাল সবার দিকে, সবাইকে দেখে নিয়ে সে ফিরে তাকাল তার বরাবর বসে থাকা মানুষটার দিকে। কীরারা কখনো মাথা নিচু করে না, কোনো অবস্থাতেই নয়, কিন্তু দোষী মানুষটা মাথা নিচু করে বসে রয়েছে। 'মিস্তি, মাথা সোজা করো, চোখ তুলে তাকাও আমার দিকে।

তাও সে মাথা নিচু করে রয়েছে, দেখে তার সঙ্গে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল বয়স্ক মুরকি, কিন্তু সে আবারো ধমকে ওঠার আগেই চোখ তুলে তাকাল মিস্তি, তার চোখ ভেজা। এটাও অন্যায় আরোঘী সমাজে। তাদের মাঝে দুর্বলতার কোনো স্থান নেই। মিস্তির ভেজা চোখ দেখে বয়স্ক প্রধানের আরো বেশি মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। 'নিজের চোখ মুছে, মাথা সোজা করে একজন প্রকৃত আরোঘীর মতো তাকাও,' বলে সে বড় করে নিঃশ্বাস নিল। 'তুমি একজন আরোঘী নামের লজ্জা,

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

তুমি কোনোদিনই আরোঘী ছিলে না, আজও হতে পারোনি, তুমি আরোঘী নামের
কে লজ্জা।’

যে বয়স্ক প্রধান কথা বলছে, সে মিস্তির পিতৃসম, মিস্তিকে তারা অন্যদের
মতো জন্ম দেয়নি, এই বয়স্ক প্রধান তাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে নিজের সন্তানের
মতো বড় করে তুলেছিল আরোঘীদের নিয়মের ব্যতিক্রম করে। এটা কেউই মেনে
নিতে চায়নি, কিন্তু মিস্তি যত বড় হতে থাকে, তার অবয়ব এবং মানসিক শক্তি
এতটাই বেশি হিসেবে প্রদর্শন করে যে সবাই বুঝতে পারে সে একদিন আরোঘীদের
সেরা খুনি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বড় হতে হতে সেটা সে প্রমাণও করতে
থাকে। বড় হতে হতে সে এমন সব কাজ করে, যা অসম্ভবের চেয়েও বেশি।
আরোঘীদের মাঝে তার জন্ম এবং তার পরিচয় নিয়ে শঙ্কা থাকলেও তার কাজ
নিয়ে কোনো দ্বিধা ছিল না কারো মাঝে। আরোঘীরা এটা একরকম মেনেই
নিয়েছিল সর্দারের পালক ছেলে মিস্তিই হতে যাচ্ছে আরোঘীদের ভবিষ্যৎ প্রধান।
আর এরপর সে ঘটায় সেই ঘটনা, যা বদলে দেয় সবকিছু এবং এরপর সে আবারো
ভুল করে করতেই থাকে, সবশেষে সে এমন এক কাজ করে বসে, যা আরোঘী তো
বটেই যেকোনো সন্ন্যাসী গোত্রের জন্য সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

‘তোমাকে কোনোদিনই আমার একজন আরোঘী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা উচিত
হয়নি। তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল,’ বলে বয়স্ক প্রধান থেমে গেল। সে
প্রতিক্রিয়া খেয়াল করছে। সে ভেবেছিল তার কথা শুনতে শুনতে মিস্তি কেঁদে
ফেলবে এবং সেটা করলে একজন আরোঘী এবং একজন বাবার মাঝে আরোঘী
প্রধানের জয় হবে এবং সে মিস্তিকে সেই শাস্তি দিতে পারবে, যা দেওয়ার জন্য
আজকে এই সভা বসেছে। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই মানব বৃক্ষের পেছন থেকে
কেউ একজন হাত তুলে কথা বলার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করল।

এরকম অবস্থাতে কখনোই কথা বলার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় না। কিন্তু
আজ দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে মিস্তির বয়সেরই আরেক আরোঘী মাথা তুলে উঠে
দাঁড়াল, সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠল, ‘মিস্তি যা করেছে সেটা পুরোটাই আমার এবং
অন্যদের জীবন বাঁচানোর জন্য, সেটা না করলে আমরা কেউই এখানে উপস্থিত
থাকতাম না। কাজেই—’

তরুণ আরোঘী কথা শেষ করতে পারল না। আরেক বয়স্ক প্রধান কথা বলে
উঠল তা কথার মাঝেই। ‘তোমার এবং তোমার সঙ্গীদের বক্তব্য আমরা আগেও
শুনছি, তুমি আমার দুটো প্রশ্নের উত্তর দাও, প্রথমত, বন্ধুত্ব আর কর্তব্যের মাঝে
মিস্তি বন্ধুত্বকে বেছে নিয়েছে, আরোঘী আইন কি বলে, এটা কি সে ঠিক করেছে?
দ্বিতীয়ত, তোমাদের জীবন শঙ্কার যে কারণ সেই ঘটনার জন্য দায়ী কে? মানে যে

সিপাহী

আহত তোমাদের ঠিক করার জন্য সে আরোগীদের রহস্য ফাঁস করেছে, সেই অবস্থায় তোমাদের ফেলার জন্য দায়ী কে?’

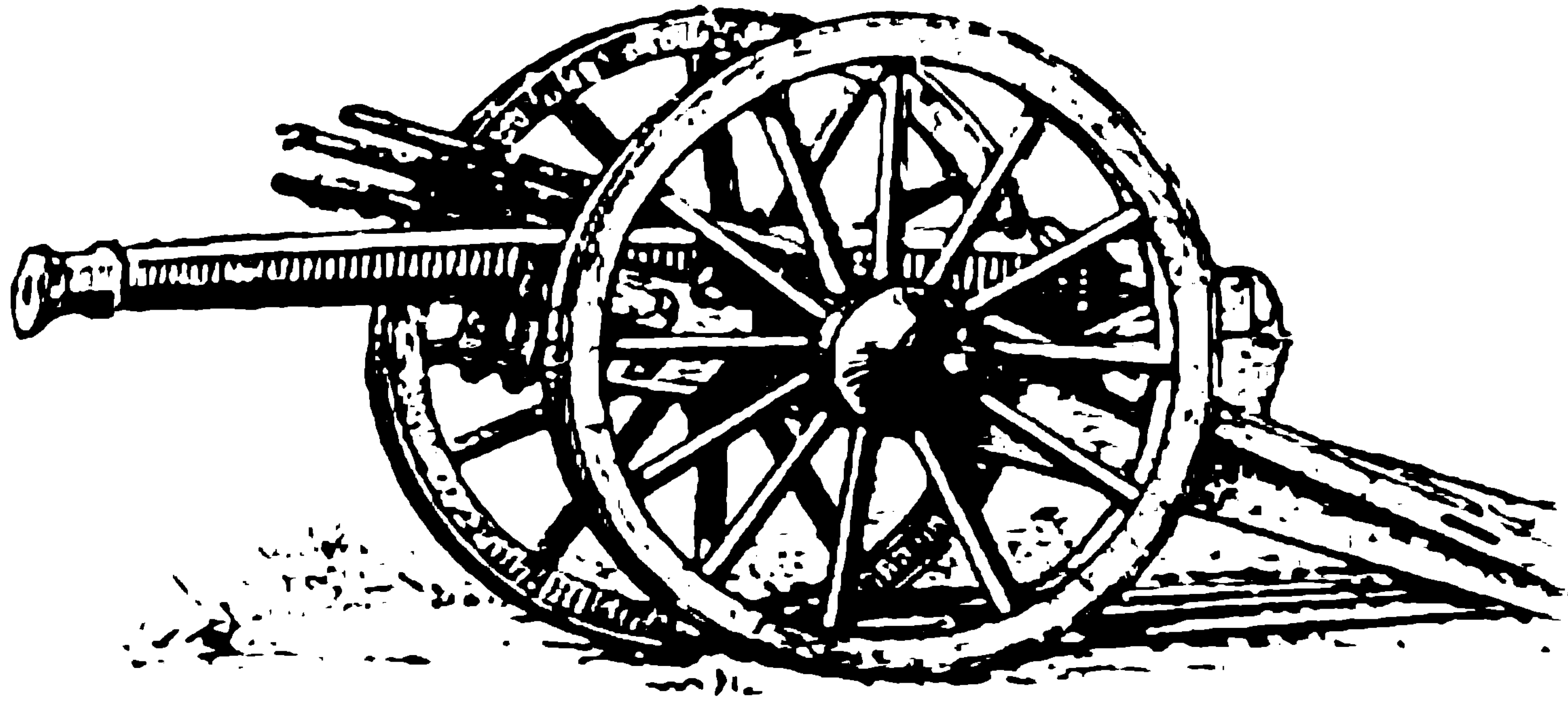
তরুণ আরোগী চুপ, দুটো প্রশ্নেরই জবাব সে জানে। দুই ক্ষেত্রেই দায়ী তার বন্ধু মিস্তি। কাজেই তার আর কিছু বলার নেই। তরুণ বসে পড়ল, তার চেহারা থেকে সবাই নজর সরিয়ে ফিরে তাকাল, কিন্তু সে যা ভেবেছিল মিস্তি সেটা না করে বরং সে সোজা হয়ে বসল, বুক-পিঠ টানটান করে মাথা সোজা করে চোখ তুলে তাকাল বয়স্ক প্রধানের দিকে। ‘আমি দুটি প্রস্তাব করতে চাই, অনুমতি দিলে,’ বলে সে অনুমতির অপেক্ষা করল। বয়স্ক প্রধান মাথা নেড়ে সাই দিল যাতে সে বলতে লাগল। তার গলায় আগের আবেগ বা ভেজা ভাব কিছুই নেই। ‘প্রথমত, আমি চাই আমাকে যেচ্ছা মৃত্যুর অনুমতি দেওয়া হোক, সম্মানের সঙ্গে।’ আরোগীরা বয়স কম হলে বা কোনো ভুল করলে বা কোনো অপরাধ করলে সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে তারা উপযুক্ত আয়োজনের মাধ্যমে পানিতে নেমে যেতে পারে, ডুব দিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে। এটাই তাদের জন্য অপরাধের পর সবচেয়ে সম্মানের সঙ্গে প্রস্থান করার উপায়। ‘আর যদি সেটা করতে না দেওয়া হয়, তবে আমাকে আরেকবার সুযোগ দেওয়া হোক যে ভুল আমি করেছি, একবার নয় দুবার নয়, তিনবার ভুল করেছি আমি। সেই ভুল শোধারানোর সুযোগ দেয়া হোক আমারে। কারণ এই ভুল একমাত্র আমি শোধরাতে পারব। এখন বলুন—’

চার বয়স্ক প্রধান নিজেদের ভেতরে আলোচনা করল কিছুক্ষণ, তারপর মিস্তির দিকে ফিরে তাকাল। ‘দ্বিতীয় বিষয়ে তোমার প্রস্তাবনা কি?’

মিস্তি বড় করে একবার দম নিল। মনের ভেতরে কথাগুলো গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে সে, তার জীবনটাই একটা মিথ্যের ওপরে গড়ে উঠেছে। ছোটবেলা থেকে সে সবার হয়েও সবার থেকে আলাদা, জীবনের প্রতিটি পদে সে চেষ্টা করেছে একজন আরোগী হয়ে ওঠার জন্য কিন্তু পারেনি। সবচেয়ে বড় ভুলগুলো করেছে। কর্তব্য আর ভালোবাসার মাঝে ভালোবাসাকে বেছে নিয়েছে, জ্ঞাতি আর বন্ধুত্বের মাঝে বন্ধুত্বকে বেছে নিয়েছে সে। আর তাই সবচেয়ে ভালো করার চেষ্টা করেও সে সবচেয়ে খারাপে পরিণত হয়েছে।

‘আমার প্রস্তাবনা খুব সহজ, প্রতিরোধ এবং নিকেশ,’ খুব শান্ত স্বভাবে বলে উঠল সে। ‘আমাকে সুযোগ দিন, যে ভুল আমি করেছি সেটা শুধরে দেব আমি তারপর ফিরে আসব আপনাদের সামনে, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমি মোচন করব সব শাপ।’

সবাই তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে, বয়স্ক প্রধান মাথা নেড়ে সাই জানাল তাকে।



অধ্যায় সাতান্ন বর্তমান সময় পিবিআইএস ল্যাব, নতুন বাজার

সবাই মিলে ল্যাবের টেবিলগুলোকে সাজিয়ে অনেকটা অর্ধবৃত্তের মতো হয়ে বসেছে, সবার কেন্দ্রে রয়েছে একটা টেবিল, সেটার ওপরে রাখা কিছু জিনিস এবং সেগুলোর মাঝে রাখা প্রজেক্টর। প্রজেক্টরটা জ্বিন উলটোদিকে বড় পর্দার মতো জ্বিনে প্রজেক্ট করছে টমির ল্যাপটপের জ্বিনটাকে। ‘শুরু করো টমি, এমনিতেই বহুত ঝামেলা, আর এই ল্যাবে বসে বকরবকর করলে লাভ হবে না, কাজে নামতে হবে।’

টমি মৃদু হেসে উঠল তার ভুঁড়ি দুলিয়ে। তার পরনে রোলিং স্টোনের একটা টি-শার্ট। টি-শার্টে সত্তর-আশির দশকের বিখ্যাত মিউজিক ব্যান্ড রোলিং স্টোনের লিড গিটারিস্ট কিথ রিচার্ড, মুখে বিড়ি চেপে ধরে চিৎকার করে বলছে ‘হু ইজ মিক জ্যাগার?’ মিক জ্যাগার হলো রোলিং স্টোনের ভোকালিস্ট। এই কিথ রিচার্ডের বাস্তব জীবনের চরিত্রটাই পরবর্তীতে পর্দায় ফুটিয়ে তোলে জনি ডেপ তার বিখ্যাত সিরিজ পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ানে। টমি হাসছে, তার ভুঁড়ির সঙ্গে দুলছে কিথ রিচার্ড। ‘ধীরে বস, ধীরে, যা আবিষ্কার করেছি তা কোটি টাকা দিলেও—’

‘টমি—’ এবারের ধমকে কাজ হলো, কারণ এবারের ধমকটা দিয়েছে সামিরা। জ্যাকের মুখে যেভাবে লবণ পড়ে সেভাবে মিইয়ে গেল টমি। ‘বলছি ম্যাডাম,’ বলে সে প্রজেক্টর অন করতেই জ্বিনে ছবি ফুটে উঠল। ‘প্রথমেই শুরু করি ডেভিডকে দিয়ে। কারণ শেষ মিটিংয়ে আমাদের বড় একটা আবিষ্কার ছিল এই ডেভিড। জয়া সরকার আর রিফাতের সঙ্গে ডেভিডের পরিচয় হয়েছিল প্রফেসর হামিদের মাধ্যমে,’ বলে সে প্রফেসর হামিদের স্টাডি থেকে পাওয়া ছবিটা নিয়ে এলো প্রজেক্টরে। ‘ডেভিড,’ ছবিতে পার্টিরত ডেভিডকে দেখা যাচ্ছে প্রফেসর হামিদের

সিপাহী

সঙ্গে। 'তারচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হলো প্রফেসর হামিদের সঙ্গে প্রফেসর আবদেলের চট্টগ্রামে অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় সে, এবং প্রফেসর ইফতেখার যে প্রফেসর আবদেলের পার্টনার ছিল এবং যাকে বাশার স্যার এর আগের কেসে খুঁজে বের করেছে, মানে এর সবাই আগে থেকেই পরিচিত এবং আমরা বারবার যে কথাগুলো বলছি যে সব কেস কানেক্টেড, এটা মোটেই কো-ইন্সিডেন্সের কিছু নয়। আর কেন এবং কীভাবে কানেক্টেড সেটা বের করতে হবে আমাদের।'

'এখানে আমার দুটো প্রশ্ন রয়েছে, বাশার নিজের নোটবুক বের করে নোট নিতে নিতে জানতে চাইল। 'প্রথম প্রশ্ন, প্রফেসর হামিদ এবং ডেভিড কানেক্টেড এটা তো আমরা জানি। কিন্তু ডেভিড এবং বাকি প্রফেসররা যে কানেক্টেড, এটার কোনো এভিডেন্স কি রয়েছে আমাদের কাছে?'

'ছবি দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে, সামিরা বলে উঠল। 'যেভাবে পার্টি করছে এরা।'

'আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন?' প্রশ্নটা করল টমির পাশে দাঁড়ানো রুশো। মোটা লেন্সের অড়ালে তার চেহারায় পরিষ্কার কৌতূহল।

'আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, এই ডেভিড এবং প্রফেসরেরা যদি কানেক্টেড হয়েই থাকে এবং ডেভিডেরও পরিচিত হয়ে থাকে তবে এসব বিষয়গুলো আগে সামনে এলো না কেন?'

'কারণ এর আগে এরা যে এত গুরুত্বপূর্ণ এবং এরা যে কানেক্টেড এটাই তো কেউ জানত না,' টমি বলে উঠল।

'আসলে এটা আমার মূল প্রশ্ন নয়,' বাশার চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে উঠল। 'জয়া সরকার কি প্রফেসর ইফতেখার এবং প্রফেসর আবদেলকে চেনে? জয়া সরকার নিজেই এই ছবিটা খুঁজে বের করল এবং প্রথমে সে খুবই এক্সাইটেড ছিল ছবিটা দেখে, এরপর কী এমন হলো যে সে হঠাৎ সুইসাইড করতে চলে গেল। আর প্রফেসর হামিদের এই ছবিটা যদি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তবে এই ছবিটা এভাবে রেখে গেল আর ওটার পেছনে নম্বরটাই বা কীসের?'

'আরে আরে, আন্তে, বলেছো দুটো প্রশ্ন করবে, একের পর পর প্রশ্ন করেই যাচ্ছে,' টমির ফোড়ন কাটা শুনে বাশার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই আবারো টমি কথা বলে উঠল। 'ওকে ওকে বস, আমি জানি অনেক অনেক প্রশ্ন সবার মনে। আমি একে একে বলছি, বাবা টমির কাছে সব প্রশ্নের জবাব না হলেও কিছু প্রশ্নের জবাব রয়েছে।'

'প্রথম কথা, জয়া ব্যাডামকে উদ্ধার করে আনার পর তুমি যে অনুরোধগুলো করেছিলে, সেগুলোর জন্য ব্রিফ করে ইনসপেক্টর রবিউল আজকের মতো অফ ডিউটি চলে গেছে,' টমির কথা শুনে বাশার মাথা নাড়ল। গতকাল রাত থেকে কাজ

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

রুমের একটা লোক, তারও রেস্ট প্রয়োজন। 'প্রফেসর হামিদের বাসায় সার্চ কন্সট্রাক্টস্‌ টিম পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর কোস্ট গার্ড এবং মধুপুর রেলওয়ে স্টেশনবাড়ি হয়ে খাগডহর—এসব এলাকার কোস্ট কার্ড এবং অন্যান্য ফোর্সের নেয়া হচ্ছে অপহরণকারী বা এমন কারো কোনো আপডেট রয়েছে কি না, মনে রিকাত ম্যাডামের অপহরণের কোনো কু তারা পাচ্ছে কি না। আশা করছি দুটো বিষয়েই আপডেট পাওয়া যাবে ঘটনাক্ষণেই ভেতরে।'

'ওহ,' বাশার বলে উঠল।

'এবার বলি আমরা কি পেয়েছি। তোমার একটা প্রশ্নের উত্তর জানা গেছে। প্রফেসর হামিদের স্টাডির এই ছবি এবং সেটার ভেতরে পাওয়া কাগজের টুকরো। এই ছবিটি এত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ভেতরে এমন কু রেখে প্রফেসর হামিদ বিদেশ চলে গেলেন এবং বিগত কিছুদিনের কোনো ঘটনাতেই তার কোনো রা নেই কেন! এর পেছনে কারণ হলো—বেশ কয়েক বছর আগেই প্রফেসর হামিদ বিশেষ প্রয়োজনে কানাডা যান এবং সেখানে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, সেই থেকে তিনি কোমাতে রয়েছেন। আর এখানে বলে রাখি উনি কানাডার সিটিজেন। কাজেই বুঝতেই পারছে সে অনেক কিছুই পরিকল্পনা মারফিক করেনি এবং সাম্প্রতিক সময়ের কেসে তার কোনো রা নেই কেন।'

'প্রফেসরের ওখানে যে ছবিটা পেয়েছি আমি ওটা আবারো দেখতে চাই,' বাশার বলে উঠল। 'আমার মন বলছে এই ছবিতে এমন কিছু রয়েছে, যেটা জয়া সরকারকে চমকে দিয়েছে। কি সেটা জানি না।'

বাশার বলতেই টিম ছবিটা বড় করে দিল। ছবিটা কোনো একটা টেরেসে তোলা। 'আমরা ধারণা করছি এটা সিঙ্গাপুরের কোনো একটা কনফারেন্সের ছবি,' টিম বলে উঠল ছবির ব্যাকড্রপ তাই বলে।'

'আমি এটা জানি, কোনো একটা সাউথ এশিয়ান কনফারেন্সেই প্রফেসর ইফতেখার এবং আবদেল ছিল, এটা পৃথা মানে প্রফেসর ইফতেখারের মেয়ে আমাকে বলেছিল। আমার ধারণা এটাই সেই কনফারেন্স এখানে প্রফেসর হামিদ এবং ডেভিডও ছিল। এখানেই ওদের কোলাবোরেশন ঘটে। আমি এই কনফারেন্সের নাম জানতে চাই এবং ডিটেইল চাই, কারা ছিল, কারা প্রজেন্টেশন করেছিল কী বিষয় করেছিল,' বাশারের কথা শুনে টিম নোট নিয়ে বেল ডেকে একজনকে নোট পাঠিয়ে দিল। 'ছবিটা ভালোভাবে দেখে বেশ কয়েকজন বিভিন্ন দেশীয় মানুষ, রয়েছে, সাদা চামড়া, ভারতীয়, মঙ্গলয়েড, মানে আমাদের দেশ যাদের চার্নিভ চেহারা বলে, তারা। তবে এর ভেতরে বাংলাদেশি কয়েকজন।'

বলে টিম ছবি সরিয়ে দিলে আরেকটা জিনিস তুলে ধরল। সে এন্টিডেস ব্যাগে সাদা কিছু একটা দেখাল। 'এটা সেই কাগজ যেটা আমরা প্রফেসর হামিদের ওই

সিপাহী

ছবির পেছনে পেয়েছিলাম,' বলে সে আবারো জিনে চেপে ধরল। 'এটা আজকের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং আবিষ্কার বেশ কয়েকটা কারণে। প্রথমত, যে কাগজে নম্বরটা লেখা সেটা খুব প্রাচীন এক ধরনের কাগজ, এটা কেউ বলে আমাকে, এই কাগজ এখন আর নেই বলতে গেলে। মানে এটা এক ধরনের বিলুপ্ত কাগজ।'

'তাই নাকি?' কেউ একজন বলে উঠল।

'হ্যাঁ, এই কাগজটার খুব আকর্ষণীয় একটা বৈশিষ্ট্য হলো এটা আসলে পুরোপুরি কাগজ নয়, কাগজ আর কাপড়ের মাঝামাঝি একটা বস্তু। প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিরা কাগজে লিখে কোনোকিছু লুকিয়ে রাখতে হলে এই বিশেষ ধরনের কাগজ ব্যবহার করত,' বলে সে সবার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিয়ে বলে উঠল। 'যেই টেকনিক এমনকি প্রফেসর হামিদও ব্যবহার করেছিলেন?'

'তারমানে কি আমরা যে কাগজটা এনেছি, সেটাতে প্রফেসর হামিদের কোনো লুকানো বার্তা রয়েছে?'

প্রশ্নের জবাবে টিমি মৃদু হাসি দিল। তার ভাবটা এমন, যতই ছোট বাচ্চার মতো প্রশ্ন করো জবাব রয়েছে আমার কাছে। বলে সে তার হাসি আরো বিস্তৃত করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই সামিরার দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে আবার বলতে শুরু করল। কিন্তু একটু ট্রিকস করল সে, আগেই কাগজটার ব্যাপারে না বলে, সবাইকে খানিক কৌতূহলে রেখে বলতে লাগল নম্বরটার বিষয়ে। 'প্রথমে কাগজে থাকা নম্বরটার বিষয়ে বলি,' বলে সে প্রজেক্টরে বাটন চাপতেই, নম্বরটা ফুটে উঠল। 'খুবই সাধারণ ছয় ডিজিটের একটা নম্বর,' সবাই তাকিয়ে রয়েছে নম্বরটার দিকে। 'আমি বহুভাবে বহুকিছু করে দেখার চেষ্টা করেছি। কিছুতেই কোনো অ্যাংগেল বের করা যায়নি। চট্টগ্রামে শারিয়ার ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করার সময় এরকম একটা নম্বর পেয়েছিলাম আমরা, সেটা ছিল একটা লোকেশন, এটা সেরকম কিছুও নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি সব করার পর হঠাৎ একটা জিনিস মাথায় আসে,' বলে সে বাশারের দিকে তাকাল। 'চট্টগ্রাম থেকে আমরা প্রফেসর আবদেলের সমস্ত রিসার্চের একটা মোবাইল স্টোরেজ সিস্টেম পেয়েছিলাম যেটা ডাবল পাসওয়ার্ড প্রটেক্টেড ছিল। তুমি এর আগের কেসে প্রফেসর ইফতেখারকে উদ্ধার করার পর এর একটা অংশ উনি খোলেন, আমি ওটার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। আমার কেন জানি বারবার ওটার কথাই মনে হচ্ছিল। মজার বিষয় হলো আমি এই নম্বরটা ঢাকায় আমাদের অফিসে দেওয়ার পর এই নম্বর ওরা সেখানে প্রেস করে এবং ওটার প্রথম অংশ খুলে যায়।'

'বলো কি?' বাশার প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। 'এটা তো বিরাট ঘটনা। ওখানে কী পেয়েছে ওরা।'

'এখনি উত্তেজিত হয়ো না বস, ওরা ওখান থেকে এখনো তেমন কিছু পায়নি। পুরো ড্রাইভটাই এনক্রিপ্টেড, ওরা সেটা ভাঙার চেষ্টা করছে।'

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

‘তার পরও এটা বিরাট বিষয়,’ বাশারকে দেখে মনে হচ্ছে সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ‘কারণ এটাই প্রভ করে প্রফেসর হামিদ, প্রফেসর আবদেল এবং প্রফেসর ইফতেখার কানেক্টেড ছিল এবং তাদের সঙ্গে ডেভিডেরও সংযোগ ছিল।’

‘তুমি আসল মজার জিনিস তো জানোই না। আসল মজা তো ভিন্ন জায়গায়,’ বলে সে রুশোর দিকে ফিরে তাকাল। ‘এই অংশটা অবশ্য আমি বুঝতে পারিনি, এটা রুশোর আবিষ্কার। তুমি বলো,’ বলে সে রুশোকে বলতে বলল।

রুশোকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন লজ্জা পাচ্ছে কিন্তু প্রজেক্টরের সামনে এসে বলতে শুরু করল, তখন অবশ্য তার গলা একেবারে পরিষ্কার। ‘প্রথমেই টমি তাকে ধন্যবাদ, উনি না থাকলে আসলে বিষয়টা এভাবে ধরা যেত না। প্রফেসর হামিদের স্টাডিতে পাওয়া কাগজটা নিয়ে আমরা প্রথমে শুধু নম্বরটার দিকেই ফোকাস করছিলাম, তারপর হঠাৎ আমার মাঝে কাগজের টেক্সটেরটা ভিন্ন মনে হলো এবং আমি চিনতে পারি এটা সেই ধরনের কাগজ যেটাকে ‘আমাতে’ বলত। প্রাচীনকালে বিশেষ করে মোগল ইন্ডিয়াতে এই কাগজ ব্যবহার করা হতো নানা ধরনের বার্তা প্রেরণের জন্য। কাগজের ওপরে লেখা থাকত এক জিনিস আর এর ভেতরে দেওয়া থাকত অন্য বার্তা। আগের দিনের মানুষেরা পেন্সিল বা কাঠকয়লা ব্যবহার করত এটা থেকে বার্তা উদ্ধারের জন্য, আমরা আরো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেছি। এটাকে বলে উড এক্স-রে, সাধারণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিভিন্ন প্রডাক্টের খুঁত বের করার জন্য এ-ধরনের এক্সরে ব্যবহার করা হয় ফরচুনেটলি এই ল্যাবে, এর একটা খুঁদে ডার্সন রয়েছে। ওটা দিয়ে কাগজের টুকরোটাকে স্ক্যান করতেই একটা বিশেষ সিগন্যালের মতো ধরা পড়ে,’ বলে সে ল্যাপটপে কি চাপতেই জ্বিনে ফুটে উঠল কাগজটা। ওটা স্বচ্ছ হয়ে যেতেই ওটার ভেতর থেকে কিছু একটা আলাদা হয়ে আবার জ্বিনে ফুটে উঠে অনেকটা প্রিডি মডেলের মতো ওটা আলাদা হয়ে নতুন একটা পেজে গিয়ে বসে গেল।

‘এটাকে দেখে তো একটা পাজল মতো মনে হচ্ছে,’ কেউ একজন মন্তব্য করে উঠল।

‘আমরাও সেটাই ভেবেছিলাম প্রথমে,’ রুশো বলে উঠল। ‘কিন্তু পরে এটার একটা অংশ দেখে সেই ধারণা ভেঙে যায় আমাদের,’ বলে সে আবারো কি চাপতেই জ্বিনের ছবিটা জুম হয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে স্থির হলো।

‘এটা তো সেই সিগন্যাল যেটা আমাদের হাতে থাকা রিংটার গায়ে রয়েছে,’ সামিরা বলে উঠল বিস্ময়ের সঙ্গে।

‘ভেরি গুড পয়েন্ট ম্যাম,’ রুশো হেসে উঠল। ‘কাপড়ের গায়ে থাকা এই ছবিটার আরেকটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো ফ্ল্যাট সারফেসে আঁকা একটা প্রিডি ছবির মতো। এখন এই প্রিডি ইমেজ থেকে যেখানে সিগন্যালটা রয়েছে সেটা যদি আমি

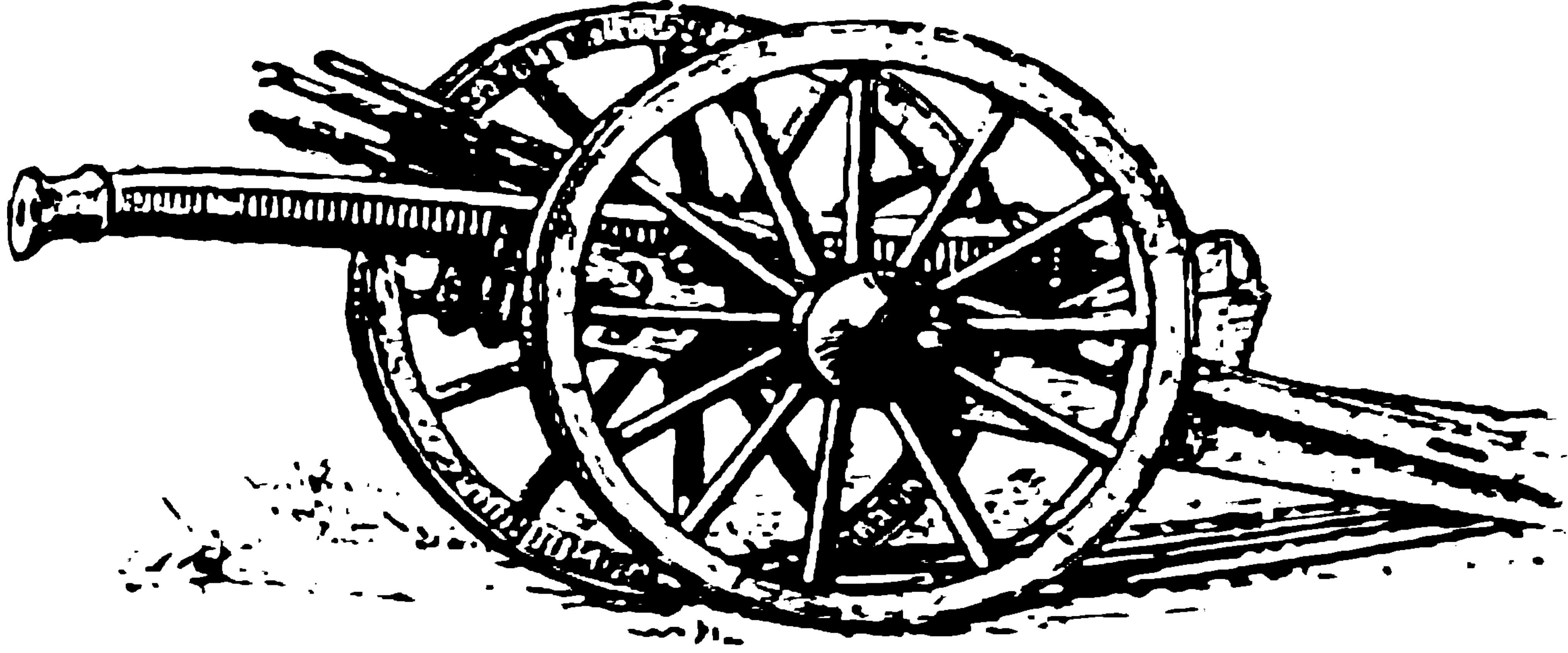
সিপাহী

আলাদা করি, তবে দেখেন,' বলে সে বাটন চাপতেই ইমেজের ওই অংশটা আলাদা হয়ে গেল।

'ওয়াও,' বাশার সোজা হয়ে গেল ওর সিটের ওপরে। 'এটা তো পুরোপুরি সেই রিংটাই,' বলে সে হেসে উঠল। 'তুধু তাই না এই পুরো পাজলটাকে আলাদা আলাদাভাবে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই পুরো পাজলটাই বানানো হয়েছে ছয়টা সিগনেট রিংকে জোড়া দিয়ে,' বলে সে বাটন চাপতেই পুরো পাজলটাই আলাদা আলাদা হয়ে ছয়টা রিং আলাদা হয়ে গেল। 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান, ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো আমাদের হাতে ছয়টা সিগনেট রিংয়ের ছবি রয়েছে,' বলে সে সবার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বলে উঠল। 'আর্কিওলজির ইতিহাসে এটা এমন এক মুহূর্ত যেটা বলতে পারেন, নিউটনের মাথায় আপেল পড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।'

'সেই সঙ্গে আরো দুটো জিনিস পরিষ্কার,' টমি বলে উঠল। 'এক, সিগনেট রিংয়ের রহস্যের সমাধান করতে হলে এই পাজলের সমাধান করতে হবে।'

'আর দুই,' টমির পরিবর্তে এবার বাশার কথা বলে উঠল। 'এই রহস্যের সমাধান কোনো না কোনোভাবে পুরোটাই ডেভিড, মৃত প্রফেসর আবেদল এবং জীবিত প্রফেসর ইফতেখারের সঙ্গে জাড়িয়ে রয়েছে। এটার সমাধান করতে হলে অনেক মানুষকে একসঙ্গে করতে হতো,' বলে সে উঠে দাঁড়াল। 'সেই সঙ্গে জয়া সরকারকেও প্রয়োজন ছিল। আরো অনেক কিছুই প্রয়োজন হবে, যা এখনো আমরা জানি না,' বাশার বড় করে দম নিয়ে অন্যদের দিকে তাকাল। 'আর এই কারণেই ঠিক যেই মুহূর্তে আমি এর আগের অপারেশন শেষ করেছি, প্রফেসর ইফতেখারকে হুঁজে পাওয়া গেছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই রিকাতকে অপহরণ করা হয়েছে।'



অধ্যায় আটান্ন

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
দিল্লি, উত্তর ভারত

দিল্লির অন্ধকার গাঢ় হয়েছে অনেক আগেই কিন্তু দিল্লি শহর রক্ত আর আগুনের রঙে
প্রভাবিত। অগ্নি ফোর্টের এই অংশে দাঁড়িয়ে অগ্নিশ্রোতে তন্দনরত লালচে শহরটার
দিকে তাকিয়ে কর্নেলের অন্তর তাই মনে হলো। পাইপে টান দিতে দিতে শহরটার
দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরে কষ্ট ছাড়া আর কিছু অনুভব করতে পারছে না
কর্নেল। নিজের দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় সে জানে যুদ্ধ, বিদ্রোহ, মৃত্যু ইত্যাদিতে
কো শেষে ক্ষতি হয় সাধারণ মানুষেরই, সম্পর্ক নষ্ট হয়, জীবন হারিয়ে যায়,
জীবনের স্রোত বদলে যায়।

দিল্লি শহরে বিদ্রোহী আর কোম্পানি সৈনিকদের ভেতরে যুদ্ধের পর পার
হয়েছে বেশ কয়েক ঘণ্টা। এর ভেতরে ইংরেজ সেনারা প্রাথমিক আক্রমণে
একবারে তুলোধুনো করলেও পুরোপুরি বিজয় খুব একটা সহজ হয়নি। দিল্লির
বিদ্রোহীরা প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তারপর এক দফা
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আবারো পিছিয়ে পড়ে শহরের বাহিরের দিকে চলে যায়, এই
সময় আশপাশের কিছু সেনানিবাস থেকে আরো কিছু বিদ্রোহীরা এসে যোগ দিলে
আবারো আরেক দফা ভয়াবহ যুদ্ধ হয়, কিন্তু এরপরে আর বিদ্রোহীরা সুবিধা করে
উঠতে পারেনি, বরং এক রকম বলতে গেলে পালায় তারা। যারা শহরে ভেতরে
ছিল এরা বন্দি হয়। বন্দি করা হয়েছে শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যবসায়ী থেকে
তক্ক করে অনেককেই, সেই সঙ্গে সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর এবং তার সব
ছেলেদের।

কর্নেল এবং তার দল শহরের এই গোলমাল থেকে দূরেই ছিল, তারা যুদ্ধের
সময়টাতে সরে যাওয়ার পর, ইংরেজ বাহিনী থেকে দূত পাঠিয়ে তাদের প্রথমে

সিপাহী

নিয়ে যাওয়া হয় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে ইংরেজদের ঘাঁটি ছিল। সেখানে গিয়ে অবশ্য খুব একটা সুবিধা হয়নি, কারণ সেই সময়ে তাদের ঘাঁটিতে পাগল অবস্থা। সেখানে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষার পর শহরের অবস্থা ভালো হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসার পর তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়, অগ্রা দুর্গে। সেখানে পৌঁছে কর্নেলদের পরিচ্ছন্ন হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে তাদের পোশাক পাল্টে খেয়ে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। যদিও কর্নেল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অধরিটির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল, আর তারা বেশি ব্যস্ত হলে প্রয়োজনে কর্নেলের বাহিনী নিজেদের কাজে চলে যাবে এমন কথাও বলে কর্নেল। কিন্তু সেটাতেও আপত্তি জানায় কোম্পানি এবং সেনাদের পাঠানো দূত। ওরা জানায় কর্নেল এবং তার টিমকে অধরিটির সঙ্গে দেখা করতেই হবে। বিশেষ একজন অপেক্ষায় রয়েছে কর্নেলের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

‘কর্নেল কি মনে হয়, কী করবে তারা সম্রাটের পরিবারের সঙ্গে?’ ত্রিলোক জানতে চাইল।

‘প্রশ্ন সেটা নয়,’ কর্নেল ফিরে তাকাল ত্রিলোকের দিকে। ‘আমি সচকিত, খোদ সম্রাটকে নিয়ে। সে ভালো মানুষ কিন্তু এখন যে অবস্থার হয়েছে, এই বৃদ্ধ বয়সে তাকে অনেক নাজেহাল হতে হবে। যদি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, এটা তার জন্য ভালো হবে, কিন্তু সেটা হবে না। তাকে আরো অনেক বেশি কষ্ট দেওয়া হবে,’ বলে মাথা নাড়ল কর্নেল। ‘এই সমস্ত ঘটনার বলি হবে এই ভালো মানুষটা।’

‘কেন এমন মনে হচ্ছে তোমার কাছে?’ পালোয়ান বলে উঠল। তার বাঁশের হুকো দিয়ে কলের মতো ধোঁয়া ছাড়ছে সে।

‘কারণ আমি আমার স্বজাতিদের চিনি,’ কর্নেল বলে উঠল। ‘মনে রেখো দিল্লি দখল হয়ে গেলেও এই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে রয়েছে পুরো ভারতে, বিশেষ করে মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতে কোম্পানির অবস্থা খুবই সঙ্গীন। কাজেই দিল্লিতে পরাজিত বিদ্রোহী এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে তারা সর্বোচ্চ নির্ভরতা দেখাবে, যাতে অন্যরা সাবধান হয়ে যায়। বিশেষ করে সাধারণ মানুষেরা। মনে রেখো, সাধারণ মানুষের সহায়তা ছাড়া বিদ্রোহীরা ছড়াতেও পারবে না, টিকতেও পারবে না। আর তাই কোম্পানি এমন ব্যবস্থা করবে, যাতে করে সাধারণ মানুষ দিল্লির ঘটনায় সাংঘাতিক ভয় পায়। আর এই সবকিছুর কেন্দ্রে রাখা হবে বৃদ্ধ মানুষটাকে,’ বলে কর্নেল দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

‘কোম্পানিস তো বরাবরই তাই করে, একজনকে দিয়ে অন্যজনের উদাহরণ সৃষ্টি করে,’ অনেকটা মন্তব্য করার মতো করে ফিসফিস করে বলে উঠল সোলেমান।

‘আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে?’ ত্রিলোক জানতে চাইল। তার গলায় ক্রান্তি।

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

‘পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে সেটা আমি জানি, কিন্তু কীভাবে হবে সেটা বের করতে হলে আমার আসলে কোম্পানির সাহায্য দরকার,’ কর্নেল বলে উঠল। ‘আর্থার নামে একজনকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। ডিক্টরের লিখে যাওয়া বার্ক,’ বলেই নিজেকে শুধরে নিল কর্নেল। ‘মানে ঐকে রেখে যাওয়া মেসেজ অন্তত তাই বলে।’

‘কর্নেল, একটা কথা জিজ্ঞাস্য,’ পালোয়ান তার কুকুরটার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে উঠল। ‘ওদের বন্দি করার সময়ে কুকুরটাকে কিছুই বলেনি বিদ্রোহীরা। কুকুরটাও বুদ্ধিমান কিছু করার নেই, বুঝতে পেরে সে কাছাকাছি ছিল কিন্তু একেবারে সামনে আসেনি। ওরা মুক্ত হওয়ার পর যখন গলির ভেতরে সরে যায় তখন সে আবার ফিরে আসে ওদের কাছে।’

‘বলো।’

‘কোম্পানির ডিক্টরকে কেন দরকার?’ বলে সে আঙুল দিয়ে ইশারা করল, ‘তুমি হয়তো জাতিগতভাবে ওগো লোক, কিন্তু আমরা সবাই এইখানে কমবেশি কাউরে আপনও মনে করে না। কাজেই ওরা ডিক্টরের মতো একজন মানুষকে কেন এমনে খুঁজতাকে মনে হয়?’

‘এই প্রশ্নের উত্তর আমি নিজেও পুরোপুরি জানি না,’ কর্নেল আবার ফিরে তাকিয়েছে বাইরের দিকে। ‘কিন্তু এর জবাব জানতে নয়, বের করতে হবে, সেই সঙ্গে কিছু জিনিস বুঝতে হবে আমাকে এবং আমাদের,’ বলে সে সবাইকে দেখাল। ‘কাজের জন্য জীবন দিতে হলে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু যদি, কাজ উদ্ধারের পর জীবন দিতে হয়, তাও নিজের মানুষদের কাছে, এরচেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না।’

‘মানে কি—’ পালোয়ান বলে উঠল।

কর্নেল ইশারায় চুপ থাকতে বলল তাকে। পিটার এগিয়ে আসছে আরো বেশ কিছু ইংরেজ সৈনিক এবং অফিসারের সঙ্গে। ‘এমন নয় আমি পিটারকে অবিশ্বাস করি কিন্তু অন্যরা—’ বলে সে পিটারের দিকে ফিরে তাকাল। ‘পরিস্থিতি কি—’

‘চলো, কর্নেল ভেতর থেকে ডাক এসেছে, সবাই অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য,’ বলে পিটার সবাইকে তাড়া লাগাল। ‘চলো,’ কর্নেল বলে উঠল। পিটারের পাশাপাশি এগোতে দিল্লির পরিস্থিতির বয়ান শুনতে লাগল। যেখানে সবাই অপেক্ষা করছে সেই কামরার বাইরে এসে পিটার ইশারা করতেই একজন অফিসার দরজা দাঁড়ানো প্রহরীদেরকে নির্দেশ দিতেই দরজা খুলে মেলে ধরল সবার জন্য। ভেতরে প্রচুর মানুষ এবং লম্বা চৌপায় ঘিরে রীতিমতো হটগোল চলছে সেখানে। কর্নেল দেখল টেবিলে খাবার থেকে শুরু করে ম্যাপ, অস্ত্র থেকে শুরু করে মদ, কিছুই রাখতে বাকি

সিপাহী

নেই। কেউ উৎফুল্ল, কেউ উত্তেজিত, কেউ ভীত, কর্নেলদের নিয়ে পিটার এবং তার সঙ্গী ক্যান্টেন একপাশে চলে এলো, সেখানে সেদিনের জেনারেল উইলিয়াম, কোম্পানির প্রতিনিধি এডওয়ার্ড এবং সঙ্গে আরো বেশ কয়েকজন আলাপ করছে। কর্নেল খুবই অবাক হয়ে দেখল তার বন্ধু জনও রয়েছে তাদের মাঝে।

‘স্যার্স,’ কর্নেলকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এলো জন।

‘দিল্লি জয়ের জন্য শুভেচ্ছা বন্ধু,’ কর্নেল চেষ্টা করল যেন তার হাসিটা যতটা সম্ভব আনন্দময় দেখায় কিন্তু জন পাত্তাই দিল না কর্নেলের ফর্মালিটির, সে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল কর্নেলকে। ‘এমন তো হওয়ারই ছিল, তুমি কেমন আছো বলো? যে খেল তুমি দেখালে শুনেছি!’

কর্নেল নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠল, ‘না তেমন কিছু না, চেষ্টা করছি আরকি—’

‘কর্নেল, আসুন আসুন,’ জেনারেল উইলিয়াম বলে উঠল।

‘জন, জেনারেল,’ বলে কর্নেল নিজের দলের সবাইকে একে একে পরিচয় করিয়ে দিল, পালোয়ানের কুকুরটাকেসহ।

‘বাহ দারুণ, আমি শুনেছি বোম্বে বন্দরে কী ভয়াবহ অবস্থার ভেতরে পড়তে হয়েছিল তোমাকে, সেখান থেকে উদ্ধার হয়ে নিজের দল বানিয়ে,’ বলে জন মাথা নেড়ে অন্যদের দিকে দেখল।

‘কর্নেল নিজের স্খাতিভাইদের ঠিক বিশ্বাস করেন না মনে হচ্ছে,’ কোম্পানির প্রতিনিধি এডওয়ার্ড বলে উঠল। ‘তার দলের প্রায় পুরোভাগই ভারতীয়, তাও এই সময়ে।’

কর্নেল চোখ তুলে তাকাল কোম্পানির প্রতিনিধির দিকে, তার দৃষ্টি একেবারে শান্ত কিন্তু স্থির। ‘কখনো কখনো স্থির আগুনের চেয়ে অগ্নি স্কুলিঙ্গের ওপরে ভরসা রাখতে হয় বেশি, তাতে আগুন বেশি দূরে ছড়ায়। আপনি আমি আমরা সবাই যথেষ্ট বয়স্ক হয়েছি সেটা উপলব্ধি করার জন্য। যাই হোক কাজের কথায় আসি।’

‘হ্যাঁ, আমি মোটামুটি শুনেছি তোমরা কত দূরে কী করেছো, তবে একেবারে সাম্প্রতিক বিষয়গুলো জানতে হবে, কারণ আমাদের প্রাথমিক অনুমান ছিল ভিক্টর দক্ষিণ ভারতের দিকেই গেছে। আর উত্তর ভারতের মূল অংশ কবজা করার পর আমাদেরও নজর এখন দক্ষিণের দিকেই।’

‘মূল বিষয় আলোচনার আগে আমার একটা কথা রয়েছে,’ কোম্পানির প্রতিনিধি বলে উঠল। ‘মিরাটের ঘটনায় আমাদের কাছে দাপ্তরিক বিচার এসেছে কর্নেলের বিরুদ্ধে যে উনি এবং উনার লোকেরা ইংরেজ সেনাদের ওপরে আক্রমণ করেছে, এই বিষয়ে কর্নেলের কী বলার রয়েছে?’ কোম্পানির প্রতিনিধি এডওয়ার্ড তাকিয়ে রয়েছে অন্যদের দিকে।

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

‘আমরা আমাদের বর্তমান কাজে মনোযোগ দিই,’ জন বলে উঠল।

কিন্তু কর্নেল তার একটা হাত উঠিয়ে থামিয়ে দিল। ‘না জন, আমি বলতে চাই,’ কর্নেল তাকিয়ে রয়েছে কোম্পানির প্রতিনিধির দিকে, একবার জেনারেল উইলিয়ামের দিকে দেখে নিল সে। পিটার থেকে শুরু করে তার সঙ্গে আসা তরুণ অফিসার এবং সৈনিকেরাও তাকিয়ে রয়েছে কর্নেল এবং কোম্পানির প্রতিনিধির দিকে। ‘আমি জানি না কোম্পানির প্রতিনিধি কী শুনেছে বা আমি কিংবা আমার দলের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ এসেছে, তবে আমি পুরোটা বলতে চাই,’ বলে কর্নেল এক পা এগিয়ে গেল কোম্পানির প্রতিনিধির দিকে, তাকিয়ে রয়েছে সরাসরি তার চোখের দিকে। ‘এডওয়ার্ড, হ্যাঁ আমি এবং আমার লোকেরা ইংরেজ অফিসারের গায়ে হাত তুলেছি, শুধু তুলেছি বললে ভুল হবে না, চেষ্টা করেছি সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে আঘাত করার এবং আমি জানি না ওরা বেঁচে আছে না মরে গেছে,’ কর্নেলের গলা শান্ত কিন্তু কঠিন।

‘আপনি একজন ইংরেজ হয়ে নিজের জাতির বিরুদ্ধে এমন কথা কীভাবে বলেন?’ কর্নেল শান্ত থাকলেও কোম্পানির প্রতিনিধির মাথা গরম হয়ে গেছে, তার কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে।

‘এটা তো সঠিক মানসিকতা নয় কর্নেল,’ জেনারেল বলে উঠল। ‘আপনি বেয়াদবি করছেন।’

‘না,’ কর্নেল মাথা নেয়ে মানা করল। ‘আপনার জন্য এটা সঠিক মেন্টালিটি নাও হতে পারে, কিন্তু আমার জন্য এটাই সঠিক মেন্টালিটি। কারণ আমি সরাসরি সেনাবাহিনীর লোকও নই, আবার আমি কোম্পানির হয়েও কাজ করছি না। আমি কাজ করছি সরাসরি গ্রেট ব্রিটেনের রাজদরবারের হয়ে,’ বলে সে জনের দিকে দেখাল। ‘বিশ্বাস না হলে আমাকে এখানে পাঠানোর জন্য যে চিঠি এবং নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে সেটা পড়ে দেখুন। কি, আমি সঠিক বলছি?’ কর্নেল প্রশ্নটা উচ্চারণ করল জনের দিকে তাকিয়ে।

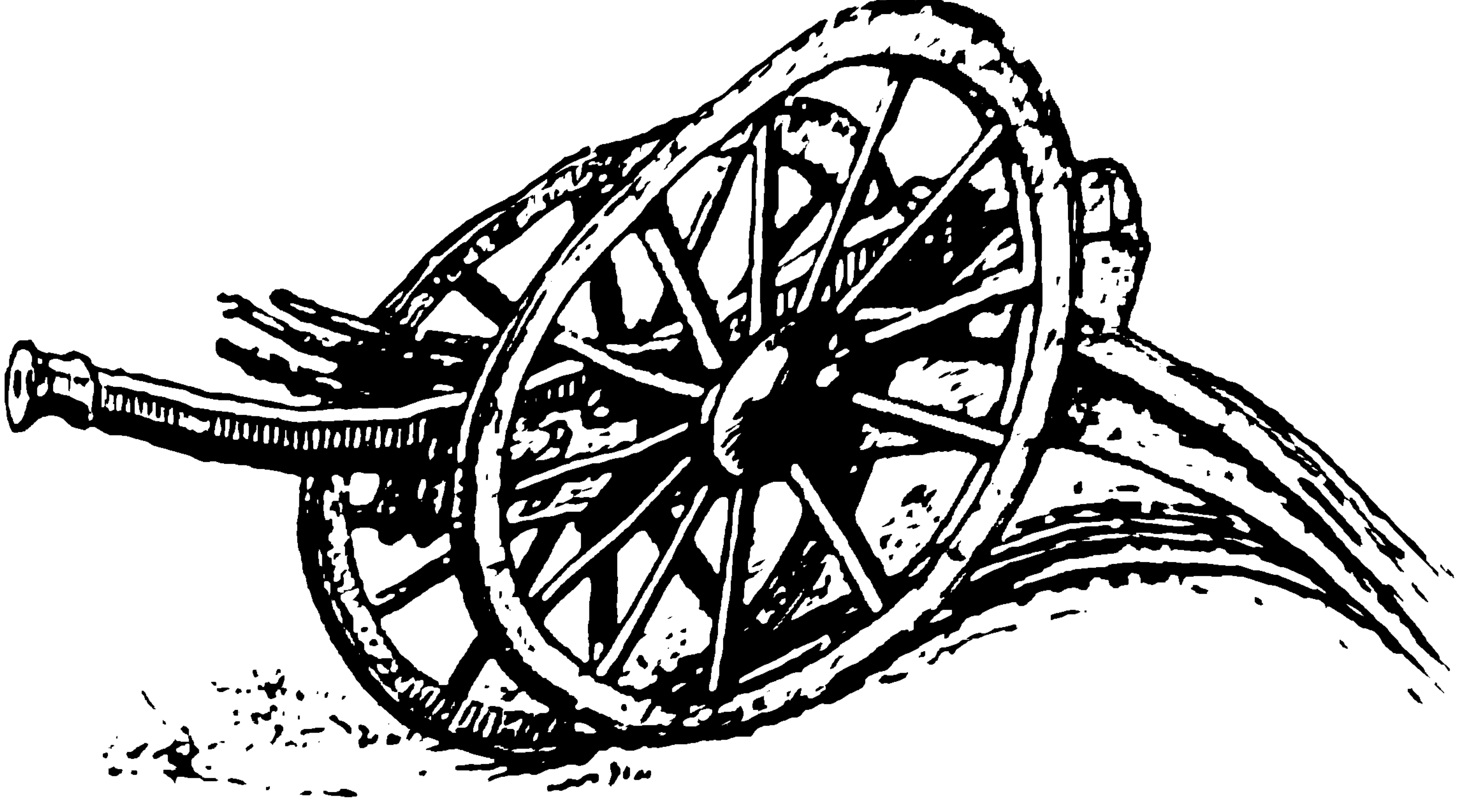
সবাই চুপ, কেউ কোনো কথা বলছে না। আবারো কর্নেলই কথা বলে উঠল। ‘আর আমি এমনকি গ্রেট ব্রিটেনের জন্যও কাজটা করছি না। আমি একজন বন্ধুর অনুরোধে,’ সে জনকে দেখাল। ‘আরেকজন বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য এবং আমার দেশের জাতির এবং ভারতবর্ষের ক্ষতি যা না হয়, সাধারণ মানুষের জন্য যাতে ক্ষতিকারক কিছু না ঘটে সেজন্য আমি আগেই কাজের দায়িত্ব নিয়েছি।’

‘কিন্তু আপনি আমাদের তা সবার সহায়তা পাচ্ছেন,’ কোম্পানির প্রতিনিধি বলে উঠল। ‘আপনি আমাদের লোকের ক্ষতি করতে পারেন না, আপনি আমাদের কাজে জবাবদিহি করতে বাধ্য।’

সিপাহী

‘না, মোটেই বাধ্য নই,’ কোম্পানির প্রতিনিধি এডওয়ার্ডের গলা যতটা ঠুঁক কর্নেলের গলা ঠিক ততটাই শান্ত। ‘মিস্টার এডওয়ার্ড, স্যার। আমাকে বাধ্য যেহেতু করলে আমি একটা কথা বলি,’ বলে সে সবার দিকে নজর বুন্ডিয়ে নিল। কর্নেলের সত্যিকারের শক্তিমত্তা ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে। ‘আপনারা ভারতে নিজেদের মতো চলেছেন, ম্যাসাকার করেছেন, সেই ম্যাসাকারের ফল ভোগ করছে আমার দেশ এবং তারচেয়ে বেশি ভারতবর্ষ। আর ভেতরের কথা যদি বলি, তাকে খুঁজে বের করার মতো বল আপনাদের কারো নেই, তাই আমাকে ধরে এনেছেন। আমি আবারো পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই। আমি কারোই পরোয়া করি না, আমি কাজ করছি মানবতার জন্য। আর যদি আমাকে কেউ জবাবদিহি করতে বলে, আমি এই মুহূর্তে এখান থেকে ইন্তফা দিয়ে চলে যাব। আমার এক পয়সারও দরকার নেই, দরকার নেই কোনো সুযোগ-সুবিধার, আমার লোকদের তাদের কষ্ট অনুযায়ী সুবিধা এবং প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হোক, আমি বিদেয় নেই,’ বলে কর্নেল তার কোমর থেকে পিস্তল এবং তরবারি খুলে টেবিলের ওপরে রেখে দিল।

তার শান্ত এবং গম্ভীর গলা এবং দৃঢ়চেতা কাজ দেখে পুরো কামরা শান্ত হয়ে গেছে, সবাই তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।



অধ্যায় ঊনষাট
বর্তমান সময়
পিবিআইএস ল্যাব
নতুন বাজার, ময়মনসিংহ

ল্যাবে উপস্থিত সবাই তাকিয়ে আছে স্ক্রিনের দিকে।

‘আমি পুরো পাজলটা দেখতে চাই,’ সামিরা বলে উঠল। ‘এবং সিগনেট রিংগুলো কীভাবে একসঙ্গে হয়ে পুরো পাজলটা তৈরি করল সেটাও বুঝতে চাই।’

‘সিগনেট রিংগুলো আলাদাভাবে দেখতে কেমন সেটাও আমি ভালোভাবে দেখতে চাই,’ বাশার যোগ করল। ‘সেই সঙ্গে এখান থেকে আমাদের পরবর্তী স্টেপ কী হবে এবং আমাদের কী করা উচিত, সেটাও বের করতে চাই।’

‘আচ্ছা আমি রিংগুলো দেখাই আগে,’ বলে রুশো টমির দিকে তাকাল। টমি মাথা নেড়ে সায় জানাতেই সে দেখাতে শুরু করল। ‘একটা ব্যাপার খেয়াল করবেন, সিগনেট রিংয়ের প্রতিটা রিংয়ের গায়ে বেশ কিছু সিঙ্কল রয়েছে এবং অন্তত একটা করে প্রমিনেন্ট সিঙ্কল রয়েছে। প্রথমেই আমাদের সবচেয়ে পরিচিত, সার্পেন্টস এনিগমা। এটার গায়ে সার্পেন্ট বা রেপটাইল বা যেটাকে আমরা খাস বাংলায় বলি সাপের মতো চিহ্ন রয়েছে,’ বলে সে রিংটাকে ঘুরিয়ে ওটার গায়ে থাকা সিঙ্কলটা ফোকাস করে দেখাল। ‘আমরা ধারণা করি, এই সিঙ্কলটার অন্তত তিনটা মিনিং রয়েছে, এক, টাইম ওয়াচ সিঙ্কল, দুই ইনফিনিটি সিঙ্কল, তিন ইনফিনিটি সিঙ্কলটাকে সাজানো হয়েছে আরোবরোসের মতো করে,’ বলে সে রিংয়ের সিঙ্কল যুক্ত অংশটাকে জুম করে দেখাল। ‘এখানে আমি খানিক অ্যাড করি, সময়ের ব্যাপারে, স্যান্ড ক্লককে সময়ের ধাপ বলা হয় এবং এই সিঙ্কলকে সময়ের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই এনশিয়েন্ট চায়না থেকে শুরু করে মেডিয়াভাল ইউরোপ থেকে। আবার ইনফিনিটি সিঙ্কলের ব্যবহার মূলত গণিত বা

সিপাহী

ম্যাথ থেকে, যদিও এটা মূলত সতেরো শতকের একজন গণিতবিদের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তবে এটার অরিজিন নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। আর অরোবোরস সেই প্রাচীন মিশর থেকে শুরু করে প্রাচীন গ্রিক, এমনকি নর্স মিথোলজিতেও এর ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় হলো এই সিম্বল তিনটাকে এভাবে একসঙ্গে এর আগে একক ব্যবহারের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে কি না সন্দেহ আছে, আমার অন্তত জানা নেই। এবং অল্প সময়ে আমি ইন্টারনেট থেকে যতটুকু দেখলাম, তাতে আমি অন্তত পাইনি,' বলে সে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'পয়েন্ট হলো এই প্রতিটা রিং, প্রতিটা সিম্বল মিনিংফুল এবং এর প্রতিটা মিনিং ডিবাংক করতে বেশ সময় লাগবে।'

'আচ্ছা সেটা বুঝলাম,' বাশার বলে উঠল। 'রিংগুলো অন্তত দেখাও।'

'আপনার হাতে যে আংটি রয়েছে, সেটার দিকে যদি তাকাই আমরা,' রুশো কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ফিরে তাকাল বাশারের ডান হাতের আঙুলের দিকে। বাশার বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে তার ডান হাতের মধ্যমায় পরা আংটিটা ঘোরাচ্ছিল অভ্যাসবশত। সবাই তাকানোতে ও একটু লজ্জা পেয়ে গেল। কারণ আংটিটা পুরনো দিনের সোনার একটা আংটি, আবার মেয়েদের আংটি। এই আংটিটার একটা ইতিহাস রয়েছে, কিন্তু সেটা তো আর সবখানে বলা যায় না।

রুশো কথাটা বলে বুঝতে পারল বাশার একটু লজ্জা পেয়ে গেছে, যে কারণে সে খানিক লজ্জা পাওয়া হাসি দিয়ে বলে উঠল, 'সরি, ভাই এভাবে বলার জন্য। তবে আপনার আংটিটা একটা কারণে দেখিয়েছি,' বলে সে অন্যদের দিকে তাকাল। দেখুন, বাশার ভাইয়ের আংটিটা দেখেই বোঝা যায় পুরনো ডিজাইন এবং মেয়েদের আংটি, উনি নিশ্চয়ই এটা পরেন কোনো কারণে,' বলে সে নিজের একটা আঙুল তুলে দেখাল। 'ঠিক যেমন আমি পরি, তারও মধ্যমায় একটা বড় রুপালি রঙের আংটি, আমার এই আংটিটাও তেমনি,' বলে সে আবারো প্রজেক্টরে বাটন চাপল। 'আপনারা যদি এই আংটিগুলো দেখেন, এগুলোর একেবারেই আলাদা। পাজলটা ভালোভাবে খেয়াল করে দেখেন, কোনোটা বৃত্তের মতো, কোনোটা ত্রিভুজ আবার কোনোটা অষ্টভুজ আকৃতির এবং প্রতিটার ভেতরে আলাদা আলাদা সিম্বল রয়েছে। আর এই রিংগুলোর বাহ্যিক আকৃতি খাপে খাপে একসঙ্গে বসে তৈরি হয়েছে পুরো পাজলটা। এটা নিজেই একটা বিস্ময়, দেখুন,' বলে রুশো মূল পাজল থেকে একটা একটা করে রিংগুলো আলাদা করে ওগুলোকে তিন শ ষাট ডিগ্রিতে ঘুরিয়ে দেখাল।

'আচ্ছা, বুঝলাম,' বলে বাশার টমির দিকে তাকিয়ে বলল। 'এই রিংগুলোর ছবি আমাকে সামিরাকে পাঠাও আর একটা করে প্রিন্ট কপি দিয়ে দিও,' বলে সে এখন বাকি আবার সবার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। 'এখন প্রশ্ন হলো। এই কেসটা

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

আমরা খানিক রিওয়াইন্ড করব এটাকে ফরোয়ার্ড করার জন্য। প্রথম থেকে শুরু করি, বলে ও নিজের নোটবুকটা খুলে বসল। 'প্রথমে ময়মনসিংহের পাতাল মন্দির, যানে আর্কিওলজিক্যাল সাইট থেকে অপহরণ হলো সাইটের চিফ আর্কিওলজিস্ট রিক্ত মজুমদার। আমি তখন সদ্য অন্য একটা কেস শেষ করেছি। আমাকে এবং স্যামিরাকে পাঠানো হলো কেসের দায়িত্ব দিয়ে। আমরা ময়মনসিংহে পা রাখতেই আমাদের ওপরে আক্রমণ হলো—তাও একেবারে নিজেদের লোক সেজে। যারাই আক্রমণ করেছে তাদের কাছে আমাদের সব ডিটেইল তো ছিলই এমনকি পাসকোডও ছিল। ওখান থেকে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে এলো ইনসপেক্টর রবিউল। আমরা কেসে নামলাম এবং নামার সঙ্গে সঙ্গেই কেসের অন্যতম আই টইটেনেস রুশো গায়েব হয়ে গেল কোনো ট্রেস ছাড়াই। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি স্যামিরা ইনসপেক্টর রবিউল বাদে আর কারো ওপরে ভরসা রাখা যাচ্ছে না। আমি পুরনোদের নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। দলে এলো রমিজ ভাই এবং কনস্টেবল আবদুল্লাহ। আমরা কাজে নামলাম রুশোকে উদ্ধার করা হলো। জানা গেল তার ওপরে আক্রমণ হয়েছিল এবং সে নিজেকে নিরাপদ মনে না করে পানিয়েছিল। এরপরে আমরা সবাই মিলে সাইট থেকে উদ্ধার করলাম কীভাবে রিফাতকে অপহরণ করা হয়েছে এবং সেটা থেকে জানতে পারলাম অপহরণকারীরা কু রেখে গেছে আমাদের জন্য। সেই কু ধরে আমরা জানতে পারলাম আমার আগের কেসের জয়া সরকার এর সঙ্গে কানেকটেড তাকে ছাড়িয়ে আনা হলো, সে এবং অন্যরা মিলে কাজে নামার পর জানতে পারলাম, এর সঙ্গে ডেভিড মানে আগের কেসে সেই লোক জড়িত এবং তাদের সঙ্গে আগের কেসের প্রফেসর ইফতেখার এবং চট্টগ্রামে অ্যাকসিডেন্টে মারা যাওয়া প্রফেসর আবদেল পরিচিত। এমন সময় জয়া সরকার সুইসাইড করার চেষ্টা করল কেন—এখনো পুরোপুরি আমরা জানি না।'

'একটা ভাইটাল পয়েন্ট বাদ গেছে—' স্যামিরা বলে উঠল।

'হ্যাঁ,' বাশার আবারো বলতে শুরু করল। 'অপহরণকারীরা আমাদের যে কু দিয়েছে তার হিসেবে আমরা সন্ধান পেলাম ছয়টা সিগনেট রিংয়ের, এগুলো অসম্ভব মূল্যবান এবং এই ব্যাপারে আগে তেমন কিছুই জানা যায়নি। এবং এখন অবধি এটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মূলত অপহরণকারী কোনো র্যানসম দাবি করেনি, কারণ তারা আমাদের দিয়ে এই কেসের সমাধান করাতে চায়। 'আর কেসটা সম্ভবত ডেভিডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এর সঙ্গে আগের বেশকিছু কেস জড়িত, যেগুলো একমাত্র অথরিটির মানুষদের দ্বারাই সমাধান করা সম্ভব। আর এ কারণেই তারা আমাদের দিয়ে কেসটা সমাধান করাতে চাচ্ছে। এখন এখানে দুটো ভাইটাল প্রশ্ন চলে আসে : এক, আমরা ঠিক পথে এগোচ্ছি কি না, দুই, অপহরণকারীরা এই

সিপাহী

কেসের শেষে আসলে কী করবে,' বলে বাশার মাথা নাড়ল। 'এই কেস ওরা আমাদের দিয়ে সমাধান করাতে চাচ্ছে কিন্তু ওরা বুঝবে কীভাবে আমরা কত দূরে এগিয়েছি এবং এর সমাধান আদৌ করতে পারব কি না। আর করলে সেটা তাদের জানানব কীভাবে এবং—' বাশার তার কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল। 'কোনো মতামত, কোনো সাজেশন?'

'আমার বিশ্বাস যদি আমরা রিফাত ম্যাডামকে আবার ফিরে পেতে চাই তাহলে এই কেসের সমাধান করতেই হবে, ডেভিড এবং সিগনেট রিংয়ের বিষয়ে আসলে কী রহস্য রয়েছে এবং কী সমাধান করতে হবে—সেটার কিনারা করতে হবে। আর আমার বিনিভ একটা পর্যায়ে গিয়ে অপহরণকারীরা যোগাযোগ করবেই,' রুশো যেন সবার উদ্দেশ্যে নয়, বরং অনেকটা আনমনেই বলে উঠল। বলে সে তাকিয়ে আবার লজ্জা পেয়ে গেল।

'ভালো বলেছ,' বাশার মাথা নাড়ল। 'যেহেতু আমরা টিমে কাজ করছি, কাজেই টিমের মতামত, আশা করব। সবাই অ্যাগ্রি রুশোর সঙ্গে?'

সবাই মাথা নেড়ে সায় জানাতেই বাশার বলল, 'ওকে, এবার নেক্সট প্রশ্ন- আমরা আসলে কীভাবে আবার এগোব সামনে?' বলে আবারো সে মাথা নাড়ল নেক্সট স্টেপ কি হবে আমাদের কেসের?' সবাই ভাবছে। সরাসরি জবাব নেই কারো কাছে।

'আমার একটা সাজেশন রয়েছে, ডেভিড যখন এর আগে দেশে আসে সে কোথায় গিয়েছিল কী করেছে সেটার একটা ট্র্যাক বের করতে হবে। তাহলে একটা লিড পাওয়া যেতে পারে। কারণ আমার বিনিভ যাই ঘটছে বা হচ্ছে, এগুলোর সঙ্গে অবশ্যই ডেভিডের এবং আগের কেসের সংযোগ রয়েছে,' সামিরা বলে উঠল।

'ওড, সাজেশন,' বলে বাশার টিমের দিকে ইশারা করে অন্যদের দিকে ফিরে জানানতে চাইল, 'আর কোনো সাজেশন?'

'রিফাত ম্যাডামকে যেখান থেকে অপহরণ করা হয়েছে, তার কোনো আপডেট রয়েছে?'

'আরেকটা ব্যাপার, জয়া সরকার আসলে কেন সুইসাইড করতে চাচ্ছিল সেটা চেক করা যেতে পারে। আসলে কি হয়েছিল—' আবারো সামিরা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ল্যাবের কাঁচের দরজাটার কাছ থেকে কেউ একজন কথা বলে উঠল।

'এত কষ্ট করতে হবে না, আমিই বলছি,' জয়া সরকারের গলা শুনে সবাই ফিরে তাকাল সেদিকে। হাসপাতালে রোগীদের যেরকম পোশাক পরানো হয় সে-ধরনের পোশাক পরে মলিন চেহারা নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জয়া সরকার, সে খানিক টলে উঠতেই সামিরা চট করে উঠে গিয়ে ধরে ফেলল তাকে, বসিয়ে দিল একটা চেয়ারে। 'তুমি অসুস্থ—'

শ্রেফ এক হাত দিয়ে উড়িয়ে দিল জয়া সামিরার কথা। 'আমাকে একটা সিগারেট দাও,' বলে সে হাত বাড়িয়ে বসে রইল। বাশার সামিরাকে ইশারা করল

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

দিতে, এসি রুমের পরোয়া না করে সে সিগারেটে আগুন দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে উঠল, 'ওই ছবিতে এমন কিছু রয়েছে, যা আমাদের পরের স্টেপে নিয়ে যাবে, প্রশ্ন হলো—তোমরা রেডি কি না?' বলে বাশার সবার দিকে চোখ বুন্ডিয়ে দেখে নিল। 'কারণ কেসটা এখান থেকে খুবই আগলি এবং ভয়ংকর দিকে টার্ন নিতে যাচ্ছে।'

ধানমণ্ডি, ঢাকা

স্যার, তানভীর এবং শারিয়ারের সঙ্গে কথা হলো?' ধানমণ্ডি চার থেকে ছয় নম্বর প্রক কয়েক মিনিটের পার্থক্য। কিন্তু অফিস আওয়ারের জ্যামের কারণে খানিক সময় লাগছে।

'মৌসুমির প্রশ্নের জবাবে আনোয়ার পাশা, গাড়ির জানালা নামিয়ে দিয়ে সিগার ধরল। 'হমম, হলো,' মৌসুমি কিছু না বলে চুপ রইল। কারণ ওরা এমন এক মিশনে রয়েছে যার ব্যাপারে খুবই কম মানুষ জানে। এমনকি আনোয়ার পাশাও পুরোটা জানে না। কাজেই কেউ নিজেকে থেকে কিছু না বললে জিজ্ঞেস করা যাবে না।

'দুজন কনভিক্ট যাদের ওরা এসকর্ট করবে, দুজনেই ইন্টারপোলের লিস্টেড ক্রিমিনাল। ইন্টারপোলের সঙ্গে মিটিংয়ের পর ওরা কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে, যেগুলো পালন করতে হবে, আমি মূলত সেগুলোই ওদের জানিয়েছি আমি,' বলে সে খানিক সিগার টানল। 'ওদের সব রিসোর্স দেওয়া হয়েছে, তৈরি করা হয়েছে সমস্ত স্লোক জিন। ওদের সাজানো এসকর্ট বহরের ওপরে আক্রমণ প্রমাণ করে, ওয়ারওয়েজ বা ইত্যাদি কোনোটাই সেফ নয়। ওদের অপারেশন আরেকটু অপেক্ষা করাতে হবে,' আনোয়ার পাশা সঙ্গে যোগ করল, 'আমাদের মিটিংয়ের অবস্থা কি?'

'টাক, স্যার,' এবার মৌসুমি হেসে উঠল। 'মাহবুব স্যার, মানে আমাদের শারিয়ার স্যারের চাচা, আপনার বন্ধু এবং আমার স্পেশাল উইংয়ের চিফ ফাইন্যান্সিয়ার, উনি খুব টাক মানুষ। আর যেভাবে একের পর এক আমাদের কেস জড়িয়ে যাচ্ছে। উনাকে কনভিক্ট করা টাক হবে।'

আনোয়ার পাশা হেসে উঠল, 'টাকা যারা দেয়, তারা টাকই হয়। তবে ওকে কীভাবে কনভিক্ট করতে হবে আমি জানি।'

স্পেশাল উইং ল্যাব

নতুন বাজার, ময়মনসিংহ

'ওই ছবিটা দেখানো যাবে?' জয়া সরকার বলে উঠল।

বাশার আবারো কিছু না বলে টমির দিকে ইশারা করল। টমি ল্যাপটপে কি চাপতেই সেই ছবিটা ফুটে উঠল জিনে।

'ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছে তোমরা?' বলে সে সবার দিকে দেখল। তারপর কেউ কিছু বলার আগেই সে-ই আবার কথা বলে উঠল। 'ছবিটা একটা কনফারেন্সের

সিপাহী

আফটার পার্টি। সাধারণত অ্যাকাডেমিক কনফারেন্সে এ-ধরনের পার্টি দেওয়া হয়ে থাকে সোশালাইজেশনের জন্য। একভাবে বলা যায় নিজের নেটওয়ার্ক বাড়ানো থেকে শুরু করে সব ধরনের কাজের ক্ষেত্র বাড়ানোর জন্য এটা করা হয়ে থাকে। মোটামুটি সব ফিল্ডেই এটা করা হয়ে থাকে। যাই হোক যেটা বলছিলাম, জয়া সরকার টাকা দিয়ে ছাই ফেলল। বাশার আগেই টমিকে বলে এসি অফ করে একপাশের জানালা খোলার ব্যবস্থা করেছে। সে আর সামিরা সিগারেট টানছে। কারণ একে তো এই রাতে এখন এখানে সিনিয়র কেউ আসার সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয়ত, পরিস্থিতি টানটান হয়ে উঠেছে। কাজেই এমন অবস্থায় বিড়ি টানা যেতেই পারে।

‘ছবিটার একটা অংশে মানে সামনের দিকে, তোমরা বেশ কয়েকজন বাঙালি দেখতেই পাচ্ছে, প্রফেসর হামিদ, ডেভিড রয়েছে। আরো দুজন বাঙালি রয়েছে—’

‘তুমি কি উনাদের চেন?’ জয়া ওই পর্যন্ত বলতেই বাশার মাঝে প্রশ্ন করল।

‘না, তবে—’

‘আমি বলছি, হ্যাংলা-পাতলা গৌণ্ডালা মানুষটা প্রফেসর ইফতেখার, এই কেসের ঠিক আগ দিয়ে উনাকেই আমি উদ্ধার করেছিলাম। ছবিতে অন্য যে মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছে, উনি প্রফেসর আবদেল, প্রফেসর ইফতেখারের পার্টনার। এই ভদ্রলোক চট্টগ্রামে রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা যাওয়ার পর বিরাট একটা ষড়যন্ত্র আবিষ্কার হয় এবং এরই পরিস্থিতিতে আমরা চট্টগ্রামে রেলিক নামের একটা ভয়ংকর অ্যার্কিওলজিক্যাল চোরাচালানি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম চাঁই মিস্টার ইউকে খেঁজার করি। সেই সঙ্গে তোমাকে আরো ভালোভাবে বলি, সিলেট থেকেই জেড মাস্টার নামের একজনকে খেঁজার করা হয়েছে, যে নেক্রপলিস নামের একই ক্যাটাগরির ইন্টারপোলের লিস্টেড একটা সংস্থার ভয়ংকর অপরাধী।’

‘সর্বনাশ, আমি এগুলোর ব্যাপারে আবছাভাবে জেনেছিলাম। কিন্তু এত জটিল অবস্থা তা জানতাম না—’

‘আরো একটু বলি এই কেসের ঠিক আগে প্রফেসর ইফতেখারকে উদ্ধার করার কেসে আমরা খুবই জটিল একটা বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম,’ বাশার বড় করে দম নিল। সে ভেবেছিল এই বিষয়ে কাউকে সেভাবে বলবে না, কিন্তু এখন বলছে পরিস্থিতির কারণে। ‘ওই কেসে এই নেক্রপলিস এবং রেলিক তো বটেই এর পাশাপাশি একটা কাস্টের দুজন সদস্যকে খেঁজার করা হয়েছে। এরা কারা, কোন কাস্ট এবং কীসের সঙ্গে জড়িত আমরা জানি না। সেই সঙ্গে কিশোরগঞ্জের ইশা খাঁর জঙ্গলবাড়ি দুর্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক জায়গা থেকে আমরা এক বাস্তব পুরনো তত্ত্বদানও উদ্ধার করেছি।’

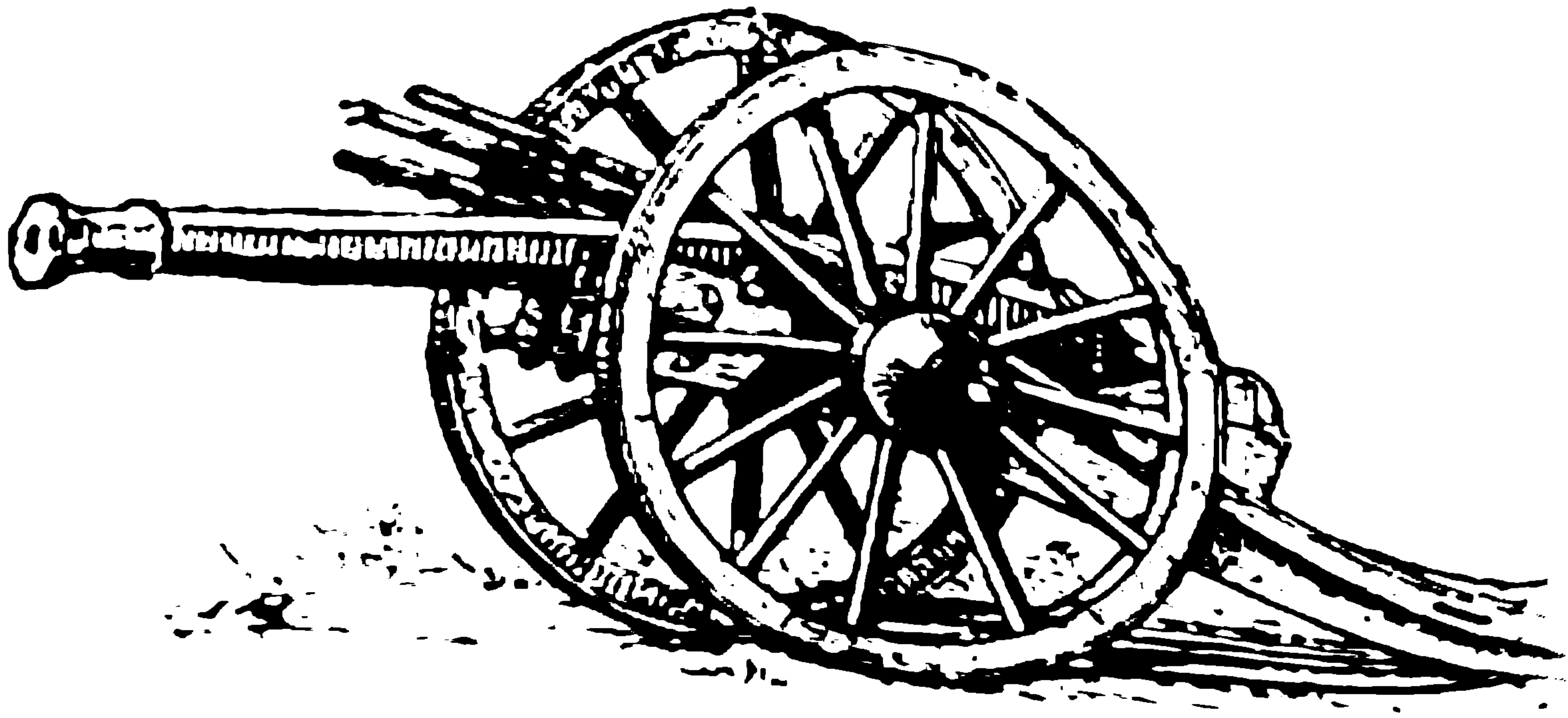
তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

বাশারের কথা শুনে শুনে জয়া সরকারে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। 'এত
ঠিটেইল তো আমাকে তোমরা বলোনি,' তার গলায় অভিযোগের সুর। বলে সে
ক্লম নাড়ল। 'আমি বুঝতে পেরেছি—'

'আসলে এসব কেসগুলো এক সূত্রে গাঁথা কিন্তু কীভাবে আমরা এখনো জানি
না। কিন্তু ছবিটা একটা কু—'

ছবিটা একটা কু কিন্তু ছবিতে তারচেয়ে বড় কু রয়েছে। তোমরা দেখতে
পাওনি, ছবিটার পেছনের অংশ জুম করো—

বাশার ইশারা দিতেই টমি জুম করতে শুরু করেছে, এমন সময় কেউ ল্যাবের
দরজা খুলে ধাম করে ঢুকে পড়ল। সবাই চোখ কলাগাছ করে উঠে দাঁড়াল।
পাটোয়ারি স্যার, ল্যাবে ঢুকেই সিগারেটের ধোঁয়া আর গন্ধে মুখ বাঁকা করে ফেলল
সে। 'এই সব কি,' বলে সে ধমক দিতে গিয়েও থেমে গেল। বাশারের দিকে
তাকিয়ে সে বলে উঠল। 'রিফাত মজুমদারের অপহরণের বড় একটা কু পাওয়া
গেছে, কোস্ট গার্ড একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছে। জলদি চলো।'



অধ্যায় ষাট

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

আগ্রা ফোর্ট, দিল্লি, উত্তর ভারত

কামরার পরিস্থিতি হঠাৎই মারাত্মক টানটান হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে যেই মুহূর্তে কোম্পানির প্রতিনিধি এডওয়ার্ডের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করে কর্নেল তার অস্ত্র টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখেছে। সবাই তাকিয়ে রয়েছে এদিকে, কেউ কেউ বুঝতে পারছে, কেউ বুঝতে না পেরে ফিসফিস করছে—কী হচ্ছে আসলে এদিকে। পুরো কামরার ভেতরে সবচেয়ে ঠান্ডা মাথার মানুষটা ঠিক এই সময়ে কথা বলে উঠল।

‘জেন্টেলম্যান,’ জনের গলা একদম শান্ত। ‘আমার মানে হয় সবার একটা ড্রিংক প্রয়োজন, ডু দ্য অনারস,’ বলে সে অন্যদের দিকে ইশারা করে টেবিলের এদিকে মনোযোগ দিল। ‘সবাই শান্ত থাকি আমরা,’ কথাটা বলে সে কর্নেল এবং এডওয়ার্ড দুজনার দিকেই দেখল। ‘স্যার্স, আমি বুঝতে পারছি তোমার আবেগ এবং তুমি যা বলেছো সেটাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু এডওয়ার্ডও একেবারে ভুল বলেনি। হয়তো মিরাতে কোম্পানির সেনা এবং তোমাদের ভেতরে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তুমি কোম্পানির সেনার গায়ে হাত ওঠাতে পারো না বা সেটাকে জাস্টিফাই করতে পারো না কোনোভাবেই।’

‘দেখো জন—’

‘স্যার্স,’ বলে জন উঠে এসে কর্নেলের কাঁধে একটা হাত রাখল। ‘আমরা সবাই খুব ভয়াবহ সময় পার করছি এবং আমরা এখানে একটা সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করছি, সমস্যা বাড়ানো নয়। আমার দেখা সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন এবং যুক্তিসম্পন্ন মানুষ তুমি, আমি আশা রাখব তুমি সব বুঝবে,’ বলে সে টেবিল থেকে অস্ত্র তুলে কর্নেলে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, ‘আমরা এবার কাজের কথা বলব। সবাই,’ বলে তুড়ি বাজাল সে। একজন আদালি দৌড়ে আসতেই সে সবার

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

জনা কেদারা এবং পানীয়ের ব্যবস্থা করতে বলল। সবাই বসতেই পানীয়ের গ্রাস হতে নিয়ে সে টোস্টের ভঙ্গিতে বলে উঠল। 'দিল্লি বিজয় এবং আমাদের বন্ধু কর্নেলের সৌজন্য।'

সবাই পানীয় পান করার সঙ্গে সঙ্গে জন বলে উঠল, 'জেনারেল, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি কি শুরু করতে পারি?'

'অবশ্যই জন, ধন্যবাদ তোমাকে।'

জেনারেল অনুমতি দিতেই কর্নেলের দিকে ফিরে জন বলে উঠল, 'কর্নেল ব্রিফ করো কী হলো শুরু থেকে। বদলাপুর সেনানিবাস থেকে বের হওয়ার পর কী কী হয়েছে—কর্নেল মোটামুটি বিস্তারিত বলে গেল একে একে, বলার সময়ে সে খেয়াল করছে পেছনে একজন বার্তাবাহক সব লিখে নিচ্ছে। কর্নেল ত্রিলোকের দিকে তাকিয়ে একবার ইশারা করল। মানে এখানে যা বলা হচ্ছে সবই দাপ্তরিকভাবে সংরক্ষিত হবে এবং এটা দরবার থেকে শুরু করে সবখানে চলে যাবে রিপোর্ট আকারে। দিল্লিতে প্রবেশ পর্যন্ত এসে থেমে গেল কর্নেল, ত্রিলোক খুব অবাক হয়ে অবিষ্কার করল, কর্নেল কীভাবে সেই ব্যাংক ডবন থেকে সূত্র বের করেছে—সেই বিষয়ে কিছু বলল না।

'এটাই কি তবে শেষ আপডেট?'

'না কর্নেল বলে উঠল, 'আমরা সেই দিল্লি এসেছিলাম যেই কাজে, সেটা মোটামুটি সম্পন্ন হয়েছে—'

'মানে কি আপনারা জানতে পেরেছেন ডিক্টর কোথায় আছে?' কোম্পানির প্রতিনিধি খানিকটা নির্লজ্জের মতোই জানতে চাইল। একটু আগেই সে এই মানুষটার সঙ্গে ঝগড়া করেছে সেই বিষয়ে তার কথা শুনে মনেই হলো না সেরকম কিছু।

কর্নেল ইচ্ছে করেই চুপ করে রয়েছে ত্রিলোকের মনে হলো।

'স্যাভার্স, তোমরা কি বের করতে পেরেছো সে কোথায় রয়েছে?' জনও ক্র কুঁচকে জানতে চাইল।

'না, তবে আমরা এখন জানি কীভাবে তাকে খুঁজে বের করতে হবে,' বলে সে আবারো ইচ্ছে করেই চুপ রইল।'

জেনারেল থেকে শুরু করে সবাই তাকিয়ে রয়েছে, কর্নেল বলে উঠল, 'জন, তোমার আর্থারের কথা মনে আছে? আমাদের আরেক বন্ধু—'

'আরেক পাগল,' জন বলে উঠল। 'অবশ্যই মনে আছে। কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে আর্থারের সংযোগটা কোথায়?'

'আমি কি একটা কাগজ আর লেখার জন্য কালিসহ পালক পেতে পারি?' কর্নেল জানতে চাইল সেই বার্তাবাহক যে লিখে তার সঙ্গে। জন তার দিকে

সিপাহী

তাকিয়ে ইশারা করতেই সে লেখার মতো সরঞ্জাম এনে রাখল টেবিলের ওপরে। কর্নেল লেখার কাগজ আর পালকটা উঠিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, সবাই মন দিয়ে দেখবে, বলে সে জেনারেল এডওয়ার্ড আর জনের দিকে দেখিয়ে বলে উঠল, 'তোমরা দেখবে, বোঝার জন্য, আর তোমরা,' বলে সে নিজের দলের লোকদের দিকে দেখাল। তোমরা দেখবে মনে রাখার জন্য,' বলে সে জেনারেলের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল। 'বিদ্রোহীরা দিল্লি দখলের পর আপনারা কি ব্যাংক ভবনের ভেতরে ঢুকতে পেরেছিলেন?'

'না, দিল্লি তো আমাদের আয়ত্তেই ছিল না। তবে তুমি তো জানোই একটা দল পাঠানো হয়েছিল কিন্তু ওদের ওপরে দায়িত্ব ছিল ভিক্টরকে কবজা করা। ওরা ব্যাংক ভবনে গোলযোগ লাগালেও ওটার ভেতরে ঢুকে পরখ করতে পারেনি।' 'আমরা আজ দিল্লি প্রবেশের পর যে তথ্য পাই,' কর্নেল ইচ্ছে করেই খলিফার নাম এড়িয়ে গেল। ব্যাংক ভবনের ওপরে সোলেমান এবং ত্রিলোকের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'তোমাদের মনে আছে? ব্যাংক ভবনের যেখানে ভিক্টর ছিল বলে আমরা সন্দেহ করছি, সেখানের দেওয়ালে কী আঁকা ছিল, বড় করে?'

'মনে আছে,' সোলেমান কিছু বলার আগেই ত্রিলোক বলে উঠল। 'একটা উলটা ত্রিভুজের ভেতরে একটা লম্বা লাঠির মতো বসানো।'

ত্রিলোক বলতে বলতে কর্নেল চিহ্নটা এঁকে ফেলেছে, 'এটা?' বলে সে ওদের দেখিয়ে জানতে চাইল। 'হ্যাঁ, এইটাই,' সোলেমান এবং ত্রিলোক দুজনেই সম্মতি জানিয়ে বলে উঠল।

'দেখো তো,' সে জন, জেনারেল এবং এডওয়ার্ডের দিকে দেখিয়ে জানতে চাইল এই চিহ্নটা কীসের প্রতীক, চিনতে পারো কি না?'

সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখছে, কিন্তু তাদের তিনজনের কেউ কিছু বলার আগেই ওদের সঙ্গে থাকা এক তরুণ ক্যান্টেন বলে উঠল, 'এটা তো কিং আর্থারের প্রতীক। ওই উলটানো ত্রিভুজটা হলো পাথর এবং আর ওই লম্বা দণ্ডটা আসলে তলোয়ার, কিং আর্থার যে পাথরের ভেতর থেকে তলোয়ারটা উঠিয়ে এনেছিল, এটা সেই প্রতীক,' ছেলেটা বলে খানিক সংশয়ের সঙ্গে সবাইকে দেখতে লাগল।

'ভেরি গুড বয়,' কর্নেল নিখাদ প্রশংসার সঙ্গে বলে উঠল। 'দেখো তো এবার তোমার বর্ণনা সঙ্গে মেলে কি না,' কর্নেল কথা বলতে বলতে চিহ্নটাকে খানিক পরিবর্তন করেছে। 'এটাই স্যার,' ছেলেটা বলে উঠতেই কর্নেল তার সামান্য বদলানো প্রতীকটা দেখাল সবাইকে। 'ব্যাংকের দেয়ালে এই প্রতীকটা আঁকা ছিল। আমি যতটা পরিষ্কার করে এবং ঠিকঠাক করে এঁকেছি এমন নয়, বরং খানিকটা ইচ্ছে করেই এলোমেলো করেই আঁকা ছিল। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে ওখানে থাকা ভিক্টর একটা বার্তা দিতে চাচ্ছিল কাউকে, সেটা যেই হোক। আর আমার ধারণা

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

‘জানত আমি কিংবা এমন কেউ ওখানে ঠিকই যাবে, যে এই বার্তার মানে ঠিকই বুঝতে পারবে। কিং আর্থারের চিহ্ন—’ বলে কর্নেল জনের দিকে ফিরে তাকাল, সে তাকিয়েই রইল।

কিং আর্থার, জন ফিস ফিস করে বলে উঠল, ‘আর্থার। মেইক সেন্স। কিন্তু তুমি কি নিশ্চিত যে আমাদের নির্দিষ্ট আর্থারকেই বোঝাতে চেয়েছে ভিক্টর?’ জনের মতো মানুষকে সন্তুষ্ট করা সহজ নয়, এটা তো জানা কথা।

কর্নেল হেসে উঠল, ‘আমি শতভাগ নিশ্চিত দুটো কারণে। প্রথমত, কিং আর্থারের এই সিফলের আরেকটা মানে আছে, কেউ জানে?’

‘আমিই বলছি,’ জন বলে উঠল। ‘এই প্রতীক আসলে রাইটফুল এয়ারকে সিফলাইজ করে।’

‘মানে অনেকটা এমন যে, লাক ডেসটিনি, ডেডিকেশন যাই হোক না কেন। সঠিক মানুষটা একটা সময় নির্ধারিত হবেই, তাই না?’ কর্নেল বলে উঠল। জন মাথা নেড়ে সায় জানাল। ‘এক্সক্রেও ভিক্টর এই সিফলটা এমনভাবে ঐকেছে সেটা আমি হইবা যেই হই, নির্দিষ্টভাবে সেই তাকে অনুসরণ করতে পারবে যে এটার অর্থ বুঝতে পারবে। ভিক্টর আগেও এমনটা করত, তোমার মনে আছে কি না?’

জন মাথা নেড়ে সায় জানাল কর্নেলের কথা, তার মনে আছে।

‘আর দুই নম্বর কারণ?’ এবার জেনারেল জানতে চাইল।

‘এটা আমি বলতে পারব এবং জন কনফার্ম করতে পারবে।’ এটা খানিকটা ব্যক্তিগত, তোমার মনে আছে জন, ছোটবেলায় আমরা ট্রেইল হান্টিং খেলতাম, যেখানে এভাবে কু সাজিয়ে চিহ্ন দিয়ে দিয়ে এগোত, যারা জানে না তাদের বলছি, ট্রেইল হান্টিং ইংল্যান্ডে শিকারদের জন্য খুবই পপুলার একটা খেলা।’

‘আমার মনে আছে স্যার্স এবং এই খেলায় সবসময় উদ্যোক্তা থাকত ভিক্টর, কারণ সেই আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল। সে এমন সব ট্রেইল বানাত আমাদের মাথা খারাপ হয়ে যেত,’ বলে জন মাথা নাড়ল। ‘আমিও এখন মোটামুটি নিশ্চিত যে ভিক্টর আর্থারের কথাই বলেছে। আর—’

‘আর্থারের বিষয়টা নিশ্চিত এবং এটাই উপযুক্ত মানুষ,’ অনেকক্ষণ পর কোম্পানির প্রতিনিধি এডওয়ার্ড বলে উঠল। ‘যে আর্থারের বিষয়ে কথা হচ্ছে, আপনারা হয়তো তাকে চেনেন কিন্তু বিগত কয়েক বছর সে কী করছে বা করেছে আপনারা জানেন?’

জন, কর্নেল এবং জেনারেল কেউই জানে না।

‘আর্থার এবং ভিক্টর একসঙ্গে কাজ করত, এটা আমি জানি কিন্তু পরে—’ জন বলে উঠল।

সিপাহী

ঠিক তারা একসময় দুজনেই একসঙ্গে কাজ করত এবং আর্থারও ভিক্টরের মতোই রহস্যময় জীবন যাপন করত। একভাবে বলা যায় ভিক্টর তা-ও ব্রিটিশ রাজ এবং কোম্পানির সঙ্গে দীর্ঘসময় কাজ করেছে এবং যোগাযোগ রেখেছে, তারপর যা হওয়ার হয়েছে। কিন্তু আর্থার এ দেশীয় সব ট্রাইবের সঙ্গে কাজ করত। সে স্থানীয় কেমিক্যাল এবং নানা ধরনের ওষুধ নিয়ে কাজ করেছে লম্বা সময়, তার ব্যাপারে কথিত রয়েছে সে নানা ধরনের ভালো ওষুধ যেমন বানাতে পারত, ঠিক তেমনি, নানা ধরনের নেশাজাতীয় জিনিসও বানাত। তার সঙ্গে খুবই রহস্যময় মানুষ এবং ভিক্টর ছাড়া তার আর কোনো ইংরেজের সঙ্গে সখ্যতাও ছিল না বহুদিন।

‘কোথায় পাওয়া যাবে আর্থারকে?’ কর্নেল জানতে চাইল।

এডওয়ার্ড একবার জেনারেলের দিকে দেখল, তারপর কর্নেলের দিকে ফিরে বলে উঠল, ‘আমাদের দাপ্তরিক হিসেবে, আর্থারের নিজের একটা দোকান ছিল হায়দ্রাবাদে, ওখানেই সে থাকে এবং শেষবারও তাকে ওখানেই দেখা গেছে, যদিও সেটা বেশ আগে।’

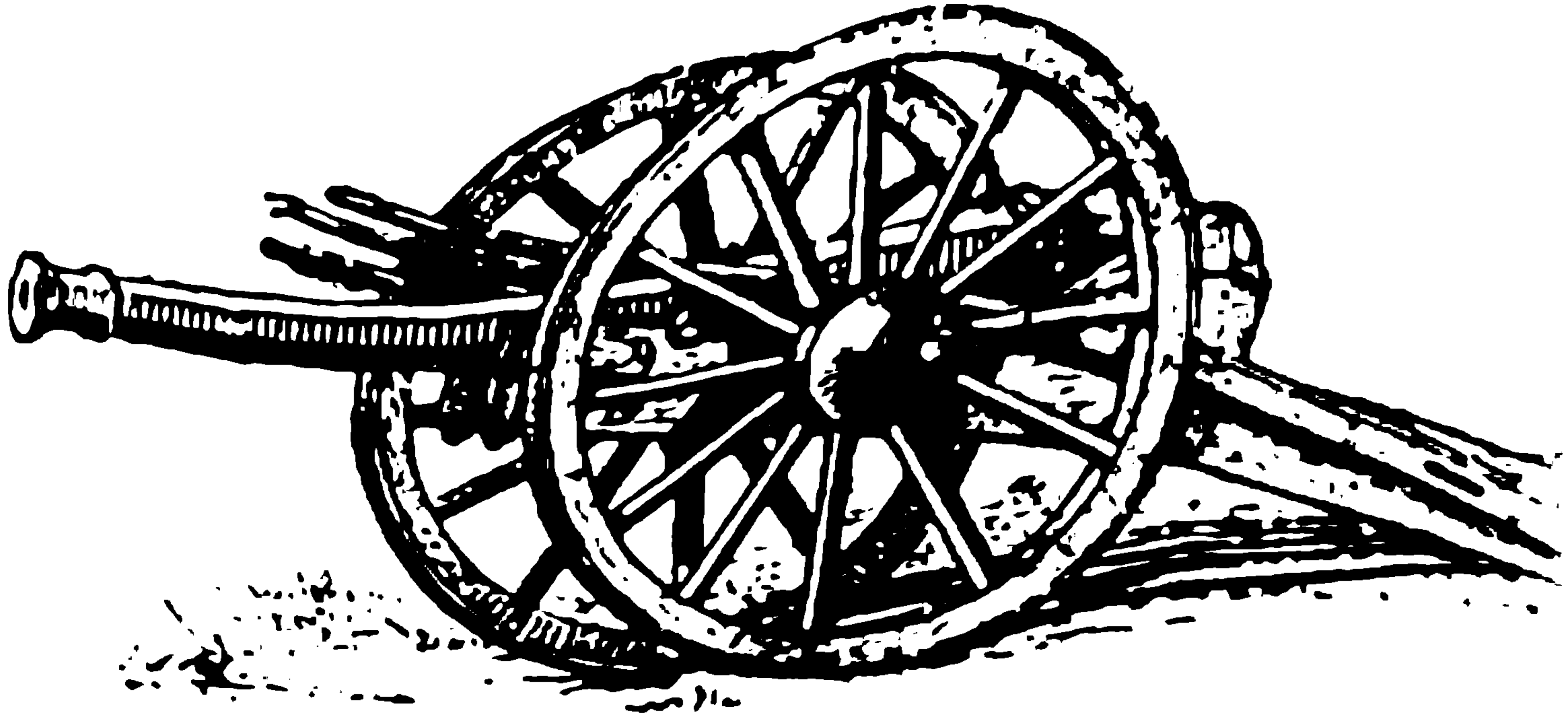
‘হায়দ্রাবাদে যেতে হবে আমাদের,’ কর্নেল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠল। ‘আমার বিশ্বাস ওখানে গেলেই একমাত্র ভিক্টরের ব্যাপারে কিছু না কিছু জানা যাবেই।’

‘কিন্তু সমস্যা হলো, হায়দ্রাবাদ নিজামের শহর, আর ওটা এখন স্রেফ জীকট আয়েয়গিরি।’

‘মানে?’ কর্নেল ক্র কুঁচকে বলে উঠল।

‘মানে হলো,’ সেই তরুণ ক্যান্টেন বলে উঠল। ‘আপনারা তো জানেন ব্যারাকপুর থেকে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ার পর আক্রান্ত হয় দিল্লি এবং সেখান থেকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যদিও উত্তর ভারতে আমরা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাচ্ছি, কিন্তু দক্ষিণ ভারত এখন স্রেফ আয়েয়গিরিতে পরিণত হয়েছে। আর এই মুহূর্তে দিল্লি দখলের পর পুরো আগুন ছলে উঠবে দক্ষিণ ভারতে। হায়দ্রাবাদ হলো এগুলোর প্রাথমিক কেন্দ্র।’

‘কোনো বিষয় না,’ কর্নেল একবার নিজের লোকদের দিকে দেখে নিয়ে বলে উঠল, ‘তার প্রতিটা লোকের চোখে-মুখে একইরকম দৃঢ় প্রত্যয়, ঠিক তার মতোই। ‘একবার বেহেতু মাঠে নেমেছি, প্রয়োজনে আয়েয়গিরির লাভার ভেতর থেকে হাত দিয়ে আমি বের করে আনব, যা খুঁজে বের করতে চাচ্ছি। হায়দ্রাবাদ তো দূরে থাক, আমি প্রয়োজনে নরকে যাব,’ বলে সে উঠে দাঁড়াল। ‘আমাদের ঘোড়াগুলো শহরের বাহিরে রয়েছে। আমাদের আরো কিছু অস্ত্র, পোশাক, রসদ এবং আমার আরো কিছু তথ্য লাগবে। আজ রাতে বিশ্রাম নিয়েই আমরা আজ সকালে হায়দ্রাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেব।’



অধ্যায় একষটি

বর্তমান সময়

ধানমণ্ডি, ঢাকা

‘বুঝলে মৌসুমি, হঠাৎ করে এমন বড়লোক বাড়িতে এলে আমার কেমন জ্ঞানি গা চুলকায়,’ বলে মৃদু হেসে উঠল আনোয়ার পাশা। আনোয়ার পাশার কথা শুনে মৌসুমি হেসে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু বড়লোকদের বাড়িতে চট করে মুখ ভেটকি দিয়ে হাসতে নেই, এটা সে শিখেছে অনেক আগে।

মৌসুমি এবং আনোয়ার পাশা এই মুহূর্তে বসে রয়েছে তাদের পিবিআইএসের প্রধান ফাইন্যান্সিংয়ার মাহবুব তালুকদারের বাসায়। এই মাহবুব তালুকদার আবার পিবিআইএসের অন্যতম এজেন্ট শারহান শারিয়ারের আপন চাচা এবং একমাত্র অ্যাকটিভ গার্ডিয়ান, সেই সঙ্গে আনোয়ার পাশার বন্ধুসমও। আনোয়ার পাশা যখন আগের ফোর্সের সঙ্গে থেকে অনেক ক্ষেত্রে নিজের মতো কাজ করতে পারছিল না, তখন মাহবুব তালুকদারই তাকে বুদ্ধি দিয়েছিল একটা নতুন শাখা খোলার এবং আলফা এম নামে একটা স্পেশাল টিম তৈরি করার, সেই সঙ্গে সে এটাও বলেছিল যদি যথেষ্ট পটেনশিয়াল থাকে তবে সে নিজে এই স্পেশাল উইংয়ের ফাইন্যান্সিংয়ার হবে।

সরকারি প্রজেক্টের প্রাইভেট ফান্ডিং খুব আনকমন নয়। বাইরের দেশে এটা খুব প্রচলিত বিষয়। বাংলাদেশে কম হলেও একেবারে যে নেই তা নয় এবং দিন দিন এটার জনপ্রিয়তাও বাড়ছে। প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিংয়ের মাধ্যমে প্রাইভেট ফান্ড প্রভাইডাররা ট্যাক্স থেকে শুরু করে প্রজেক্ট পাওয়ার নানা ধরনের সুবিধা পেয়ে থাকে। বিষয়টা হলো সরকারি প্রজেক্টে আংশিক বা সম্পূর্ণ ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে তারা ভলান্টারি কন্ট্রিবিশনের মাধ্যমে নিজেরে ব্যবসা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে নানা ধরনের সুবিধা পেয়ে থাকে। এটাও এমন একটা কনসেন্ট যেটা ম্যাস স্কেলে স্পেশাল ফোর্সে ইনক্রুড এবং ইনট্রাডিউস করাতে চাচ্ছিল আনোয়ার পাশা। ওটার

সিপাহী

প্রাথমিক সব কাজ হয়ে গেলেও এবার ফাইনাল আলোচনা এবং অ্যাক্রিস্টাল চন্দ্রের কথা ছিল আজ।

‘স্যার, উনাদের বাসায় এলে আমার কাছে কেমন লাগে জানেন?’ মৌসুমি তার সব কাগজপত্র ইত্যাদি গোছাতে গোছাতে বলে উঠল। ‘আপের দিনের বাংলা সিনেমায় খলিল যেতকম বাড়িতে থাকত এবং দেখা যেত তার মেয়ের প্রেমিককে যে রকম ড্রাইংরুম থেকে অপমান করে বের করে দিত এটা সে-ধরনের বাড়ি।’

মৌসুমি মুখ টিপে বললেও আনোয়ার পাশা জোরে জোরে হেসে উঠল।

‘কি ব্যাপার, এত হাসি কীসের, স্যার?’ ওদের পেছন থেকে কেউ একজন জানতে চাইল। দুজনেই খানিক চমকে গেছে, মানুষটার উপস্থিতি সেভাবে কেউই খেয়াল করেনি। ‘আরে হামিদ ভাই, কেমন আছেন?’

মাহবুব তালুকদারের রাইট হ্যান্ড ম্যান কাম তাদের পারিবারিক ব্যবসা থেকে শুরু করে সব ধরনের কাজের ম্যানেজার হামিদুর রহমান হামিদ। বলা হয়ে থাকে মাহবুব তালুকদার যদি তাদের তালুকদার পরিবার এবং সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে থাকে, তবে সেই অধিপত্যের অন্যতম শিকড় এই হামিদুর রহমান। বিগত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে মানুষটা এক হাত আগলে রেখেছে তাদের পরিবার এবং সাম্রাজ্য। মাহবুব তালুকদারের বড় ভাই মানে, শারিয়ারের বাবার পারিবারিক ট্রাজেডি এবং শারীরিক অক্ষমতার সময়ে তাদের সাম্রাজ্য যখন ভেঙে পড়ার জোগাড় সেই সময়ে, এই মানুষটাই সব ধরে তো রেখেছিলই এমনকি, বাচ্চা শারিয়ারকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে এই হামিদ ম্যানেজার। যে কারণে দেশের অন্যতম পয়সাওয়ালা এবং শক্তিশালী তালুকদার পরিবারের ভেতরে এবং বাইরে এই মানুষটার প্রভাব একইরকম এবং কেউ কেউ এমনও বলে, মাহবুব তালুকদার নাকি বালক, পুরো সাম্রাজ্যের প্রকৃত চালক নাকি এই মানুষটাই। আর তাই এই লোকটার শক্তিমত্তা নাকি ক্ষেত্রবিশেষে কর্নধারের চেয়েও বেশি।

হামিদ ম্যানেজারের দিকে দেখলে মনে হতে পারে নব্বইয়ের দশকের বাংলা সিনেমার পর্দা থেকে আনোয়ার হোসেন উঠে এসেছে, যেকোনো মুহূর্তে হাট অ্যাটাক করতে পারে। হালকা-পাতলা মানুষটা একদম শুকনো এবং পোশাক-আশাকে অস্বাভাবিক এবং খাস বাংলায় বলতে গেলে অনেকটাই সেকেন্ডে। কিন্তু বাহ্যিক দিক থেকে দেখতে সেকেন্ডে এই মানুষটাই বিবিএ-এমবিএ করা আধুনিক কর্পোরেটদের ঘোল খাইয়ে দেয়। এমনকি মাহবুব তালুকদারকে বুদ্ধি দিয়েছিল পিবিআইএসে ফাইন্যান্স করতে।

হামিদ ম্যানেজার ওদের সামনে এসে বসল না, সোফার এক কোনায় দাঁড়িয়ে রইল। ‘স্যার, কেমন আছেন আপনারা?’ বলে সে আনোয়ার পাশার দিকে দেখে নিয়ে মৌসুমির দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকাল।

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর পেন্সা

‘চলো আমি হামিদ তাই আপনি কেমন?’ আনোয়ার পাশা সহস্রো বলে উঠল। ‘মাহবুব কি আসছে?’

‘আসছে, আপনাদের চা-কফি কিছু দিয়েছে?’ স্বল্পভাষী হামিদের গলায় কখনোই স্বস্তিরতা নেই। ‘দিয়েছে,’ আনোয়ার পাশা কাপ দেখিয়ে বলে উঠল। ‘শরিয়ারের বাবা, কেমন আছে?’ যদিও কাজে এসেছে তাও আনোয়ার পাশা চমকিতভাবেই জানতে চাইল।

‘ভালো আছে, তবে খুব একা,’ বলে সে চোখ তুলে তাকাল। ‘বিশেষ করে হেলকে সে খুব মিস করে। শরিয়ারের কী অবস্থা?’ ওদের ব্রাইড অপারেশন কখন শুরু হচ্ছে?’

হামিদের প্রশ্ন তনে চমকানোর কথা ছিল আনোয়ার পাশার কিন্তু দীর্ঘ দিনের অচিন্তিত্য সে জানে কোথায় চমকতে হবে, আর কোথায় নয়। সেই সঙ্গে সে এও জানে দেশের অন্যতম প্রভাবশালী তালুকদার পরিবারের প্রধান চাঁই হামিদ ম্যানেজারের প্রভাব-ক্ষমতা এবং তার রিচ কতদূর। এর আগেও সে দেখেছে ‘সাইলিং ডেভিল’ নামে পরিচিত হামিদ ম্যানেজারের কাছে এমন সব তথ্য রয়েছে, যা এমনকি কোর্সের লোক হয়ে তার কাছেও অনেক সময় থাকে না।

আনোয়ার পাশা এক পায়ের ওপর ওপর পা তুলে বসে ছিল, সে পা নামিয়ে অন্য পা তুলে হামিদ ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিল, প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল না, আবার সরাসরি জবাবও দিল না। ‘শরিয়ার খুব ভালো করছে, সত্যি কথা বলি এতটা ভালো করবে ও, আমি আশা করিনি।’

‘আমি জানতাম,’ হামিদ ম্যানেজার তার স্বভাবসুলভ মৃদু হাসি দিয়ে বলে উঠল। ‘শরিয়ার হলো একটা পাগলা ঘোড়ার মতো, ওকে একবার ঠিকভাবে গাইড করলে ও শ্রেফ একটা সাইক্লোনের মতো শক্তিমত্তা নিয়ে ছুটতে পারে। দরকার শ্রেফ গাইডেন্স। যেটা আপনি করেছেন।’

হামিদ ম্যানেজার আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মাহবুব তালুকদারের গলা শোনা গেল। ‘লেটস ফেস দ্য ডেভিল,’ আনোয়ার পাশা মৃদু স্বরে বলে উঠল। তবে এতটাও মৃদু না যে হামিদ ম্যানেজার শুনতে পাবে না। তার কথা তনে হামিদ ম্যানেজার হেসে উঠল।

স্পেশাল উইং ল্যাব

নতুন বাজার, ময়মনসিংহ

পাটোয়ারি স্যার ল্যাবে ঘোষণা দিল না তো শ্রেফ একটা বোমা ফাটল। রিকাত মজুমদার অপহরণের কেসে নতুন কু পাওয়া গেছে তনে সবাই উত্তেজিত হয়ে

সিপাহী

দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু পাটোয়ারিকে দেখে মনে হলো না সে উত্তেজিত। 'সবাই ঠান্ডা হও। আমি বলতাছি,' বলে সে ভেতরে প্রবেশ করে আবারো নাক-মুখ কুঁচকে বলে উঠল, 'ল্যাবটারে তো বিড়ির ফ্যাক্টরি বানায়ে রাখছে। টমি জানালা খোল ভালো করে।'।

'সরি স্যার, আমরা আসলে ভাবিনি এত রাতে আপনি আসবেন,' সামিরা বলে উঠল দ্রুত। পাটোয়ারি মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল।

'স্যার কী পাওয়া গেছে বলেন প্লিজ,' বাশার তড়িত গতিতে বলে উঠল।

'শান্ত হও বাশার,' বলে পাটোয়ারি হেঁটে গিয়ে ল্যাপটপের সামনে গিয়ে বসে পড়ল। তারপর কি চেপে ম্যাপের একটা জায়গা ছিঁর করল। 'কেউ চেন এই জায়গা?'

'জি স্যার,' কনস্টেবল আবদুল্লাহ বলে উঠল। 'ব্রহ্মপুত্র নদীর এক অংশ বমার নামে ছোট একটা নদীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে এইখানে গিয়ে। মধুপুর জঙ্গল এবং নদী এলাকার একটা পয়েন্ট। সম্ভবত কাঠুরিয়ারা ব্যবহার করে।'।

'ঠিক বলছে,' পাটোয়ারি স্যাটেলাইট ভিউতে জুম করতেই জায়গাটায় দেখা গেল ছোট একটা ঘাটের মতো। 'এইটা নদী আর জঙ্গলের অন্যতম একটা পয়েন্ট, এইখানে একটা পরিত্যক্ত একটা বোট পাওয়া গেছে, খুব বড় না আবার একেবারে ছোটও না। মেশিনচালিত ছোট ট্রলারের মতো। আমরা ধারণা করতাছি এইটাতে করেই রিফাত মজুমদারকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।'।

'স্যার, তাহলে—' বাশার আবারো উত্তেজিত হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই পাটোয়ারির দৃষ্টি দেখে থেমে গেল সে।

'আমারে কইতে দিবা?' মৃদু ধমক দিয়ে সে বলে উঠল। 'যেই জায়গার কথা বললাম ওইখানে আমাদের কোস্ট গার্ড এবং নৌ পুলিশরা একটা পরিত্যক্ত ট্রলার বোট পাইছে, ওইটার কাছেই পানিতে এইটা ডাসতেছিল,' বলে সে তার ই-মেইলে একটা ছবি ওপেন করে দেখাল। সবাই দেখল একটা স্কার্ফ, ডেজা স্কার্ফটা একটা এভিডেন্স ব্যাগের ভেতরে রাখা।

'এটা রিফাত আপার স্কার্ফ,' চট করে বলে উঠল রুশো। 'অপহরণের সময়ে এটাই পরনে ছিল উনার।'।

'যাক তোমার কথায় অন্তত ফাইনাল কনফার্মেশন পাওয়া গেল।'।

'স্যার, আমাদের উচিত ওই জায়গায় পুরো কম্ব অপারেশন চালানো,' বাশার নিজেই যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে যথাসম্ভব শান্ত সুরে বলে উঠল।

'অলরেডি কম্ব অপারেশন শুরু হয়ে গেছে বাশার,' পাটোয়ারি এবার শান্ত সুরে বলল, তার গলায় সহানুভূতি বাশারের জন্য। 'সমস্যা হলো ওই এলাকাটা এমন এক জায়গায় যেখানে জঙ্গল নদী এবং বর্ডার এলাকা এমনভাবে মিলে গেছে,' বলে

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

পাটোয়ারি বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'খুবই কমপ্লেক্স এলাকা, নদীবিধৌত, যে কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়েছে এবং অনেক জায়গাতে নদী সরাসরি চলে গেছে বর্ডার দিয়ে অন্য পাড়ে। তার ওপরে ঘন কাঠল গাছের জঙ্গল। ফলে সব মিলিয়ে এমন এক এলাকা এমনকি কোস্ট গার্ড বা পুলিশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এমন অনেক জায়গাই রয়েছে ওখানে।'

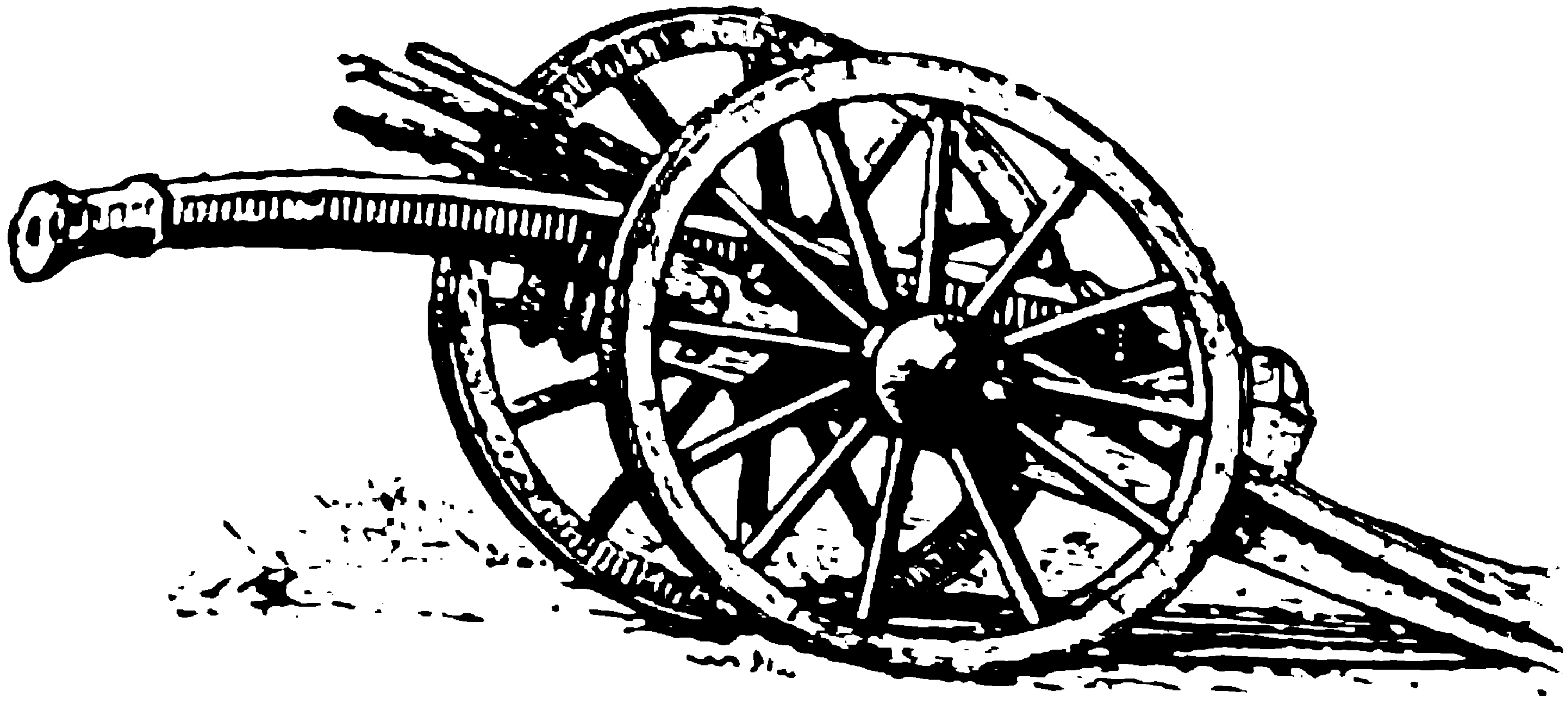
'স্যার, আমি ওই এলাকাতে ডিউটি করেছি,' কনস্টেবল আবদুল্লাহ বলে উঠল। 'রিফাত ম্যাডামের অপহরণ করে ওইখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা যুক্তিপূর্ণ,' বলে সে কাঁধ ঝাঁকাল। 'সত্যি কথা হলো, আমি যখন জানতে পারলাম উনাকে অপহরণ করে নদী দিয়ে পালিয়েছে অপহরণকারীরা আমার মনে হয়েছিল তারা ওইদিকে যাইতে পারে।'

'এখন তাহলে আমাদের করণীয় কি?' বাশারের গলা কাঁপছে। 'আমি কি—'

'তুমি এখন নিজের কাজে মন দেবে,' পাটোয়ারি শক্ত গলায় বলে উঠল। 'ওখানে যা করার করা হচ্ছে, তুমি এখান থেকে ওখানে গিয়ে কিছুই করতে পারবে না,' বাশার তড়বড়িয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই পাটোয়ারি আবারো ধমকে উঠল তাকে। 'আনোয়ার পাশার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। সে স্ট্রিক্ট নির্দেশনা দিয়েছে, তুমি এখন এখানেই কাজ করবে, বুঝতে পেরেছো?' বলে সে একটা আঙুল তুলে বলে উঠল। 'নিজের টিম, নিজের সব রিসোর্স কাজে লাগাও, রেজাল্ট চাই,' বলে সে ঠিক যেভাবে এসেছিল সেভাবেই গটগটিয়ে চলে গেল একটা কথাও না শুনে। পান খাওয়া স্থানীয় ভাষায় কথা বলা পাটোয়ারির সঙ্গে এই পাটোয়ারির কোনো মিলই নেই।

সবাই তাকিয়ে রয়েছে বাশারের দিকে, বাশার বুক ভরে বড় করে দম নিল। সবার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসার চেষ্টা করল। 'চিল এভরিবডি, আমাদের কাজে মন দিতে হবে, অকারণে এক্সট্রাইটেড হয়ে কোনো লাভ নেই, মাথা ঠাণ্ডা করে কাজে নামতে হবে,' বলে সে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকা জয়ার দিকে ফিরে বলে উঠল। 'জয়া, এবার কাজের কথা বলো। ছবিতে কী এমন আছে ব্যাখ্যা করো। আর সেটা যেন কাজের কিছু হয়।'

'ওহ, ইয়া,' বলে জয়া আবারো তার সিগারেটের প্যাকেট টেনে নিল। 'শুধু কাজের না, লম্বা কাজের ফিরিতি আসছে এবং সেটা সত্যিই ঝামেলার।'



অধ্যায় বাষটি

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

হায়দ্রাবাদের পথে, মধ্য ভারত ছাড়িয়ে দক্ষিণের দিকে

লম্বার পথের শেষে যদি থাকে ঝামেলা, সেটা কারো জন্যেই স্বস্তিদায়ক ব্যাপার নয়।

টানা পথ চলার ওপরে রয়েছে কর্নেল এবং তার দল। গন্তব্য দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদ, উদ্দেশ্য ভিক্টরের সম্ভাব্য সোর্স আর্থারের খোঁজ বের করা। খুব ভোরে রওনা দিয়েছে ওরা। আগের দিন রাতে আত্মা ফোর্টে বেশ ভালো খাওয়া এবং বিশ্রামের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে ওদের চাওয়া সবকিছু রাতেই দিয়ে দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে ওদের ঘোড়াগুলোতে শহরের বাইরে থেকে এনে সুন্দরভাবে মালিশ করে খাবার দিয়ে আশ্বাসে রাখা হয়। বিশ্রাম এবং নতুন উদ্যমে খুব ভোরে উঠে প্রায় অন্ধকার থাকতেই কর্নেলদের পুরো দল রওনা দেয় হায়দ্রাবাদের উদ্দেশ্যে। লম্বা যাত্রা, কিন্তু আগের মতোই চলতে শুরু করে তারা।

যখন দিল্লি থেকে রওনা দেয় সেই সময়ও দিল্লির আগুন পুরোপুরি নেভেনি, পোড়া শহরের কালো ধোঁয়া আর আহাজারিতে মুখরিত ছিল বিধ্বস্ত নগরী। রাতভর চলেছে দিল্লি শহরে ইংরেজ অভিযান এবং হত্যাযজ্ঞ। প্রাথমিক যুদ্ধে যারা মারা গিয়েছিল তারা মূলত বেঁচে গেছে। যারা শহরের আনাচে-কানাচে ছিল তাদের অবস্থা হয়েছে সবচেয়ে খারাপ। বিদ্রোহী বা তাদের দোসর নয় যাদের পাচ্ছে কোম্পানি সেনারা তাদেরই হত্যা করতে শুরু করেছে। প্রথম দফায় তারা সমানে গুলি করে মানুষ মেরেছে। তারপর যখন দেখেছে এভাবে হত্যা করতে গুলি কম পড়বে সেই সময়ে তারা বেছে নিয়েছে নিষ্ঠুর পন্থা। একজন করে সৈনিক ধরে এনে গাছের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে ছুরি দিয়ে গলা কাটতে শুরু করেছে। এভাবে হত্যা করতে করতেও তারা যখন দেখেছে পারা যাচ্ছে না। ধরা পড়া সৈনিক আর বিদ্রোহীদের এক অংশতে নদী-পুকুর আর কুয়ার পাড়ে দাঁড় করিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

কমান দিয়ে। আর অন্যদেন টানতে টানতে নিয়ে গেছে শহরের বন্দিখানায়। বাহুবিচার নেই সকাল হতেই সমানে লটকে দিতে শুরু করেছে শহরের কেন্দ্র থেকে শুরু করে এখানে-সেখানে।

এমনিতেই সকালেই রওনা দেওয়ার কথা ছিল তাদের, শহরের এই নারকীয় অবস্থা থেকে যত দ্রুত সম্ভব সরে পড়তে চাচ্ছিল কর্নেল। শহর ছেড়ে টানা পথ চলেছে তারা। তারপর খানিক বিশ্রাম, তারপর আবারো পথ চলা। পথ চলতে চলতে কর্নেলের পাশে চলে এলো ত্রিলোক। ‘কর্নেল খবর শুনেছে শহর ছাড়ার আগে?’

‘হম, শুনেছি তবে ভালো কিছু তো নয়,’ বলে আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল। সবাই পাগলা কুস্তা হয়ে গেছে, এভাবে বাহুবিচারহীন হত্যাকাণ্ডের সমর্থক নই আমি। অভিজ্ঞতা বলে এরকম হত্যাকাণ্ড কারো জন্যই মঙ্গল বয়ে আনে না।’

‘খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা উদাহরণ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে,’ বলে ত্রিলোক মাথা নাড়ল। ‘তবে আমি ভিন্ন খবরের কথা বলছি। সম্রাট এবং রাজ পরিবারের কী হবে জেনেছেন কিছু?’

‘কর্নেল মাথা নাড়ল। ‘না, তুমি?’

ত্রিলোক মাথা নেড়ে সায় জানাল। ‘আমি যা শুনেছি সেটা খুবই ভয়াবহ, সম্রাট জাকরকে বন্দি করে কারাগারে রাখা হয়েছে, আর সেই সঙ্গে বন্দি করা হয়েছে তার সব ছেলেদের।’

‘সম্রাটকে ওরা কষ্ট দেবে,’ কর্নেল চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে উঠল। ‘আর তার ছেলেদের—’

‘ওরা ভিন্ন পথ বেছে নিচ্ছে আমি শুনলাম, মেজর ইয়ং এবং তার দল প্রস্তাব করেছে সম্রাটকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না, বরং তাকে বন্দি করে রাখা হবে কিংবা নির্বাসনে পাঠানো হবে। আর তার ছেলেদের জনসম্মুখে হত্যা করা হবে।’

‘ছি ছি, আসলেই কি তাই?’ কর্নেল খানিক অবাক হয়েই জানতে চাইল। ত্রিলোক যা শুনেছে সেটা যদি সত্যি হয়, তবে নিজের স্বজাতির নিষ্ঠুরতায় সে নিজেই বিচলিত। ‘যদি সত্যিই এটা বাস্তবায়ন করে তবে এটা হবে, কোম্পানির ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়। এটার ফল কোম্পানিকে ভোগ করতে হবে।’

‘সেটা তো অবশ্যই, কিন্তু আমার কথা হলো সেটা যদি সত্যিই ঘটানো হয়ে থাকে এবং এই খবর একবার ছড়িয়ে পড়লে অবস্থা কী হবে ভেবে দেখেছেন, এমনিতেই উত্তরে না হলেও দক্ষিণে সমস্ত রাজা-জমিদার শাসক বিদ্রোহীরা এক হতে শুরু করেছে। উত্তরের ঘটনা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ামাত্রই দক্ষিণে স্রোত আগুন ছলে উঠবে। আর সেই আগুনের ভেতরেই গিয়ে পড়ছি আমরা,’ বলে সে মৃদু

সিপাহী

দুঃখের হাসি হাসল। 'এই বিষয়ে ওরা ভুল বলেনি। আমরা সত্যিই আগ্নেয়াগ্নির লাভার ভেতরে গিয়ে পড়ছি।'

ত্রিলোকের হাসি দেখে হেসে উঠল কর্নেলও। 'জীবনে বহু কিছু দিয়ে গোসল করলেও লাভা দিয়ে কখনো গোসল করা হয়নি। কাজেই এবার সেটা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে,' বলে জোরে জোর হাসতে লাগল কর্নেল।

'এই ওরা হাসে ক্যান,' পেছন থেকে পালোয়ান বলে উঠল। 'আমরাও জানতে চাই।'

'এই সামনে থামব,' কর্নেল বলে উঠল। 'আলোচনা আছে।'

কর্নেল আর ত্রিলোক যখন নিজেদের ভেতরে আলোচনা করতে করতে সামনের আসন্ন ভয়াবহতা নিয়ে হাসাহাসি করছে, ঠিক সেই সময়েই কানিয়া জঙ্গলে এক বার্তা এসে পৌঁছাল। পেশায় তারা খুনি, সমাজের সব মহলে তাদের লোক রয়েছে। বিচরণ রয়েছে সর্বস্তরে। মোগলদের রসুইঘর থেকে শুরু করে হারেম—এমন কোনো জায়গা নেই যেখান থেকে তাদের কাছে বার্তা আসে না। দিল্লির খবর তারা আগেই পেয়েছে কাজেই আবাবো দিল্লি থেকে গোপন বার্তা আসায়, খুনিদের শিবিরে খানিক অবাক উত্তেজনা দেখা দিল।

বার্তা এসেছে বিশেষ একজনের জন্য, তার নিজের খবরি থেকে। বার্তা আসার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ আলোচনাসভায় ডাক পড়ল তার। কী বার্তা এবং কেন এসেছে, সেই সঙ্গে যে ওয়াদা সে করেছে সবার কাছে সেটার বিষয়েও জানান আছে তার কাছে সবার।

গত দিনের নবজন্মের পর তার নাম রাখা হয়েছে কায়া। সাপের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে যাওয়ার কারণে এই বিশেষ নামকরণ করা হয়েছে তার। সেই সঙ্গে তার নতুন শুরু ঘোষণা করা হয়েছে। নবজন্মের পর নতুন শুরু এবং দরবার সভায় এটাই তার প্রথম আলোচনা। যে ওয়াদা সে করেছে, সেই ওয়াদা সে কীভাবে পালন করবে সেটাই জানানর জন্য নিজের বক্তব্য রাখবে সে।

দরবারে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই তার ওপরে নজর বোলাল এবং খানিক অবাকই হলো। এত শক্ত ধাক্কা এমন দুই দিনে কাটিয়ে উঠেছে সে বলার বাইরে, জ্বলজ্বলে চেহারা যেন আগুন জ্বলছে তার। নবরূপে এমন প্রজ্জ্বলিত কাউকে আশা করেনি দরবারের প্রধানরা। দিল্লি থেকে তার নিজস্ব খেচরের মাধ্যমে কী বার্তা এসেছে—সেটা প্রথমে সে জানাল সবাইকে। সেই সঙ্গে সে এটাও জানাল এই অবস্থার পরিস্থিতিতে তার করণীয় হিসেবে সে ঠিক কী করতে চাচ্ছে। এরা সবাই

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

বুনি এক জীবনের এমন কোনো হিংস্রতম এবং অন্ধকারতম রূপ নেই যা এরা দেখেনি। কিন্তু কায়ার পরিকল্পনা শুনে তারা পর্যন্ত ভড়কে গেল।

‘এমন কিছু কি আদৌ সম্ভব?’ একজন আর না থাকতে পেরে বলেই উঠল।

‘অবশ্যই সম্ভব,’ তার গলায় কোনো উত্তেজনা পর্যন্ত নেই, ভয় তো দূরে।

‘তবে আমার নিজামের শহরে যাইতে হবে, সেইখান থেকেই খেলা শুরু করব আমি,’ নিজামের শহর হায়দ্রাবাদে কী চলছে কারো অজানা নয়। সবাই তাকিয়ে রইল, তার নতুন গুরু দিকে, অনেকক্ষণ চুপ থেকে অবশেষে মাথা নেড়ে সায় জানাল সে, কৃতজ্ঞতার হাসি দিল কায়।

হায়দ্রাবাদে যেতে হবে তাকে নিজামের শহরে।

‘কী মনে হয়, ঠিকানা ঠিক আছে?’ কর্নেল জানতে চাইল।

‘ঠিকই তো হওয়ার কথা,’ ক্লান্তিতে মুখ হাঁ করে হাইম ছাড়তে লাগল ত্রিলোক। ওরা হায়দ্রাবাদে প্রবেশ করেছে রাত্রি ভোরের দিকে। পুরো শহর তখন ঘুমে, প্রবেশের জন্যে এমন সময় বেছে নেবার পেছনে কারণ ছিল উদ্ভট এই শহরে এমন সময়ে প্রবেশ করতে হবে, যেই সময়ে শহরের প্রহরা থাকে সবচেয়ে দুর্বল কিংবা একেবারেই নয়। এখানে কয়েকটা বিষয় রয়েছে। প্রথমত, হায়দ্রাবাদ বড় একটা শহর এবং এমন নয় যে অন্য অনেক শহরের মতো এই শহরে প্রবেশের মূল কোনো ফটক রয়েছে এবং সেটা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে যে ওখান দিয়ে প্রবেশ করতে গেলে প্রহরীদের মুখোমুখি পড়তে হবে। আবার এই শহরের অন্য অনেক দিক দিয়েই প্রবেশ করা সম্ভব ছিল। আর তাই ওরা মূল ফটক পার হয়ে শহরে প্রবেশ করে চলে আসে শহরের একপাশে যেখানে ত্রিলোকের পরিচিত এক লোক বসবাস করে। মিলিটারিতে থাকা অবস্থায় দীর্ঘদিন এই লোকের সঙ্গে কাজ করেছে। শহরের একপ্রান্তে সে একটা সরাইখানা চালায় তীর্থযাত্রী এবং পথিকদের জন্যে। তার ওখানে থাকার এবং খাবার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। যে-কারণে তার সরাইখানায় সবাই যাতায়াত করে এবং তার কাছে সব ধরনের খবরাখবর থাকে প্রতিনিয়ত।

সমির মুন্সি নামের এই লোক শহরের সর্বস্তরের সব ধরনের মানুষের সঙ্গে যেমন মিশতে পারে ঠিক তেমনি শহরের সর্বস্তরের এবং সব জায়গাতে তার লোক রয়েছে। ত্রিলোকের খবরি হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছে এবং এই লোক খবরি হলেও কিছু বিষয়ে তার ওপরে ভরসা করা যায় চোখ বন্ধ করে এবং

সিপাহী

লোকটাকে শহরের সবাই সম্মানও করে, মানে ত্রিলোক যখন কাজ করত তখনো ছিল আরকি। দিল্লি থেকে রওনা দেওয়ার সময়ে ত্রিলোক বদল নিয়েছিল, দিল্লিতে তার পরিচিত কেউ শেষবার মুন্সির সরাইখানায় ছিল কি না। সে জানতে পেরেছে মুন্সির সরাইখানা তখনো বিদ্যমান। কাজেই রওনা দেওয়ার পর বিরতিতে যখন তারা তাদের সম্ভাব্য কর্মপন্থা ঠিক করছিল, সেই সময়ে ত্রিলোকই প্রস্তাব করে, হায়দ্রাবাদে গিয়ে আর্থারের খোঁজ বের করে তার মাধ্যমে ভিক্টরকে খুঁজে বের করার বিষয়ে কেউ যদি সাহায্য করতে পারে এবং নিরাপদে তারা কোথাও অবস্থান করতে পারে, তবে, সেটা একমাত্র এই সমির মুন্সির দ্বারাই সম্ভব হবে। কাজেই কর্নেল রাজি হওয়ার পর তারা ঠিক করে মুন্সির ওখানেই চেষ্টা করবে, যদি কাজ না হয় তবে অন্য জায়গাতে কিংবা অন্যভাবে চেষ্টা করবে।

‘ঠিকানা দেখা লাগবে না,’ বলে ত্রিলোক আবারো হাইম ছাড়তে ছাড়তে বড় একটা কাচের দরজা দেখাল। ‘ওই যে মুন্সির সরাইখানার দরজা, দরজার ওপরে নীল রঙের কালি দিয়ে লেখা বার্তাটা দেখলেই বরাবর ভাবতাম মুন্সির দরজায় পৌঁছে গেছি। আজো ব্যতিক্রম না।’

ত্রিলোকের কথা শুনে সবাই নির্দিষ্ট দিকে তাকিয়ে ভোরের আবছা আলোয় রাজ্যের অন্যপাশ থেকে দেখতে পেল ত্রিলোক যা বলছে সেটাই। ‘মুন্সি কি খুব ধার্মিক নাকি?’

‘ওরে বাপরে!’ ত্রিলোক ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বলে উঠল। ‘মারাত্মক রকমের, জীবন দেবে তাও এক ওয়াস্ত নামাজ কাজা করবে না।’

‘আমরা এগোব কীভাবে?’ কর্নেল প্রশ্ন করল। ‘মানে সোজা গিয়ে দরজায় টোকা দেব?’ বলে কর্নেল আকাশের দিকে দেখল একবার। ‘সকাল হতে বেশি দেরি নেই, শহরের যে-অবস্থা তাতে অবশ্যই নিজামের লোকরা হগলে বের হবে। এখানে অবস্থান করাটাও খুব বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।’

‘আমি বলছি, এখন দেশের অবস্থা খারাপ কিন্তু মুন্সির এখানে আমি আগেও বিপজ্জনক অবস্থায় এসেছি, কাজেই তার ওখানে ব্যবস্থা রয়েছে। এক কাজ করো, আমার ঘোড়া রাখো, আমি যাচ্ছি। আমি গিয়ে যদি দেখি সব ঠিক আছে নিরাপদ রয়েছে, তাহলে তোমাদের সিগন্যাল দেব। আর যদি দেখি সমস্যা, তাহলেও তোমাদের ইশারা করব।’

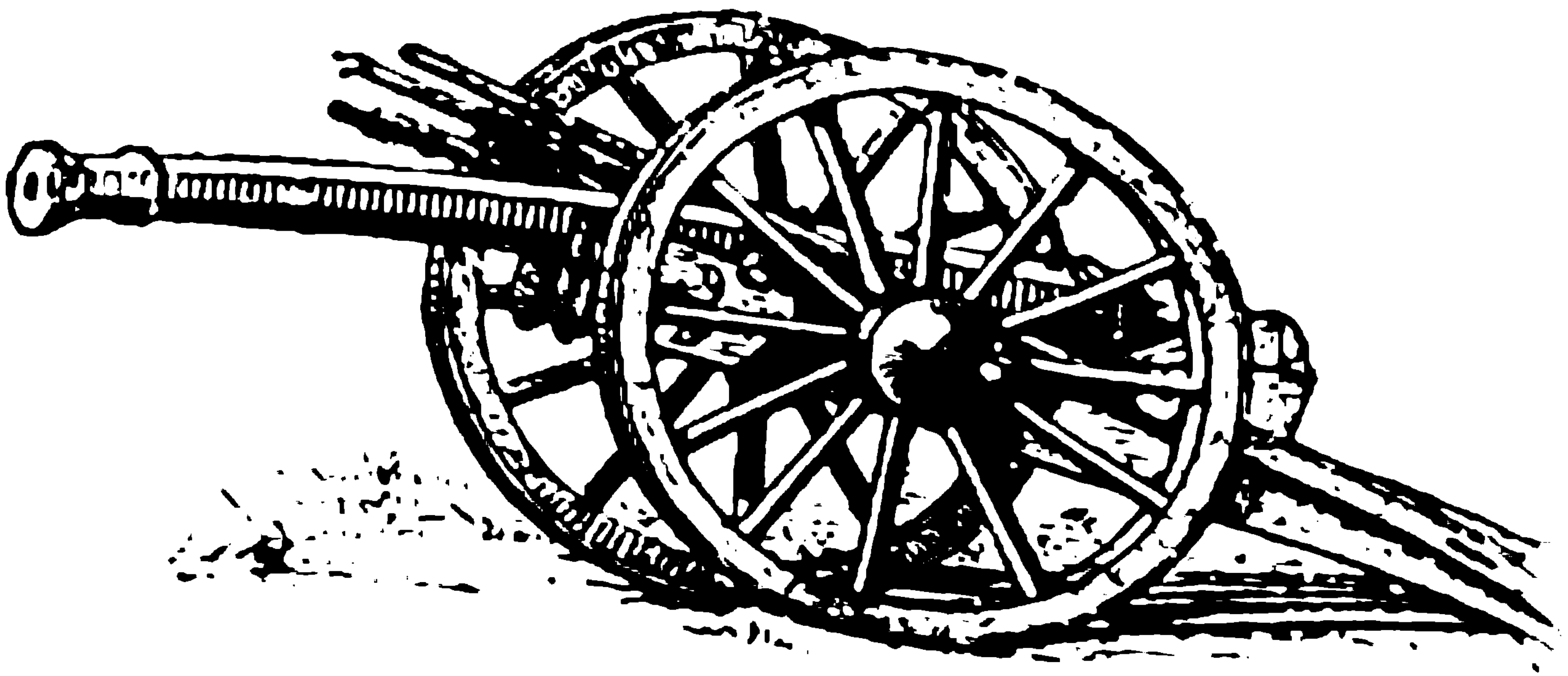
‘ঠিক আছে, সাবধানে,’ কর্নেল সতর্ক করে দিল তাকে। ‘আমরা প্রস্তুত থাকব এখানে,’ বলে সে অন্যদের দিকে দেখল দীর্ঘ যাত্রা এবং ঘোড়ায় লম্বা

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

সব্বদ থেকে সবাই ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত। সবাই এখন স্রেফ কোনোমতে একটা হুহু চায়, কোনোমতে একটু খেয়ে ঘুম দিতে চায়।

‘আমি সাবধান থাকব,’ বলে ত্রিলোক তার ঘোড়া সোলেমানের হাতে ধরিয়ে নিয়ে দুই পাশে রাস্তা দেখে, সোজা চলে গেল মুল্লির সরাইখানার দরজার সামনে। সেখানে গিয়ে সে প্রথমে হাতে টোকা দিল দরজায়। একবার-দুবার-তিনবার দেওয়ার পরও কারো সাড়া না পেয়ে সে রাস্তার অন্যপাশে ওদের দিকে দেখে নিয়ে আনমনে কাঁধ ঝাঁকাল। ত্রিলোক যখন ফিরে তাকিয়েছে ওদের দিকে, ঠিক সেই সময়ে সরাইখানার দরজার একপাশে ছোট একটা খোপের স্রোত খুলে গেল, সেখান দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা বন্দুকের নল। ওদিকে ফিরে তাকিয়েই চমকে গেল ত্রিলোক, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খোপের সঙ্গে সংলগ্ন একটা ছোট দরজা খুলে গেল। সেটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা এক জোড়া হাত ত্রিলোকের হালকা-পাতলা দেহটাকে টেনে নিল ভেতরের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটল, কেউ কিছু করা তো দূরে, বোকার মতো তাকিয়ে রইল সেদিকে।



অধ্যায় তেষষ্টি

বর্তমান সময়

পিবিআইএস ল্যাব, নতুন বাজার, ময়মনসিংহ

‘ছবিটাকে ভালোভাবে জুম করে দেখো, ছবিতে আরেকজন সাউথ এশিয়ান রয়েছে,’ জয়া সরকার কোকের গ্রাসে চুমুক দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে বলে উঠল। পাটোয়ারি চলে যাওয়ার পর বাশার প্রথমে সবাইকে কাজে নামতে বলেও সে থেমে যায়। সবার যে-অবস্থা এবং পুরো কামরা এবং এতে থাকা প্রতিটা মানুষ যেভাবে উত্তেজিত হয়ে রয়েছে তাতে কাজ করা খুব মুশকিল হবে। বাশার টমিকে ল্যাব পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করতে বলে অন্যদের নিয়ে ক্যান্টিনে চলে যায়। যদিও ক্যান্টিন খোলা নেই বা তাতে খাবারও নেই, কিন্তু ক্যান্টিন খুলে ওখানে বসার ব্যবস্থা করতে বলে সে নতুন বাজার মোড় থেকে খাবার আনায় সবার জন্যে। টমি একটু পরে তাদের সঙ্গে জয়েন করে। সবাই সাধারণ কথা বলতে বলতে খাওয়া সারে। বাশার পরিষ্কারভাবে সবাইকে নির্দেশ দিয়েছিল যাতে খাবার সময়ে অন্তত কেউ কাজের কথা না বলে। খাওয়া সেরে সবাই মিলে কফি খেয়ে তারপর আবার ল্যাবে আসে।

এবার আগে থেকেই ল্যাবের জানালা খোলা রাখার ব্যবস্থা করেছিল টমি, কারণ সে জানত বাশার, সামিরা, রমিজ দারোগা আর জয়া সরকার সবাই বিড়ি টানবে। ল্যাবে, বিস্কুট, পিজ্জা কোক আর ফ্লাক্স ভর্তি করে পর্যাপ্ত পরিমাণে চা রাখা হয়েছে, যাতে আলোচনার সময়ে প্রয়োজনে যে কেউ যেকোনো কিছু খেতে পারে। ল্যাবে ফিরেই জয়া সরকার কিছু নির্দেশনা দেয় টমিকে, তারপর শুরু হয় আলোচনা।

এই মুহূর্তে সবাই তাকিয়ে রয়েছে প্রজেক্টরের স্ক্রিনে ফুটে থাকা ছবিটার দিকে। সেই একই ছবি, কিন্তু এবার ছবিটা অনেক বড় আকারে ফুটে থাকায়

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

এক সবাই সেটার দিকে তাকিয়ে থাকায়, সবাই খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখার চেষ্টা করছে। ছবিটা অবশ্যই একটা ছাদে, অবশ্যই কোনো একটা রুফটপ পার্টিতে তোলা। ছবিটাকে পোজ দিয়ে আছে মূলত প্রফেসর হামিদ এবং প্রফেসর ইফতেখার, ডেভিড এবং প্রফেসর আবদেল—হেসে হেসে কিছু একটা কলছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে ছাদের ওপরে কাচের ঘের দেখা যাচ্ছে, ওটার ঠিক সামনে একাধিক মানুষ কথা বলছে। মানুষের সংখ্যাও একেবারে কম নয়, দশ থেকে বারোজন হবে। সবার হাতেই জুস, হুইকি বা ওয়াইনের গ্রাস। সামনের লোকগুলো বাদে বেশির ভাগই ভিন্ন দেশি বা সাদা চামড়ার মানুষ।

‘কই আমি তো তিন প্রফেসর বাদে আর কোনো বাদামি চামড়ার সাউথ এশিয়ানকে দেখতে পাচ্ছি না। মানে কিছু মজয়েড ধাঁচের চেহারার মানুষ রয়েছে, মানে যাদের আমরা চায়নিজ বলি। কিন্তু তারা তো থাই বা কোরিয়ান এরকম মনে হচ্ছে। তুমি কার কথা বলছো সরাসরি।’

‘আছে,’ জয়া সরকার ছবির দিকে না তাকিয়েই বলে উঠল। ‘ভালোভাবে দেখো,’ কোকের গ্রাস নামিয়ে রেখে সে আবারো সিগারেটে টান দিল। সবাই ছবিটাই পরখ করছে কিন্তু কেউই সেভাবে কিছু ধরতে পারছে না। বাশার আবারো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই রুশো বলে উঠল, ‘আপনি কি বলতে চাচ্ছেন প্রফেসর হামিদের মাথার পেছনে যে দুজন মানুষ রয়েছে, তাদের একজন সাউথ এশিয়ার, কিন্তু সেক্ষেত্রে তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। আপনি তাকে চিনলেন কীভাবে?’

রুশোর প্রশ্নের জবাবে জয়া সরকার কিছু না বলে সে সিগারেটের মোখাটা অ্যাশট্রেতে পিষে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রজেক্টরের জ্বিনের সামনে গিয়ে রুশো যেখানটার কথা বলছিল, সেখানে সে আঙুল দিয়ে দেখাল। এটা ছবিটার সর্বভানের অংশ এবং একভাবে বলতে গেলে ছবির সবচেয়ে অস্পষ্ট অংশ। ওখানে চারজন কি পাঁচজন মানুষ দেখা যাচ্ছে রেলিংয়ের কর্নারে প্রায় চকচকে গ্রাসের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুইজন একেবারেই পেছন ফেরা, তাদেরকে স্রেফ আবছাভাবে দেখা যায়, বাকি দুজনের চেহারা বলতে গেলে স্পষ্ট, আর তার ডানের অন্যজনের পুরো চেহারা জ্বিনে বিদ্যমান কিন্তু তার চেহারার ওপরে সামনের জনের ছায়া পড়াতে চেহারা পরিষ্কার নয়, একেবারে কালচে হয়ে আছে। আর এ কারণেই মানুষটার চেহারা জ্বিনে থেকেও অস্পষ্ট। জয়া সরকার একেবারে আঙুল দিয়ে নির্দিষ্টভাবে চেহারাটা ফোকাস করামাত্র সবাই ভালোভাবে তাকিয়ে দেখল, চেহারাটা কালচে হওয়ার কারণে এতক্ষণ ধরা পড়ছিল না। কিন্তু এবার সবাই ভালোভাবে দেখতে পেল।

সিপাহী

‘এই লোক তো বাংলাদেশি বা ইন্ডিয়ান মনে হচ্ছে,’ সামিরা বলে উঠল।

‘অবশ্যই এই লোক বাংলাদেশি,’ জয়া সরকার বলে উঠল। ‘তার নাম, জোয়ারদার, শেখ আলী আজগর জোয়ারদার,’ বলে সে টমির দিকে ফিরে বলে উঠল, ‘টমি ছবিটা পরিষ্কার করে সবাইকে ভালোভাবে দেখার ব্যবস্থা কর এবং বের কর কে এই লোক।’

‘কে এই লোক?’ তারই কথা রিপিট করল বাশার। ‘যাকে দেখে তুমি একেবারে ট্রেনের নিচে লাফ দিতে উদ্যত হয়ে পড়ল। বাই দ্য ওয়ে বিষয়টা খুবই স্টুপিড ছিল,’ বাশারের গলায় এবং চোখে কাঠিন্য।

জয়া সরকার কিছু না বলে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

‘টমি ওর কাজ করছে, এই ফাঁকে তুমি বলো, কে এই লোক?’

‘এখানে উপস্থিত সবাই হয়তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড জানে না, কিন্তু বাশার জানে,’ জয়া সরকার এটুকু বলে নিজের চোঁট কামরে ধরল। ‘আমি কে, আমি কি, আমি কি ছিলাম, বাশার জানে এবং সেই বিষয়ের সঙ্গে এই কেসের সংশ্লিষ্টতা কী ছিল, সেটাও বাশারের জানা আছে। আমি ময়মনসিংহের পুরনো এক রাজপরিবারের সন্তান। কিন্তু ভাগ্য দোষে আমার ছোটবেলা কেটেছে এতিমখানায়। আর বড় হওয়ার পর যখন সব জানতে পারলাম, সে ভিন্ন এক কথা, ভিন্ন এক জীবনের গল্প। মজার বিষয় হলো এতিমখানায় আমি বড় হওয়ার পর আমার একজন স্পনসর ছিল, তোমরা জানো কি না আমি জানি না, অনেক এতিমখানাতেই এরকম একটা বিষয় থাকে। সব এতিমখানার সামর্থ্য থাকে না সব ছেলেপেলেদের সমানভাবে পালার এবং খাবার দেওয়ার বা পড়ালেখা করানোর। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় সামর্থ্যবান পরিবার বাচ্চাদের দস্তক নেয়, আবার অনেক সময় হয়তো বাচ্চাটাকে এতিমখানা থেকে বাসায় নিয়ে রাখে না বা পরিবারের সঙ্গে পালে না, কিন্তু ওই বাচ্চার পড়ালেখা বা অন্যান্য খবর এসব মানুষেরা বহন করে। এমন অনেক লোক অনেক সময় একাধিক বাচ্চাদেরও এমনভাবে পালে। আমরা এ-ধরনের মানুষেরে বলতাম দ্বিতীয় পিতা। আর আমি এতিমখানা ছাড়ার পর বলতাম স্পনসর। আরো একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো এসব মানুষ অনেক সময় বাচ্চাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে আবার অনেক সময় রাখেও না। আমি ছোটবেলা থেকে এতিমখানায় থাকার সময়ে আমরাও এরকম একজন স্পনসর ছিল।’

‘কে এই লোক?’ বাশার জানতে চাইল।

‘আমার অ্যান্টিক নিয়ে আগ্রহ, ইত্যাদি বিষয়ের সব আমার ভেতরে এই লোকই প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল। ছোটবেলায় নিয়মিত সে এতিমখানায় যেত

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

আমার সঙ্গে কথা বলত ইত্যাদি করত। কিন্তু বড় হওয়ার পর সে একভাবে ক্লান্তে গলে হারিয়ে যায়। মানে আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখেনি। এটাও একেবারে বিরল নয়, কারণ অনেক সময়েই দেখা যায়—এরকম দ্বিতীয় পিতা বা মাতারা এতিমদের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখে না তারা বড় হওয়ার পর বা সামর্থ্যবান হওয়ার পর। কারণ এতিমরা অনেক সময় তাদের সামনে সংকোচ বোধ করে। এই লোকও এমন রাখেনি। আমি বড় হওয়ার পর যখন আমার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারি এবং বেশ ভালো ধরনের সম্পদের অধিকারী হই, আমি তাকে অনেক খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি কিন্তু সে সামনে আসেনি। কিন্তু একটা সময় সে সামনে আসে,’ বলে সে ইচ্ছে করেই থেমে গেল। তারপর নাটকীয়ভাবে বলল, আমার দ্বিতীয় সন্তার জন্মের পর।’

বলে সে আবারো থেমে গেল, তাকিয়ে রয়েছে বাশারের দিকে। বাশার অনুধাবন করল সেই পেইনফুল স্মৃতি সে মনে করতে চাচ্ছে না। বাশার নিজে বলে গেল, ডেভিড কীভাবে জয়ার সঙ্গে মিলে শহরের মিউজিয়াম থেকে এক্সবিউশনের নামে জিনিস বের করে এনে রিফাতকে বোকা বানিয়ে ডাকাতির আয়োজন করেছিল এবং সেখান থেকে বোকার মতো ডেভিড নিজেও এবং জয়া সরকার ভয়াবহভাবে আগুনে পুড়ে অর্ধমৃত অবস্থায় পালিয়ে যায়। তখন অবশ্য সে জয়া সরকার নামে নয়, অন্য নামে পরিচিত ছিল। সেদিনের ঘটনায় ডেভিড পানিতে পড়ার পর পুলিশ যখন জয়া সরকারকে ধরতে অভিযান চালাতে যায়, পালাতে গিয়ে সে পুরো বাসায় আগুন লাগিয়ে দেয়, বাসায় আরেকজনের মৃতদেহ পেয়ে পুলিশ ভেবেছিল সে মারা গেছে। কিন্তু জয়া সরকার পালিয়ে যায় এবং নতুন পরিচয়ে সে জয়া সরকার নাম নিয়ে নতুন মানুষ হিসেবে বসবাস করতে থাকে। এর বহু বছর পর বাশার ময়মনসিংহের সেই পুকুরের নিচ থেকে ডেভিডের মৃতদেহ তোলার পর সে আবার প্রেক্ষাপটে এসে হাজির হয়।

‘ডেভিডের মৃত্যুর পর পুলিশ অভিযানে আমার বাসায় আগুন লাগার পর, আমি ভয়াবহ অসুস্থ এবং আহত অবস্থায় কোনোমতে পালিয়ে ঢাকার এক নিম্নমানের হাসপাতালে পড়েছিলাম। প্রায় পুরো শরীর পুড়ে গেছে, টাকা নেই, কোনো মানুষ নেই, পুলিশের ডয়ে কিছুই করার সুযোগ নেই। হাসপাতালের ওরাও বুঝতে পারছিল আমার কোনো একটা গড়বড় রয়েছে। কারণ আমি আহত হওয়ার পরও কথা বলতে পারছিলাম কিন্তু নিজের বিষয়ে কিছুই বলছিলাম না। আর ওই ক্লিনিকটাও ছিল মূলত অবৈধভাবে এবরশন করানোর, বা ক্রিমিনালরা গুলি-টুলি খেয়ে পুলিশ কেঁস না করে ট্রিটমেন্ট করতে চায় এ-ধরনের একটা ক্লিনিক। যাই হোক আমি অপেক্ষায় ছিলাম কোনোমতে টিকে

সিপাহী

যাই কিছুদিন, এরপর যদি বেঁচে থাকি তবে ভালো কোথাও যাব। কিন্তু কয়েক দিন যাওয়ার পরও যখন অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না বরং খারাপের দিকে যাচ্ছিলাম, বুঝতে পারলাম আর বাঁচব না। হাসপাতালের ওরাও আমার আশা ছেড়েই দিয়েছিল। আমি ধুকতে ধুকতে মৃত্যুর দিন গুনছি, এমন সময় সেই হাসপাতালে এলো সেই লোক। আমি ভাবতেও পারিনি সে ওখানে ওভাবে ওই সময়ে গিয়ে হাজির হবে। তার লোকেরা আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে নকল কাগজপত্র ইত্যাদি সব বানিয়ে আমাকে থাইল্যান্ড নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে প্রথমে আমার পোড়ার চিকিৎসা করা হয়, এরপর আমার বিশেষ অপারেশন করা হয় আমার ইচ্ছেতেই—এরপরে আমার কসমেটিক এবং প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়। অলমোস্ট এক বছরের চেষ্টার পর আমি আবারো মানুষে পরিণত হই।’

জয়া সরকার ল্যাবের জানালা দিয়ে বাইরে দেখল। ‘আমি সুস্থ হওয়ার পর সে আমাকে দেশে ফেরার নির্দেশ দেয়। আমি দেশে ফিরে জানতে চাই—আমার পেছনে সে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কেন ঢালল। সেই ছোটবেলা থেকে এবং এখন আবার। সে আমাকে বলল সে একদিন জানাবে। আপাতত সে আমাকে একটা অফার দেয়। অ্যান্টিক নিয়ে পারিবারিক কারণে আমার বিস্তর পড়ালেখা রয়েছে, এটা সে জানত। এরপরে, সে আমাকে বলে, আমি অ্যান্টিক রিলেটেড ইনভেস্টিগেটিভ সাংবাদিকতা শুরু করতে পারি। এতে দুটো সুবিধা হবে, একদিকে আমি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নিতে পারব এবং এই কাজের সুবাদে আমি নানা অ্যান্টিকের খবর বের করতে পারব। আর একবার খবর বের করার পর সে খবর আমি তাকে দিলে, সে তার সোর্সের মাধ্যমে ওটা উদ্ধার করে বিত্রির ব্যবস্থা করবে, যেখানে আমি একজন মিডলম্যান,’ বলে নিজেকে শুধরে নিল জয়া। মিডল ওম্যান হিসেবে কাজ করব।’

‘মূলত, আপনি তার সোর্স, ইনভেস্টিগেটর এবং মিডল পারসন ছিলেন,’ রুশো বলে উঠল। তার গলার স্বরে কোথায় যেন খানিক ভিন্নতা। ‘সঙ্গে আপনি তার ক্রিনও ছিলেন, আপনাকে সামনে রেখে সে ব্যবসা করছিল।’

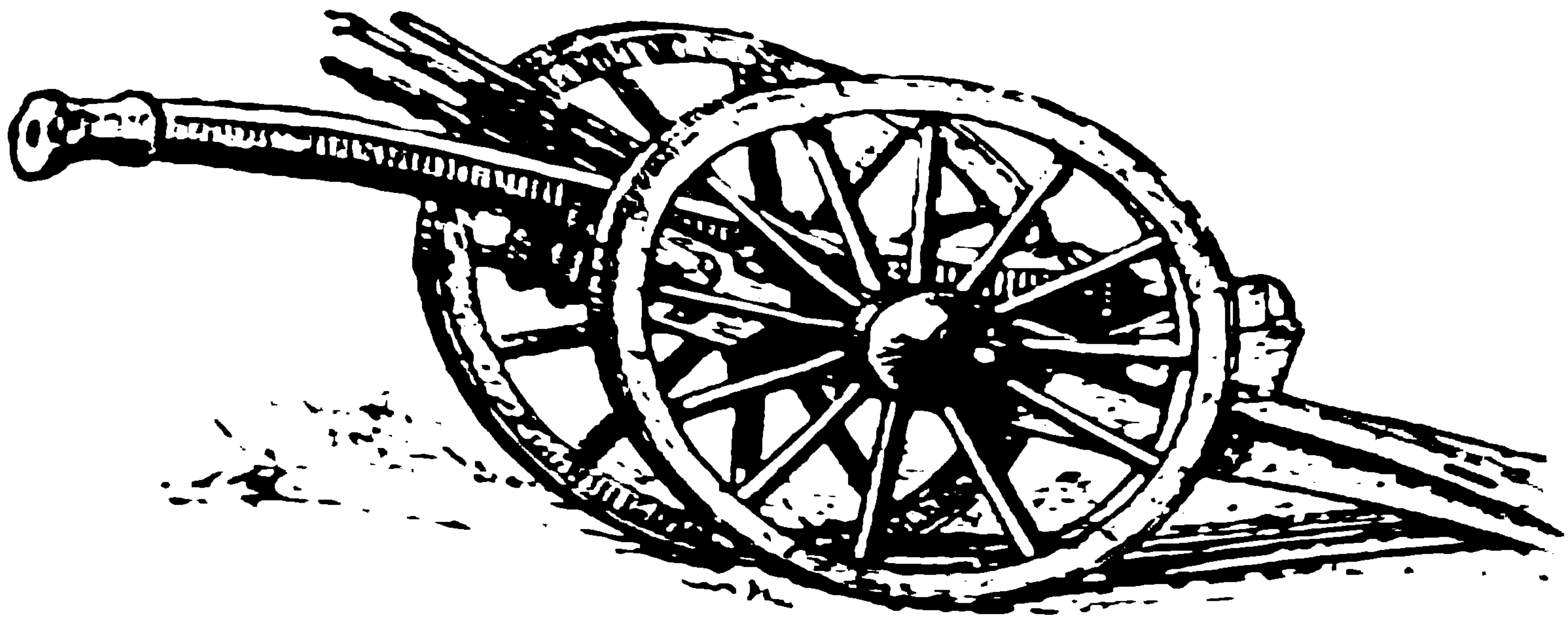
‘রাইট, একদম ঠিক এটাই করছিল সে। আমাদের ব্যবসা এবং কাজ ফুলে-ফেঁপে ওঠে। এভাবে এই ব্যবসা এর আগে এই এলাকায় কেউ করেনি। আর এই লোকের সোর্স, মেধা রিসোর্স অসাধারণ। আমাদের কাজ পুরোদমে চলেছে এর ভেতরে একদিন সে আমাকে খবর পাঠায় তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। আমি দেখা করতে গেলে সে ময়মনসিংহের পুকুরে একটা লাশ পাওয়ার খবর দেখায় এবং সে আমাকে বলে আমি যেন ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা দেখি। এরপর তো আপনারা জানেন,’ বলে জয়া সরকার খানিক থামল।

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

যাই হোক বাশার যখন আমাকে জেলে পোরে—আমি, ভেবেছিলাম আমি দুই দিনে বের হয়ে যাব। এই লোকের যে-পাওয়ার কিছু কোনো কারণে সে আমার সঙ্গে কিছুই যোগাযোগ করেনি। কেন কে জানে, আমি আমার ব্যবসা এবং এই লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সোর্স এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করেছি জেলের ভেতরে বসে এবং অবাক হয়ে আবিষ্কার করেছি আমি কিছুই পাইনি। স্রেফ কিছুই না। এরপরে আমি আজকে প্রফেসর হামিদের স্টাডিতে তার ছবি পেলাম এমন কিছু মানুষের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে তার কোনো সংযোগ রয়েছে আমার ধারণামাত্র ছিল না। এরমানে কি দাঁড়াল, আমি ছোটবেলা থেকে যা জেনে এসেছি সব মিথ্যে। এই লোক এবং আরো কিছু মানুষ মিলে আমাকে বিভিন্ন সময় স্রেফ ব্যবহার করে এসেছে একটা লম্বা সময় ধরে। যখন যেখানে প্রয়োজন হয়েছে, বসিয়েছে-তুলেছে, ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। একবার এটা জানার পরে আমি আর সহ্য করতে পারিনি, বলে জয়া আবার থামল তার চোখে-মুখে বিষণ্ণতা মাখা পানি। ‘আরেকটা কথা, এই কেস তোমরা হয়তো ভাবছ স্রেফ কিছুদিন ধরে শুরু করেছে, আসলে এটা অনেক পুরনো ষড়যন্ত্র। কি কেন, কোথায় আমি জানি না, তবে অনেক পুরনো।’

‘ব্যাপার না,’ বাশার কঠিন গলায় বলে উঠল, ‘যখন যেখানে যাই হোক আমি এর সমাধান এখনই করে ছাড়ব এবং রিফাতকেও ফিরিয়ে আনব। আমরা নেস্টট লিড পেয়ে গেছি,’ বলে সে জয়ার দিকে ফিরল। ‘এই লোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা লিড রয়েছে, সব প্রভাইড করো, টিম সব সোর্স এক্সপ্লোর করো। আমি আজ রাতের ভেতরে এই লোকের সন্ধান চাই।’

‘পাবে না,’ জয়া সরকার মাথা নাড়তে নাড়তে বলে উঠল। ‘এই লোকের কোনোই ট্রেস নেই। এ-স্রেফ একটা ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়।’



অধ্যায় চৌষটি
সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
হায়দ্রাবাদ, ভারতবর্ষ

শেষ বিকেলের আলো গায়ে এসে লাগতেই কর্নেল উঠে বসল তার বিছানায়। মিনিটারিতে থাকতে সে নিয়মিত ভোরে উঠেই ব্যায়াম করত। বিশেষ করে সেনানিবাসের নিয়ম ছিল, ভোরে ঘুম থেকে উঠেই প্যারেড গ্রাউন্ডে চলে যাওয়া, ঘণ্টা দুই ধরে প্যারেড এক্সারসাইজ চলত। এরপরে সে মিনিটারি ছেড়ে ইম্প্যাডে চলে যাওয়ার পরে দীর্ঘদিন সে দূরে ছিল প্রায় সবকিছু থেকেই। তারপর যখন শরীর-মন দুটোই বিষিয়ে উঠতে শুরু করে সে অনুধাবন করে এভাবে চলবে না। ছোটবেলা থেকে সে বিশেষ ধরনের কুস্তি শিখত এবং চেষ্টা করত সেটাতে ভালো করার। সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় শারীরিক কসরত এবং এই কুস্তি নিয়ে পড়ালেখা করবে, জার্নালিং করবে এবং নিজেকে শিখবে। সেই থেকে সে প্রায় কয়েক বছর ধরে একজন শিক্ষক রেখে সেই কুস্তি শিখেছে, ফলে আবারো শারীরিক কসরতের সেই সময়টা ফিরে এসেছিল কয়েক বছর ধরে। এরপরে ভারতে আসার পর থেকে আবারো সব গড়বড় হয়ে যায়।

কর্নেল আজ বেলা করে উঠে আবারো শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। বিস্মৃত কয়েক দিনের পরিশ্রম, লম্বা সময় ধরে টানা ঘোড়ায় চড়া, সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক চাপ খানিক কাহিল করে তুলেছে তাকে। বিছানা থেকে উঠে আশপাশে তাকিয়ে দেখল লম্বা কামরাটায় সারি সারি বিছানা পাতা এবং তার দলের লোকজন সবাই লম্বা হয়ে ঘুমাচ্ছে। পালোয়ানের নাক ডাকা শুনে মনে হচ্ছে, পুরো কামরা যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। কর্নেল মৃদু হেসে উঠে তার বিছানা থেকে নেমে তিন বৈঠক শুরু করল। পালোয়ান তো বটেই তার কুকুরও পড়ে ঘুমাচ্ছে তীব্র পরিশ্রমে।

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

মোটামুটি ঘটাখানেক ডন বৈঠক করে ঘরামুঠ কলেবরে কর্নেল স্থির হয়ে ফল ফেরের ওপরে রাখা মাদুরের ওপরে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে কামরাটার দরজাশে দেখল। লম্বা সরু একটা কামরা। একপাশে ছোট একটা ফোকর রয়েছে যেটাকে ঠিক জানালা বলা সম্ভব নয়, তবে এই কামরাতে সামান্য বাতাস এক আলো আসার জন্যে যথেষ্ট। কামরার আরেক পাশে সামান্য একটু ঘুরল অপরেকটা ছোট খোপের মতো রয়েছে, যেখানে চাইলে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া তো অবশ্যই, এমনকি স্বল্প পরিসরে গোসল পর্যন্ত করা সম্ভব। কর্নেল অনুমান করল। মুলির নিচের এবং ওপরের তলার মাঝে এমনভাবে এই কামরাটা বসানো হয়েছে যাতে, বাইরে থেকে দেখলে বা পরীক্ষা করলে ভেতরে এমন কিছু আছে বোঝাই সম্ভব নয়। কর্নেল এটাও অনুমান করতে পারে, একরকম কামরা মুলির এই সরাইখানায় এই একটাই নয়, আরো রয়েছে। এটাও মুলির অনেক ব্যবসার একটা। কর্নেল চেষ্টা করল তাদের কাজের পরবর্তী ধাপে মনোযোগ দেওয়ার কিন্তু বারবার তার গভীরাতের ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে।

বন্দুকের নল বের হয়ে আসা আর ত্রিলোককে ভেতরে টেনে নেওয়ার ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটল যে ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ত্রিলোকে ভেতরে টেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কণিকের জন্যে জমে রইল সবাই। তারপর কর্নেলই প্রথম নিজের পিঙ্কল বের করে ছুটেতে শুরু করল রাস্তার ওপর পার্শে। সবাই সাবধান, বেশ আওয়াজ করো না, আর বের হয়ে আসা বন্দুকের নলের লাইন থেকে সাবধান থেকো, কর্নেলই আগে দৌড়াতে শুরু করেছে আর তাই সেখানে পৌঁছালোও সে সবার আগেই। কাঠের গেট তবে বেশ মোটা এবং কোথাও কোনো ফাঁকফোকড় কিছুই নেই, কর্নেল পিঙ্কল তাক করে ধরে হাতড়াতে লাগল। ততক্ষণে পালোয়ান থেকে শুরু করে সবাই পৌঁছে গেছে, পালোয়ান এগিয়ে এসে লাঠিটা তুলে নিল মাথার ওপরে, 'দেব নাকি একটা বাড়ি বসায়?' সে যেমন জলদ গম্ভীর গলায় কথা বলেছে, তার কুকুরও ঠিক তেমনি ঘেউ ঘেউ করছে।

সে উত্তেজিত হলেও কর্নেল মাথা ঠাভা রাখল। 'আগে, লাঠি দিয়ে টোকা দাও।'

যদিও কর্নেল টোকা দেওয়ার কথা বলেছে, কিন্তু পালোয়ানের বাড়িতে পুরো কাঠের ফটক কেঁপে উঠল। দুই টোকার সঙ্গে সঙ্গে দুইবার কেঁপে উঠল ওটা। সঙ্গে সঙ্গে ওটার একপাশে আবার ফোকর দেখা দিল এবং সেখান দিয়ে বন্দুকের পরিবর্তে দেখা গেল একজন মানুষের মুখ। কর্নেল পিঙ্কল তুলে ধরতে

সিপাহী

যাবে, তার আগেই যদি দিগে ত্রিলোককে ভেতরে টেনে নেওয়া হয়েছে, সেটা আবারো খুলে গেল। কর্নেল দেখল, এই ছোট অংশটা এমনভাবে মোটা কাঠের পাল্লার সঙ্গে মেশাতে চাইলেও ধরা সম্ভব নয়। কর্নেল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ফোকর দিয়ে মুখ বের করা লোকটা ওদের ভেতরের ঢোকান অন্য ইশারা করল।

কর্নেল নিজের সঙ্গীদের দিকে দেখল। ‘জলদি জলদি,’ লোকটা তাদা দিল।

‘সবাই সাবধানে,’ বলে কর্নেল মাথা নিচু করে ফটকের ছোট অংশটা দিয়ে ভেতরে ঢুকল, হাতে প্রতুত পিঙ্কল। কিন্তু ভেতরে ঢুকে যা দেখল তাতে হাতে পিঙ্কল নামিয়ে নিল সে। একে একে তার সঙ্গীরা সবাই ভেতরে ঢুকল এবং ভেতরের চিত্র দেখে সোলেমান বলে উঠল, ‘সকোনাশ, যুদ্ধ লাগছেনি?’

ভেতরে অন্তত দশ থেকে পনেরোজন অস্ত্রধারী বন্দুক-রামদা-কোঁচ-বর্শা আর খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের সামনে মাথার দুই পাশে দুই হাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ত্রিলোক। ‘কারা তোমরা? এত রাইতে সরাইখানায় কি চাও?’ সবার সামনে থাকা ঘন গোঁফ-দাড়িওয়ালা লোকটা বলে উঠল, তার পরনে লুঙ্গি আর খাদির চাদর, হাতে বিরাট একটা কোঁচ। আকার-আকৃতিতে সে পালোয়ানের সঙ্গে পাল্লা টানার মতো। লোকটা কথা বলছে কিন্তু সে তাকিয়ে রয়েছে পালোয়ানের দিকে, পালোয়ানও নিজের মোটা গোঁফে তা দিতে দিতে দেখছে তাকে। দুই ভীম আকৃতির মানুষ, পরস্পরের ওজন নেওয়ার চেষ্টা করছে চোখ দিয়ে। অন্যদেরকে কেউ পাত্তাও দিচ্ছে না।

‘আমরা মুল্লির সঙ্গে দেখা করতে আসছি,’ ত্রিলোক বলে উঠল।

‘মুল্লির তো এই সময়ে কারো সঙ্গে দেখা করার কথা না,’ লোকটা ত্রিলোকের দিকে তাকায়ওনি, সে এখনো দাঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে মাপছে পালোয়ানকে। ‘যদি থাকত, আমি দায়ুব জানব না সেইটা তো হইতে পারে না।’

‘তাকে খবর দাও, গিয়ে বলো আফগান সেনার কান্দাহারের ত্রিলোক আসছে,’ মুল্লির সঙ্গে ত্রিলোকের পরিচয় হয়েছিল আফগান যুদ্ধের সময়ে কান্দাহারে।

‘তুমি কান্দাহারে ছিলা?’ হঠাৎই গলা বদলে গেল বিশালদেহী দায়ুবের।

‘হমম, ছিলাম,’ ত্রিলোক বলে উঠল। ‘আর উনি কর্নেল স্যান্ডার্স, কান্দারের এক ব্যারাকের প্রধান ছিল।’

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

ত্রিলোকের কথা শুনে লোকটার চেহারা হঠাৎই একেবারে বদলে গেল, হাতের কোঁচাকে নামিয়ে সে কর্নেলের সামনে গিয়ে একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে বলে উঠল। 'হুজুর, আমি আপনারে চিনতে পারি নাই, আমি কান্দাহারে আপনার ব্যারাকেই কুলির কাম করতাম,' বলে সে আবার ত্রিলোকের দিকে ফিরে বলল। 'আপনেরা এই বাজে সময় শহরে, তাও কর্নেল সাব, উনি,' বলে সে পিটারকে দেখাল। খুবই বিপজ্জনক।'

'দায়ুব, কি হইতাছে?' সরাইখানার দোতলা থেকে ডায়ংকর ভারী গলার অত্যধিক চিকন একজন মানুষ কথা বলে উঠল। 'এত হটগোল কেন রাইতের কোলা,' বলেই সে ওপর থেকে উঁকি দিয়ে ত্রিলোককে দেখে গালি বকে উঠল।

'মুন্সি, আমি ত্রিলোক,' বলে ত্রিলোক হাত নাড়ল, ডয়াবহ চিকন দাঁড়িওয়ালা মানুষটার উদ্দেশে হাত নাড়ল।

'সর্বনাশ, তুমি এইখানে!' দাঁড়াও আমি আসতাছি,' বলে সে গায়েব হয়ে গিয়েও আবার ফিরে এলো। 'এক কাম করো, আমি না নামি তুমরা ওপরে আসো,' বলে সে দায়ুবকে বলে দিল কী করতে হবে—দায়ুব ওদের নিয়ে ওপরে রওনা দিল আর অন্যরা বাতি নিভিয়ে সরাইখানা স্বাভাবিক করে অন্ধকারে মিশে গিয়ে পাহারা দিতে লাগল। ওরা ওপরে গিয়ে মুন্সিকে বলে ওরা হায়দ্রাবাদে এসেছে একটা বিশেষ কাজে, সেই কাজ তো বটেই থাকা-খাওয়ার জন্যেও মুন্সির সহায়তা লাগবে। মুন্সিকে সব জানাবে, কিন্তু আপাতত ওদের পরিচ্ছন্ন হওয়া, খাওয়া এবং বিশ্রাম প্রয়োজন। মুন্সি ওদের জানায় পুরো শহরে সাদা চামড়ার লোকের খোঁজে চিরুনি অভিযান চলছে এমনকি তার সরাইখানাও নিরাপদ নয়। কাজেই সে ওদের নিয়মিত কামরায় রাখতে পারবে না। ওদের নিয়ে সে চলে আসে তার বিশেষ কামরায়, ওরা পরিচ্ছন্ন হয়ে খেয়েই শুয়ে পড়ে। ত্রিলোক মুন্সির সঙ্গে কথা বলে সবার পরে আসে শোয়ার জন্যে। এত ক্লান্ত ছিল ওরা, এমনকি ঠিকমতো খেতেও পারেনি, ঘুমিয়ে পড়েছে।

শরীর একটু ঠান্ডা হয়ে আসতেই কর্নেল পরিচ্ছন্ন হয়ে পুরোদোক্তর পোশাক পরে নিয়ে দেখল পালোয়ান উঠে বসে নিজের কুকুরটাকে আদর করছে। কর্নেলকে দেখে সে মৃদু হেসে বলে উঠল, 'ঘুম হইছে কর্নেল?'

কর্নেল কিছু না বলে মাথা নেড়ে সায় জানাল, তারপর জানতে চাইল, 'ও ঘুমিয়েছে?'

পালোয়ান মৃদু হেসে সায় জানিয়ে পায়ের কোনা দিয়ে অন্যদের খাট নাড়তে লাগল। 'এই ওঠো ওঠো ঘুমকাতুরের দল,' ডাকাডাকিতে সবাই উঠে

সিপাহী

বসতে বসতে কর্নেল নির্দেশ দিল সবাইকে প্রস্তুত হয়ে নিতে, ওদের প্রস্তুত হয়ে
স্বয়ে কাজে নামতে হবে।

‘ত্রিলোক, ওরা কি আমাদের ঘোড়াগুলো—’

‘জি, কর্নেল আমি মুন্সির সঙ্গে রাতে কথা বলেছি। ওকে আপনার হয়ে
বেশি করে স্বয়মুদ্রা দেওয়া এবং,’ বলতে বলতে সে কর্নেলের চোখের দিকে
তাকিয়ে বলে উঠল, ‘আর্থারের খোজও লাগাতে বলেছি, যদি পারে।’

‘এত আগেই বললে?’ কর্নেল কোমরে নিজের অস্ত্র আঁটতে আঁটতে বলতে
লাগল। ‘সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা নেই তো?’

‘হজুর, কাউকে না কাউকে তো বিশ্বাস করতেই হবে আর আমি মুন্সিকে
বিশ্বাস করি। বাকিটা দেখা যাক,’ দরজা খোলার শব্দ শুনে দুজনেই ফিরে
তাকাল সেদিকে। মুন্সি নিজে এসেছে ওদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। মুন্সি
একই ঢুকল দেখে কর্নেল তার একটা হাত রেখেছিল পিষ্টলের ওপরে,
আলগোছে সেটা সরিয়ে নিল সে। ‘মুন্সি, আসুন,’ বলে উঠল সে দরজা গলায়।
‘আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের স্থান দেওয়ার জন্যে। আপনার কাছে আমাদের
আরো সাহায্য নিতে হবে।’

‘হজুর, কী যে বলেন,’ মুন্সি, বসে পড়ল ত্রিলোকের পাশে। ‘আপনাদের
সঙ্গে, বিশেষ করে ত্রিলোক বাবুর সঙ্গে আমার হিসাব আলাদা। কিন্তু আপনারা
আসছেন এমন এক সময়ে খাতেরদারি তো দূরে—’

‘না-না,’ কর্নেল হাত নেড়ে মানা করল। মুসলিম পরিবারের আপ্যায়নের
বিষয়ে কর্নেলের খুব ভালো ধারণা রয়েছে। এরকম অবস্থায় সে কোনো
আয়োজন করতে দেবে না ঝামেলার জন্যে এবং এতে করে খবর ছড়িয়ে পড়ার
সম্ভাবনা রয়েছে। ‘আমরা এখানে কাজে এসেছি, কাজেই সে বিষয়ে মনোযোগ
দেওয়াই ভালো হবে,’ কথাটা মুন্সিকে উদ্দেশ্য করে বলে সে নিজের লোকদের
উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল দ্রুত তৈরি হয়ে নেওয়ার জন্যে।

‘জি, হজুর,’ বলে মাথা নেড়ে সায় জানাল মুন্সি। ‘আপনার যেমন আজ্ঞা
হয়। এখন বলেন আপনাদের কি খেদমত করতে পারি?’ বলে সে তৈরি হতে
থাকা ত্রিলোকের দিকে দেখাল। ‘ত্রিলোক বাবু কিছুটা বলছেন, সেই অনুযায়ী
আমি লোকও লাগাই দিয়েছি, খবর চলেই আসতে পারে। কিন্তু আপনাদের
পুরোপুরি সাহায্য করতে হলে আমাকে আরো বিস্তারিত জানতে হবে।’

মুন্সিকে দেখে কর্নেলের কেন জানি মনে হতে লাগল লোকটা ভীষণ ভয়ে
আছে। অবশ্য সময়টাই ভয়ের।

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

‘আমাকে আগে শহরের খবর বলেন?’ কর্নেল প্রসঙ্গ খানিক পরিবর্তন করে বলে উঠল। মুন্সিকে সব জানতে হলে তাকে আগে মুন্সির মোটিভ আরো ভালোভাবে বুঝতে হবে। সেই সঙ্গে এটাও উপলব্ধি করতে হবে, মুন্সি আসলে কতটা নির্ভরযোগ্য? বিশ্বাস এবং যোগ্যতা দুইদিক থেকেই।

‘হজুর, শহরের খবর তো আপনারা জানাইবেন,’ মুন্সি হেসে উঠল। ‘আপনারা না দিল্লি থেকে আইসছেন।’

কর্নেল হেসে উঠল মুন্সির কথায়, লোকটা বুদ্ধিমান এবং ঝাঁটি ব্যবসায়ী। সে দেবে ঠিকই কিন্তু তার আগে অবশ্যই আদায়ও করে নেবে। ‘অবশ্যই,’ বলে কর্নেল বলে গেল দিল্লিতে কী হয়েছে এবং স্বল্প পরিসরে জানাল, সেখানে এখন কী হতে যাচ্ছে। কর্নেলের কথা শুনে আনমনে মাথা নাড়ল মুন্সি। ‘এমনটা তো হওয়ারই কথা ছিল, দিল্লির যে অবস্থা শুনেছিলাম,’ বলে সে আবারো মাথা নাড়ল। ‘এক বালতি দুধে এক ফোঁটা চোনা পড়লে যেমন সব শেষ, মহৎ উদ্দেশ্যও কলুষতায় পরিণত হয় কলুষিত মানুষের মিশ্রণে।’

‘শক্ত নেতৃত্বও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়,’ কর্নেল আনমনে বলে উঠল। তার জন্যে এ-ধরনের আলোচনায় অংশগ্রহণ খুবই কঠিন বিষয়, কারণ সে নিজে সাদা চামড়ার মানুষ, কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময় সে কাটিয়েছে এই দেশে, নিজেকে একভাবে বলতে গেলে সে ভারতীয় মনে করে, অন্তত চামড়ায় না হলেও বিবেকে তাই মনে করে সে। আবার সে জানে কী ঘটছে এবং কেন ঘটছে। আফগান যুদ্ধের পর তার পরিবারের সঙ্গে যা ঘটেছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে সে জানত এমন কিছু স্রেফ সময়ের বিষয়।

‘অবশ্যই হজুর,’ কর্নেলের দ্বিধা মুন্সি ঠিক খেয়াল করেনি। ‘হজুর সাম্প্রতিক সময়ে পাটনায় নাকি ভয়াবহ এক ঘটনা ঘটেছে, একদল সাহেব আর ম্যাম নদী পার হচ্ছিল, বিদ্রোহীদের হাতে পড়ে যায়, তারা সবাইকে নিরাপদে পার করে দেওয়ার কথা বলে সবাইকে তুলে নদীতে নৌকা ভাসানোর নাম করে আগুন দিয়ে দেয়। নারীশিশুসহ প্রায় দেড় শ নিরীহ মানুষ পুড়ে মরে,’ মুন্সির কথা শুনে কর্নেল মাথা নেড়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মুন্সি আবারো বলে উঠল। ‘ওদিকে দিল্লিতে কয়েক শ বিদ্রোহীকে বাছবিচার ছাড়াই স্রেফ কচুকাটা করেছে ইংরেজ,’ বলে সে নিজেকে শুধরে নিল। ‘মানে সাহেবরা, হজুর আপনার জন্যে খবর আছে, আপনি যা ধারণা করেছিলেন হবে বা হতে যাচ্ছে, সেটা ঘটে গেছে, আপনারা যখন ঘুমে ছিলেন, সেসময় খবর এসেছে দিল্লি থেকে।’

‘কি হইছে, ওরা খুন করছে সম্রাট জাফরকে?’ সোলেমান তৈরি হতে হতে প্রশ্ন করে উঠল।

সিপাহী

‘না, হজুর, সম্রাটেরে বন্দি করে রাখা হইছে কারাগারে, সব শাহজাদাদের
উনুস্ত রাজপথে জবাই করা হয়েছে,’ বলে আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল সে।
‘হজুর যত যাই বলি, মোগলদের এইরকম বিনাশ আমরা আশা করি নাই।
এইটা দেখবেন পরিস্থিতি আরো খারাপ করব।’

কর্নেলও আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল। এই ঘটছে পুরো দেশে,
দীর্ঘদিনের অবিচার আর অবহেলায় যে আগুন লেগেছিল সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে
পড়ছে সবাই। সাদারা যেখানে যেভাবে পারছে, চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মারছে
ভারতীয়দের, ভারতীয়রা যেখানে যেভাবে পারছে হত্যা করছে সাদাদের, নারী
শিশুদেরও রেহাই দিচ্ছে না। ‘এই শহরের খবর কী বলেন?’ কর্নেল কাজের
আলোচনায় ফেরার চেষ্টা করছে। ‘পরিস্থিতি কি?’

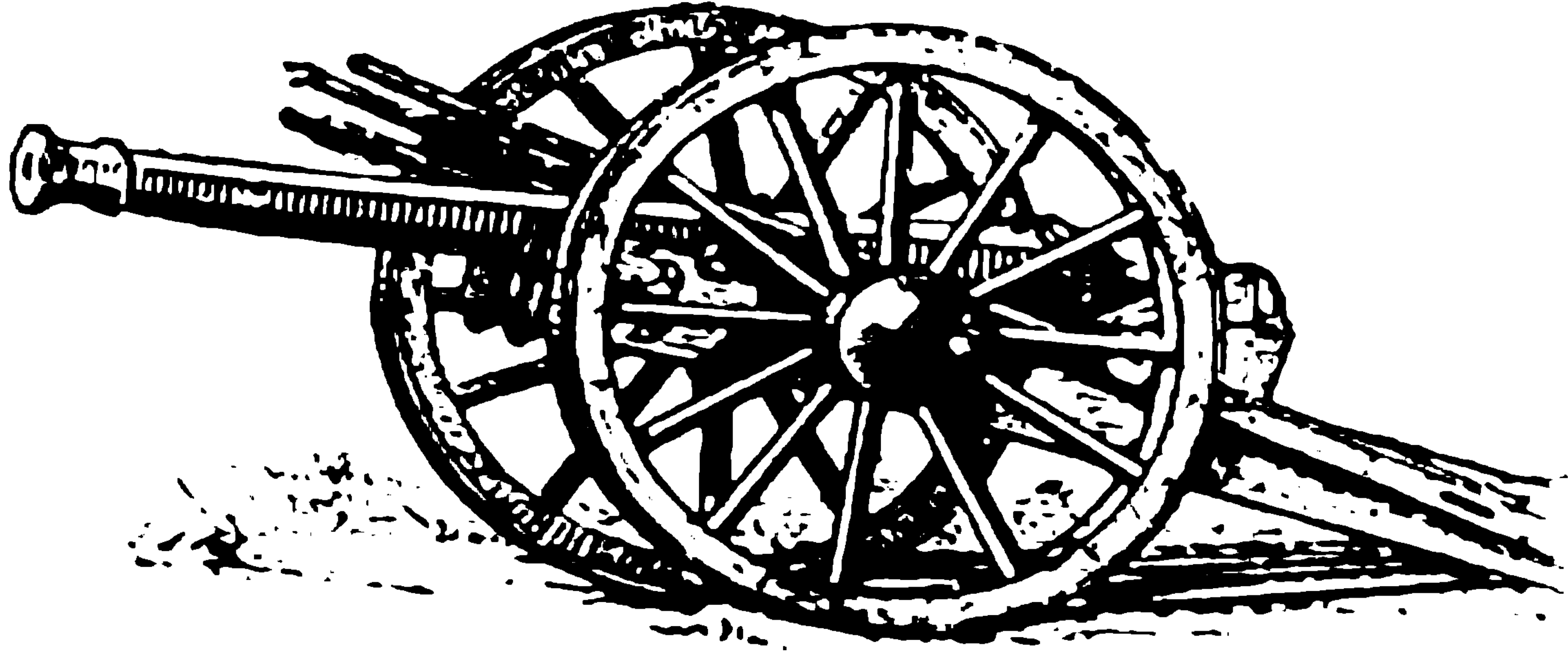
‘গরম হজুর খুব গরম, জানেন হয়তো এই বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সময়ে
নিজামের সঙ্গে অবিচারও একটা কারণ ছিল। আর এইটা তো তারই এলাকা। আর
ব্যারাকপুর খেইকা বিদ্রোহ আগে উত্তরে ছড়াইলেও এখন দক্ষিণে জড়ো হইতাছে
সবাই। আর হায়দ্রাবাদ হইছে এখন সব জমায়েতের কেন্দ্র। আর যে-কামে
আসছেন খুব সাবধানে, বিপদ হইব শহরে নিজামের সৈনিকেরা প্রতিনিয়ত টহল
দিতাছে ইংরেজগো খোঁজে। প্রতিদিন একটার পর একটা সৈন্যবাহিনী আসতাছে।
জমায়েত চলতাছে বিদ্রোহের আগুন ছড়ায় দেওয়ার লাইগা।’

‘বুঝতে পেরেছি,’ কর্নেল বলে উঠল। ‘এখন বলেন, আমরা যার খোঁজে
এসেছি তারে বের করব কীভাবে?’

‘হজুর, আমার লোক আছে, আমি কাজে লাগায়াও দিছি, খবরও চইনা
আসব,’ বলে সে সবাইকে দেখল। সবাই কমবেশি প্রস্তুত, ‘এক কাজ করি
হজুর, আমার সঙ্গে চলেন, খাওয়া লাগানো আছে ওপরে, নিরাপত্তার কারণে
আপনোগো যেমন এইখানে রাখছি, তেমনি খানাও লাগাইতে কলছি আমার
নিজের খাস কামরায়, তাও খুব অল্প কিছু চাকর জানে আপনারা আছেন। যত
বেশি লোকে জানবে তত বেশি বিপদের সম্ভাবনা। আগে—’ মুল্লির কথা
মাঝখানে হঠাৎ পালোয়ানের কুকুরটা গরগর করতে শুরু করল।

‘ব্যাপার কি, কুস্তাডা—’ সে কথা শেষ করার আগেই দরজার কাছে পায়ের
আওয়াজ শোনা গেল। কর্নেলের হাত আলগোছে চলে গেল তার কোমরে,
অন্যরাও সতর্ক হয়ে উঠেছে। পায়ের আওয়াজ দরজার কাছে এসে থেমে গেল।

ব্যাপার, কি, কে এসেছে দরজা খুলছে না বা টোকা দিচ্ছে না কেন।
কর্নেল আনমনেই নিজের পিঙ্গলের খাপের বোতাম খুলে ফেলল।



অধ্যায় পঁয়ষটি
বর্তমান সময়
পিবিআইএস ল্যাব
নতুন বাজার, ময়মনসিংহ

‘হোয়াট ডু ইউ মিন, কোন ট্রেস নেই এই লোকের?’ বাশার রাগের সঙ্গে বলে উঠল। সে টিমের থেকে জয়া সরকারের দিকে ফিরে তাকাতেই জয়া এমনভাবে কাঁধ ঝাঁকাল যেন বলতে চাচ্ছে, আমি তো আগেই বলেছিলাম, একে খুঁজে পাওয়া এত সহজ হবে না, এখানে জটিলতা রয়েছে।

‘একজন মানুষের আবার ট্রেস থাকে না কীভাবে?’ একজন মানুষ নিশ্চয়ই হওয়া থেকে আসে যায় না, হওয়ার ওপরে বাস করে না। আর এরকম একজন মানুষ পয়সাওয়ালা, প্রভাবশালী তার অবশ্যই নিজের লোক, বাড়ি-গাড়ি রয়েছে, ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট রয়েছে, পাসপোর্ট, এনআইডি রয়েছে। সব সোর্স এক্সপ্লোর করো, যে যেভাবে পারো।’

‘তুমি যে সোর্সগুলোর কথা বললে অল সোর্স ট্রাইড, এই নামের মানুষ আমরা পাইনি যে এমন নয়, কিন্তু যাকে আমরা খুঁজছি তাকে পাইনি, জয়া আপা ভেরিফাই করেছে,’ টিম বলে উঠল।

বড় করে দম নিল বাশার, মাথা গরম করা যাবে না কোনো অবস্থাতেই। ‘আচ্ছা, এক মিনিট আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যাব,’ বলে সে সবার দিকে এক নজর দেখে নিল। রমিজ দারোগা হাই ছাড়ছে, এই বয়স্ক মানুষটাকে এভাবে বসিয়ে না রেখে বাড়ি পাঠানো দরকার, আবদুল্লাহরও চোখ লাল, নিশ্চয়ই বাড়িতে তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রী এবং পরিবারে লোকেরা চিন্তিত। ‘প্রথমে, আমি বলে দিচ্ছি, আবদুল্লাহ আর রমিজ ভাই আপনারা চলে যান,’ দুজনেই ভীষণভাবে মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল।

সিপাহী

‘স্যার, বুড়া মানুষ, সারা দিন-রাইত ঘুমাই, এমন একটা কাম করতে দেন।’

‘স্যার, আমিও থাকতে চাই, ডাবল শিফট, টাকা বেশি,’ বলে আবদুল্লাহ মৃদু হাসল। ‘ঘরে বউ এসেছে, এখন বেশি টাকা দরকার।’

হেসে উঠল বাশার। ‘ঠিক আছে, পরে অসুস্থ হলে-টলে আমাকে দোষ দিও না কেউ। আমরা অ্যানালিসিস স্টেপ অনুসরণ করব এখন,’ বলে ও দাঁড়ানো থেকে বসে পড়ল। সামনে একটা চেয়ার টেনে জুতো খুলে ওটার ওপরে পা তুলে গ্রাসে কোক ঢেলে নিল। ‘আমরা কেস শুরু করব, প্রথম প্রশ্ন, জয়া সরকারের কাছে। এই লোক কী জানি নাম?’ বাশার কোকের গ্রাসে প্রথম চুমুক দিল।

‘শেখ আলী আজগর জোয়ারদার।’

‘আমার প্রথম প্রশ্ন, তুমি কি নিশ্চিত ছবিতে এই লোকই রয়েছে?’ বাশার প্রশ্নটা করল জয়াকে, কিন্তু উত্তর দিল টমি।

‘সবাই জ্বিনের দিকে তাকাও, এবার চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পাবে।’

সবাই জ্বিনের দিকে তাকাতেই দেখল টমি ছবির মানুষটাকে ক্রপ করে এডিটের মাধ্যমে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলেছে। টকটকে ফরসা, লালচে দাঁড়িওয়ালা চেহারার একজন মানুষ, পরনে কালো শার্ট, কালো টাই এবং কালো স্যুট। পয়সাওয়ালা মানুষজনের চেহারা কালো বা ফরসা বিষয় না। তাদের চেহারায় চকচকে একটা ভাব থাকে। এই লোকদের দেখলেই বোঝা যায় এর অনেক পয়সা।

‘এই লোক, শেখ আলী আজগর, তুমি নিশ্চিত?’

জয়া সরকার হেসে উঠল, ‘আমি নিজে কী এবং কেন, সেটার চেয়েও বেশি নিশ্চিত,’ জয় সরকারের উদাহরণ শুনে বাশারই হেসে উঠল। ‘গ্রেট, এবার আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই লোক কেন আমাদের এই কেসের জন্যে সিগনিফিকেন্ট? শুধু প্রফেসররা এবং ডেভিডের সঙ্গে তার ছবি রয়েছে এজন্য?’

‘এটা তো বটেই। দুটো কারণে এই লোক আমাদের এই কেসের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এই লোক ছোটবেলা থেকে আমাকে চিনত এবং এই লোকই অ্যান্টিক রিলেটেড অনেক কিছুর সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে এবং একাধিকবার সে আমাকে স্পনসর করেছে এবং সে এই উপমহাদেশের অ্যান্টিকের জগতের সঙ্গে কানেক্টেড এবং এই লোক ডেভিড বা প্রফেসরদের সঙ্গেও কানেক্টেড কিন্তু তার সঙ্গে এত বছরের পরিচয়ে আমি এটা জানতাম না। এর মানে এই লোকের পরিচয় থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সব বিষয়ে ঘাপলা রয়েছে এবং বড় লেভেলে সুযোগও রয়েছে।’

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

‘মানে এই,’ বলে বাশার ছবিটা দেখাল। ‘আমাদের কেসের জন্যে ক্রুশিয়াল একটা পয়েন্ট, যেটা আমাদের এক্সপ্রোর করা উচিত। নেক্সট প্রশ্ন,’ বলে বাশার এবার কোকের গ্রাসে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। ‘এই লোকের কোনো ট্রেস নেই বলছে তোমরা। তুমি এত বছর এর সঙ্গে কাজ করেছো, কোথায় এক কীভাবে? তার বাসা অফিস, কিছুই তুমি চেন না?’

‘না,’ জয়া সরকার কনফিডেন্সের সঙ্গে মাথা নেড়ে মানা করল। ‘এই লোক কখনোই তার অফিস বা বাসায় নিত না আমাকে, সঠিক কোনো ঠিকানা দিত না, বেশির ভাগ কাজ ফোনেই হতো কিংবা দেখা করার প্রয়োজন হলে সে আমাকে হোটেলের লবিতে, বা রেস্টুরেন্টে দেখা করতে বলত। কাজেই ওদিকে কোনো কু নেই।’

‘আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি,’ বাশার বলে উঠল। ‘অনেক ব্যবসাই এভাবে চলে, কাজেই এটা অসম্ভব কিছু নয়, আর এরকম ব্যবসার ক্ষেত্রে তো আরো নয়, সেক্ষেত্রে তোমার পুরনো কন্টাক্ট কাউকে এক্সপ্রোর করা যায় কি না? পুরনো কন্টাক্ট এক্সপ্রোর করার মাধ্যমে ওদের দিয়ে টোপ দিতে পারো, বা কাউকে লোভ দেখিয়ে এই লোকের ব্যাপারে কোন খবর বের করা যায় কি না দেখতে পারো।’

জয়া সরকার ভাবছে, ‘এটা ভালো বলেছো, এটা একটা মাধ্যম হতে পারে। আমি একটু খোঁজখবর করে দেখতে পারি পুরনো কারা ময়দানে আছে। এদের ভেতরে কাউকে পেলে যে শেখকে চেনে—এমন কারো মাধ্যমে ট্রাই করে দেখা যেতে পারে।’

‘ভেরি গুড—’

‘বস,’ টমি বলে উঠল। ‘আমি আরো একটা দিক এক্সপ্রোর করতে চাই। এটা যদিও স্ট্রিক্টলি লিগ্যাল নয়, কিন্তু এসব ব্যবসার একটা বড় অংশ চলে ডার্ক,’ সে ডার্ক ওয়েব মিন করল, কিন্তু সরাসরি বলল না। ‘আমি ওই পথে এই লোককে ধরার জন্যে একটা টোপ ফেলে দেখতে পারি।’

‘দারুণ,’ বাশার খুশি হয়ে উঠল। ‘এবার কেসের সেকেন্ড স্টেপ, ডেভিড। আমার বিলিভ রিফাতকে যারাই অপহরণ করে থাকুক না কেন, তাদের একটা মোটিভ তো বুঝতে পেরেছি, তারা আমাদের দিয়ে এমন কিছু কাজ করিয়ে নিতে চায় যেটা তাদের দ্বারা পসিবল হচ্ছে না। এমনকি তারা এত পাওয়ারফুল হওয়ার পরও, কাজ হতে পারে সিগনেট রিং রিলেটেড কিছু বা হয়তো ভিন্ন কিছু। আর এর সঙ্গে ডেভিডের সংযোগ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই ডেভিডের ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা মোটামুটি জানি এবং এটাও জানি সে ময়মনসিংহে এসেছিল। এমন হওয়ার একটা জোরদার সম্ভাবনা রয়েছে যে সে ময়মনসিংহে আসার আগে

সিপাহী

থেকেই এসবের সঙ্গে বা কোনো একটা নির্দিষ্ট কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, আসলে সে ময়মনসিংহে আলাদাভাবে টুইন কালীর সন্ধানে আসেনি। সে এসেছিল তার সামগ্রিক মিশনের পার্ট হিসেবে, এসে এখানেই তার শেষ সমাপ্তি ঘটে। কাজেই আমাদের বের করতে হবে সে রিফাত বা জয়ার সঙ্গে টুইন কালীর চুরি এবং এই রিলেটেড বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর কী কী করছিল এবং আর কিসের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।’

‘জোরদার সম্ভাবনা সে আসলে বড় কোনো মিশন নিয়ে এসেছিল এবং এখানকার কাজ ছিল তার সেই মিশনের অংশ,’ রুশো বলে উঠল। ‘আমি আমার অনুমান বলি,’ রুশো খানিক দ্বিধার সঙ্গে বলে উঠল। ‘আমার ধারণা সে বাংলাদেশে এসেছিল সিগনেট রিংগুলো খুঁজে বের করতে বা এর সঙ্গে সংযুক্ত এমন এক বা একাধিক বিষয় খুঁজে বের করতে, যার মাধ্যমে সিগনেট রিংগুলো আবিষ্কার করা যাবে বা খুঁজে বের করা যাবে। কাজেই—’

‘তুমি একজন আর্কিওলজিস্ট হয়ে এ-কথা বলছো,’ জয়া সরকারের গলায় খানিক টিটকিরি এবং বিরক্তি। ‘এত সিগনিফিকেন্ট একটা বিষয় দুনিয়ার বাকি সব জায়গা থাকতে এখানে, বাংলাদেশে আসবে কেন?’

রুশো হেসে উঠল। ‘আর্কিওলজিস্ট দেখেই এই কথা বলছি ম্যাডাম, একটা কথা বলি, বাংলাদেশ তো এখন হয়েছে, কিন্তু আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন সাবকন্টিনেন্টের এই অংশে অনেক সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। তারচেয়েও বড় কথা বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে এমন একটা অবস্থানে রয়েছে যেটাকে এই সাবকন্টিনেন্টের করিডর বলা হয়। এখানে যে অনেক কিছুই থাকতে পারে না বা পারবে না, এমন নয়,’ বলে সে নিজের মোটা চশমার কাচ খুলে মুছতে মুছতে বলে উঠল। ‘একটা উদাহরণ দিই। ময়মনসিংহের যে-কেসটার কথা আপনারা জানেন, মানে যেখানে মাটির নিচে পাতালে কালীমন্দির পাওয়া গেছে, সেখানে এই কালীমন্দিরে দুটো মা-কালীর মূর্তির পূজো করা হতো, যেটাকে যারা পূজো করত এরা ছিল ঠগি,’ বলে রুশো খানিক থামল। চশমাটা মুছে চোখে দিয়ে সে সবার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল আবারো। ‘এই ঠগিদের অরিজিন নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে একটা হলো প্রাচীন পার্সিয়ার রাজা জেরক্সিসিসের বিশাল সেনাবাহিনী ছিল। সেই সেনাবাহিনীর একটা অংশ সে নিয়ে গিয়েছিল এশিয়ার কিছু অংশ বা এশিয়া মাইন থেকে। এদের ভেতরে ভয়ংকর ডেডলি একটা অংশ ছিল যারা কোনো ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করত না। এরা ফাঁস দিয়ে বা আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে চামড়ার ফাঁস দিয়ে মানুষ হত্যা করত, শত্রুশিবিরে শত্রুদের সঙ্গে মিশে গিয়ে। কি কিছু মিল চোখে পড়ে?’

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

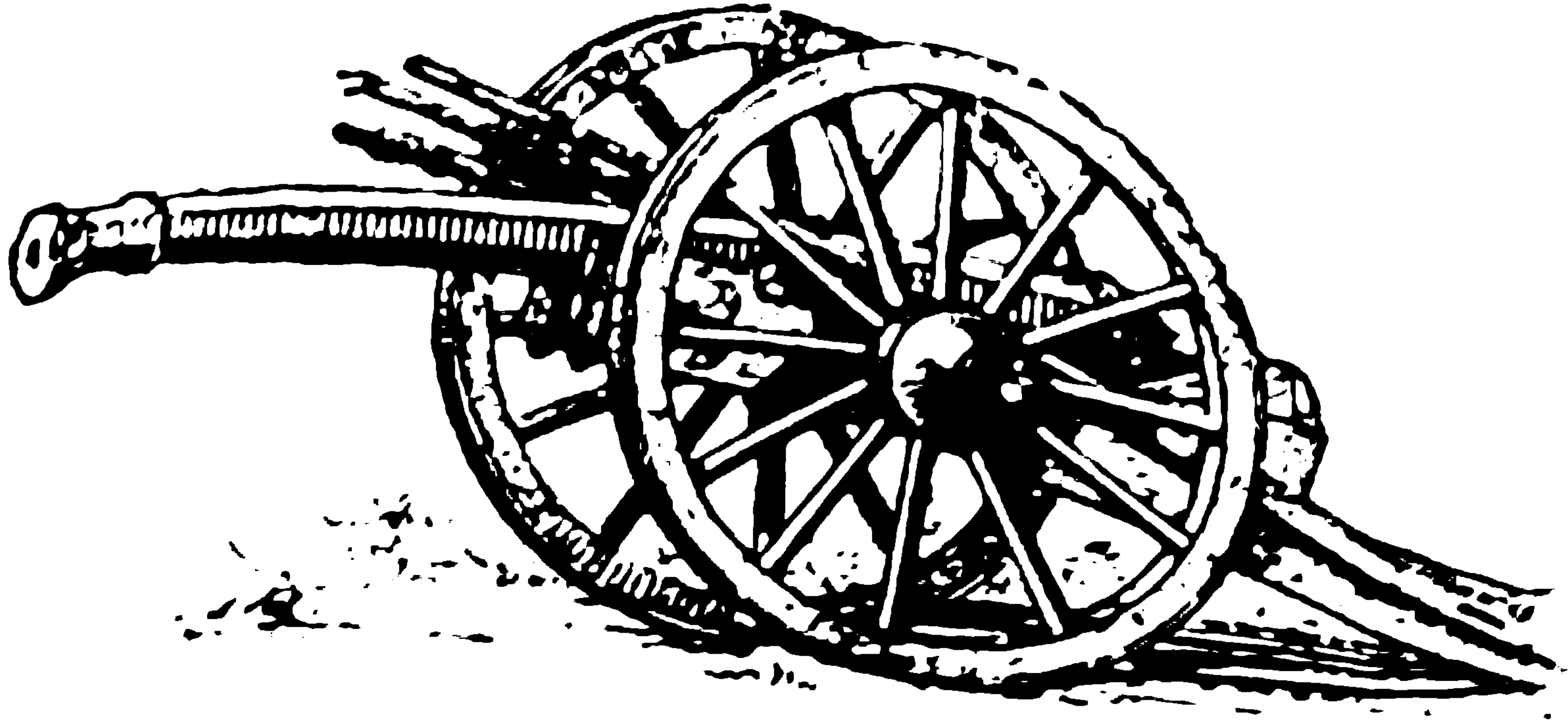
‘অবশ্যই, ঠগিরা সাধারণ মানুষদের সঙ্গে মিলে গিয়ে তাদের হত্যা করত ফাঁস দিয়ে,’ জয়া সরকার বলে উঠল।

‘এখন খেয়াল করুন, ঠগি এবং মা-ভবানীর সঙ্গে জড়িত এদের ইতিহাস মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে জড়িত। সিগনেট রিং বা এর সঙ্গে জড়িত যে-রহস্যই থাকুক না কেন, এর অরিজিন স্টোরি একটা বড় অংশ মধ্যপ্রাচ্য এবং প্রাচীন পার্সিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, একই গল্প অন্য আরো অনেক ক্ষেত্রেই হতে পারে। যেমন আরো একটা উদাহরণ দিই, বাশার স্যার এই কিছুদিন আগে সদ্য যে-কেসটা সমাপ্ত করেছেন, উনারা যে-বিপুল পরিমাণ সম্পদ উদ্ধার করেছেন এবং কান্টের একাধিক মেম্বার ধরা পড়ছে তারাও পার্সিয়ার সঙ্গে জড়িত। সিগনেট রিংয়ের গল্পগুলো একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না এবং এমন হতে পারে, ডেভিডকে আসলে পাঠানো হয়েছিল বাংলাদেশে সিগনেট রিংগুলো হাসিল করতে এবং হয়তো সে এর একটা অংশ উদ্ধারও করেছিল এবং সে যা উদ্ধার করেছে, সেগুলো এখনো সেখানেই রয়েছে। আর রিফাত আপার অপহরণকারীরা সেগুলোই খুঁজে বের করতে বলছে,’ বলে সে নিজের দুই হাত মাথার দুই পাশে তুলল আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। ‘আমি স্রেফ সম্ভাবনার কথা বলছি।’

‘যুক্তিযুক্ত সম্ভাবনা,’ বাশার বলে উঠল। ‘আচ্ছা তাহলে আমরা কেসের নেক্সট স্টেপ হিসেবে তিনটা পথ বেছে নিচ্ছি। এক, শেখ আলী আজগর জোয়ারদার সাহেবের সন্ধান করা—জয়া তুমি পুরনো সোর্স এক্সপ্লোর করবে, টমি তুই ডার্ক, আর ডেভিডের আগের জীবন আমরা কীভাবে এক্সপ্লোর করব।’

‘একটা ওয়ে হতে পারে,’ অনেকক্ষণ পর সামিরা বলে উঠল, ‘ডেভিড গায়েব হয়ে যাওয়ার পর ঢাকায় বা এখানে থাকা তার সমস্ত জিনিসপত্র কী করা হয়েছিল?’

বাশার কাঁধ ঝাঁকাল। ‘আমি সঠিক জানি না। তবে নিশ্চয়ই পুলিশ হেফাজতেই থাকার কথা। যদি থেকে থাকে, তবে অবশ্যই সেটা এক্সপ্লোর করা যাবে,’ বলে সে সামিরার দিকে তাকিয়ে প্রশংসার দৃষ্টিতে বলে উঠল, ‘ভেরি গুড। এটা একটা বেশ ভালো রান্না হতে পারে। ঠিক আছে,’ বলে সে দেওয়ালের ঘড়ি দেখল। তাহলে সিদ্ধান্ত হলো, আমি এখন ডেভিডের খোঁজ লাগাব, জয়া তুমি আবদুল্লাহ এবং রমিজ ডাইকে নিয়ে পুরনো সঙ্গীদের খোঁজ করো, টমি তুই ডার্ক ওয়েকে খোঁজ লাগা,’ বলে বাশার মাথা নাড়ল। ‘তিনটা পথে খোঁজ লাগালে একটা না একটা উপায় বের হয়ে যাবেই।’



অধ্যায় ছেষটি
সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
হায়দ্রাবাদ, ভারতবর্ষ

‘নেই মানে?’ কর্নেল খুব অবাক হয়ে মুগ্ধি এবং তার খবরির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। ‘একজন জ্যান্ত মানুষ আবার নেই হয়ে যায় কীভাবে?’

মুগ্ধি সামান্য হেসে উঠল। ‘হজুর সময়টাই তো এমন, সাদা বলেন বাদামি বলেন আর কালো বলেন, প্রতিদিনই মানুষ সইরা পড়তাছে, নতুন মানুষ যোগ হচ্ছে, আবার কে কোথায় যাইতাছে, কে কই হারায় যাইতাছে কলা মুশকিল।’

‘মুগ্ধি তোমার কাছে তো সাহিত্য গুনতে চাই নাই,’ ত্রিলোক খানিক গরম হয়েই বলে উঠল। ‘খবর বলো।’

‘গোস্তাখি মাক হজুর,’ চলেন খাইতে যাই, খাইতে খাইতে আলোচনা করি,’ বলে সে নিজের লোককে কিছু নির্দেশনা দিল। তারপর আবারো ওদের উদ্দেশে বলে উঠল, ‘চলেন হজুর, সব পথ পরিষ্কার আছে, খাস আমার নিজের বাড়িতে আমার পরিবারে লোকেরা আপনাদের আপ্যায়ন করবে। চলেন হজুর,’ বলে সে সবাইকে নিয়ে রওনা দিল বাইরের দিকে। তাদের ছোট ফোকড়ের মতো কামরাটার বাইরে এসে কর্নেল বড় করে দম নিল।

একটু আগে তাদের লুকানো কামরাটার বাইরে যখন পায়ের শব্দ হলো ক্ষণিকের জন্যে কর্নেল সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কারণ এমন একটা সময় যখন কাউকেই আসলে পুরোপুরি বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। যদিও ত্রিলোক বলেছে মুগ্ধিকে সে বিশ্বাস করে কিন্তু তাও আসলে পুরোপুরি ভরসা করা সম্ভব নয় কাউকেই, বিশ্বাস তো অনেক পরের বিষয়। ওরা যখন সচকিত হয়ে ওঠে এমন সময় দরজায় মৃদু টোকা পড়ে এবং কর্নেল জানতে চায় কে, তার এক ভৃত্য

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

ভেতরে প্রবেশ করে জানায় ফকির এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে মুন্সি ওদের অপেক্ষা করতে বলে বেরিয়ে যায় এবং খুব দ্রুতই ফিরে এসে জানায় তার খবরাখবর নিয়ে এসেছে কিন্তু যার খোঁজ করছিল কর্নেলরা, সেই আর্থার নাকি নেই। তখন কর্নেল কলতে চায় সে আসলে কী বলেছে এবং কেন বলেছে। এর পরেই মুন্সি তাদের বলে, আগে খেয়ে নেক, খেতে খেতে আলাপ করুক।

মুন্সির সঙ্গে বেরিয়ে এসে বাড়ির ভেতরের সরু বারান্দা দিয়ে তারা চলে এল দোতলার অন্যপাশে তারপর কাঠের সরু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো ওপরে। ওখানে বোলা একটা ছাদের মতো জায়গায় মাদুর বিছিয়ে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে মুন্সি। কর্নেল সত্যি খুশি হলো মুন্সির আপ্যায়ন দেখে এবং তারচেয়ে বেশি খুশি হলো সে খোলা জায়গায় বসতে পেরে। মাথায় কাপড় দেয়া চিকন লম্বা একটা মেয়ে খাবার পরিবেশন করল।

খাবার পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে কর্নেলই প্রথম প্রশ্ন করল, 'আর্থার নেই কলতে মুন্সি আসলে কী বুঝিয়েছে?'

'হজুর, আর্থার সাব মারা গেছে,' মুন্সির কথা শুনে কর্নেলের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সে অবাক হয়ে মুন্সির দিকে দেখল একবার, তারপর ফিরে তাকাল নিজের লোকদের দিকে। যে-মানুষটার খোঁজে এত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে তারা এখানে এসেছে, যে মানুষটা একভাবে কলতে গেলে ভিক্টরকে খুঁজে বের করার জন্যে তাদের একমাত্র ভরসা—সেই লোকটা মারা গেছে এ-কেমন কথা।

'বলো কি?' কবে, মানে কীভাবে?' কর্নেল প্রশ্ন করার আগে ত্রিলোকই কর্নেলের মনের প্রশ্ন করে বসল। এমনকি এত ক্ষুধার্ত হওয়ার পরও সোলেমান এবং পালোয়ান খাওয়া বন্ধ করে তাকিয়ে রয়েছে মুন্সির দিকে। এমনকি পালোয়ানের কুকুর বাহাদুরও বুঝতে পেরেছে কিছু একটা গুণগোল হয়েছে, সে অবশ্য খাওয়া থামায়নি, সে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে আবার খাওয়ায় মন দিয়েছে।

'হজুর, শান্ত হন, আমি দুঃখিত খাওয়ার মাঝে এই কথা বলে খাওয়ার মন নষ্ট করে দিলাম।'

'মুন্সি, তুমি খাওয়া রাখো, খবর বলো?' কর্নেল চেষ্টা করছে নিজের গলাটাকে যতটা সম্ভব শান্ত রাখতে।

'হজুর, আপনারা অস্ত্র হবেন না, আল্লাহ চাহেন তো একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে,' বলেই সে আবারো ত্রিলোকের কড়া দৃষ্টি দেখে নিয়ে থেমে গিয়ে কলতে লাগল। 'আপনারা তো জানেন আমার নানা ধরনের খবরি রয়েছে। এদের ভেতরে ফকির এবং তার দল হইল সবচেয়ে বিখ্যাত। ফকির শুধু নামে ফকির

সিপাহী

না, আসলেই সে ফকির কিংবা কওন যায় সে হায়দ্রাবাদের ফকিরগো দলের নেতা। তার অধীনে কয়েক শ ফকির হায়দ্রাবাদের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে। আর এই কারণেই শহরে কই কী অইতাছে সে অথবা হের পোলাপানে আর না হয় বুইড়ারা সব খবর রাখে, এর ভেতরে আবার গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবর থাকলে সে আমারে জানায়, আমি উপযুক্ত দাম দিয়া কিইনা নিই।’

‘তারপর তুমি উপযুক্ত দামে বেচো,’ সোলেমান বলে উঠল, সে আর পালোয়ান আবার খেতে শুরু করেছে। কর্নেল আর ত্রিলোক এখনো বলার মতো মুড ফিরে পায়নি। ‘আইচ্ছা, তারপর বলো।’

‘হুজুর, আপনারা আসার পর যখন জানাইলেন শহরের খবর নিতে, লগে আর্থার সাবের খবর নিতে—আমি প্রথমেই ফকিরের কাছে খবর পাঠাই। ফকিরের লোকেরা দুইটা খবর নিয়া আসে। প্রথমটা অইলো, দিল্লি শহরের পতনের পর এবং মোগল শাহজাদাগো হত্যার খবরের পর আইজ রাইত শহরের মেহফিলে বড় ধরনের আলোচনাসভা বসব, অবশ্যই গোপনে। আরেকটা অইলো,’ বলে মুঙ্গি বড় করে দম নিল। ‘আর্থার সাবের মৃত্যু।’

‘প্রথম কথা, যে-আর্থারের কথা বলছো তোমরা, বা যে-আর্থারের খোঁজে এসেছ সে মারা গেছে বলে, দুজনে যে একই লোক, এটা নিশ্চিত হচ্ছে কীভাবে?’ কর্নেল শান্ত সুরে প্রশ্ন করল। তার যুক্তিবাদী মস্তিষ্ক কাজ করতে শুরু করেছে। ‘আর্থার নামের মানুষ স্রেফ একজনই রয়েছে এমনটা ভাবার কোনো কারণ আছে কি?’

‘নাই, হুজুর,’ মুঙ্গি মাথা নেড়ে বলে উঠল। ‘তবে আমি প্রায় নিশ্চিত যে আপনে যে আর্থার সাবের কথা বলতামেন, উনি আর যে-আর্থার মারা গেছে—এই সাব একই লোক। এর পেছনে কিছু কারণ আছে,’ বলে সে একবার দেখে নিল কারো কিছু লাগবে কি না। সবার খাওয়া প্রায় শেষ দিকে দেখে নিয়ে সে আবার বলতে শুরু করল। ‘হুজুর, এই শহরে ইংরেজ সাহেব যারা আছে, তাগো বেশির ভাগই চেনা না হইলেও একটা বড় অংশের সাবগো ব্যাপারে জানা আছে। কারণ হয় আমি অথবা আমার লোকেরা অথবা আমার পরিচিত কেউ না কেউ চিনে। যেমন উদাহরণ দিই, ধরেন আপনে কারো ব্যাপারে জানতে চান, ওই লোকেরে হয়তো আমি সরাসরি চিনব না। কিন্তু দেখা গেল আমার কাছে জানতে চাইলেন হের বিষয়ে, আমি খোঁজ লাগাইলাম, এহন সে ইংরেজ হোক, বা কালা আদমি হোক, সেনাবাহিনীর লোক হোক বা ব্যবসায়ী হোক। সেই লোক যদি কোনোনা কোনোভাবে এই শহরের বা এর আশপাশের সঙ্গে কোনো

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

না কোনো ভাবে সংযুক্ত হয়, তাইলে আমার সংযোগের ফকির বাহিনী হোক, নায়েবের গোমস্তা হোক বা কামার-কুমার হোক, কেউ না কেই দেখা যাবে হেরে চিনবোই। এইবার আমি হের মাধ্যমে খবর বাইর করতে শুরু করব।’

‘বুঝতে পারছি তুমি ক্যামনে কাম করো,’ ত্রিলোক বলে উঠল। ‘এইবার নির্দিষ্ট বিষয়ে আসো।’

‘দুঃখিত হজুর, বেশি কথা কই ইদানীং, বুড়া হওয়ার লক্ষণ,’ বলে সে দাঁত দেখাল। ‘যাই হোক, এমনে কোনো না কোনো মানুষের মাধ্যমে আমি জানবোই কে কই, কোনহানে কী দরকার, তার বিষয়ে। কিন্তু আপনেরা যে-আর্থার সাবের কথা বললেন হেরে আমি নিজেই চিনতাম। খালি আমি না, হেরে এই শহরের অনেকেই চিনত, বিশেষ করে কালা আদমিরা প্রায়ই চিনত তারে।’

‘কারণ কি?’ কর্নেল ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইল।

‘কারণ, হজুর সে ছিল অন্যরকম মানুষ। কিছু মনে নিয়েন না হজুর,’ বলে সে কর্নেল এবং পিটারকে দেখে নিল। ‘সাদা সাহেবেরা কালা আদমিগো শ্রেফ গোলাম মনে করে,’ বলেই সে নিজের একটা হাত তুলল। ‘সবাই না, বেশির ভাগ। খুব কম সাদাই আছে, যে ভারতীয় আর কালা গো মানুষ মনে করে, মনে করে হেগোরও আবেগ আছে, কষ্ট আছে, ইচ্ছা আছে। আর যারা এমনটা মনে করে আপনেনগো আর্থার সাব এমন একজন মানুষ,’ বলে সে বড় করে দম নিল। ‘আর্থার সাব মূলত শিক্ষক মানুষ ছিলেন এবং তাঁর জীবনের বিগত কয়েক বছর ধইরা সে নানা ধরনের গাছগাছড়া নিয়া গবেষণা করতেন এবং স্থানীয় মানুষের চিকিৎসা করতেন। উনার ব্যাপারে যতটুকু জানতাম, উনি সেনানিবাসে চিকিৎসা করাইতেন ইংরেজ গো, পাশাপাশি গবেষণা করতেন। স্থানীয়গো লগে অনেক বেশি মাখামাখি এবং ওঠাবসার কারণে তারে কোম্পানি থেইকা সতর্ক করা অইলে উনি সেনানিবাস থেকে বাইরে বের হয়ে বাচ্চাগো ফুলে পড়াইতে শুরু করেন এবং লগে তাঁর গাছগাছড়া নিয়া গবেষণা করতে থাকেন। উনি এই এলাকায় বহু মানুষের চিকিৎসা করেছেন এবং সুস্থ করেছেন।’

কর্নেল একবার ত্রিলোকের দিকে দেখল। দুজনেরই মনে একই কথা, দুজন মানুষই চিকিৎসার সঙ্গে সংযুক্ত। ‘আচ্ছা তারপর?’ বলে কর্নেল নিজের কথাগুলোকে শুধরে নিল। ‘মানে আর্থার মারা গেল কীভাবে?’

‘খুব বেশি দিন আগে না তখন বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে, দিল্লি-মিরাটে বিরাট গণগোল চলতাকে কিন্তু এইদিকে তেমন কিছু হয় নাই। এমন সময় তারে একদিন মরা অবস্থায় পাওয়া যায় তার বাড়িতে।’

সিপাহী

‘মানে কেউ ছিল না তার সঙ্গে?’

‘না, সে তো একলাই থাকত, আর নিজের কাম করত, সবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল, কিন্তু লগে কেউ থাকত না। আর কাজের লোক ছিল, তারে সে নিজেই ছুটিতে পাঠাইছিল। সেই লোকই ছুটি খেইকা আইসা দেখে মানুষটা ঘরে মইরা পচে রইছে।’

কর্নেল চোখ কুঁচকে ফেলল। নিজের এক সময়কার সতীর্থের এমন মৃত্যু মেনে নিতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। ‘সময়টা কখন, আর এরপর কী হয়?’

‘তার লাশ আবিষ্কার যখন হয়, লাশের চেহারা আর কিছু বোঝার উপায় ছিল না। পোশাক, হাতের আংটি আর যেই সব জায়গা পচে নাই, যেমন পায়ের গোড়ালি, এগুলো দেখে বোঝা গেছে মানুষটা সেই। লাশ সেনানিবাসে নিয়ে যায়। এরপরে আর জানি না হজুর।’

‘আর সময়টা?’

‘হজুর, তখন বিদ্রোহ শুরু অইছে, দিল্লিতে সম্রাট জাফর শাসন হাতে নিচ্ছে, দিল্লিতে অনেক বড় একটা বিক্ষোভ অইতে শুনছিলেন, হের কিছুদিন পরেই,’ মুন্সি বলে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আবাবো ফ্র কুঁচকে উঠল কর্নেলের। দিল্লি দখল করল বিদ্রোহীরা, সেখানে ব্যাংকে লুট করানো হলো, বিক্ষোভ ঘটল অফিসারের, পালাল ভিক্টর, সে পালানোর সময়ে ব্যাংকের দেওয়ালে সূত্র দিয়ে গেল আর্চারের সঙ্গে দেখা করার জন্যে, আর সেই আর্চার মারা গেল অফিসার বিক্ষোভের কয়েকদিন পরেই। এটা ভিন্ন এবং আলাদা ঘটনা হতেই পারে না। অবশ্যই অবশ্যই এই ঘটনাগুলো একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত, কেন এক কীভাবে বের করতে হবে তাদের। ‘মুন্সি, এক কাজ করো তোমার ফকিরকে ডাকো, আমাদের পথ দেখাতে বলো, আমি আর্চারের বাড়িতে যেতে চাই এক পরীক্ষা করে দেখতে চাই সে মারা যাওয়ার আগে কিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।’

মুন্সি চূড়ান্ত আপত্তির সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগল। ‘ধীরে হজুর ধীরে। আমি ফকিরের ডাকতেছি, তবে আপনারা এহন বাইর হইতে পারবেন না। আপনেনগো, বাইর হইতে অইবো অফিসার নামার পরে। আগেই কলছি শহর আইজ রাইত গরম, সব লোক-লফর জড়ো অইতাছে,’ বলে সে মাথা নাড়ল। ‘আপনেনগো বাইর হওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।’

‘এই সব বইলা লাভ নাই,’ সোলেমান বলে উঠল। ‘কর্নেল স্যারে যা বলছে সেই বন্দোবস্ত করো।’

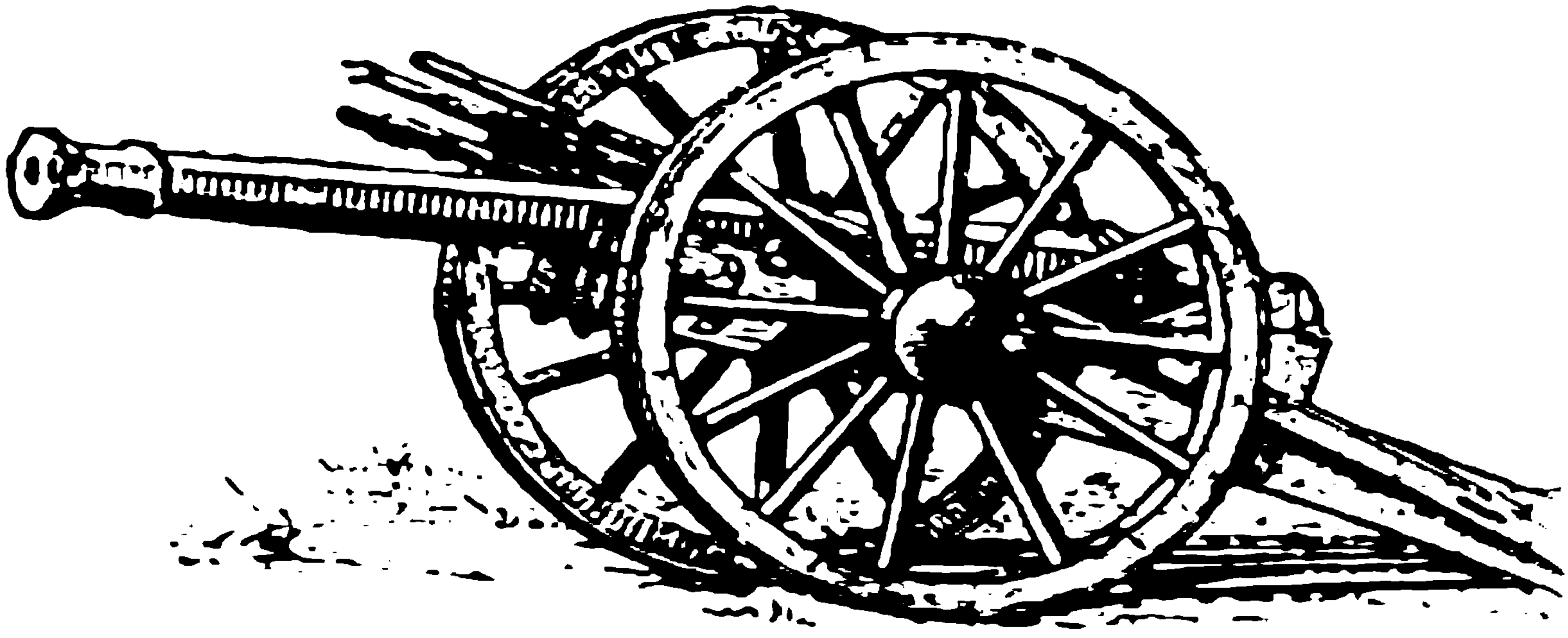
মুন্সি মাথা নেড়ে সায় জানাল। তাকে ঠিক সন্তুষ্ট মনে হলো না কর্নেলের কাছে। ‘আর কোনো আর্জি হজুর?’ তাও সে জানতে চাইল।

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

‘হ্যাঁ, আমি বের হওয়ার আগে নিজের লোকদের সঙ্গে একান্তে বৈঠক করতে চাই। আর তুমি খবর লাগাতে পারবে, আর্থার মারা যাওয়ার আগে কী করছিল, তার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল কি না এই সব?’

‘পারব হজুর, আপনি যেইভাবে বলবেন, সেইভাবেই খবর লাগাইতেছি। আর আমি ভেতর বাড়িতে বলতেছি, তারা চা পাঠায়ে দেবে, আপনারা একান্তে আলাপ করতে পারেন এখানেই। আর আলাপ শেষ অইলে আওয়াজ দি য়েন, আমি ফকিররে পাঠাব এবং আপনেনগো যাত্রার আয়োজন করব।’

মুন্সি মাথা নেড়ে চলে যেতেই, কর্নেল নিজের লোকদের নিয়ে গোল হয়ে বসল আসন্ন অভিযানের প্রস্তুতি বিষয়ক আলোচনা করতে হবে।



অধ্যায় সাতষষ্টি

বর্তমান সময়

ধানমণ্ডি, ঢাকা

ভেসে আসা গলার শব্দে আনোয়ার পাশা, মৌসুমি এবং ম্যানেজার হামিদ তিনজনেই ফিরে তাকাল ও ড্রইংরুমে থাকা সিঁড়ির ওপর দিকে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে দেশের অন্যতম প্রভাবশালী এবং পয়সাওয়ালা পরিবারের প্রধান মাহবুব তালুকদার। ‘কি ব্যাপার, সবাই এত খুশি কী নিয়ে?’ মাহবুব তালুকদারকে যখনই দেখে, আনোয়ার পাশার তিনটে জিনিস মনে হয়। এক, এই মানুষটার ব্যবসা থেকে শুরু করে সব বিষয়ে রুচি এবং আভিজাত্য অন্য লেভেলের, কাজে এবং মননে দুই ক্ষেত্রেই। দুই, এত সুদর্শন মানুষটা চিরকুমার হিসেবে কীভাবে টিকে গেল। তিন, এই লোকটা সবসময় এত সুন্দর পোশাকে থাকে কী করে! এখন রাতের বেলা প্রায় শোবার সময় হতে যাচ্ছে। এমন সময়ও, মানুষটার পরনে সুন্দর সাদা পাজ্জাবি আর পাজ্জামা। সাদা সুতির পোশাকটার প্রতিটা ভাঁজ ধারাল এবং পোশাকে একটা দাগ অতিরিক্ত কোঁচকানো ভাঁজ নেই। তার হাতে ছোট একটা প্যাকেট।

মাহবুব তালুকদার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে একই প্রশ্ন করল আবারো। ‘সবাই খুব হাসি-ঠাট্টা করছিলে মনে হয়!’ সে ওদের সামনের সোফায় বসতে বসতে জানতে চাইল। ‘আমিও শুনি, আমিও একটু হাসি,’ মাহবুব তালুকদারের গলায় আন্তরিকতা কিন্তু মুখের ভাবে ঝানু ব্যবসায়ীসুলভ আবেগহীন মৃদু হাসি, উপন্যাসের ভাষায় যেটাকে বলা হয়, ঠোঁটে হাসি কিন্তু সেই হাসি চোখ স্পর্শ করেনি।

‘সেটা না হয় বলব, তার আগে তুমি একটা কথা বলো তো,’ আনোয়ার পাশার নিজের পায়ের ভর পরিবর্তন করতে করতে বলতে লাগল। ‘তোমাকে

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

সেই কলেজজীবন থেকে দেখে আসছি এবং তোমাকে আজো কখনো একটা ধরাপ পোশাকে দেখলাম না,' বলে সে মৃদু হাসল। 'ধরাপ পোশাক তো দূরে কোনদিন এতটুকু এলোমেলো পোশাকে, এলোমেলো চুল, শেভ ছাড়া চেহারা পর্যন্ত দেখলাম না। এটা কীভাবে সম্ভব?' বলে আনোয়ার পাশা ম্যানেজার হামিদ আর মৌসুমির দিকে দেখল একবার। 'মাঝেমধ্যে আমার সন্দেহ লাগে, ও কি আসলে মানুষ না রোবট? এই পুলিশি জীবনে এত এত রহস্যের সমাধান করলাম কিন্তু এই রহস্যের সমাধান করতে পারলাম না,' বলে আবারো দরাজ গলায় হেসে উঠল আনোয়ার পাশা, তার সঙ্গে যোগ দিল মাহবুব তালুকদার।

তবে তার হাসি মাপা এবং ধারাল ঠিক তার পোশাকের ভাঁজের মতোই। 'পাশা তুমি আজো মানুষ হলে না,' বলে সে সামান্য হাত নাড়ল। 'শোন, সারাজীবন তো ফালতু সব সিগার খেয়ে গেলে,' বলে সে তার হাতের ছোট প্যাকেটটা এগিয়ে দিল আনোয়ার পাশার দিকে। 'তোমাকে যেটা প্রমিজ করেছিলাম, একেবারে খাঁটি সাউথ আমেরিকার সিগার।'।

'সত্যি,' প্যাকেটটা হাতে নিতে নিতে আন্তরিক খুশি হলো আনোয়ার পাশা, প্যাকেট খুলে একটা সিগার বের করে শ্বেল নিল। 'টাকিলা ইনফেসটেড! অ্যামেজিং।'।

মাহবুব তালুকদার মুসকি হাসছে। 'এবার বলো তোমার টিম এবং শারিয়ারের কী অবস্থা?' বলে সে আপনাতেই নিজের হাতের দিকে দেখল একবার। 'শুনলাম, তোমার অফিসার সেই অপারেশন বেশ ভালোভাবে শেষ করেছে, প্রফেসরকেও খুঁজে বের করেছে আবার কিশোরগঞ্জ থেকে বড় ধরনের একটা ট্রেজার নাকি—'

'দ্যাটস কনফিডেনশিয়াল,' আনোয়ার পাশা সিগারের প্যাকেটটা সাইড টেবিলে নামিয়ে রেখে মাহবুব তালুকদারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। তার মুখের হাসির পরিমাপ কমে গেছে, সেখানে এখন একজন পুলিশের কাঠিন্য। 'তবে যেহেতু তুমি আমাদের ফাইন্যানশিয়ার, তোমাকে শুধু এটা বলব আমার ছেলেরা যেখানে হাত দিচ্ছে সোনা ফস্কাচ্ছে। সিলেট এবং চট্টগ্রামের কথা তো তুমি জানোই, এবার কিশোরগঞ্জেও,' বলে সে আশঙ্কিত করার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। 'কাজেই তোমার ইনভেস্টমেন্ট শতভাগ সিকিউরড।'।

'আর ময়মনসিংহে যা হয়েছে, খবরে পর্যন্ত এসেছে—'

'মাহবুব ভাই,' স্বল্পভাষী হামিদ ম্যানেজার বলে উঠল। 'খবরে যা আছে সেটা তো জানেনই। আর নিশ্চয়ই তারা আমাদের চেয়ে বেশি কনসার্ন,' সে আনোয়ার পাশার সাপোর্টে বলে উঠল।

সিপাহী

‘হ্যাঁ, আমার অফিসার বাশার ওখানে গেছে,’ বলে সে হামিদ ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা নাড়ল ধন্যবাদসুলভ ভঙ্গিতে। ‘আমরা আশা করছি ওখানেই বাকি প্রতিটা অপারেশনের মতোই সফলতা আসবে এবং খুবই দ্রুত।’

‘পেপারগুলো এনেছো?’ মাহবুব তালুকদার মূল প্রশ্নে আসছে। তার প্রশ্নের জবাবে আনোয়ার পাশা মৌসুমির দিকে ইশারা করতেই হামিদ ম্যানেজার এগিয়ে গিয়ে মৌসুমির হাত থেকে পুরো ফাইলটা নিয়ে নিল।

‘হামিদ, তুমি আজ রাতে ফাইলে চোখ বুলাও, কাল সকালে আমি আর তুমি ডিসকাস করব এরপর—’ বলে মাহবুব তালুকদার তার বাক্য সম্পূর্ণ করল না। আনোয়ার পাশা মনে মনে হাসল। মাহবুব তালুকদার তার বন্ধু হতে পারে কিন্তু সে যে কঠিন ঘাণ্ড মাল আবারো প্রমাণ করল সে। সেই করার বিষয়ে কিছু বলল না। আনোয়ার পাশা কিছু বলতে যাবে, তার আগেই আবারো মাহবুব তালুকদার কথা বলে উঠল, ‘তুমি তো জানো, একবার সবই করে দিলে অল ইজ অন ইয়োর হ্যান্ড,’ আনোয়ার পাশা কিছু না বলে মাথা নাড়ল। ‘কাজেই আমরা লাস্ট মিনিট অ্যাসেসমেন্টের সুযোগ আশা করি—কিছু মনে করবে না।’

‘অবশ্যই না,’ আনোয়ার পাশা পায়ের ডর বদল করল। মনে মনে সে বলল, লাস্ট মিনিট অ্যাসেসমেন্টের ফল ভালো হলেই হলো।

‘শারিয়ারের কী খবর?’ মাহবুব তালুকদারের প্রশ্ন শুনে আনোয়ার পাশা বুঝতে পারল সে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছে দুটো কারণে। এক তার ভাতিজার খবর নেওয়ার জন্যে। দুই, সে চট্টগ্রাম এবং সিলেট মিশন নিয়ে আগ্রহী। এটাও তার লাস্ট মিনিট অ্যাসেসমেন্টের একটা অংশ।

‘ভালো, সিলেটে তানভীর আর চট্টগ্রামে শারিয়ারের মিশন শুরু হবে খুব দ্রুত, আর আমি ওদের ব্রাইন্ড অথরিটি দিয়েছি।’

আনোয়ার পাশা দেখল মাহবুব তালুকদারের ঞ্চ কুঁচকে উঠল। সে খানেক সময় দিল মাহবুব তালুকদারকে প্রশ্নটা হজম করার জন্যে। তারপর আবার বলে উঠল। ‘ওরা দুজনেই স্ট্রং এবং নির্ভরযোগ্য, কাজেই ওরা লিস্টেড ক্রিমিনালদের ঢাকায় এনে ইন্টারপোলের হাতে তুলে দেবে। আর সেটা একবার হয়ে গেলে, ইউ নো—’ ইচ্ছে করেই আনোয়ার পাশা কথা শেষ করল না। সে স্পষ্ট রাখছে মাহবুব তালুকদারের লাস্ট মিনিট অ্যাসেসমেন্টের ডাবনার খোরাক হিসেবে।

‘শিগুর দে উইল—’

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

আরো পনেরো মিনিট পর যখন মৌসুমি আর আনোয়ার পাশা বেরিয়ে এলো ধানমন্ডির বাসা থেকে, 'মৌসুমি জানতে চাইল, 'স্যার উনি সই করবেন তো কাল নাকি?'

আনোয়ার পাশা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। সে ভাবছে। 'করবে, তবে আরেকটু সময় নেবে, কারণ সে জানে একবার সই করলে আমি হয়ে উঠব সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ, একজন ব্যবসায়ী হিসেবে সে আরো অ্যাসেস করবে,' বলে সে সামান্য ভেবে বলে উঠল। 'মৌসুমি প্রফেসর ইফতেখারের ঘর নাও, উনার সঙ্গে কথা বলা খুব জরুরি, হয় আজ রাতে, না হয় কাল তার সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হবে।'

কোতোয়ালি থানা ময়মনসিংহ

ধানার রেকর্ড এবং এভিডেন্স রুমের সামনে দাঁড়িয়ে বাশার খানিক নস্টালজিক অনুভব করল। এই রুমেই সে ঠগিদের নিয়ে সেই কেস ফাইলের প্রাথমিক সূত্র পেয়েছিল। আজো মনে পড়ে সেই ভৌমিক নামের ছেলেটা এবং রমিজ দারোগা এবং আবদুল্লাহ মিলে এই রেকর্ড রুমেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করে কেস ফাইল ঘেঁটেছিল পুরনো কেসের এবং সেটা না পেয়ে ওরা সিদ্ধান্তে আসে যে এই কেসটা আলাদা এবং গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই ফাইল কেউ গায়েব করেছে। কামরাটার দিকে তাকিয়ে খানিক নস্টালজিক অনুভব করল বাশার। সেই কামরাটা আর নেই, এখন পুরোপুরি বদলে সব আধুনিক করা হয়েছে। বেশির ভাগ কেসফাইলই এখন ডিজিটাল।

'পুরনো কেসফাইলগুলো কি সব ফেলে দেওয়া হয়েছে?' বাশার কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল।

'না, স্যার, একেবারে ফেলে দেওয়া হয়নি, তবে সব নেইও, যেগুলোর অবস্থা অনেক বেশি খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো ফেলে বাকিগুলো রাখা হয়েছে পুরনো গুদামে। আর প্রায় সবই এখন এখানে ফাইল করা আছে ডিজিটালি। আবার চাইলে হার্ড কপি ফাইলও বের করে আনা সম্ভব, তবে একটু কঠিন হবে বিষয়টা এবং সময় লাগবে। তবে আপনারা যেটা অনুরোধ করেছিলেন সেগুলো এরই মধ্যে বের করে এনে রাখা হয়েছে। কাজেই ওটার জন্যে আরো অপেক্ষা করতে হবে।'

'ঠিক আছে চলেন,' বলে বাশার, রুশো আর সামিরা তিনজনে মিলে এগোল এভিডেন্স আর্কাইভের দিকে। ওদের একটা ছোট কামরায় বসিয়ে রেখে

ସେହିଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାସ୍ଥାନ ଗଲେ ମୋ । ସାହେବଜୀ ଏହା ଆଗରେ ନନ୍ଦା ଯିବି 'ମା' ଚାଲି ।
 'ମା'ରେ ଚାଲି ଯିଲ । 'ମା'ର, ଶେଷରେ ଯିବି ଯିବି ଯୁଦ୍ଧର ଚେତନା ରାଜା ମା'ର
 ବିଜୟଚାଲି । ଯିବି ମୋ ଯିବି କଲ । 'ଆମନାତା ମୋହର ଆଗରେ ।'

ବନ୍ଧୁ ମାନିଆ ଆଉ କଲେଜ ଘିରେ ଥିଲେ । ‘ଢାଳା’

କାହାଣୀର ସାବଧାନ ଯୋଗାଣର ଦେଖା ଦିଅନ୍ତା। କାହାଣୀ ଛାନ୍ଦିନୀଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 'ପ୍ରାଚୀନ
'ବିଦ୍ୟାଳୟ' ଦେଖା ଦିଆଯାଇ ସାହିତ୍ୟ କାହାଣୀ ଲେଖନ ।

‘ହେ ଚନ୍ଦ୍ରା ନା, ତୁ ବିଚିତ୍ରତା (ସାଧୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇ)
 ଯାଉଛି ଏ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚାରି : ମା ଗୋଟିଏ କାଳରେ ତୁ ତୁ
 ତୁ ହେ ଚନ୍ଦ୍ରା !’

[illegible][illegible]

ପୂର୍ବର ସ୍ଥାନ : ଏକାକୀୟ ବ୍ୟାପାର ସେବା

‘কি পোশ তোমরা?’ দিস্টটা নাড়িয়ে রেখে বাশার জামতে চাটল সামিরা
কে কণ্ঠের কাছে।

‘না, তাই, সবই তো ধুব সাধারণ জিনিসপত্র যখন হচ্ছে,’ কনো বলে
 চিৎ। ‘তাকে বন্ধিও কখনো লাগতে। চন্দ্রবার মোটা সেরের আঁড়ালে তার চোখ
 মুটে ঢাকান হয়। কখনো বাকি উত্তেজিত বাণীর ঠিক বুঝতে পারল না। সে
 উদ্ভাসিত হয়ে পালকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে উঠল, ‘একটা ছুটি থাকার কথা
 দেবে?’

[illegible]

‘বড়, অসহন করে যে মনে তরল না,’ বাণীর থেকে চুইয়া নিতে নিতে
সে যায় উঠল। ‘এই আধুনিক চুই আটিক তরল কোরো কারণ মেটে।’
চুইয়া যেসে বাণীর যায় উঠল, ‘একটা মর্দু আর কাদাময়ের একটা কোমর
করার কথা।’

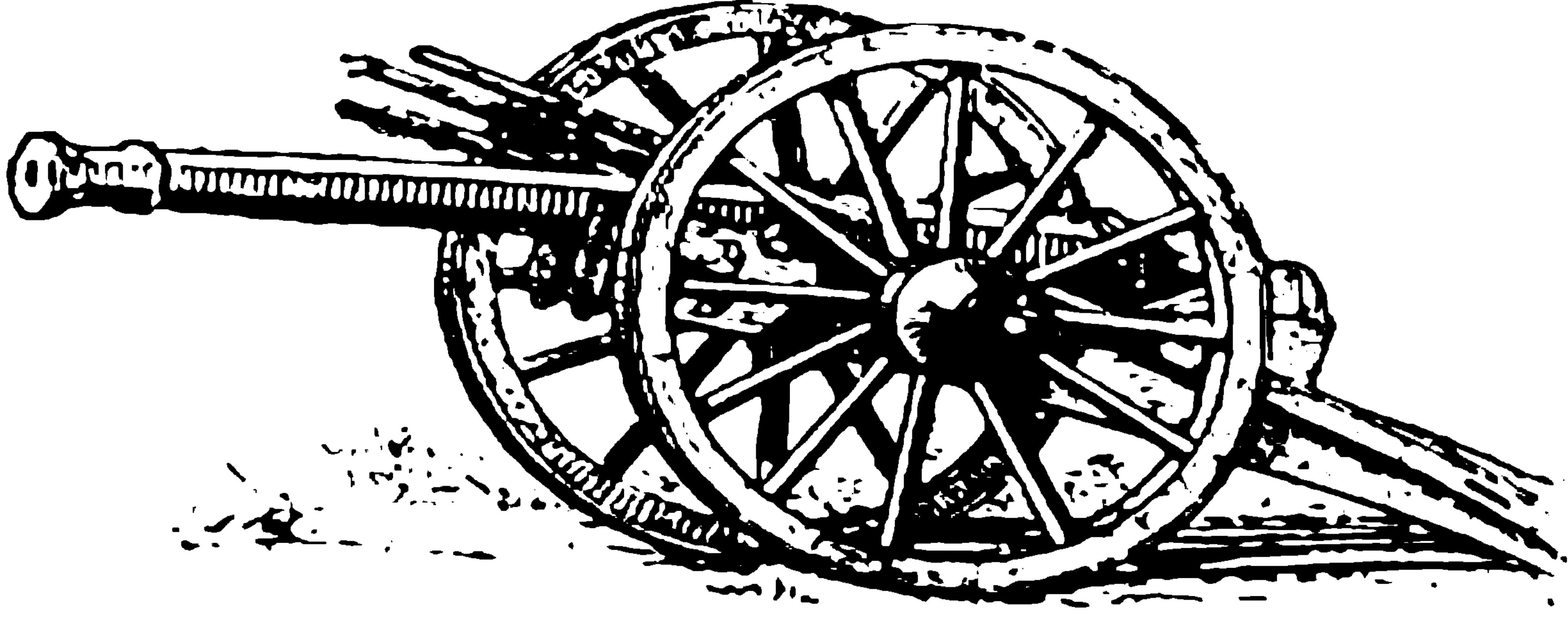
‘কিছু সেস ঘেরাঘেরি’, ‘সমিতির বাস উঠল’, ‘কিছু একটা সোপানর দুলা ধরে সে
বাস উঠল’, ‘ভুলি যাবে তবু এটার কথা কখনো’

'सर्वे भद्राणि कुरुते' : सदा साधनं यथा नृणां सर्वयोगिनः ।

[illegible]

‘একটা ডাক্তারি,’ সে যেটা কামা একটা ডাক্তারি ‘হুগল মরল যুগের সামনে।

‘সেইভাবে ভাবারি, সত্যকে অবশেষে তরুণেরা কিছু পাওয়া দেবে না।’



অধ্যায় আটষষ্টি

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
হায়দ্রাবাদ, ভারতবর্ষ

মুন্সির ভাষায় ফকির লোকটাকে দেখে কর্নেল কেন কারোই খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই, কেউ হলো না। মোটাসেঁটা মানুষ সে, বেশ বয়স্কও। মাথায় লাল পট্টি বাঁধা, তার মুখের লম্বা এলোমেলো দাঁড়ি তার কোমরে গিয়ে ঠেকেছে, যেখানে তার শরীরটার সমাপ্ত হয়েছে। কোমরের নিচ থেকে তার দুই পা নেই। একভাবে বলতে গেলে মানুষটার দাঁড়ি তার শরীরের চেয়ে অনেক বেশি লম্বা। দুই পা থাকার কথা যেখানে সেখানে মোটা চামড়ার পট্টি বাঁধা, মাটিতে চলাচলের সুবিধার জন্যে। মানুষটার দুই হাত শক্তিশালী, গাছের শিকড়ের মতো মোটা মোটা, চওড়া মুখে ধূর্ত হাসি।

কর্নেলদের দেখে সে মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে তার ধূর্ত হাসিটা আরেকটু চওড়া করল, তারপর তার পাশে থাকা ছোট ছেলেটার ঘাড়ের একটা চাটি মেরে বলে উঠল, 'হজুরগোরে সেলাম কর,' হাত চাটি খেয়ে খানিক হতভম্ব হয়ে যাওয়া ছেলেটা একই ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, কর্নেলদের থেকে তার মনোযোগ বেশি পালোয়ানের কুকুরটার দিকে। 'হজুরগোর খেদমতে, ফকির হাজির।'

'তোমার কি নাম, এই ফকির, নাকি ফকিরদের সর্দার দেখে, নিজেকে ফকির বলেই পরিচয় দাও?' কর্নেল পাইপে টান দিতে দিতে জানতে চাইল।

'দুইটাই হজুর,' বলে সে নিজের দুই হাতে ধরা ছোট পিড়ার মতো কাঠের দুটো জিনিসে ভর দিয়ে খানিক এগিয়ে এলো ওদের দিকে। 'হজুর আপনোগো সামনে কিছু না হইতে পারি আমি, কিন্তু এই শহরে, আমারে মানে লোকে। আমার নামে বাতাসও ফিস ফিস করতে ডরায়, কারণ হেরাও জানে আমারে না জানায়া ফিসফিস করলে আমি জাইন্না ফালাব, হে-হে,' বলে সে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

‘তোমার এত কথার দরকার নেই,’ ত্রিলোক বলে উঠল। ‘তোমারে যথেষ্ট অর্থ দেওয়া হইছে, তুমি আমাদের গোপন পথে নিরাপদে ওই মৃত সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাবা,’ বলে ত্রিলোক ফ্র নাচাল। ‘পারবা কি না সেইটা বলো?’

‘অবশ্যই হজুর,’ বলে সে সিঁড়ির দিকে দেখাল। ‘সন্ধ্যা নাইয়া গেছে এখন চলেন হজুর, সময় খারাপ, দিনের বেলায়ই বিপদ, আবার রাইত যত গভীর হইবে বিপদ তত বাড়বে। কাজেই এহনই ভালো—’ ফকির বকে চলেছে, কর্নেল ফিরে তাকাল মুন্সির দিকে। সে দেউড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কর্নেল ফিরে তাকাতেই সে সোজা দাঁড়াল। কর্নেলের চোখের জিজ্ঞাসা দেখে সে আশঙ্ক করার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে জানাল, চিন্তা নাই হজুর এর ওপরে ভরসা করতে পারেন। কর্নেল নিজের লোকদের দেখে নিয়ে ফকিরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। ‘চলো, আমরা কোনো ঝামেলা চাই না, সব ঝামেলা এড়ায়ে যেকোনোভাবে আমগোরে স্রেফ ওই সাহেবের বাড়িতে পৌছায়া দিবা। বুঝতে পারছো?’

‘জি, হজুর চলেন,’ বলে সে দুই হাতে ভর দিয়ে সিঁড়ির দিকে রওনা দিল আর অন্যরা অনুসরণ করল তাকে।

আড়াইতলা সরাইখানার ওপরের ছাড়-বারান্দা যেখানে একটু আগে কর্নেলরা খাওয়া-দাওয়া করে আলাপচারিতা করছিল সেখান থেকে দলটাকে সরাইখানার পেছন দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখল মুন্সি, সবার আগে একজন অর্ধ-মানব দুই হাতে ভর দিয়ে চলেছে, তার একপাশে একটা কুকুর অন্য পাশে একটা ছোট ছেলে, তার পেছনে একাধিক শক্তিশালী এবং অস্ত্রধারী মানুষ, তবে সবার পদচারণ অত্যন্ত সাবধান, ওদের দেখে নিয়ে সে মুখ তুলে তাকাল শহরে দিকে, আজ রাতে শহর উত্তেজিত, সে নিজেও। মানুষগুলো চোখের আড়াল হয়ে যেতেই, সে দ্রুত পায়ে চলে গেল নিজের ভেতরের বাড়িতে, সেখানে ঢুকেই সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

তার পরিবারে মানুষ তিনজন। তার স্ত্রী এবং তার দুই যুবতী কন্যা। তিনজনই বিস্ফোরিত নয়নে বসে আছে চৌকির ওপরে বিছানো মাদুরে। তিনজনেরই চোখ বিস্ফোরিত, দৃষ্টি স্থির, গাল গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। কিন্তু তিনজনই এতটা ভয় পেয়েছে, কোনো শব্দ তো দূরে থাক এমনকি, নড়চড়া করতেই ভয় পাচ্ছে। কারণ তাদের পাশেই মুখ ঢেকে সটান দাঁড়িয়ে রয়েছে

সিপাহী

একটা মানুষ্য আকৃতি। পরনে সাধারণ পোশাক এবং মুখ ঢাকা, এই মানুষ্য আকৃতিটাই একটু আগে কর্নেল এবং তার সঙ্গীদের খাবার পরিবেশন করছিল। মুন্সি ভেতরে ঢুকতেই সে ধীরে ধীরে নিজের মুখের কাপড়টা সরাল। ‘সব ঠিক আছে মুন্সি?’

‘হজুর,’ বলেই নিজেকে শুধরে নিল মুন্সি, ‘সাহেব, মিনতি করি, আমার পরিবারে কোনো ক্ষতি—’ মুন্সি কথা শেষ করার আগেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে মাটিতে, দুই হাত জড়ো করা মুখের সামনে। কথা বলতে গিয়ে থেমে যাওয়ার কারণ হলো মানুষটা নিজের ঠোঁটের সামনে একটা আঙুল রেখে তাকে চুপ থাকতে বলছে। নারী আকৃতিটা মুন্সিকে চুপ থাকতে বলে ধীরে ধীরে নিজের শরীর থেকে গৃহপরিচারিকার পোশাক খুলে ফেলতে শুরু করেছে। মুন্সির মনে হলো, মহিলা না যেন একটা সাপ, ধীরে ধীরে নিজের খোলস খুলে ফেলছে। মুন্সি সঠিকভাবে এই মানুষটাকে না চিনলেও সে খুব ভালোভাবেই জানে এদের পরিচয়। এদের বলা হয় বিষকানিয়া। কর্নেলরা তার দরজার পা রেখে যখন বিশ্রাম নিচ্ছে ঠিক সেই সময়ে একটা সাপের মতোই তার বাড়ির পেছন দিয়ে প্রবেশ করে এই মহিলা, মুন্সি কিছু করার আগেই সে জিম্মি করে মুন্সির পরিবারের লোকদের। কোনোরকম লুকোছাপা না করেই সে নিজের পরিচয় দেয় বিষকানিয়া হিসেবে এবং কর্নেলদের বিষয়ে কিছু নির্দেশনা দেয় সে। না হলে কী হবে সেই বিষয়েও জানান দেয় তাকে। মহিলা তাকে সব বলার পর মুন্সি এমনকি একটা পা-ও নাড়েনি, সে মহিলার কথামতোই কাজ করেছে। সে কর্নেলদের ভেতরের বাড়িতে খাবার পরিবেশন করেছে পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছে এই মহিলা। সে কর্নেলদের ভালোভাবে দেখার জন্যে এবং বোঝার জন্যে এমনটা করেছে। এরপরে কর্নেলরা বিদায় নেওয়ার পরে সে এখন ছিন্ন হয়েছ মুন্সির পরিবারের কাছে। মুন্সি ভয় পাচ্ছে, কোথায় যেন শুনেছিল এরা পেছনে কোনো পরিচিত রেখে যায় না। যে-কারণে মুন্সি ভয় পাচ্ছে তাকে পরিবারসহ মেরে ফেলবে কি না এই মহিলা! বিশেষ করে যখন তারা তিনজনেই এই মহিলার চেহারা দেখেছে।

‘সাহেব, আপনে যা বলছেন আমি করছি, আপনে—’

‘মুন্সি তুমি কেন খামাখা ভয় পাচ্ছেছা,’ সে পরনের পরিচারিকার পোশাক খুলে ফেলেছে, মুন্সি দেখল মহিলার চিকন লম্বা আকৃতির পায়ে এবং কোমরে জড়ানো নানা ধরনের অস্ত্র। মহিলা এগিয়ে এসে মুন্সির ছোট মেয়েটার গাল ধরে ফেলল। ‘এত সুন্দর পরিবার তোমার, মুন্সি দেখল তার ছোট মেয়েটা কাঁদছে,

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

ভয়ে বড় বড় হয়ে গেছে তার চোখ, ক্ষণিকের জন্যে মুন্সির মনে হলো এবার তার মেয়েটাকে মেরে ফেলবে এই মহিলা। 'এত সুন্দর একটা পরিবার থাকলে,' মহিলা তার কোমরে হাত দিল। মুন্সি ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল, কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে। 'চোখ খোল মুন্সি,' মানুষটা না থাকতে পেরে চোখ খুলে ফেলল। দেখল কোমর থেকে ছোট একটা রুমাল বের করে তার ছোট মেয়ের চোখ মুছে দিচ্ছে। এই প্রথমবার সে ভালোভাবে মহিলার চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখল, তার কপালের ডান পাশে সবুজ একটা জন্মদাগ। 'তোমায় ভয় নেই মুন্সি আমি তোমাদের মারব না,' বলে সে ছট করে সোজা হলো।

যন্ত্রির নিঃশ্বাস ফেলল মুন্সি, ফিরে তাকাল নিজের পরিবারের মানুষদের দিকে। মহিলা বাইরের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই উঠে এসে জড়িয়ে ধরল তাদের।

মহিলা হঠাৎ ফিরে এসে, মুন্সির দিকে তাকিয়ে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল তার দিকে, 'এটাতে একটা বার্তা আছে, আর কোথায় পাঠাতে হবে পাঠানোর ব্যবস্থা করো,' মুন্সি দেখল সেই মৃত আর্থার সাহেবের বাড়িতে কাদের পাওয়া যাবে সেটা জানান দেওয়ার বার্তা, পত্রটাকে পাঠাতে বলা হয়েছে নিজামের সৈন্যদের ওখানে। 'এইটা তো—'

'যা বলছি করো,' বলে সে একবার মুন্সির পরিবারের দিকে দেখাল তারপর রওনা দিল বাইরের দিকে।

'এর ওপরে তো আমার ঠিক ভরসা হচ্ছে না,' সোলেমান বলে উঠল ত্রিলোককে। কিন্তু তার পেছন থেকে জবাব দিল কর্নেল। 'কিন্তু করারও কিছু নেই। এর ওপরেই ভরসা রাখতে হবে। আর ভরসা করতে পারি না পারি একে আমার কাজের লোক মনে হচ্ছে। দেখো কীভাবে আগাচ্ছে।'

ওরাও এগোতে এগোতে সামনে তাকিয়ে দেখল, মানুষটা কুকুর আর ছোট ছেলেটার সঙ্গে সমান তালে এগোচ্ছে। একজন পাবিহীন মানুষ হিসেবে সে যে-গতিতে সামনে এগোচ্ছে, তাতে মনেই হয় না তার পা নেই। দেখে মনে হচ্ছে যেন উড়ে চলেছে। এমনকি ওরাই অন্ধকারের ভেতরে গলি ঘুপচি দিয়ে তার পেছনে এগোতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে।

মুন্সির ডেরা থেকে বেরিয়ে ওরা প্রথমে নেমে আসে একটা শুকনো নালায়, সেটা দিয়ে খানিক এগিয়ে ছোট একটা জঙ্গলের মতো পার হয়ে, উঠে আসে

সিপাহী

একটা গলিতে, সেখান থেকে একটা দেওয়াল টপকে চলে আসে অন্যপাড়ে, সেখান থেকে ওরা বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। যদিও সন্ধে হয়ে গেছে কিন্তু সে-হিসেবে অন্ধকার বেশি এবং এই অন্ধকারের ভেতরে এই লোকটা না থাকলে ওরা কোনোভাবেই ওই নির্দিষ্ট বাড়িটা খুঁজে পেল না, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ ওরা পরিচিত সব রাস্তা এড়িয়ে চলেছে যতটা সম্ভব আড়াল নিয়ে। শহরে বিচরণ করতে গিয়ে ওরা পরিষ্কার বুঝতে পারছে শহর পুরো সরগরম হয়ে আছে। আর এর ভেতরেই ওদের পৌছাতে হবে জায়গামতো।

‘জলদি জলদি আগাও,’ পালোয়ান ধমকে উঠল ওদের।

‘আর কত দ্রুত আগাব, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল পিটার।

ওরা কোনোমতে ফকিরকে অনুক্রম করে ছুটল আরো প্রায় আধা দশটা। যখন প্রায় দম ফুরিয়ে আসছে, অন্ধকার এক কানাগুলির শেষ মাথায় পৌঁছে ফকির ঘোষণা করল ওরা পৌঁছে গেছে, এখন এই দেওয়াল টপকাতে হবে। সবাই অবাক হয়ে ফিরে তাকাল তার দিকে, এত উঁচু দেওয়াল পার হতে জ্ঞান বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সেটা কলার আগেই ফকির লোকটা লাফ দিয়ে একটা পুরনো মাচার মতো জায়গায় উঠে গেল, তাকে অনুসরণ করল পিচ্চি ছেলেটা এবং কুকুরটাও, সেখান থেকে দেওয়ালের একটার পর একটা খাঁজ ধরে বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগল। সবাই অবাক হয়ে দেখছে, কর্নেল তাড়া দিল সবাইকে, ‘চলো।’

ফকির খোঁড়া হলেও সে যেভাবে তড়তড়িয়ে উঠে এলো এবং নেমে গেল দেওয়ালের অন্যপাশে, ওদের সেটা করতে কালঘাম ছুটে গেল। তাও বহুক্ষণে দেওয়াল পার হয়ে অন্যদিকে নেমে সবাই হাঁপাতে হাঁপাতে দেখতে পেল ওরা একটা বাড়ির পেছনের আঙিনায় এসে পৌঁছেছে।

‘হজুর, এইটাই ওই আর্থার সাহেবের বাড়ি।’

কর্নেল আঙিনার চারপাশে দেখল। যদিও পাশের বাড়ি এবং রাস্তা থেকে আলো আসছে, তা-ও কলতে গেলে অন্ধকারই। বাড়ি এবং আঙিনা দেখে কর্নেল অনুধাবন করল এটা অবশ্য কোনো ইংরেজের বাড়ি। কারণ আঙিনাটা খোপে-ঝাড়ে ছাওয়া হলেও, ওটা একসময় সুন্দর করে গোছানো একটা আঙিনা ছিল সেটা কলার অপেক্ষা রাখে না। আর সবচেয়ে বড় কারণ হলো, বাড়ির পেছনের আঙিনাতে বৈকালিক চা পানের আয়োজনের জন্য সাজানো টেবিল-চেয়ার রয়েছে। ওটার ধরন দেখলেই কর্নেল বলে দিতে পারে এটা অবশ্যই কোনো

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

ইংরেজের চা খাবার ব্যবস্থা। 'চলো বাড়ির ভেতরে গিয়ে পরখ করতে হবে, সোলেমান, পিটার দেখ তো আলোর কোনো বন্দোবস্ত করা যায় কি না,' বলে কর্নেল এগিয়ে গেল বাড়ির মূল অংশের দিকে।

ওদা ঢুকেছে বাড়ির পেছনের অংশ দিয়ে। কাজেই মূল বাড়িতে প্রবেশ করার পর প্রথমেই পড়ল, শোবার ঘর, তার একপাশে বসার ঘর এবং অন্যপাশে দরজা ভেড়ানো একটা কামরা। ওটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কর্নেল সোলেমান এবং পিটার দুটো মশাল নিয়ে এসে হাজির হলো। একটা মশাল কর্নেল নিজের হাতে নিয়ে সে বাড়ির ভেতরের দিকে চোখ কুলাল। 'এখানে কিছুই নেই,' বলে সে নিজের সোফাদের দিকে ইশারা করল ছড়িয়ে পড়ার জন্যে। 'সবাই সাবধান, বাইরে থেকে যেন আলো দেখা না যায়, আর অসাবধানে, কোনো শব্দ করো না।'

সবাই ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে দেখতে লাগল, কর্নেল চলে এলো বসার কামরায়। সাধারণ একটা কার্পেট পাতা মেঝেতে। একপাশে একটা ইজিচেয়ার, আরবার এটাতে বসে নিশ্চয়ই বই পড়ত। ওটার সামনে একটা চৌপায়ার ওপরে বেশ কিছু কাগজপত্র আর পুরনো বই ছড়িয়ে রয়েছে। কর্নেল সেগুলো দেখতে শুরু করবে, এমন সময় বাড়ির ভেতরের দিক থেকে কেউ একজন কর্নেলের নাম ধরে ডেকে উঠল। মশাল হাতে সেদিকে এগিয়ে গেল কর্নেল।

পিটার এবং পালোয়ান দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বন্ধ দরজার সামনে, দরজাটায় ছোট একটা লোহার তালা লাগানো। তালাটাকে ভাঙবে কি না, সেটা জিজ্ঞেস করার জন্যেই মূলত কর্নেলকে ডাক দিয়েছে ওরা। 'ভেঙে ফেল, অপেক্ষার কী আছে।'

পালোয়ান তালাটা দু হাতে ধরে এমনভাবে মোচড় দিয়ে ভেঙে ফেলল ওটাকে, দেখে মনে হলো ছোট বাচ্চা পিঠা ভেঙে দুই ভাগ করল। 'পিটার, পালোয়ান, ত্রিলোক তোমরা আমার সঙ্গে চলো,' বলে সে সোলেমানকে বলল ফকিরকে নিয়ে পাহারায় থাকতে।

'ফকির গেল কই?' সোলেমান চারপাশে ফকিরের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল কিন্তু ফকিরের হদিস নেই। কর্নেল কোনো কারণে পাত্তা দিল না। সে সোলেমানকে পালোয়ানের কুকুরটাকে নিয়ে পাহারায় থাকতে বলে তালা ভাঙা কামরাটার দিকে এগিয়ে গেল পরখ করার জন্যে।

কর্নেলদের ব্যস্ত দেখে ফকির মৃদু শিস বাজাল তার সঙ্গে থাকা পিচ্চি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে। এই শিসের ইশারা পিচ্চি জামে এবং বেশ ভালোভাবেই

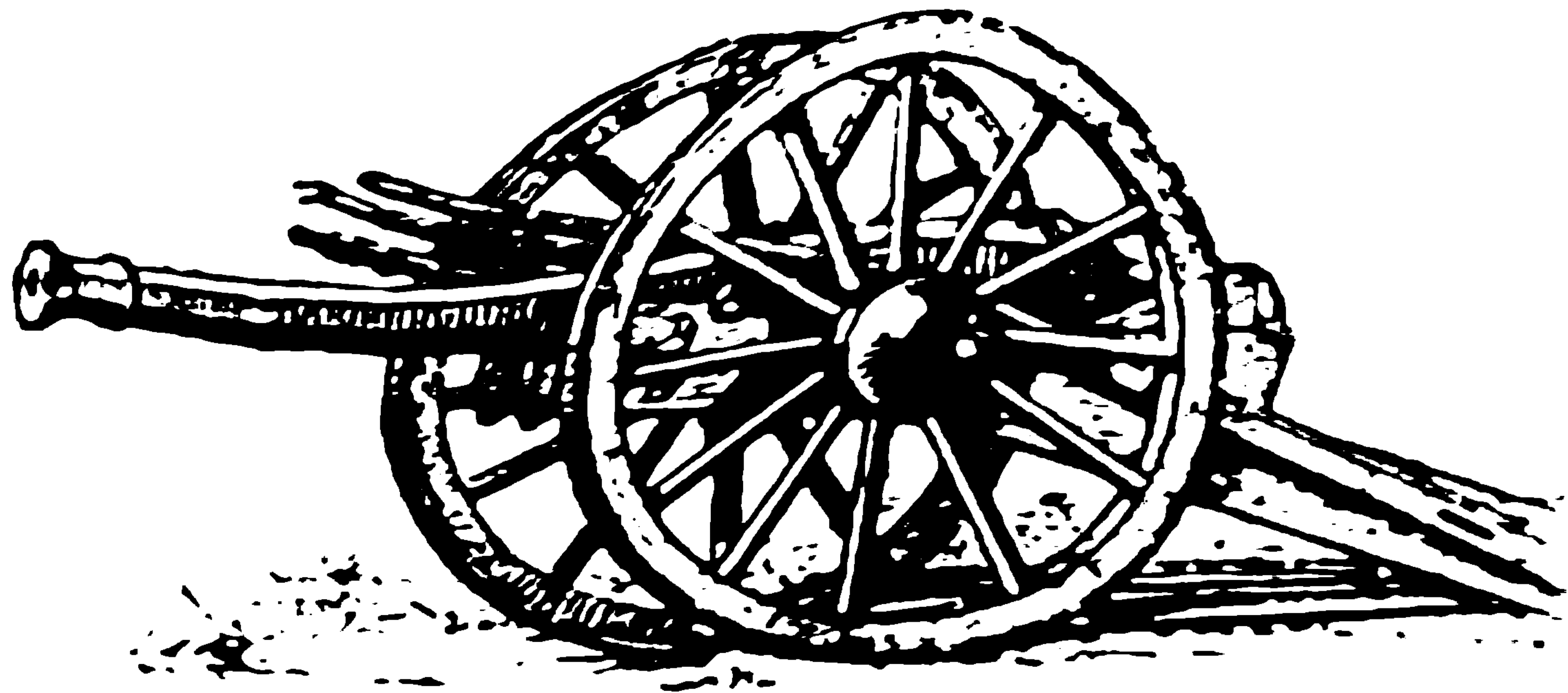
সিপাহী

বোঝে। ছোট হলেও সে বলতে গলে একেবারে গুঁড়া অবস্থা যেতে ৮ ফরিকেরর সঙ্গে আছে। ফকির পাদ দিলেও সে বুঝতে পারে এমন কী করতে হবে। ফকিরের এই শিসের মানে হলো এমন সরে পড়তে হবে। সঙ্গে নিয়ে আসা কুকুরটাকে সে আদর করছিল, গুটাকে মনিবের উদ্দেশ্যে ব্যস্ত করিয়ে দিয়ে সে সরে এলো ফকিরের কাছে। সে আসতেই ফকির আবারো ঠিক হাঙ্গের মতোই নিঃশব্দে কিন্তু বিদ্যুৎগতিতে তাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো বাড়ির পেছনে সেই আঙিনাটার। আঙিনার একপাশের এসে সে দেওয়ালের কাছে ছোট একটা ফোকর দিয়ে বেরিয়ে এলো রাস্তার ওপরে। তাকে অনুসরণ করল পিচ্চি ছেলেটা।

‘ওয়াদ পলাইলেন যে?’

‘জলদি পলা, ক্যান জানি বিপদ মনে অইতাছে। মুন্সি কোনো দেশ পাকাইতাছে কি না কেডা জানে!’ কথা বলতে বলতে সে দ্রুত এগোচ্ছে, গলি থেকে বাড়ির সামনের রাস্তার দিকে এগোতে যাবে, একদল ঘোড়সওয়ার পার হয়ে গেল তাদের, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে গেল সে আর পিচ্চি। ঘোড়সওয়াররা পার হয়ে যেতেই সে পিচ্চিকে বলে উঠল, ‘এরা ওই বাড়ির দিকে গেল না?’ পিচ্চি মাথা নেড়ে সায় জানাল। ফকির জলদি পিচ্চিকে নিয়ে সরে গেল আবার গলির ভেতরে। অন্যপাশে গিয়ে পার হয়ে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে, অন্ধকার গলির মাথায় একটা পুরুষ আকৃতি দেখে যেমে গেল সে, ফকির মূর্খ হতে পারে কিন্তু বোকা না, অবয়ব দেখেই মানুষটাকে চিনতে পারল সে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ‘আজরাইল।’

‘ফকির, কথা আছে তোর সঙ্গে,’ বলে সে খানিক এগিয়ে এলো। তার মাথার পাশ দিয়ে উড়তে থাকা ধোঁয়ার গন্ধে ফকির নিশ্চিত হলো ভুল অনুমান করেনি সে। আজ তার খবর আছে।



অধ্যায় উনসত্তর বর্তমান সময় আঠারোবাড়ি, ময়মনসিংহ

রাত গভীর হয়েছে কিন্তু এই এলাকা দেখে সেটা মনেই হচ্ছে না। কারণ এই এলাকাতে মূলত বিভিন্ন ধরনের ধাতব জিনিসের ব্যবসা এবং কাজ হয়। আর ধাতুর ভেতরে রয়েছে সোনা থেকে শুরু করে রুপা, তামা, লোহা, কিছু আর বাদ নেই। আর ধাতব জিনিসের ব্যবসা মানেই দুপুর, সন্ধ্যা আর রাতের কাজ, লেনদেন আনা-নেওয়া আর নানা ধরনের বিনিময়। আর এ কারণে শহরের নির্দিষ্ট এই অংশে দিনের শুরু হয় দিনের শেষে, আর চলতে থাকে রাতের প্রথম দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় প্রহর, আবার কখনো কখনো ভোর পর্যন্ত।

আঠারোবাড়ি রাস্তার একপ্রান্তে এসে কনস্টেবল আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগার দিকে তাকিয়ে জয়া সরকার বলে উঠল, 'টমটমের ভাড়া দাও, পুলিশ হয়ে একটা জিপের ব্যবস্থা করতে পারলো না, কেমন পুলিশ তোমরা!' বলে জয়া সরকার টমটম থেকে নেমে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল একটা। এলাকাটা এখনো চালু থাকলেও রাতের এই ছিপ্রহরে এটাকে আর ব্যস্ত বলার উপায় নেই কোনোভাবেই। 'তোমরা এই এলাকা কেমন চেন?'

'ভালোই চিনি, আপনার কোথায় যাইতে হবে বলেন?' আবদুল্লাহ কঠিন স্বরে বলে উঠল জয়ার দিকে তাকিয়ে। এই মহিলাকে তার ঠিক ভালোও লাগে না, আর সে বিশ্বাসও করে না। সে আনমনেই একবার নিজের কোমরে রাখা অস্ত্রটা পরীক্ষা করে নিয়ে রমিজ দারোগার দিকে ইশারা করল সাবধান থাকার জন্যে। 'কোথাও যাইতে হবে না। আমার লগে লগে চলো, তাইলেই হবে,' বলে জয়া সরকার সিগারেটে টান দিয়ে ইট ভাটার মতো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে

সিপাহী

রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। কনস্টেবল আবদুল্লাহ এবং রমিজ দারোগা পেছন পেছন চলল তার। খানিক এগিয়ে জয়া সরকার একটা পিতলের জিনিসপত্রের দোকানের সামনে এসে থেমে গেল। একবার সে মাথা উঁচু করে সাইনবোর্ডটা দেখল, তারপর আশপাশে তাকিয়ে আবদুল্লাহর দিকে দেখে বলে উঠল, 'তোমরা এখানে থাকো। আমি ভেতরে যাই—'

'না,' সে বাক্য শেষ করার আগে রমিজ দারোগা বলে উঠল, 'জি, না ম্যাডাম সেইটার পারমিশন নাই। আপনে যেখানে যাবেন আমরাও যাব, আপনে যারে যা বলবেন আমরাও শুনব।'

জয়া সরকার চোখ রাঙিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আবদুল্লাহ জানিয়ে দিল, এসব চলবে না। জয়া সরকার চোখ দিয়ে দুজনকে ভয় করার চেষ্টা করেও আনমনে একবার কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর ঢুকে পড়ল দোকানের ভেতরে। দোকানের ভেতরটা খুবই অন্ধৃত। অর্ধেক দোকান সমান মাটিতে, আর বাকি অর্ধেক নেমে গেছে মাটিতে, মানে আন্ডারগ্রাউন্ডে। রাতের এই দ্বিপ্রহরেও দোকান সরগরম, লোকজন ঢুকছেন বের হচ্ছে, দোকানে থাকা কর্মচারীরা কথা বলছে। 'সমীর মোল্লা আছে? জয়া সরকার দোকানের এক কর্মচারীর কাছে প্রশ্ন করল। লোকটা সন্দেহের চোখে একবার জয়াকে দেখল, তার সঙ্গে থাকা আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগাকে দেখল। তারপর মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'তারে কি দরকার, সে তো নাই।'

'নাই!' জয়া সরকার তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। 'ঠিক আছে, বলে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সোজা হাঁটা দিল দোকানের ভেতরের পাতাল অংশের দিকে। 'আরে আরে, ম্যাডাম করেন কি!' লোকটা চোঁচিয়ে উঠল। 'আরে ওই দিকে কাস্টোমারদের যাওয়া নিষেধ।' লোকটা চোঁচিয়ে চলেছে, জয়া সরকার নেমে চলেছে, আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা একবার দ্বিধা করে জয়াকে অনুসরণ করতে লাগল। সিকিউরিটি দৌড়ে এসে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল ওদের। 'এই আমরা পুলিশ, গায়ে হাত দেবে না,' আবদুল্লাহ চোঁচিয়ে উঠল।

'এই আপনারা আগাবেন না,' পুরো দোতানে হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে। পাতালের সিঁড়ির মুখ থেকে ভারী একজন মানুষ মাথা তুলল। 'এই ওদের আসতে দাও।'

জয়া সরকার আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'সমীর মোল্লা। তার অ্যান্টিক বেচাকেনার প্রাক্তন সহকর্মী,' বলে সে দুজনার

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

দিকে একবার চোখ টিপে দিয়ে এগিয়ে গেল নিচের দিকে, যেখানে সমীর মোস্তাফা লোকটা অদৃশ্য হয়েছে।

‘আসলেই কি এই নোটবুক কোনো কাজের জিনিস, নাকি এই ডেভিড হারামজাদা এটাতে তার বাজারের লিস্টি বানিয়েছে?’ বাশার খানিক সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে রুশোর হাতে ধরা নোটবুকটার দিকে। ডেভিডের জিনিসপত্র পরীক্ষা করার সময়ে যেটা নিচে পড়ে গিয়েছিল তার কাগজপত্রের ফোন্টারের ভেতর থেকে।

‘অহহ, মাই গড,’ রুশো শিস দিয়ে উঠল নোটবুকটা দেখতে দেখতে। ‘বিশ্বাসও করতে পারবেন না কী আছে এটার ভেতরে,’ সে এমনকি বাশার কিংবা সামিরাকে দেখানোরও গরজ বোধ করছে না, এতটা মনোযোগ দিয়ে ঘাঁটতে শুরু করেছে ডেভিডের নোটবুকটা। পাতা উলটে একবার সামনের দিকে যাচ্ছে, আরেকবার পেছন দিকে যাচ্ছে। মোটা লেন্সের ওপাশে চকচক করছে তার চেহারা। রুশোর অবস্থা দেখে, বাশার সামিরার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল আনমনে, তারপর মোবাইল বের করে সময় দেখল। রাত প্রথম প্রহর থেকে ধীরে ধীরে গভীরতার দিকে এগিয়ে চলেছে। ‘সারারাত নিজেই দেখতে থাকবে নাকি?’ বাশার প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠল। ‘আমাদেরও দেখাও কী পেলো?’

‘অবশ্যই অবশ্যই,’ বলেও সে ভীষণ উত্তেজনার সঙ্গে নোটবুকের ভেতরেই দেখছে, সেই সঙ্গে আবার অন্যহাতের কড়ে গুনে কী জানি হিসেবও করছে। ‘আর একটা মিনিট সময় দেন আমাকে,’ বলে সে আরো অল্পত দশ মিনিট নিজের কাজ করে গেল। এই ফাঁকে বাশার আর সামিরা আলাপ চালিয়ে গেল জয়া সরকার আর অন্য টিম কী করবে এবং টিম সম্ভাব্য কী বের করতে পারে, সেটা নিয়ে।

‘রুশো আর সময় দেওয়া যাচ্ছে না তোমাকে,’ এবার বাশার অস্থিরতার সঙ্গেই বলে উঠল।

‘জি জি,’ সরি বলে সে চকচকে দৃষ্টিতে বাশার আর সামিরার দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসি দিল একটা, তারপর নোটবুকটা দিয়ে টেবিলে একটা চাটি মেরে বলে উঠল। ‘এটা নোটবুক না, রীতিমতো একটা বোমা। আশ্চর্য বিষয় হলো এরকম একটা জিনিস, এতদিন কেউই ধরতে পারেনি। এটা এভাবে এই ভাগাড়ে পড়ে ছিল। অদ্ভুত—’

সিপাহী

‘কি পেলো, সেটা বলো,’ সামিরা ধমকে উঠল।

‘আমি এখন মোটামুটি একটা আন্দাজ করতে পারি, ডেভিড এই শহরে এবং এই দেশে কেন এসেছিল, সেই সঙ্গে এটাও খানিকটা ধরা যাচ্ছে, যে-কাজে সে এসেছিল, সেটার থিওরিটিক্যালি সে অনেকটাই অ্যাচিভ করে ফেলেছিল। সাউথ এশিয়ার স্কলার এবং বাংলাদেশ-ভারতের নানা প্রফেসরদের সঙ্গে কথা বলে হোক আর কাগজে-কলমে ইনভেস্টিগেশন করে হোক সে বের করে ফেলেছিল অনেক কিছুই। আর যেটা সে থিওরিটিক্যালি অ্যাচিভ করেছিল, সেটা সে প্র্যাকটিক্যালি করতে শুরু করে ময়মনসিংহ থেকে। ময়মনসিংহে সে পুরোপুরি সফল হলে সে অন্যান্য জায়গায় হাত দিত। কিন্তু সেটা সে দেয়নি,’ বলে নিজেকে শুধরে নিল রুশো। ‘মানে দিতে পারেনি। সে মারা পড়ে ময়মনসিংহ শহরে।’

‘এই কারণেই তাহলে রিফাতকে অপহরণ করা হয়েছে, যাতে আমাদের দিয়ে অপহরণকারীরা বের করতে পারে ডেভিড আসলে কী পেয়েছিল এবং—’ সামিরার কথা শেষ করতে দিল না বাশার। ‘এক কাজ করো,’ দ্রুত বলে উঠল সে। ‘এখানে আমরা যা পাওয়ার পেয়েছি, আর কিছু পাওয়ার নেই। আমরা এখান থেকে বের হবো। আমরা ল্যাবে গিয়ে কাজ শুরু করব আবার। তুমি কী পেয়েছো,’ বলে সে রুশোর দিকে আঙুল তুলে দেখাল। ‘একেবারে কনফ্রিটভাবে বলবে এবার।’

‘ঠিক আছে,’ বলে সে মৃদু হেসে উঠল। ‘কংক্রিট এভিডেন্স আছে এবার আমার হাতে,’ বলে সে নোটবইটা দিয়ে বাড়ি মারল টেবিলে আবার।

সমীর মোল্লাকে অনুসরণ করে সেই পিতলের দোকানের পাতালের কামরায় নেমে এলো জয়া সরকার, সিঁড়ির নিচে দুটো কামরা। যেটার পর্দা সামান্য নড়ছে, রমিজ দারোগা আর আবদুল্লাহকে নিয়ে সেটার দিকে এগিয়ে গেল জয়া, ‘তোমরা কোনো কথা বলবা না, যা বলার আমি বলব। বুঝছো?’

জয়ার কথা জবাবে দুজনেই সায় জানিয়ে মাথা নাড়ল।

কামরাটার ভেতরে গদি আঁটা একটা বিছানার মতো, সেটার ওপরে আধশোয়া হয়ে বসে আছে বিশালদেহী সমীর মোল্লা, বিছানায় চাদরের চেয়ে বেশি চড়িয়ে রয়েছে তার বিরাট ভুঁড়ি। বিছানাটার একপাশে একটা ছোট ব্যবসায়ী ক্যাশবাক্সের মতো, আর বিছানার সামনে বেশ কয়েকটা চেয়ার রাখা। বিছানা,

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

চাদর, চেয়ার প্রতিটা জিনিস দামি এবং অভিজাত। দেখলেই বোঝা যায়, লোকটা তার স্পেশাল লোকদের এখানে এনে বিভিন্ন ধরনের ডিল করে। ওরা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। 'জ্যা, তুমি জেল থেকে ছাড়া পাইছো, একটা ফোন দিলা না, কষ্ট পাইলাম,' সে হাতের ইশারায় ওদের সামনে চায়ের কাপ রাখতে বলল একটা ছেলেকে। জ্যা সরকার চায়ের কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে বলে উঠল। 'আগে বিড়ি খাওয়াও মোল্লা। তুমি জানো আমি কী ব্র্যান্ড খাই।'

সমীর মোল্লা এক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল জয়ার দিকে, তারপর জোরে জোরে হেসে উঠল। 'অবশ্যই, বলে সে নিজের ক্যাশবাক্সের মতো কারুকাজ করা কাঠের বাক্সটা খুলে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল জয়ার দিকে। 'আমি না খাইলে কী হবে, সব ব্যবস্থা আছে আমার কাছে।'

জ্যা সিগারেট ধরিয়ে মোল্লার দেওয়া দামি লাইটারটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। 'মোল্লা আমরা কত বছর এক লগে কাম করছি বলো?'

'প্রায় আধা যুগ,' মোল্লা সরাসরি তাকিয়ে আছে জয়ার দিকে। 'তুমি কী চাও বলো তো?'

'মোল্লা আমি তোমার বসরে চাই, আলী আজগর, আমার পোষ্য পিতা,' জ্যা সরাসরি তাকিয়ে আছে মোল্লার দিকে। জয়ার কথা শুনে মোল্লা জোরে হেসে উঠল, তারপর গম্ভীর হয়ে গেল। 'তুমি কি দুটামি করো?'

জ্যা কোন কথা না বলে সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বিড়ি টানতে লাগল।

'তুমি জানো এইটা সম্ভব না,' জয়ার গম্ভীর চেহারা দেখে মোল্লার চেহারাও গম্ভীর হয়ে গেছে। 'আলী আজগরের মতো মানুষের কেউ খুঁজে পায় না। সে না চাইলে তো একেবারেই না।'

'তার জন্যে অফার আছে আমার কাছে,' জ্যা বলে উঠল। বলে সে একটা কাগজ এগিয়ে দিল মোল্লার দিকে। কাগজটা দেখে মোল্লার চেহারা সঙ্গে সঙ্গে রসগোল্লা হয়ে গেল। 'তুমি যদি ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করো—' জয়ার চেহারা দেখে সে চুপ হয়ে গেল। 'তোমরা বসো এইখানে আমি দেখতামি,' বলে সে নিজের মোটা দেহটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর পায়ের স্যান্ডেল পরে নিয়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

'কি টোপ দিলেন?' রমিজ দারোগা জানতে চাইল। 'কাম হবে তো?' জ্যা কিছু না বলে চুপ করে রইল। তার চেহারা পাথরের চেয়েও বেশি কঠিন।

সিপাহী

‘এক কাজ করো, এখানে যা পাওয়ার সেটা পাওয়া গেছে, কাজেই এই আলোচনা এখানে না করে চলো আমরা ল্যাভে যাই,’ বাশার বলে উঠল। ‘সেখানে গিয়ে আলোচনা তো হবেই সঙ্গে, সবকিছু নথিভুক্ত করতে হবে। আর ওখানে গিয়ে আলোচনাটাও করা যাবে ঠিকভাবে এবং নিরাপদে।’

‘একটা বিষয় আছে,’ সামিরা বলে উঠল। ‘আমরা কি এখান থেকে এগুলো নিয়ে যেতে পারব?’

‘অবশ্যই পারব,’ বাশার বলে উঠল। ‘আমাদের অনুমতি আছে নিয়ে যাওয়ার। যেকোনো আইটেম এন্ট্রি দিয়ে সই করে নিতে পারব আমরা, তবে সময় আছে, এর ভেতরে আবার ফেরত দিতে হবে এবং নিয়ে যাওয়ার পর এর দায়িত্ব আমাদের। একটা কথা,’ বলে বাশার খানিক ভাবল। ‘আমরা শুধু নোটবইটা নেবো না। এতে জিনিসটা নির্দিষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমরা ছুরিটা, ডেভিডের ঘড়িটা এবং নোটবুক— এই তিনটা জিনিসই নেব।’

‘ওকে চলো,’ বলে ওরা ডিউটি অফিসারকে ডেকে সব ফর্মালিটি সেরে বেরিয়ে এসে জিপে উঠল। বাশার জিপ ছেড়ে দিতে দিতে বলে উঠল, ‘রাত গভীর হলেও একটা কাজের কাজ হয়েছে।,’ বলে সে জিপ স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে এলো তার প্রাক্ষণ থেকে। রাতে ডিউটি ড্রাইভার না থাকাতে সে নিজেই চালিয়ে এসেছে।

‘তুমি তো ভালোই ড্রাইভ করলে,’ সামিরা বলে উঠল। রুশোর এসব দিকে মন নেই, সে একমনে ডায়েরি ঘাটছে।

বাশার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল অন্ধকারের ভেতরে একটা বড় মাইক্রো এসে বাড়ি মরল ওদের জিপে।

‘কী ব্যাপার, এত দেরি করছে কেন লোকটা?’ বিরক্তির সঙ্গে মোবাইল বের করে সময় দেখল কনস্টেবল আবদুল্লাহ।

‘আসলেই অনেক সময় নিতাকে,’ রমিজ দারোগাও বিরক্ত।

‘রিল্যাক্স, কাজে এলে এমন দেরি হবেই,’ কথাটা বলেই কেন জানি সচকিত হয়ে উঠল জয়া সরকার। ‘তোমরা কিছু গুনতাহো?’

‘না কই, সবই তো নীরব।’

‘ঠিক, একটু আগেও লোকজনের কথাবার্তার শব্দ গুনতাহিলাম, কোনো শব্দ নাই, বলেই সে উঠে দাঁড়িয়ে চট করে বাইরে বেরিয়ে এলো। তাকে

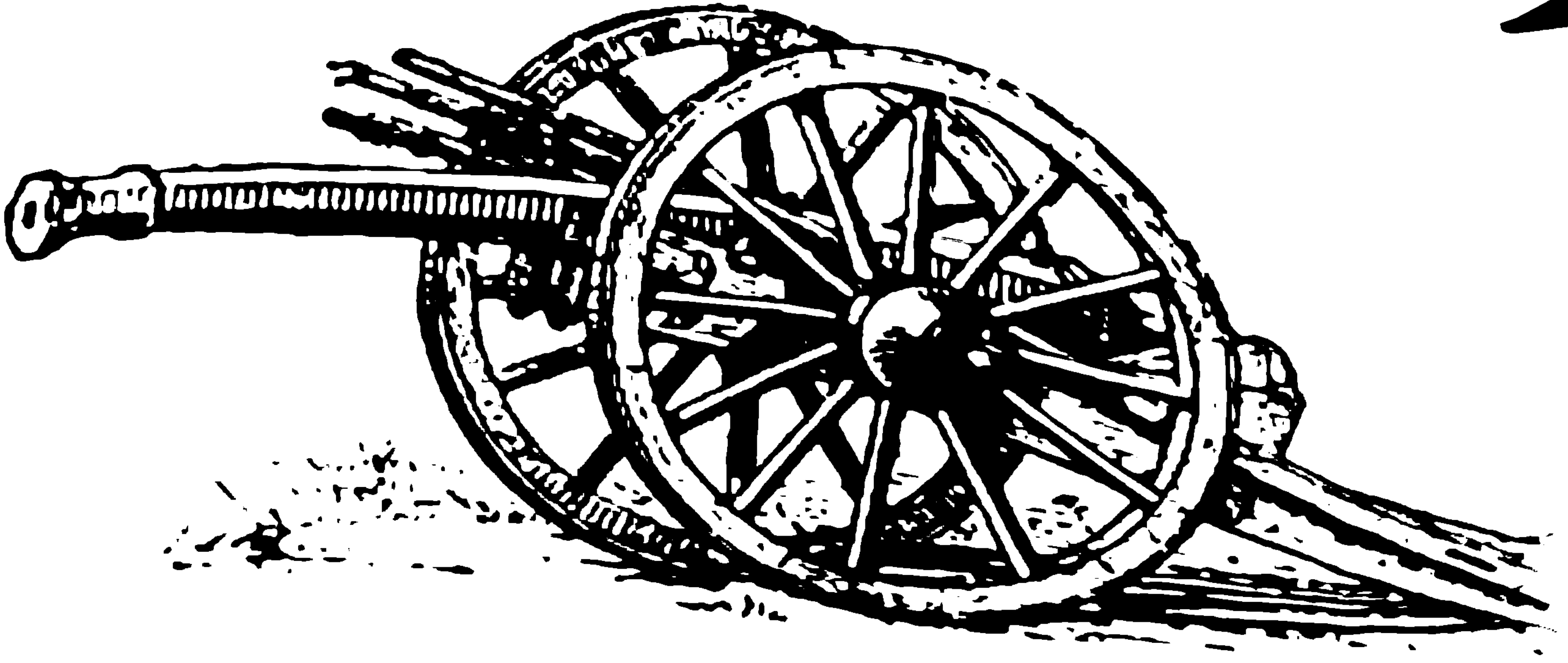
তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

অনুসরণ করল বাকি দুজনে। বাইরে কেউ নেই। ওপর থেকেও কোন কথার শব্দ আসছে না। তিনজনেই একে অন্যের দিকে দেখল। তারপর যত দ্রুত সম্ভব সিঁড়িটি টপকে ওপরে এসে দেখল পুরো দোকান খালি।

'দেখছো কারবার, কেউই নাই,' রমিজ দারোগা বলে উঠল।

'জলদি বের হতে হবে, বলেই জয়া দোকানের বাইরের দিকে পা বাড়াল। প্রায় কোনো বাধা ছাড়াই বাইরে বেরিয়ে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তিনজনে।

'যাক—' আবদুল্লার কথা শেষ করার আগেই চার-পাঁচজনের একটা দল নিষ্প্রাণ বৃক্ষের মতো ঘিরে ধরল তাদের, তারপর পিঙ্কল ঠেকিয়ে বলতে গেলে আলগোছে তুলে ফেলল দাঁড়িয়ে থাকা মাইক্রোর ডেভারে।



অধ্যায় সত্তর
সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
হায়দ্রাবাদ, ভারতবর্ষ

কামরাটার দরজায় ঠেলা দিয়ে নাক কুঁচকে ফেলল কর্নেল। ‘শুকনা রক্তের গন্ধ,’ সে কিছু বলার আগেই পেছন থেকে পালোয়ান বলে উঠল। ‘ঠিক,’ তাকে সায় জানাল ত্রিলোক। কর্নেল কিছু না বলে পা রাখল কামরাটার ভেতরে, তারপর উঁচু করে ধরল মশাল। ‘কামরাটাকে বাইরে থেকে ঠিক যতটা ছোট মনে হচ্ছিল কামরাটা আসলে ঠিক ততটাই বড়। ‘এটা আর্থারের কাজের জায়গা এবং স্টাডি ছিল,’ কর্নেল বলে উঠল। কারণ কামরাটার একপাশে সারি সারি বইয়ের র্যাক অন্যদিকে টানা চৌপায়ার ওপরে নানা ধরনের কাচের বোতল, ঝুড়ি এগুলো রাখ। এগুলোর ভেতরে তো বটেই চৌপায়ার ওপরে টানা দিয়ে বেঁধে রাখা সুতো আর দড়িতেও ঝুলছে নানা ধরনের শিকড়, নানা ধরনের মৃত প্রাণীর শরীরের বিভিন্ন অংশ, কোনোটা শুকনো কোনোটা আধা শুকনো, কোনটাতে এখনো পোকা কিলকিল করছে, সেগুলো থেকেও গন্ধ আসছে। দেখলেই বোঝায় যায় এক সময় এগুলোর যত্ন নেওয়া হতো এখন আর সেরকম কিছু করা হয় না। কামরাটায় ছোট ছোট অনেক খাঁচা। এখন অবশ্য একেবারেই খালি।

‘আপনার বন্ধু করত কি?’ পালোয়ান জানতে চাইল।

‘সে ওষুধ বানাত আর নানা ধরনের তরল নিয়ে গবেষণা করত,’ বলে সে আরেকটা চৌপায়ার ওপরে রাখা নানা আকৃতির কাচের জিনিসের ভেতরে রাখা নানা রঙের তরল দেখাল। ত্রিলোক এগিয়ে গিয়ে একটাতে হাত রাখতে যাচ্ছিল কর্নেল সাবধান করে দিল। ‘ধরো না এগুলো খুব বিপজ্জনক হয় অনেক সময়,’ বলে সে কামরার চারপাশে দেখাল। ‘আর্থার এগুলো নিয়ে গবেষণা আর কাজ করত। প্রশ্ন হলো,’ কর্নেল পায়ে কাঁচের কাছের কাছের কিছু একটা দেখে সেদিকে মশালটা

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

এগিয়ে দিয়েই থেমে গেল। মেঝেতে পাতা কার্পেটের রং গাঢ় হয়ে আছে এক জায়গাতে। 'রক্ত,' কর্নেলের পেছন থেকে বলে উঠল পালোয়ান।

'সম্ভবত, এখানেই মারা গিয়েছিল আর্থার,' খানিক ভারী গলায় বলে উঠল কর্নেল। 'কিন্তু—'

'কর্নেল দেখেন, কাছেই একটা বইয়ের আলমারির কাচ ভাঙা, সেটা দেখাল ত্রিলোক, সেই সঙ্গে সে এটাও দেখাল, ওটার পাশেই আরেকটা চৌপায়ার ওপরে অনেক ভাঙা কাচের জিনিস পড়ে আছে। একটা চৌপায়ার পা ভাঙা।

'কী মনে হচ্ছে দেখে?' কর্নেল প্রশ্ন করল, ত্রিলোক পালোয়ান এবং পিটারের দিকে তাকিয়ে। 'এটা তো পরিষ্কার যে, আর্থার এখানে মারা গেছে। সেটা এখানে তাকে খুন করা হোক আর যাই হোক না কেন।'

'আমার কি মনে হয় জানো কর্নেল,' পিটার বলে উঠল। 'কেন জানি কামরাটার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, এখানে আসলে স্রেফ একটা খুন হয়নি বরং আরো অনেক হাতাহাতি হয়েছে এবং একাধিক মানুষ মারামারি করেছে এবং অবশ্যই আর্থারকে খুন করা হয়েছে এখানে।'

ত্রিলোক চাটি দিয়ে উঠল, 'এই একই কথা আমরা মনে হইতেছিল।'

'সবাই ছড়িয়ে পড়ো, যতটা সম্ভব সাবধানে, পুরো কামরায় তল্লাশি চালাতে হবে আমাদের। এখানে অবশ্যই কিছু না কিছু পাওয়া যাবে আমার বিশ্বাস।

সোলেমান আর্থারের বাড়ির বাইরে এসেও ফকিরের দেখা পেল না। চারপাশে নজর বুলিয়ে ফকিরকে দেখতে না পেয়ে সে সামান্য অবাক হলেও খুব বেশি গা করল না। ফকিরের কাজ ছিল সবার নজর এড়িয়ে তাদের আর্থারের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া, সেটা সে করেছে। এরপর সে সরে পড়লেও তাকে কিছু বলার নেই। কিন্তু এভাবে কিছু না বলে সরে পড়াটা অস্বাভাবিক লাগছে আরকি। বাড়ির বাইরে এসে সামনের দেউড়ির কাছে দাঁড়াল সে। এমনভাবে দাঁড়িয়েছে তাকে চট করে দেখা যাবে না। কিন্তু সে ঠিকই দেখতে পাবে কেউ সামনে থেকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে চাইল। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে সে কুকুরটার কাঁধে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল। এমনিতে শান্ত কুকুরটা, কিন্তু আজ কেন জানি অস্থির হয়ে আছে সে। এখনো গড়গড় করছে।

সিপাহী

‘আন্তে বেটা আন্তে,’ বলে সোলেমান সামনের দিকে নজর বোলাল।

সে তো আর জানে না দুই পাশ থেকে দুজন মানুষ তার ওপরে নজর রেখেছে এই মুহূর্তে। সোলেমান দক্ষ যোদ্ধা এবং সৈনিক কিন্তু একজন পুরুষ এবং একজন নারী যারা আড়াল থেকে নজর রেখেছে, এই মুহূর্তে তার ওপরে এরা দুজনেই দক্ষ খুনি। কাজেই সোলেমানের টের পাওয়ার কথা নয়, আবার বিশ্বকানিয়া এবং আরোঘী এরা দুজনে পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানে না।

সোলেমান কুকুরটাকে শাস্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে নিজের কোমরে রাখা কাটার ছুরিটার ওপরে একটা হাত রাখল এবং পিঠ থেকে আন্তে করে নামিয়ে আনল নিজের বন্দুকটা। এমন সময় আর রাখটাক না করেই উঁচু হয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুরটা।

এমনিতেই আর্থারের কামরাটার দশা বেহাল হয়ে ছিল, ওরা চারজন মানুষ দুটো মশাল আর আটটা হাত এটাকে প্রায় লুণ্ঠন করে ফেলেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এখানে আসলে কী ঘটেছিল বা আর্থারকে সম্ভাব্য কারা মারতে পারে। অথবা, আর্থারের সঙ্গে ভিক্টরের সংযোগ কী ছিল এবং এরই ভিত্তিতে কীভাবে কী ঘটেছে, সেই সংক্রান্ত কিছুই পায়নি তারা।

আধা ঘণ্টা ধরে তাগুব চালিয়ে চারজনে আবার ফিরে এলো সেই তুকনো রক্তের কাছে। ‘কাজের কাজ তো কিছুই হলো না,’ ঠান্ডার ভেতরেও কর্নেলের কপালে ঘাম। ‘এখন তো মনে হচ্ছে, আর্থারের মৃতদেহটা পরখ করতে পারলেই ভালো হতো অথবা—’ কথা বলতে গিয়েও কর্নেল থেমে গেল, যেখানে তুকনো রক্ত পড়ে ওটার পাশেই যে বইয়ের আলমিরা, ওটার নিচের কাচ একেবারেই ভেঙে চুরচুর, ওটার সামনে ছড়ানো কাচের কারণে ওরা আগে ওদিকে যায়নি, এখন ত্রিলোক সেই কাচগুলো সাবধানে মাড়িয়ে আলমিরাটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল।

‘কিছু পেলো?’ কর্নেল প্রশ্ন করলেও ত্রিলোক কিছু বলল না, সে আরো উবু হয়ে আলমিয়ার নিচ থেকে দু-আঙুলে ধরে বের করে আনল কিছু একটা। কর্নেল খুশি হয়ে দেখল একটা ছোট বইয়ের মতো জিনিস। ‘কর্নেল এটা কি এখানে থাকার কথা?’ প্রশ্নটা করে সে জিনিসটা দিয়ে দিল কর্নেলের হাতে। কর্নেল ওটাকে মেলে ধরে পরখ করেই বলে উঠল, ‘এটা আর্থারের জার্নাল,’ বলে সে ওরটা ভালোভাবে দেখতে দেখতে শিস দিয়ে উঠল। ‘শেষবার লেখার

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

ঠাণ্ডা তার মৃত্যুর আগের দিন এবং এতে পরিষ্কার লেখা তার বন্ধু আসছে দেখা করতে, সে খুশি,' বলেই সে মুখ তুলে তাকাল ত্রিলোকের দিকে।

'নাম না কইলেও বন্ধুটা যে ভিক্টর কোনো সন্দেহ নাই, তাইলে তারে মারল কে?'

'সেইটাই তো কথা, এমনকি—'

ত্রিলোক বুঝতে পারছে কর্নেল কী বলতে চাচ্ছে। এমনকি সন্দেহের তালিকা থেকে ভিক্টরকেও বাদ দেওয়া যায় না। 'তাহলে কি—'

'কর্নেল দেখ তো এইটা,' হঠাৎ পালোয়ানের গলা শুনে তিনজনেই চমকে উঠে, ফিরে তাকাল সেদিকে। 'এইটা পাইলাম এইটার নিচে,' বলে সে নিজের খিরাট হাতের পাল্লায় কিছু একটা দেখাল।

'এইটা তো একটা সিলমোহর?' বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল ত্রিলোক। 'এইটা এইখানে আসবে ক্যামনে, সম্ভব?' ত্রিলোকের চোখ কপালে উঠে গেছে।

'কেন আর্চারের এইখানে কি—'

'কর্নেল, স্যার আপনে জানেন না এইটা কি—'

'কেন, এটা—' কর্নেল কথা শেষ করতে পারল না, তার আগেই পদশব্দ শোনা গেল দরজার বাইরে। পদশব্দ এগিয়ে আনছে ওদের দিকে। চারজনই সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল। প্রত্যেকেই হাত রেখেছে নিজের অস্ত্রের ওপরে।

প্রথম সৈন্যের দলটাকে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তিনজন মানুষের প্রতিক্রিয়া হলো সম্পূর্ণ তিন রকম। তিনজনের ভেতরে একজন নজর রাখছিল রাস্তার ওপরে, মানুষটা আর কেউ না সোলেমান। পালোয়ানের কুকুর বাহাদুর ঘেউ ঘেউ করে উঠতেই সে আড়াল ছেড়ে বাইরে বের হয়েই বুঝতে পারল, তাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে সৈন্যদের একটা দল। সোলেমান নিজে সৈনিক এবং সে দীর্ঘসময় কাজ করেছে সেনাবাহিনীতে, শুধু ইংরেজ সেনাই নয়, ভারতবর্ষের অনেক সেনাবাহিনীর মানুষদেরই সে চেনে, খুব ভালোভাবেই চেনে, যে-কারণে সে দেখেই বুঝতে পারল এটা নিজামের সেনাবাহিনীর লোক। এই শহর এখনো ওদেরই নিয়ন্ত্রণে, কাজেই ওরা শুধু টহলের জন্যেও আসতে পারে, সৈন্যদলটাকে দেখে, সে কুকুরটাকে শান্ত করে আবারো আড়ালে চলে গেল। সৈন্যদলটাকে বাড়ির সামনে দিয়ে পার হয়ে যেতে দেখে বাড়ির নিত্যস ফেলল সে।

সিপাহী

কিন্তু তার এই স্বস্তি স্বল্প সময়ের ভেতরেই গায়েব হয়ে গেল, যখন সৈন্যদের দলের একটা অংশ ফিরে এসে থেমে গেল বাড়িটার সামনে। তখনো সে মনে মনে প্রার্থনা করছে, যাতে দলটা এই বাড়িটার দিকেই এগিয়ে না আসে। কিন্তু তার প্রার্থনা ভুল প্রমাণ করে দলটা এইদিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। আর এভাবে প্রহরায় থাকার কোনো মানে হয় না, আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসে ভেতরের কামরাগুলোর দিকে দৌড় দিল সোলেমান।

সৈন্যদলটাকে বাড়িটার সামনে এসে নামতে দেখে বাকি দুজনার একজনের ড্র কুঁচকে উঠল রাগ, ভয় এবং বিরক্তিতে। আর অন্য মানুষটার মুখে ফুটে উঠল দন্ত বিকৃত হাসি।

পায়ের শব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠলেও দরজা দিয়ে মানুষটাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে কেউই নিজেদের অস্ত্র বের করল না। কারণ দরজা দিয়ে যে প্রবেশ করেছে, সে আর কেউ না সোলেমান, সঙ্গে পালোয়ানের কুকুর।

‘কি ব্যাপার!’ রাগের সঙ্গে বলে উঠল কর্নেল। ‘এভাবে কেউ ভেতরে ঢোকে, পুরো ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।’

‘হজুর সৈনিক,’ দম নিতে নিতে বলে উঠল সোলেমান। ‘একটা দুইটা না একদল সৈনিক বাড়ির বাইরে অবস্থান নিচ্ছে, যেকোনো সময় টুইকা পড়ব বাড়িতে। জলদি পলাইতে হবে।’

‘ওরা এখানে!’ কর্নেলের ড্র কুঁচকে উঠেছে। ‘ওরা টের পেল কীভাবে আমরা এখানে!’

‘হজুর সেইটা ভাইবা আর লাভ নাই, একবার ধরা পড়লে শ্যাম। জলদি জলদি পলাইতে হবে।’

‘মাথা গরম করা যাবে না,’ বলে সে আর্থারের জার্নালটা ঢুকিয়ে রাখল নিজের কোটের পকেটে। ত্রিলোকের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘সিলমোহরটা তুমি রাখো। পালোয়ান, তুমি সবার সামনে যাবে, সৈনিকেরা কোন দিক দিয়ে এসেছে?’

‘হজুর, সামনের—’

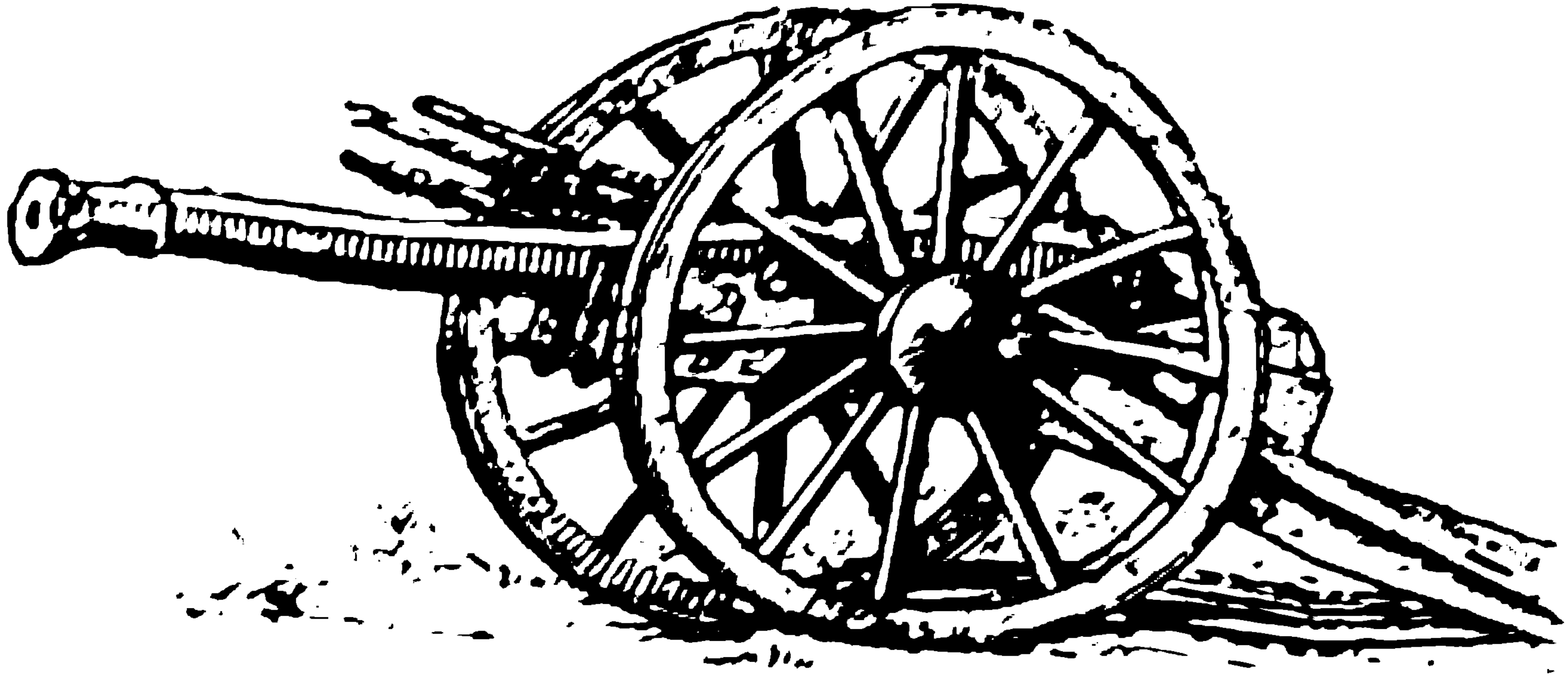
‘আমার পেছন দিয়ে পালাব,’ বলেই কর্নেল পথ দেখাল পালোয়ানকে। ‘সব মশাল নিভিয়ে ফেল। ওরা কামরার বাইরে বের হতেই টের পেল বাড়ির সামনের গেট খুলে যাচ্ছে এবং একদল সৈনিক ভেতরে ঢুকে পড়েছে, সেটা আর বলার

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

অপেক্ষা রাখে না। 'জলদি জলদি,' বলেই ওরা দ্রুত দৌড়ে বের হয়ে এলো বাড়ির পেছনের আঙিনায়। সেখানে বেরিয়েই সবার চোখ কপালে উঠে গেল।

পেছনের দেওয়ালের ওপাশ থেকেও একাধিক মানুষ কথা আর গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

'হজুর ওরা পুরা বাড়ি ঘিরা ফেলছে,' সোলেমান বুঝতে পারল সৈন্যদের দলটা প্রথমে বাড়িটা পার হয়ে গিয়ে আবার কেন ফিরে এসেছিল। ওরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে বাড়িটাকে দুই দিক থেকে ঘেরাও করার জন্যে একদল পেছনে গেছে, আরেকদল সামনে এসেছে। 'হজুর ধরা পইরা গেছি আমরা,' সোলেমানের গলায় চূড়ান্ত হতাশা।



অধ্যায় একাশ্বর বর্তমান সময় ময়মনসিংহ সদর

হতাশা আর রাগে সীতিমতো কাঁপছে বাশার।

নিজের শহরে এভাবে বারবার বোকা বনতে হচ্ছে, ভেবেই নিজের ওপরে রাগ লাগছে বাশারের, কিন্তু কিছু করার নেই। কারণ ডেভিডের জিনিসপত্রের ভেতরে নোটবুকটা পেয়ে এতটাই খুশি হয়ে গিয়েছিল সে, সেই খুশি যে এত দ্রুত দুঃখপ্লে রূপ নেবে ভাবতেও পারেনি। ওদের জিপটা পানা থেকে বের হয়ে আধা মাইলের মতো এগিয়েছে, অরেকটু গেলে বিপিন পার্ক। রাতের কেলো, কলতে গেলে প্রায় কোনো লোকজনই নেই আশপাশে। তিনজনে কথা কলতে কলতে এগোচ্ছে এমন সময় বড় মাইক্রোটা বেরিয়ে এলো অন্ধকারের ভেতর থেকে। ওটা এমনভাবে এসেছে ওরা কোনো প্রতীতি বা প্রতিরোধ তো দূরে থাক এমনকি ঠিকঠাক দেখতেও পায়নি। মাইক্রোটা বেরিয়ে এসে এমনভাবে ওদের জিপ মাঝপথে বাড়ি মারল। ওদের জিপটার মাথা ঘুরে গেল সঙ্গে সঙ্গে, নিয়ন্ত্রণহীন জিপটা সোজা ছুটে গেল বিপিন পার্কের দেওয়ালের দিকে, ওটা দেওয়ালের বাড়ি লেগেই সামনের ছেনে চাকা ঢুকে গিয়ে একপাশে কাত হয়ে উলটাতে উলটাতেও থেমে গেল। জিপের সামনের হুইলের সামনে বসা বাশার হুইলে বাড়ি থেয়ে কপাল কেটে আধা জ্ঞান হারিয়ে ছিন্ন হয়ে গেল, সামিরার অবস্থাও একই, আর চিপ কাত হয়ে যেতেই ওটার পেছন থেকে রাস্তার ওপরে ছিটকে পড়েছে রুলো।

ক্ষণিকের জন্যে বাশার নুখতেই পারল না আসলে হয়েছেটা কি। প্রাথমিক আঘাত এবং শকে ছিন্ন হয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। প্রথমে সে ডাকল অ্যাকসিডেন্ট করেছে সে, কিন্তু আধা সচেতন অবস্থাতেও তার মস্তিষ্ক ধরতে পারল এটা

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

হুজুরিক অ্যাকসিডেন্ট না। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করতেই জিপের কাত হয়ে থাকা খোলা দরজা দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল বাইরে, দেখল সামিরায় প্রাথমিক শক কাটিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করছে। বাশার ড্রেনের চেতরে ওপর দিয়ে ত্রল করে চলে এলো রাস্তার ওপরে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছির হয়ে গেল সে সামনের দৃশ্য দেখে। তিনজন কালো পোশাকধারী, তিনজনেরই একই কালো মুখোশ, একজন একটা বিশাল বাঁকানো ছুরি ধরে রেখেছে ফলাতে বাকী ক্রশোর একেবারে গলার ওপরে।

বাশার হামাগুড়ি অবস্থা থেকে সোজা হতে হতে মাথার দুই পাশে হাত তুলতে তুলতে শান্ত ভঙ্গিতেই বলে উঠল। 'ইজি, ছেলেটার কোনো ক্ষতি করোনা,' বলে সে আশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল দৃশ্য, যদিও ছেলেটা ওকে দেখতে পাচ্ছে কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ চশমা ছাড়া সে প্রায় অন্ধ এবং তার চশমা পড়ে গেছে। 'কি চাও তোমরা?'

ছুরি ধরা পাশের জন ইশারায় রাস্তার ওপরে দেখাল বাশারকে। প্রথমে বাশার ঠিক বুঝতে পারল না কি, পরে ভালোভাবে তাকাতেই দেখতে পেল রাস্তার ওপরে ওরা আর তার মাঝখানে পড়ে আছে ভালো কিছু একটা। বিস্ময়ের সঙ্গে সে অনুভব করল, ওরা নোটবইটা চাচ্ছে। 'এটা চাচ্ছে তোমরা?' নিজের বিস্ময় লুকাতে না পেরে সে বলেই উঠল। ওরা জানত এটা আছে ওদের কাছে।

বাশার নোটবইটা তুলে ওদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'ছেলেটাকে ছাড়া, আমি দিচ্ছি।'

'ওটাকে ছুড়ে দাও এইদিকে, বলেই লোকটা ছুরি দিয়ে চাপ দিল ক্রশোর গলায়, ছেলেটার গলা থেকে রক্তের চিকন ধারা গড়াতে শুরু করেছে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাশার নোটবইটা ছুড়ে দিল ওদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও ক্রশোকে ছুড়ে দিল ওর দিকে। ক্রশো সোজা এসে পড়ল বাশারের গায়ের ওপরে, বাশার সর্বোচ্চ চেষ্টা করল ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরে তাল সামলে ওঠার, কিন্তু ছেলেটাকে ধরতে পারলেও তাল সামলাতে না পেরে দুজনেই ছিটকে পড়ল রাস্তার ওপরে। ক্রশোকে গায়ের ওপর থেকে সরিয়ে উঠে বসতে বসতে বাশার দেখল মাইক্রোটা আবার চলতে শুরু করেছে। ও পিঙ্কল বের করার আগেই জিপের একপাশ থেকে গুলি করল সামিরা। ওর গুলিতে মাইক্রোর নম্বর গ্রেট খুলে পড়লেও ওটা থামল না। বাশারও উঠে দাঁড়িয়ে পিঙ্কল বের করে ফেলেছে কিন্তু সে গুলি করার আগেই ওটা পূর্ণ গতি তুলে হারিয়ে গেল অনেকটা দূরত্বে। বাশার এগিয়ে গিয়ে নম্বর গ্রেটটা তুলে নিল।

সিপাহী

রাগে ওর গা কাঁপছে। এমন এক কেস শুরু হয়েছে কাজের কাজ যা হচ্ছে তার চেয়ে বেশি বারবার ধরা খাচ্ছে, এমন মেজাজ খারাপ করা কেস ওর ক্যারিয়ারে কমই এসেছে।

‘আপনি ওটা দিলেন কেন?’ রুশো প্রায় চিৎকার করে উঠল বাশারকে দেখে। বাশার খুবই অবাক হয়ে ফিরে তাকাল ছেলেটার দিকে। সে ভেবেছিল ছেলেটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাকে ধন্যবাদ জানাবে, উলটো সে রীতিমতো হুংকার করতে করতে বাশারকে দোষ দিচ্ছে। ‘হেই, আরেকটু হলে ওরা তোমার গলা ফাঁক করে দিচ্ছিল,’ বলে সে প্রেটটা এক হাতে সামলে পকেট থেকে রুমাল বের করে ছেলেটার হাতে ধরিয়ে দিল। ‘গলা মোছ, আরেকটু হলে গেছিলে।’

‘গলে যেতাম,’ রুশোর ভেতরে বিন্দুমাত্র ফ্রস্ট নেই গলার রক্ত মোছার। সে চূড়ান্ত হতাশার সঙ্গে একবার রাস্তার দিকে দেখছে, আরেকবার ওদের দিকে দেখতে দেখতে রাস্তার ওপরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ‘ইসস, আপনাদের কোনো ধারণা আছে, কী ছিল ওই নোটবইতে। আপনার-আমার-আমাদের কারো জীবনই ওর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ না,’ বলে সে আফসোসের সঙ্গে দুই হাতে মাথার দুই পাশ চেপে ধরল। ‘ইসস, সব গেল।’

‘এত আফসোস করো না,’ বেঁচে আছে এটার শোকর করো। সামিরা ধমকের সুরে বলে উঠল পেছন থেকে, বাশারের দিকে ফিরে যোগ করল, ‘অ্যালাট জারি করে দেওয়া হয়েছে, বেশি দূরে পালাতে পারার কথা না। কিন্তু কারা এরা? আর এভাবে—’

‘এটা রান করতে বলা,’ বাশার নম্বর প্রেটটা ধরিয়ে দিল সামিরার হাতে। রাগে গা পুড়ে যাচ্ছে তার। ‘যদিও এটাতে কিছু পাওয়ার কথা না, তা-ও। আর তুমি,’ বলে সে রুশোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘আফসোস বাদ দিয়ে ল্যাভে চলো, যা দেখেছিল ডায়েরিতে, সেগুলো নোট করতে হবে,’ বলেই সে ফিরে তাকাল সামিরার দিকে। ‘এরা যারাই হোক, হচ্ছেটা কি, আমি বুঝতে পারছি না। ওরা জানত আমরা ডেভিডের জিনিসপত্র ঘাঁটতে গেছি,’ বলে বাশার বড় করে দম নিল। ওর মনে হচ্ছে ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছে। ‘শোন আমরা যদি বিপদে পড়ে থাকি, জয়ারাও তাহলে অবশ্যই ঝুঁকির ভেতরে আছে। ওদের অ্যালাট করে দিতে হবে,’ বলেই বাশার মোবাইল বের করে ডায়াল করল।

‘কী অবস্থা?’ টকিতে কথা বলতে বলতে সামিরা জানতে চাইল।

‘ধরছে না, কোন বিপদে পড়েছে কে জানে!’

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

যদিও তাদের মুখ বাঁধা কিন্তু জয়া সরকার এমনভাবে মোচড়ামুচড়ি শুরু করল, ওদের সামনে বসে থাকা লোকটা পিঙ্কল বের করে সেটা চেপে ধরল, জয়ার কপালের ওপরে। তাও জয়া সরকার নড়ছে, কিছু বলতে চায় সে। ‘যদিও বাইরে কেউ শুনবে না, তাও যদি চিল্লানোর চেষ্টা করো, তাইলে সোজা গুলি করে দেব। আমগো কাম তুমগোরে জায়গামতো পৌছানি, জ্যাতা না মরা, হেইডা বসে কয় নাই, কাজেই সাবধান।’

জয়া সরকার ছির হয়ে গেছে, লোকটা জয়া সরকারের মুখের বাঁধন খুলে ফেলল। ‘আমাদের নিচ্ছেন কোথায়? আপনারা কারা? এভাবে রাস্তা থেকে উঠিয়ে আনলেন, এরা পুলিশের—’

লোকটা আবার চট করে জয়ার মুখের বাঁধনটা আটকে দিল। ‘এত কথাই কোনো উত্তর নাই। যেইখানে লয়া যাইতেছি সেইখানে গেলে সব কথাই উত্তর পাবা। একদম চুপচাপ বইসা থাকো। বেশি নড়াচড়া করলে, মাতা বাড়ি দিয়া অজ্ঞান কইরা নিয়া যাব, তহন মরতেও পারো,’ বলে লোকটা থেমে গিয়ে ড্রাইভারকে কিছু নির্দেশনা দিল। এত দ্রুত আর এমনভাবে কথাগুলো বলল সে, ওরা কেউই ঠিক বুঝতে পারল না। ‘আরেকটা কথা বলি, তুমি কেডা আমরা জানি, এই পোলায় পুলিশ, এই বুইড়া রিটার্ডার্ড পুলিশ,’ লোকটার মুখে কথাগুলো শুনে ভেতরে ভেতরে তিনজনই ছির হয়ে গেল। এরা এদের পরিচয় জানে, এরমানে জেনেও ওরা কেয়ার করে না।

ঠিক সেই কথাগুলোই বলে উঠল লোকটা। ‘শুনো, যেহেতু তোমরা কারা জানি, এর পরেও নিতাছি ধইরা কাজেই, বুঝতেই আছে, আমরা কেয়ার করি না। কাজেই চুপচাপ চলো, জানে বাঁচবা। নাইলে—’ বলে সে আর কিছু না বলে, অন্যদিকে ফিরে বসল।

জয়া সরকার, কনস্টেবল আবদুল্লাহ এবং রমিজ দারোগা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হতাশার সঙ্গে মাথা নাড়ল। হচ্ছেটা কি, কারা এরা, নিচ্ছে কোথায়, মেরে ফেলবে নাকি, জানা নেই।

‘বস, আপনার কপাল ঠিক আছে?’ টমির প্রশ্ন শুনে বাশার রাগ হবে না খুশি হবে, উত্তর দেবে না ধমক দেবে ঠিক বুঝতে পারল না। আনমনেই সে স্টিয়ারিংয়ের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে কপালের ফুলে ওঠা জায়গাটায় হাত কুলাল। আসলে টমির প্রশ্ন ঠিকই আছে। সব কপালেরই দোষ, আর বাকিটা ওর

সিপাহী

বলদামি এবং অসহায়ত্ব। 'টমি কাজে মন দাও, আপডেট বলো। শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার বহু সময় পাওয়া যাবে পরে।'

'সরি বস, প্রায় কোনো গুড নিউজই নেই, ডার্ক কিছু পাইনি,' বলে টমি কাঁধ ঝাঁকাল। 'মানে এখন অবধি কিছু না। বাকিটা দেখা যাক ওখানে আগামী এক মিনিটের মধ্যেও হিট আসতে পারে, আবার আগামী এক বছরে কিছু নাও আসতে পারে। দুই, জয়া সরকারদের তিনজনেরই কোনো হদিস নেই। ওরা আঠারোবাড়ি যাওয়ার পর থেকে টোটাল গায়েব। আর তোমাদের আক্রমণ করা মাইক্রো চুরি করা। যারা করেছিল ওদেরও কোনো হদিস নেই। সরি বস।'

বাশার মাথা নাড়ল। 'আর রিফাতের জিনিসটা খুঁজে পেয়েছিল যেখানে ওখানকার সার্চ পার্টি কিছু পেয়েছে?' বাশারের বুকের ভেতরটা ধকধক করে উঠল।

'না বস, রাত হওয়াতে ওখানে সার্চ আপাতত বন্ধ আছে, তবে কাল সকাল হতেই আবার সার্চ পার্টি মাঠে নামবে,' বলে টমি নিজেকে শুধরে নিল। 'মানে জঙ্গলে-পাহাড়ে-পানিতে নামবে।'

বাশার আনমনে মাথা নাড়ল। 'যারা আমাদের ওপরে আক্রমণ করেছিল, ওদের ব্যাপারে আমি আপাতত ভাবছি না। কেন ভাবছি না একটু পরে বলছি। টমি তুমি ডেভিডের জিনিসগুলো চেক করো,' বলে সে টেবিলের ওপরে রাখা ছুরি আর ঘড়িটা দেখাল। 'আর তুমি,' বলে ল্যাপটপে সমানে বাটন চাপতে থাকা রুশোর দিকে ফিরে বলে উঠল, 'তুমি ব্রিফ করো, কী দেখেছিলে ডেভিডের ডায়েরিতে, এত উত্তেজিত হয়ে গেলে।'

'বস দুটো মিনিট সময় দেওয়া যাবে, আমি প্রায় রেডি করে ফেলেছি, পাঁচটা মিনিট,' রুশো মিনতির সুরে বলে উঠল।

'তিন মিনিট দিলাম,' বলে বাশার সামিরার পাশে এসে বসে পড়ল। 'তুমি ঠিক আছো?' সে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে জানতে চাইল। পাশের সাইড টেবিল থেকে একটা আই ব্যাগ তুলে কপালে চেপে ধরল।

'আমি ঠিকই আছি। টায়ার্ড বাট এসবে অভ্যাস আছে আমার,' সামিরা বাশারের দিকে ফিরে বলে উঠল। 'আর ইউ ওকে?'

'আর ওকে!,' বাশার আইস ব্যাগটাকে টেবিলের ওপরে ধাম করে রাখতে রাখতে বলে উঠল। 'একটার প একটা ধাপ পার হচ্ছি কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এত করাপটা সিস্টেমের সঙ্গে লড়াই করে কাজ করা খুব মুশকিল। সকালে ধরা খেলাম, শত্রুপক্ষের সমস্ত লোক ছিল ভেতরে, সব জানত। একটু

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

আগে ওখানে ধরা খেলাম, ওরা জানত আমরা কবে কোথায় থাকব। বিশ্রি অবস্থা। রিফাতের কোনো খোঁজ বের করা গেল না এখনো, ওদিকে জয়াদের খোঁজ নেই, চূড়ান্ত হতাশার সঙ্গে মাথা নাড়ল বাশার।

‘কুল ডাউন, স্লো হলেও তো আগাচ্ছি আমরা। আর—’

‘বস, আমি রেডি,’ রুশো বলে উঠতেই, সামিরা আর বাশার দুজনেই ঘুরে বসল তার দিকে। আর টমি তার কাজে বিজি, ওকে বিরক্ত না করে ওরা দুজনেই গুনতে লাগল। ‘বলো।’

‘বস ডেভিডের যে-জার্নালটা ছিল, ওটা তো আমি ডিটেইল পড়তে পারিনি, তবে দুয়েকবার নজর বুলিয়ে কয়েকটা জিনিস বুঝতে পেরেছি। প্রথমত, ওটাতে ডেভিডের কিছু দিনলিপি ছিল, কিছু কাজের আউটলাইন, যেগুলোর কোনটাই আমি ভালোভাবে দেখতে পারিনি,’ বলে সে মাথা নাড়ল এত অল্প সময়ে দেখতে পারার কথাও নয়। আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস ছিল প্রায় ষাট ভাগের মতো শেষ হওয়া জার্নালটাতে, বেশ কিছু কোড ছিল, একটা দুটো না বেশ কিছু। ওগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার ধারণা, তবে ওগুলো আমি ধরতে পারিনি, পারার কথাও ছিল না।’

‘তাহলে তুমি কি দেখেছো, যেটা দেখে তুমি এত উত্তেজিত হয়ে গেলে?’ বাশার ছেলেটার এই লেকচারে আবারো বিরক্ত বোধ করতে শুরু করেছে।

‘এটা,’ বলে রুশো ল্যাপটপের কি চেপে একটা ছবি ফুটিয়ে তুলল স্ক্রিনে। ‘আমি একেবারে সঠিকভাবে ধরতে পারিনি, তবে এরকম একটা কিছু ছিল তার ওখানে।’

‘এটা তো, সেই প্রফেসর হামিদের স্টাডি থেকে পাওয়া সেই পাজলপিসের কপি মনে হচ্ছে,’ সামিরা আনমনে বলে উঠল। ‘সেই সিগনেট রিংগুলো জোড়া লাগিয়ে যেটা বানানো হয়েছিল, ঠিক?’

‘একদম ঠিক,’ রুশো পণ্ডিতের ভঙ্গিতে বলে উঠল। ‘কিন্তু এটাতে আরেকটা জিনিস ছিল,’ বলে সে আরেকবার ল্যাপটপের বাটন চাপতেই পাজল পিসটার গায়ে বেশ কিছু অ্যারো চিহ্ন ফুটে উঠল। মোট ছয়টা চিহ্ন। কোনোটা অ্যারো, মানে সামনে দেখানোর চিহ্ন। আবার কোনোটা টিক চিহ্ন এবং কোনোটা ক্রশ চিহ্ন।

‘মানে কি এর?’ বাশার নিজের মাথাটাকে এগিয়ে নিতে নিতে জানতে চাইল।

সিপাহী

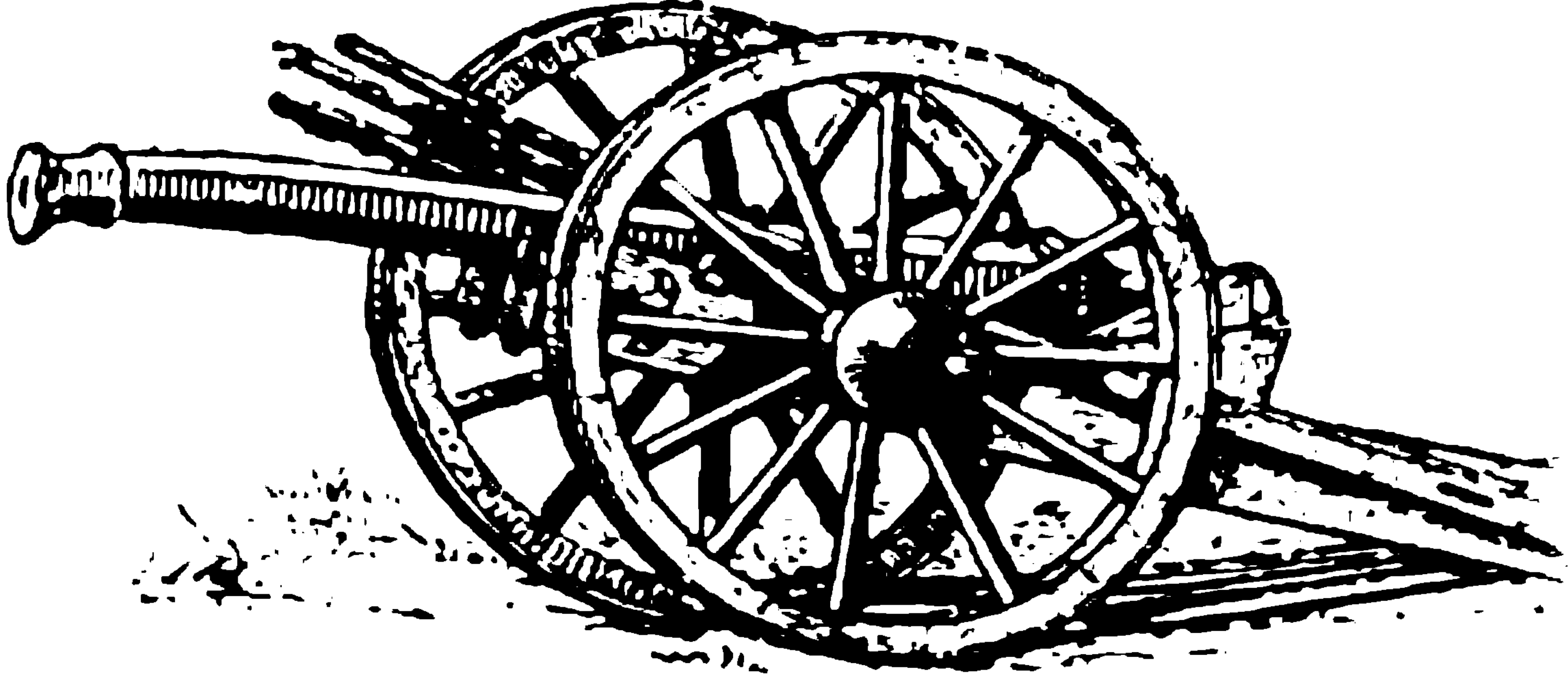
‘ভালোভাবে খেয়াল করে দেখেন, যে সিগনেট রিংটা রিফাত আপার অপহরণকারীরা ফেলে রেখে গেছে আমাদের জন্যে, ওটার ওপরে টিক চিহ্ন দেওয়া। দেখেন বাকি তিনটা রিংয়ের ওপরে অ্যারো চিহ্ন দেওয়া এবং দুটো রিংয়ের ওপরে ক্রশ চিহ্ন দেওয়া।’

‘এর মানে কি?’ বাশার আবারো একই প্রশ্ন করল।

‘ডেভিড আসলে এই দেশে এসেছিল এই রিংগুলো খুঁজে বের করার মিশন নিয়ে। এর ভেতরে সে যেই সংগঠনের হয়ে কাজ করত, ওদের কাছে বা তার কাছে দুটো রিং ছিল, তিনটা রিং সম্ভবত সে আবিষ্কার করেছিল বা সেগুলো কোথায় আছে সেটার কু খুঁজে বের করেছিল। আর বাকি দুটোর হদিস সে বের করতে পারেনি। এর আগেই সে মারা যায়।’

‘যারাই রিফাতকে অপহরণ করেছে এরা আসলে চায় আমরা যেকোনোভাবে এই রিংগুলো আবিষ্কার করে ওদের হাতে তুলে দেই,’ বাশার বলে উঠল আনমনে। তার গায়ে কাটা দিতে শুরু করেছে। ‘আর সেটা করতে হলে ডেভিডের ওই ডায়েরি আমাদের লাগবে।’

‘ইয়ো বস, তোমাদের জন্যে একটা সারপ্রাইজ রয়েছে,’ পাশের টেবিল থেকে টমি বলে উঠল। ‘তোমরা ডেভিডের যে-দুটো জিনিস এনেছো, এর ভেতরে ছুরিটা সাধারণ কিন্তু যে-ঘড়িটা এনেছো, এটা আসলে ঘড়ি স্রেফ ওপরে। এইটার ভেতরে একটা ফলস চেম্বার রয়েছে, ওটার ভেতরে কিছু একটা আছে, জলদি এসো।’



অধ্যায় বাহান্তর

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
হায়দ্রাবাদ, ভারতবর্ষ

এমন দিশেহারা এবং আটকা পড়া পরিস্থিতি কর্নেলের জন্যে মোটেই নতুন নয়। যুদ্ধের ময়দান থেকে শুরু করে, সেনাবাহিনীতে কাজ করতে জীবনে বহুবার এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে তাকে। কিন্তু সময়ের কষাঘাতে সেই ক্ষিপ্ততা আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সবই খানিক দুর্বল হয়ে গেছে কিন্তু হারিয়ে যায়নি মোটেই। কাজেই যখন সে দেখতে পেল বাড়ির সামনে দিয়ে এর মধ্যেই সৈনিকেরা ঢুকে গেছে এবং পেছনেও একই সৈনিকদের গোলযোগ শোনা যাচ্ছে, কর্নেলের জন্যে সে দিশেহারা বোধ করেও শান্ত হয়ে গেল।

‘সবাই শোন,’ বলেই সে নিজের লোকদের দিকে দেখল। পালোয়ানকে দেখে মনে হচ্ছে খাঁচায় বন্দি বাঘ, সোলেমান ছটফট করছে, পিটার বের করে এনেছে নিজের অস্ত্র আর ত্রিলোক তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। তাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে সে পুরোপুরি নির্ভর করে আছে কর্নেলের ওপরে। ‘সোলেমান তুমি ফরিকরকে সামনে দিয়ে বের হতে দেখেছো?’ সোলেমান মাথা নেড়ে মানা করল। ‘আমার ধারণা সে পেছন দিয়েও বের হয়নি, কারণ তাতে সে ঝুঁকিয়ে পড়ত। এর মানে এই আঙিনাতেই কোথাও বের হওয়ার মতো আরেকটা রাস্তা আছে। পিটার, সোলেমান তোমরা সেটা খুঁজে বের করো, যাও যাও,’ বলেই সে বাড়ির দিকে দেখল সৈনিকেরা বাড়িতে তো প্রবেশ করে খুঁজতে শুরু করেছে ওদের, অল্প সময়ের ভেতরেই ওরা টের পেয়ে যাবে—ওরা বাড়ির ভেতরে নয়, বরং আঙিনাতে অবস্থান করছেন।

‘পালোয়ান, ওই কাপড়ের আর শুকনো ডাল-পাতার ছুপ বাড়ির দিকে ছড়িয়ে দাও,’ বলেই সে ত্রিলোকের দুই হাতে থাকা দুটো মেশিনের একটা নিয়ে

সিপাহী

নিল নিজের হাতে। ‘পালোয়ানের ওগুলো ছড়ানো শেষ হতেই আমরা আগুন ধরিয়ে দেব, এতে খানিক সময় পাওয়া যাবে। পালোয়ান তার বিরাট লাঠিটা দিয়ে বাড়ির আঙিনায় থাকা পাতা আর কাঠের স্তূপটাকে ছাড়াতে শুরু করল বাড়ির দরজার কাছটায়।

‘জলদি জলদি,’ ভেতর বাড়ির সৈনিকদের হটগোল এগিয়ে আসছে, সৈনিকেরা বারান্দায় বেরোতে শুরু করল, পালোয়ানকে দেখে বন্দুক তুলল দুয়েকজন, কর্নেল আর ত্রিলোক হাতে থাকা মশাল ছুড়ে দিল সেদিকে, শুকনো পাতায় আগুন ধরতে শুরু করল স্রোতের বেগে আগুনের উত্তাপে বন্দুক তোলা সৈনিকেরা বন্দুক নামিয়ে পিছিয়ে গেল খানিক। ‘পালাও পালাও,’ বলে কর্নেল নিজের পিস্তল বের করে ফাঁকা গুলি করল আতঙ্ক ছড়ানোর জন্যে। এরপর নিজে দৌড় দিল আঙিনার দিকে।

‘কর্নেল এই দিকে,’ ত্রিলোক আর পালোয়ান আগেই এগিয়ে গেছে যদিও থেকে সোলেমানরা ডাকছে ওদের। সবার শেষে এল কর্নেল। আঙিনার মোটা দেওয়ালের গায়ে ছোট্ট একটা ফোকর, সেটা দিয়ে একে একে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে ওরা। কর্নেলও মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে ফোকরের ভেতর দিয়ে শরীর গলিয়ে বেরিয়ে এলো বাড়ির পাশের গলিতে। এই দিকটাতে এখনো সৈনিকেরা আসেনি। ওরা গলিতে বেরিয়ে দৌড়াতে শুরু করল অন্ধের মতো।

আরেকটু হলে অন্যপাশের সৈনিকদের গায়ের ওপরে গিয়ে পড়ত। সৈনিকেরা ওদের দেখে হইহই করে উঠল। কর্নেল উলটো ঘুরে দৌড়াতে শুরু করে। এ-গলি ও-গলি পার হয়ে মূল রাস্তার কাছে চলে এসেছে প্রায়, পুরো রাস্তা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সৈনিকেরা। ‘উলটো, উলটো দিকে,’ কেউ একজন চিৎকার করে উঠল। আবারো ওরা ঢুকে পড়ল অন্যপাশের গলিতে। সামনে-পেছনে দুই দিক থেকেই সৈনিকদের এগিয়ে আসার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মাঝখানে আটকা পড়েছে ওরা।

‘এখন কি করব আমরা?’

‘লড়াই,’ বলে মাথার ওপরে লাঠিটাকে দুইবার ঘোরাল পালোয়ান। তার লাঠি ঘোরানো দেখে তার কুকুর লাফাতে লাগল।

‘না, আমরা এখনো পালানোর চেষ্টা করব,’ বলে কর্নেল দুই পাশে দেখল। ‘আমরা এরপরে ওপারে চেষ্টা করব তারপর না হলে প্রয়োজনে লড়াই হবে,’ আবারো একপাশের গলিতে সৈনিকের মাথা দেখা যেতেই সে চিৎকার করে উঠল। ‘পালাও পালাও।’

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

একে অপরের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে ওরা আরো দূর এক গলিতে এসে পড়ল। আর পালানোর পথ নেই। 'এবার মনে হচ্ছে—' সরু গলির ভেতরে নিকোনো একটা জায়গায় এসে আটকে গেছে ওরা। দুই পাশে দেওয়াল আর একপাশে একটা লোহার দরজা। 'আমরা আর—'

'আপনারা এইদিক দিয়ে আসেন,' কারো গলার আওয়াজ শুনে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল তিনমাথার এক মাথা থাকা দরজাটা খুলে গেছে। ওখানে দরজা আছে কেউই ভালোভাবে খেয়ালই করেনি। খুলে যেতে খানিক অবাকই হলো ওরা, দরজার ভেতরে দাঁড়ানো সেই ছায়ামূর্তি আবারো তাড়া দিল ওদের। 'জলদি, জলদি আসেন,' বলেই সে গলির মাথায় দেখাল, 'একবার ওরা চইলা এলে আর পালানো যাবে না।'

দলের সবাই তাকিয়ে আছে কর্নেলের দিকে। কর্নেল কোনো দ্বিধা ছাড়াই সবাইকে দরজার ভেতরে ঢুকে যাওয়ার নির্দেশ দিল। 'সময় নেই, জলদি,' বলেই সে গলির মাথায় প্রথম সৈন্যদলটাকে দেখতে পেল। 'চলে এসেছে ওরা,' শান্ত গলায় বলে উঠল কর্নেল। তার দলের লোকেরা একে একে দরজাটা দিয়ে ঢুকছে, আর দুজন বাকি, কর্নেল হিসেব করে দেখল, সৈন্যদের আসতে আর বিশ গজের মতো বাকি, একটানে খাপ থেকে নিজের পিস্তল বের করে আনল কর্নেল। গুলি করার ইচ্ছে নেই তার। কারণ গুলি করলে বা সৈন্যদের মারলে ওরা আরো বেশি হিংস্র হয়ে উঠবে। কিন্তু নিরুপায় হলে আর কোনো পথ খোলা না থাকলে, কিছু করার থাকবে না। সৈন্যরা প্রায় চলে এসেছে, কর্নেলের দলের শেষ লোকটাও ঢুকে গেছে, কর্নেল পিস্তল তুলল, প্রথমে থাকা সৈন্যটা খানিক থমকে গেল, তার পেছনে বাড়ি খেল পেছনের সৈনিকেরা, ওরা একটু এলোমেলো হয়ে গেছে, কর্নেল ভেতরে ঢুকে একটানে লাগিয়ে দিল লোহার দরজাটা।

কর্নেল ফিরে দেখল সেই ছায়ামূর্তিটা সবার আগে দৌড়াচ্ছে, তার পেছনে তার লোকেরা। কর্নেল পিস্তল খাপে রেখে দৌড়াতে শুরু করল, পেছনে লোহার ফটকে ধুমধাম শব্দ হচ্ছে। দৌড়াতে দৌড়াতে কর্নেল অবলোকন করল ওরা একটা গুদাম এলাকার মতো জায়গায় প্রবেশ করেছে, ওদের সামনে আধো অন্ধকারের ভেতরে বেশ কয়েকটা বড় বড় গুদামঘর। 'আমরা যাচ্ছি কই?' কর্নেল প্রাণপণে দৌড়াতে দৌড়াতে চিৎকার করে জানতে চাইল। কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিল না, সামনের ছায়ামূর্তিটা শুধু ইশারায় সামনে দেখাল। পেছনে ধুমধাম শব্দ আরো বেড়েছে। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে যেকোনো সময়ে ভেঙে পড়বে গেটটা। 'জলদি দৌড়ান সবাই,' সামনের মূর্তিটা চোঁচিয়ে উঠল।

সিপাহী

সবাই প্রাণপণে দৌড়াতে দৌড়াতে গুদামঘরগুলোর কিনারায় পৌঁছে গেল, পেছনের শব্দ শুনে মনে হলো লোহার যে-ফটকটা দিয়ে তারা প্রবেশ করেছে, সেটা ভেঙে পড়েছে। সৈনিকদের হট্টগোলও শোনা যাচ্ছে। ওরা প্রায় সরে এসেছে গুদামের কোনার দিকে। ফটক দিয়ে প্রবেশ করা সৈনিকদের চোখে পড়ার কথা না, ওরা গুদামের কোনার দিকে প্রবেশ করে দেওয়াল আর গুদামঘরগুলোর ফাঁক দিয়ে দৌড়ে চলেছে। ‘জলদি জলদি, এইদিক দিয়ে আসেন, সামনেই গুদামঘরগুলোর পেছনের দেওয়ালের কাছে একটা বড় ফোকর দেখতে পেল কর্নেল, সে ভাবল সামনের মূর্তিটা ওদের ওই দিক দিয়ে বের করে নিয়ে যাবেন, কিন্তু সেটা না করে সে ওটা পার হয়ে সামনে চলে গেল, তারপর ধেমে গিয়ে আবার ফিরে এলো ফোকরটার কাছে, ক্ষণিকের জন্যে কর্নেলের কাছে এসে তার মাথা থেকে টান দিয়ে খুলে নিল টুপিটা। কর্নেল খুবই অবাক হয়ে মানুষটার কার্যক্রম দেখছে। করছে কী লোকটা।

মানুষটা তার টুপিটা সেই ফোকর দিয়ে ছুড়ে দিয়ে আবারো আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে সামনে বামে ঘুরে গেল। কর্নেল তখনো নিজের অবাক ভাব পুরোপুরি কাটাতে পারেনি, সে অবাক হয়ে নিজের লোকদের অনুসরণ করতে বলল। বামে বাঁক নিয়েই ওরা দেখল, সামনে বড় বড় পিপে সাজানো, মূর্তিটা ওদের সেই পিপেগুলোর দিকে দেখিয়ে নিজে একটা বড় পিপের গায়ে লাগানো মই বেয়ে উঠতে লাগল, ওপরে উঠে একটা পিপের মুখ খুলে শরীরটাকে বাঁকিয়ে ঢুকে পড়ল ওটার ভেতরে। এবার কর্নেল বুঝতে পারল মানুষটা আসলে কী করেছে। সে তার টুপি ওই ফোকরের ওপাশে ছুড়ে দিয়েছে সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের ধোঁকা দেওয়ার জন্যে। যাতে ওরা এইদিকে না এসে ওই ফোকর দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর ওরা লুকিয়ে থাকবে পিপেগুলোর ভেতরে।

কর্নেল নিজের লোকদের ইশারা করল মূর্তিটাকে অনুসরণ করার জন্যে। নিজেও বেয়ে উঠতে লাগল একটা মই। মই পেয়ে বিরাট পিপেটার ওপরে উঠে দেখল ওটার মুখের কাছে একটা ডালার মতো, গায়ের জোরে টান দিয়ে খোলার চেষ্টা করলেও খুলতে পারল না সে, এগিয়ে আসা সৈন্যদের হট্টগোল বাড়ছে। কর্নেলের পাশ থেকে উঠে এসেছে সোলেমান। সে আর সোলেমান মিলে ডালাটা ধরে প্রাণপণে টান দিই ওটা উছে এলো, আঠালো কিছু একটা আটকে রেখেছিল ওটাকে, ডালাটা খুলেই কর্নেল প্রথমে নিজের শরীরটাকে টেনে তুলে আনল পিপের ভেতরে, এরপরে সে নেমে গেল পিপের ভেতরে। তাকে অনুসরণ করল সোলেমান। শুধু ডালাই নয়, পিপের ভেতরেও সেই আঠালো গন্ধযুক্ত

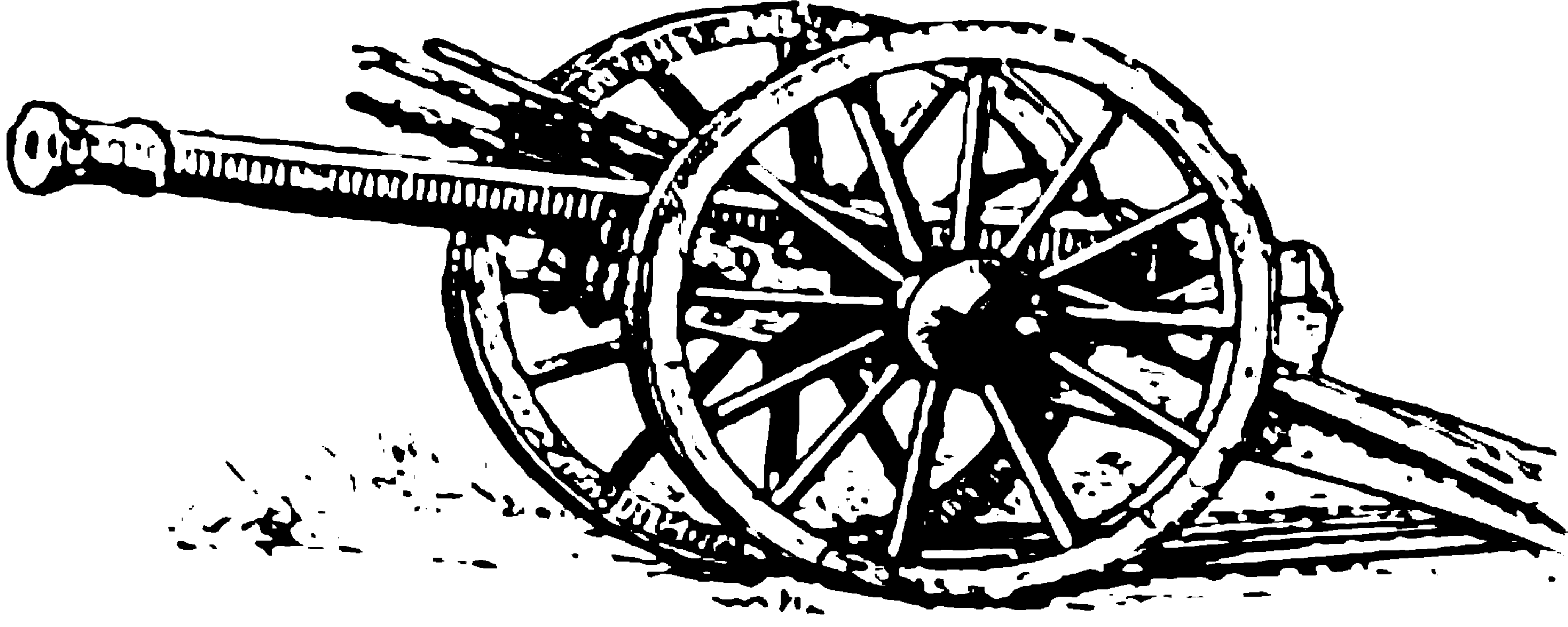
তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

পদার্থে সমস্ত শরীর আঠায় মাখামাখি হয়ে গেল ওদের। ওপরের ডালাটা আটকে দিতেই নিখাদ কবরের অন্ধকারে ঢেকে গেল পুরো পিপের ভেতরটা। গায়ে গা লাগিয়ে কর্নেল এবং সোলেমান বসে রইল পিপের ভেতরে। সোলেমান কেমন জ্বনি ছটফট করছে, কর্নেল নিজের সঙ্গে চেপে ধরে রইল তাকে। বাইরে পদশব্দ এবং হট্টগোল বাড়ছে, তবে আপাতত ওদের কিছু করার নেই। অপেক্ষা আর প্রার্থনা করা ছাড়া।

অন্ধকারে গা মিলিয়ে বাড়িঘরের ওপরে অবস্থান করা মানুষটা পুরো ঘটনাটা অবলোকন করল অনেকটা বাজারে দেখা পথ নাটকের মতো। যেখানে তার ভূমিকা স্রেফ দর্শক ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমে যখন সৈন্যদের আসতে দেখল, তখন সে সচকিত হয়ে উঠেছিল, তার নিয়ত ছিল বাড়ির ভেতরে থাকা দলটাকে সাবধান করে দেওয়া।

কিন্তু সেটা করার আগেই তারা বাড়ির পেছন দিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং পালাতে শুরু করে, এরপরে সে যখন তাদের সাহায্য করার জন্যে প্রায় পৌঁছে গেছে—এমন সময় সে যা দেখে সেটা আরো অবিস্মরণীয়। আরেকজন মানুষ তাদের সাহায্য করতে এলে—হচ্ছেটা কি বুঝতে না পেরে সে সিদ্ধান্ত নেয় প্রথমে নিজে নিরাপদে থাকবে এবং সুযোগ হলে তাদের সাহায্য করবে, আর সেটা করতে না পারলে আপাতত সে স্রেফ অবলোকন করে যাবে কী হচ্ছে। এ ছাড়া আসলে খুব বেশি কিছু করার নেই তারও। কর্নেলদের দলটাকে পিপের ভেতরে ঢুকে যেতে দেখে সে দম ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। অন্ধকারের ভেতরে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছে। যে-বিপদের সম্ভাবনা কর্নেলদের রয়েছে, সেই একই বিপদের সম্ভাবনা তারও রয়েছে। কাজেই এখন অপেক্ষা আর প্রার্থনা করা ছাড়া আসলে আর কিছু করার নেই। যদি টিকে যায় তাহলে কাজে নামতে পারবে, আর সেটা না হলে সবই শেষ।

চারপাশে ছড়িয়ে পড়া সৈনিকদের অবগাহন টের পাচ্ছে সে। ধীরে ধীরে সেটার সংখ্যা এবং পরিমাণ বাড়ছে।



অধ্যায় তিয়াত্তর

বর্তমান সময়

অজানা কোনো এক জায়গা, ময়মনসিংহের আশপাশে

কোথায় আছে সেটা ধরতে না পারলেও তারা এখনো ময়মনসিংহের আশপাশেই আছে, সেই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই জয়া সরকারের। তাদের অপহরণের সময় মুখ বেঁধে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু সে কচর-মচর করার পর তাদের ভেতরে যখন কথোপকথন হয় এরপরে ওরা আর মুখ বাঁধেনি। আসলে যে-খুঁট তাদের দিয়েছে, সেটা দেওয়ার পর আর মুখ বাঁধার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে আরেকটু এগোনোর পর তাদের চোখ বেঁধে ফেলা হয়েছে। জয়া সরকার মনে মনে হিসেব করেছে তারা রওনা দিয়েছে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ মিনিটের মতো হয়েছে, আর ওদের চোখ বেঁধে ফেলা হয়েছে আরো পনেরো কি বিশ মিনিটের মতো সময় আগে। তার হিসেব যদি ভুলও হয়, তাহলেও অন্তত চল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বে রয়েছে তারা। মানে একভাবে কলতে গেলে ওরা এখনো ময়মনসিংহের চৌহদ্দির ভেতরেই রয়েছে।

এই দূরত্বে এলে যেকোনো দিকে যেতে পারে তারা, ত্রিশাল, ভালুকা, ফুলবাড়িয়া, নেত্রকোনা, যেকোনো ডিরেকশনে যেতে পারে। কাজেই কোনদিকে যাচ্ছে সেটা সঠিকভাবে কলা সম্ভব নয়। 'রমিজ ডাই, আবদুল্লাহ তোমরা ঠিক আছো?' এই মানুষ দুজনকে সে-ই এই ঝামেলার ভেতরে এনে ফেলেছে। নিজের ওপরে খানিক বিরক্ত এবং রাগ হচ্ছে তার নিজের। এরকম বোকার মতো ঘটতে শুরু করবে সব, এটা সে ভাবতে পারেনি।

‘আর কি ঠিক থাকব—’

‘একটা পান খাইতে পারলে ভালো লাগত,’ এই বিপদের সময়ের রমিজ দারোগার কথা শুনে হাসি পেল জয়ার।

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

‘এই চুপ, কোনো কথা নাই,’ সেই লোকটা ধমকে উঠল। ‘প্রায় চলে আসছি আমরা। কেউ কোনো কথা বললে গুলি করে দেব, অন্তত শক্ত একটা ঠুঁকা মারব, বলে দিলাম,’ ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষায় মাথা টোকা মারাকে ঠুঁকা বলে। তিনজনের তিনজনই চুপ রইল, এতক্ষণে এটা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে এরা যা বলছে সেটাই করে দেখাবে প্রয়োজন হলে। চুপচাপ বসে রইল তিনজনই। আরো মিনিট দশ চলার পর গাড়িটা এসে থেমে গেল কোথাও। একটু পরেই গড়গড় করে শব্দ হতে লাগল, জয়া সরকার অনুমান করল এটা গেট খোলার বা গ্যারেজের শাটার খোলার শব্দ। গাড়িটা আবার একটু এগিয়েই আবার থেমে গেল। খুলে গেল গাড়ির দরজা, ওদের ধরে নামিয়ে দেয়া হলো, খুলে ফেলা হলো মুখের ওপরের আবরণ। তীব্র আলোতে চোখ বন্ধ করে ফেলল তিনজনেই।

‘এইদিকে আসো, তিনজনেরই হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো তারপর পথ দেখানো হলো কোনদিকে এগোতে হবে। জয়া সরকার, কনস্টেবল আবদুল্লাহ এবং রমিজ দারোগা এগোল নির্দেশিত পথে। গ্যারেজ থেকে বের হয়ে তারা একটা বেশ বড় বাড়ির পেছনের দিকে ঢুকল, সেখান থেকে একটা করিডর ধরে তাদের নিয়ে আসা হলো বেশ অভিজাত একটা ড্রইংরুমে। তিনজনকে সোফায় বসার নির্দেশ দেওয়া হলো। ওরা বসে পড়তেই সেই লোকটা অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে রইল ওদের ঠিক মাথার কাছে।

ওরা চুপচাপ বসে আছে, কেউই কথা বলছে না। একটু আগের খেঁট সবার মনের ভেতরে তখনো তাজা। তিনজনেই বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে জয়া সরকার কিছু একটা বলতে যাবে, তার আগেই ড্রইংরুমের পর্দা সরে গেল, ভেতরে প্রবেশ করল দুজন মানুষ। ‘হ্যালো জয়া, নাকি আমার কলা উচিত বিজয়?’

হুইলচেয়ারে বসা আলী আজগরের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে চোয়াল খুলে গেল জয়া সরকারের। ‘আপনার এ-অবস্থা হলো কী করে?’ নিজের অবস্থার খবর নেই, কিন্তু আলী আজগরের মতো একজন মানুষের অবস্থা দেখে চমকে উঠেছে জয়া সরকার।

‘জিনিসটা কি আসলে?’ খুলে রাখা ঘড়িটার দিকে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে রয়েছে বাশার।

‘প্রথমত, এখানে যে অংশটা দেখছো, এটা হলো একটা ফ্লস চেয়ার,’ বলে সে ঘড়িটা তুলে দেখাল। ‘এ-ধরনের ঘড়িকে বলে স্পাই ওয়াচ, অনেকটা

সিপাহী

জেমস বন্ডের কিউ সেকশনের স্পেশাল গেজেটের মতো। একটা সময় ছিল, বিশেষ করে কোন্ড ওয়ারের যুগে এ-ধরনের ডিভাইস বা গেজেট খুব ব্যবহার করা হতো। কিন্তু বর্তমানে এসবের ব্যবহার অনেকটাই কমে গেছে। তা-ও একেবারে যে নেই তা নয়,' বলে সে আবারো ঘড়িটা নাড়িয়ে দেখাল। 'এই ডিভাইসটা ডেভিড সম্ভবত ব্যবহার করত তার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস লুকিয়ে রাখার জন্যে—'

'সেটা কি?' রুশো জানতে চাইল।

'জিনিসটা হলো এটা,' টমি তার দুই আঙুলের ফাঁকে ধরা ছোট্ট একটা জিনিস দেখাল। 'একটা মাইক্রোচিপ, এই মাইক্রো চিপটা একই সঙ্গে একটা ডেটা ব্যাংক এবং আরো অনেককিছু।'

'যেমন?' বাশার জানতে চাইল। আমার বিশ্বাস এই চিপটা একই সঙ্গে কিছু একটার ইলেকট্রনিক ট্র্যাকারও।'

'সেটা কীভাবে বুঝতে পারলে?' সামিরা জানতে চাইল।

'কারণ এটাতে এক ধরনের লোকেশন ডিভাইস বসানো আছে, অনেকটা জিপিএসের পূর্বপুরুষের মতো জিনিসটা,' টমি একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস তুলে ধরে মনোযোগের সঙ্গে দেখছে।'

'তার মানে এটা কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু?' আবারো বাশারের প্রশ্ন।

'তা তো বটেই,' সে এখনো মাইক্রোচিপটা নাড়াচাড়া করছে। 'আমার বিলিভ এইটা সেই একই চিপের আদলে গড়া, যেটা ডক্টর আবদেলের ওখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। ওটাও এই ধরনের কিন্তু আরেকটু আপডেটেড এবং আরেকটু গভীর ধরনের জিনিস।'

'তোমার কাছে কেন মনে হলো এই ডিভাইস এবং ডক্টর আবদেলেরটা একই ক্যাটাগরির?'

'কারণ দুটোই একই প্রক্রিয়ায় এনক্রিপটেড,' বলে সে ল্যাপটপের বাটন চেপে কোড়ের মতো কিছু জিনিস ওপেন করে দেখাল। 'দেখো এটা এবং এই চিপ দুটোকেই রিড করতে গেলে একই ধরনের এনক্রিপশন দেখাচ্ছে এবং দুটো এক ধরনের হলেও দুটোর একটাও প্রচলিত ধরনের এনক্রিপশন নয়।'

'আচ্ছা, প্রফেসর ইফতেখার যে একটা কোড বলেছিল সেটা এখানে বসিয়ে কিছু বের করা যায় না?'

'আমি এর মধ্যেই সেটা করেছি,' বলে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল টমি। 'ওটাতে কিছুই হয়নি,' বলে সে ভাবতে লাগল। 'এক মিনিট। আমাদের কাছে প্রফেসর হামিদের কাছ থেকে পাওয়া আরেকটা কোড আছে—ওটা বসিয়ে

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

দেখতে পারি,' বলে সে ওই কোডটা বের করে রান করে দেখাল। 'নাহ কাজ হচ্ছে না, এই কোডটা এমনকি পুরোপুরি ফিটও হয়নি।'

'এক কাজ করো, প্রফেসর ইফতেখারের দেওয়া কোড এবং প্রফেসর হামিদের ওখানে পাওয়া কোড, দুটোকে এক করে রান করে দেখো,' বাশার বলে উঠল। 'ওকে ইউ আর দ্য বস,' বলে টমি দুটোকে একসঙ্গে রান দিল মাইক্রোচিপের এনক্রিপশন ভাঙার জন্যে। 'ওয়াও ওয়াও, বস কাজ হচ্ছে কাজ হচ্ছে,' রীতিমতো চিৎকার করে উঠল টমি।

জয়ার প্রশ্ন শুনে সামান্য হাসলেও ওদের দিকে তাকিয়ে বিরক্তির ভঙ্গিতে মুখ কুঁচকে ফেলল আলী আজগর। ঙ্গ কুঁচকে ফিরে তাকাল সে নিজের পাহারাদার, কাম বডি গার্ড লোকটার দিকে। 'তোমাকে না বলেছি ওদের ভালোভাবে নিয়ে আসবে, এভাবে হাতকড়া পরিয়ে রেখেছো কেন?' আলী আজগরের কটুস্তি শুনে সঙ্গে সঙ্গে লোকটা এগিয়ে এসে হাতের চাবি দিয়ে তিনজনেরই হাতকড়া খুলে দিল। হাত ডলতে ডলতে জয়া সরকার বলে উঠল, 'ও আমাদের বলেছে, তার ওপরে নাকি নির্দেশনা আছে, আমরা উলটা-পালটা করলে গুলি করে ফেলে দেওয়ার।'

জয়ার কথা শুনে চূড়ান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লোকটার দিকে তাকিয়ে প্রায় ধমকে উঠল আলী আজগর। 'আসলেই?' দাড়িওয়ালা পাহারাদার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'যাও ওদের জন্যে চা-কফি দিতে, বলো, আর আমার জন্যে মিন টি দিতে বলো,' বলে সে তার হুইলচেয়ার ধরে রাখা লোকটাকে ধরতে মানা করে সে নিজেই বাটন চেপে হুইলচেয়ারটাকে সোফার কাছে নিয়ে হুইলচেয়ার থেকে সোফায় বসল। ওরা দেখে বুঝল লোকটা নিয়মিতই এভাবে বসে, যে-কারণে ব্যবস্থা করাই আছে। নিজে নিজে বসতেও খুব বেশি সমস্যাও হলো না তার।

'আপনার এ-অবস্থা হলো কি করে, আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল খুব বেশি সময় আগে নয়, এত অল্প সময়ের ভেতরে একটা মানুষ এতটা বদলে যায় কীভাবে?' জয়া সরকারের গলায় নিখাদ বিস্ময় এবং সেটা লুকানোরও কোনো চেষ্টা নেই তার ভেতর।

'তুমিও তো বেশ বদলে গেছো,' মৃদু হেসে বলে উঠল আলী আজগর।

'তার পরও, আপনার এমনটা হলো কীভাবে?' জয়া জানতে চাইল।

'নিজের কর্মদোষে,' আলী আজগরের গলায় নিজের ওপরে বিরক্তি। 'বলতে

সিপাঠী

পারো অতি লোভেও। আমি বেশ কিছু ভুল করেছিলাম, যেই ভুলের মাত্রা গুনছি এখন।’

‘মানে?’

‘মানে,’ এই যে সিকিউরিটি ইত্যাদি দেখলো এগুলো আসলে আমার প্রেফ বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। বিগত বেশ কিছুদিনে একাধিকবার আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে এবং অনেক দূর সফলও হয়েছে ওরা। আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছে, আলী আজগরের গলায় দুঃখ।

জয়া সরকারের মনে পড়ে গেল বিশালদেহী, শক্তিশালী দুর্দান্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আলী আজগরের কথা, যে-মানুষটাকে সবসময় নিজের ছায়াছাড়া জীবনের সবচেয়ে বড় খুঁটি মনে করত জয়া, যে-মানুষটা ছিল তার সবচেয়ে বড় শক্তির উৎস, সেই মানুষটার এমন ভঙ্গুর দশা মন তো বটেই এমনকি ওর চোখের জন্যে পীড়াদায়ক।

জয়া সরকার বড় করে দম নিল। ‘স্যার, এভাবে কথা বলে হবে না, আমি সম্প্রতি আপনার পুরনো একটা ছবি দেখেছি, ওখানে আমি দেখেছি আপনি এমন কিছু মানুষের সঙ্গে ছিলেন, যাদের আপনার চেনার কোনো কারণ নেই। এটা কীভাবে সম্ভব যে, আপনি এমনকিছু মানুষের সঙ্গে রয়েছেন, যাদের সঙ্গে আপনার থাকার কথা নয়, আপনার পরিচয় থাকার কথা নয়। কারণ আপনি আমাকে চেনেন সেই ছোটবেলা থেকে, আর এদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে অনেক পরে। কীভাবে সম্ভব।’

‘জয়া, আমি দুঃখিত,’ আলী আজগরের চেহারা। ‘তোমার নানা সময়ে উপকার করলেও আমি আসলে তোমাকে নানাভাবে ব্যবহারও করেছি,’ বলে সে সরাসরি তাকাল জয়ার দিকে, ‘তবে এবার সময় এসেছে তোমাকে সব জানানোর। পুরোটা আমিও জানি না। তবে যতটুকু জানি আমি তোমাকে জানাব।’

‘কি পাওয়া গেল?’ বাশার প্রায় ধমকে উঠল টমিকে।

কিন্তু টমির তেমন কোনো ফ্রস্ট্রেশন নেই। সে একমনে কাজ করে চলেছে। ‘সরি বস তোমাকে এবং তোমাদের খানিক বিরক্ত করব আমি। তবে, আমাকে আগে বোঝাতে হবে তোমাদের জিনিসটা,’ বলে সে খানিক দাঁত বের করে বাশার আর অন্যদের দিকে তাকাল। তাকে দেখে মোটেও দুঃখিত বলে মনে হচ্ছে না। ‘আমি যা ভেবেছিলাম জিনিসটা ঠিক তাই। এটা দুই ভাগে বিভক্ত,

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

একটা ভাগে বেশ কিছু ডেটা আছে, যেটা এখনো আমি ব্রেক করতে পারিনি। আর অন্যভাগটা একটা কাইন্ড অব জিপিএস টাইপের জিনিস, যেটাতে একটা লোকেশন স্ট্যাটিকভাবে ফিক্স করা রয়েছে, এই ডিভাইসটা কীভাবে কাজ করি আমি—’

টমি, তুই কি চাস তোকে আমি গুলি করে তথ্য আদায় করি, যদি না চাস, তাহলে এসব বাদ দিয়ে তুই আমাদের সরাসরি জানা তুই আসলে কি পেয়েছিস?’

‘আরে তোমরাই তো বলতেই দিচ্ছে না, আমি মূল দুটো জিনিস পেয়েছি। পুরো চিপটার এনক্রিপশন এখনো ভাঙতে পারিনি কিন্তু এটার যে-অংশটা ডিবাংক করা গেছে, সেখান থেকে আরো দুটো জিনিস পাওয়া গেছে। প্রথমটাতে একটা নম্বর,’ বাশার আবার গুড়িয়ে উঠতে যাচ্ছিল, এই নম্বর আর সিম্বলের খেলা তার আর মোটেই ভালো লাগছে না। সে পুলিশ, তার হলো ইনভেস্টিগেশন আর অ্যাকশনে কাজ। এসব তামাশা তার পছন্দ নয় মোটেও।

‘শান্ত হও বস, এইবার আমি জানি এই নম্বরটা কিসের?’

কেউ প্রশ্ন করল না তাকে, সবাই তাকিয়ে রয়েছে।

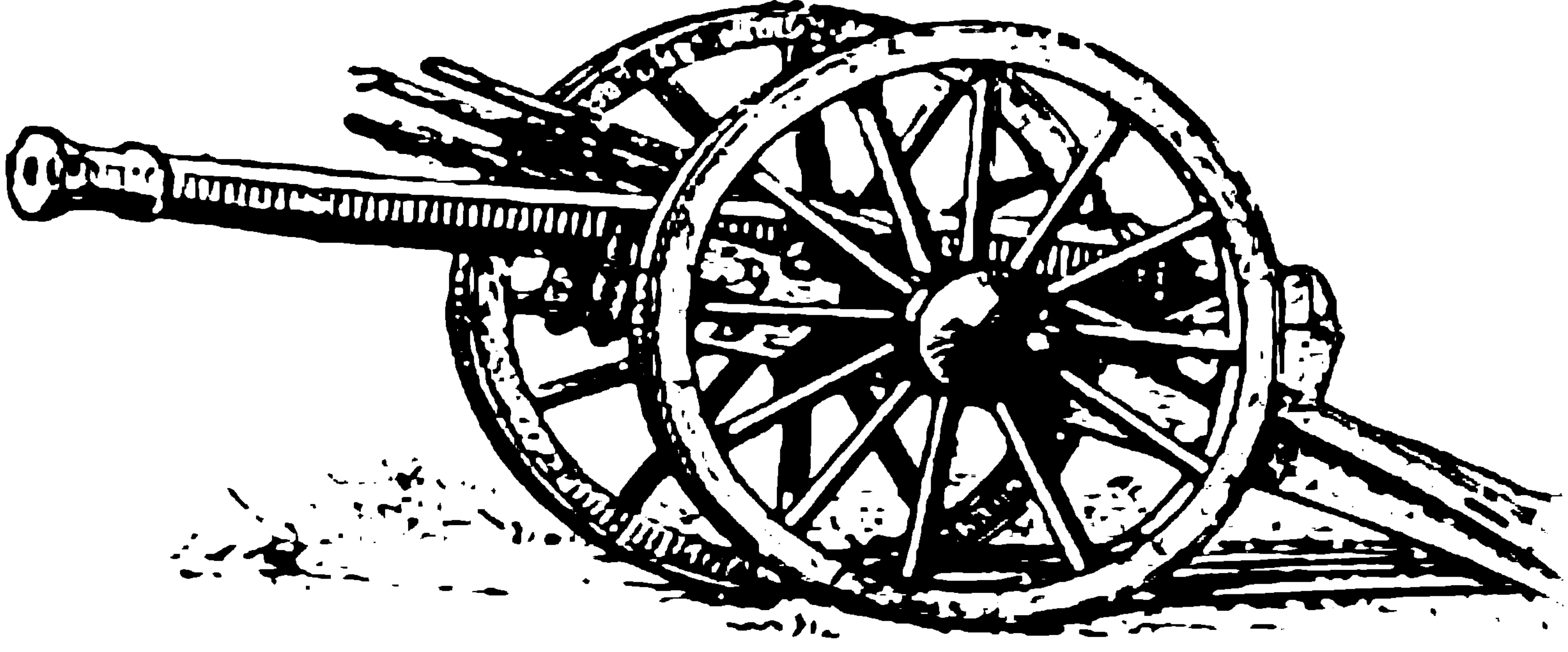
‘এটা একটা ব্যাংকের নম্বর, আন্তর্জাতিক একটা ব্যাংকের নম্বর।’

‘ব্যাংক নম্বর,’ বেশ অবাক হয়ে বলে উঠল বাশার। ‘কিন্তু ডেভিডের তো আরেকটা ব্যাংক নম্বর ছিল, সেটা কি এটা?’

‘না বস, যদি আমাকে মানো, আমার বিশ্বাস ডেভিডের ওই নম্বরটা ছিল স্রেফ আইওয়াশ। এটা ছিল তার প্রকৃত নম্বর। এই নম্বরে অনেক কিছু পাওয়া যাবে। তার সব আন্তর্জাতিক লেনদেন থেকে শুরু করে সবকিছু এখানেই পাওয়া যাবে।’

‘এটা যে-ব্যাংকের নম্বর বলছেন আপনারা, সেই ব্যাংকের নম্বর এমন নয়,’ অনেকক্ষণ পর রুশো বলে উঠল। ‘আমি দেশের বাইরে পড়েছি, ওই ব্যাংকে আমার অ্যাকাউন্ট ছিল। এটা তার ব্যাংকের নম্বর হতে পারে না।’

‘ওকে, নম্বর যাই হোক না কেন, লোকেশন তো একটা আছে আমাদের কাছে, সেটা দিয়ে শুরু করব আমরা,’ বাশার সোজা হয়ে দাঁড়াল। ‘বিরতি দেওয়ার কোনো মানে হয় না। আমরা এখনই বের হবো লোকেশন বরাবর।’



অধ্যায় চূয়াস্তর
সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
হায়দ্রাবাদ, ভারতবর্ষ

এখান থেকে বের হওয়া কতটা জরুরি দুজনেই অনুভব করতে পারছে।

কর্নেল আর সোলেমানের মনে হতে লাগল, অনন্ত কাল ধরে তারা বিচ্ছিন্নি আঠালো পিপের ভেতরে বাতাস বিহীন অবস্থায় বন্দি হয়ে রয়েছে।

সোলেমান যখন আর সহ্য করতে পারছে না, এমন সময় কর্নেল শক্ত বলে ধরল তাকে। কানের কাছে ফিসফিস করে শান্ত হতে বলতে লাগল তাকে, সেই সঙ্গে সে নিজের দুই হাতে শক্ত করে ধরে ডলে দিতে লাগল হাতের তালু। সোলেমানের অস্থিরতা না কমলে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসতে লাগল সে। 'শান্ত থাকো, আরো কিছুক্ষণ, আর অল্প সময় পরেই আমরা বের হয়ে যেতে পারব। যদিও অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সোলেমান মাথা নেড়ে সায় জানাল, শরীর এবং মন অনেকটাই শান্ত হয়ে আসছে তার। কিন্তু অল্প সময়ে তারা বের হতে পারল না। আরো অনেক অনেক সময় সেই পিপের ভেতরে বন্দি থাকতে থাকতে, ওদের যখন মনে হতে লাগল শরীর-হাত-পা আর মাথা কোনোটাই আর কাজ কাছে না, সেই সময়ে পিপের গায়ে ঠকঠক করে শব্দ হতে লাগল।

কর্নেল প্রথমে কান পেতে শুনল, প্রথমবারে না হলেও দ্বিতীয়বার শব্দ হতেই সেও ভেতর থেকে একইভাবে টোকা দিল, একটু পরে খটাখট শব্দের সঙ্গে পিপের ওপরের ঢাকনা খুলে গেল, অন্ধকারের ভেতরেও সে আলোর নানারকম নিখাদ রেখা হতে পারে, সেটা এরকম গিলে খাওয়া অন্ধকারের ভেতরে না গেলে কেউই বুঝতে পারবে না। কর্নেলরা এমন ভীষণ কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে ছিল যে রাতের অন্ধকার রীতিমতো আলোকিত মনে হতে লাগল তাদের কাছে। পিপের মুখের কাছ থেকে কেউ একজন হাত বাগিয়ে

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

দিয়েছে, চেহারা বোঝা না গেলেও নির্ধিধায় কর্নেল প্রথমে সোলেমানকে ওপরে ঠেলে দিল, এরপর নিজের হাতটা ধরে ওপরে উঠে এলো। অনেকটা ছোট বাচ্চার মতো ওদের দুই হাতে ধরে মাটিতে নামিয়ে দিল পালোয়ান। ‘ঠিক আছে কর্নেল? কর্নেল মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে সোলেমানের দিকে দেখিয়ে বলে উঠল, ‘ওর অবস্থা খারাপ, ওরে একটু সেবা করো।’

কর্নেল অনুভব করতে পারছে তার পুরো শরীর চটচটে আঠালো তরলে ভরে গেছে, কাপড় থেকে শুরু করে চুল সবই একই অবস্থা। সে অন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখল মানুষ তো বটেই এমনকি পালোয়ানের কুকুরটারও একই অবস্থা।

‘সৈন্যরা কি চলে গেছে?’ কর্নেল জানতে চাইল। শরীর পরেও ঠিক করা যাবে, আগে জানে বাঁচতে হবে।

‘জি, সাহেব,’ সেই ছায়ামূর্তিটা বলে উঠল। মানুষটা কথা বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল দুটো ব্যাপার অনুভব করল। প্রথমত, মানুষটাকে সে যা বলেছিল তা নয় এবং মানুষটার গলাও ভিন্ন। কারণ ছায়ামূর্তিটা কোনো পুরুষ মানুষ নয়। একটা নারীমূর্তি। ‘আপনি আপনি—’ কর্নেল বলতে না চাইলেও তার ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

‘সাহেব, আমাকে আপনি বলার দরকার নাই,’ মেয়েটার অবয়ব লম্বা এবং চিকন, তার পরনের পোশাকও অনেকটা ছেলেদের মতোই। ওনারে কালিঝুলি আর আঠামাখা চেহারায় ঠিক বোঝা না গেলেও, চোখ দুটো তার জ্বলজ্বল করছে। ‘আর হ্যাঁ, আমি মেয়ে মানুষ। আমরা এহন এখান থেইকা সইরা পরা খুব জরুরি,’ সে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে রয়েছে কর্নেলের দিকে।

‘আপনি মেয়ে না ছেলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়,’ কর্নেলও তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। ‘প্রথমত, আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে। আর দ্বিতীয়ত, ধন্যবাদ আপনার প্রাপ্য হলেও আপনাকে পরিষ্কার জানাতে হবে আপনি আমাদের সন্ধান পেলেন কীভাবে, সেটা না জানানো পর্যন্ত আমরা—’ কর্নেল কথা শেষ করার আগেই পালোয়ান তার লাঠিটা এক পাক ঘুরিয়ে নামিয়ে আনল শরীরের পাশে। মেয়েটা একবার পালোয়ানের দিকে দেখল, তারপর একে একে দেখল ওদের, ফিরে তাকাল কর্নেলের দিকে। তার চোখে বিন্দুমাত্র ভয় নেই, বরং এক ধরনের খেলো ভাব। ‘আমি শত্রু না, এখানে অনেক শত্রু আছে আপনাদের। আমাকে শত্রু ভাবার কোনো প্রয়োজন নাই। বরং আমাদের একই শত্রু রয়েছে বেশ কিছু, কাজেই আমরা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারব,’ মেয়েটার চোখে কাঠিন্য।

সিপাহী

‘আমি বলিনি, আপনি আমাদের শত্রু,’ কর্নেল এগিয়ে গেল মেয়েটার দিকে। ‘কিন্তু একেবারে সঠিক সময়ে সঠিক জায়গাতে সম্পূর্ণ অচেতন একজন মানুষ কীভাবে এবং কেন সাহায্য করতে এলো, সেটা আমাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে,’ কর্নেলের চোখেও একই কাঠিন্য। ‘অযাচিত সাহায্য যে খুব ভালো জিনিস নয়, সেই অভিজ্ঞতা এর মধ্যেই আমার যথেষ্ট হয়েছে।’

‘অযাচিত সাহায্য না সাহেব,’ মেয়েটার দৃষ্টি ভাঙা কাচের মতো তীক্ষ্ণ এবং শীতের রাতের পিচ্ছিল কালো বরফের মতো ঠান্ডা। ‘আপনাদের আমার প্রয়োজন, সেই কারণেই আমি সাহায্য করছি এবং করতে চাই।’

‘এটা যথেষ্ট না, আমাদের জানতে হবে—’

‘হজুর, আমি সবই বলব, কিন্তু এখন এবং এখানে না হজুর,’ মেয়েটা অন্যদের দিকে দেখে নিয়ে বলে উঠল। ‘নিজামের সৈনিকেরা, সইরা পড়ছে কিন্তু এখানকার ওরা চাইরপাশ ঘাটলে আপনেনগো না পাইলে আবার ফিরব না সেইটার কোনো ঠিক নাই; বলে সে অন্যদের দেখল। ‘আর আমগো যা অবস্থা, তাতে আগে নিজেগো ঠিক করা দরকার। কাছেই দেওয়ালের পেছনে যদিও সৈনিকরা গেছে তার উলটাদিকে গেলে, আমরা খাল পার হয়ে নদী দিয়া আগাইতে পারব খানিক, শহর থেইকা একটু দূরে, নিজেগোরে ঠিক করতে পারব আর লম্বা আলাপ আছে। তার আগে খাওয়াও দরকার। বলে,’ মেয়েটা আবারো সবাইকে দেখল। ‘যদি রাজি থাকেন, বলেন না হইলে আমার নিজের পথ ধরতে হবে।’

সবাই তাকিয়ে আছে কর্নেলের দিকে। ‘ঠিক আছে তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। চলো।’

এখনো সে নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে, ব্যাপারটা তার জন্যে অস্বস্তিকরই না, বরং ভীষণ বিরক্তিকরও। কাজের মানুষ সে, এভাবে চুপচাপ দেখে যাওয়ার মানুষ না। আর একজন আরোগী হিসেবে সে একটা নির্দিষ্ট দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছে। যে-ভুল সে করেছে, সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তারই করতে হবে। আর সেজন্যে ওই দলটাকে দরকার তার। কিন্তু এখানে যা ঘটছে, সেটা ঠিক বুঝতে পারছে না সে। প্রথমত ওই দলটা যখন মৃত লোকটার বাড়ির ভেতরে ছিল, সেখানে নিজামের সৈনিকেরা এলো কীভাবে। আর ওরা পালানোর সময়ে সাহায্যই বা করল কে।

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

এখনো মানুষগুলো পিপার ভেতরেই অবস্থান করছে। নিজামের সৈনিকেরা আশপাশে খুঁজে ওদের না পেয়ে পেছনের দেওয়াল পার হয়ে জলপথের দিকে চলে গেছে। সম্ভাবনা কম যে ওরা আবার এইদিকে ফিরে আসবে। সম্ভবত ওরাই কোন না কোনোভাবে ওদের সেই জলপথের দিকে ধাবিত করে নিজেরা এসে পিপার ভেতরে লুকিয়েছিল। ধারণাটা ভালো ছিল এবং কাজে দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যায় এটাও সম্ভবত ওরা করেনি। সেই মানুষটা যে ওদের সাহায্য করছিল—সেই এই ব্যবস্থা করেছে।

পিপার ভেতরে মানুষগুলো লুকিয়ে থাকা অবস্থায় সে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আরো কাছে চলে এলো। মানুষগুলোকে সতর্ক করে দেবে কি না বা পিপে থেকে বের হতে বলবে কি না সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু ভেবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই একটা পিপার মুখ খুলে গেল। আবারো আড়ালে সরে গেল সে। অন্ধকারের ভেতরে পুরোপুরি দেখতে না পেলেও সে অনুধাবন করতে পারল, মানুষগুলো বের হয়ে আসছে একে একে। তারা বেরিয়ে নিজাদের ভেতরে আলোচনা করতে লাগল, আর ঠিক সেই সময়েই যে-মানুষটা তাদের আড়াল থেকে সাহায্য করেছে তাকে ভালোভাবে দেখতে পেল সে।

যদিও অন্ধকার এবং কালিঝুলি আর আঠালো তরলে ঢাকা তার চেহারা, কিন্তু এই মানুষটাকে চিনতে না পারলে তার মানব জন্ম বৃথা। বিন্ময়ের সঙ্গে সে ভাকল, যার খোঁজে এত দূরে আসা। সেই মানুষটা নিজেই এভাবে সামনে চলে আসবে কে ভাবতে পেরেছিল।

‘এবার বলো বিষয়টা কি, এবং এর সঙ্গে তোমার সংশ্লিষ্টতা কোথায়?’ প্রশ্নটা কর্নেলের এবং সে তাকিয়ে রয়েছে আগুনের অন্যপাশে বসা নারী মূর্তিটির দিকে। ভারতবর্ষ থেকে বিগত কয়েক বছর দূরে থাকলেও নিজের জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছে কর্নেল ভারতে। আর সেই সুবাদে তার পরিচিত মানুষের সংখ্যাও বরাবরই সবচেয়ে বেশি ভারতীয়ই। যে-কারণে কর্নেল একটা সময় ভাবত সে ভারতীয়দের চেনে এবং বুঝতে পারে। বিশেষ করে যেহেতু সে ওই ধরনের ইংরেজ নয়, যারা ভারতীয়দের স্রেফ দাস মনে করে। কিন্তু তার এই ধারণা ভেঙে যায় যখন সে এবং তার পরিবারের সঙ্গে সেই ঘটনাটা ঘটে। এর পরও সে ভাবত ভারতীয় নারী-পুরুষদের ব্যাপারে জানে। কিন্তু আবারো তাকে ভুল প্রমাণ করে দিচ্ছে প্রতিটা মানুষ। বিশেষ করে তাদের সামনে বসে

সিপাহী

থাকা এই নারীকে দেখে কোনোভাবেই ভারতীয় অন্য নারীদের সঙ্গে মেলাতে পারছে না কর্নেল।

কর্নেলরা এখন বসে আছে হায়দ্রাবাদ শহর থেকে বেরিয়ে ঋনিক দূরে ছোট একটা জংলা জঙ্গলের মতো জায়গায়। ওরা যেখানে পিপেতে ঢুকেছিল সেখান থেকে বের হয়ে পেছনের সেই দেওয়ালের ও পাশের জায়গা দিয়ে ওরা চলে যায় ছোট একটা খালপাড়ের দিকে, সেখানে ছোট একটা নৌকা রাখা ছিল। সেটা দিয়ে ওরা চলে আসে খালের অন্যপাড়ে। জায়গাটা জংলা এবং জঙ্গলের সমন্বয়। এটার একদিকে খালপাড় অন্যদিকে জংলা আরেকদিকে নদী। মাঝে ছোট ত্রিভুজের মতো একটা জায়গা। ওখানে পৌঁছে ওরা সবাই নিজেদের যতটা সময় পরিষ্কার করে নেয় পানিতে। পোশাক পরিষ্কার করে ধুয়ে চিপে নেয় যতটা সম্ভব। এখনো ভিজে পোশাকে রয়েছে, কিন্তু অন্তত আঠালো পদার্থের চেয়ে ভালো। আর বড় করে আগুন জ্বলানোতে পোশাক শুকিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। জায়গাটায় ওদের নামিয়ে দিয়ে মেয়েটা চলে যায় অন্যদিকে, ওরা পরিচ্ছন্ন হয়ে এসে দেখে মেয়েটা এর মধ্যেই আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে। ওরা ফিরে এসে গোল হয়ে বসে আগুন ঘিরে। আর কর্নেল প্রশ্নটা করে মেয়েটাকে। ‘প্রথমে তোমার নাম বলো,’ কর্নেল ইচ্ছে করেই মেয়েটাকে তুমি করে বলছে, কারণ মেয়েটাই তাকে আপনি বলতে নিষেধ করেছে।

‘আমি খুনি,’ বলে মেয়েটা কর্নেলের দিকে দেখল। ‘জন্ম থেকেই খুনি, অন্তত জ্ঞান হওয়ার পর থেকে খুনি হিসেবেই বড় হয়েছি। আপনারা বিষ্কানিয়ার নাম শুনেছেন?’ সে সবার দিকে নজর বোলাল।

‘শুনেছি,’ ওদের ভেতরে ত্রিলোক কথা বলে উঠল।

‘আমি বিষ্কানিয়া,’ বলে সে আবারো কর্নেলের দিকে তাকাল। ‘আপনি আমার নাম জানতে চাচ্ছিলেন, আমার কোনো নাম নেই, আমার আসলে মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় জন্মের পর আমার নাম দেওয়া হয়েছে কায়া। আপনারা আমাকে কায়া নামে ডাকতে পারেন।’

‘তুমি বিষ্কানিয়া, এটা বিশ্বাসযোগ্য না,’ ত্রিলোক বলে উঠল। ‘কারণ বিষ্কানিয়ারা কখনো নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করে না। কোনো অবস্থাতেই না। আর তা ছাড়া বিষ্কানিয়ারা কখনো দলের সঙ্গে বা অন্য গোত্রের মানুষের সঙ্গে কাজ করে না। কাজেই তোমার কথা বিশ্বাস করার উপায় নাই,’ ত্রিলোকের গলায় সন্দেহ এবং অবিশ্বাস।

‘বিশ্বাস করা না করা আপনাদের বিষয়,’ মেয়েটা একেবারেই কোনো পরোয়া করে না এভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠল। ‘আমি যেটা সত্যি সেটাই

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

হলছি। আগেই বলেছি আমার আসলে মৃত্যু হয়েছে। কাজেই বিষকানিয়া সমাজের অংশ হলেও তাদের সব নিয়ম আমার জন্যে খাটে না। আমার একটাই কাজ বাকি, আর সেটা করতে পারলে আমার হয়তো আর বেঁচে থাকারও প্রয়োজন পড়বে না,' বলে সে চোখ তুলে তাকাল কর্নেলের দিকে। 'আর সেই কামটার জন্যে আপনাদের সাহায্য দরকার আমার।'

কর্নেল তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। সে বোঝার এবং মাপার চেষ্টা করছে মানুষটাকে। উঁচু পাহাড়ের উপত্যকার শান্ত হৃদের মতো দৃষ্টি, সেখানে হিংস্রতার পাশাপাশি খানিকটা যেন বিষণ্ণতাও। 'এভাবে বললে তো হবে না, তোমাকে পুরো ঘটনা খুলে বলতে হবে।'

'আমি খুনি আগেই বলছি, বিশ্বাস করা না করা আপনাদের বিষয়, আমি একটা কামে বাইর হইছিলাম, কী কাম বুঝতেই আছেন। সেইটা করতে গিয়া, সেই সময়ে শহরে বিদ্রোহের গণ্ডগোল লাগে। আমি দুই দলের মাঝে পইড়া মারাত্মক আহত হই। কোনোমতে, নদীর ঘাটে গিয়া একটা নৌকা নিয়া পলানির চেষ্টা করি। কিন্তু কপাল খারাপ। জ্ঞান হারায় ফেলি। সেই নৌকায় ছিল আরেক গোত্রের আরেকজন মানুষ, পুরুষ মানুষ। সে সেবা কইরা আমারে সুস্থ করে তোলে। অল্প সময়ের ভেতরেই আমরা প্রেমে পড়ি,' মেয়েটা অন্যদিকে তাকাল। তার গলা শুনে মনে হচ্ছে ডয়াবহ কোনো অপরাধ করেছে সে প্রেমে পড়ে।

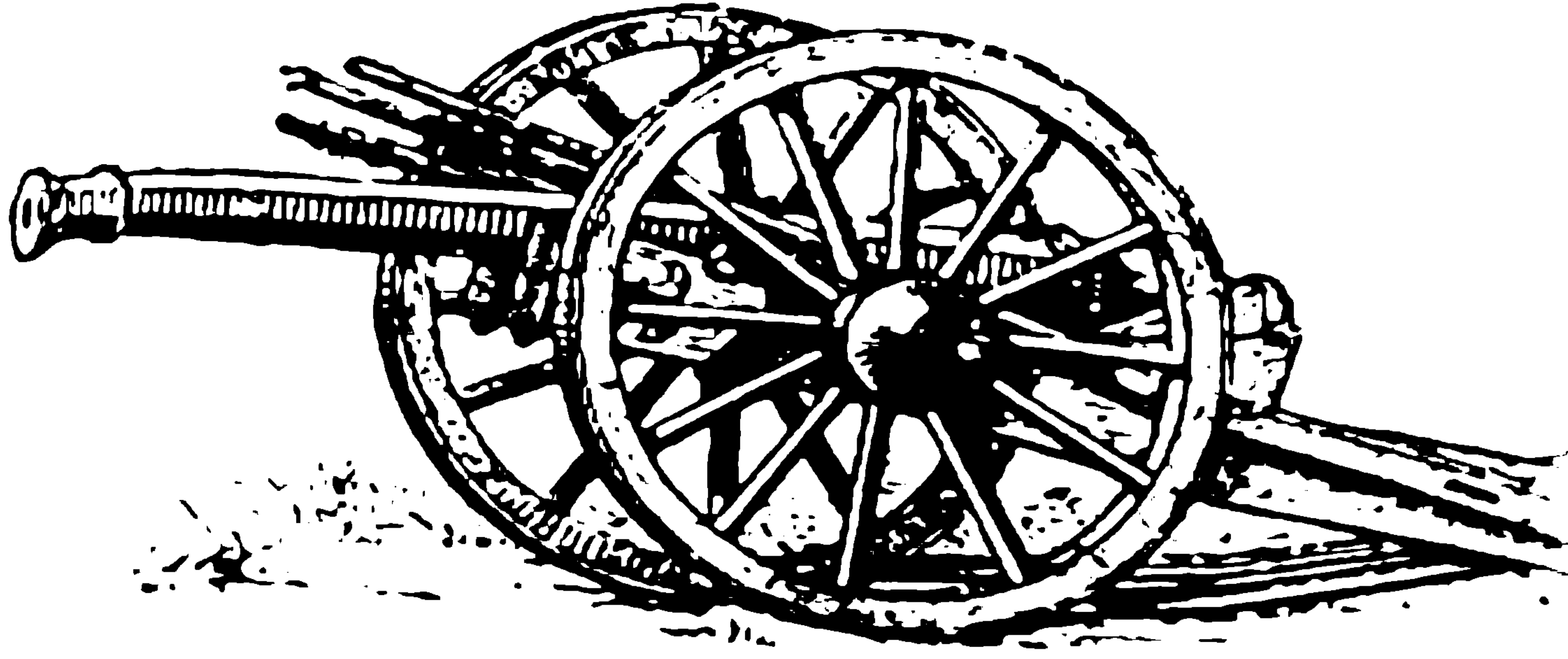
'যে-আমি কোনোদিন প্রেম-বিয়া এসব নিয়া ভাবিও নাই, ছোট বাচ্চাদের মতো করতে থাকি। আমি তারে নিয়া পলানির চিন্তা করি। কিন্তু বিধি বাম, অনেক পরে জানতে পারি ওই লোকটাও আমার মতোই অন্য গোত্রের মানুষ। সেও আরেক ধরনের খুনি, সেও একটা কাজে গিয়েছিল। ওইখানে ধরা না পড়ার জন্যে সে বাইদা সাইজা ছিল। আমি তার মিথ্যা জানতে পলানির চেষ্টা করি, তার সঙ্গীরা আমারে বাধা দেয়, আমি তাগোরে সাংঘাতিক এক বিষ খাওয়াইয়া, পলাই। আমার নিজের গোত্রের কাছে ফিরা যাওয়ার মুখ ছিল না। তা-ও তাগোর মাঝেই ফিরি, না হইলে দুনিয়ার যেই প্রান্তেই থাকি হেরা ঠিকই খুঁইজা বাইর করত আমারে। এরপর আমার নবজন্ম হয়। আমি সেই মানুষটা এবং তার গোত্র যারা আমার এবং আমার গোত্রের সব রহস্য জানে তাগোরে মারতে হবে।'

'কিন্তু এখানে আমরা এলাম কীভাবে?' আমরা তোমাকে কীভাবে সাহায্য করব?' কর্নেল খুবই অবাক হয়ে বলে উঠল।

সিপাহী

‘এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে আছে,’ অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সোলেমান, পিটার ওদিকে অগ্র তুলল। অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা পুরুষ আকৃতি বেরিয়ে এলো। আগুনের আলোতে সবাই দেখল জটাধারী সন্ন্যাসীদের মতো একজন পুরুষ মানুষ বের হয়ে এসেছে আগুনের আলোতে। ‘আপনারা যা জানতে চান সেই সব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা আছে, আপনাদের বন্ধু ভিক্টর কোথায় আছে, কেন তারে সবাই খুঁজতেছে সেই প্রশ্নের উত্তরও আমার জানা আছে।’

‘কে তুমি?’ কর্নেলও উঠে দাঁড়িয়েছে। সবাই তাকিয়েছিল মানুষটার দিকে, তাই কেউই পেছনে দেখেনি, যখন দেখল অনেক দেরি হয়ে গেছে।



অধ্যায় পঁচাত্তর বর্তমান সময় বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকা

‘বিষয়টা কি আমাকে খুলে বলেন তো,’ জয়া সরকার চায়ের কাপটা রাগের সঙ্গেই পিরিচের ওপরে নামিয়ে রাখল। সে এতটাই জোরে নামিয়েছে, ঝগিকের জন্যে তার মনে হলো, কাপ আর পিরিচ দুটোই ভেঙে যাবে। কিন্তু তাকে খুবই অবাক করে দিয়ে কোনোটাই ভাঙল না। ‘এই ছায়াঢাকা শত্রু, আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল সংগঠন, নম্বরের পর নম্বর, কোড, সিফল! এগুলো দেখতে দেখতে অসহ্য হয়ে উঠেছি,’ শেষদিকে জয়া সরকারের গলা রীতিমতো যুদ্ধংদেহি। ‘মনে করেন আপনি একটা থ্রিলার উপন্যাসের ভেতরে আছেন, আর লেখক একের পর এক কাহিনি প্যাঁচিয়েই যাচ্ছে, মূল জিনিসটা কিছুতেই বলছে না, কেমন মেজাজ খারাপ হবে আপনার। আমার এখন সেইরকম মেজাজ খারাপ হচ্ছে।’

জয়ার চিৎকার বা যুদ্ধংদেহিভাবে আলী আজগরের ভেতরে কোনো ভ্রক্ষেপ দেখা দিল না। আর্ট ফিল্মের প্রিমিয়ারে লোকজন যেমন বোদ্ধা আর দার্শনিক ভাব ধরে বসে থাকে, সে একই রকম ভাব ধরে বসে রইল, দর্শকদের চূড়ান্ত বিরক্তির উদ্বেক করে দিয়ে সে আশপাশে দেখল। ‘কিছু বিষয় থাকে এমন যাদের কথা সময় নিয়েই পৃথিবীবাসীকে জানাতে হয়। আর সেই সময়টা নির্ভর করে বিষয়ে ওপরে। কখনো সেটা এক-দুই ঘণ্টা হতে পারে, কখনো সেটা হাজার বছর হতে পারে। আর সেখানে কয়েক বছর তো কিছুই না।’

‘কাট দ্য কুলশিট,’ প্রায় চিৎকার করে উঠেও জয়া সরকার নিজেকে শান্ত করে ফেলল। ‘আচ্ছা, আমি ওভার রি-অ্যাক্ট করছি। আপনি বলুন, আগে বলুন আপনার এই অবস্থা হলো কি করে, আর মূল বিষয়টা আসলে কি নিয়ে। কারা এর সঙ্গে সংযুক্ত।’

সিপাহী

‘তোমার ছোটবেলা থেকে শুরু করি,’ আলী আজগর আগের মতোই শান্ত ভঙ্গিতে শুরু করল। ‘আমি একজন অপরাধী, এটা আমার মূল পরিচয়, তবে এর সঙ্গে আমার বড় যে-পরিচয়, আমি একজন ব্যবসায়ীও। আমি পারিবারিকভাবেই একেবারে জাত ব্যবসায়ী। আর আমাদের মতো যারা একবারে ব্যবসায়ী এবং অপরাধী, তাদের অনেকেরই একটা বড় বিনিয়োগ মানুষ। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা মানুষ ইনভেস্ট করে রাখি, যারা নানাভাবে পরবর্তীতে কাজে লাগে। তুমি আমার প্রাথমিক জীবনে ওই রকম একটা ইনভেস্টমেন্ট ছিলে। পরিচিত এরকম অনেক প্রতিমুখানাকেই এরকম দু-চারজনকে আমরা ইনভেস্ট করে রাখি। খুব বেশি খরচও হয় না। তবে তোমাকে ইনভেস্ট করার পেছনে আরো একটা কারণ ছিল, আমি গোড়া থেকেই জানতাম তুমি কে, এবং ময়মনসিংহের রাজপরিবারের সঙ্গে তোমার সংযোগ কি। আর সেটা জানার পর থেকেই তুমি বরবরই আমার জন্যে স্পেশাল ইনভেস্টমেন্ট ছিলে।’

‘ইনভেস্টমেন্ট!’ জয়া সরকার স্কোভের সঙ্গে বলে উঠল। ‘আমি আপনার জন্যে স্রেফ একটা ইনভেস্টমেন্টে ছিলাম,’ তার চোখে স্কোভের অশ্রু। ‘আর আমি আপনাকে আমার বাবার মতো ভাবতাম।’

‘আগে শোন জয়া, যদিও তুমি সবসময়ই আমার জন্যে স্রেফ বিজয়। যাই হোক,’ আলী আজগর খানিক থামল। ‘আমি অনেক ধরনের ব্যবসাই করতাম, এর ভেতরে অন্যতম একটা ছিল অ্যান্টিকের ব্যবসা। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, আমি শুরুতে সরাসরি অ্যান্টিকের ব্যবসা করতাম না। বরং আমি অনেকটা কাজ করতাম অ্যান্টিকের কুরিয়ার হিসেবে। আমার এই বিষয়টা তুমি জানো না। বাংলাদেশে আসলে অ্যান্টিক সেভাবে চলে না, তুমি তো জানোই। আমরা যে-ব্যবসা করতাম সেটার বেশির ভাগই আলটিমেটলি বাইরের ব্যারদের কাছে চলে যেত। যে-দেশের পঁচানকই ভাগ মানুষ অ্যান্টিক আর শো-পিসের ভেতরে পার্থক্য করতে পারে না, সে-দেশে অ্যান্টিকের বাজার গরম হবে না এটাই স্বাভাবিক।’

‘আমার অভিজ্ঞতা তো সেটা বলে না,’ জয়া সরকার ভ্রু কুঁচকে বলে উঠল। ‘এই পঁচানকইয়ের একটা বড় অংশ নব্য ধনী। আর এই সব নব্য ধনীদের সবচেয়ে দুর্বলতা হলো এদের আইডেনটিটি ক্রাইসিস। বৈধ কিংবা অবৈধ যাই হোক না কেন, নব্য ধনীদের টাকা আছে, রুচি নেই। রয়েছে নিজেকে রুচিবান হিসেবে প্রমাণ করার ব্যাপক ক্ষুধা। আর সেই ক্ষুধা মেটানোর জন্যে আইডেনটিটি আর রুচির খানিকটা সস লাগিয়ে এদেরকে ঠিকভাবে খাওয়ানো যায়,’ জয়া সরকার মাথা এগিয়ে হাঁটুতে দুই হাত ভর দিয়ে বলতে লাগল।

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

‘আপনি ব্যবসার প্যাচাল কেন পারছেন? এই ব্যবসা গ্রাউন্ড লেভেলে আমার চেয়ে ভালো কয়জন বোঝে এই দেশে!’

আলী আজগর হাত নাড়ল। ‘সেটা ভিন্ন আলোচনা। আমি তোমাকে ব্যবসা বোঝানোর চেষ্টা করছি না, আমি তোমাকে আমার চিত্রটা বয়ান করছি। বাংলাদেশটা জিওগ্রাফিক অবস্থানে কারণে সাউথ এশিয়াতে অনেকটা করিডরের মতো। ফলে ইন্ডিয়া এবং চায়না, সারা বিশ্বের অবৈধ অ্যান্টিকের এই দুই মেগা জয়েন্টের পাশে বাংলাদেশ রিসোর্সের দিক থেকে কিছুই না। তার ওপরে নেপাল, থাইল্যান্ড, লাউস, ভিয়েতনাম এগুলোর হিসেবে আমরা স্রেফ দুধভাত। কিন্তু এই দুধভাত দেশটার একটা বিরাট শক্তি হলো এর অবস্থান, যেটা এই মেগা জয়েন্টগুলো ব্যবহার করতে চায়,’ বলে মৃদু হাসল আলী আজগর। ‘তার ওপরে আমার সোনার বাংলা করাপটেড, ফলে এখানে খুব অল্প টাকা ঘুস দিয়ে অনেক কিছুই করা যায়। বাঙালিরা জানেও না, তাদের দেশের ওপর দিয়ে মিলিয়ন ডলারের অ্যান্টিক পাচার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর এই পাচারের জন্যে প্রয়োজন স্থানীয় লিয়াজোঁ যাদের রয়েছে ব্যাপক কানেকশন,’ বলে সে নিজের দিকে দেখাল। ‘আমি ছিলাম সেরকমই একজন লিয়াজোঁ। তোমার জন্মের আগের থেকেই আমি এই ব্যবসা করতাম। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেও টুকটাক যখন অ্যান্টিকের বিষয়গুলো বুঝতে শুরু করি নিজেও সংগ্রহ এবং বিক্রি শুরু করি। সারা দেশে আমার দশের বেশি এজেন্ট ছিল,’ বলে সে জয়ার দিকে দেখাল। ‘তুমি ছিলে তাদেরই একজন। সব ভালোই চলছিল। আমাদের কাজের একটা অংশ হলো নানা জায়গায় খোঁজখবর রাখা। তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং জায়গামতো পাচার করা। আর তুমি তো জানো এসব ক্ষেত্রে জায়গামতো তথ্য পাচার করতে পারলে এমনকি তথ্যটা কখনো কখনো অ্যান্টিকের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হয়। আর এসব তথ্য সংগ্রহের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট ছিল কিছু পারিবারিক অ্যালবাম, মৃত কোনো দাদাজির লেখা জার্নাল এবং

‘... নির্দিষ্ট কিছু কনফারেন্স,’ জয়া বলে উঠল।

‘একদম ঠিক। কনফারেন্স কখনো কখনো খনি হয়ে ওঠে তথ্যের। এটা শুধু আমাদের জগতে নয়, অ্যাকাডেমিয়া থেকে শুরু করে টেক ইন্ডাস্ট্রি সবখানেই কনফারেন্স থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এমনি এক কনফারেন্সে আমার পরিচয় ডেভিডের সঙ্গে। শুধু ডেভিডই নয়, সেখানেই আমার সঙ্গে, আসলে আমার মাধ্যমেই প্রফেসর আবদেল, প্রফেসর ইফতেখার এবং ডেভিডের পরিচয় ঘটে। ওখানে প্রফেসর হামিদও ছিল।’

সিপাহী

জয়া সরকার অনুধাবন করতে পারল আলী আজগর ধীরে ধীরে পয়েন্টের দিকে যাচ্ছে। সময় দেখছে সে, এই লোকদের কাছ থেকে দ্রুত তথ্য বের করে এখান থেকে কেটে পড়তে হবে। যদি সেটা করা যায় আরকি।

আনমনেই একবার রমিজ দারোগা আর কনস্টেবল আবদুল্লাহর দিকে দেখল সে। দুজনে আলোচনার সুবাদে ঝিমালেও চিত্তিত চেহারা দুজনার, তাকালেই বোঝা যায় দুজনেই ভাবছে, এতকিছু বলার পর এই লোক কি বের হতে দেবে ওদের।

‘একটা তথ্য বের করতে এত সময় লাগে,’ বিরজির সঙ্গে মোবাইলে সময় দেখে মন্তব্য করে উঠল বাশার। বাশার, সামিরা আর রুশো বসে আছে জিপের ভেতরে। ওরা দাঁড়িয়ে আছে পুলিশলাইনের কমিউনিকেশন ভবনের বাইরে। ওরা জিপিএস ট্র্যাক করার পর দুটো জিনিস করার ছিল ওদের। প্রথমত, এই রাতের বেলা অপারেশনে নামতে হলে ব্যাকআপের প্রয়োজন ছিল সেটার ব্যবস্থা এখনো পুরোপুরি করতে পারেনি, দ্বিতীয়ত, বাশার পরিষ্কার বলেছে যত্নে প্রয়োজনীয় হোক না কেন, অথরাইজ না করে সে অপারেশনে যাবে না। ওর আগের জীবনে একবারই যথেষ্ট বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছে আনাঅথরাইজ অপারেশনের। কাজেই আর ঝুঁকিতে যাবে না সে। তো সেই সব কাজের জন্যেই মূলত এখানে আসা। সেইসঙ্গে ছাপা অফিসেও প্রোপার চ্যানেলের মাধ্যমে রিপোর্ট করার প্রয়োজন ছিল, সেটাও করে আসবে। সামিরা ভেতরে যাওয়ার পর থেকেই বসে আছে ওরা।

‘বস, ধরো তোমাকে একটা জিনিস লুকানোর জন্যে দেওয়া হলো,’ তুমি সেটা রাখবে কোথায়?’ টমি ল্যাপটপ ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলে উঠল।

‘অনেস্টলি স্পিকিং,’ বাশার বলে উঠল। ‘আমি জানি না। আমার নিজেরই কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই, আমি জিনিসপত্র লুকাব কোথায়। আর এতদিনের জন্যে লুকাতে হলে আসলে কোথায় লুকানো উচিত আমি জানি না,’ বাশার কাঁধ ঝাঁকাল।

‘আমি বলতে পারি,’ রুশো বলে উঠল। ‘কোনো উকিলের কাছে লিগ্যাল ওয়েতে গচ্ছিত রাখা যেতে পারে। কোনো ব্যাংকের লকারে রাখা যেতে পারে,’ বলে রুশোও কাঁধ ঝাঁকাল। ‘বাইরের দেশে এয়ারপোর্ট, অফিস, জিম, পোস্ট অফিসের লকারেও অনেককিছু রাখা থাকে। অনেস্টলি বলতে গেলে আমি কোনোকিছু কোথায় কীভাবে কার কাছে লুকাব, সেটার অনেকটাই নির্ভর করে

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

জিনিসটা কি, সাইজ কেমন, কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা লুকানোর জন্যে আমার বাজেট কেমন,' বলে সে ওদের দুজনার দিকে তাকাল। 'কারণ বাধকূমের টাইলের নিচে লুকানোর যুগ আর নেই।'

'তা ঠিক,' বাশার আঙুল তুলে বলে উঠল। 'আমি রুশোকে সমর্থন করি।'

'সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু আমার প্রশ্ন ভিন্ন জায়গায়, টমি বলে উঠল। 'ডেভিড এতদিন ধরে লুকিয়ে রেখেছে জিনিসগুলো। আই মিন সে নিশ্চয়ই পরিকল্পনা করে রাখেনি যে সে মারা যাবে।'

'অস্তুত ওভাবে তো নয়ই যেভাবে সে মরেছে। তোর পয়েন্টটা কি?' বাশার ক্র কুঁচকে জানতে চাইল।

'পয়েন্ট হলো। এতদিনে জিনিসগুলো আছে কি না জায়গায়তো?'

'অগ্রিম ভেবে লাভ নেই, বাশার চোখ বন্ধ করে সিটে হেলান দিতে যাবে—সামিরাকে দেখা গেল গেটের বাইরে। 'চলো চলো চলো,' সে দৌড়ে এসে বলে উঠতে বাশার চমকে সোজা হয়ে গেল।

'আমি লোকেশন শেয়ার করেছি তোমার সঙ্গে বসে,' টমি বলে উঠল।

বাশার মোবাইলে লোকেশন দেখতে দেখতে ক্র কুঁচকে বলে উঠল, 'এই জায়গায়, ওখানে তো-'

'তো ওই কনফারেন্সে অনেক মানুষ আমরা একসঙ্গে হই। বিশেষ করে আমার সঙ্গে পরিচয় ঘটে ডেভিডের এবং আমার মাধ্যমে ডেভিডের পরিচয় ঘটে প্রফেসরদের সঙ্গে। প্রফেসর গ্রুপের নেতা ছিল প্রফেসর আবদেল, যিনি পরে চট্টগ্রামে অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। প্রফেসর আবদেল ওই কনফারেন্সে খুব ডিসটার্বড ছিলেন। কারণ উনি বেশ কয়েক বছর আগে নিজের গবেষণার এরিয়া বদলে একটা নির্দিষ্ট এরিয়ায় কনভার্ট করেন কী কারণে, কীভাবে সেটা আমরা কেউই সঠিকভাবে জানতাম না। অস্তুত আমি জানতাম না। উনার রিসার্চ নিয়ে উনি বাংলাদেশে সরকারের কাছে সাহায্য চাইলে তারা তাকে সাহায্য করেনি। আর তাই উনি ফান্ড এবং অপরচুনিটি খুঁজছিলেন। আর ডেভিডের মাধ্যমে উনি সেটা পান।'

'এটা আমি অনেক পরে জেনেছি,' আলী আজগর বলে উঠল। 'আসলে ডেভিড ছিল রেলিকের ইউরোপ এজেন্ট। সে এশিয়াতে নতুন এরিয়া এক্সপ্লোর করার জন্যে ঘাঁটি গাড়ার পরিকল্পনা করছিল। আর সেই রিসোর্স খোঁজার জন্যেই সে ওই কনফারেন্সে গিয়েছিল।'

সিপাহী

‘প্রফেসর আবদেল এবং প্রফেসর ইফতেখার তাকে একেবারে সঠিক জিনিসটা তুলে দেন তার হাতে,’ জয়া সরকার হেসে উঠল। ‘শিয়ালের হাতে মুরগি তুলে দেবার মতোই।’

‘ঠিক, তবে এসবই আমরা অনেক পরে বুঝেছি। আর যখন বুঝেছি, প্রফেসর আবদেল লুকিয়ে পড়েন, প্রফেসর ইফতেখার লুকিয়ে পড়েন, আর আমি লুকাতে পারিনি। আর এর ফল তো দেখেছোই।’

‘মানে ওরা আপনাকে এই হাল করেছে?’

‘ডেভিড যে এত গভীর জলের মাছ আমরা বুঝতে পারিনি। সে ফাভ দিয়েছিল আমাদের, সে লিয়াজোঁ করেছিল, সে নতুন রুট নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছিল এবং এত এত টাকার ইনপুট দেখিয়েছিল আমরা স্রেফ পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। ডেভিডের মৃত্যুর পর আমি ভেবেছিলাম ওদিকটা বন্ধ হয়ে গেলেও আমি তোমাকে মেরামত করে আমার ব্যবসা চালিয়ে নিচ্ছিলাম। ময়মনসিংহে ডেভিডের লাশ পাওয়ার পর সব খুলে যায়। তারপর সেটা ব্যর্থ হওয়ার পর রেলিক আমার মতো তার পুরনো লোকদের সরিয়ে দিতে শুরু করে। কারণ অতদিনে তারা বাংলাদেশের মার্কেটে ঢুকে পড়েছিল। আমাদের আর প্রয়োজন ছিল না। বরং আমরা অনেক বেশি জানি, আমরা তাদের লায়াবিলিটি।’

‘সিলেট-চট্টগ্রামে তাদের এজেন্ট ঘাঁটি গেড়ে ফেলেছে ততদিনে,’ জয়া বলে উঠল।

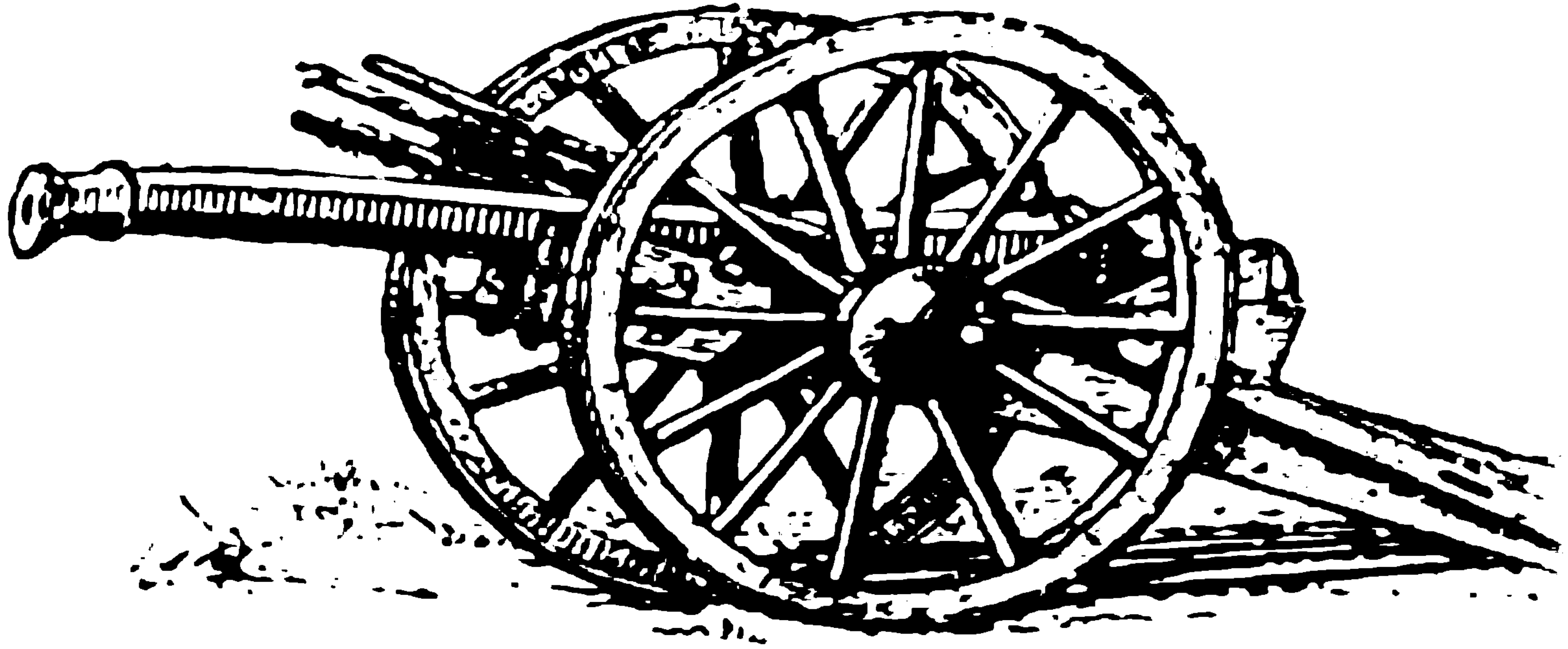
‘ঠিক। আমাদের তারা মেরে ফেলার চেষ্টা করে। আমি ঘাঁও মান, কোনোরকমে টিকে যাই। আর প্রফেসর হামিদ পালান কানাডায়, কাজ হয়নি।’

‘মানে আপনি বলছেন উনি যে কোমায়—এটার পেছনে ওদের হাত আছে?’ জয়া বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করল।

‘হতে পারে, আমি শতভাগ নিশ্চিত না হলেও মোটামুটি শিওর।’

‘এখন মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন, ডেভিড আসলে কিসের সন্ধান করছিল। প্রফেসর আবদেল আসলে কিসের স্বোজ দিয়েছিল ওদের?’

‘জয়া, আমি জানি তুমি কোনোভাবেই আমাকে আর বিশ্বাস করো না,’ বলে সে একটু থামল। ‘তাও আমি তোমার ভালো চাই। তুমি কি নিশ্চিত তুমি সত্যি সত্যি বিষয়টা জানতে চাও? কারণ এই বিষয়ে খুব গুটিকয়েক মানুষ জানে। যেই মুহূর্তে যে-এই বিষয়ে জানবে, তার জীবন আর কোনোভাবেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে না। এটা শুধু জয়া নয়, তোমাদের জন্যেও প্রযোজ্য,’ বলে সে আবদুল্লাহ এবং রমিজ দারোগাকে দেখাল।



অধ্যায় ছিয়াত্তর

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
হায়দ্রাবাদ শহরের প্রান্তে

কর্নেল এবং তার দল চোখের সামনে বলতে গেলে প্রায় অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য অবলোকন করছে। এমনকি চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটতে থাকার পরও ব্যাপারটা আদৌ ঘটছে কি না সেই বিষয়েও তারা সন্দিহান। অন্ধকারের জঙ্গলের ভেতর থেকে বের হয়ে আসা মানুষটার দিকে অস্ত্র তাক করেছে, তার পরিচয় জানতে চাইবে, সবাই তাকিয়ে রয়েছে মানুষটার দিকেই, পেছনে ফিরে নেই কেউ, তাই বিষয়টা কেউই দেখতে পায়নি সঠিকভাবে।

তাকিয়ে থাকা মানুষটার পরনে বিচিত্র পোশাক, অনেকটা সন্ন্যাসীরা পরে যে-ধরনের পোশাক সেই ধরনের। তার পায়ে চামড়ার পাদুকা, লাল ধূতি, গায়ে ফতুয়ার মতো বস্ত্র খণ্ড, সেটার ওপর এক ধরনের পাতলা ধাতব জালের মতো বিছানো। মাথায় লম্বা চুল পাক দিয়ে ওপরের দিকে ওঠানো, মুখে ভারি গৌফ-দাড়ি। হঠাৎ দেখলে অনেক বয়স্ক মনে হয়। কিন্তু ভালোভাবে খেয়াল করে তার চেহারা দেখলে এবং সুগঠিত শরীর অবলোকন করলে বোঝা যায় তার বয়স কোনোভাবেই ত্রিশের কোঠা পার হয়নি।

মানুষটা অন্ধকারে বের হয়ে এসে ওদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে, এমন সময় সাঁই করে ওদের কানের পাশ দিয়ে কিছু একটা উড়ে গিয়ে লোকটার বুকে লাগল। জিনিসটাকে আসতে না দেখলেও ওটা যে একটা পাতলা ছুরি সেটা বোঝা গেল, ছুরিটা মানুষটার বুকের ধাতব জালে বাড়ি খেয়ে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ছুরির আঘাত সরাসরি তার বুকে না লাগলেও, মানে ছুরিটা বুকে গেঁথে না গেলেও ওটার আঘাতে তীব্র ব্যথায় বাঁকা হয়ে গেল মানুষটা। এই সুযোগে জ্যামুস্ত তীরের মতো আগের ওপড় দিয়ে উড়ে এলো পাতলা লম্বা শক্তিশালী একটা শরীর।

সিপাহী

কায়া নামের মেয়েটাকে ওদের পালানোর সময়ে সাহায্য করতে দেখেছে ওরা, তার গঠন এবং আকৃতি দেখলেই বোঝা যায় সে অত্যন্ত শক্তিশালী, বিশেষ করে মেয়েমানুষ হিসেবে। আর সে যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খুনি এটা তো সে নিজেই সরাসরি স্বীকার করেছে। তার পরও সে যে এতটা খিপ্র আর হিংস্র সেটা কেউই ঠিক ধরতে পারেনি। ছুরিটা ছুড়ে দিয়ে সে আগুনের ওপাশ থেকে সেফ উড়ে এলো। আগুনটা টপকে, তার লম্বা পাতলা শরীরটা মাটিতে একটা গড়ান দিয়ে সোজা হলো মানুষটার ঠিক সামনে, তার ডান হাতটা সরাসরি উঠে গেল মানুষটার উনুস্ত চিবুক এবং গলা বরাবর, তাতে ধরা একটা চিকন কিন্তু ভীষণ ধারাল ছুরি। ছুরিটার লক্ষ্য মানুষটার গলা।

কিন্তু সবাইকে আরো অবাক করে দিয়ে আহত এবং অপ্রস্তুত মানুষটা ততোধিক ক্ষিপ্ততার সঙ্গে ধরে ফেরল মেয়েটার ছুরি ধরা হাতটা।

মেয়েটা প্রায় নিশ্চিত ছিল সে লোকটাকে আঘাত করতে পারবে, কিন্তু সেটা করতে না পেরে সে খানিক ভারসাম্য হারাল। পলকের জন্যে দুজনে তাকিয়ে রইল দুজনার দিকে। মেয়েটাই আগে নড়ে উঠল, সে পা দিয়ে বিশেষ কায়দায় ধরে টান মানল লোকটার পায়ের কবজিতে, উলটে পড়ে গেল মানুষটা। ছুরিটা ছুটে গেল হাত থেকে, দুজনার থেকে ছিটকে পড়ল বেশ অনেকটা দূরে।

লোকটা মাটিতে পড়ে যেতেই শরীরটাকে একটা বাউলি কাটিয়ে লাফিয়ে উঠেই আবারো আক্রমণ চালান মেয়েটা, গড়িয়ে সরে গেল লোকটা। ছোট একটা তলোয়ার বেরিয়ে এসেছে মেয়েটার হাতে, সেটা দিয়ে শোয়া অবস্থাতেই কোপ মারল মেয়েটা। অস্ত্রের জন্যে কোপটা না লাগলেও, ছিটকে উঠে লোহার কিনারা গিয়ে বাড়ি মারল লোকটার হাতের কবজিতে, কাঠের সঙ্গে লোহার বাড়ি লাগলে যেরকম শব্দ হয় সেরকম শব্দ হলো অনেকটা। চোঁচিয়ে উঠল লোকটা।

‘এই থামো,’ ধমকে উঠল কর্নেল। অসহায়ভাবে সে নিজের লোকদের দিকে তাকাল। কেউই ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, কী করবে। পালোয়ানের কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছে সেদিকে তাকিয়ে।

ওদিকে দুই নারী পুরুষের লড়াই তুঙ্গে উঠেছে। লোকটা আঘাত পেয়েও উঠে দাঁড়িয়েছে আর মেয়েটা বন্য জন্তুর মতো লোকটার পিঠের ওপরে উঠে পেঁচিয়ে ধরেছে তার গলা, কর্নেল দেখল মেয়েটার দুই হাতে ধরা একটা ফাঁসের মতো জিনিস, সেটাকে লোকটার গলায় পরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে মেয়েটা, আর লোকটা চেষ্টা করছি যেকোনোভাবে এড়িয়ে যাওয়ার। দুজনেই আবারো পড়ে গেল মাটিতে। লোকটা এবং মেয়েটা ছিটকে পড়ল দুইদিকে, নিজের পিছু দিয়ে দুজনার মাঝ বরাবর গুলি করল কর্নেল। ‘খবরদার।’

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

লোকটা থেমে গেলেও মেয়েটা বনবিড়ালের মতো বাউলি কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল লোকটার দিকে, পালোয়ান তার সাত ফুটি লাঠিটা দিয়ে মেয়েটার এক ফুট সামনের মাটিতে বাড়ি মারল একটা। মাটি কেঁপে উঠতেই মেয়েটা থমকে গেল, মেয়েটার একেবারে কানের দুই ইঞ্চি দূরে নিজের বন্দুক থেকে গুলি করল ত্রিলোক। এবার থেমে গেলে মেয়েটা, বনবিড়ালের মতোই ফোঁসফোঁস করছে।

‘খামো!’ কর্নেল ধমকে উঠল। ‘হচ্ছেটা কি?’

‘ওকে জিজ্ঞেস করেন,’ মেয়েটা এখনো ফুলে ফুলে উঠছে, পালোয়ান তার একটা হাত ধরে না রাখলে ছুটেই যেত আবারো।

কিন্তু লোকটা তার একেবারে উলটো। সে একদম শান্ত, হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের হাত ডলছে সে, রক্ত গড়াচ্ছে আঘাত লাগা জায়গায়। ‘আমি বলতেছি,’ বলে লোকটা মেয়েটাকে দেখাল। ‘ওর অধিকার আছে আমারে মারার, হয়তো হত্যা করারও, কিন্তু আমার কথা আগে শুনতে হবে তার।’

‘কোনো কথা নেই,’ মেয়েটা চোঁচিয়ে উঠল। ‘বেইমানের আবার কথা কিসের!’ বলেই সে আবারো আক্রমণের ভঙ্গি করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে অস্ত্র তাক করল কর্নেল, পিস্তলটা ঢুকিয়ে রেখে সোলেমানের বন্দুক টেনে নিয়েছে সে। ‘সবাই চুপ, একদম শান্ত, যে-কথা বলবে আমি গুলি করব,’ কথার ভেতরে সবার কথা বললেও কর্নেল স্থির তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকেই। ‘শান্ত হও, যদি সে অপরাধী হয় আমি নিজে তাকে তুলে দেব তোমার হাতে। কিন্তু সবার আগে আমাকে সব শুনতে হবে, একদম শান্তভাবে। বোঝা গেছে?’ মেয়েটা এখনো ফোঁসফোঁস করছে কিন্তু কর্নেলের ধমক খেয়ে সে কিছুটা নীরব হলো। ‘আপনি বাধা দেন না দেন, আমি ওকে খুন করবই।’

‘আমি তো আগেই বলেছি, আমি অপরাধী। লোকটার গলা শান্ত। ‘কিন্তু তুমি যে কারণে ভাবছো সেটা নয়। তুমি যেমন বেইমানির শিকার হয়েছেো আমিও তেমনি, বেইমানির শিকার। আমি-তুমি আমাদের গোত্র এবং,’ বলে সে কর্নেলের দিকে ফিরে তাকাল। ‘আর আপনার বন্ধু, দুজনেই। একজন তো মারাই গেল, যে-মানুষের ভালো করতে গিয়ে ধুকতে ধুকতে বেঁচে আছে তাকে উদ্ধার করেন,’ বলে সে আবারো ফিরে তাকাল মেয়েটার দিকে, ‘যে-ভুল আমি করেছি, সেটার মাস্তুল হয়ে গেল আমি শুনাগার, আমাকে যে-শাস্তি দেবে মেনে নেব। তুমি যেমন তোমার গোত্রের কাছে মারা গেছ, আমিও তেমনি।’

‘সবাই চুপ,’ কর্নেল আবারো ধমকে উঠল। ‘আমরা এটা বুঝতে পারছি, এখানে উপস্থিত প্রতিটা মানুষ একটা বিরাট ধাঁধার টুকরো টুকরো অংশমাত্র। আমার বিশ্বাস আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সাহায্য করতে পারব,’ বলে সে

সিপাহী

আবারো সবার দিকে দেখে নিল। 'তবে এভাবে না। আমরা শান্ত হয়ে আগে খাওয়া-দাওয়া করব, তারপর তামাক খেতে খেতে সব শুনব। আমি কর্নেল স্যান্ডার্স কথা দিচ্ছি, যেকোনো মূল্যে প্রত্যেকের যথাযথ পাওনার ব্যবস্থা আমি করব। কিন্তু আমাকে আগে সব জানতে হবে, বুঝতে হবে। ঠিক আছে?' কর্নেল লোকটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। 'ঠিক আছে?' এবারের প্রশ্ন মেয়েটার দিকে।

'আপনে কথা দিচ্ছেন?' মেয়েটার প্রশ্নের জবাবে কর্নেল মাথা নেড়ে সায় জানাল। মেয়েটা একটু সরে গিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে মাথার দু পাশে হাত তুলে সায় জানাল।

'তোমরা খাবার আয়োজন করো আমি সব শুনতে চাই।'

'আমার নাম মিস্তি,' সেই সন্ন্যাসীর মতো দেখতে লোকটা বলতে শুরু করেছে।

'মিস্তি!' কর্নেলের কুঁচকে ওঠা ক্রুর দিকে তাকিয়ে ত্রিলোক বলে উঠল, 'মিস্তি অর্ধ মাটি।'

'জি, মাটি,' ছেলেটা তাকিয়ে রয়েছে আগুনের দিকে। মানুষটাকে প্রথমে লোক ভাবলেও আসলে সে ছেলেই। মুখের লম্বা দাড়ি আর মাথার জটা দেখলে চট করে মনে হবে অনেক বয়স, প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি কিন্তু আদতে তা নয়। বয়স তার ত্রিশের কম। ছেলে আর মেয়েটার মারামারি থামানোর পর ওরা খেয়ে নিয়েছে দ্রুত। খাবার মেয়েটার সঙ্গেই ছিল, কিন্তু সে-ই খায়নি বলতে গেলে, ছেলেটাও খায়নি। কর্নেলের দল অবশ্য এসবের পরোয়া করেনি। সবাই বেশ ক্ষুধার্ত ছিল এবং খেয়েছেও ভরপেট। খাবার পর আগুনটাকে আবার উসকে দিয়ে এখন আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসেছে সবাই। কর্নেলের পাইপ হাতে ধরে বসে আছে, ভিজ্জে সব অবস্থা খারাপ। সোলেমানের সমস্যা নেই, সে তামাক চাবায়, ভিজ্জে বরং সুবিধা ক্ষেত্রবিশেষে। অন্যদিকে পালোয়ানও কীভাবে জানি তার শলাকায় আগুন ধরিয়ে টানছে। কর্নেল একটু পর পর ঋনিক হিংসার দৃষ্টিতে তাদের দুজনার দিকে তাকাচ্ছে আর নিজের হাতের পাইপটা নাড়া-চাড়া করছে।

'আমার বাবা,' ছেলেটা বলে চলেছে। বলতে বলতে সে মাথা নাড়ল সামান্য। 'মানে আমার নিজের পিতা নয়, বলতে গেলে যিনি আমাকে খুঁজে পেয়েছিলেন এবং যার অধীনে আমি বড় হয়েছি। তাকে এমনকি আমি বাবা

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

কলার অধিকারও হারিয়েছি, সারাজীবন বাবা বললেও এই ঘটনার পর আমি আমার গোত্রের মানুষ, ভাইয়েরা সবাইকেই নিজের সম্পর্ক দিয়ে ডাকার অধিকার হারিয়েছি,' বলে সে আগুনের অন্যপাশে বসে মাটিতে নিজের হাতের ছুরি দিয়ে আঁকিবুকি আঁকতে থাকা মেয়েটার দিকে তাকাল, মেয়েটাও চোখ তুলে তাকিয়েছিল, চোখাচোখি হতে দুজনে সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি সরিয়ে নিল। 'আমি একজন আরোঘী। আর আরোঘীদের সব নিয়মই আলাদা।'

'আরোঘী!' ত্রিলোক খুবই বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল। 'বুঝলাম না, আজকে, একজন দাবি করছে বিষকানিয়া, আর অন্যদিকে আরেকজন দাবি করছে আরোঘী, যে-দুই দলের কেউই আসলে কখনোই নিজেদের পরিচয় কারো সামনেই প্রকাশ করে না, এমন মানুষেরা নিজেদের পরিচয় বাকি দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করার জন্যে এত উত্তপ্ত কেন হচ্ছে, আমি নিজেই বুঝতে পারলাম না,' বলে সে সোলেমান আর পালোয়ানের দিকে দেখে জানতে চাইল। 'এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?'

'কায়ো যেটা বলেছে,' বলে সে না তাকিয়ে মেয়েটার দিকে দেখাল। 'আমিও একই কথা বলব। বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ব্যাপার, আমি সত্যি বলছি।'

'তুমি বলে যাও,' কর্নেল বলল, আড়চোখে সে পালোয়ানের বাঁশের হুকোর দিকে দেখল। আরেকবার চেষ্টা করবে কি না ভাবছে মনে মনে।

'আমরাও একটা বিশেষ ধরনের গোত্র, আমরা নিজেদের সত্যের ধারক বলে দাবি করি এবং আমাদের নিজেদের কিছু রহস্য এবং নিয়ম আছে।'

'আমি তো জানি তোমরা স্রেফ খুন করে বেড়াও,' ত্রিলোক বলে উঠল। 'ওই বিষকানিয়াদের মতোই।'

মিস্তি নামক ছেলেটা বড় করে দম নিল। 'খুন আমরা করি, বলতে গেলে আমরাও খুনি, বিষকানিয়াদের মতোই,' ছেলেটা এটুকু বলতেই মেয়েটা ধমকে উঠল ওপাশ থেকে, 'আমার গোত্রের নাম মুখে নেবে না।'

ছেলেটা তার দুই হাত তুলে মানা করল। 'ঠিক আছে।'

'শোন মিস্তি, কর্নেল বলে উঠল। 'তোমার গোত্রের কাহিনি কিংবা তোমাদের দুজনার ভেতরে আসলে কী হয়েছে এই বিষয়ে জানার তেমন কোনো অগ্রহ আমার আসলে নেই। আমি স্রেফ অগ্রহী দুটো বিষয় নিয়ে, এক, আমার বন্ধু ভিক্টর কোথায়, আর দুই, ভিক্টর আর্থার এবং আমাদের সঙ্গে তোমাদের সংযোগটা কোথায়?' বলে সে হাত তুলে বড় করে দম নিল। 'সত্যি কথা হলো

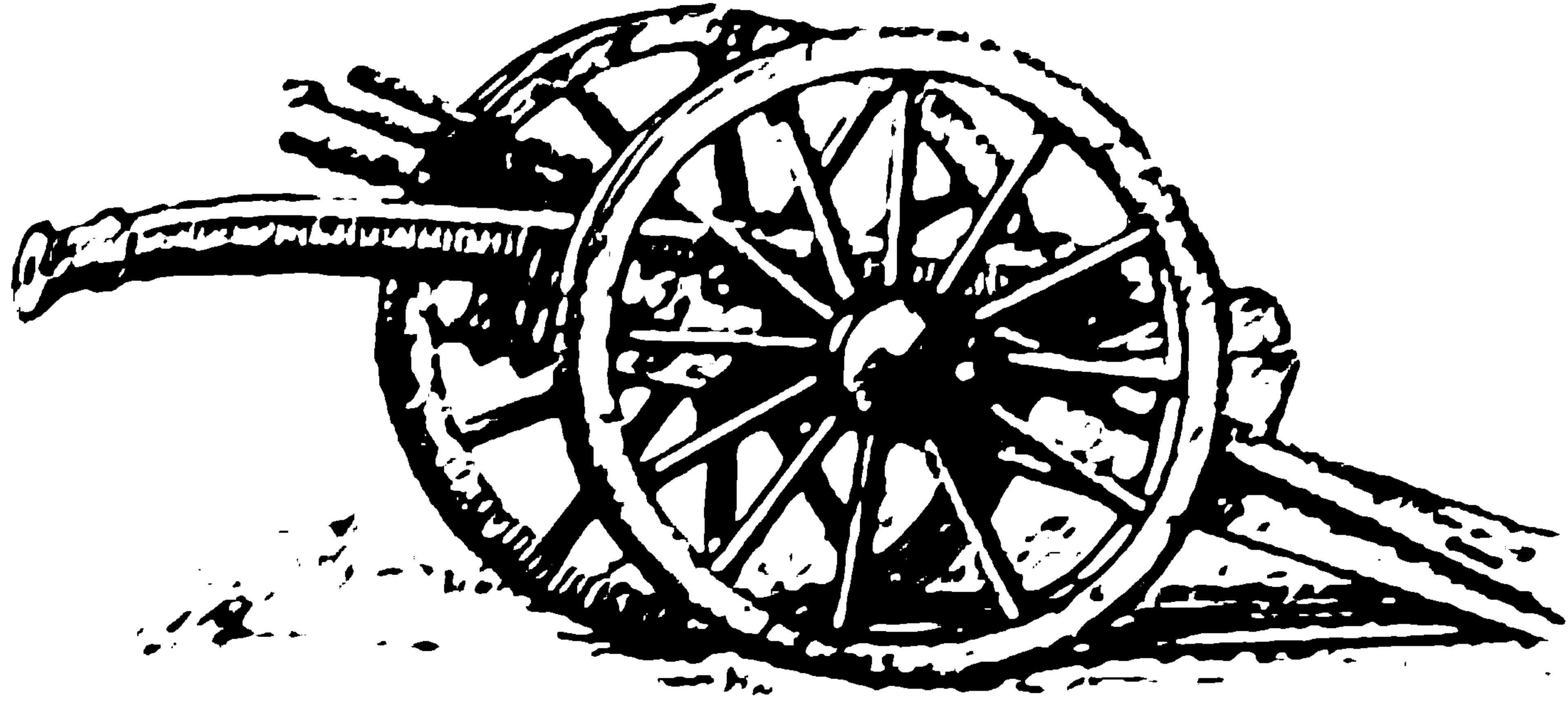


সিপাটী

‘আমি ভারতে এসেছিলাম আপনার বন্ধুকে উদ্ধার করতে, আর এই প্রাণত্যাগ করতে করতে আমি ক্লান্ত।’ ‘আমি সত্যটা জানতে চাই।’

‘আপনি ভারতে শুধু আপনার বন্ধুকে উদ্ধার করার জন্যে আসেননি; ছিঃ ছেলেরা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কর্নেলের দিকে। কর্নেল ঘটাং বসে চমকে গেছে ছেলেরা কথা শুনে এবং ছেলেরা চোখের দিকে তাকিয়ে! ৩ অনেকে এসব সন্ধ্যাসী বা শুনিতা নানাতাবে সম্বোধন করতে পারে কল্পনায়। ছেলেরা এখনো এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কর্নেলের দিকে। ‘আপনি ভারতে কেন এসেছেন কর্নেল?’

কর্নেলও চুপচাপ তাকিয়ে রয়েছে ছেলেরা দিকে। ‘আপনি ভারতে এসেছেন আপনার আত্মার ব্যক্তিগত যাত্রা অনেকটা ঝুঁজে বের করার জন্যে। বন্ধুকে ঝুঁজে বের করাটা আপনার পোজের অংশমাত্র। আর আমি যা করছি, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমার গোত্র, আপনার দুই বন্ধু, এই বিদ্রোহের ক্ষিপ্রদায়ক এবং আপনাদের দুজনার প্রেম,’ বলে ছেলেরা আবার তাকাল মেয়েটার দিকে। ‘সবটা তন্দ্রেই হবে আপনাদের,’ বলে সে নিজের চোখ বন্ধ করে ফেলল। ‘আমি শুধু ভারতবর্ষ না, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন বিবর্তনশীল একটি বস্তুকে বোঝতে যাচ্ছি আপনাদের।’



অধ্যায় সাতাশ বর্তমান সময় বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকা

‘এসব পৃথিবীর প্রাচীন ব্রহ্মা, দুনিয়া বদলে যাওয়া, সিক্রেট সোসাইটি এসব সস্তা
য়ে বইতে মানায়, বিশেষ করে আজতবি সব ক্রিমার বইতে,’ বলে জয়া সরকার
ক নাচল। ‘আপনার মতো একজন ঘাণ ব্যবসায়ীর কাছে যদি এগুলো জন্মে
হয়, ব্যাপারটা দুঃখজনক।’

জয়া সরকার ভেবেছিল মানুষটা গ্রেসে যাবে, তার কথা শুনে। কিন্তু উল্টো
দেসে উঠল সে জয়ার কথা শুনে। ‘শোন ইগনোরেন্স এক ধরনের নেতা এক এই
নেতার আশ্রয় করেবেশি সবাই অন্ধনত। বিশেষ করে আমাদের আইডেনটি বরন
কানোইত।’

‘নানে?’ জয়ার গলায় বিষ্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন।

‘অল্প বয়সে ইগনোরেন্স এক ধরনের হিরোইজম, বধ্যবৃত্তে ইগনোরেন্স
হলো ইন্টেলেকচুয়ালিটি, আর বয়সকালে ইগনোরেন্স হলো অস্টিজিকেশন,’
আলী আজগরের কথা শুনে জয়া আবারো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে হাত
তুলে থামিয়ে দিল আলী আজগর। ‘বেমন তুমি কলো, এসব গল্পগুলো
আজতবি ক্রিমার বইতে থাকে, মনেই পারে। বিষয়টা কেন ইন্টেলেকচুয়ালিটি
জানো? এটাকে আমি বলি ইন্টেলেকচুয়াল মাস্টারশিপ। মাস্টারশিপ বেমন
প্রিন্সেল সেক্স নয়, তেমনি, অকারণ ইন্টেলেকচুয়ালিটি দেখানো এক ধরনের
বুদ্ধিবৃত্তিক হাত মারার মতো। যে-হিন্দী সিনেমা দেখে সে যেমন বাংলা
সিনেমাকে বলে এতলা আজতবি, আবার যে হলিউডে দেখে সে যেমন শাহরুখের
হাত ছড়ানোর বিষয়টাতে উড়িয়ে দেয়, ঠিক তেমনি যে তরকোভজির ক্যান সে
আবার মেইন স্ট্রিম হলিউডকে উড়িয়ে দিতে চায়। ভুল দাবি করতে চায়,’ বলে

সিপাহী

আলী আজগর নিজের মাথাটাকে সামনে এনে চায়ের কাপে চুমুক দিল। ‘এগুলো সবই আসলে সবই যার যার জায়গা থেকে ইগনোরেন্স, সবই যার যার জায়গা থেকে কখনো হিরোইজম, কখনো জাস্টিফিকেশন, আবার কখনো ইন্টেলেকচুয়ালিটি। যাক গে কথাগুলো বললাম তোমার কথার পরিপ্রেক্ষিতেই।’

‘আপনি মূল বিষয়টা বলছেন কেন?’

‘এই কথাগুলো এই কারণেই বললাম কারণ তুমি বিষয়টাকে ইগনোর করতে চাচ্ছে। তুমি যতই হালকা করো এটার গুরুত্ব বুঝতে হলে তোমাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তুমি ভাবছো এসব কান্ট মিথ এগুলো সব গালগল্পো, ঠগিরো কি বাস্তবে ছিল না। বিশ থেকে চল্লিশ লাখ মানুষ তারা হত্যা করেছে অর্ধশত বা তারো বেশি সময়ের ব্যবধানে। মগরা কি হাজারো বাঙালিকে ধরে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়নি। আচ্ছা ঠিক আছে, ধরে নিলাম, অতীতে এসব ছিল, এখন আর নেই। তাহলে আমাকে বলো, রথচাইল্ড ফ্যামিলি কারা, ওরা কী করে, কীভাবে পুরো বিশ্বের অর্থনীতি-রাজনীতি ম্যানুপুলেট করে মেইনটেন করে। সম্রাট আশোকের আননোন নাইন, গোড়া ক্রিস্টিয়ান বিশ্বাসের ওপাস দাই, রেসিস্ট কান্ট কুক্কান, এরকম হাজারো গোপন সংগঠন রয়েছে—’ কথাগুলো উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে সে হঠাৎ থেমে গেল। ‘হোয়াটএভার আমি পয়েন্টে আসি।’

‘প্রফেসর আবদেল আসলে কিসের সন্ধান পেয়েছিল,’ জয়া কেমন যেন ফিসফিসানো ভঙ্গিতে জানতে চাইল। তার গলার স্বরটা এমন যেন, জোরে বললে কেউ শুনে ফেলবে। ‘ডেভিড আসলে কিসের খোঁজ করছিল।’

‘আকাশ খনে আইলো মণি, সোনার বাগ্জে মোড়ানি, মণি মণি একটা মণি, দুইটা মণি চাইর চাইরটা মণি,’ আলী আজগর ছোট বাচ্চাদের মতো সুর করে ছড়া কাটার ভঙ্গিতে বলে উঠল। ‘মণির নাম চিন্তামণি,’ বলে হা-হা করে হাসতে লাগল। ‘কি বাচ্চাদের ছড়া মনে হচ্ছে?’ সে একে একে দেখল জয়া সরকার, রমিজ দারোগা আর কনস্টেবল ফকিটের দিকে। ‘সবকিছুর শুরু এই ছোট এক ছড়া থেকে। এই ছড়ার ভেতরে লুকিয়ে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং পুরনো মিথগুলোর একটা। তোমরা কেউ এইড্রিয়ান মেয়োর নাম শুনেছো?’ প্রশ্নটা করেও আলী আজগর থামল না। সে জানে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। তাই সে উত্তরের আশা না করে বলে চলল।

‘ইনি একজন মহিলা, স্ট্যানফোর্ডের প্রফেসর। উনার নাম শুগলে সার্চ করলেই দেখতে পাবে। আমার একবার সৌভাগ্যও হয়েছিল উনার সঙ্গে দেখা

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

করার কোনো এক কনফারেন্সে। উনার একটা বিখ্যাত বই আছে, দ্য ফাস্ট ফসিল হান্টার। এই বইটা ভদ্রমহিলার একটা রিয়েল লাইফ প্রজেক্টের অংশ। প্রজেক্টের নামই হলো ফসিল হান্টারস। এই নামে উনার একটা সংগঠনও আছে। প্রফেসর আবদেল কোনো এক কনফারেন্সে এই মহিলার সঙ্গে পরিচিত হন এবং ভদ্রমহিলার এই প্রজেক্টের ব্যাপারে জানতে পারেন। সেই সময়ে প্রফেসর আবদেল দীর্ঘ সময় মিশর এবং মিডল ইস্টে কাজ করতে করতে ভীষণ টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলেন। উনি দেশে ফিরতে চাচ্ছিলেন, ইন্ডিয়ান সাব-কনটিনেন্ট নিয়ে কিছু একটা করতে চাচ্ছিলেন। সেই সময়ে উনি এই প্রফেসরের প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে পারেন। এই সংগঠন মূলত যা করে, সেটা হলো মিথলজিবিদ্যাত যত প্রাণী আছে সেগুলোর বাস্তব অনুসন্ধান করে। কলতে গেলে এরা হলো, ফসিল হান্টার এবং মিথলজি ইনভেস্টিগেটর। যেমন ধরো হাইড্রা একটা মিথিক্যাল ফিগার, এটার বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব ছিল কি না, কিংবা হাইড্রার কনসেন্ট বাস্তবে কোন প্রাণী থেকে এলো, কীভাবে এলো সেটার ট্রেইল ধরে পুরো ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করাই এদের কাজ।

‘প্রফেসর আবদেল উনার সঙ্গে কথা বলে খুব উত্তেজিত হয়ে সে ভারতীয় অনেক কিছু শেয়ার করে উনার সঙ্গে। যেমন ধরো জটায়ু, আচ্ছা আরো ডিপ এক্সামপল দিই, মাকারা ইন্ডিয়ান মিথোলজিতে বর্ণিত একটা সামুদ্রিক প্রাণী, যেটা কুমির এবং হাতির মিশ্রণের মতো অনেকটা। আবার ধরো সরভা, বলা হয়ে থাকে যেটার শরীর সিংহের আবার আটটা পা, যেটাকে শিবের অবতারও বলা হয়। এরকম কিছু বিষয়ে প্রফেসরের সঙ্গে শেয়ার করার পর, দুজনের দারুণ কিছু আলোচনা হয় এবং প্রফেসর সিদ্ধান্ত নেন, উনি দেশে ফিরে ভারতীয় মিথ এবং এগুলোর অরিজিন নিয়ে কাজ করবেন। ফিরে উনি আসেন, কাজও শুরু করেন কিন্তু উনি বের করে ফেলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু। একেবারেই ভিন্ন এক মিথ, যেটা বদলে দিতে পারে পুরো দুনিয়ার ভারসাম্য, তারচেয়েও বড়কথা যেটার বাস্তব এখন অস্তিত্ব অনেকটাই প্রমাণিত।’

‘টমি তুই কি নিশ্চিত?’ বলে বাশার আশপাশে দেখল। ‘এখানে তো আসলেই কিছু নেই।’ প্রশ্নটা বাশারের মুখ থেকে উচ্চারিত হলেও টমির কোনো মন নেই বাশারের প্রশ্নে, সে একমনে কিছু একটা ঘেঁটে চলেছে। ‘টমি?’

‘হুমমম,’ সে তার কাজ করে চলেছে, বাশার পেছন ফিরে একবার তাকে দেখে সামিরা আর রুশোর দিকে দেখে নিল। ‘আমি কি আরো এগোব?’ ওরা

সিপাহী

এই মুহূর্তে অবস্থান করছে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল এলাকার দিকে। ডেভিডের চিপে অবস্থানটা এখানেই দেখাচ্ছিল। ময়মনসিংহ শহর থেকে খানিক সরে এসে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢুকে খানিক ডানে মোড় নিয়ে হল এলাকায় প্রবেশ করে ওরা, কয়েকটা হল পার হয়ে এলেও নির্দিষ্ট জায়গাটা পিন পয়েন্ট করতে পারছে না ওরা। বিশেষ করে এমন জায়গার অবস্থান দেখাচ্ছে যেখানে আসলে কিছুই নেই।

‘এগোতে থাকো, দেখি টমি কি বলে,’ টমি উত্তর না দিলেও সামিরা কথা বলে উঠল। রুশো একমনে তার মোবাইল ঘাটছে, যদিও বাশার তিন চিহ্ন ছিল কিন্তু কণিকের জন্যে সে ত্রুটি কুঁচকে রুশোকে দেখল। কিছু একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল ছেলেটাকে, কারণ রাতের সেই ছিনতাইয়ের ঘটনার পর থেকে, ছেলেটাকে ওর একটু অন্যরকম লাগছে। কে জানে অতিরিক্ত মানসিক চাপ, বিশ্রামহীন সময়ের জন্যেই এমন হচ্ছে কি না। কিন্তু সে কিছু করার আগেই টমি চিৎকার করে উঠল, ‘বাস বাস বাস, এখানেই লোকেশন।’

‘এখানে, তুই শিওর?’ বাশার আবারো জ্ঞানতে চাইল। ‘এখানে তো—’

‘এখানেই বস, গাড়ি সাইড করো, নামি আমরা,’ বলে সে ল্যাপটপের ভান্না নামিয়ে দিল।

বাশার গাড়িটাকে পার্ক করে থামল। প্রথমেই জিপের পেছন থেকে লাফ দিয়ে নামল টমি, তার এক হাতে ল্যাপটপ ভাঁজ করা। ‘এই জায়গাই,’ সে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলটাকে দেখাল আঙুল তুলে। ‘দুটো জিনিস কনফার্ম করছে বিষয়টাকে। কারণ প্রথমত রেকর্ড বলে ডেভিড, প্রথম যখন ময়মনসিংহে এলো, সে এখানেই অবস্থান করেছে হলের ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউসে। দ্বিতীয়ত, লোকেশনও এখানেই বলছে।

‘হ্যাঁ, এটা এই ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল হয় এবং এখানে ইন্টারন্যাশনাল গেস্টদেরও থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই সে এখানে থাকতেই পারে, যেহেতু তার বেশ কিছু সরকারি লিয়াজোঁও ছিল,’ বাশার বলে উঠল। ছোটকোষ সে এখানে এসেছে বেশ কয়েকবার। ‘কিন্তু ডেভিডের সোর্স আসলে কতটা পিন পয়েন্টেড?’

‘বুঝ বেশি না, সবাই ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করো। এখানেই আশপাশেই কোথাও এবং কিছু একটা আছে,’ বলে ওরা সবাই ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করল।

অন্তকারের ভেতরে একাধিক চোখ অনুসরণ করছে তাদের প্রতিটা কার্যকলাপ।

‘প্রফেসর আবদেল ইভিয়ান সাবকনটিনেন্টের বিভিন্ন মিথ নিয়ে কাজ শুরু করেন। উনার ইচ্ছে ছিল পরবর্তীতে প্রফেসর এড্রিয়ানের মতো একটা টিম

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর কৈলা

হানিয়ে ইন্ডিয়ান মিথোলজির বিভিন্ন বিষয়ে ইনভেস্টিগেশন করা। উনি কাজ করতে গিয়ে ভারতীয় মিথোলজির একটা লাইনে আটকে যান।’

‘মণি মণি,’ জয়া সরকার বলে উঠল। ‘ওই ছড়া যেটা বললেন আপনি?’ তার গলায় একই সঙ্গে কৌতূহল এবং বিদ্বেষ। ‘ওই বাচ্চাদের ছড়ায় এত গভীর কীসের সন্ধান পেলেন উনি?’

‘কল্যাম তো এই ছড়া আসলে ছড়া না, আমি ছড়ার মতো করে এবং সহজ করে বলেছি। কিন্তু বিষয়টা অনেক গভীর এবং এই ছড়ার রেফারেন্স বহু জায়গাতে রয়েছে। প্রাচীন তিব্বতীয় পুঁথি থেকে শুরু করে আধুনিক অনেক ক্রিপ্টারে পর্যন্ত। ইংরেজিতে এটাকে কলা হয় ‘ফোর রেলিক্স দ্যাট ফেল ফ্রম দ্য ফাই’, এইটুকু বলে আলী আজগর নিজের পায়ের ভর পরিবর্তন করল। ইশারায় সে তার পাহারাদার লোকটাকে ডাক দিল। তাকে কানে কানে কিছু বলতে লোকটা বেরিয়ে গেল।

‘ফোর মানে, চারটা রেলিক?’ জয়া সরকার জানতে চাইল।

‘হ্যাঁ, চারটা, তবে বর্তমানে আমাদের বিষয়ের জন্যে সংখ্যাটা ভুলে যাও, এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আকাশ থেকে পতনের বিষয়টা। মিথটা আগে বলে নিই, এরপর এর স্বল্প ইতিহাস এবং সঙ্গে এর বাস্তবভিত্তিক গুরুত্বটা বলব আমি। এই চার রেলিকের পতনটা তিব্বতের শাসন এবং বুদ্ধিজন্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সম্ভবত তিব্বতের আটশতম কি ত্রিশতম রাজা, আমার সঠিক মনে নেই। নাম ছিল সম্ভবত ধখোরি নিয়ানসেম বা নিয়ানসেন। তার কাছে প্রথম বুদ্ধিজন্মের ক্রিপচার বা বার্তা পৌঁছায়। আর সেটা পৌঁছানোর ধরনটাও ছিল খুবই অদ্ভুত। মিথ বলে, ক্যাসকেটে মোড়ানো রেলিকগুলো বা বার্তাটা এসেছিল রাজার কাছে আকাশ থেকে। এর ভেতরে একটা ছিল চিত্রাংগি, যেটাকে উইজডোম স্টোনও বলে। আবার অনেক পপুলার কালচারেও এর রেফারেন্স রয়েছে। যেমন ডেভিড লিঙ্কের বিখ্যাত টিভি সিরিজ ‘টুইন পিক্সের’ কোনো একটা পর্বে সম্ভবত এর রেফারেন্স ছিল। এই মিথ বুদ্ধিস্ট ফিলোসফির সঙ্গে কানেক্টেড, এটার আবার আরো কিছু ভার্সন রয়েছে। যেটার সঙ্গে হিন্দু মিথোলজির সংযোগ রয়েছে, আমার সঠিক মনে নেই যদিও।’

‘এর মানে এই মিথ তো অনেক পুরনো।’

‘কল্যাম কি সৃষ্টির আদি রহস্যগুলোর একটা। আপাতত মন দাও আকাশ থেকে পতনের ওপরে। বুদ্ধিজন্ম, তিব্বত, এনশিয়েন্ট হিন্দু মিথোলজি, তিনটার কানেকশন পেলাম। এবার আরো কিছু রেফারেন্স দিই, সেইম একটা মিথ রয়েছে ইরানে, পার্শিয়ান হিস্ট্রিতে রাজা পায়াম নামে এক রাজার উল্লেখ রয়েছে, যার সেনাবাহিনী নাকি, জেরেব্রিসের বাহিনীর মোকাবিলা করতে গিয়ে

সিপাহী

যখন নাবানিচুবানি খাচ্ছে, সেই সময়ে আকাশ থেকে কিছু একটা উড়ে এসে তার সেনাবাহিনীকে সহায়তা করেছে, যেটা নাকি বদলে দিয়েছিল জেরেক্সিসের সেনাবাহিনীর ওই অংশটাকে।’

‘আপনি এত এত রেফারেন্স দিয়ে আসলে কী বোঝাতে চাচ্ছেন?’

‘চুপচাপ শোনো, আগেই বলেছি বিষয়টা অনেক বড় এবং গভীর। আমার সঙ্গে সঙ্গে গোন, আকাশ থেকে পতন, বদলে যাওয়া, তিক্তত, বুদ্ধিজন্ম, এনশিয়েন্ট হিন্দু মিথোলজি, প্রাচীন পার্শিয়া, প্রাচীন চীন, কতগুলো জায়গায় এই আকাশ থেকে পতনের বিভিন্ন ভার্সন প্রচলিত রয়েছে খেয়াল করো।’

‘এখন শুধু ইউরোপটা বাকি,’ জয়া ফোরন কাটার মতো করে বলে উঠল।

‘সেটাও আছে, তবে সেটা পরে বলছি, এখন বললে গল্পে স্পয়লার হয়ে যাবে। এতগুলো রেফারেন্স যে দিলাম, মিথের কথা বললাম, এ-থেকে কী বুঝলে?’

‘আপনি এমন কিছু একটার কথা বলছেন যেটার এক্সিজটেন্সের কথা অনেক মিথোলজি আর স্ক্রিপচার এবং কালচারে রয়েছে।’

‘ভেরি গুড, তুমি সবসময়ই বুদ্ধিমান জয়া, এই জন্যই তোমাকে আমি ভালোবাসি। এবার আমরা আরেকটু কাছের ইতিহাসে আসব। বিগত যে কয়টা কেস ঘটেছে, ঠগি, ঠগিদের অরিজিনের ক্ষেত্রে পার্শিয়ান একটা কানেকশন রয়েছে। রাজা জেরেক্সিসের বাহিনীর একটা অংশ চামড়ার ফালি দিয়ে মানুষ হত্যা করত রক্তপাত না ঘটিয়ে। তাদের দেবী ছিল মা-ভবানী, মানে মা-কালী। ওদের প্রতীক কি ছিল?’

‘টুইন কালী,’ জয়া অস্ফুটে বলে উঠল।

‘ব্র্যাক বুদ্বা, যে-মূর্তি নিয়ে কাহিনি, সিলেট থেকে একজন এজেন্ট উদ্ধার করেছে, যেটা আবার পাওয়া গেছে আসাম থেকে। সেই মূর্তি, আবারো বুদ্ধিজন্মের রেফারেন্স। চট্টগ্রামে মোগল সম্রাট শাহ সুজার হারানো ট্রেজার। কিশোরগঞ্জের পুকুর থেকে তুলে আনা সম্পদ—’

‘আপনি এটা জানলেন কীভাবে?’

আলী আজগর বিরক্ত হলো জয়ার প্রশ্ন শুনে। ‘আমার ইনসাইডার লোক আছে। যাই হোক, আলোচনায় আসি। যা যা বললাম এগুলো সবই কানেকটেড।’

‘কীভাবে?’

‘টুইন কালী কি দিয়ে তৈরি তুমি জানো, বুদ্ধমূর্তি কী দিয়ে তৈরি তুমি জানো?’

‘না,’

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

‘দুটোই এমন ধরনের ধাতু দিয়ে তৈরি, যেটার আধুনিক বিজ্ঞানে কোনো স্থান নেই। মিথ বলে দুটোই আকাশ উদ্ধাপিণ্ডের গলিত লাভা থেকে বিশেষ ধরনের ধাতু দিয়ে বানানো হয়েছে। আমার বিশ্বাস সেই জিনিস তুমি পাবে যোগলদের হারানো ট্রেজারে এবং বারোভূঁইয়াদের কেসের সঙ্গে সংযুক্ত সম্পদের ভেতরেও। সবক্ষেত্রেই এমন কিছু না কিছু রয়েছে যেই ধাতু আসলে পৃথিবীর নয়, বাইরে থেকে এসেছে। উদ্ধাপাত বা এমন কিছুর মাধ্যমে।’

‘আকাশ থেকে পতন!’

‘একদম ঠিক,’ আলী আজগর খুশি হয়ে উঠল।

‘তাইলে কি এইগুলো সব এলিয়েন নিয়া?’ অনেকক্ষণ পর কনস্টেবল আবদুল্লাহ কথা বলে উঠল।

‘ধুর মিয়া,’ জয়া এবং আলী আজগর দুজনেই বিরক্তির সঙ্গে তাকাল তার দিকে। ‘তোমার কি মনে হয় আমরা ফাইজলামি আলোচনা করতেছি এখানে?’ আবদুল্লাহ আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলে আলোচনা চালিয়ে যেতে বলল।

‘তোমাদের আমি বুদ্ধিজমের আকাশ পতনের কথা বলেছি, ট্রানশিয়েন্ট, হিন্দু মিথলজির বাহন, তিব্বতের রাজা, পার্শিয়ান মিথ—এগুলো বাদেও এর রেফারেন্স পাবে তুমি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। যেমন ধরের হাতুড়ি কীভাবে বানানো হয়েছিল?’

‘ফ্রম দ্য হার্ট অব আ ডাইং স্টার।’

‘যদিও কমিক্সে ভিন্নভাবে বলা আছে কিন্তু একভাবে বলা যায় উদ্ধাপিণ্ডের গলিত লাভার রেফারেন্স রয়েছে। ব্র্যাক প্যাছারের উয়াকাভার ভাইব্রেনিয়াম, ওটাও আকাশ থেকে পতিত হয়েছিল। আবারো আকাশ থেকে পতনের রেফারেন্স। ডেনম, সুপারম্যানের পৃথিবীতে আগমন থেকে শুরু করে এমন হাজারো মডার্ন ডে রেফারেন্স পাবে যেখানে এই আকাশ পতনের রেফারেন্স রয়েছে এক হাজারটা ভিন্ন উপায়ে। সব এক সূত্রে গাঁথা এবং সব রেফারেন্স লিড ব্যাক করে একটা দিকেই।’

‘কি সেটা?’

‘পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আকাশ থেকে উদ্ধাপাতের মাধ্যমে এমন সব ধাতু এসেছে যেগুলোর প্রপারটিজ আমাদের পৃথিবীর প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট এবং মানুষসৃষ্ট ধাতু থেকে একেবারেই আলাদা। সেই প্রাচীনতম যুগ থেকে মানুষ নানাভাবে সেগুলোকে পেয়েছে এবং ভিন্ন ভিন্নভাবে সেগুলোকে সংরক্ষণ করেছে এবং সেগুলোর পূজা করেছে। এর ভেতরে যেগুলো অস্বাভাবিক ক্ষমতালালী, অস্বাভাবিক শক্তিশালী সেগুলোকে নানা ফর্মে এবং নানা শেপে লুকিয়ে রেখেছে কখনো আমাদের চোখের সামনে, কখনো আমাদের

সিপাহী

চোখের আড়ালে। আর সেসব অস্বাভাবিক শক্তিশালী ধাতুগুলোকে যাতে প্রয়োজনে খুঁজে বের করা যায় সেজন্য সেগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করে এমন কিছু আংটি বানানো হয়েছে, সেগুলোর স্যাম্পল এবং কু লুকিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত নানা, গোত্র এবং তাদের সৃষ্ট চরিত্র ও কনসেন্টের মাধ্যমে।’

‘সিগনেট রিং,’ জয়া অস্কুটে বলে উঠল।

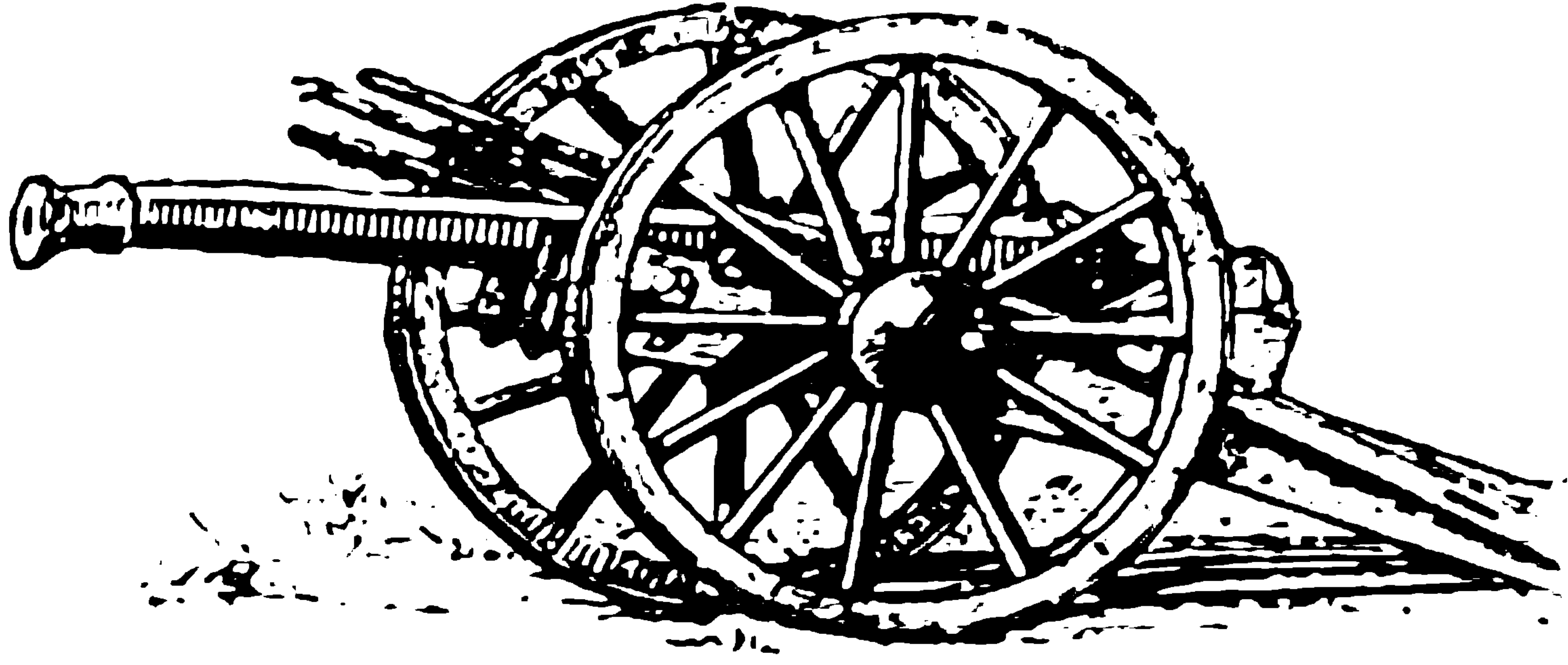
‘এগজেক্টলি ডেভিড এই সিগনেট রিংগুলো খোজার জন্যই ভারতে এসেছিল,’ বলে সে একটু খেমে যোগ করল। ‘এবং সে পেয়েছিলও, আর বাকিগুলোর সন্ধান বের করেছিল এবং সে জানত বাকিগুলো কোথায় বা কীভাবে পাওয়া যাবে।’

‘এখানে প্রফেসর আবদেল এবং ইফতেখারের ভূমিকা কি?’

‘ও বলতে ভুলে গেছি, এই পুরো বিষয়টা প্রফেসর আবদেলই ইন্ডিয়ান মিথোলজি ঘাঁটতে গিয়ে আবিষ্কার করে। সেই সঙ্গে সে ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে জানতে পারে এই সিগনেট রিংগুলো কোনো না কোনোভাবে আসাম-বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গের আশপাশে রয়েছে। সেই সরকারের ওপরে ক্ষোভ ঝাড়তে গিয়ে ডেভিডের সঙ্গে শেয়ার করে এবং এর পরেই ডেভিড তার সংগঠনকে জানিয়ে ওগুলোর সন্ধান করতে আসে।’

‘আমার দুটো প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্ন, এই রিংগুলো এখানে এলো কীভাবে?’

‘কয়েকটা রিং এখানকারই, আর বাকিগুলো পার্শ্বীয়া এবং মিশর থেকে এসেছে। শোনা যায় বিভিন্ন গোত্রের মাধ্যমে এসেছে কিন্তু কীভাবে এসেছে সঠিকভাবে জানা নেই। তবে এর সঙ্গে প্রাচীন ভারতেরও সংযোগ তো আছেই। সেইসঙ্গে বারোভূঁইয়া, সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ঘটা কিছু ঘটনা, এমনকি দেশ ভাগ এবং মুক্তিযুদ্ধেরও সংযোগ পাওয়া যায়। আমি খুব বিস্তারিত না জানলেও খুব সংক্ষেপে বলছি যে—গোত্রগুলো এগুলো ধারণ করে তাদের বিষয়ে।’



অধ্যায় আটাত্তর

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
হায়দ্রাবাদ শহরের কাছাকাছি

‘তুমি বলছো তোমার গোত্র পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো রহস্যগুলোর একটা ধারণা করে। কি সেটা আর কীভাবে?’ কর্নেল জানতে চাইল। অবশ্য ছেলেটা উত্তর দেওয়ার আগেই সে আরো যোগ করল, ‘আর আমাদের বর্তমানের সঙ্গে এগুলোর সংযোগই বা কি?’ বলে কর্নেল নিজের লোকদের দিকে দেখল। ‘কিছু মনে করো না, এত বেশি ঘটনা এবং চরিত্র, এগুলোকে একসূতোয় মেলাতে পারছি না আমি কিছুতেই,’ নিজের লোকদের দিকে দেখে নিয়ে সে আবারো ছেলেটার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল। ‘তোমাদের দুজনের আমি কোনোভাবেই ভিক্টর এবং আর্থারের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারছি না।’

‘তাহলে আগে শোনেন আমাদের গোত্রের উৎপত্তি এবং বিকাশ। আমাদের গোত্রের উৎপত্তি সেই নীল নদ এবং প্রাচীন পার্শিয়া থেকে আসা দুটি গোত্রের সমন্বয় আসলে। আজ থেকে প্রায় এক শ বছরেরও আগে আমাদের গোত্র প্রাচীন পার্শিয়া থেকে পাড়ি জমায় ভারতে। আসলে সেখানে তারা এই বিশেষ জিনিস নিয়েই নানামুখী ঝামেলায় ছিল। যেটাকে রক্ষা করার জন্যই এক বাঙালির সহায়তায় আমাদের গোত্রের ঠটিকয় মানুষ পাড়ি জমায় ভারতে, এক কথায় বলতে গেলে বাঙাল মুলুকে। বাঙাল মুলুকে বারোভূঁইয়ারা নামের কিছু শক্তিশালী শাসকের শাসন চলতেছিল। তাদের সঙ্গে মোগলদের লড়াইও হচ্ছিল, সেই সময়ে বারোভূঁইয়ারা আমাদের থেকে কিছু সাহায্য নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেটা তাদের লাগেনি। এরপর বারোভূঁইয়া যাতে আমাদের গোত্রে বিরাজমান থাকতে পারে নিজেদের মতো সেইটার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু পরবর্তীতে বারোভূঁইয়াদের শাসনামল শেষ হওয়ার পর আমাদের গোত্র নানাভাবে ঝামেলায়

সিপাহী

পড়ে এবং বাধ্য হয়ে তারা এক জায়গায় না থেকে নানাভাবে পানিবাহিত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আমাদের গোত্রে আরো একটা সমস্যা দেখা দেয় সেটা হলো একদিকে গোত্রের ভেতরে বিবাহ এবং পরিবার তৈরি হওয়ার কারণে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয় এবং গোত্রের সদস্যদের একটা বড় অংশ মূলনীতি থেকে সরে বা পালিয়ে সবাই সংসারধর্ম শুরু করতে চায়। আবার যেহেতু সময়ের ব্যবধানে আমাদের গোত্র নানাভাবে বাইরের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে থাকে বাইরের মানুষের সঙ্গেও বিবাহ বা সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গোত্র এবং এর মূল নীতি থেকে সবাই সরে গিয়ে গোত্র বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।’

ছেলেটা একটু থেমে আবার বলতে লাগল। ‘প্রায় এক শ বছরের ব্যবধানে যখন আমাদের গোত্র ধ্বংস হওয়ার পথে এমন এক সময় আমাদের এক নেতা অঘোরীদের সঙ্গে মিশে তাদের কিছু বিষয়ে মারাত্মক প্রভাবিত হয়ে পুরো গোত্র সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেন। উনি অঘোরীদের মতো অতটা কঠিন না হলেও সিদ্ধান্ত নেন, গোত্রের বাকি যারা আছে তাদের ভেতরে শুধু পুরুষেরাই গোত্র সংরক্ষণ করবে, যারা পরিবার-ধর্ম করতে চায় তারা চাইলে চলে যেতে পারে। এবার আসো কীভাবে গোত্রের মূলনীতি সংরক্ষণ করা হবে, কীভাবে গোত্রের মূল দায়িত্ব পালন করা হবে, কীভাবে বংশবিস্তার করা হবে,’ ছেলেটা টানা বলে গেল। ‘এভাবে সব সংস্কারের পর বিগত এক শ বছর ধরে এভাবেই চলেছে। এই কারণেই যারা এই গোত্রের মানুষ তাদের জন্য প্রেম-বিয়ে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। আর বহুবছর পর আমি সেই নিয়ম ভঙ্গ করাতে গোত্র এবং আমার এই দুর্দশা।’

‘এই অবস্থা হলো কি করে?’ কর্নেল জানতে চাইল।

‘সেটা বলতেই হবে সাহেব, সেখান থেকেই তো সব সমস্যার উৎপত্তি,’ বলে বেশ বড় করে দম নিল। ‘বিগত এক শ বছরে আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী এক গোত্র হিসেবে গড়ে উঠেছি। কিন্তু নানা সময়ে আমাদের বেশ কিছু বিষয়ে বিভিন্ন মানুষ এবং গোত্র থেকে সাহায্য নিতে হয়। এদের মধ্যে কখনো ভালো মানুষ থাকে আবার কখনো মন্দ মানুষ থাকে। ঠিক তেমনি একজন মানুষ রাজা বিক্রম সিং কোনো না কোনোভাবে আমাদের গোত্রের কয়েকজন সঙ্গীকে কোনোভাবে ধরে তাদের অত্যাচার করে আমরা যে পুরনো শক্তি ধারণ করি—সেটার মূল রহস্য জেনে ফেলে।’

‘আমাদের গোত্রের নিয়ম হলো, কোনোভাবেই আমাদের রহস্য ফাঁস হওয়া যাবে না। এই কারণে এই লোককে হত্যা করতে পাঠানো হয় গোত্রের সবচেয়ে সেরা খুনি আমাকে এবং আমার দলকে। আমি আমার ছোটবেলার কিছু বন্ধুকে নিয়ে বেদে সেজে রওনা দিই এই লোককে হত্যা করতে। খুবই ডয়ংকর এবং খারাপ লোক এই রাজা বিক্রম সিং। আমরা জায়গামতো পৌঁছে যখন অপেক্ষা

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

করছি, সুযোগ খুঁজছি, তখন ঘটে বিদ্রোহ, আমরা শহরে কীভাবে টিকব আর কীভাবে বিক্রম সিংকে খুন করব ভাবছি—এমন সময়ে আমার নৌকায় এসে পড়ে কায়া,’ এবারও সে চোখ না তুলে মেয়েটাকে দেখাল।

‘একদিকে পুরো শহরে আগুন জ্বলছে, আরেকদিকে খবর পেয়েছি ওই লোক দ্রুত শহর ছাড়বে। এর ভেতরেই তাকে নিকেশ করতে হবে। না হলে আবারো আমাদের সেই শক্তি এবং তার রহস্য বিনাশ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। শহরে যখন সবাই সবাইকে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের ভেতরে আটকা—তখন কায়া আমাদের মাঝে আসাতে আমি খুশিই হয়েছিলাম। মেয়েটা ভীষণ আহত এবং অসুস্থ অবস্থায় আসে, আমি আর আমার সঙ্গীরা মিলে সেবা করতে থাকি। বিদ্রোহীরা টহল দিতে এলে জানাই আমরা স্বামী-স্ত্রী, বেদে পরিবার। কেউ সন্দেহও করে না। এর ভেতরে আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়ে যাই,’ যেন খুব গর্হিত কাজ করেছে এমনভাবে বলে উঠল ছেলেটা।

‘আমি বা আমরা কেউই বুঝতে পারিনি যে আমরা দুজনেই খুনি,’ এবার ছেলেটা চোখ তুলে তাকাল। ‘এমনকি আমরা দুজনেই সেই একই মানুষকে হত্যা করতে ওখানে গিয়েছিলাম। আমাকে পাঠিয়েছিল আমার গোত্র আর ওকে পাঠিয়েছিল ওই লোকের আরেক শত্রু। আমরা দুজনেই প্রেমে পড়ে নিজের দায়িত্ব ভুলে যখন দিশেহারা, এমন সময়ে কায়ার গোত্র বিষকানিয়ারা সন্ধান করতে আসে তাদের মেয়ের, তার আরো অনেক আগেই বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। তখন সব ফাঁস হয়ে পড়ে। কায়া ওর গোত্রের লোকদের থেকে জানতে পারে আমি আসলে মিথ্যে বলেছি। আমি বা আমার বন্ধুরা বেদে নই, আমরাও আরেক খুনি গোত্রের লোক। কায়া রাগের সঙ্গে আমাদের নিকেশ করার জন্যে গোপনে আমাদের খাবারে বিষ মেশায়। বিষকানিয়াদের ভয়ংকর বিষ। ওখান থেকে ওর গোত্রের লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পালাই আমরা ওরাও সরে পড়ে। রাজা বিক্রমও সরে পড়েছে ততোদিনে শহর থেকে। এই সময়েই আগমন ঘটে আপনার বন্ধু ভিক্টরের।’

‘কীভাবে?’

‘আপনার বন্ধু ভিক্টর স্থানীয়দের সঙ্গে কাজ করত। ওর গোত্রের লোকেরা আমার তিন সঙ্গীকে বিষ প্রয়োগ করে। আমি কোনোভাবেই সুস্থ করতে না পেরে নিজের বন্ধুদের জীবননাশের ভয়ে যখন দিশেহারা। সেই সময়ে স্থানীয় একজন ভিক্টরের কাছে পৌঁছে দেয় আমাদের। উনি তার বন্ধু আর্থারের কাছে নিয়ে যায় এবং সেবা করে সুস্থ করে তোলে আমার সঙ্গীদের। কিন্তু সে সেবা করার আগে একটা শর্ত দিয়েছিল। আমার কাছে কিছু জানতে চাইলে আমি জানাব। ওকে মোটামুটি সুস্থ করে তোলার পরে উনি আমার কাছে আমাদের গোত্রের রহস্য

সিপাহী

এবং মূল বিষয় জানতে চান, শর্তানুযায়ী আমি তাকে জানাই এবং আমাদের গোত্রের ধারক যেটার দায়িত্বে ছিলাম আমি সেটা তার হাতে তুলে দিই। আমি আসলে নিজের বন্ধুদের জীবনের জন্য যখন দিশেহারা। আমার বন্ধুরা তখনো পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেনি। ভিক্টর সাহেব আমাদের জানান ওদের পুরো সুস্থ করে তুলতে হলে দিল্লি নিতে হবে।’

‘কথা ছিল দিল্লি থেকে উনি আর্থারের ওখানে ফিরে আসবেন। আমার বন্ধুদের দিল্লি নিয়ে সুস্থ করে তোলেন তবে ওদের নিয়ে দিল্লি গিয়ে উনি আটকে পড়েন বিদ্রোহের কারণে। এরপর যখন দিল্লি থেকে পালাতে সমর্থ হন আর্থারের ওখানে ওত পেতে বসে ছিল সেই লোক যাকে হত্যার জন্য আমরা এবং ওরা এসেছিল। রাজা বিক্রম সিং।’

‘এই লোকই আপনাদের বন্ধু আর্থারকে ওরা হত্যা করে, ভিক্টর এবং আমাকে গোত্রের ধারক নিয়ে সরে পড়ে। আমার তিন সঙ্গী দুজন পালাতে পারে ওখান থেকে। ওরাই জানায় কী ঘটেছে এবং,’ এরপর যা যা ঘটেছে সে বলে গেল। বলা শেষ করে সে মেয়েটার দিকে চোখ তুলে তাকাল। ‘আমি ভুল করেছি, কিন্তু আমার প্রেম মিথ্যে ছিল না।’

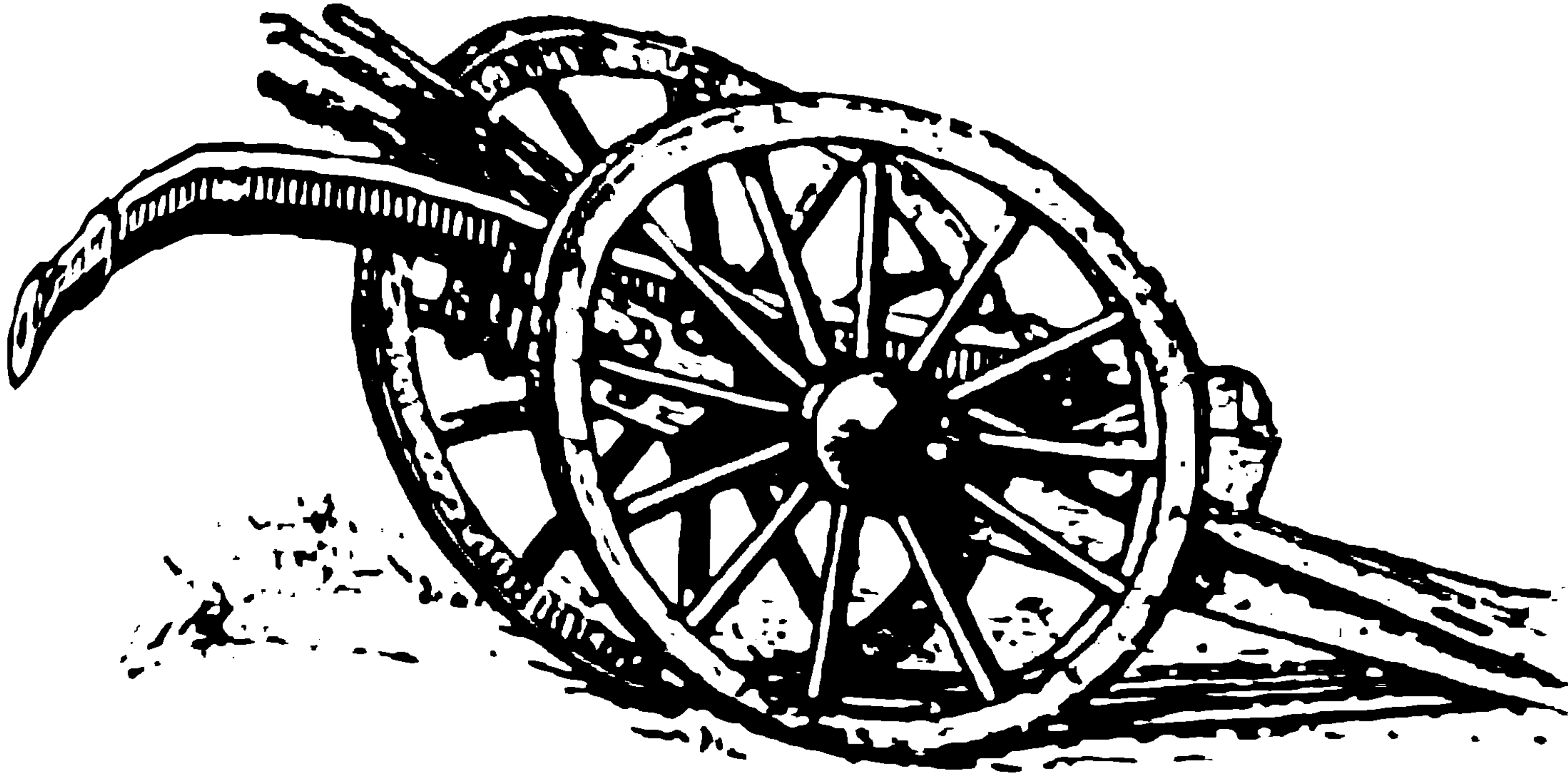
‘কিন্তু তুমি যে বারবার বলছো, তোমার গোত্রের বাহক, এ বিষয়টা কি?’

‘একটা আংটি,’ বলে সে হাতের ইশারায় দেখাল। ‘আমাদের গোত্র যে-শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে সেটার প্রতীক এই আংটি। এই আংটিটা ছিল আপনার বন্ধুর কাছে—এই জন্যই তাকে সবাই খুঁজছে। এমনকি ইংরেজ সরকার এবং কোম্পানি আসরে তার ব্যাপারে এত আগ্রহী এই কারণেই। কারণ এই ধারকের অনেক বড় গোপন শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করে অনেকে। আর যদি সেটা নাও থাকে, স্থানীয় অনেক গোত্রের ওপরে এর প্রভাব মারাত্মক। ইংরেজ সরকার কোম্পানি কিংবা বিক্রম যার কাছেই এটা থাকুক সে অপরিসীম শক্তির অধিকারী হবে স্রেফ এই কারণেই যে এটা থাকার কারণে অনেক শক্তিশালী গোত্রকে ওরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এই ধারক আর আপনার বন্ধু উভয়েই সেই লোকের কবজায়।’

‘এই আংটি আসলে কি প্রকাশ করে?’

‘বহু বহু পুরনো এক বিচ্ছিন্ন শক্তি—যেটা পৃথিবীর বাইরে থেকে এসেছে।’

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ছেলেটার দিকে, আর সে বলে চলেছে।



অধ্যায় উনআশি

বর্তমান সময়

বৃহস্পতি ময়মনসিংহ এলাকা

‘তরমানে আপনি বলতে চাচ্ছেন সিগনেট রিংগুলোকে শত বছর ধরে রক্ষা করে আসছে এই গোত্রগুলো?’

‘ঠিক, ওদেরই দুজন মেঘার ধরা পড়েছে কিশোরগঞ্জে। ওরা আরো আছে এবং ডেভিড সামহাউ এদের খুঁজে বের করে ওদের থেকে রিংটা নিয়ে নিয়েছিল।

‘আমার আরেকটা জিনিস জানার আছে,’ জয়া বলে উঠল। ‘আপনি বলতে চাচ্ছেন, এই সিগনেট রিংগুলো নিজে যতটা না মূল্যবান, এরা আসলে পুরনো কোনো শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। যে-ধাতু বলো, শক্তি বলো যাই বলো, সেগুলো এসেছে এই গ্রহের বাইরে থেকে।’

‘অনেকটা তাই, ছয়টা সিগনেট রিং, এর ভেতরে একটা রেলিকের কাছে আগে থেকেই ছিল, যেটা নিয়ে তোমরা তদন্ত করছে এখন। এটা বহু আগে ওরা কীভাবে যেন পেয়েছিল। আরো একটা এখানে এসে ডেভিড কীভাবে যেন বের করেছিল। আরো চারটা রিং রয়েছে। আমার বিশ্বাস টুইন কালী, বুদ্ধমূর্তি, কিশোরগঞ্জের ওগুধন এবং মোগলদের হারিয়ে যাওয়া সম্পদের ভেতরেই ওগুলো রয়েছে।

‘সেটা তো বুঝলাম, কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্য জায়গাতে, এই সিগনেট রিংগুলো যদি সত্যি সত্যি একেকটা শক্তির প্রতিনিধি করে এবং এগুলো কিছু না কিছু একটাকে রিপ্রজেন্ট করে তবে সেই মূল জিনিসগুলো একসঙ্গে করলে কী ঘটবে?’

আলী অজগর হেসে উঠল। ‘এই তো ভুমি চলে এসেছো মূল পরেন্টে। এই এতদিন ধরে যে এতকিছু হচ্ছে সবই হচ্ছে নানাবিধ জিনিসের মধ্যে দিয়ে রিংগুলোকে খোঁজার জন্য এবং রিংগুলোর মাধ্যমে সেই মূল জিনিসগুলোর কাছে

সিপাহী

পৌছানোর জন্য। রিংগুলো আসলে যতটা না মূল্যবান তারচেয়ে বেশি ভয়ংকর হবে ওগুলোকে একসঙ্গে করলে যা ঘটবে সেটা।’

‘এই ছয়টা আননোন বস্তু বা যাই হোক, যদি রিংগুলো পাওয়া যায়, যদি সেগুলোর কাছে পৌছানো যায়, তাহলে কি হবে?’ জয়া সরকার মূল রহস্যের কাছে পৌছানোর চেষ্টা করছে।

কিন্তু আলী আজগর কোনো জবাব দিল না। মৃদু হেসে সে তাকিয়ে রইল জয়ার দিকে। তারপর মৃদু স্বরে জানতে চাইল, ‘পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে পুরনো এবং রহস্যময় ঘটনা কি বা জিনিস কি, মিথ কি?’

জয়া সরকার সঠিক কোনো জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

অ্যাগ্রি ইউনিভার্সিটি, ময়মনসিংহ

সবাই মিলে ছড়িয়ে পড়ে যা খোজার চেষ্টা করছে, সেটার সন্ধান পেল রুশোই প্রথম। বলেই টমি রুশোর দিকে ফিরে তাকাল ইন্টারন্যাশনাল হলের সামনে একটা বাগানের মতো রুশোর সোজা গিয়ে সেটার ভেতরে ঢুকছে। ‘এই পোলা কই যায়?’

বাশার এবং সামিরা দুজনেই অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। রুশো এগিয়ে গিয়ে বাগানের মাঝামাঝি একটা জায়গায় থামল, তারপর হাতের ইশারায় ডাকতে লাগল অন্যদের। ‘চলো দেখি কী বলে?’ সবাই মিলে সেদিকে এগিয়ে গেল। রুশো ছোট বাগানটার ভেতরে কিছু একটা দেখছে খুব মনোযোগ দিয়ে। স্বল্প আলোতে সেদিকে তাকিয়ে বাশার প্রশ্ন করল। ‘এই ছেলে করছে কি ওখানে?’

‘এত ভেবে লাভ নেই। দেখি কী করছে,’ বলে সামিরা বাগানের ছোট গেটটা ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে ওদের দুজনার জন্য গেটটা মেলে ধরল। রুশো মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের স্মিংয়ে ঝোলানো হাতটা অন্যহাতে ধরে মনোযোগের সঙ্গে কিছু একটা দেখছে। ওরা এগিয়ে গিয়ে দেখল একটা কবর। তবে কবরটা মুসলিম কারো নয়, খ্রিস্টান একটা কবর। ‘ডেভিড এখানেই রেখেছে জিনিসটা,’ সে অস্ফুটে বলে উঠল। ‘ইট মেইকস সেন্স,’ নিজেই বিড়বিড় করে বলে চলেছে রুশো। ‘সে এখানে ছিল, এই জায়গাটা সে খুব ভালো চেনে, নিজের জিনিসপত্রের ভেতরে রাখার চেয়ে এমন এক জায়গাতে রেখেছে যেটা হাতের কাছে, যেকোনো সময় অ্যাক্সেস পাওয়া যাবে এবং সকালে হাঁটতে বের হলেই সে নিয়ে যেতে পারবে রাতে বাগানে বসে চা খাবার বাহানা করে আবার রেখে দেওয়া যাবে। কবর হঠাৎ করে কেউ তুলে নিয়ে যাবে না। সহজে নষ্ট হবে না,’ বলে সে অন্যদের দিকে দেখে বলে উঠল। ‘বিলিয়ান্ট।’

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

‘ফটা ব্রিলিয়ান্ট,’ বাশার বলে উঠল। ‘দুই বেলা বলে একটা কবর খুদবে মানুষ, ভালো আইডিয়া তো দূরে—আমার তো মনে হচ্ছে এরচেয়ে বলদামি আর হতে পারে না।’

রুশো মৃদু হেসে উঠল বাশারে দিকে তাকিয়ে। ‘আমি একবারও বলেছি যে এখানে যাই রেখেছে সেটা কবরে ভেতরে রেখেছে!’ বলে সে আশপাশে দেখাল। ‘সে যাই রেখে থাকুক না কেন সেটা এখানে এমনভাবে আছে, যেটা সহজেই বের করা সম্ভব, আবার নিরাপদ এবং পার্মানেন্ট, খুঁজে দেখতে হবে।’

‘খোজ সবাই,’ বাশার বলে উঠল। সবাই কবরটা থেকেই শুরু করল। ছোট জায়গা খুব বেশি সময় লাগল না দেখতে কিন্তু সেভাবে নজর কাড়ার মতো কিছুই পাওয়া গেল না। বাশার খানিক বিরক্তির সঙ্গেই একপাশে এসে সিগারেট ধরাল, টমি এসে দাঁড়াল বাশারের পাশে। টমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সামিরার ডাক শুনে ঘুরে গেল দুজনেই। সামিরা আর রুশো দুজনে মিলে খুব মনোযোগ দিয়ে কবরের টুন্স্টোন যেটা, সেটার সামনে লাগানো পাথরটা পরখ করছে। আর দশটা খ্রিস্টান কবরের মতো এটার ওপরেও একটা ফলক বসানো, সেটার ওপরে খুব সুন্দর একটা পাথরের ক্রশ। খুবই চমৎকারভাবে পাথরের ক্রশটাকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে টুন্স্টোনটার ওপরে। খুবই দক্ষ হাতের কাজ—এত বছরেও স্রেফ সামান্য শ্যাওল ধারা আর কিছুই হয়নি।

‘যদি কিছু থাকে, এখানেই রয়েছে,’ আনমনে বলে উঠে রুশো ফলকের ওপরে থাকা ক্রশটা ধরে টানাটানি শুরু করল। ‘এই আস্তে,’ বলে বাশার এগিয়ে এসে রুশোকে সরিয়ে দিয়ে ক্রশটাকে আগে ভালোভাবে পরখ করল। করতে করতে মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। সে মোটামুটি ধরতে পেরেছে, হাসি নিয়েই সে ক্রশটাকে ধরে স্বাভাবিক যেদিকে যেকোনো প্যাচ খোলে—ওটার বিপরীতে মোচর দিল। কিছুই হলো না, জোর বাড়াতে লাগল বাশার। বাড়াতে বাড়াতে এক সময় মৃদু শব্দ হলো। তারপর ধীরে ধীরে ক্রশটা খুলে আসতে শুরু করল। পুরো প্যাচ শেষ হতে হতে পুরো ক্রশের অংশটা খুলে গেল। ভেতরে একটা ছোট ফোকরের মতো—ওটার ভেতরে আবার একটা খাপ, সেটার ভেতরে ছোট একটা লম্বা বাস্তের মতো অনেকটা চিকন পেনসিল বাস্তের মতো।

‘অবশ্যই এটা ডেভিডের কাজ। মূল ফলকটাকে ঠিক রেখে সে ওইটার ওপরের ক্রশটা সম্ভবত বদলে দিয়ে মার্বেলের ক্রশ বসিয়েছে, ফলকে এবং ক্রশের বেজটার ওপর। ক্রশটা দুইমুখীভাবে ঘোরে এবং ক্রশের বেদিটার ভেতরটা ফাঁপা,’ বলে সে বস্ত্রটা খুলে ভেতর থেকে একটা চাবি বের করে আনল। ‘চাবি।’

সিপাহী

‘সাধারণ চাবি না, এটা যেই ব্যাংকের নম্বর পেয়েছিলাম আমরা সেই ব্যাংকের লকারের চাবি,’ রুশো বলে উঠল। ‘এই কারণেই নম্বর মেলেনি কারণ নম্বরটা কোনো অ্যাকাউন্টের নয়। আসলে একটা লকার নম্বরের সিরিয়াল।’

‘কি থাকতে পারে লকারে?’ বাশার প্রশ্ন করার আগেই একাধিক পায়ের শব্দ শুনে ছোট বাগানের গেটের দিকে ফিরে তাকাল সবাই।

আলী আজগরের প্রশ্ন শুনে জয়া সরকার তখনো তাকিয়ে রয়েছে, কোনো জবাব আসছে না তার মাথায়। ‘কী হলো বলো,’ আলী আজগর আবারো জানতে চাইল। ‘তোমার মাথায় যা আসে বলতে থাকো। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রহস্যগুলোর কোনটা মাথায় আসে তোমার?’

‘এরিয়া ফিফটি ওয়ান,’ যেটা মাথায় এলো বলে দিল জয়া সরকার। ‘যেটা নাকি সিআইএ নিয়ন্ত্রণ করে।’

‘ওড স্টার্ট,’ আলী আজগর মৃদু হাসির সঙ্গে বলে উঠল।

‘বারমুডা ট্রায়াংগল!’

‘যদিও এখন আর ওটার অস্তিত্ব নেই, বলে সে হেসে উঠল। ‘ওকে, বলতে থাকো। প্রতি মাসের ক্রেডিট কার্ড বিল, ওটা আবার বলো না। মিথিক্যাল বা মিথ বেইজড বা ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন কিছু বলো।’

এবার জয়া সরকার হেসে উঠল। ‘হারানো নগরী আটলান্টিস।’

‘এই তো লাইনে আসছো, আরো বলো শুনি।’

‘আলাদিনের প্রদীপ, ডালিম কুমারের জাদুর কাঠি,’ এবার জয়ার গলায় খানিক টিটকিরির সুর।

কিন্তু আলী আজগর হালো না। ‘সিরিয়াস বিষয় জয়া, আরো কিছু বলো যেটা তোমার মাথায় আসে।’

‘আটলান্টিস,’ বলে জয়া সরকার মাথা নাড়ল।

‘ভেরি ওড, এইরকমই চাই, বলে যায়,’ এবার আলী আজগরকে খানিক সুখী মনে হলো।

‘হলি গ্রেইল, আর্ক অব কডেনাট।’

‘ওড, বাট এই দুইটাই স্ট্রিকলি রিলিজিয়াস মিথ। সামথিং মোর ইউনিভার্সাল।’

‘এলিম্বিয়ার অব লাইফ, টাচ স্টোন—’

‘হ্যারি পটারের প্রথম বইয়ের নাম কী?’

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

‘কী!’ জয়া সরকার আলী আজগরের প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারেনি। ‘কীসের প্রথম নাম, কী?’

‘ফরগেট ইট,’ বলে সে আবার চুপ হয়ে গেল, ভাবছে। ‘আমি বিষয়টা তোমাকে কীভাবে বলব ঠিক বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটাই আসলে এমন, এটাকে কোনো ছাঁচে ফেলা সম্ভব নয়, আর এটা এতটাই অবিশ্বাস্য যে,’ সে কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল। সিগনেট রিংয়ের ব্যাপারটা তো বুঝতেই পেরেছে। এই রিংগুলো মিথিক্যাল, এই রিংগুলো আসলে মূল জিনিস নয়, এটা প্রফ রিপ্রেজেন্ট করে কিছু একটাকে, আর এই মূল ব্যাপারটা এমনই এক অবিশ্বাস্য বিষয় এটার ব্যাপারে নির্দিষ্ট বলাও সম্ভব নয়। কারণ এখন অবধি কেউই সব সিগনেট রিং একসঙ্গে করে, এর মূল সোর্স কনটেন্ট একত্র করতে পারেনি। ফলে মূল বিষয়টা নিয়ে যা যা জানা যায়, যা যা প্রচলিত আছে, সবই হয় ধারণা, না হয় মিথ আর না হয় গালগল্প—’

‘এখানে আমার তিনটা প্রশ্ন আছে,’ জয়া সরকার বলে উঠল। ‘আপনি বলছেন, সিগনেট রিংগুলো বা এর মূল সোর্সকে কেউই নির্ণয় করতে পারেনি। ডেভিড কি এর সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল?’

‘হ্যাঁ, একভাবে বলা যায় সেই সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছিল।’

‘আর আমার দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা, এই রিংগুলোতেই মূল ব্যাপারটার সব কু দেওয়া আছে, তাই না?’

‘হ্যাঁ। মূল বিষয়টার সবকিছুই আসলে রিংগুলোতেই বলা আছে। ডেভিডও যা বুজে বের করেছিল সেটা—’

‘শেষ প্রশ্ন, যতই অ্যাবসার্ড আর আজগুবি শোনাক, আমি মূল ব্যাপারটা জানতে চাই।’

আলী আজগর চট করে কথা বলল না, সে চুপ। যখন মুখ খুলল, সে কথা বলার আগেই তীব্র শব্দে কঁপে উঠল তার পুরো বাড়ি।

পায়ের শব্দ শুনে অন্য সবাই খুব চমকে গেলোও বাশার খুব বেশি গা করল না। সে প্রথমেই হাতে ধরা জিনিসটা রুশোর হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে নিজের জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল, তারপর ফিরে তাকাল যেদিক থেকে শব্দ এসেছে সেদিকে। একাধিক মানুষ এগিয়ে আসছে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্ধকারের ভেতরে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না ঠিকমতো। লোকগুলো আরেকটু এগিয়ে আসতেই তাদের দেখে সবাই শান্ত হয়ে গেল।

সিপাহী

‘রিল্যাক্স,’ বাশার ছোট বাগানটার গেটের দিকে এগিয়ে গেল। ভার্টিটির হলে দুজন দারোয়ান এগিয়ে এসেছে কী হচ্ছে দেখার জন্য। সঙ্গে আরেকজনকে দেখা গেল, বাশার অনুমান করল লোকটা বাবুর্চি বা এমন কেউ হবে। বাশার এগিয়ে গিয়ে নিজেকে থেকেই পরিচয় দিল এবং জানাল এখানে একটা কাজে এসেছিল এবং কাজ শেষে ওরা চলে যাচ্ছে। লোকগুলো বিদায় নিতেই ওরাও এসে জিপে উঠল।

‘এবার কি? টিমি প্রশ্ন করল।

‘এবার কি মানে,’ বাশার বা সামিরা জবাব দেওয়ার আগেই টিমি বলে উঠল। ‘এত কষ্ট করে একটা বড় ধরনের সোর্স পাওয়া গেল, আমাদের বের করতে হবে না, ডেভিড আসলে ওই ব্যাংকের লকারে কী রেখে গেছে?’ মোটা লেন্সের ওপাশে তার চোখ এবং চেহারা চকচক করছে।

‘অবশ্যই তো সেটা বের করতে হবে কিন্তু তাই বলে কি এই মাঝরাতে ব্যাংকের কাজ করা যাবে নাকি?’ টিমি খানিক বিরক্তির সঙ্গেই বলে উঠল।

‘করা যাবে,’ আবারো বাশার বা সামিরা কথা বলার আগেই রুশো কথা বলে উঠল। ‘এটা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক এবং এই ব্যাংকের লকার সার্ভিস সারারাতই কাজ করে। অস্তত দেশের বাইরে তো সেটাই দেখেছি।’

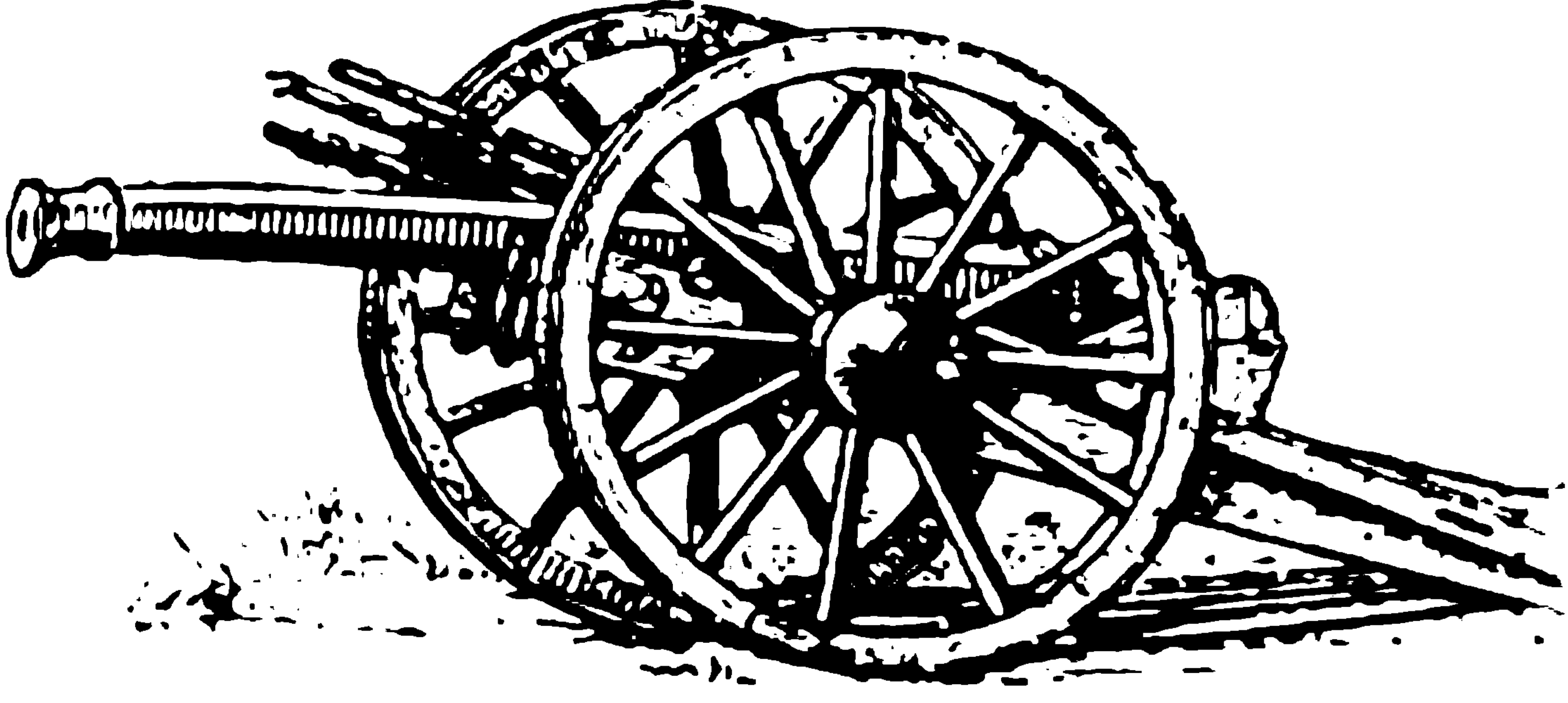
‘এখানেও টুয়েন্টি ফোর সেভেন কাজ করে বেশির ভাগ ব্যাংকের লকার সিস্টেম, বিদেশি ব্যাংকগুলোর তো বটেই,’ বাশার ঠোটে সিগারেট চেপে ধরে একমনে জিপ চালাচ্ছে।

‘ডেভিড আসলে ব্যাংকের লকারে কী রেখে গেছে,’ সামিরা জানতে চাইল। ‘কী মনে হয় ওখানে তার কালেক্ট করা সিগনেট রিংগুলো রয়েছে? সেই সঙ্গে বাকিগুলোর সম্ভাব্য সোর্স বা ইত্যাদি?’

‘না দেখলে জানব কীভাবে!’ বাশার একমনে জিপ চালাতে চালাতেই জানতে বলে উঠল।

‘তারমানে কি আমরা যাচ্ছি লকার থেকে জিনিগুলো বের করতে?’ টিমি প্রশ্ন করল।

‘অবশ্যই, তবে তার আগে কিছু কাজ সারতে হবে।’



অধ্যায় আশি

সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ

হায়দ্রাবাদ শহরের কাছাকাছি

‘তুমি যা বলছো এর কোনোকিছুই আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না,’ বহু চেষ্টার পরে কর্নেল তার তামাকেই পাইপ ধরাতে পেরেছে, ওটাকে আগুনের পাশে রেখে দেয়াতে, শুকিয়ে এসেছে, যে-কারণে আগুন ধরাতে সক্ষম হয়েছে সে। প্রাণপণে পাইপ টানতে টানতে খানিক কেশে উঠল কর্নেল, ভেজা তামাকে আগুন লাগার পর। কাশতে কাশতে খানিক ছির হয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল সে। কাশির দমকে দুই চোখ লাল হয়ে গেছে তার।

‘শোন মিস্তি, আমি সৈনিক মানুষ, যুদ্ধ বুঝি, যুক্তি বুঝি, নেতৃত্ব বুঝি, শক্তি এবং সামর্থ্যও যে বুঝি না সেটা বলব না,’ বলে সে নিজের লোকদের দিকে দেখল। যদিও সবাই ক্লান্ত কিন্তু সবাই বেশ মন দিয়েই শুনছে মিস্তি নামের সন্ন্যাসী গোছের এই ছেলেটার আলোচনা। ‘কিন্তু তুমি যে-ধরনের শক্তি বা ভিত্তির কথা বলছো সেটা আমি ধরতে পারছি না, এটা আমার যুক্তিতেও খেলছে না,’ কর্নেলের কথা শুনে ছেলেটা কিছু একটা বদলে যাচ্ছিল, কর্নেল আবারো কথা বলে উঠল। ‘আমি বলি, তুমি আমাকে শুধরে দেবে। তুমি বলছো, তুমি এবং তোমার বিশেষ গোত্র বহু প্রাচীন এক শক্তি ধারণ করে—’

‘না আমরা ধারণ করি না,’ ছেলেটা মাথা নেড়ে বলে উঠল। ‘আমরা প্রতিনিধিত্ব করি, শুধু আমরাই না। আমাদের মতো আরো বেশ কিছু আরো গোত্র রয়েছে এমন যারা এমন পুরনো শক্তির পূজা করে এবং তাদের ধারণ করে।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে, কর্নেল তার পাইপে টান দিতে দিতে বলতে লাগল। এখন তাকে তৃপ্ত দেখাচ্ছে, তামাকের ধোয়ার ফল। ‘তুমি বলছো, তোমাদের গোত্র বহু আগে সেই প্রাচীন পার্শিয়া বা ওরকম কোথাও থেকে এসে এই মূল্যকে

সিপাহী

ছাত্রী বাস পড়ে এবং পরবর্তীতে বহু উপান-পতনের স্তম্ভে দিয়ে যাওয়ার পর নিজেরা কঠিন নিয়মে প্রতিষ্ঠা করে। এবার এসে সেটার ব্যতিক্রম হয় কিছু কারণে। আর সেই ব্যতিক্রম ঘটান সঙ্গে জড়িয়ে যায় আমার বন্ধু শিবির এবং আর্দার। আর্দার মারা পড়ে এবং শিবিরকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়।’

‘ঠিক,’ ছেলেটা বলে উঠল।

‘এখানে দুটো বিষয়, প্রথম প্রশ্ন তোমাদের এই শক্তি আসলে কি?’

‘আমার জানা নেই,’ ছেলেটা মাথা নেড়ে বলে উঠল। ‘আমি বা আমাদের মতো সৈনিকেরা শ্রেফ এর রক্ষক।’

‘আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি, দ্বিতীয় প্রশ্ন কে এই লোক যে—এরকম একটা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি করতে পারে, একজন ইংরেজকে খুন করে আরেকজনকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং সে তোমাদের এই বিষয়ে জানল কীভাবে?’ বলে কর্নেল পাইপ সরিয়ে বলে উঠল। ‘তারচেয়ে বড় কথা আমি কীভাবে এরকম একটা শক্তির অস্তিত্বের কথা বিশ্বাস করব?’

ছেলেটা কর্নেলের প্রশ্ন শুনে হেসে উঠল। ‘অনেক কথা জিজ্ঞাসিলেন। একটা একটা করে উত্তর দিই, প্রথম কথা আমরা যার কথা বলতেছি, সেই লোক এক স্থানীয় জমিদার। নাম রাজা বিক্রম সিং। স্থানীয় জমিদার পুরনো এক বংশের প্রতিনিদিত্ব করে, সে স্থানীয় রাজা হলেও, দুনিয়াখোরা লোক। বুদ্ধিমান, নিষ্ঠুর, সতর্ক লোক। ইংরেজ খেইকে শুরু করে সবার সঙ্গে শান্তির কিন্তু তার নিজের বিরূপ বাহিনী আছে, আর সে কারো পরোয়া করে না। আমি সঠিক জানি না, সে আমাদের এই বিষয়ে সঠিক জানল কীভাবে? তবে এটা জানি সে বিনোদনের বাহ্যিক আমাদের নেতৃস্থানীয় একজন এবং তার দলকে নিজের কাজের জন্য ডেকে নিয়ে যায় এবং কোনো না কোনোভাবে তার কাছ থেকে জানতে পারে। এরপর তারে মারার জন্য পাঠানো হয় আমাকে; বাকিটা তো জানেনই,’ বলে সে মৃদু গেমের আরো যোগ করল। ‘আর এই বিষয়ে শুধু সে না, আপনার নিজের সোকেরাও জানে, আপনার কি মনে হয় আপনার বন্ধুর জন্য সবাই কেন এত উতলা হয়ে আছে। শুধু তার মঙ্গলের জন্য, বলে সে মাথা মাড়ল। ‘না সাহেব, সবাই তার মাধ্যমে সেই শক্তির সন্ধান চায়। যেইটা আমি হইতে দিতে পারি না। আপনাকে আমার সঙ্গে আছেন কি নাই, আমি শ্রেফ সেইটা জানতে চাই।’

‘আচ্ছা,’ কর্নেল বলে উঠল। ‘কিন্তু আমার প্রশ্ন কায়ার কাছে, তুমি কেন বিক্রম সিংকে হত্যা করতে গিয়েছিলে? এবং প্রায় কাছাকাছি সময়?’

‘আমরা যারা ময়দানের গুঁমি, তারা কখনোই কেন কারে হত্যা করতে

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর স্বেপনা

হবে— এতলা জানি না। তবে আমি অনুমান করতে পারি—রাজা বিক্রম অত্যন্ত ধার্মিক মানুষ এবং মিস্ত্রিগো গোত্র যে-শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, সেইটারে অনেক গোত্রই গোপন রাখতে চায়। বিক্রম যখন মিস্ত্রিগো গোত্রের লোকের থেকে কোনোভাবে এইটার ব্যাপারে জানতে পারে, তখন শুধু আরোহী না আরো অনেক গোত্রই হয়তো চাচ্ছিল বিক্রম সিন্ধু নিকেশ করতে, যাতে সে এইটা হস্তগত করতে না পারে। এরকমই কেউ তারে হত্যার জন্য আমগোরে ভাড়া করে থাকতে পারে।’

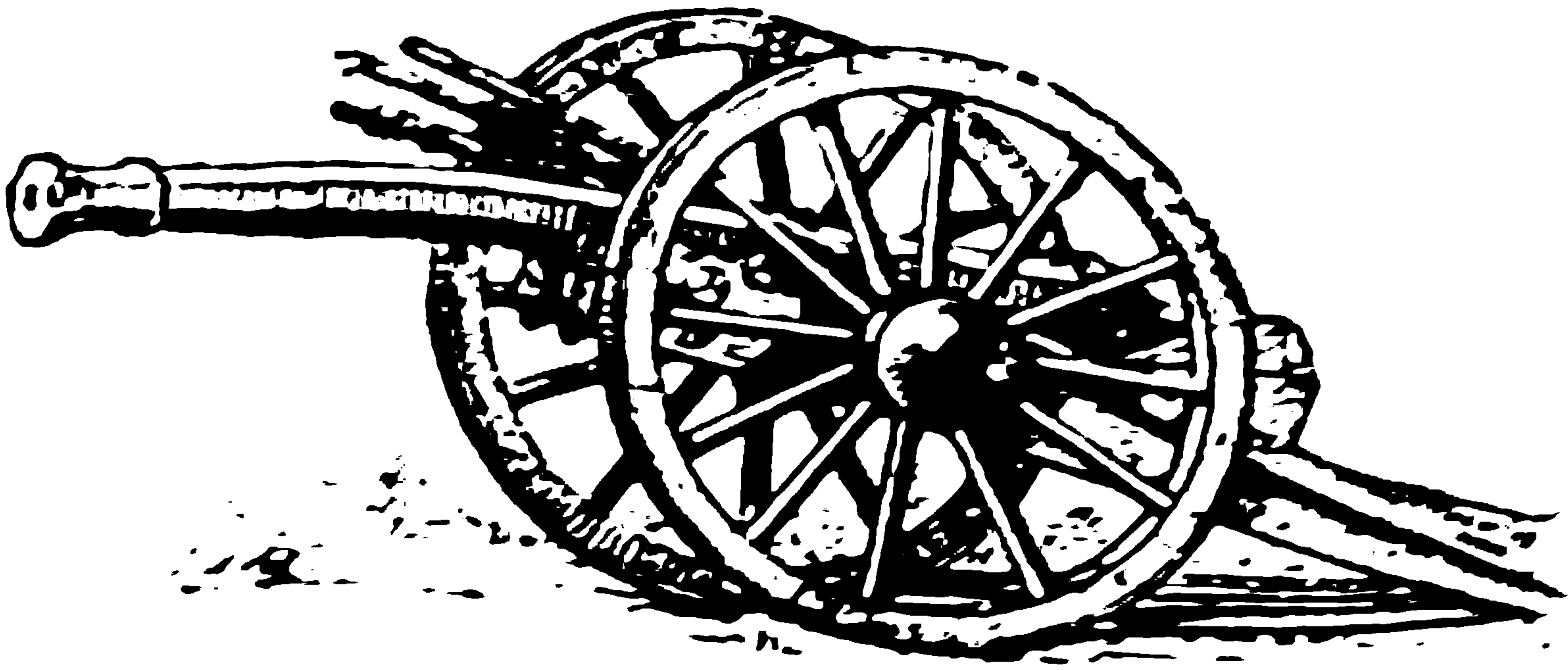
‘কিংবা কানিয়ারা নিজ থেকেও কায়ারে পাঠিয়ে থাকতে পারে,’ মিস্ত্রি বলে উঠল।

‘ঠিক আছে, অনেক কথা হলো, শেষ আরো দুটো প্রশ্নের উত্তর দাও। আমাকে বলো, তুমি কি জানো এই রাজাকে কোথায় পাওয়া যাবে, আর তাকে যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানে আমার বন্ধুকেও পাওয়া যাবে কি না?’

‘যাবে, আমি জানি সে কোথায় আছে, আমি সেখানেই যাব,’ বলে সে কর্নেলের দিকে দেখল এবং মেয়েটার দিকে দেখে যোগ করল। ‘আমার জীবনের আর একটাই উদ্দেশ্য বাকি আছে—তারে হত্যা করা। আর আমার বিশ্বাস আপনেনাও উদ্দেশ্য আপনানাগো বন্ধুরে উদ্ধার করা,’ বলে সে নিজের একটা হাত বাড়িয়ে দিল। ‘তাইলে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করব। রাজি?’ কর্নেল তার সঙ্গে হাত মেলাল। ‘রাজি।’

‘আমিও যাব’, মেয়েটা বলে চলে। ‘আমি আপনেনাও লগে কাজ করব।’ ‘আমার জীবনের দুইটা উদ্দেশ্য, ওই রাজার মৃত্যু হলো কি না নিশ্চিত করা, আর ও মারা গেলে মিস্ত্রিগো আমি-’

‘সে দেখা যাবে এখন—’ কর্নেল কথা শেষ করার আগেই গুলির শব্দে কেঁপে উঠল ছোট বনটা।



অধ্যায় একাশি বর্তমান সময় বৃহত্তর যয়মনসিহ

‘এই ক’ল কীসে?’ ভদ্রা সন্ধ্যায় বৃহৎ অদ্যক হার বসে উঠল। অশ্লী আভ্যন্তরঃ
কর অদ্যক হইনি এই শব্দে। ‘দুস্কাম না—’ অশ্লী আভ্যন্তর কিছু বলে ওঁর
আগেই তার ওই নতিওলো লোকটা দৌড়ে এলো।

‘স্যার, বাল্লি সামনে তিনটা বড় গাড়ি আইনা পায়েছে, চেতর খেইক
দুহুদোয়া করছে একটা,’ লোকটা একবার ওঁদের দিকে দোবে নিড়ে যায়
উঠল। ‘এই দুহুদোওয়ানো লোক মন অর,’ বলে সে জ্বর দিকে তাকিয়ে
থুওর নিল নিজেই। ‘দুহুদোওয়ানি।’

অশ্লী আভ্যন্তর ওঁদের দিকে দোকে একবার, তারপর নিজের লোকের দিকে
তাকল, তারপর অদ্যক জ্বরদের দিকে তাকিয়ে ঘোরে উঠল। ‘আবি জানতর,
কোন আবি এই ক’লে দুহুদোওয়ান এক সেদিন দুহুদে পাওয়ান, মাফর ওঁর
খেতে ওঁদের তার উঠ গেছে, সেদিন থেকেই আবি জানতর এই দিন
আমরই,’ বলে সে হাসতে হাসতে আকসোসের সঙ্গে বাবা নাড়তে লাগল।
‘ওঁর নিচুই সেমাসের মাধ্যমে এগান প’ল এসে পৌছেছে।’

‘অস্বাদ—’ চুড়চুড় হাসের সঙ্গে বলে উঠল জ্বরা সন্ধ্যায়, সে মাথা নেড়ে আরে
কিছু ফেল করতে লাগিল, তার আগেই অশ্লী আভ্যন্তর আশ্বাসে ঘোরে উঠল।

‘আবি ক’লি না সেমরা ওঁদের নিয়ে এসেছো, আবি ক’লি, দুহু ওঁর
সেমাসের অস্বাদন করছে আর না হয় সেমাদের সঙ্গেই কিছু একটা লাগলো
আছে, সেটা ধর ওঁর এগান প’ল এসে পৌছেছে।’

‘কিছু ওঁর জামর কীভাবে সে আমরা এগান প’ল এসে পৌছেছি,’ একর
প্রবদ্যুত বলে উঠল।

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

অলী আজগর কিছু না বলে হাসল।

‘হ্যেন আমাদের ভেতরে এমন কেউ আছে যে ওদের সব পাচার করছে।’

‘সে আর কলতে,’ বলে সে নিজের লোকটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল।

‘শোন ওরা এখানে এসেছে আমার জন্য। তুমি তোমার সব লোকদের এক করো। এটা জীবন-মরণ লড়াই হতে যাচ্ছে। বা অস্ত্র আছে সেগুলো এক করো, অন্য সবাইকে ভাইনিংক্রমে আসতে বলো।’

‘আমরা এখন কি করব?’ হঠাৎ জয়া সরকার খুব অসহায় বোধ করতে লাগল।

‘শোন সময় একেবারেই নেই,’ অলী আজগর সোফা থেকে নিজেকে আবার হইলচরারে টেনে তুলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে সে। ‘আমি আমার লোকদের এক হতে বলেছি, কিন্তু সবাইকে আমি লড়াই করতে বলব না। আমি সারোভার করব না, ফলে বস্তাকরী বৃদ্ধ হবে ওদের সঙ্গে। আমার লোকেরা যারা লড়াই করবে, তারা করবে—অন্যদের আমি টাকা দিয়ে বিদেয় করে দেব। এই বাড়ি থেকে পেছন দিয়ে গোপনে বের হওয়ার একটা পথ আছে, জটা চমলের ভেতর দিয়ে হাইওয়ের কাছে গিয়ে যেখানে উঠবে, ওখানে একটা গ্যারেজে গাড়ি আছে। আমার লোকেরা এক তোমরা পালাবে ওদিক দিয়ে।’

‘কিন্তু—’

‘আগে শোন,’ অলী আজগর থামিয়ে দিল জয়াকে। ‘আমি পালাতে পালাব না। আমি যেখানেই যাই, তারা অনুসরণ করবে, আমাকে না ধরে থামবে না। কাজেই আমি আর পালাব না, আর আমি পালাতে পালাতে ক্লান্তও হয়ে গেছি। আমি বা জানতাম তার অনেকটাই তোমাদের বলেছি। বাকিটা প্রফেসর ইকস্টনার জানে, তাকে শত করে ধরবে কলার জন্য। দুটো জিনিস যেন রাখবে, চিত্রমণি আর হ্যারি পটার সিরিজের প্রথম বইয়ের নাম, সেই সঙ্গে—’

আবারো পুরো বাড়ি কেঁপে উঠল।

‘আপনি আমাকে কলুন—’

‘শোন, তোমরা যে-ছবিটা সেখা আমাকে লোকেট করেছে, ওই ছবিতে আরো বহুস্যা আছে, ওটা ভালোভাবে দেখবে। যে-গোলের সন্ধান করছে ওরা খুব সাংঘাতিক, ওদের সাবধানে হ্যান্ডেল করবে। রেলিক আর নেক্রপলিস এখানে যেমন আক্রমণ করেছে ওরা সবখানে আছে, সিসেটে আর চট্রামে ওদের এজেন্ট ধরা পড়লেও ওদের কূল এজেন্ট আছে একজন, তাকে প্রতিষ্ঠা

সিপাহী

কিং নামে ডাকা হয়, সেই লোকই এই সব করাচ্ছে। তার বিষয়ে সাবধান,' বলে সে বড় করে দম নিল। জলদি চলো সময় নেই—'

'এই ব্যাংকই তো নাকি?' বাশার বড় বাজারের বড় রাস্তাটার একপাশে পার্ক করে রাস্তাটার ওপাশে বাতি জ্বলতে থাকা ব্যাংকটা দেখাল।

'অবশ্য এটাই,' বলে সামিরা আশপাশে দেখল। রাস্তা একেবারেই নির্জন, বলতে গেল একটা কাকপক্ষীও নেই। 'এত নির্জন কেন?'

'এই রাতের বেলা মানুষ থাকবে আশা করাটাও বোকামি!' বলে বাশার বিড় বিড় করে কিছু একটা বলল। তারপর জিপের পেছন দিকে ফিরে বলে উঠল। 'চলো চলো, দেরি করার কোনো অর্থ হয় না।'

সবাই মিলে জিপ থেকে নেমে হেঁটে রাস্তা পার হয়ে এলো। বেশ বড় ভবনটাতে ব্যাংকটা। মূল ভবনের অংশটা প্রায় অন্ধকার হলেও একপাশে আলো জ্বলছে। এই প্রথমবারের মতো ওরা খেয়াল করল ব্যাংকের সাইনবোর্ডের একপাশে এদিকে লেখা টুয়েন্টিফোর-সেভেন লকার অ্যাডেইলেবল। 'লকার অ্যাডেইলেবল সাইন যেহেতু আছে, কাজেই কাজ হবে মনে হচ্ছে।'

'একটাই চিন্তা,' টমি বলে উঠল। 'এই সব লকারের একটা মেয়াদ থাকে, সেই মেয়াদের বাইরে এক্সটেনশন না করলে বা না খালি করলে, লকার ডেসট্রয় করে ফেলা হয়।'

'এখানে এক শ বছরের জন্যও লকার নেওয়া যায়,' রুশো বলে উঠল। 'আমার মনে হয় না ডেভিডের মতো লোক খুব অল্প সময়ের জন্য লকার নিয়েছিল।'

ওরা এগিয়ে যেতেই একজন দারোয়ান এসে জানতে চাইল, কী জন্য এসেছে তারা। ওরা জানাল। দারোয়ান ভেতরে নিয়ে একজন অ্যাসোসিয়েটকে ডেকে নিয়ে এলো। পুরোদোক্তর পোশাক পরা মানুষটাকে দেখে বোঝার উপায় নেই এখন প্রায় ভোররাত। সে ওদের নিয়ে একটা রুমে বসাল। ওদের কাছে লকার নম্বরটা জানতে চাইল, তারপর ভেতরে নিয়ে এলো সারি সারি লকারের সামনে।

'আমার সে হাতের একটা লেজারের মতো জিনিস এসে ওদের সাইন নিল এবং সেটা থেকে একটা চাবি বের করল। 'আমার বিলিভ আপনাদের কাছেও

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

একটা চাবি আছে, বলে সে চাবিটার জন্য হাত বাড়াল। বাশার চাবিটা তার দিকে এগিয়ে দিতে, লোকটা প্রথমে নিজের চাবিটা লকে ঢুকিয়ে মোচড় দিল এবং এরপর ওদের দেওয়া চাবিটা প্রবেশ করাল। দূর দূর বৃকে অপেক্ষা করছে সবাই, ওদের শঙ্কা মুক্ত করে লকারের তালাটা কিট করে একটা শব্দ হয়ে খুলে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই।

‘আপনারা কি এখানে লকারের কনটেন্ট চেক করতে চান?’

‘জি,’ লকারের লম্বা বাক্সটা বাশারের হাতে দিয়ে সে ওদের পাশের ছোট একটা কামরায় নিয়ে এলো। ‘আপনাদের কাজ শেষ হলে জানাবেন, আমি বাইরে রিসিপশনে থাকব।’

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাশার লকারের জিনসগুলো টেবিলে ওপরে রাখল।

‘খোল খোল,’ আমার আর সহ্য হচ্ছে না,’ সামিরা বলে উঠল।

বাশার ভগিতা না করে ওটা খুলে ফেলল। ভেতরে একটা ছোট পিস্তল, বেশ কিছু বিভিন্ন ধরনের কারেলি, নানা ধরনের কাগজ এবং ভেতরে একটা পোর্টেবল ড্রাইভ এবং ছোট একটা ডায়েরি। ওরা কেউ দেখার আগেই টমি ডায়েরিটা তুলে নিল। ওটা দেখতে দেখতে বলে উঠল, খুব বেশি লেখা নেই, তবে পুরোটাই কোডে লেখা,’ বলে সে ডায়েরি আর পোর্টেবলটা দেখাল। ‘আমার বিশ্বাস, আগের ডায়েরি আর এটা, এদুটো এক করলে দুইটার মিনিং বের করা যাবে।’

‘এই দুটো একসঙ্গে করলেই সে যে রিংগুলো পেয়েছিল, সেগুলো এবং বাকিগুলোর অবস্থানও জানা যাবে,’ রুশো মন্তব্য করার ভঙ্গিতে বলে উঠল।

‘আর এই পোর্টেবল এবং ডক্টর আবদেলের পোর্টেবল এক করলে বাকি রহস্যের পুরোটাই সমাধান হবে,’ টমি বলে উঠল।

‘কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে-ডায়েরিটা মিসিং সেটার কী হবে?’ সামিরা জানতে চাইল। ‘ওটা তো গেছে।’

‘বাশার হেসে উঠল, আমার বিলিভ, ওটার ব্যবস্থা একটা হবে,’ বলে সে এসব গুছিয়ে আবার ব্যাগে ভরে ফেলল। এখন চলো। এখানে যা আছে বেশির ভাগগুলো এভিডেন্স হিসেবে জমা দিয়ে বাকিগুলো নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে,’ ওরা সব গুছিয়ে আবার রিসিপশনে এসে সাইন করে বাইরে বেরিয়ে এলো। গাড়ির কাছে চলে এসেছে হঠাৎ বাশার থেমে গেল। ‘গাড়ির দরজা খোলা মনে হচ্ছে না?’

সিপাহী

রাস্তার মাঝামাঝি ছিলে ওরা, বাশার দৌড় দিল গাড়িটার দিকে, অন্যরাও অনুসরণ করছে তাকে। ‘কি ব্যাপার?’

পেছন থেকে ভেসে আসা ক্লিক শব্দটা শুনে থেমে গেল বাশার। ‘চুপচাপ হাতের ব্যাগটা দিয়ে দিন,’ পেছন থেকে ভারী একটা গলা বলে উঠল।

গলা একটা হলেও পায়ের আওয়াজ একাধিক, মানুষ যে একের বেশি সেই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

অন্যদের সঙ্গে জয়া সরকার আর আলী আজগর ডাইনিংরুমে বেরিয়ে এসে দেখল তার লোকেরা প্রায় সবাই জড়ো হয়ে গেছে। সবাই অস্ত্রে সজ্জিত। ‘শোন ওরা আমাদের মারার জন্য আসছে,’ বলে উঠল আলী আজগর। ‘তোমাদের সবার মরার দরকার নাই, যারা যারা চইলা যাইতে চাও টাকা নিয়া সইরা পড়তে পারো,’ বলে সে নিজের ওই দাঁড়িওয়ালা লোকটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘মনা, তুমিও চলে যাও।’

‘আজগর চাচা আমি আপনার সঙ্গেই থাকব,’ লোকটা মাথা নিচু করে বলে উঠল।

‘তোমার ইচ্ছা,’ বলে আলী আজগর মাথা নাড়ল। ‘এক কাজ করো, যারা চলে যাবে, দ্রুত তাদের বিদেয় করে অস্ত্র যা আছে নিয়ে সামনে চলো। বাড়ির সামনে থেকে গুলির শব্দ ভেসে আসতে শুরু করেছে। ‘সময় নেই জলদি করো।’

পরবর্তী দশ মিনিটের ভেতরে জয়া, আবদুল্লাহ আর রমিজ দারোগা আলী আজগরের লোকদের সঙ্গে যখন বাড়ির পেছনের গোপন পথ দিয়ে বের হয়ে পেছনের জঙ্গলে পা রাখল, বাড়ির সামনের অংশে রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। দ্রুত পা বাড়াল ওরা পথে গিয়ে। আরো চল্লিশ মিনিটের মতো সময় পরে কেওটখালি বাসস্ট্যান্ডের সামনে যখন ওদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল তখন প্রায় ভোর হতে শুরু করেছে।

জয়া সরকার মোবাইল বের করে ডায়াল করতে লাগল বাশারের নম্বরে। কিন্তু বাশার কল ধরল না। ‘কোথায় তুমি বাশার, জলদি ধরো, এখন আমি জানি কী করতে হবে।’

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

অস্থায়ী লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বাশার যখন হেসে উঠল, লোকগুলো রীতিমতো চমকে উঠল। ওরা ভেবেছিল ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়ে জিনিসগুলো হাতিয়ে নিয়ে চলে যাবে ওরা। কিন্তু ওদের ভেতরে কোনো চমক তো নেই, বাশারকে বরং উলটো হাসতে দেখে প্রাথমিকভাবে ভড়কে গেল ওরা। বাশার আশপাশে তাকিয়ে দেখল—তিনজন। দুজনের হাতে অস্ত্র, কাছাকাছিই কোথাও নিশ্চিত সেই মাইক্রো লুকিয়ে রেখে এসেছে। ‘শোন আমি জানি তোমরা কারা, অন্তত অনুমান করতে পারি।’

‘কোনো কথা নেই, সোজা জিনিসগুলো দিয়ে দাও, নাইলে—’

‘নাইলে তোমরা মরবে,’ বলে বাশারের গলা শান্ত কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে রাগে চিড়বিড় করছে। তার পাশ থেকে রুশো এবং সামিরা একযোগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল—ওদের লোক দুজন এগিয়ে এসে পিঙ্কল চেপে ধরল একবারে রুশোর কপালের পাশে আর সামিরার মাথার পেছনে।

‘এক মিনিট সবাই শান্ত হও,’ বাশার নিজের দুই হাত তুলে শান্ত হতে বলল।

‘ব্যাগ?’ সবার সামনে থাকা লোকটা এগিয়ে এসে পিঙ্কল ধরল বাশারের একেবারে মুখের সামনে। ‘মনে রেখো তোমরা কারা আমরা অনুমান করতে পারি,’ তোমরা পালাতে পারবে না।’

লোকটা টান দিয়ে বাশারের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে মুখটা সামান্য খুলে ভেতরে একবার পলক বুলিয়ে নিয়ে বাশারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘দেখা যাবে,’ বলে নিজের লোকদের দিকে ইশারা করতেই সবাই পিছিয়ে গেল, এক মিনিটের ভেতরে সেখানে এসে থামল সেই সাদা মাইক্রো, প্রায় এক ঝলকের মতো সবাই উঠে পড়ল ওটাতে। সামিরা পিঙ্কল তুলল ওটার দিকে, বাশার হাত দিয়ে থামিয়ে দিল তাকে। ‘শান্ত হও।’

‘শান্ত হব মানে!’ সামিরার চেয়ে বেশি উত্তেজিত হয়ে আছে রুশো। সে নিজের মাথার দুই পাশ চেপে ধরে বসে পড়ল রাস্তার ওপরে। ‘আপনি কি পাগল নাকি, এভাবে সব শেষ হয়ে যেতে দিলেন,’ বলে সে অন্যদের দিকে ফিরে বলে উঠল, ‘আপনার কি ন্যূনতম সেল অব রেসপনসিবিলিটি নেই, রিফাত আপাকে কীভাবে বাঁচাবেন? সব শেষ!’

‘বাশার এখন সবখানে অ্যালাইট জারি করে দেওয়া দরকার,’ সামিরা টকি বের করতে যাচ্ছিল, বাশার আবারো তাকে থামিয়ে দিল। ‘রিল্যাক্স,’ বলে সে

সিপাহী

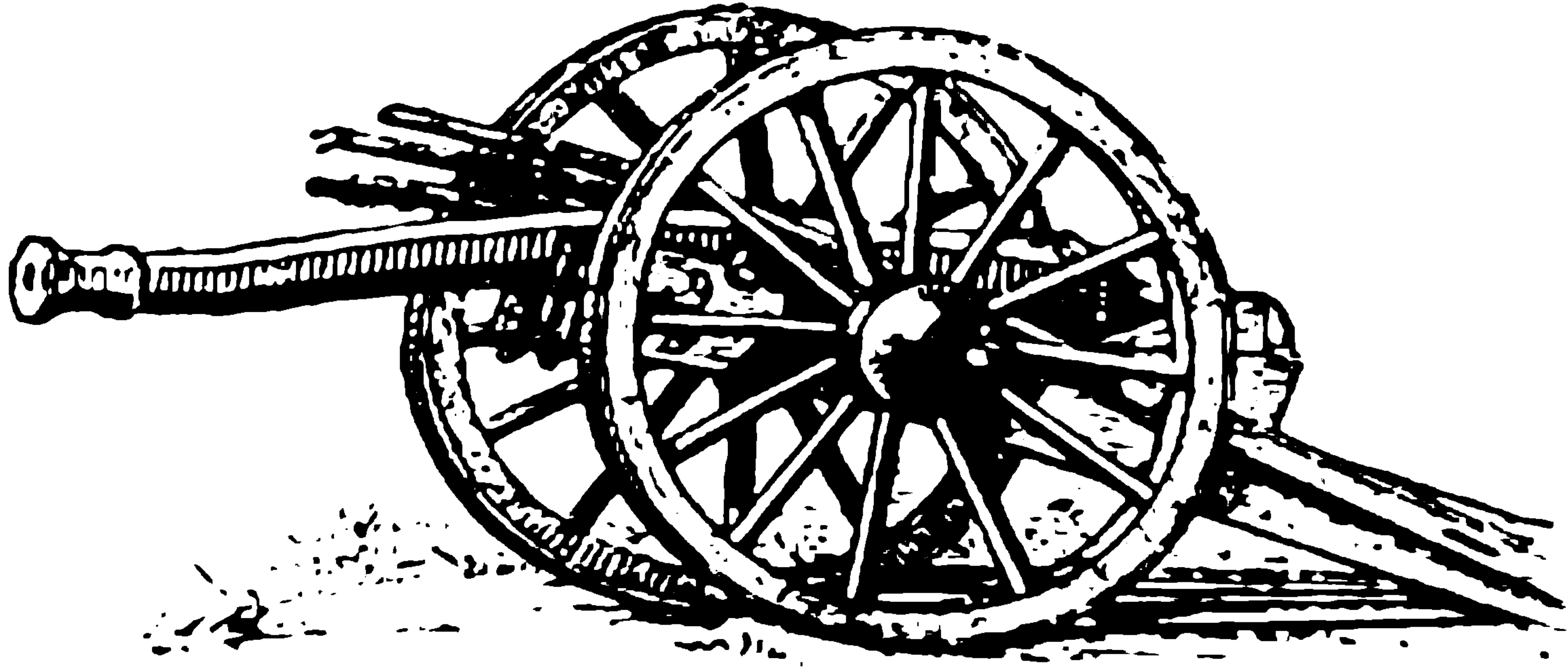
রুশোর দিকে ফিরে তাকাল। 'কিছুই শেষ হয়নি এখনো, তবে এখন সময় হয়ে গেছে শেষ হওয়ার। পুরো গল্প শেষ করার সময় এসেছে এখন।'

'কিন্তু কীভাবে সবই তো গন।'

'না, কিছুই হারায়নি,' টমি বলে উঠল পাশ থেকে। 'আমরা আগেই জানতাম প্রথম ডায়েরিটা নেওয়ার পর কান্ট চেষ্টা করবে দ্বিতীয় কু নেওয়ার। আর তাই প্রটেকশন না নিয়ে আমরা ফাঁদ তৈরি করেছি।'

'মানে?' সামিরাও অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'ওই ব্যাগে ট্র্যাকার দেওয়া আছে,' টমি বলে উঠল দাঁত কেলিয়ে। 'এবার ওদের অনুসরণ করে আমরা কেস সলভ করব।'



অধ্যায় বিরাশি সময় : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ হায়দ্রাবাদ শহরের সায়াফে

গুলির শব্দটা শুনে সবাই সচকিত হয়ে উঠল। প্রথমেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সোলেমান। ‘ব্যাপার কি—এখানে আমরা আছি কেউ জানল ক্যামনে।’

‘নিশ্চয়ই, ওদের লড়াই থামানোর সময় দুবার গুলি করা হয়েছে,’ কর্নেলও উঠে দাঁড়িয়েছে। ‘সেই গুলির শব্দ শুনেছে টহল সৈনিকেরা,’ আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল কর্নেল। ‘ব্যাপারটা বোকার মতো হয়ে গেছে।’

সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে, অস্ত্র বের করে এনেছে অনেকে কিন্তু আসল কাজটা করল সেই মেয়েটা। খাবার পানি রাখা ছিল একটা চামড়ার মতো পাত্রে, ওটাও সেই এনেছিল অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে। ওটা তুলে ছুড়ে মারল সে আন্তনটার ওপরে। ‘আমগো আরো আগেই বোঝা উচিত ছিল।’

পালোয়ানের কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছে, আবারো গুলি হলো, এবারের গুলিটা পিটারের মাথার পাশ দিয়ে চলে গেল। মাথা নিচু করে ফেলল সবাই। ‘জলদি জলদি,’ বলে মেয়েটা ওদের উলটোদিকের পথ দেখাল।

‘সবাই শোন, আমরা কাউকে হত্যা করব না কোনো অবস্থাতেই,’ বলে সে-ও নড়তে শুরু করতে গিয়েও থেমে গেল। সেই সন্ন্যাসী ছেলে মিস্তি দাঁড়িয়ে আছে, যেদিক থেকে শব্দটা ভেসে এসেছে সেদিকে। ‘তুমি যাবে না?’

‘যাব, তবে আগে আপনারা এগোন, এগুলো সবই আমার কর্ম,’ বলে সে কর্নেলের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে উঠল। ‘আপনারা জানেন আপনার বন্ধুরে কোথায় পাওয়া যাবে, আর সেই জিনিসটাও কোথায় পাওয়া যাবে, কাজেই আমি যদি নাও যেতে পারি আপনাদের সঙ্গে—সমস্যা নাই,’ বলে সে পেছনে ফিরতে যাবে, তার আগেই কর্নেল ধমকে উঠল।

সিপাহী

‘তোমাকে আমি চিনি এক ঘণ্টাও পুরো হয়নি,’ বলে সে থেমে গিয়ে যোগ করল, ‘তবে এটা বুঝতে পারছি তোমাকে ছাড়া আমি ভিক্টরকে উদ্ধার করতে পারব না। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব,’ বলে কর্নেল একবার মাথা নেড়ে রওনা দিল যদিকে তার দল এগিয়েছে সেদিকে। ছেলেটা একবার মাথা নেড়ে ফিরে তাকাল জঙ্গলের দিকে।

কর্নেল দৌড়াতে শুরু করেছে। জঙ্গলটা ছোট হলেও ঘন এবং অচেনা ঘন জঙ্গলের ভেতরে খুব জোরে দৌড়ানো সহজ কথা নয়। কর্নেল আরো কিছুদূর এগিয়ে নিজের দলকে ধরে ফেলল। সবাই দ্রুত এগোনোর চেষ্টা করছে।

‘ওই ছেলেটা কই, মিস্তি?’ কর্নেলকে দেখে পালোয়ান জানতে চাইল।

‘ও পেছনে রয়ে গেছে যাতে আমরা পালাতে পারি,’ বলে কর্নেল পালোয়ানকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেল, এখন সে সবার সামনে থাকা মেয়েটার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে।

‘ও আইবো না?’ যদিও প্রশ্নটা পেছন থেকে এসেছে কর্নেল তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটার দিকে। ‘আসবে, ওকে না নিয়ে আমি যাব না,’ বলে সে মেয়েটার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে, অন্ধকারের ভেতরে ঠিক বুঝতে পারল না নাকি ভুল দেখল, কর্নেল ধরতে পারল না। তবে মেয়েটার চোয়াল একবার শক্ত হয়েই আবার ঠিক হয়ে গেল।

‘আমরা কোনদিকে যাচ্ছি?’ পেছনের জঙ্গল থেকে ঠকঠক এক ধরনের অদ্ভুত শব্দ ভেসে এলো, সেই সঙ্গে বিচিত্র এক ধোঁয়ার গন্ধ। ‘এইটা কীসের শব্দ।’

‘এটা মিস্তির কাজ,’ মেয়েটা কর্নেলের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলে উঠল। ‘ওরা এক ধরনের হাতবোমা মারে,’ বলে সে থেমে গেল, কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে। কর্নেল কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল, তাকেও মৃদু ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল সে। ওরাও শুনতে পাচ্ছে ওরা যদিকে এগোচ্ছে সেদিক থেকেও আওয়াজ ভেসে আসছে।

‘আমরা যাব নৌকাটার কাছে, ওইটা যদিকে সেদিকে সৈনিকেরা ছিল, কিন্তু মিস্তি ওগোরে ফিরাব বা অন্যদিকে সরিয়ে দেব, আমরা যদিকে এগোচ্ছি তার ডাইনে থেইকা আওয়াজ আসতাকে,’ বলেই সে সবার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। ‘আমরা ডাইনে যাব, তারপর বামে মোড় নিলে, নৌকার কাছাকাছি পৌছিয়ে যাব, একবার নৌকায় উঠতে পারলে খাল পার হয়ে নদীতে পড়ব, সেইখান থেইকা নদী দিয়া রাজা বিক্রম সিংয়ের এলাকায় পৌছানোর সম্ভব হবে। জলদি জলদি,’ বলে সে ডানে ঘুরে দৌড়াতে শুরু করল।

তৃতীয় অংশ : একরকম মৃত্যুর খেলা

ওদের বাঁ দিক থেকে আওয়াজ ভেসে আসছে, কর্নেল অন্যদের আগানোর জন্য ইশারা করে, পিঙ্কল বের করে যেকোনো আওয়াজ আসতেছে সেদিকে মাথার ওপরে ফাঁকা গুলি করল। রাতের জঙ্গলের আওয়াজ হলো বজ্রপাতের মতো।

এক-দুই-তিন গুনে কর্নেল গুলি ভরতে ভরতে আবারো গুলি করল, তারপর গরম হয়ে উঠলে পিঙ্কলটা খাপে ভরে দৌড়াতে শুরু করল। সবাই প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে, কর্নেল খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে অন্যর থেকে, কর্নেলের গুলির আওয়াজে সৈনিকদের দলটা পিছিয়ে পড়েছিল, আবার আওয়াজ আসতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। কর্নেলরা ডানে ঘুরে খানিক এগিয়ে জঙ্গলের ভেতরেই কায়া মেয়েটাকে বাঁক নিতে দেখে অনেকটা অন্ধের মতোই বাঁক নিল। এখন প্রায় চারপাশ থেকে আওয়াজ আসতে শুরু করেছে। কর্নেলের কাছে মনে হচ্ছে, ওদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলছে শত্রুরা। কর্নেল প্রাণপণে দৌড়াতে দৌড়াতে ত্রিলোকের পাশে চলে এলো। ‘একটা ফাঁকা গুলি করো।’

ত্রিলোক দৌড়াতে দৌড়াতে নিজের বন্দুক বের করে আনল, ঝগিকের জন্য থেমে গিয়ে ওটাকে সাজাতে শুরু করল সে। কর্নেলও থেমে গেছে, ত্রিলোক দ্রুত সম্ভব ঠিকঠাক করে গুলি করল, কিন্তু তাড়াহড়োয় ভুল করল কিছু একটা। গুলি বের হলো না বন্দুক থেকে। ঠুস করে ফেটে গেল গুলি, আরেকটু হলে হাতই উড়ে যেত তার। ‘ধুর!’

সৈনিকদের পায়ের আওয়াজ প্রায় ঘাড়ের ওপরে চলে এসেছে। ওদের পেছন থেকে এগিয়ে এসে একহাতে বন্দুক ধরে গুলি করল সোলেমান। সামনের ওরা কোনদিকে গেল—স্রেফ ধারণার ওপরে ভর করে দৌড়াচ্ছে তিনজনে। ‘ওই যে ওই, সামনে,’ কেউ একজন চিৎকার করে বলে উঠল সামনের ফাঁকা জায়গা দেখে। অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর থেকে হশ করেই যেন ফাঁকা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। অন্যরা এরই মধ্যে নৌকায় উঠে গেছে। দৌড়াতে দৌড়াতে বালিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সোলেমান। তাকে টেনে তুলে নৌকার কাছ পর্যন্ত পৌঁছে গেল ওরা। লাফিয়ে উঠে বসল নৌকাতে। পালোয়ানের কুকুরটা প্রাণপণে ঘেউ ঘেউ করছে। কায়া মেয়েটা তুলে ফেলেছে নৌকার দড়ি, সে আরা পালোয়ান পানিতে দাঁড় ফেলতে যাবে—চোঁচিয়ে উঠে তাদের ধামতে বলল কর্নেল। ‘এখন না, আমি মিস্তির জন্য অপেক্ষা করব।’

‘অসম্ভব—’

‘কর্নেল, সময় নাই—’

জঙ্গলের কিনারায় পায়ের আওয়াজ চলে এসেছে কর্নেল কিছু বলার আগেই আশ ডজন সৈনিক বালিতে পা রাখল জঙ্গল পার হয়ে। সবাই বন্দুক তাক করে

সিপাহী

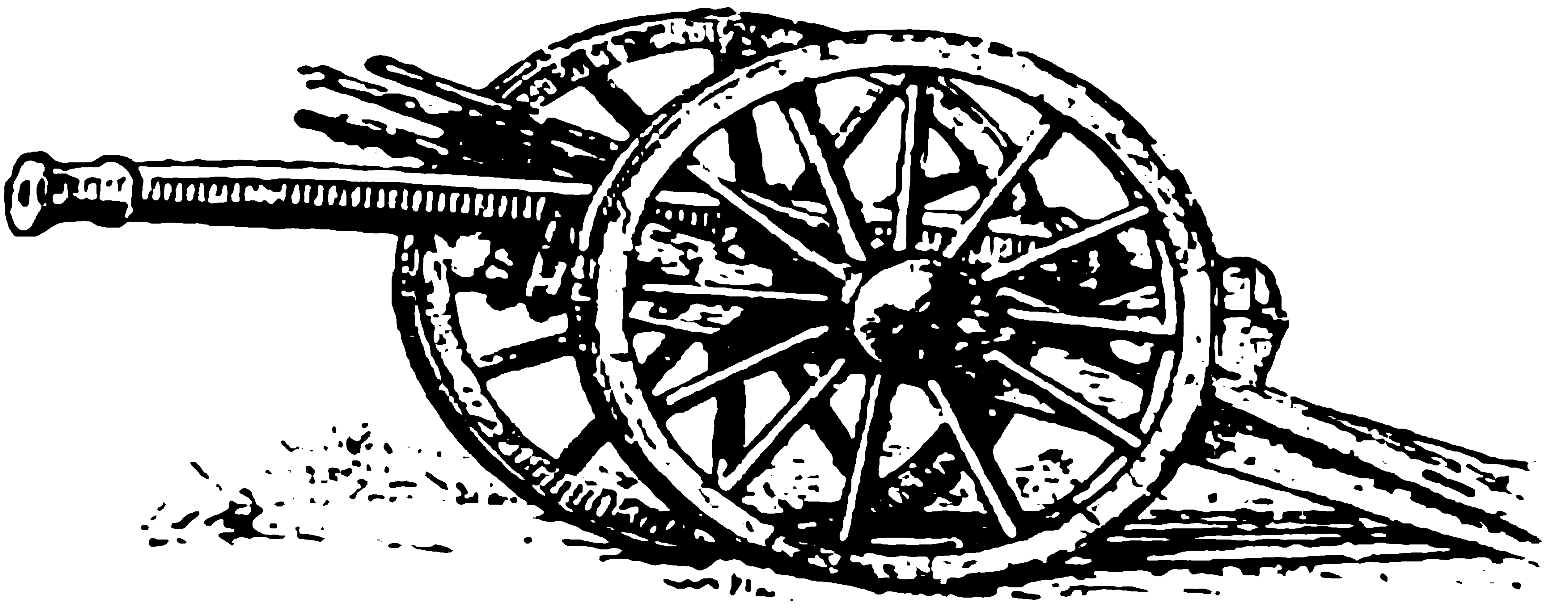
রয়েছে তাদের দিকে। ঋষিকের জন্য কর্নেলের মনে হলো নিজের তো বটেই
সবার মৃত্যুর কারণ হলো সে।

ওরা কিছু করার আগেই সেই বিচিত্র কট কট শব্দে ভরে গেল ছোট বালিময়
খালপাড়, আগুনের ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল, সৈনিকরা গুলি করা তো দূরে থাক—
কাশতে কাশতে অবস্থা ঝরাপ তাদের। ধোঁয়ার ভেতর থেকে লাফিয়ে নৌকার
কাছে পা রাখল জটাধারী একজন মানুষ, নিজের লম্বা চুল নেড়ে মিস্তি বলে
উঠল, 'কীসের লাগিয়া বইসা আছেন, জলদি চলেন, বিক্রম সিংরে ধরতে
হবে।'

হেসে উঠে পানিতে দাঁড় ফেলল পালোয়ান।

হস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কর্নেল।

গল্প শেষের শুরু



অধ্যায় তিরিশি বর্তমান

‘আমাদের পরিকল্পনা খুব পরিষ্কার এবং স্থির,’ সিগারেটে টান দিয়ে বলে উঠল বাশার। ‘দুঃখজনক হলোও সত্যি যে এই কেসের শুরু থেকেই আমরা ব্যাকড্রপে ছিলাম। রিফাত অপহরণ হয়ে যাওয়াতে আমরা শুরুতেই দুর্বল হয়ে পড়েছি, এরপর করাপটেড সিস্টেমের কারণে প্রতি পদে আমাদের নিজেদের লোকের হাতেই হেনস্তা হতে হয়েছে। এরপরে কাজে নামার পরও প্রতিনিয়ত দেখা গেছে মানা সমস্যা। প্রথমত, আমাদের শত্রু কারা, তাদের শক্তি-ক্ষমতা কিছুই বুঝতে পড়ছিলাম না আমরা! তবে এটা বুঝতে পারছিলাম রেলিক এবং নেত্রপলিশ তো বটেই, এমনকি আরো লোকজন আমাদের ব্যবহার করছে নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। এই কারণে আমি এবং টমি আজ রাতের প্রথম ছিনতাইয়ের ঘটনার পর সিদ্ধান্ত নিই যে, আমরা এবার অন্যভাবে খেলব,’ বলে বাশার সিগারেটে টোকা দিয়ে ছাই ফেলল। ‘এবার আমরা অন্যদের ইউজ করা শুরু করব।

ওরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছে স্বদেশি বাজার মোড়ে। রাত প্রায় ভোর হতে চলেছে কিন্তু এখনো দিনের আলো ফুটেতে অনেক দেরি। বড় বাজারে ওই ব্যাগটা ছিনিয়ে নেওয়ার পর যখন অন্যরা খুব অসহায় আর বিরক্তি বোধ করতে থাকে, বাশার জানায়, ওরা পরিকল্পনা করেছে এমনটা করেছে। ইচ্ছে করেই একাধিক শক্তিশালী ট্র্যাকার বসিয়ে দেওয়া হয় ব্যাগ এবং ডায়েরি দুটোতেই। কেন এই পরিকল্পনা করেছে ওরা এবং কেন অন্যদের জানায়নি, সেটা বলার জন্য জিপ নিয়ে আরেকটু এগিয়ে এসে স্বদেশি বাজারের মোড়ে এসে জিপ পার্ক করে টমিকে চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে—এরকম একটা দোকানে পাঠিয়েছে বাশার, জরুরি কিছু জিনিস আনার জন্য। এই ক্রিকে সে বাকি দুজনকে ব্যাখ্যা

সিপাহী

করছে, আসলে কীভাবে কী করেছে ও এবং সামনে কীভাবে কী করার কথা ভাবছে।

‘এই কারণেই খুব হট করে এই পরিকল্পনা করা এবং ব্যাংকেই জিনিসগুলো ব্যাংকে রাখার সময়ে আমি ওই দুটো ঢুকিয়ে দিয়েছি জায়গামতো,’ বলে বাশার খানিক আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, ‘সরি আমি এত দ্রুত এবং হঠাৎ পরিকল্পনাটা করেছি যে, আমার আসলে সময় ছিল না তোমাদেরকে জানানোর, আর সবাইকে জানালে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল এবং আরো একটা কারণ ছিল না, জানানোর।’

বাশার চুপ, সামিরা এবং রুশোও চুপ। ‘আমি সঠিকভাবে জানি না আমাদেরই কেউ বাগ করেছে কি না, আমার সন্দেহ এমনকি আমাদের অফিসেও বাগ থাকতে পারে, ট্র্যাকার থাকতে পারে। আমাদের সিস্টেম এতটাই করাপটেড, যে আসলে কোনো কিছুই ট্রাস্ট করার উপায় পাচ্ছি না আমি। আর রিফাতকে উদ্ধার করার জন্য আমি যেকোনো কিছু করতে রাজি।’

‘সে তো বুঝলাম,’ সামিরা বলে উঠল। ‘এটাও বুঝলাম কেন আমাদের জানাওনি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ‘ওরা কি আসলে মাঠে নামবে বা কোনোভাবে টের পেয়ে যাবে না তো যে এমন কিছু করা হয়েছে?’

‘ঝুঁকি তো আছেই, তবে ওরাও ডেসপারেট।’

‘কেন এরকম মনে হচ্ছে আপনার কাছে?’ রুশো প্রশ্ন করল।

‘দুটো কারণে। প্রথমত, ওরা কারা আমি জানি,’ বলে সে ইচ্ছে করেই খানিক চুপ রইল। ‘আজ রাতের প্রথম প্রহরে যখন ওরা আমাদের ছিনতাই করতে আসে, একজনের হাতে আমি একটা ট্যাটু দেখেছি, বোটা আমি আগেও দেখেছি,’ বলে সে হাওয়ার ওপরে আঙুল দিয়ে একটা বিশেষ ভঙ্গি করল। ‘ট্যাটুটা আমি কিশোরগঞ্জের বারোভূঁইয়াদের কেসে যে দুজন কান্ট মেম্বার ধরা পড়েছে ওদের হাতেও দেখেছি। আমি ধারণা করছি, সম্ভবত এই কান্টের লোকদের ধোঁকা দিয়ে ডেভিড, সিগনেট রিংয়ের সন্ধানে বের করেছিল। মানে ওদের জিনিস ওরা হারিয়েছিল বেশ আগে। এরপরে ওরা ওদের সম্পদ হারিয়েছে, নিজের লোকদের হারিয়েছে। এখন একটা মাত্র সুযোগ আছে সব ফিরে পাবার আর সেটা করতে পারে ওই ডায়েরি দুটোর মাধ্যমে, কাজেই ওরা চেষ্টা করবেই করবে এবং করতে পারলে ওরা আমাদের সঙ্গে নিজের লোকদের ছাড়ানোর জন্য নেগোশিয়েট করার চেষ্টা করবে।’

‘ঠিক যেটা রেলিক এবং নেত্রপলিস করছে, রিফাতকে অপহরণের মধ্যে দিয়ে।’

গল্প শেষের শুরু

‘হ্যাঁ, এমনকি এগুলোর সন্ধান পেলেও আমার পরিকল্পনা আছে—’

বাশার কথা শেষ করতে পারল না—টমি দুটো ব্যাগ হাতে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলো, ‘জলদি জলদি, ট্রাকার মুড করতে শুরু করেছে।’

বাশার বাকি দুজনার দিকে তাকিয়ে একটা মৃদু হাসি দিয়ে জিপে চড়ে বসল। তার চেহারার অভিব্যক্তি পরিষ্কার, বলেছিলাম না।

‘বাই দ্য ওয়ে, সবাই মোবাইল বন্ধ করো, আমারটাসহ সব মোবাইল বন্ধ থাকবে। অনিশ্চিত কিন্তু অবভিয়াস যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে। এবার সফল হতেই হবে আমাদের রিফাতকে ফিরিয়ে আনতে হলে।’

অতীত

‘আমাদের পরিকল্পনা কি?’ কর্নেল প্রশ্নটা উচ্চারণ করেছে মিস্তির দিকে তাকিয়ে। ছেলেটা এক মনে দাঁড় বাইতে বাইতে ফিরে তাকাল কর্নেলের দিকে। সোলেমান, পালোয়ান, পিটার এমনকি পালোয়ানের কুকুর বাতেনও নৌকার পাটাতনে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। শুধু ঘুম নেই বিষকানায় কায়, কর্নেল আর আরোঘী মিস্তির চোখে। কায় বসে রয়েছে নৌকার এক মাথায়, মিস্তি আরেক মাথায়, যদিও দুজনেই দাঁড় ফেলছে একই দিকে। কর্নেল পাইপ ধরিয়ে টানতে টানতে কথা বলছে দুজনার সঙ্গে। মাঝে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছে সে। এখন তাকে বুঝতে হবে কীভাবে কী হতে যাচ্ছে সামনে।

‘পরিকল্পনা সহজ সাহেব,’ মিস্তি বলে উঠল। সে ধোয়াশা নদীর পানির দিকে তাকিয়ে ছিল, কর্নেলের প্রশ্ন শুনে ফিরে তাকাল কর্নেলের দিকে। ‘আমরা যেদিকে যাইতেছি ওই দিকে আর ঘণ্টাখানেক নাও বাইলে আমরা ছোট একটা গঞ্জে গিয়ে পড়ব। সেই গঞ্জের বাজার খেঁকা আইল দুই হাটলেই রাজা বিক্রম সিংয়ের দুর্গ। ওই দুর্গেই আছে, আমগো সেই জিনিস। আপনার বন্ধুও আছে ওইখানেই। একবার গঞ্জে গিয়া পড়লে কোনো না কোনোভাবে ওই দুর্গে ঢুকতে অইবো আমগো। আর একবার ঢুকতে পারলে—’

‘এলাকায় কি হচ্ছে, আমরা এতগুলো নতুন মানুষ হঠাৎ ওখানে গিয়ে ওই দুই মাইল রাজ্য পার হয়ে দুর্গে পৌছে ওখানে ঢুকে সব করতে পারব কি না, আমাকে বুঝতে হবে,’ কর্নেল চিন্তিত মুখে বলে উঠল। ‘অব্র, মানুষ এবং পরিকল্পনা—এই তিনটা এক বিন্দুতে না এলে আমি নিজে তোমাদের এবং আমার লোকদের বিপদে ফেলতে রাজি নই।’

সিপাহী

‘আমি বুঝতে পারছি আপনার কথা,’ মিস্তি মাথা নেড়ে বলে উঠল। ‘যুক্তি আছে আপনার কথায়। আমরা গজের বাজারে গিয়ে নাইমা দুইটা কাজ করব,’ বলে সে নিজেকে ওধরে নিল। ‘তিনটা কাজ করব আসলে। প্রথমত, আমরা কয়জন আছি, আমরা লগে অল্প কি আছে হিসাব করতে হবে, গজের বাজারে গিয়ে বুঝতে হবে ওইখানকার পরিস্থিতি কি, ক্যামনে নিরাপদে ওই দুই মাইল পার অইতে হবে, সমস্যা অইলো তিন নম্বর বিষয়ে। আমি দুর্গটা চিনলেও ওইটার ভেতরে কখনো যাই নাই। ওইটার ভেতরে দুইকা ক্যামনে কী করব এইটা বাইর করা মুশকিল অইবে।’

‘ওই দুর্গ আমি চিনি খুব ভালোভাবেই, আমি আগেও গেছি ওই দুর্গের ভিতরে,’ কায়া বলে উঠল। সে কথা বললেও মিস্তির দিকে তাকায়নি, সে তাকিয়ে আছে কর্নেলের দিকে। ‘গজের বাজারে আমার লোক আছে, এক বইন, খবর এবং যা যা লাগবে ওইখান থেইকা নেওয়া যাবে।’

‘ভালো এই পরিকল্পনা আমার কাছে আগের চেয়ে বেশি ভালো মনে হচ্ছে,’ কর্নেল পাইপ নামিয়ে রেখে বলে উঠল। ‘তাহলে প্রথমে আমরা ওখানে পৌছে, নিজেদের হিসাব করব, তারপর আমরা খবর এবং জিনিস সংগ্রহ করব, তারপর পরিকল্পনা করে ঠিক করব কীভাবে কী করা হবে। কি মনে হয়?’ সে প্রশ্নটা রাখল দুজনার উদ্দেশ্যেই।

কায়া কিছু না বলে মাথা নাড়ল। ‘ঠিক আছে সাহেব,’ মিস্তিও মাথা নেড়ে সায় জানাল। আরো আধা ঘণ্টা নাও বাওয়ার পর নদীর কূলে দূরের গজের রেখা দেখা দিতেই কর্নেল একে একে ডেকে ডুলল তার লোকদের। সবাই উঠে হাত-মুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে ঠিকঠাক হতে হতে তারা পৌছে গেল গজের ঘাটে রাখা সারি সারি নৌকার ভেতরে। ‘সবাই মন দিয়ে শোন আমরা এখন হিসেব করতে বসব, সেইসঙ্গে ঠিক করব আমাদের করণীয়।’

বর্তমান

‘এখন তাহলে করণীয় কি?’ পাটোয়ারি পান চিবুতে চিবুতে আনমনে বলে উঠল। সবসময় যেরকম ছানীয় ভাষায় কথা বলে সে, সেটা ভুলে গিয়ে অতি উত্তেজনায় তরু ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছে।

‘প্রথমে আপনি আলী আজগরের ওখানে ফোর্স পাঠানোর ব্যবস্থা করেন,’ বলে সে ইনসপেক্টর রবিউলের দিকে দেখল। ইনসপেক্টর মাথা নেড়ে সায় জানাল জয়ার কথায়। জয়া সরকার যখন কল করে বাশারকে পেল না, টমটম

নিয়ে সে সোজা আসে নতুন বাজারের ল্যাবে। সিকিউরিটি যে আছে তাকে ডেকে আনার ব্যবস্থা করতে বলে। সিকিউরিটি এসে জানায় টিমি বা বাশার বা অন্য কেউ নেই, শুধু পাটোয়ারি স্যার রয়েছে, সে-ও ঘুমে। তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার অনুরোধ করে ওরা খানিক পরিচ্ছন্ন হয়ে ক্যান্টিনে অপেক্ষা করতে থাকে, পাটোয়ারি এসে প্রথমিক কিছু কথা শুনেই প্রথমে ইনসপেক্টর রবিউলকে ডেকে পাঠায়। সে যতটা দ্রুত সম্ভব এসে ওদের সঙ্গে যোগ দেয় ল্যাবে, এই মুহূর্তে ওরা অবস্থান করছে ল্যাবের সেই মিটিং এবং ডিসকাশন রুমে।

জয়া প্রথমেই মোটামুটি যতটা সম্ভব বিস্তারিত জানাল কি হয়েছে গতকাল রাত থেকে এবং আলী আজগরের ওখানে কী ঘটেছে এবং কী জানতে পেরেছে সে। তবে খুব সামান্য কিছু জিনিস সে খানিক আড়ালও করে রাখল। বিশেষ করে যখন কামরায় ইনসপেক্টর রবিউল এবং আরো দুজন পুলিশ অফিসার রয়েছে রমিজ দারোগা এবং কনস্টেবল আবদুল্লাহর পাশাপাশি।

‘আচ্ছা প্রথম কথা, তুমি আলী আজগরের সেই বাসার লোকেশন জানো?’ পাটোয়ারি ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করল। প্রাথমিক উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যেতেই সে নিজের স্বরূপে ফিরে গেছে, অত্যন্ত ভাষা এবং সুরধার মস্তিষ্ক একসঙ্গে কাজ করতে শুরু করেছে।

‘না, তবে যেখানে আমরা বাড়ির পেছন দিয়ে পালিয়ে হাইওয়েতে উঠেছি সেই জায়গার লোকেশন আমি বলতে পারব।’

‘রবিউল নোট নাও এবং ওখানে ওরকম বাড়ি অনেক বেশি অইবার পারে না, যতটা জলদি সম্ভব ফোর্স পাঠানোর ব্যবস্থা করো। তুমি আলী আজগরের লোকদের সঙ্গে গাড়িতে ওঠার পরেই খবর দিলা না কেন?’

‘আমি ভয়ে ছিলাম,’ ওইখানে কারো সঙ্গেই কথা বলি নাই, কোনো না কোনো বিপদ হয়, ওরা আবার—’

তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিল পাটোয়ারি। ‘সুখবার পারছি। এখন বলো কোনখিকা শুরু করবার চাও?’

‘আমি আগে বাশারের সঙ্গে কথা বলতে চাই,’ জয়া জোর গলায় বলে উঠল। ‘ওর সঙ্গে কথা বলা এবং ওকে কিছু বিষয়ে সাবধান করে দেওয়া খুবই জরুরি। বিশেষ করে সিলেট এবং চট্টগ্রামে রেলিক আর নেক্রপলিসের লোক ধরা পড়লেও ওদের সত্যিকারের বস প্রভিজি কিং নাকি অ্যাকটিভ এক আলী আজগরের সাজেশন ছিল সেই লোকই নাকি আড়ালে থেকে এসব করেছে।’

সিপাহী

পাটোয়ারি নিজের মোবাইল বের করে ডায়াল করতে লাগল। 'আমি বুঝতেছি না, ওরা গেল কই?' বলে সে জয়ার দিকে ফিরে বলে উঠল। 'শোন মাথা ঠান্ডা রাহো, আমি কমিউনিকেশন রুমে লোক লাগাইতেছি কনটিনিউয়াস একজন ফোন দিতে থাকব, বিশ মিনিট পর পর। আর তুমি ওইখানে যা জানছো সেইটা বলো বিস্তারিত, যদিও টিম নাই, তবে আমরা কাজ শুরু করতে পারি।'

'অবশ্যই স্যার,' বলে জয়া রমিজ দারোগা আর আবদুল্লার দিকে দেখে নিয়ে বিস্তারিত বলতে শুরু করল কি জেনেছে ওখানে।

অতীত

'সবাই মন দিয়ে শোন,' কর্নেল বলে উঠল। তার হাতে পাইপ কিন্তু ওতে তামাক বা আগুন কোনোটাই নেই। এরকম বিধ্বস্ত অবস্থার পরেও তার গৌফের কিনারা এখনো চোখা কীভাবে সেটা একটা রহস্য। 'সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এখন আমাদের সার্বিক করণীয়, আমরা রাজা বিক্রম সিংহের দুর্গে হানা দিতে যাচ্ছি,' বলে সে মিস্তির দিকে দেখাল। 'কারণ সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী এই সমস্ত ঘটনার সূত্রপাত তার হাত ধরেই এবং এর সঙ্গে একে একে জড়িয়ে গেছে কায়া, মিস্তি, তাদের গোত্র, ইংরেজ বাহিনী পরবর্তীতে কোম্পানি ব্রিটিশ রাজ এবং সবশেষে আমরা। তথ্য আরো বলে ভিক্টরও ওখানেই আছে।'

কর্নেল খানিক থামল। 'সমস্যা হলো, এত এত কিছু করেও আমরা না জানি মানুষটা সম্পর্কে, না জানি তার শক্তি-সামর্থ্য এবং তার জায়গার আর আকৃতি বাহিনী সম্পর্কে। আমার কাছে মনে হচ্ছে আমরা একটা গল্পের বা উপন্যাস পড়তে পড়তে সেটার শেষ পর্যায়ে পৌঁছেও আমরা এর মূল খল চরিত্র সম্পর্কেই ঠিক মতো জানতেই পারিনি। এটা আমাদের কমতি, কিন্তু সম্পূর্ণ বাইরে থেকে এসে এত জটিল ঘটনার ভেতরে ঢুকে আমরা সম্ভাব্য সবকিছু জানতে পেরেছি এবং যে-কাজ এবং দায়িত্ব নিয়ে আমি ভারতে এসেছিলাম এবং তোমাদের খুঁজে বের করে একত্র করেছিলাম, সেই দায়িত্বটা ছিল ভিক্টরকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেটার প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি। এটা আমাদের সাফল্য।'

কর্নেল আবারো থামল, সবার অভিব্যক্তি দেখে সে। 'সাফল্য ব্যর্থতা সবমিলিয়ে আমরা এখন এই অবস্থানে আছি। যেহেতু আমি যে-কাজে নেমেছি

সেটা শেষ দেখেই ছাড়ব কাজেই এই অভিযানে আমার জন্য ফেরার কোনো পথ বা উপায় নেই। কিন্তু যেহেতু একেবারেই অন্ধের মতো শত্রুর গুহায় ঢুকতে যাচ্ছি, একভাবে বলতে গেলে শুধু গুহায় প্রবেশই নয়, সোজা বাঘের মুখের ভেতরে হাত দিতে যাচ্ছি কাজেই, আমি তোমাদের আরেকবার ভাবতে বলব। তোমরা যদি কেউ এখান থেকে অভিযানে পিছিয়ে যেতে চাও, তাহলে আমি বলব এটাই সেরা সময়, আমার জন্য তোমাদের জীবনের ঝুঁকি একাধিকবার নিয়েছো, কিন্তু এখন যা ঘটতে যাচ্ছে, সেটা স্রেফ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই বলো, কেউ কি পিছিয়ে যেতে চাও?’

‘আমার জন্য ফেরার কোনো পথ নাই,’ মিস্তি বলে উঠল। ‘হয় আমি আমার গোত্রের সম্মান এবং সম্পদ ফিরায়ে নেব, আর না হয় এই নদীর জলে আমি আত্মহত্যা করব,’ তার কণ্ঠে কোনো দ্বিধা নেই।

‘আর আমার দ্বিতীয় জনের দুইটা লক্ষ্য, একটা বিক্রম সিংয়ের রক্তপান,’ বলে সে মিস্তিকে দেখাল। ‘আর দুই, ওর রক্তপান। হয় আমি এই দুইটা করব আর না হয় আমি নিজে আত্মহনন করব।’

কর্নেলের বাকি লোকেরা সবাই চুপ, কেউ কথা বলছে না দেখে পালোয়ান কথা বলে উঠল। ‘শোন কর্নেল এরা সবাই তোমারে মানে, তাই এরা কিছু বলবে না। এদের হয়ে আমি বলে দিচ্ছি। তুমি যদি আমগোরে নপুংসক মনে না করো, তাইলে এই কথা আর দ্বিতীয়বার বলবা না। ঘর খেইকা বাইর হইছি, হয় লক্ষ্য পূরণ করব, আর না হয় একসঙ্গে—’ বলে সে কথা শেষ না করে ইশারায় নিজের গলা কাটার ভঙ্গি করল।

‘অবশ্যই, অবশ্যই,’ সোলেমান বলে উঠল। সে নৌকার পাটাতনে বসা কর্নেলের কুকুরটা পিঠে হাত বুলাচ্ছে। ‘পালোয়ান বা ত্রিলোকদারে এই অভিযানে शामिल করছিলেন আপনে, আর আমি এই অভিযানে আসছিলাম আপনার জন্য। আমার মৃত বাবার জন্য। আপনার সঙ্গে আমার বাপে কাজ করত, তার সঙ্গে যা ঘটছিল, সেইটা ঠিক হয় নাই। তার সম্মান ফেরানোর একটাই উপায় আমার,’ সে সোজা তাকিয়ে আছে কর্নেলের চোখের দিকে। কর্নেলও ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ‘এই অভিযান সফলভাবে শেষ করা।’

‘ত্রিলোক তুমি তো সংসারি মানুষ,’ কর্নেল বলে উঠল। ‘তুমি কি বলবা?’

‘আমার জীবনে কোনো কাজে পেছন ফিরতে দেখছেন আপনে?’ বলে সে হেসে উঠল। ‘আর এই কাজে এত কষ্ট করার পর আমি শেষটা না দেখে চলে যাব। আমার ধারণা, এইখানে কেউই যাবে না, চলেন কাজের কথা শুরু করি।’

সিপাহী

পিটারও মাথা নেড়ে সায় জানাল। ‘আমারো যাওয়ার কোনো উপায় নেই।’
কর্নেল আবারো সবার দিকে দেখল। ‘সেইটাই ভালো তাহলে।’

বর্তমান

‘গতি বাড়ছে দেখতে পাচ্ছে?’ ট্র্যাকারের মুভমেন্টের দিকে দেখতে দেখতে টমি বলে উঠল বাশারকে। সে বাশারের পাশের সিটে বসেছে। ‘এরা তো মনে হচ্ছে ময়মনসিংহ শহর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।’

‘শহর থেকে বের হোক আর যেখান থেকে বের হোক। আমি এবার এর শেষ দেখে ছাড়ব,’ বাশারের গলায় পর্বতের দৃঢ়তা। ‘সবাই মন দিয়ে শোন। আমি পুলিশ মানুষ। আমার কর্মক্ষেত্রের শুরু থেকে আমি পুলিশ ছিলাম, বাকি জীবনও তাই থাকবে। স্পেশাল ফোর্স বলো, আর যাই বলো, বেলা শেষে আমি পুলিশ। কাজেই কেস সলভ করা, জীবনের ঝুঁকি নেওয়া, অ্যাকশনে যাওয়া এগুলো আমার কাজ। কিন্তু তোমরা সবাই সেটা নও। দ্বিতীয়ত, এই কেস সমাধান করার ওপরে, অ্যাটর্নিস্ট সিগনেট রিংগুলো খুঁজে বের করার ওপরে নির্ভর করছে রিফাতকে খুঁজে পাওয়া এবং তার জীবন। আর সে শুধু আমার ফিয়োসেই না, একভাবে বলতে গেলে আমার একমাত্র কাছের মানুষ, কাজেই যেকোনো মূল্যে আমাকে ওগুলো খুঁজে বের করতেই হবে, সেটা আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও। কাজেই এই কেস এবং এই অভিযান আমার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আশা করি তোমাদের না বললেও চলবে। কিন্তু তোমাদের জন্য ব্যাপারটা মোটেই এমন নয়। যে অভিযানে আমরা যাচ্ছি এটা এক ধরনের স্টুপিড অভিযান, আনঅথোরাইজড, শত্রুর নাম-নিশানা শক্তি ইত্যাদি ঠিকভাবে জানানোই। কাদের বিরুদ্ধে কীসের বিরুদ্ধে যাচ্ছি—সেটাও ঠিকভাবে বলা নেই, শুধু ইনটুইশনের বশে আমরা একরকম বাধ্য হয়ে এই অভিযান চালাচ্ছি যেটাতে জীবনের ঝুঁকি তো বটেই এমনকি, বেঁচে ফেরার সম্ভাবনাও কম। কাজেই তোমরা কেউ যদি এই অভিযানে যেতে না চাও, এখনি বলো, আমাদের জিপ ময়মনসিংহ শহরের সীমা অতিক্রম করেনি, এর আগেই আমি তোমাদের নামিয়ে দেব।’

সবাই চুপ, টমি কথা বলে উঠল। ‘আমি আছি, একভাবে বলতে গেলে আমি পুলিশ না হয়েও পুলিশ, আমিও বাকি জীবন এই কাজ করে যাব কাজেই এ বিষয়ে ভয় পেলে বুড়ো হলে কী করব!’ টমির কথার ধরনের সবাই হেসে

ফেলল। 'আমি না গেলে তুমি সব সামলাতে পারবে না, ঠিকমতো ট্র্যাক করা তো দূরের কাজ। হাহ, নিজেরে এত বাহাদুর মনে করার কোনো কারণ নাই।'

'টমি, আমি দুষ্টামি করতেছি না।'

'আমিও না,' বলে টমি ফিরে তাকাল সামিরার দিকে। 'আপা, আপনে বলেন।'

সামিরা তার পিঙ্কল বের করে দক্ষ হাতে সেটাকে অ্যাসেম্বল করে খাপে ভরে বলে উঠল। 'আজতক কোনো কাজে আমি পিছু হটিনি, আর আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় কেসে পিছু হটব, এটা যে ভাববে তারই খবর আছে,' বলে সে মাথা নাড়ল। 'আর আমিও টমির সঙ্গে একমত, তুমি বাশার যতই গল্প মারো। তুমি একা কিছুই করতে পারবে না। আমাদের হেল্প তোমার লাগবেই।'

এবার সবাই মিলে ফিরে তাকাল রুশোর দিকে। তার চুল এলোমেলো রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে চেহারার অবস্থা বিধ্বস্ত। মোটা লেসের ওপাশ থেকে তার চোখ জোড়া স্রেফ জ্বলজ্বল করছে। 'আমার কথা আপনাদের কাছে হয়তো অস্বাভাবিক লাগবে, কিন্তু আমি একভাবে বলতে গেলে জন্ম থেকে আর্কিওলজিস্ট। এতিমখানায় বড় হওয়া ছেলে আমি, জীবনে কারো ভালোবাসা পাইনি, এক রিফাত আপা বড় বোনের মতো ভালোবেসেছে আমাকে। গত ছয়টা মাস আমার মনে হয়েছে আমি সত্যিকারের পরিবার খুঁজে পেয়েছি। সেই মানুষটাকে আমার চোখের সামনে থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে, আমি কিছুই করতে পারিনি। আর সুযোগ পেয়েও যদি তার উদ্ধার অভিযানের অংশ হওয়া থেকে পালাই এখন, আমি জীবনেও নিজেকে মাফ করতে পারব না। কাজেই বাশার ভাই আপনি এত সব চিন্তা না করে কাজে নামুন, আমি যতটা পারি সাহায্য করব কিন্তু বাধা দেব না। এটা বলতে পারি। বোঝা হব না অ্যাটলিস্ট। আর রিংগুলো যদি খুঁজেও পান, তবে সেগুলো চেনা এবং বোঝার জন্যও মানুষ লাগবে আপনাদের, সেই জায়গায় আমি কাজে লাগতে পারব,' বলে সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আহত কাঁধের ব্যথায় মুখ কুঁচকে উঠল।

'আমার একটা প্রশ্ন আছে,' বাশার কিছু বলার আগে টমি বলে উঠল। 'আমরা অফিসে জানাচ্ছি না কেন ব্যাকআপ এবং রিপোর্টের বিষয়—'

'শোন টমি, আমি আমার পুলিশি ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় কতিটা করেছিলাম একবার আন অথরাইজড অপারেশন চালিয়ে। এরপর নিজেকে নিজে প্রমিজ করেছিলাম, অফিসিয়াল প্রক্রিয়া না মেনে একটা আড্ডাও নাড়াব না। সেই আমি পুরোপুরি মানা করছি এই মুহূর্তে জিনিসগুলো উদ্ধার না করা

সিপাহী

পর্যন্ত অন্তত কোনো অফিসিয়াল প্রতিক্রিয়া বা রিপোর্টিংয়ে না যাওয়ার। কারণটা কি তুমি বুঝতে পারছিস না?’

‘ও আছে আছে।’

‘ওকে,’ বলে বড় করে দম নিল বাশার। ‘যেহেতু সবাই মরার জন্য উত্তলা হয়েছে, লেটস ভু ইট দেন,’ বলে সে জিপের গতি বাড়িয়ে দিল।

অতীত

‘প্রথম প্রশ্ন,’ কর্নেল বলে উঠল। ‘কয়জন আছি আমরা?’ বলে সে একে একে গুলল, ‘সাড়ে সাতজন,’ বলে সে পালোয়ানের পাশে গুয়ে থাকা কুকুরটাকে দেবাল পাইপ দিয়ে নির্দেশ করে। এই অবস্থাতেও সবাই মৃদু হেসে উঠল।

‘দ্বিতীয় কথা, অস্ত্র কী কী আছে আমাদের?’ এবারের প্রশ্ন ত্রিলোকের। প্রশ্নটা উচ্চারণ করে সে প্রথমেই কর্নেলের দিকে নির্দেশ করল।

‘একটা পিস্তল, সঙ্গে কিছু গুলি, একটা তলোয়ার, একটা ছোট বন্দুক এবং একটা ছুরি।’ ত্রিলোক ফিরে তাকাল সোলেমানের দিকে। ‘একটা বন্দুক, একটা কাটা ছুরি, আর একটা তলোয়ার।’

‘একটা লাঠি, একটা তলোয়ার আর একটা ছুরি,’ এবারের বক্তব্য পালোয়ানের। ‘একটা বন্দুক, কিছু গুলি-বারুদ, আর তলোয়ার, পিটারের অস্ত্রসজ্জা। ত্রিলোক একা ফিরে তাকাল মিস্তির দিকে।

মিস্তি জানাল তার কাছে বিশেষ ধরনের হাতবোমা আছে কয়েকটা, শুধু সর্বশেষ পছন্দ হিসেবে ব্যবহার করবে ওগুলো, তা ছাড়া নয়। কিন্তু যদি ব্যবহার করে, তবে কীভাবে করবে, সেটা বলে গেল সে। কায়া জানাল তার কাছে বিষ মাখা ছুরিসহ আরো কি কি আছে।

ওদের কথা শেষ হওয়ার পর ত্রিলোক বলে উঠল, ‘আমাদের কাছে মোটামুটি যা আছে আমাদের সেটা দিয়ে ছোটোখাটো অভিযান চালানো যাবে কিন্তু দুর্গে হানা দেওয়া যাবে না,’ কথাটা বলে সে কর্নেলের দিকে তাকাল। ‘প্রথমেই বলেন আমাদের লাগবে কি?’

‘প্রথমেই আমাদের পোশাক বদলাতে হবে, সবারই বদলাতে হবে, বিশেষ করে আমার আর পিটারের। এরপরে প্রতিটা বন্দুক এবং পিস্তলের জন্য গুলি লাগবে, সেই সঙ্গে তলোয়ার আর ছুরিগুলো ধার করে নিতে হবে। আর ভালোভাবে ঝাওয়া-দাওয়া করতে হবে। আর যথেষ্ট পরিমাণে খবর এবং তথ্য প্রয়োজন হবে।’

গল্প শেষের শুরু

‘আপনারা যেসব জিনিসের কথা বললেন, সেগুলো সবই আমি গল্প খেইকা আমার লোকেও ওখানে ব্যবস্থা করতে পারব। সেই সঙ্গে যথেষ্ট খবরও আনতে পারব, তবে খবর বাইরে খেইকার বাইর করতে হবে।’

‘আমরা এখন যে-ঘাটে আছি, এখান থেকে তোমার ওই বইনের বাড়ি কতদূরে?’ কর্নেল জানতে চাইল।

‘আধাক্রোশ পথ হবে।’

‘ঠিক আছে, আমরা এখানে ঘাটে নেমে দুই দলে ভাগ হয়ে যাব, একদল সোজা কায়ার সঙ্গে রওনা দেব তার ওখানে। এতে থাকবে আমি, পিটার, পালোয়ান আর কুকুর বাতেন। আর অন্যদলে থাকবে মিস্তি, সোলেমান আর ত্রিলোক। তোমরা আমাদের পেছনে থাকবে, আমরা দ্রুত এগোব, আর তোমরা আরেকটু আশ্তে তবে খুব বেশি আশ্তে না। এতে দুটো বিষয়ে সুবিধা হবে। প্রথমত, তোমরা আসতে আসতে খবর নিতে পারবে আর দ্বিতীয়ত, আমাদের কোনো সমস্যা হলে তোমরা সাহায্য করতে পারবে। বোঝা গেছে?’

সবাই মাথা নেড়ে সায় জানাল।

‘কাছে নামি যত দ্রুত সম্ভব,’ বলে কর্নেল আকাশের দিকে দেখল। ‘চলো, দিনের শুরু হয়ে গেছে খুব ভালোভাবেই।’

বর্তমান

দিনের শুরুতেই এরকম একটা খবর শুনতে পাবে আনোয়ার পাশা ভাবতে পারেনি। জিয়া সরকারকে কীভাবে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—সেটা সে বিজ্ঞপ্তি তুলল ফোনে, তারপর ময়মনসিংহ থেকে আসা কলটাতেই বিজ্ঞপ্তি কিছু নির্দেশনা দিল সে। নির্দেশনা শেষ করে কয়েকটা প্রশ্ন করল সে পাটোয়ারিকে। ‘প্রথমত বাশারের আপডেট কি?’ ওপাশে পাটোয়ারির কাছে যখন সে জানতে পারল বাশারের কোনো খবরই নেই গতকাল রাত থেকে, ত্রু কুঁচকে উঠল তার। বাশারের স্বোজ নেওয়ার নির্দেশ দিল সে। ফোন রাখতে গিয়েও মনে পড়ল গতকাল রাত থেকে রিফাতকে যদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখান থেকে কোনো খবর বা আপডেট আসেনি। ওখানে অভিযানের কোনো আপডেট আছে কি না জানার নির্দেশ দিল সে, সেই সঙ্গে এ-ও জানাল আলী আজগরের বাংলোতে, কিছু পাওয়া যায় কি না ইনসপেক্টর রবিউল জানার সঙ্গে সঙ্গে যেন জানায় তাকে।

ফোন রেখে কিছুক্ষণ বিছানায় বসে রইল আনোয়ার পাশা। মোবাইলে সময় দেখল। প্রতিদিন এই সময়ে সাধারণত সে উঠে পড়ে, রাতে দেরি করে

সিপাহী

ঘুমামোতে একটু দেরি হয়েছে আজ। অন্যান্য দিন উঠে সে খানিক ওয়ার্মআপ এক্সারসাইজ করে, স্ট্রেচিং ইয়োগা করে, শাওয়ার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দিন শুরু করে। আজ সেগুলোর কোনোটাই করল না সে। পাটোয়ারির সঙ্গে কথা শেষ করে প্রথমেই সে কল দিল মৌসুমিকে। তাকে দ্রুত প্রস্তুত হয়ে থাকার নির্দেশ দিল। সে অফিসে যাওয়ার সময়ে তাকে পিক করবে বাসা থেকে সেটাও বলে দিয়ে কল রেখে সে মেঝেতে পদ্মাসনে বসে গেল। আজকের দিনটা তার জন্য অসম্ভব লম্বা এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন হতে যাচ্ছে। তিন-তিনটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সারতে হবে আজ তাকে। প্রথমত মাহবুব তালুকদারের সঙ্গে চুক্তি সই, সিলেট ও চট্টগ্রাম অভিযানের ঘোষণা। বাশারের কেস সমাধান এবং প্রফেসর ইফতেখারের সঙ্গে আলাপচারিতা। মাথার ভেতরে পরিকল্পনা সেরে সে শাওয়ার নিয়ে রেডি হয়ে খুব ভালোভাবে ব্রেকফাস্ট করে গাড়িতে উঠল। প্রথমেই মৌসুমিকে পিক করল তার ড্রাইভার, মাথার ভেতরে থাকা বিষয়গুলো সব একে একে বলে দিল মৌসুমিকে এবং কোনটার পর কোনটা হতে হবে সেটাও জানিয়ে দিল সে।

প্রাথমিক নির্দেশনা শেষ করে সে গাড়ির জানালার কাচ নামিয়ে দিয়ে সিগারে আগুন দিল। আজকের দিন শুধু লম্বা এবং ক্লান্তিরই না, তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে যাচ্ছে। খুব সাবধানে এবং সতর্কতার সঙ্গে খেলতে হবে তাকে আজ।

অতীত

গল্পের বাজারের মূল অংশটা পার হওয়ার সময়ে দুটো জিনিস চোখে পড়ল কর্নেলের। বাজারের থেকে দেখতে পাওয়া দুর্গটার অংশবিশেষ এবং বাজারের মানুষদের ভেতরে চাপা উত্তেজনা। টুকরো টুকরো কথা শুনতে পেলেও সে ভাষার কারণে সঠিকভাবে বুঝতে পারল না পুরোপুরি, বাজারে বা ছোট এই গল্পে আসলে কী হচ্ছে। এখানে অতিরিক্ত কৌতূহল না দেখিয়ে সে অপেক্ষা করবে বলেই ঠিক করল। কারণ এখানে এরকম উলটা-পালটা কিছু করলে মহাবিপদে পড়তে হবে। এবার আগের মতো ঝামেলায় পড়লে আর দেখতে হবে না।

তবে বাজারে উত্তেজনা থাক আর যাই থাক, সেটা পার হয়ে এলো তারা বেশ ভালোভাবেই। বাজারের মূল এলাকা পার হয়ে ওরা যখন বাজারসংলগ্ন কুমোরপাড়ার দিকে পা রাখল, কর্নেল বেশ অবাকই হলো। কায়া যখন বলেছিল

গল্প শেষের শুরু

এখানে তার লোক আছে, যাদের ওদের গোত্রের ভাষায় বইন বলে যাকে, সে ভাবতে পারেনি এরা কুমোরের ছদ্মবেশে বসবাস করে, কারণ কুমোরের কাজ সাধারণত পুরুষ মানুষেই করে থাকে। মেয়েরা এমন ধারার কাজ করার কথা না, কিন্তু এ-ধরনের গোত্রের লোকেরা এবং এসব খুনিরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বসবাস করে এবং একভাবে বলতে গেল সবখানে সব জায়গাতে এদের লোক থাকে। তবে এখানে এভাবে কুমোরপাড়াতে আসতে হবে এমন না। একটা বাড়ির সামনে এসে কিছু একটা দেখল কায়া, তারপর সোজা ঢুকে গেল ভেতরে। ইশারায় অপেক্ষা করতে বলল ওদের।

কর্নেল আর পিটার মাথা ঢেকে রেখেছে, পালোয়ান কিছু একটা খেতে দিয়েছে কুকুরটাকে, ভেতর থেকে ডাক এলো একটু পরেই। ওরা ভেতরে ঢুকে দেখল তিনজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির ছোট আঙিনাতে, ওদের পাশেই কায়া। বাড়ির বারান্দার সঙ্গে সংলগ্ন একটা ছোট কামরার সামনে চৌকি পাতা, কামরাটা দেখিয়ে কায়া জানাল। ওদের প্রয়োজনমতো সব বলা হয়েছে ঘণ্টাখানেক লাগবে সব ঠিক করতে, এর ভেতরে ওই কামরার পেছনে পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। উনারা পরিচ্ছন্ন হয়ে এলেই চৌকিতে খাবার দেওয়া হবে। কর্নেল পালোয়ান এবং পিটারকে নিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে পোশাক বদলে যখন ফিরে এলো—দেখল চৌকিতে সুন্দর খাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

‘আমি সত্যিই অবাক হচ্ছি আয়োজন দেখে, বিশেষ করে পোশাক ছিল কীভাবে এখানে?’ কর্নেল আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলে উঠল।

‘আমাদের এরকম আন্তানা থাকে সব জায়গাতে, যেখানে সব আয়োজন করা থাকে। ‘আপনারা চাইলে খেয়ে নিতে পারেন।’

‘তুমিও ঠিকঠাক হয়ে খেয়ে নিতে পারো। আমাদের সঙ্গেই,’ কায়া মেয়েটা একটু অবাক হয়েই ফিরে তাকাল তার দিকে। ভারতে এভাবে কেউ বলে না, এটাই হয়তো কারণ মাথা নেড়ে আপত্তি করল সে কর্নেল কিছু ভরতে যাবে দরজায় একজন মহিলা দৌড়ে এসে জানাল। আরো তিনজন লোক এসেছে। কায়া বলল ওদরেকেও ভেতরে আসতে দিতে।

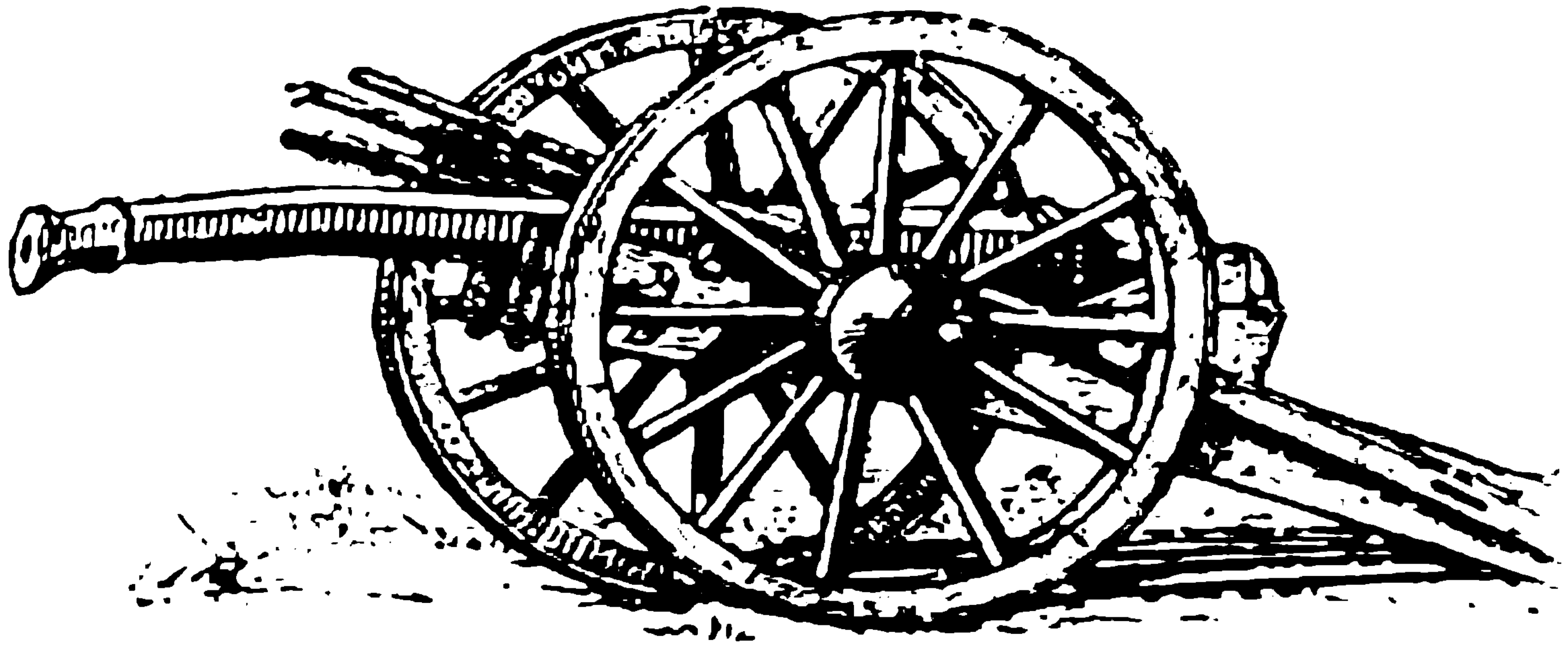
সোলেমান, মিস্তি আর ত্রিলোক ভেতরে ঢুকল চূড়ান্ত উত্তেজনা নিয়ে। ভেতরে ঢুকেই কর্নেলকে দেখে বলে উঠল। ‘হজুর গরম খবর আছে। আজ এই এলাকাতে অনেক বড় ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। স্থানীয় এক বিদ্রোহী, তার নাম মৌলবি, সে তার বাহিনী নিয়ে রাজা বিক্রম সিংয়ের এখানে আসতেছে সাহায্যের জন্য, কিন্তু এর ভেতরে অনেক বড় ঘাপলা আছে। এটা কি দেখেন,’ বলে সে ছাতুর মতো দেখতে একটা পিঠা এগিয়ে দিল কর্নেলের দিকে।

সিপাহী

‘এটা কি?’ কর্নেল খুব অবাক হয়ে জানতে চাইল।

‘এইটা এক ধরনের বার্তা বিনিময় প্রথা, বড় ঘটনার আগে গোপনে সতর্ক করার জন্য কিংবা গোপন কোনো বার্তা প্রেরণের জন্য যখন গোপন কোনো মাধ্যম প্রয়োজন হয়, তখন দুই পন্থায় কাজ করা হয়,’ কায়ার পাশে দাঁড়ানো মুখ ঢাকা বয়স্ক এক মহিলা বলে উঠল। ‘এক, হয় কোনো একট অদ্ভুত কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়, অথবা বিশেষ ধরনের খাবার বিতরণ করা হয়, যাতে নির্দিষ্ট মানুষটা বুঝতে পারে কী হচ্ছে। এইটা সেই ধরনের খাবার। এইটা যেহেতু ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তারমানে কেউ কাউকে গোপনে কিছু একটা বোঝাইতে চাইতাকে।’

কর্নেল ফিরে তাকাতেই কায়ার নিশ্চিত করল মহিলার কথা। ‘উনি ঠিকই বলেছেন, এইটা বিতরণ হচ্ছে মানে বড় কোনো ঘটনা ঘটতে যাইতাকে।’



অধ্যায় চুরাশি বর্তমান

পাটোয়ারি অনোয়ার পাশার সঙ্গে কথা শেষ করে কমিউনিকেশন রুম থেকে বেরিয়ে একটা মেসেঞ্জার ছেলেকে ডেকে পাঠাল। জয়া সরকারকে ল্যাভে যাওয়ার কথা বলে সে নিজে ল্যাভে চলে গেল সোজা। ল্যাভে গিয়ে দেখল এখনো সেভাবে কেউই আসেনি। সে ল্যাভের মূল কম্পিউটারের চাবি চেপে সেটা ওপেন করে টমির কাজ করা রিসেন্ট ফাইল এবং ফোল্ডারগুলোর বের করে মোটামুটি যখন প্রস্তুত করে ফেলেছে, সেই সময়ে প্রথমে ল্যাভে প্রবেশ করল ইনসপেক্টর রবিউল।

এই সকালবেলাতেও তার চোহারা রীতিমতো বিধ্বস্ত, রবিউল তাকে রিপোর্ট করতেই যাচ্ছিল, তার আগে পাটোয়ারি তাকে থামিয়ে দিল। ‘ওরা এলে একবারেই কও, তার আগে তুমি বইসা দম নেও।’

ইনসপেক্টর রবিউল বসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ল্যাভে প্রবেশ করল জয়া সরকার, রমিজ দারোগা এবং কনস্টেবল আবদুল্লাহ। তিনজনে পোশাক বদলে, শাওয়ার নিয়ে হালকা ঝাওয়া-দাওয়া করে আসাতে এখন ঝানিক হলোও ফ্রেশ লাগছে তাদের। ‘খবর কি বলেন?’ জয়া সরকার ভেতরে ঢুকেই স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে জোর গলায় বলে উঠল।

‘কিছুই নেই,’ ইনসপেক্টর রবিউল মাথা নেড়ে বলে উঠল।

‘মানে?’ জয়া সরকার বসতে গিয়েও থেমে গেল।

‘মানে প্রথমে আমরা বাড়িটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তবে একটু পরেই ধোঁয়া আর স্থানীয় এক বাড়িতে আগুন লাগার খবরে ডাবলাম পরখ করে দেখি। সেটা করতে গিয়ে দেখতে পেলাম সম্ভবত ওইটাই বাড়ি এবং ভেরিফাই করে নিশ্চিত হলাম। আমরা যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছাই পুরো বাড়িতে দাউ দাউ করে আগুন

সিপাহী

জ্বলছে। ওখানে কিছুই নেই, ভেতরে কোনো মানুষ থাকলে মৃত্যু নিশ্চিত। আর সবচেয়ে বড় কথা আগুন কমে ঠান্ডা না হলে কিছুই বের করার কোনোই উপায় নেই,’ বলে ইনসপেক্টর রবিউল মাথা নাড়ল।

‘ফাক,’ পাটোয়ারির পরোয়া না করে গালি বকে উঠল জয়া সরকার।

‘শোন, কিছু খবর আছে, তুমিগো জানা দরকার।’ পাটোয়ারি বলে উঠল।

‘বাশারগো এহনো কোনো খবর নাই, রিফাতরে উদ্ধার করার মধুপুর অভিযান আবার সকালে শুরু হইছে, ওইদিকে কোনো আপডেট নাই। এহন তোমরা বলো, এইখানে কোথা থেইকা শুরু করব আমরা?’

‘স্যার, আপনাকে তো আমি বলেছি আলী আজগর কি বলেছে আমাকে, আমার মনে হয় কয়েকটা দিক থেকে শুরু করতে পারি আমরা। এক,’ বলে সে হাতের কড়ে আঙুল গুনতে লাগল। ‘প্রথমত, সে সরাসরি কিছু না বললেও দুটো কু দিয়েছে আমাদের, এক চিত্তামণি, আকাশ থেকে পতন এবং হ্যারি পটারের প্রথম বইয়ের নাম। এটা একটা অ্যাংগেল হতে পারে। দুই, সে আমাকে পরিষ্কার বলেছে যে-ছবিটা থেকে আমি এই বিষয়ের সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা জানতে পেরেছি, সেই ছবিতে আরো বেশ কিছু কু আছে, ওই ছবিটা একটা ভালো জায়গা হতে পারে শুরু করার জন্য। তিন, সে বারবার আমাকে বলে দিয়েছে রেলিকের এক অপারেটিভের কথা যার নাম প্রডিজি কিং, সিলেট এবং চট্টগ্রামে যারা ধরা পড়েছে, এরা সবই নাকি তার অধীনের লোক, আসল মাথা নাকি সে। তার পরিচয় এবং ইত্যাদির ব্যাপারে কেউই জানে না। সিলেটের জেড মাস্টার এবং চট্টগ্রামে মিস্টার ইউ ধরা পড়ার পর সেই নাকি এখন ওদের মূল নেতা এবং মস্তিষ্ক। এই লোকটার পরিচয় বের করতে হবে আমাদের স্যার, যেকোনো মূল্যে।’

পাটোয়ারি এক মুহূর্ত চিন্তা করল। ‘অনেকগুলো বিষয়। আইচ্ছা আমরা ছবিটা থেইকা শুরু করতে পারি। বাকি দুইটা পরে দেখব,’ বলে সে ক্লিক করে ছবিটা ওপনে করল।

জয়া আরেকবার বাশারের নম্বরে ডায়াল করল।

এই লোকটা গেল কোথায়?

অতীত

‘অস্থিরতার কোনো কারণ নেই। যাই হতে যাচ্ছে বা হবে, তাতে মাথা গরম করে কারোই কোনো লাভ হবে না, বলে কর্নেল মিস্তি, সোলেমান এবং

গল্প শেষের শুরু

ত্রিলোকের দিকে ইশারা করল। 'শোন আমাদের কাজে নামতে হবে, আর সেজন্য শরীর এবং মনে শক্তি প্রয়োজন। আগে তোমার পরিচ্ছন্ন হও, এরপর আমরা একসঙ্গে খেতে খেতে আলোচনা করব। আগে আমি শুনব কি শুনেছো তোমরা এরপরে আমরা পরিকল্পনা শেষ করে সোজা কাজে নেমে যাব। বুঝেছো?'

'জি, হজুর।'

'যাও আমরা খাওয়া শুরু করছি, তোমরা পরিষ্কার হয়ে এসো এরপর আমরা শুনব সব,' বলে কর্নেল আরাম করে বসে পাইপ টানতে লাগল সেইসঙ্গে কায়ার সঙ্গীদের সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা বলতে লাগল। মিস্ত্রি আর ত্রিলোকেরা আসার পর থেকে সবাই কেমন জানি কিম মেরে আছে। এমনিতেই আজানা-অচেনা পরিস্থিতি, কারণ অচেনা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, তার ওপরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি হওয়ার কারণে সবাই এখন আরো বেশি অনিশ্চয়তার ভেতরে পড়ে গেছে। শুধু কর্নেলের ভেতরে কোনো বিকার নেই। সে একদম স্থির। যখন থেকে ভিক্টরকে উদ্ধার করার অভিযান শুরু হয়েছে তখন থেকে সে অনেক ক্ষেত্রে উত্তেজিত হয়ে গেছে, অনেক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেছে, ভুলও করেছে। কিন্তু এখন যেন সেই আগের কর্নেলকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, অন্তত ত্রিলোকের তাই মনে হলো। তিনজনের ভেতরে সেই সবার প্রথম ফিরে এসেছে পরিচ্ছন্ন হয়ে।

ত্রিলোক চলে আসতেই কর্নেল তাকে খেতে বসার জন্য ইশারা করল। তারপর জানতে চাইল, 'ওরা আসতে আসতে তুমি খেতে খেতে বলো কী শুনে এসেছো?' কর্নেল সরাসরি তাকিয়ে রয়েছে ত্রিলোকের দিকে। 'বোঝার মতো বিশদ বললেই চলবে।'

'এটা রাজা বিক্রম সিংয়ের এলাকা, এইটা তো জানা কথা। কিছুদিন ধরে, বিশেষ করে দিল্লির অবস্থা যখন খারাপ হতে শুরু করে সেই সময়ে, দক্ষিণ এবং উত্তর ভারতের মাঝামাঝি মৌলবি আজমাইন উল্লাহ নামের এক বিদ্রোহীর উত্থান ঘটে। এই মানুষটা পেশায় মৌলবি, খুব ভালো মানুষ, শিক্ষিত, শাস্ত। সাধারণ মানুষ তাকে মানে। উনি ইংরেজদের জুলুম-অত্যাচারে,' বলে ত্রিলোক খানিক মাথা নাড়ল। 'যদিও কর্নেলের বিষয়টা খানিক আলাদা, তার পরও স্বজাতি বলে কথা। কিন্তু কর্নেলের ভেতরে কোনো ভ্রক্ষেপ দেখা গেল না, ত্রিলোক বলে চলল। 'মানুষটা খুবই বিরক্ত ছিল। সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সময় থেকে সে মসজিদে এবং এলাকাতে বয়ান দিতে থাকে এবং মানুষও যেহেতু তাকে মানে

সিপাহী

কাজেই তারা ক্ষেপে ওঠে এবং সময়ের ব্যবধানে মৌলবি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে এবং সে তার বাহিনী মিলে একের পর এক ঘাঁটি দখল করতে থাকে। উত্তরে বিদ্রোহীরা দুর্বল হতে থাকে, উত্তর আর দক্ষিণে সে এবং তার চরিত্ররা হয়ে ওঠে এক ধরনের আইকন। এখানে আরো অনেক কাহিনি আছে। আমি সংক্ষেপ করছি,’ মিস্তি এবং সোলেমানও এসে খেতে বসে গেছে। ত্রিলোক কথা বলছে দেখে ওরা আর কিছু বলেনি, নীরবে খাওয়া সারছে।

‘উত্তরে বিদ্রোহীদের ঘাঁটি দুর্বল হতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আর দক্ষিণের ভেতরে এক সেতুবন্ধন হয়ে ওঠে মৌলবি, অনেকটা সাধারণ মানুষের ভেতরে বিদ্রোহের প্রতীক। দিল্লি দখলে এনে কোম্পানি নজর দিতে শুরু করেছে দক্ষিণের দিকে। আর তাদের প্রথম উদ্দেশ্য মৌলবিকে খতম করা। এই পরিক্রমা দিল্লি দখলের আগে থেকেই বা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে। দিল্লি দখলের পর ইংরেজ সরকার এবং কোম্পানি পূর্ণ শক্তি নিয়ে নেমেছে এবং আরো অনেক বিদ্রোহীদের মতো একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে মৌলবিকে কোণঠাসা করে ফেলেছে,’ বলে ত্রিলোক মিস্তির দিকে ইশারা করল।

‘এটা কয়েকদিন আগের কথা,’ মিস্তি খেতে খেতে বলে চলেছে। ‘হঠাৎ এমন আক্রমণের প্রস্তুতি মৌলবির ছিল না। সে আক্রমণে দিশেহারা হয়ে তার মিত্রদের কাছে সাহায্য চায় এবং কেউই সেটা করে উঠতে পারেনি কারণ তারা নিজেরাই বিপদে। এই সময়ে মৌলবির দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রাজা বিক্রম। রাজা বিক্রম অত্যন্ত ধূরন্ধর চরিত্র—সে শুরু থেকে বিদ্রোহীদের সঙ্গে ছিল, কথিত আছে বিদ্রোহের সুযোগে সে নাকি শুরু থেকেই লুটপাট চালিয়েছে, আমি এটা বিশ্বাস করি,’ মিস্তি মাথা নেড়ে বলে উঠল। ‘কারণ সেটা না হলে সে আমাদের গোত্রের জিনিসের দিকে হাত বাড়াত না। যাই হোক, রাজা বিক্রম যেই মুহূর্তে দখল উত্তর চিত্র বদলে যাচ্ছে এবং ইংরেজরা শক্তি বৃদ্ধি করছে সেই সময়ে সে আসলে ইংরেজদের সঙ্গে আঁতাত করার জন্য মৌলবিকে টোপ দিয়ে তার দুর্গে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। মৌলবিকে সাহায্য করার জন্য নয়।’

‘তা সবাই বুঝতে পারছে, মৌলবি সেটা বুঝতে পারছে না?’ কর্নেল জানতে চাইল।

‘এখানে দুটো সমস্যা। প্রথমত, হঠাৎ আক্রমণে মৌলবি দুর্বল এবং কোণঠাসা, দ্বিতীয়ত, সে রাজা বিক্রমকে বিশ্বাস করে। এই অবস্থায় সে সরাসরি ধরা পড়ার চেয়ে বিক্রমের কাছে গিয়ে দেখতে চায়। অন্যান্য বিদ্রোহী এই গণ্ডে

ছাত্তু বিতরণ করছে, কারণ তারা নিজেদের লোক জড়ো করতে চাচ্ছে, কিন্তু বিক্রম এমন অবস্থা করেছে—কী হবে কেউই বলতে পারছে না।’

‘মৌলবি বিক্রমের দুর্গে যাবে কখন?’ কর্নেল শান্ত সুরেই জানতে চাইল।

‘আজই আর ঘণ্টাখানেকের ভেতরে,’ এবার সোলেমান কথা বলে উঠল।
ওদের তিনজনের খাওয়া প্রায় শেষ।

‘শোন, আমাদের তিনটা উদ্দেশ্য,’ কর্নেল ভাবতে ভাবতে বলতে লাগল।
‘ভিক্টরকে উদ্ধার করা, তোমাদের জিনিস তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া, এবং—’

‘যেকোনো মূল্যে বিক্রমকে শেষ করা—’

‘ঠিক,’ কর্নেল মাথা নাড়ল। ‘আগেই আমি আমার লোকদের বলেছি, এখন তোমাদের বলছি। ভারতের রাজনীতিতে কী হচ্ছে না হচ্ছে, সেটার সঙ্গে আমাদের সংশ্লিষ্টতা নেই। আমার কোনো আগ্রহও নেই। আমরা আমাদের কাজ করব, প্রয়োজনে উত্তম পরিস্থিতিতে ব্যবহার করব। আর রাজা বিক্রম, কোম্পানি এবং মৌলবির অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আমাদের জন্য এটা ভালো সুযোগ কারণ মৌলবি হোক আর যেই হোক, শহরে অনেক মানুষ আসবে, আর ওদের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমরা দুর্গে ঢুকে যাব।’

‘একটাই সমস্যা সাহেব,’ অনেকক্ষণ পর কায়া বলে উঠল। ‘বিক্রম যদি আসলেই মৌলবির সঙ্গে বেইমানির ইচ্ছা করে থাকে, তাইলে সে মৌলবির একটা মানুষকে বাইর হতে দেবে না। আমাদেরও না।’

কর্নেল ভাবছে, ‘সঠিক কথা, কিন্তু আমাদের জন্য এটা কোনো বিষয় না। আমরা যাবোই, হয় মরবো আর না হয় কোনো না কোনোভাবে উদ্দেশ্য হাসিল করে ঠিকই দুর্গ থেকে বের হবো,’ বলে সে অন্যদের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলে উঠল। ‘অস্ত্র আর প্রয়োজনীয় জিনিস চলে এলেই আমরা বের হব। সবাই প্রস্তুতি নাও।’

বর্তমান

‘আমরা যাদের অনুসরণ করছি তাদের যুভমেন্ট এবং চলমান রুট বিবেচনা করে একটা ব্যাপার আমার মাথায় আসছে বস,’ টমি বলে উঠল। ‘কলব?’

‘অবশ্যই কলবি, বাশার এক মনে গাড়ি চালাচ্ছে। ময়মনসিংহ শহর থেকে বের হয়ে এসেছে ওরা আরো আধাঘণ্টা আগে। শহর থেকে বের হওয়ার আগে দ্রুত থেমে একটা পেট্রলপাম্প থেকে জিপ একদম কানায় কানায় ভরে নিয়েছে ওরা। এরপর টানা গাড়ি চালাচ্ছে, সামনের ওদেরও থামার কোনো নাম-গন্ধ

সিপাহী

নেই, আর ওরা তো থামার প্রশ্নই আসে না। 'টমি তুই এমন নাটক করছিস কেন বলত?' বাশার খানিক রাগের সঙ্গেই বলে উঠল।

'সরি বস,' টমি তার ভুঁড়ি দুলিয়ে হেসে উঠল। 'আসলে নাটক না। আমি খানিক কনফিউজড। আর এই কারণেই বলতে খানিক দ্বিধা হচ্ছিল। তুমি যেহেতু অভয় দিলে তাই আর বলতে সমস্যা নাই। ওদের মুভমেন্ট আর রুট দেখে আমার কাছে কেন জানি লাগছে ওরা হালুয়াঘাট—'

'গারো পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে,' টমির অসমাপ্ত ব্যাখ্যা বাশার শেষ করে দিল। বলে সে একহাতে জিপ সামলে অন্যহাতে জ্যাকেটের বুক পকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগাল। 'আমারে কিছুক্ষণ ধরে এমনটাই মনে হচ্ছিল।'

'গারো পাহাড় কি?' পেছন থেকে সামিরা বলে উঠল। 'স্থানীয় আদিবাসীদের বসবাস ওখানে?'

'শুধু আদিবাসী গোত্রের বসবাস নয়,' বাশার বলতে লাগল, ছোটবেলায় সে বহুবার বেড়াতে গেছে গারো পাহাড়ে। এমনকি বড় হওয়ার পরও সে বন্ধুদের সঙ্গে গেছে ওখানে। খুব ভালোভাবেই চেনে জায়গাটা। 'পাহাড়ি, জঙ্গলে এলাকা, বেশ সুন্দর আর যে-কারণে বেশ ভালো রকমের টুরিস্ট অ্যাট্রাকশনও রয়েছে ওখানে। বেশ বিস্তৃত এলাকা ওখানে। ছোটোখাটো জায়গা নয়।'

'হিসেবে কিন্তু মেলে, কারণ পাহাড়ি এলাকা, ক্রাইম বেশি, টুরিস্ট আকর্ষণ রয়েছে—'

'বর্ডার কাছেই,' পেছন থেকে রুশো বলে উঠল।

'ওড পয়েন্ট, বর্ডার কাছেই,' বাশার বলে চলল এবার। 'আর তা ছাড়া ওখানে পুরনো বেশ কিছু স্থাপনা এবং জমিদারবাড়িও রয়েছে, আর আদিবাসীদের থাকার জায়গা তো রয়েছেই। শহর থেকে এক ঘণ্টার ড্রাইভ সো, ডেভিড যাই কিছু পেয়ে থাকুক না কেন, সে অবশ্যই নিজের রেষ্টের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চাইলে ওই জায়গাটা একটা আদর্শ জায়গা হতে পারে। প্রশ্ন হলো সে কি পেয়েছিল এবং কীভাবে রেখেছে?' বাশারের ভ্রু কুঁচকে উঠল বলতে বলতে।

'সো সময়ই বলে দেবে,' পেছন থেকে রুশো আনমনে বলে উঠল।

বাশার তার সঙ্গে সহমত পোষণ করে মাথা নাড়তে নাড়তে ভিউ মিররে দেখল। যদি ওরা গারো পাহাড়েই যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকে তাহলে আর চল্লিশ মিনিটের মতো লাগার কথা হিসেবে। ওখানে গেলে কী হবে সেটা নিয়ে

বাশার এখন ভাবছে না। ও ভাবছে কেউ ওদের পিছু নিচ্ছে না তো, আসলেই কি পুরোপুরি পিছু ছাড়াতে পেরেছে সে সম্ভাব্য শত্রুর?
সময়ই বলে দেবে। ভাবতে ভাবতে গাড়ি চালানোতে মন দিল সে।

অতীত

রাস্তার পাশে এভাবে সাধারণ মানুষের ভিড় দেখাটা বিরল এসব এলাকায়। কিন্তু আজকের হিসাব আলাদা। পুরো ভারতবর্ষের উত্তেজনা ছড়িয়েছে এই এলাকাতেও। হাজারে হাজারে না হলেও শতে শতে লোকে ভিড় করেছে রাস্তার পাশে মৌলবিকে আর তার বাহিনীকে দেখার জন্য। ভিড়ের ভেতরে চাদরের মতো উর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্র দিয়ে ভালোভাবে মুখ-মাথা ঢেকে কর্নেল তার দিকে দেখল একবার, তারপর ফিরে তাকাল ভিড়ের দিকে।

ভিড়ের ভেতরে চাপা উত্তেজনা। সবাই জানতে অগ্রহী রাজা বিক্রমের ওখানে আসলে কী হতে যাচ্ছে, সে কি আসলেই মৌলবিকে আশ্রয় দিয়ে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে, ভারতের এই বিদ্রোহের স্রোতকে আরো উত্তাল করতে আরো বেগবান করতে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করবে, নাকি স্বজাতির সঙ্গে বেইমানি করে হাত মেলাবে ইংরেজ এবং কোম্পানির সঙ্গে। যেকোনোটাই ঘটতে পারে আজ। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে কর্নেলের মনে হলো, এই ভিড়ে এবং এই শহরে এমন কোনো মানুষ নেই যে মৌলবিকে ভালোবাসে না, তার মঙ্গল চায় না। এই ভিড় যদি মৌলবির সঙ্গে যোগ দেয় তাহলেই আর মৌলবিকে ঠেকানোর সাধ্য নেই কারো। কিন্তু সে এটা জানে এই কথা বলতে যত ভালো লাগে, শুনতে যত ভালো শোনায়, বাস্তবতা আদতে এমন নয়। এখানে যে-ভিড় জমা হয়েছে এই ভিড়ের প্রতিটা মানুষ জালে জড়িয়ে আছে, আটপেট্টে, যেটাকে বলা হয় জীবনের জাল, দায়িত্বের বেড়াজাল। এদের নিজের পরিবারের কথা ভাবতে হবে, নিজের সন্তানের জন্য পরের বেলার খাবার জোগাড় করতে হবে, কাউকে দেখভাল করতে হবে নিজের বৃদ্ধ বাবা-মার। কাজেই যুদ্ধ-বিদ্রোহ এদের জন্য কৌতূহলের বিষয় হতে পারে কিন্তু দায়িত্বের নয়। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কর্নেল ফিরে তাকাল রাস্তার দিকে। ওখানে ছোট একটা বাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। সবার অগ্রভাবে বাদামি ঘোড়ায় চড়া জোবাবা পরা লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা সৌম্য চেহারার একজন মানুষ। ছোটোখাটো মানুষটার সৌম্য চেহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধা জাগায়, ছোটোখাটো এবং

সিপাহী

ক্রান্ত হলেও তার ছোটোখাটো তেজদীপ্ত অবয়ব মনের ভেতরে অজানা এক শক্তির দোলাচল তৈরি করে। মৌলবি ওদের ছাড়িয়ে চলে যেতেই কর্নেল ঝানিক বিস্মিত হলো। তার বাহিনী সে ষতটা বড় ভেবেছিল, তারচেয়ে অনেক ছোট। সবমিলিয়ে সর্বোচ্চ শ দেড়েক মানুষ হতে পারে। কেউ ঘোড়া, তবে বেশির ভাগই পায়ে হেঁটে দুর্গের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নিজের লোকদের দিকে ইশারা করল কর্নেল।

ভিড় আরো ঝানিক এগোতেই রাস্তার পাশে থেকেই ভিড়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিলে যেতে শুরু করল তার লোকেরা। অন্যরা উর্ধ্বাঙ্গের অন্য পোশাক কেনে দিয়ে মিলে গেল। কর্নেল ও পিটারের মুখের অবরূপটা রইল। মৌলবির বাহিনীর কোনো বিশেষ পোশাক নেই, তবে প্রায় সবার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে, কর্নেলের লোকদেরও রয়েছে। কাজেই তাদের মিলে যেতে খুব বেশি অসুবিধা হলো না। মৌলবির বাহিনীর সঙ্গে মিলে দুর্গের প্রধান কটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল ওরা।

ওরা ভেতরে ঢুকতেই বিকট শব্দের সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল দুর্গের মূল কটক।

বর্তমান

‘এরা তো দেখি ঝানি এগিয়েই যাচ্ছে সামনের দিকে?’ বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল সামিরা। ‘বর্টার পার হয়ে যাবে নাকি?’ সে জিপের পেছন থেকে ঠকি দিয়ে টমির ল্যাপটপ দেখছে মন দিয়ে। ‘যেভাবে এগোচ্ছে তাতে তো মনে হচ্ছে বর্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।’

‘আরে নাহ,’ টমি বলে উঠল। ‘দিও তার গলার জোর একেবারেই কম।’ ‘এখানে ম্যাপে দেখতে অনেক কাছে মনে হচ্ছে, কিন্তু আদতে বর্টার এখনো অনেক দেরি। কস তোমার কি মনে হয়? তুমি তো এই এলাকা খুব ভালো চেন!’

বাশার প্রথমেই প্রশ্নটার উত্তর দিল না। সামনে থেকে সামান্য নজর সন্নিবে সে আশপাশে দেখে নিয়ে আবার সামনের দিকে ফিরে তাকাল। এর মধ্যেই সমস্ত ভূমির ল্যান্ডস্কেপ বদলে গেছে, বেশ কিছুক্ষণ হলো। প্রথমে শুরু হয়েছে পাতলা চিকন গাছের জঙ্গল দিয়ে। এরপরে ছোট ছোট টিলা দিয়ে শুরু হয়ে এখন রাস্তার দু পাশে রীতিমতো জঙ্গল আর পাহাড়ি টিলা। জঙ্গলও বেশ ঘন এবং টিলা-টকুর ধীরে ধীরে পাহাড়ে রূপ নিচ্ছে। বাশার এই এলাকাতে শেষবার এসেছিল সেই কল্যাণে থাকতে, বন্ধুদের সঙ্গে এরপরে আর এদিকে আসা হয়নি। পুরো এলাকা আগে যেমন ছিল তার নাম-গন্ধও নেই আর আগের

মতো। মূল ধরনটা বাদ দিলে প্রায় পুরো এলাকাই বদলে গেছে। কাজেই এই এলাকাকে আসলে সে চেনে এমনটা কলার কিংবা ভাবার কোনোই কারণ নেই।

‘আমি আসরে অনেক আগে এসেছি,’ বাশার বলে উঠল। ‘কাজেই এই জায়গা আমি চিনি কলা ঠিক হবে না। তবে আমারও মনে হয় ওরা বর্তার পার হবে না। দেখা যাক।’

ওরা বেশ কয়েকটা পিকনিক স্পট আর রিসোর্ট, একটা ছোট বাজার এক একটা বেশ বড় মার্কেট এলাকা পার হয়ে এলো। টমির ল্যাপটপ কিন্দুটা এখনো ছুটে চলেছে পুরোদমে। ধীরে ধীরে ওদের আশপাশের জঙ্গল আরো ঘন হতে শুরু করেছে সেই সঙ্গে বাশারের মনে হতে লাগল ওরা ধীরে ধীরে আরো উঁচুতে উঠতে শুরু করেছে। ‘গাইজ, আমরা কি ওপরের দিকে উঠছি?’ জানতে চাইল সে।

‘হ্যাঁ, ম্যাপও বলছে আমরা পাহাড়ের দিকে উঠছি।’

‘আচ্ছা, আমার ধারণা আদিবাসীদের মূল এলাকাটা সামনেই পড়বে,’ বাশার বানিকটা চিনতে পারছে চারপাশটা হঠাৎ করেই। ‘আমার ভুল না হলে ওরা হয়তো ওদিকেই বাচ্ছে।’

কিন্তু বাশারের কথা ভুল প্রমাণিত হলো। ওরা ভালোভাবেই আদিবাসীদের এলাকায় প্রবেশ করল এক সেই এলাকা পারও হয়ে এলো কিন্তু সামনের ওদের থামার উপায় নেই। বাশার জিপ চালাতে চালাতে একবার বেগের দিকে দেখল। সকাল হয়ে গেছে অনেক আগেই। সূর্য ধীরে ধীরে মাথার ওপরে উঠতে শুরু করেছে। হঠাৎ ওর মনে হলো, জয়া রমিজ দারোগা এক কনস্টেবল আবদুল্লাহর কী অবস্থা কে জানে। ওদের রাতের অভিযান কেমন হলো সেটা একটা জানার মতো বিষয় হতে পারে। হয়তো সেখান থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেয়েছে ওরা। তার সঙ্গে কথা করতে পারলে ভালো হতো কিন্তু বাশার আর নতুন কোনো বুকি নিতে আগ্রহী বোধ করেনি, যে কারণে ওর সঙ্গে কথা কলার বিষয়টাও সে এড়িয়ে গেছে কিন্তু মূল্যবান কিছু পেতে পারে না। জয়া কী করেছে কে জানে, তাবতে তাবতেই হঠাৎ কথা বলে উঠল টমি।

‘হেই, এভরিওয়ান,’ টমি উত্তেজনার সঙ্গে বলে উঠল। ‘সম্ভবত ওদের গাড়ির গতি কমতে শুরু করেছে। কারণ জিনে ভটটা স্রো মৃত হয়েছে।’

বাশার জিপ চালাতে চালাতেই টমির জিনে দেখল, আসলেই ওটার গতি কমতে শুরু করেছে। বাশার তাকাতে তাকাতেই কিন্দুটা থেমে গেল পুরোপুরি।

‘সামনের ওরা থেমে গেছে,’ যদিও সবাই দেখছে তাও টমি বলে উঠল। ‘আমার ধারণা ওরা জায়গামতো পৌছে গেছে।’

অতীত

জায়গামতো পৌছে ওরা একটা বন্দিদশায় পড়বে এটা কর্নেল খুব ভালোভাবেই জানত। কিন্তু সেটা যে এত দ্রুত ঘটবে এটা সে বুঝতে পারেনি। তারা তো আছে ছদ্মবেশে কিন্তু মৌলবির মূল বাহিনী দুর্গের ভেতরে ঢোকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পেছনের মূল ফটকটা বেশ শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকাল ফটকটার দিকে। মৌলবির সঙ্গে যদি আলোচনা করার জন্য তাকে ডেকে থাকে তাহলে এই ফটক এত দ্রুত বন্ধ করার কোনোই কারণ নেই বিক্রমের জন্য। যদি বন্ধুত্বপূর্ণ কারণে মৌলবিকে ডেকে থাকে, তাহলে একটামাত্র কারণেই এই দুর্গের ফটক এভাবে বন্ধ করতে পারে, সেটা হলো নিরাপত্তা। আর যেহেতু এখানে চট করে নিরাপত্তা বিঘ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই, কাজেই এভাবে দ্রুত ফটক বন্ধ করে দেখার পেছনে একটাই কারণ হতে পারে, ওদের বন্দি করে ফেলা।

কর্নেল দ্রুত চারপাশ জরিপ করল। দুর্গটা খুব বড় না আবার একেবারে ছোটও না। তার হিসেবে ভারতের ছোট একটা রাজ্যের দুর্গ যেমন হওয়া উচিত সেরকমই এটা। ওরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে মূল ফটক দিয়ে ঢুকেই তুলনামূলক চাপা একটা জায়গাতে। দুর্গগুলোতে মূল ফটক দিয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এরকম চাপা জায়গা রাখা হয় যাতে শত্রু কোনোভাবে মূল ফটক পার হয়ে ভেতরে ঢুকতে পারলেও অনেকে একসঙ্গে ঢুকে আক্রমণ চালাতে না পারে এবং ওপর থেকে তাদের কাবু করার একটা সুযোগ থাকে। এই মুহূর্তে এই দুর্গের চাপা জায়গাতে প্রায় শ-দেড়শ লোক প্রায় ঠেলাঠেলি করছে ভালোভাবে দাঁড়ানোর জন্য। এটা ভালো লক্ষণ হতেই পারে না।

কর্নেল শিস দিয়ে নিজের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ওর সবচেয়ে কাছে ছিল ত্রিলোক—তাকে ইশারায় কায়াকে ডাক দিতে বলবে। কায়াও তার আর পিটারের মতো মুখ ঢেকে আছে, 'দ্রুত সরতে হবে, এখানে আক্রমণ হবে।'

কায়া সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে একবার চারপাশে চোখ বুলাল, তারপর সে চাপা জায়গাটার একপাশে ছোট একটা ফোকরের মতো দেখাল। ওটা একটা ছোট দরজা। কর্নেল সবাইকে নিয়ে ভিড় ঠেলে দ্রুত এগোল সেদিকে। ভিড়ের সামনে ঘোড়ায় বসা মৌলবি দুর্গের সামনে অংশের রেলিংয়ের কারো সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলছে। ক্ষণিকের জন্য মানুষটাকে দেখতে পেল

কর্নেল ফোকরের দিকে এগোতে এগোতে, সে অনুমান করল ওটাই রাজা বিক্রম হবে। সময় নেই সময় নেই, কর্নেলের মন বলছে মৌলবির সঙ্গে কথোপকথন শেষ হতেই আক্রমণ হবে। কর্নেল ফোকরের কাছে গিয়ে ঢুকতে যাবে ফোকরের মোটা কাঠের দরজা নেমে আসতে লাগল। বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ছোট দরজাটা। কর্নেল হাতের ছোট বন্দুকটা বের করে ওটাকে ঠেস দিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা নেমে আস্তে আস্তে আটকে গেল ওটার সঙ্গে। কর্নেল চট করে সবাইকে মাথা নিচু করে চুপচাপ ঢুকে পড়ার ইশারা করল। সবাই ঢুকে পড়েছে সে নিজেও মাথা নিচু করে ঢুকে পড়ল এবং ভেতরে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে মুখ হাঁ হয়ে গেল তার। একাধিক বন্দুক তাক করা তাদের দিকে।

বর্তমান

‘এই ছবি থেকে আর যেকোনো তথ্য বা আর কিছু বাইর করা খুবই কঠিন হইবে,’ পাটোয়ারি মুখ কুঁচকে বলে উঠল জয়ার দিকে তাকিয়ে। জয়া যতই অস্থির হয়ে ছটফট করুক না কেন পাটোয়ারি একেবারে স্থির—সে বেশ আয়েশ করে পান চিবুচ্ছে এবং প্রফেসর হামিদের স্টাডি থেকে উদ্ধার করে আনা ছবিটাকে নেড়েচেড়ে দেখছে কোনোভাবে ওটা থেকে আর কিছু বের করা যায় কি না। হার্ড কপি ছবিটা তার হাতে, আবার ওটাই ওপেন করা ল্যাপটপে এবং প্রজেক্টরের স্ক্রিনে। ‘একে তো পুরান ছবি, তার ওপরে আবার ঘোলা। এইখান থেকেইকা যা বোঝার তা তো পাওয়াই গেছে আর কি চাও?’

‘স্যার,’ জয়া সরকার উত্তেজনায় পায়চারি করছিল, সে চট করে বসে গেল পাটোয়ারির সামনে। ‘ছবিটার অবশ্যই কোনো না কোনো দারুণ গুরুত্ব রয়েছে, তা না হলে আলী আজগর বারবার এই ছবিটার কথা বলত না। সে তিনটা কথা বলে গেছে, বলেই সে নিজেকে শুধরে নিল। ‘চারটা কথা। এই ছবিতে আরো কুঁ রয়েছে, প্রজিডি কিং নামে রেলিক এবং নেত্রপলিসের এক শুরু রয়েছে, চিত্তামণি আর হ্যারি পটারের প্রথম বইয়ের নাম। এই চারটা জিনিসের সমাধা করতে হবে আমাদের। যেকোনো মূল্যে। আমি ছবিটা দিয়েই শুরু করতে চাই,’ বলে সে সাহায্যের আশায় রমিজ দারোগা আর কনস্টেবল আবদুল্লাহর দিকে দেখল।

রমিজ দারোগা, আবদুল্লাহ আর ইনসপেক্টর রবিউল আরাম করে চা খাচ্ছিল জয়ার কথায় তিনজনেই সচকিত হয়ে উঠল। ‘জি, স্যার, জয়া ম্যাডাম ঠিকই বলছেন,’ কনস্টেবল আবদুল্লাহ বলে উঠল।

সিপাহী

‘আইচ্ছা,’ পাটোয়ারি তার হাতে তুলে নিল আবার ছবিটা। ‘এই ছবিতে দেখতে বাকি কী আছে?’ নিজেকেই সে নিজে প্রশ্ন করল। ‘ডেভিড, তিন প্রফেসরের ছবি তো পরিষ্কার। হেগো লগে আরো দুইজন আছে,’ বলে সে ড্র কুঁচকে চাবিটার দিকে দেখল। ‘একমিনিট, তোমরা কেউ কি খেয়াল করছো মানুষ আসলে দুইজন না আরো তিনজনের চেহারা পরিষ্কার না?’ জয়া চট করে ছবিটার দিকে দেখল। প্রায় ছিনিয়ে নিল সে ছবিটা পাটোয়ারির হাত থেকে। ‘কই কই, তিনজন আবার এলো কোথা থেকে?’ সে আবার দেখেও দেখতে পাচ্ছে না।

‘ভালো কইরা দেহো, দুজনের লগে আরেকজন আছে, হেরে দেহা যাইতেছে না, কারণ অন্ধকারের ভেতরে দুইজনই আলা মার্ট পইরা আছে—তাই একজন মনে অইতাছে।’

জয়া খুব ভালোভাবে দেখে ড্র কুঁচকে ফেলল। ‘আরে তাইতো, পাটোয়ারিকে কেন সবাই শ্রদ্ধা করে ধরতে পারল সে। ‘স্যার, কোনোভাবে কি বের করা যায় এদের চেহারা?’ সে ছবিটা ফিরিয়ে দিল পাটোয়ারিকে।

‘একটা উপায় আছে,’ পাটোয়ারি তার চোখের চশমা নাকের ওপরে এনে ছবিটা দেখছে আবারো। ‘খেয়াল করছো কি না জানি না, যে তিনজনের চেহারা বোঝা যায়, অচেনা হেগো ভেতরে দুজন অন্যদিকে ফিরা আছে দেইখাই এগোরে দেহা যাইতেছে না। কিন্তু হেগোর পেছনে ছাদের রেলিংয়ে একটা কাচ আছে। আমি প্রায় নিশ্চিত হেরা যদিও মুখ কইরা আছে তাতে ওইটাকে হেগো চেহারার প্রতিফলন থাকার কথা।’

জয়া খুব বেশি ভরসা পাচ্ছে না, কিন্তু পাটোয়ারির কথা সে ফেলেও দিতে পারল না। ‘হ্যাম আছে তো।’

‘ওইটা একটা জায়গা হতে পারে, চেহারা উদ্ধারের,’ বলে পাটোয়ারি হেসে উঠল।

জয়ার মনে হলো পান চিবুতে থাকা বুড়ো মানুষটাকে জড়িয়ে ধরে সে খুশিতে।

অতীত

কর্নেল ছোট দরজাটার ভেতরে ঢুকে একেবারে মুখের সামনে তাক করা অস্ত্র দেখে খানিক ভড়কে গেল। কিন্তু সে এমনকি মাথার দু পাশে হাত তোলার আগেই তার দু পাশে নড়ে উঠল দুজন মানুষ। সাপ যেভাবে ছোবল মারে ঠিক সেরকমভাবেই দুজনার হাত একসঙ্গে ছোবল মারল অস্ত্রধারী দুজনার অস্ত্রধরা হাতের দিকে।

কর্নেল সৈনিক মানুষ, সে নিজের জীবনে অসংখ্য যুদ্ধ দেখেছে এবং করেছে কিন্তু এত দ্রুত কাউকে নড়তে দেখেনি। কর্নেল শুনেছিল ভারতের খনে গোত্রের লোকরা ভয়ংকর হয়, কিন্তু ওরা আসলে কতটা ভয়ংকর হয়, সেটা সে সরাসরি দেখতে পেল আর মিস্তি আর কায়া'র দুই অস্ত্রধারী পাহারাদারকে ঘায়েল এবং কাবু করতে দেখে। প্রথমেই দুজনার হাত ঠিক সাপের ছোবলের মতোই অস্ত্রধারীদের হাত থেকে অস্ত্রদুটো নিয়ে নিল, তারপর ওরা বুঝে ওঠা বা চমকে ওঠার আগেই ওদের অস্ত্রের আঘাতে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। এমনকি লুটিয়ে পড়ার আগেই দুজনেই ধরে ফেলে স্রেফ তুলোর মতো নিঃশব্দে নামিয়ে রাখল দুজনকে।

কর্নেল তো বটেই এমনকি তার সঙ্গীরাও রীতিমতো হাঁ করে দেখল এই দৃশ্য। মিস্তি আর কায়া দুজনেই পাহারাদার দুজনকে ছিন্ন করে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তখনো কর্নেল এবং তার সঙ্গীরা হাঁ হয়ে আছে। 'কি ব্যাপার সবাই খারায় থাকবেন নাকি?' কায়া রাগের সঙ্গে বলে উঠল।

কর্নেলই প্রথম কথা বলে উঠল। 'মৃত্যু আর হত্যা আমার জন্য নতুন কিছু নয়। কিন্তু এতে দ্রুত এমন উপায়ে আমি এর আগে দেখিনি। যাই হোক,' বলে কর্নেল মিস্তি এবং কায়াকে দেখল। 'কায়া তুমি এখান থেকে নির্দেশনা দেবে—আমি এবং আমরা কীভাবে ভিক্টরকে খুঁজে বের করব, আর সেক্ষেত্রে আমি আমার দল নিয়ে যদি ভিক্টরকে উদ্ধার করতে যাই, তাহলে তোমরা কি করবে?' কর্নেল তাকিয়ে রয়েছে কায়া এবং মিস্তির দিকে। 'তোমরা কি দুজনের মিলে রাজা বিক্রমকে হত্যা করতে যাবে? নাকি আমাদের এখান থেকে সাহায্য লাগবে?'

কর্নেলের প্রশ্ন শুনে খানিক চুপ হয়ে রইল কায়া ও মিস্তি দুজনেই। মিস্তি এই প্রথমবারের মতো তাকাল কায়া'র দিকে সরাসরি। কায়াও তাকিয়ে আছে তার দিকে। কথা বলে উঠল কায়াই প্রথম, 'আমরা দুজনেই যাব, আমরা দুজন থাকলে আর কাউরেই লাগব না। আর আমরা কাজ সাইরা, দুর্গের পেছনে নদীর সংযোগ আছে যেইখানে, সেইখানে থাকব। আপনারাও কোন দিক দিয়া সেখানে যাইবেন সেইটাও আমি বলে দিতাছি।'

'ভিক্টরকে কোথায় রাখা থাকতে পারে?' কর্নেলই প্রশ্ন করল।

'জোরদার সম্ভাবনা দুর্গের নিচের অংশের কারাগারে,' কায়া বলে উঠল। 'আমি আগেও একাধিকবার এইখানে আসছি এবং প্রতিবারই দেখছি বন্দিদের ওইখানেই রাখা হয়।'

সিপাহী

‘যদি না থাকে ওইখানে?’ ত্রিলোক জানতে চাইল।

‘সুযোগ নিতে অইবো আপনেনগো,’ কায়া বলে উঠল। ‘যদি না থাকে আপনারা সোজা দুর্গের নদীর অংশের দিকে যাইবেন, আমরা কাজ সাইরা ওইখানে গেলে আপনেনগো লইয়া আবার ফিরব লাগলে।’

‘অনেকক্ষণেই বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ভিক্টর না থাকতে পারে কারাগারে, তোমরা ধরা পড়ে যেতে পারো ইত্যাদি,’ কর্নেল জু কুঁচকে বলে উঠল। ‘কিন্তু সত্যি কথা হলো, সুযোগ নিতে হবে, কিছু করার নেই। তুমি বলে এখন থেকে কারাগারে কীভাবে যাব?’ কায়া সংক্ষেপে কিছু যতটা সম্ভব বিস্তারিত বলে গেল কীভাবে ওরা দুর্গের নিচের দিকের পাতালে যাবে। কায়া তার বিবরণে শেষ পর্যায়ে রয়েছে, পুরো দুর্গ কেঁপে উঠল গুলির শব্দে, কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

বর্তমান

টমির জিনের বিন্দুটা থেমে গেলেও বাশারের জিপ এখনো থামেনি, যদিও গতি কমে এসেছে অনেকটাই। ‘টমি, আমি কি থামব?’ বাশার সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়েই প্রশ্নটা করল।

‘আবশ্যই থামবে,’ বলে টমি প্রায় ধমকে উঠল। ‘আরো কত আগেই বলেছি থামতে!’

‘আরে তুই তো ল্যাপটপে দেখছিস, আমাকে তো রাস্তা দেখে থামাতে হবে,’ বাশার খানিক অসহায়ের মতো বলে উঠল। ‘থামানোর জায়গা না থাকলে আমি কি মূল রাস্তার ওপরে থামিয়ে দেব নাকি,’ বলে বাশার ডানের ইভিকেটর দিয়ে জিপটাকে প্রায় সাইড করে থামিয়ে ফেলেছে এমন সময় টমি আবারো প্রায় চৌঁচিয়ে উঠল। ‘থেমো না থেমো না, ওরা আবার মুভ করতে শুরু করেছে।’

বাশার জিপ থামিয়ে দিতে দিতেও আবার এক্সেরেটেরে চাপ দিয়ে গতি বাড়িয়ে জিপটাকে তুলে ফেলল রাস্তার ওপরে। ‘টমি, তোর কি মাথা গেছে!’

‘আরো ওরা আবার মুভ করতে শুরু করেছে আমি কী করব। বাশার অসহায়ভাবে একবার টমির দিকে দেখে নিয়ে সামিরার আর রুশোর দিকে দেখল। ওদের মাথার ওপর দিয়ে কট কট শব্দ করতে করতে উড়ে গেল একটা হেলিকপ্টার। ‘এখান থেকে বর্ডার মনে হয় একেবারে কাছে, এটা কি বর্ডার গার্ডেন কন্টার নাকি?’

‘আরে তুমি সামনে দেখো,’ বাশারের প্রশ্নের জবাবে টমি বলে উঠল।
‘ত্বিনেরও পরে বিন্দুটা ডাইনে ঘুরছে। মানে ওরা মূল রাস্তা থেকে ডানে মোড়
নিয়েছে, আমার ধারণা, ওদিকে ঘোরার জায়গাটা সামনে ডানদিকেই কোথাও
হবে।’

বাশার জিপের গতি কমিয়ে যতটা সম্ভব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে যাতে, ডানে
এগোনোর রাস্তাটা মিস করে না যায়। আরেকটু সামনে এগোতেই সে মূল রাস্তা
থেকে জঙ্গলের ভেতরের ডানের রাস্তাটা দেখতে পেয়ে জিপটা ডানে ঘুরিয়ে
দিল। জিপটা মূল রাস্তা থেকে ঢুকে পড়ল জঙ্গলের ভেতরের কাঁচা রাস্তায়। কিন্তু
ঢুকেই বাশার জিপ থামিয়ে ফেলল চট করে। ‘সামনে তো রাস্তা দুইটা, কোনটা
দিয়ে যাব?’

টমি থেকে শুরু করে জিপের সবাই তাকিয়ে রয়েছে রাস্তার দিকে।
ইংরেজ কবি রবার্ট ফস্টের ‘রোড নট টেকেন’ কবিতার মতো দুই ভাগ হয়ে
দুদিকে চলে গেল জঙ্গলের রাস্তাটা। এতটাই সূক্ষ্মভাবে ভাগ হয়েছে ওটা যে
পরিষ্কার বোঝার উপায় নেই কোনটা কোনদিকে যাবে। ‘এই কারণেই সামনের
ওরাও এই রাস্তার মোড়ে এসে থেমে গিয়েছিল। ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না
কোনটা ধরে যাবে,’ পেছন থেকে সামিরা বলে উঠল।’

‘আমার কাছে মনে হচ্ছে, সামনের বিন্দুটা মানে ওরা বামের রাস্তাটা ধরে
এগিয়েছে, কারণ বিন্দুটার মুভমেন্ট বামঘেঁষা এবং সেই সঙ্গে বামের রাস্তাটা
সামনের ওই টিলাটার দিকে এগিয়েছে, রুশো বলে উঠল। বাশার, টমি এবং
সামিরা তিনজনেই তাকিয়ে দেখল রুশোর কথাই ঠিক মনে হচ্ছে। কথা না
বাড়িয়ে বাশার বামে মোড় নিয়ে চলতে শুরু করল। ‘যদি ভুল হয় আবার ফিরে
আসা যাবে, এত ভয়ংকর কিছু না।’

ওরা চুপচাপ সামনে এগোল আধা মাইলের মতো। যত এগোচ্ছে সামনের
টিলাটা ততই পরিষ্কার হচ্ছে। আরেকটু এগোতেই টিলাটার গোড়ায় দাঁড়
করানো মাইক্রোটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা। ‘সবাই সাবধান। জিপ
থামিয়ে ফলেছে বাশার।

এমনভাবে হঠাৎ মাইক্রোটাকে দেখতে পেয়েছে ওরা যে আড়াল নেবার
উপায় নেই। বাশার অস্ত্র হাতে নেমে এলো জিপ থেকে। সামিরারও হাতে অস্ত্র,
টমির হাতে ল্যাপটপ। রুশোকে পেছনে ঠেলে দিল ওরা।

‘কিন্তু সামনে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, টমি বলে উঠল।

সিপাহী

ওরা একে অপরকে কভার করে সামনে এগোল। ‘ব্যাপার কি, ওরা গেল কই?’ বাশার বলে উঠল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, দু পাশের জঙ্গলের ভেতর থেকে উদয় হলো একাধিক অস্ত্রধারী।

অতীত

কায়ার বর্ণিত পথ ধরে কর্নেল তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চলেছে দুর্গের নিচের দিকে। এ-ধরনের দুর্গ খুব বড় নয় ফলে খুব বেশি সময় লাগল না আর বেশি অসুবিধাও হলো না ওদের জন্য। অবশ্য সুবিধা না হওয়ার পেছনে আরেকটা কারণ রয়েছে। কারণ দুর্গের সবার নজর বাইরের দিকে, আসলে বাইরে দিকে বলা উচিত না। বলা উচিত দুর্গের কেন্দ্রের দিকে। সেখানে ভয়াবহ নাটক চলছে।

কায়া যখন, তার বিবরণের প্রায় শেষ দিকে—এ-সময় গুলির শব্দে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে চারপাশ। একের পর এক গুলি চলতেই থাকে এবং সেই সঙ্গে দুর্গের সেই ছোট অংশ থেকে ভেসে আসতে থাকে শত মানুষের আহাজারি। ‘মৌলবির সঙ্গে বেইমানি করেছে রাজা বিক্রম, ত্রিলোক বলে উঠল। কচুকাটা করা হচ্ছে তার বাহিনীকে,’ আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগল সে।

‘আমি আসলেই দুঃখিত আন্তরিক ভঙ্গিতেই বলে উঠল কর্নেল। ‘কিন্তু মৌলবির জন্য আসলেই আমাদের আর কিছু করার নেই। বরং আমরা যেটা করতে এসেছি সেটা করতে পারলে সাধারণ কিছু মানুষের হলেও উপকার হবে। যেহেতু রাজা বিক্রমের বাহিনীর মূল মনোযোগ এখন বাইরের দিকে, স্বাভাবিকভাবেই ভেতরের প্রহরা থাকবে দুর্বল। এই সুযোগ কাজে লাগাব আমরা। সবাই দ্রুত চলো আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে।’

মিস্তি আর কায়ার কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে ওরা রওনা দেয় কারাগারের দিকে। সেখানে থেকে প্রথমেই সরু জায়গাটা পার হয়ে চলে আসে একটা গোলমতো সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে কিছুটা নিচে নেমে ওরা আবার আরেকটা সরু পথ ধরে এগোতে এগোতে যখন শিক লাগানো কারাগারের সারি দেখতে পেল, সেখানে শিকের ভেতরে বন্দিরা বসে আছে, কেউ শুয়ে আছে।

ভারতের মাটিতে পা দেওয়ার পর এই প্রথমবারের মতো কর্নেলের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। এই প্রথমবারের মতো তার মনে হচ্ছে সে ভিক্টরের খুব

কাছে চলে এসেছে। 'সবাই ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে থাকো। লাল চুলের লম্বা একজন ইংরেজ, যারা চেনো না। ডান গালে একটা জারুল রয়েছে। জলদি জলদি।'

'দুর্গটা সরু হলেও কারাগার এবং বন্দির সংখ্যা একেবারে কম নয়। ওরা ছড়িয়ে পড়ে এ পাশের সারি পার হয়ে অনফোমে এসে মিলিত হলো সবাই। 'কোথায়, দেখবে তো—'

'ওই যে সোলেমান বলে উঠল, অন্যপাশের সারির প্রথম কারাগারের ভেতরে লম্বা সাদা চামড়ার এক ইংরেজ শুয়ে আছে। কর্নেল দেখেই বুঝল, এটাই তার বন্ধু। খোঁজ সম্পন্ন হয়েছে, খুঁজে পেয়েছে সে ভিক্টরকে।

বর্তমান

পিবিআইএস অফিস, ধানমন্ডি ঢাকা

নিজের অফিসের প্রাথমিক কাজগুলো সেরে সে উত্তেজনার সঙ্গে নিজের ডায়েরিতে একবার চোখ বুলাল। হাবিব আনোয়ার পাশা, কখনোই খুব বেশি উত্তেজিত হয় না। কিন্তু আজকের দিন তার জন্য একেবারেই আলাদা এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একাধিক কারণে। আর এই মুহূর্তে এত বেশি ঘটনা ঘটছে একসঙ্গে যে, সে আসলে চাইলেও সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। আবার এই সব ঘটনাই একটার সঙ্গে আরেকটা সংযুক্ত এবং একটা আরেকটার সহায়ক। ঠিক একইভাবে একটার সমস্যা হলে অন্যটারও বিপদ হবে। সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ সব একসঙ্গে গোঁথে রয়েছে, সেই সঙ্গে ইন্টারপোল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সই।

আনোয়ার পাশা নতুন একটা সিগার ধরিয়ে ঘড়ি দেখল। নিজেকে তার বাক্সেট কেস মনে হচ্ছে, তলাবিহীন ঝুড়ি। কারণ সবকিছু একসঙ্গে জমা হয়ে রয়েছে কিন্তু সে নিজে চাইলে ওর কিছুই করতে পারছে না। আবার এসব কিছুর একেবারে কেন্দ্রে অবস্থান করছে সে। কাজেই সবকিছুরই তার কাজ রয়েছে। আনোয়ার পাশা উঠে দাঁড়িয়ে সিগার টানতে টানতে পায়চারি করতে লাগল। সবকিছুই মোটামুটি গোছানো হয়েছে। এবার দেখা যাক সারাজীবন ধরে সে একের পর এক স্বপ্ন দেখে এসেছে, সেগুলো সব কার্যকর করা সম্ভব হবে কি না। যে-স্বপ্ন সে দেখে এসেছে এতদিন ধরে সেগুলো পূরণ হবে কি না।

আনোয়ার পাশা পায়চারি করতে করতে হঠাৎ রুমের দরজায় নক হলো এবং একটু পরেই সেটা খুলে গেল। সেখানে মৌসুমি দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'স্যার, দুটো ওড নিউজ আছে।'

সিপাহী

যদিও সে দুটো না হলেও অন্তত একটা গুড নিউজ মৌসুমির হাসি দেখে অনুমান করতে পারে। কিন্তু অপরটা সে ঠিক জানে না। ‘বলো,’ যদিও সে ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে কিন্তু ওপরে সেটা প্রকাশ হতে দিল না।

‘স্যার,’ মৌসুমি হাতের খামটা এগিয়ে দিল আনোয়ার পাশার দিকে, মাহবুব তালুকদার সব অ্যাগ্রিমেন্ট সাইন করে পাঠিয়েছেন। আনোয়ার পাশা বড় করে দম নিল একবার। স্বস্তির চোটে প্রায় তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল কিন্তু সেটা মুখে প্রকাশ পেতে দিল না। সে খামটা হাতে নিয়ে কাগজগুলো দেখতে লাগল। সেগুলোকে দেখে, সে হাসিমুখে একবার অভিবাদন জানিয়ে সেগুলোকে তার সেফে রেখে, মৌসুমির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। ‘তুমি এগুলোর কপি করে জায়গামতো পাঠিয়েছো?’

‘স্যার, কপি করেছি এখনো পাঠানো হয়নি।’

‘পাঠিয়ে দাও, আনোয়ার পাশা উত্তেজনায় চিৎকার করতে চাইছে, কিন্তু সে কথা বলছে ফিসফিস করে। আর দ্বিতীয় গুড নিউজ?’

‘স্যার, প্রফেসর ইফতেখার পুরোপুরি সুস্থ বোধ করছেন এবং উনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন।’

‘সিলেটে তানভীর আর চট্টগ্রামে শারিয়ারকে জানাও আমি আর কিছুক্ষণের ভেতরেই সিদ্ধান্ত দেব। সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে বলো। তবে এখনো ওদের মিশন বিরতিতে থাকুক। আর আমরা এখন প্রফেসর ইফতেখারের সঙ্গে কথা বলতে যাব। চলো।’

আনোয়ার পাশা জানে, এই সেকশনে এখন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সে। চাইলে ওই সে অনেককিছু করতে পারে।

অতীত

‘ভিক্টর ভিক্টর, কর্নেল ফিস ফিক করে ডেকে উঠল কারাগারের শিক ধরে দাঁড়িয়ে, উত্তেজনায় তার বুকের ভেতরে পিটছে। গুয়ে থাকা মানুষটা কর্নেলকে দেখে। মানুষটা ডাক শুনে প্রথমে উঠে বসল এবং এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আবার গুয়ে পড়ল, তাকে দেখে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ মনে হচ্ছে।

কর্নেল পালোয়ানের দিকে তাকিয়ে তালাটা দেখিয়ে বলে উঠল, ‘দেখো তো এটা খোলা যায় কীভাবে?’

কারাগারের শিকের সঙ্গে বিরাট একটা তালি মারা। পালোয়ান এগিয়ে এসে তালিটা ভাঙার চেষ্টা করল হাতে, লাঠি দিয়ে কিন্তু কাজ হলো না। অত্যন্ত মজবুত তালি। ‘এইটা এইভাবে খোলা যাবে না। চাবি খুঁজতে অইবো।’

‘চাবি আছে কাছেই কোথায়, খুঁজে দেখতে হবে। ওরা ছড়িয়ে পড়ে, চাবি খুঁজতে যাবে, তার আগেই পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। এক-দুজন নয়, একদল লোক এগিয়ে আসছে এদিকে। ‘চাবি পরে, যেখানে পারো লুকিয়ে পড়ো আগে। ওরাও এদিক-সেদিক ছড়িয়ে লুকিয়ে পড়ল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কারাগারের ভেতরে প্রবেশ করল একদল সৈনিক—সোজা এগিয়ে গেল ডিক্টরকে রাখা কারাগারের ভেতরের দিকে।

কর্নেল হাতের ইশারায় তার লোকদের শান্ত থাকতে বলল। এত সৈনিকের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। সৈনিকের দলটা ডিক্টরকে রাখা কারাগারের দরজা খুলে তাকে টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে গেল কারাগার থেকে। কর্নেল ইশারায় অনুসরণ করার নির্দেশ দিল তাদের।

কায়া এবং মিস্তি সরু জায়গাটা ধরে প্রথমে কিছুক্ষণ এগিয়ে গেল নিঃশব্দে তারপর দুর্গের অন্য অংশে চলে এলো। অস্বাভাবিকভাবে দুর্গ ভেতরের দিকে প্রায় খালিই বলা চলে। কারণটাও অনুমেয় নয়। রাজা বিক্রমের লোকেরা সব বাইরের দিকে ব্যস্ত। আরেকটু এগোতেই মিস্তি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই কায়া তার দিকে ফিরে বলে উঠল। ‘আমরা কাজের প্রয়োজনে এক হইছি। আমাদের মধ্যে কাজের বাইরে কোনো কথা হবে না। কাজ সমাধা হইলে পরে আমাদের নিজেদের হিসাব হবে। সামনে চলো।’

মিস্তি কিছু না বলে মাথা নেড়ে সায় জানাল। ওরা দুজনে মিলে সাবধানে এগিয়ে দুর্গের ওপর দিকে চলে এলো। দু-একজন সৈনিকের পার হওয়া দল দেখে আড়ালে সরে গিয়ে লুকালেও প্রায় কোনো সমস্যা ছাড়াই ওরা চলে এলো যেখানে রাজা বিক্রম দাঁড়িয়ে ছিল তার ভেতরের দিকে। সেখানে পৌছানো রাজার দরবারের সঙ্গে সংলগ্ন চাতালে উঠে পড়ল দুজনে খুব সাবধানে। তারপর নজর বোলাল ভেতরের দিকে। রাজা বিক্রম বসে আছে তো লোকদের সঙ্গে, কায়ার দিকে তাকিয়ে ইশারা করল মিস্তি, কায়ার হাতে এরই মধ্যে বেরিয়ে এসেছে ছোট একটা বাঁশের কঙ্কির মতো জিনিস, আর মিস্তির হাতে দুইমাথা ওয়ালা একটা কাঠের টুকরো। একটাকে বিষমাখা সুচ আর অন্যটাতে কাটাওয়ালা লোহার বল। যেকোনোটাই রাজাকে দূর থেকে হত্যার জন্য যথেষ্ট।

ওরা নিজেদের অস্ত্র সাজিয়ে আবার ফিরে তাকিয়ে চমকে গেল। রাজার দরবারে একাধিক ইংরেজ বসে আছে। সবাই মিলে কথা বলতে বলতে, বাহির

সিপাহী

দিকে দেখল। ‘ওরা অপেক্ষা করছে কারো লাইগা, কায়া বলে উঠল খানিক অবাক হয়ে বলে উঠল। মিস্তি ফিরে তাকাল কায়ার দিকে। দুজনারই মনে একই প্রশ্ন—কার জন্য অপেক্ষা করছে ওরা।

বর্তমান

নতুন বাজার ল্যাভ, ময়মনসিংহ

‘ছবি জায়গামতো পাঠানো অইছে,’ জয়ার দিকে তাকিয়ে পাটোয়ারি বলে উঠল। ফলাফল জলদি চইলা আসবে যেকোনো সময়,’ পাটোয়ারি বলে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সে নতুন একটা পানের খিলি মুখে দিল তার স্টিলের পানের কেস থেকে বের করে। মনোযোগের সঙ্গে পরখ করছে সে জয়াকে। ‘একটা কথা জিগাই, তুমি তো আগে বাশার অগো শত্রু আছিল। রিফাতের তো তোমার আরো বেশি অপছন্দ হওয়ার কথা। তাইলে তুমি এহন এই কেস সমাধান করার লাইগা এত উতলা অইতাছো ক্যান কও তো?’ পাটোয়ারি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জয়ার দিকে।

জয়া সরকার সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিল না। সে ভাবছে। ‘সত্যি কথা কবো, বাশারের প্রতি আমার খানিক দুর্বলতা আছে,’ বলে সে পাটোয়ারির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। ‘না ওই ধরনের দুর্বলতা না। আসলে ওর লগে আমার শত্রুতা থাকলেও ও কখনোই আমার সঙ্গে অন্যায় করে নাই। আর রিফাতের সঙ্গে বিষয়টা আরো উলটা। আমি বরং ওর প্রতি অনেক অন্যায় করছি। মূল কথা অইলো। ওরা যে যার জায়গায় ঠিকই আছে। আমি আসলে ভুল, এটা একটা কারণ আর অন্য কারণটা আমি নিজেও ঠিক বুঝতাই না। কেন জানি এই পুরা ঘটনা, যেটা একভাবে বলতে গেলে আমার থেকেই শুরু হয়েছিল, পুরো ব্যাপারটা এত বড় হবে, এমনকি আমিও এটা বুঝতে পারিনি। আর কেন জানি পুরো বিষয়টা নিয়ে আমার মধ্যে ভালো অনুভূতি হচ্ছে না। খুব বাজে একটা অনুভূতি হচ্ছে—যেটা ঠিক ভালো লাগছে না আমার,’ বলে জয়া সরকার কাঁধ ঝাঁকাল। ‘আসলে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না।’

পাটোয়ারিও কিছু না বলে পান চিবালা আনমনে কিছুক্ষণ। তারপর ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘আইচ্ছা, আমরা ছবিতে যেহেতু নাই, কাজেই কথা দিয়া শুরু করি। কি জানি কইছিল, আলী আজগর শব্দটা।’

‘তিনটা জিনিস বলেছে সে,’ হঠাৎ চতুর্থ কথাটা মনে পড়েছে জয়ার। ‘প্রথমত, চিন্তামণি; দুই, আকাশ থেকে পতন; তিন, হ্যারি পটারের প্রথম বইয়ের নাম।’

গল্প শেষের শুরু

‘আইচ্ছা, তিন নম্বরটা দিয়া শুরু করি। হ্যারি পটারের প্রথম বই কি’ বলে সে গুগলে সার্চ দিল হ্যারি পটার সিরিজ রিলে। ‘হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য সরসরার’স স্টোন। পড়ছিলা নাকি বইটা?’

‘পড়েছিলাম অনেক আগে,’ জয়া সরকার সিনেমার গল্পটা মনে করার চেষ্টা করছে। ‘ঠিক মনে নেই গল্পটা, সিনেমাটাও দেখছিলাম। আমার মনে আছে টাইটানিকের পরে ওটাই মনে হয় সবচেয়ে রেকর্ড ব্রেক করা সিনেমা ছিল।’

‘আইচ্ছা, এইটা বাইর করা থাক,’ পাটোয়ারি বলে উঠল। ‘এইবার বলি চিন্তামণি,’ বলে সে বাংলায় চিন্তামণি লিখে সার্চ দিল গুগলে। ‘চিন্তামণি কর, একজন মানুষের নাম, চিন্তামণি ঘোষ,’ বলে সে মৃদু হাসল, এই নামে তো দেহি জিতের সিনেমাও আছে একটা। কিন্তু এইগুলো তো কোনোটাই কাজের কিছু মনে হচ্ছে না। শব্দটার বুৎপত্তিগত অর্থ বের করে দেখব নাকি?’

‘আমার মনে হয় না ওটাতেও খুব বেশি কাজ হবে। এক কাজ করেন তো, ইংরেজিতে লিখে সার্চ দেন,’ বলেই হঠাৎ জয়ার মনে পড়ে গেল, আলী আজগর দুটো রেফারেন্স দিয়েছিল। ‘বাক্সের ভেতরে করে কোনো রাজার কাছে এসেছিল। আর বুদ্ধিস্ট রিলিজিওনের সঙ্গে এর সংযোগ আছে। এগুলো মিলিয়ে দেখেন তো—’

পাটোয়ারি সার্চ দেওয়ার আগেই মোবাইল বাজতে লাগল। জয়ার কলিজা লাফ দিয়ে উঠল।

বাশার নাকি?

অতীত

কর্নেলের কাছে মনে হচ্ছে হয় তারা সাংঘাতিক লাকি আর না হয়, দুর্গের আর রাজা বিক্রমের রাজ্যের বেহাল দশার কারণেই তারা এখনো ধরা পড়েনি। আর না হলে দুর্গের ভেতরে এভাবে একদল সৈনিককে এই সরু জায়গার ভেতরে অনুসরণ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হওয়ার কথা স্বাভাবিক অবস্থায়। কিন্তু তারা ব্যাপারটা পারছে এবং বেশ ভালোভাবেই পারছে। সৈনিকদের দলটাতে প্রায় এক ডজনের মতো সৈনিক রয়েছে, সামনে ছয়জনের মতো, মাঝে দুজন ধরে আছে ভিক্টরকে, আর পেছনে আরো চারজন তারা সদর্পে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর তাদের পেছনে প্রায় নির্জন সরু গলির মতো জায়গা দিয়ে নিজেদের যতটা সম্ভব দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে এবং যতটা সম্ভব আধো অন্ধকারের ভেতরে দিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে ওরা।

সিপাহী

রাজা বিক্রমের দুর্গে আসলে হচ্ছেটা কি ওরা জানে না। তবে এটা বুঝতে পারছে, ওরা বাইরের গজগোল ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। আর এ কারণেই হয় দুর্গের ভেতরে ওদের লোক নেই অথবা ওরা আসলে দুর্গের ভেতরে সেভাবে প্রহরা মজবুত করতে পারছে না। সামনের সৈনিকদের দলটা দুর্গের সরু অংশ ধরে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে একটা গোলমতো জায়গায় গিয়ে ঢুকল এবং ওখানে গিয়ে সামনের ডানের একটা দরজা দিয়ে একে একে বেরিয়ে যেতে শুরু করল।

গোলমতো জায়গাটার সামনে গিয়ে কর্নেল থেমে গেল। হাতের ইশারায় সে ধামিয়ে দিল নিজের সঙ্গের লোকদের। এতক্ষণ যদিও মূল অংশ দিয়েই যাচ্ছিল, যেখানে খানিকটা হলেও আড়াল ছিল এবং আধো অন্ধকার একটা ব্যাপার ছিল, অস্তুত আধো অন্ধকারে যাওয়ার উপায় ছিল প্রয়োজন হলে। কিন্তু এখন যেখানে প্রবেশ করতে যাচ্ছে—সেটা একেবারেই খোলা একটা জায়গা। ফলে ধরা পড়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যাচ্ছে প্রতি পদে। কর্নেল সোজা হয়ে দাঁড়াল। ‘সবাই খুব স্বাভাবিকভাবে আগাবে, যেন কোনো কাজে যাচ্ছে কর্নেল বলেই মাথা উঁচু করে সোজা ঢুকে গেল গোলমতো জায়গাটায়, ওটার ভেতরে ঢুকে বীরদর্পে এগিয়ে গেল সেই দরজাটার দিকে, যেখানে দিয়ে সৈনিকগুলো বেরিয়েছে। কিন্তু দরজার হাল ধরে ঠেলা দিয়ে কোনো কাজ হলো না। কর্নেল আরো জোরে ঠেলা দিল কিন্তু তাও কোনো কাজ হলো না। ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে নাকি।

‘ব্যাপার কি লাগিয়ে দিয়েছে নাকি?’ ত্রিলোক বলে উঠল কর্নেলের পেছন থেকে।

‘আমি চেষ্টা করব—’ পালোয়ান তার কথা শেষ করতে পারল না, তার আগেই গোলমতো জায়গাটার দু পাশের দরজা বন্ধ হয়ে গেল ধাম করে, আর উলটোদিকে যে একমাত্র খোলা দরজাটা রয়েছে সেটা দিয়ে পিল পিল করে ঢুকতে লাগল সৈন্য। প্রত্যেকেই অস্ত্রধারী। চূড়ান্ত মেজাজে খারাপ করে মাথা নাড়ল কর্নেল। আসলে ওরা এতক্ষণ ধরে এত সহজে এখানে আসতে পেরেছে কারণ, এরাই এদের আসতে দিয়েছে যাতে সহজে এরা ঢুকতে পারে এখানে এবং কর্নেল তার বাহিনী নিয়ে বোকার মতো ঢুকে পড়ে। আর ওরাও সোজা এসে পড়েছে একেবারে ফাঁদের ভেতরে।

পালোয়ানের কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছে সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে, তাকে ইশারায় শাস্ত হতে বলল পালোয়ান। না হলে মেরে ফেলবে এরা। যেটা সম্ভবত ওদের ভাগ্যেও ঘটতে যাচ্ছে।

বর্তমান

হাশুয়াঘাট ময়মনসিংহ

অস্ত্রধারীদের জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে কেন জানি বাশার খুব বেশি অবাক হলো না। সে যখন জিপ নিয়ে অনুসরণ করতে শুরু করে তখনই তার মনে হচ্ছিল যে সম্ভবত এরকম কিছু একটাই হতে যাচ্ছে। সামিরা উত্তেজিত ভঙ্গিতে নিজের অস্ত্র তুলতেই বাশার হাতের ইশারায় থামিয়ে দিল তাকে।

অস্ত্রধারীর সংখ্যা তিনজন, প্রত্যেকের হাতেই একটা করে পুরনো দিনের কোল্ট পিস্তল। তিনজনের ভেতরে দুজন নারী এবং একজন পুরুষ। বাশার নিজের অস্ত্র নামিয়ে পুরুষ লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। ‘আপনার এই মাস্কাতার আমলের অস্ত্রের চেয়ে আমার পিস্তল বেশি আধুনিক,’ বলে সে সামিরার দিকে দেখাল। ‘আমার পার্টনারেরও তাই। আমি এবং আমার পার্টনার এটা নিশ্চিত বলতে পারি, তোমাদের চেয়ে আমাদের ট্রেনিং ভালো,’ বলে বাশার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে আনল। ঠোটে সিগারেট লাগাতে লাগাতে সে একবার নিজের লোকদের দিকে দেখে নিয়ে তাদের চোখের ইশারায় শান্ত থাকতে বলে পুরুষ লোকটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘তাহলে প্রশ্ন ওঠে, আমি আমার অস্ত্র নামিয়ে নিলাম কেন।’

কেন?’ লোকটাও ওর প্রশ্নের শেষের শব্দটা উচ্চারণ করল।

‘কারণ তোমাদের সঙ্গে আমার কথা আছে,’ বলে সে সিগারেটে টান দিয়ে চিহ্নিত ভঙ্গিতে বলে উঠল, ‘আমার বিশ্বাস বে-রহস্য সমাধানের জন্য আমরা নেমেছি সেটা আমাদের একার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব হবে না,’ বলে সে লোকটার অন্য দুই সঙ্গীর দিকে দেখল। ‘আর তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, আমাদের কমন শত্রু রয়েছে এখানে। একটা নয় দুটো, এবং বড় ভয়ংকর শত্রু,’ বলে সে আবার লোকটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। ‘রেলিক এবং নেত্রপালিশ।’

‘ভুলেও এর কথা শোন না,’ ওদের পাশে থেকে মেয়েটা চিৎকার করে উঠল। ‘এরা আমাদের ফাঁসিয়ে কাজ উদ্ধার করে, তারপর—’

বাশার মেয়েটাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে হেসে উঠল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল মেয়েটার দিকে, মেয়েটা কম্পিত হাতে অস্ত্র ধরে আছে বাশারের দিকে। বাশার বিনা দ্বিধায় তার অস্ত্রধরা হাতের দিকে আরো এগিয়ে গেল, মেয়েটার অস্ত্র ধরা হাতের শার্টের হাতাটা খানিক পিছিয়ে দিল বাশার

সিপাহী

নিজের আঙুল দিয়ে। মেয়েটার অস্ত্রটা বাশারের চোখ থেকে তিন ইঞ্চি দূরে এবং সেটা ভয়াবহভাবে কাঁপছে। এতটাই জোরে যে বাশারের মনে হলো, মেয়েটা না চাইলেও যেকোনো সময় গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। নিজের জ্যাকেটের ভেতরে ঘাম গড়াচ্ছে অনুভব করল বাশার। অস্ত্র ধরা হাতের কবজিতে একটা ট্যাটু আঁকা।

‘তোমরা সবাই একই গোত্র বা কাল্টের মানুষ,’ বলে বাশার অন্যদের দিকে দেখাল। ‘তোমরা কিছু একটা প্রটেকটর বা এমন কিছু। আমার বিশ্বাস তোমাদের কিছু আলাদা বিষয় রয়েছে যেটা আমাদের নেই। আর কোনো না কোনোভাবে ডেভিড এটা তোমাদের কাছ থেকে বের করে নিয়েছিল এবং সম্ভবত সে তোমাদের থেকে এমনি কিছু চুরি করেছিল বা কোনো না কোনোভাবে হাতিয়ে নিয়েছে, যা এখন আমরাও খুঁজছি এবং রেলিক ও নেক্রপলিশও খুঁজছে, কাজেই আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি।’

‘মোটাই না,’ লোকটা বলে উঠল, ‘অবশ্যই করতে পারি,’ বাশার মাথা নাড়িয়ে বলে উঠল। ‘আমার কাছে একটা অফার আছে। আমার বিশ্বাস তোমাদেরই দুই সঙ্গী আমার এর আগের অপারেশনে ধরা পড়েছিল। তোমরা যদি কো-অপারেট করো, তাদের ছাড়ানোর ব্যবস্থা করব আমি এবং তোমাদের প্রটেকশন দেব।’

‘রেলিক থেকে প্রটেকশন’ হেসে উঠল লোকটা।

‘আমি জানি ওরা অনেক ক্ষমতাবান কিন্তু এটাও মনে রেখো আমরা একসঙ্গে হলে আমাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি।’

‘বিনিময়ে?’ এই প্রথম অন্য মেয়েটা কথা বলে উঠল, তার পরনে চেক শার্ট। ‘কি চান আপনারা?’

‘বিনিময়ে কি চাই কেন চাই, এটা কথা নিয়ে বলতে হবে। পরিষ্কার করতে হবে সব এবং ডেভিড যা চুরি করেছিল সেটা উদ্ধারে সাহায্য করতে হবে।’

সবাই চুপ, যে যার মতো ভাবছে। ‘ডিল?’ বাশার জানতে চাইল।

‘ঠিক আছে ডিল,’ অন্য মেয়েটা বলে নিজের অস্ত্র নামিয়ে নিয়ে অন্যদের কপল অস্ত্র নামিয়ে নিতে। ‘আগে জিনিসগুলো উদ্ধার করা জরুরি। চলেন আগাই।’

অতীত

এমন বোকার মতো ধরা পড়বে কর্নেল ভাবতেও পারেনি। মেজাজ পুরো খারাপ হয়ে গেছে তার। রাগের সঙ্গে একবার সৈনিকদের দিকে দেখছে আরেকবার

নিজের লোকদের দিকে দেখছে। এই অভিযানে সে বারবার নিজের লোকদের ঝুঁকিতে ফেলেছে এবং এবার সম্ভবত সে তাদের প্রাণ বিনাশের দিকে এগিয়ে দেবে। আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়াল সে।

‘আরে কর্নেল এত আফসোস করো কেন?’ কর্নেলের পেছন থেকে পালোয়ান বলে উঠল। ‘ধরা পড়াতে একটা ব্যাপার ভালোই হইছে। আমরা তোমার বন্ধু ভিক্টরের কাছাকাছি তো যাইতে পারছি, কে জানে সুযোগ পাইলে হয়তো রাজা বিক্রমের কাছাকাছিও যাইতে পারব একই সময়ে,’ বলে সে জোরে জোরে হেসে উঠল। তার হাসি দেখে হেসে উঠল ত্রিলোক এবং সোলেমান। পিটার আর কর্নেলও মৃদু হেসে উঠল।

সৈনিকেরা ওদের নিয়ে প্রথমে সেই দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে যেটার ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল কর্নেল। তারপর ওরা সিঁড়ির মতো কিছু একটা নিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। খানিক ওপরে উঠে ওরা আরেকটা দূর করিডরের শুরু জায়গায় জমা হয়। আগের সৈনিকদের দলটা সেখানে অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। ওদের সবার সামনে ভিক্টর। ভিক্টরকে দেখতে বিপর্যস্ত লাগছে। কর্নেলের কাছে আবারো মনে হলো ভিক্টর স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। পেছনে সৈনিকদের দেখে মাথা নিচু করে ফেলল সে আবারো।

‘দুঃখিত বন্ধু আমি তোমাদের উদ্ধার করতে এসে—’ নিজের বাক্যটার শেষ করল না কর্নেল। সৈনিকদের দলটা ওদের নিয়ে শুরু জায়গাটা পার হয়ে খোলা ছাদের মতো একটা জায়গায় এলো—সেখান থেকে বাহিরে দেখা যাচ্ছে—কর্নেল তাকিয়ে দেখল নিচে অস্তিত দেড় শ থেকে দুই শ লাশ পড়ে আছে। বড় সাদা ঘোড়ার পাশে পড়ে থাকা মানুষটা মৌলভি, সেটা এতদূর থেকেও বুঝতে পারল সে। আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল কর্নেল। সৎ একজন মানুষকে ধোঁকা দিয়ে টেনে এনে খুন করা হয়েছে। শুধু খুন না গণহত্যা চালানো হয়েছে।

‘সবাই হুঁশিয়ার, আমরা রাজা বিক্রমের দরবারে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। কেউ বেয়াদবি করবে না। এই কুস্তাটারে বাহিরে রাখ,’ পালোয়ানের কুকুরটাকে দেখিয়ে বলে উঠল, তারপর ওদেরকে দুইদিক থেকে পাহারা দিয়ে রাজা বিক্রমের দরবারে নিয়ে ঢোকানো হলো।

দরবারে অনেক মানুষ বসে আছে, তাদের দিকে গোল হয়ে সবার আগে ওদের দেখে ফিরে তাকাল হ্যাংলা-পাতলা ভারী পোশাক পরা একজন মানুষ, মুখে পাকানো গোঁফ আর লম্বা দাঁড়ি গলায় মুক্তার মালা। মানুষটাকে দেখলেই কর্নেল বুঝল এটাই রাজা বিক্রম। ‘হ্যালো হ্যালো, রাজা মশাই,’ কর্নেল বিদ্রূপের সঙ্গে বলে উঠল। ‘দেখা তাহলে হয়েই গেল।’

সিপাহী

‘কর্নেল স্যাভার্স, আপনি আমার দরবারে!’ সে জোরে হেসে বলে উঠল ‘অথচ বন্দি হিসেবে। আপনার জন্য একটা উপহার আছে আমার কাছে,’ বলে সে ভিক্টরকে দেখাল, ‘যাকে খুঁজছিলেন সেই বন্ধুকে তো পেয়েছেন, আরেকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করুন।’

বলে সে দরবারে অন্যপাশে দেখাল। কর্নেল এই প্রথমবারে মতো খেয়াল করল বেশ কয়েকজন ইংরেজ বসে আছে সেখানে। একেবারে পুরোদস্তর ইউনিফর্ম পরা তার বন্ধু জনকে চিনতে না পারার কোনোই কারণ নেই।

‘জন! তুমি এখানে!’ বিস্ময়ে সঙ্গে বলে উঠল সে।

রাজা বিক্রমের দরবারে যখন এই নাটক চলছে, চাতালের ওপর থেকে দরবারের প্রতিটা দৃশ্য অবলোকন করছে দুজন মানুষ, মিস্তি আর কায়া।

বর্তমান

‘প্রথমে বলো, কি পেয়েছো তোমরা?’ বাশার জানতে চাইল। বাশারদের জিপটাকে এনে মাইক্রোর কাছে রাখা হয়েছে। ওরা এখন দুটো গাড়িতে মুখোমুখি করে দুটোর গায়ে হেলান দিয়ে আলাপ করছে।

‘আমার মনে হয় আগে আমাদের পরিচয় বিনিময় হওয়া উচিত,’ সেই মহিলা বলে উঠল, যে বাশারের সঙ্গে ডিল করতে সম্মত হয়েছিল। বাশার বুঝল এই মহিলাই দলের নেতা। সে ওর বয়সিই হবে, পরনে জিন্স, আর চেক শার্ট, ভারী চেহারা, গালে একটা বড় তিল। পুরুষ এবং অন্য মেয়েটার পরনেও প্রায় কাছাকাছি ধরনের পোশাক। ও অন্য দুজন বাশারের চেয়ে ছোটই হবে।

‘আপনারা যতটা বিস্তারিত বলতে চান বলেন, এরচেয়ে বেশি আমি জানতে চাইব না,’ বাশার দুই হাত তুলে বলল। আড়চোখে সামিরার দিকে দেখে নিল সে। সামিরার চোখে সম্মতি।

‘আপনি যা ধারণা করেছেন আমরা তাই, অনেক পুরনো একটা গোত্রের প্রতিনিধি আমরা, অনেকটা কাল্টের মতো। আমাদের পূর্বপুরুষ সেই প্রাচীন পার্শিয়া থেকে এসেছিল এ-দেশে। বিশেষ করে আমাদের গোত্রের দুটো শাখার মূলটা এসেছিল প্রাচীন পার্শিয়া থেকে, অন্যটা এসেছে মিশর থেকে। আমরা অনেক পুরনো কিছু সিঙ্কল এবং রহস্যের প্রতিনিধিত্ব করি। যেটাকে আমরা বলি পুরনো শক্তির প্রতিনিধিত্ব,’ বলে সে নিজের হাতের উলকি দেখাল।

‘দেখুন কাল্ট বা গোত্র বলতেই আমরা যা বুঝি আমরা সেরকম নই। আমরা স্রেফ নিজেদের কিছু রহস্যময় বিষয় লুকিয়ে রাখি, ব্যস। এর পেছনে আমাদের

পারিবারিক কিছু বিষয় আছে। যেটা আমরা বংশপরম্পরায় লালন করে এসেছি,' বলে মহিলা চোখ তুলে তাকাল বাশারের দিকে। 'আমাদের জন্য ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে, ধরেন আপনার মায়ের বা দাদার কোনো একটা রহস্য আছে, আপনি জানেন, যেটা উনি সর্বকরণে লালন করে এসেছেন। কারণ এই রহস্য ফাঁস হলে সমগ্র মানবজাতির জন্য হয়তো ক্ষতিকর কিছু হবে—'

'উপকারও তো হতে পারে?' রুশো বলে উঠল মহিলার কথার মাঝে।

'হ্যাঁ, সেটাও হতে পারে,' মহিলা মাথা নেড়ে বলে উঠল। 'বিষয়টা আসলে ক্ষতি বা উপকারের নয়। সত্যি কথা হলো আসলে কী হবে, আমরা জানিও না। তবে এতে পুরো মানবসমাজের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। এটা জানি। আর এ কারণেই যেকোনো মূল্যে আমাদের বংশপরম্পরা এই রহস্য লালন করা আমাদের জন্য কর্তব্য। আর সেটাই করে এসেছি আমরা।'

'আমি এখানে একটু যোগ করি,' ছেলেটা বলে উঠল এই পর্যায়ে। 'আমাদের পূর্বপুরুষ সেই শতবছর আগে প্রাচীন পার্শিয়া থেকে এসেছিল। এখানে বাঙাল মুন্সুকে তখন বারোভুঁইয়াদের রাজত্ব এবং প্রথমে তারা এখানে এসেছিল একজনের মাধ্যমে। বারোভুঁইয়ারা কোনো কারণে আমাদের পূর্বপুরুষের কাছে সাহায্য চেয়েছিল এবং সেই সাহায্য নাকি তাদের করতে হয়নি। তবে বারোভুঁইয়ারা তাদের সাহায্য করে এই মুন্সুকে অবস্থান গড়তে। কিন্তু সময়ের আবর্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বদলে গেছে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এবং কথিত আছে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের একাংশ আত্মদা হয়ে যে-রহস্য আমরা লালন করি, সেইটা তারা নিজেরা তাদের দায়িত্বে নিয়ে নেয় এবং সেখান থেকে পুরো গোত্রের বিষয়টা পরিচালনা করা হয় অনেকটা পারিবারিকভাবে খুবই গোপনে। যাই হোক, সিপাহী বিদ্রোহের পর, দেশভাগের সময়ে এবং একান্তরের আরো কিছু ঘটনা ঘটে এরপরে আমরা আরো গুটিয়ে নিই নিজেদের, ডেভিডের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত।'

'আমরা জানি না ডেভিড আসলে কীভাবে আমাদের সন্ধান বের করেছিল কিন্তু সে আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছায় এবং আমাদের বিশ্বাস আর্জন করে। সেই আমাদের জ্ঞানায় আমরা যা লালন করছি এরকম আরো বেশ কয়েকটা পরিবার বা গোত্র বা কান্ট রয়েছে, যারা এমনটা করেছে। সে কিছু প্রমাণও দেখায় এবং আমরা বিশ্বাসিত হই। এরপরে সে আমাদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে জিনিসগুলো ছিনিয়ে নেয় এবং পালিয়ে ময়মনসিংহে চলে আসে। আমরা যখন জানতে পারি সে ময়মনসিংহে আছে, আমরা আসার আগেই সে আবারো গায়েব হয়ে যায়।

সিপাহী

তার আসলে কী হয়েছিল, অনেক পরে এটা আমরা জানতে পারি আপনার কেসের মাধ্যমে যখন তার ডেডবডি তোলা হয় পুকুরের নিচ থেকে। সেখান থেকে আপনাকে অনুসরণ করে আমরা জানতে পারি কিশোরগঞ্জের কথা এবং সেখানে কী হয়েছিল, সেটা তো আপনি জানেন। আমাদের দুজন সঙ্গী ধরা পড়ে।’

‘বুঝেছি, বাশার মাথা নেড়ে বলে উঠল। ‘এটা তো নিশ্চিত যে তোমরা রেলিকের লোক নও। রেলিক এবং নেক্রপলিস আমার ফিয়ঙ্গে রিফাতকে অপহরণ করেছে এবং আমাদের কিছু কু দিয়েছে। আমাদের জিনিসগুলো উদ্ধার করার জন্য। না হলে—’

‘আমরা মোটামুটি সবই জানি, আমাদের ইনফরমার আছে আপনাদের ভেতরে। কিন্তু প্রশ্ন হলো আপনারা কি নিশ্চিত যে আপনারা এগুলো উদ্ধার করে নিজেদের কাছে রাখতে পারবেন।’

‘না, আমি নিশ্চিত নই, বাশার বলে উঠল। ‘তবে এটা নিয়ে এখন ভাবছিও না। কারণ আগে জিনিসগুলো উদ্ধার করা জরুরি। এখন প্রশ্ন হলো আপনারা কি পেয়েছেন?’

‘দুটো ডায়েরিকে এক করে লেখা মেসেজগুলো পড়ে আমরা একটা লোকেশনের ব্যাপারে জানতে পেরেছি,’ বলে মেয়েটা সামনের দিকে দেখাল। ‘লোকেশনটা স্পেসিফিক ওখানে দেখাচ্ছে। বাশারসহ অন্যরা উঁকি দিয়ে দেখল একটা উঁচু টিলার মতো জয়াগাটা।

‘চলো দেখি কী অপেক্ষা করছে ওখানে আমাদের জন্য।’

অতীত

কর্নেল মনে মনে অনেককিছু ভেবেছিল কিন্তু রাজা বিক্রম সিংয়ের দরবারে এমন কিছু অপেক্ষা করছে তার জন্য কল্পনাতেও ভাবতে পারেনি। দরবারের অন্যপাশে আসলে একাধিক ইংরেজ নয়, বরং ইংরেজদের রীতিমতো একটা দল রয়েছে। অস্ত্র আট-দশজন সৈনিক এবং রাজার দরবারে অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে বসে রয়েছে কোম্পানির সেই প্রতিনিধি এডওয়ার্ড এবং তার ঠিক পাশেই আরেকজন ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, কর্নেলের বন্ধু জন।

‘জন,’ নিখাদ বিন্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল কর্নেল।

‘হেয়ার ইউ আর, স্যার্স,’ বলেই জন অনুভব করল কোথায় আছে সে। তারপর স্থানীয় ভাষায় বলে উঠল। ‘প্রিয় বন্ধু স্যার্স, নাহ সত্যিই তুমি আমাকে

গল্প শেষের শুরু

হতাশ করলে এবার,' বলে সে মাথা নাড়তে লাগল। 'তুমি আমাকে এভাবে হতাশ করবে আমি ভাবতেও পারিনি। সেই সুদূর ইংল্যান্ড থেকে তোমাকে এত ঘটা করে নিয়ে এলাম আর শেষ পর্যন্ত কি না তোমার আগে আমিই উদ্ধার করলাম আমার বন্ধু ভিক্টর এবং তার খুঁজে পাওয়া রহস্যের চাবিকাঠি,' বলে সে টেবিলের ওপরে একটা থলে দেখাল। 'তার আবিষ্কার।'

'আর আমার বন্ধু ভিক্টর, এত প্রতিভা,' বলে সে মুখ দিয়ে চুক চুক করল। 'সব জলে। অবশ্য এই আবিষ্কার তোমারই যেটা আমরা নিয়ে যাব।'

'তারমানে ভিক্টর যে-অজ্ঞাগার উড়িয়ে দিয়ে মানুষ হত্যা করেছিল এটা মিথ্যে?'

'অজ্ঞাগার ভিক্টর উড়িয়েছিল, কিন্তু সেখানে ইংরেজ কিছু সৈনিক আর পাহারাদার বাদে কেউ ছিল না। সাধারণ সব মানুষকে ভিক্টর আগেই নৌকায় তুলে ফেলেছিল। ওদেরকে নিরাপদে রওনা করিয়ে পরে সে আর্থারের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সাধারণ মানুষ হত্যার বিষয়টা ছড়ানো হয়েছিল ভিক্টরকে বিপজ্জনক প্রমাণ করার জন্যে।'

'আমি একটা জিনিস বুঝলাম না,' কর্নেল বলে উঠল। 'তুমিই এই পর্যন্ত পৌছাতে পারলে, তাহলে আমাকে এর সঙ্গে জড়ানোর দরকার কি ছিল?'

হেসে উঠল জন। স্যান্ডার্স তুমি একটা বোকা। তবে আমি যে এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি এটা তো তোমার কারণেই। তুমি প্রাথমিক তদন্ত করে কু না দিয়ে। আর্থারের বিষয়টা বের না করলে আমরা এই পর্যন্ত আসতাম কীভাবে? তুমি কু দিয়েছিলে বলেই তো রাজা বিক্রমের ব্যাপারে আমরা অনুমান করতে পেরেছিলাম এবং তারপর রাজার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করে করে দুটো জিনিসের পরিকল্পনা করার সুযোগ পাই। এক, মৌলবিকে নিকেশ করা। দুই, ভিক্টর এবং তার আবিষ্কার হস্তগত করা। বিনিময়ে ভারতবর্ষে আমরা ক্ষমতা আবার ফিরে পেলে রাজাকে এই অঞ্চলের শাসক বানাব। আর তার জন্যে বিশেষ কিছু উপহার তো এনেছিই,' বলে সে দরবারসংলগ্ন ছোট ছাদের দিকে দেখার। সেখানে মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে কিছু একটা।

'সত্যি কথা হলো কর্নেল, যদিও আমরা শত্রু, তা-ও আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অপরিসীম,' রাজা বিক্রম বলে উঠল। 'আপনার কারণেই এসবকিছু সম্ভব হয়েছে।'

'প্রশ্ন হলো, ভিক্টর যা খুঁজে পেয়েছিল, সেটা তোমাদের জন্যে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?'

সিপাহী

‘ঠিক আছে, এই প্রশ্নের উত্তর খানিক আমি দেই,’ রাজা বিক্রম বলে উঠল। ‘বাকিটা মিস্টার জন দিবে। আপনাদের বন্ধু ভিক্টর প্রাচীন গোত্র থেকে যা খুঁজে পেয়েছে, এটা অনেকটা প্রতীকের মতো। আমি বা আমার মতো স্থানীয় রাজা, যারা প্রকৃত ক্ষমতার অনুসন্ধান করে, আমরা বহুদনি ধরে এরকম প্রতীকের সন্ধান করে আসছি দুটো কারণে। প্রথমত, এই আঙটি অনেক পুরনো এক শক্তির ধারক, এর মাধ্যমে এরকম আরো বেশ কিছু প্রতীকের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। এটা আমাদের আশ্রয়। আর কোম্পানি কেন আশ্রয়ি, সেটা মিস্টার জন আরো ভালো বলতে পারবেন,’ বলে সে জনের দিকে দেখাল।

‘যদিও আমার ব্যাখ্যা দেয়ার কোনো কারণ নেই, তাও পুরনো বন্ধুর জন্যে এটুকু তো করতেই পারি,’ মাথা নেড়ে বলে উঠল জন। ‘ভারতবর্ষে আমাদের ক্ষমতার অনেকগুলো উৎস রয়েছে, ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে, এই উৎসগুলো নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। এর ভেতরে অনেকগুলোর ওপরে আমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকলেও অনেকগুলোর ওপরে আবার নেই ও। এর মধ্যে অন্যতম হলো স্থানীয় অনেক গোত্র। প্রথমে পাস্তা না দিলেও ফকির বিদ্রোহের সময়ে আমরা প্রথম অনুধাবন করি, ভারত শাসন করতে হলে এসব গোত্রের ওপরে নিয়ন্ত্রণ পাওয়া কতটা জরুরি। কিন্তু দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও, এদের ওপরে আমরা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। যেখানে ভিক্টর সফল হয়। ওর ওপরে দায়িত্ব ছিল, গবেষণার চলে এসব গোত্রের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে ওদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার চাবিকাঠি খুঁজে বের করা। ভিক্টর সেটা করেও কিন্তু একসময় সে এসব গোত্রের প্রেমে পড়ে গিয়ে আমাদের সঙ্গে বেঈমানি করে। যাই হোক, রাজা বিক্রম যে-প্রতীকের কথা বলছেন, এই প্রতীক বা আঙটি যাই বলি না কেন, এর যে-ক্ষমতা বা শক্তি যাই থাক না কেন, আমাদের জন্যে এই প্রতীক এসব গোত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা চাবি হতে পারে। সেইসঙ্গে এর যদি কোন বস্তুগত মূল্য বা আরো বড় কোন অর্থ থাকে তবে সেটা হলো উপরি পাওনা। কাজেই বুঝতেই পারছো কেন ভিক্টর এবং তার আবিষ্কার আমাদের জন্যে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’

‘আচ্ছা বুঝলাম এখন আমাদের নিয়ে কী করবে?’

‘তোমার সঙ্গীদের সবাইকে হত্যা করা হবে, মৌলবির বাহিনীকে যেমন নিকেষ করা হয়েছে, আর ভিক্টরকে রাজবন্দি হিসেবে নিয়ে যাওয়া হবে।’

‘প্রথম কথা ভিক্টর অসুস্থ, ওর সেবা প্রয়োজন চিকিৎসা প্রয়োজন। এমন অসুস্থ একজন মানুষ তার সঙ্গে এমন জঘন্য আচরণ,’ কর্নেল আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল। আর দ্বিতীয় কথা, আমাকে নিয়ে কি তুমি হজম করতে পারবে?’ কর্নেল গৌফে তা দিয়ে বলে উঠল।

গল্প শেষের শুরু

জন উঠে এলো কর্নেলের কাছে, একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে উঠল। ‘স্যার্স আমি যা খুঁজে পেয়েছি এটা কোম্পানির হাতে একবার তুলে দিলে আমি ঠিক কতটা ক্ষমতার অধিকারি হবো, তোমার কোন ধারণা রয়েছে! আর একবার সেটা হলে, তোমাকে নিকেশ করা কোন ব্যাপারই না। কারণ আমার বিশ্বাস ভিক্টরের মতো তুমিও ক্ষতিকর হয়ে উঠছে দিন দিন।’

কর্নেল নিজের লোকদের দিকে দেখল। সে ভেবেছিল ওরা মৃত্যু ভয়ে কাবু হয়ে থাকবে, কিন্তু সবাই রাগে ফুঁসছে। কর্নেল তাদের দিকে তাকাতেই এক ধরনের কষ্ট অনুভব করল। ওদের সেই নিয়ে এসেছে, এখন এরা মৃত্যুর দাঁড় প্রাপ্তে। নিজের মৃত্যুর জন্যে কর্নেল কেয়ার করে না, কিন্তু সঙ্গীদের জন্যে। কর্নেল ভাবছে কোনোভাবে ওদের প্রাণভিক্ষা চাওয়া যায় কি না রাজা বিক্রম বা জনের কাছে। ‘দেখো—’ কর্নেল বলার আগেই কাছেই কোথাও পাখি ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ছোট কিছু একটা এসে গড়িয়ে পড়ল দরবারের ঠিক মাঝে, পটকা ফাটার মতো শব্দ আর ধোঁয়ায় ভরে গেল চারপাশটা।

বর্তমান সময়

নতুন বাজার ল্যাব, ময়মনসিংহ

মোবাইলের রিংটোন শোনামাত্র জয়া ভেবেছিল বাশার কল করেছে, কিন্তু আসলে পাটোয়ারির মোবাইলে অন্য কেউ করেছে। কথা বলা শেষ করে পাটোয়ারি জয়ার দিকে ফিরে বলে উঠল, ‘আইচ্ছা কই জানি ছিলাম আমরা। চিন্তামণি। বাংলায় সার্চ করে তো কিছু পাওয়া গেল না। এবার ইংরেজিতে সার্চ করে দেখি,’ বলে পাটোয়ারি ইংরেজিতে সার্চ করাতেই ঙ্গ কুঁচকে উঠল। সে কিছুক্ষণ নীরবে লেখাপুলো পড়ে, জয়ার দিকে ফিরে বলে উঠল। ‘আলী আজগর ভুল বলে নাই। চিন্তামণির ব্যাপারটা যত সহজ মনে অইতেছিল আসলে তা না। খুব হালকাভাবে দেইখাই আমার মনে অইতাছে চিন্তামণির ভেতরেই সব রহস্য লুকায়ে আছে। বিশেষ কইরা চিন্তামণি আর আকাশ খেইকা পতন—এই দুইটার মধ্যে পরিষ্কার একটা যোগাযোগ আছে। প্রশ্ন হইল হ্যারি পটারের প্রথম বই দিয়া আসলে আলী আজগর কী বুঝাইল?’ পাটোয়ারি তাকিয়ে রয়েছে জিনের দিকে কিন্তু সে যে ভাবছে এটা তার কুঁচকানো ঙ্গ দেখলেই বোঝা যায়।

‘স্যার সবই এক সূত্রে গাঁথা,’ জয়া সরকার বলে উঠল। ‘আলী আজগর যা বলেছে সেগুলো একভাবে বলতে গেলে মৃত্যুর আগের একজন মানুষের বলা শেষ কথা। সে জানত সে মারা যাচ্ছে, কাজেই সে মিথ্যে বা ভুল বলার কোনো

সিপাহী

কারণ নেই, প্রলাপ বকার তো প্রশ্নই আসে না। আর সে যা বলেছে, সেগুলো যে ঠিক তার প্রমাণ এর মধ্যেই আমরা পেতে শুরু করেছি। কাজেই সবগুলোই এক সূত্রে গাঁথা এবং সে যা বলেছে সেটা যে গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।’

পাটোয়ারি সম্মতির সঙ্গে মাথা নাড়ল। ‘আমরা আসলে এহনো সব ধরতে পারতাম না, আমার মনে অয় সে যা বলেছে সবগুলোই এক করতে পারলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে। আর যদি এইটা সত্যিই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরান রহস্যগুলোর একটা হয়, এত সহজ হওয়ার কথাও না। তবে বিষয়টা যাই হোক এইটা সম্ভবত আমগো হাতের খুব কাছে চইলা আসছে।’

‘একদম ঠিক স্যার,’ জয়া ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আরো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আবারো পাটোয়ারির মোবাইল বাজতে লাগল। সে সেটা রিসিভ করে কথা বলে জয়ার দিকে ফিরে হেসে বলে উঠল। ‘ছবির খবর আসছে, ই-মেইলে পাঠাইছে। দেখি কী পাইল,’ সে ই-মেইল ওপেন করে, ছবিটা প্রথমে ভালোভাবে দেখল, তারপর ল্যাপটপটা জয়ার দিকে ফিরিয়ে বলে উঠল, ‘দেখো, আমরা দুনিয়ার সবচেয়ে পুরান রহস্য সন্ধান করতামি আর আমগো মধ্যে কত বড় রহস্য লুকাই আছে।’

জয়া চোখ গোল গোল করে দেখল এবং তার প্রথম রি-অ্যাকশন, ‘বাশারকে সাবধান করে দিতে হবে।’

‘আর ছবিতে থাকা অন্য মানুষটা,’ পাটোয়ারি বলে উঠল। ‘ভাবতে পারো এই লোক এই ছবিতে।’

‘এখন আমরা জানি কে পুরো বিষয়টার কলকাঠি নাড়ছে, কার ইশারায় ঘটছে সব।’

ধানমতি, ঢাকা

প্রফেসর ইফতেখারের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে আনোয়ার পাশা যখন বেরিয়ে এলো কামরা থেকে, তার চেহারা তখন একই সঙ্গে বিন্ময়, ভয় এবং উচ্ছ্বাস বেলা করছে।

‘স্যার, কি বললেন প্রফেসর ইফতেখার?’ মৌসুমি প্রশ্ন করল হাবিব আনোয়ার পাশার কাছে।

আনোয়ার পাশা সিগার ধরিয়ে চূপচাপ টানতে লাগল। এটা যে হাসপাতাল ভুলে গেছে সে। মৌসুমির প্রশ্নেরও কোনো উত্তর দিল না সে। ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে সিগার টানছে।

‘স্যার, কি বললেন উনি?’

‘মৌসুমি প্রথমেই প্রফেসর ইফতেখারের সিকিউরিটি বাড়াও,’ বলে সে কয়েক কদম এগিয়ে এলো। ‘বাশারের খবর নাও, সিলেট আর চট্টগ্রামের অপারেশন শুরু করতে বলো তানভীর আর শারিয়ারকে। আগে যেটা বলেছিলাম ভুলে যাও, এটাকে ব্রাইন্ড অপারেশনই করা হবে, কিন্তু স্রেফ আমি জানব ওরা কোথা থেকে কই যাচ্ছে।’

মৌসুমি তাকিয়ে রইল আনোয়ার পাশার দিকে। ‘অবশ্যই স্যার।’

নতুন বাজারের ল্যাব, ময়মনসিংহ

জয়া এবং পাটোয়ারি তো বটেই, রমিজ দারোগা, কনস্টেবল আবদুল্লাহ সবাই তাকিয়ে রয়েছে ছবিটার দিকে, ইনসপেক্টর রবিউলও।

‘ছবিতে এই লোক ক্যামনে আইলো?’ রমিজ দারোগা জানতে চাইল। ‘রুশো নামের যারে আমরা চিনি, এত পুরান এই ছবিতে সে ক্যামনে আইলো?’

জয়া বড় করে দম নিল, ‘যা বুঝতে পারছি এই ছেলে শুরু থেকেই আমাদের বোকা বানাচ্ছে। রিফাতের সঙ্গে কাজ করা, রিফাতের অপহরণের সময় গুলি খাওয়া, আমাদের সঙ্গে নিজ থেকে অগ্রহী হয়ে তদন্তে যোগ দেয়া সবই ছিল এর নাটক,’ বলে সে কথা থামিয়ে দুবার ঢোক গিলল। ‘আমার ধারণা যদি ভুল না হয় আলী আজগর রেলিকের যে বসের কথা বলছিল, প্রডিজি কিং যার নাম—এই রুশোই সেই প্রডিজি কিং।’

‘যদি তাই হয় তাহলে বাশার স্যারেরা তো তাইলে মহা বিপদের মধ্যে আছে,’ কনস্টেবল আবদুল্লাহ মন্তব্য করল চিন্তিত ভঙ্গিতে।

জয়া মাথা নেড়ে বলে উঠল, ‘কোনোভাবে বাশারকে সাবধান করতে না পারলে সর্বনাশ হবে,’ সে ইনসপেক্টর রবিউলের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কিছু কি করা যায়?’

‘আমি চেষ্টা করছি।’

‘ছবিতে অন্য এই লোকটা কে?’ কনস্টেবল আবদুল্লাহ জানতে চাইল।

জয়া জবাব দেওয়ার আগেই পাটোয়ারি বলে উঠল। ‘এইটা হাবিব আনোয়ার পাশা, স্পেশাল উইংয়ের প্রধান,’ বলে সে মাথা নাড়ল। ‘যার হাত ধরে এই সব কিছুর শুরু,’ বলে সে খেমে বড় করে একবার দম নিল। ‘আজ সকালে তার সঙ্গে ফাইন্যান্সিয়ারদের চুক্তি সম্পন্ন হইছে। এই মুহূর্তে এই লোক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং,’ মনে হতে লাগল পাটোয়ারি দম নিতে

সিপাহী

পারছে না ঠিকমতো। 'পুরান এই লোকের এই ছবিতে উপস্থিত থাকা ধারণা দেয়, সম্ভবত সেই সবকিছুর নাটের গুরু,' তার চোখে কোনো ভাষা নেই।

ল্যাব রুমে উপস্থিত সবাই বসে আছে স্থানুর মতো।

অতীত

অদ্ভুত পরিস্থিতিতে কর্নেল মৃত্যুকে অনেকটা মেনেই নিয়েছিল, স্রেফ একটাই আফসোস কাজ করছিল তার ভেতরে, নিজের লোকদের বাঁচাতে পারবে না। নিজের অসুস্থ বন্ধু ভিক্টরকে বাঁচাতে পারবে না। নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলও যদি ওদেরকে রক্ষা করতে পারতো তাহলে আর আফসোস থাকত না।

মৃত্যু যখন সন্নিহিত, সেই সময়ে শিসের শব্দটা শোনামাত্র সে ধরতে পারল এটা অবশ্যই অবশ্যই কায়া কিংবা মিস্তির থেকে এসেছে। এর মানে অবশ্যই ওরা কিছু একটা করার চেষ্টা করবে।

শিসের শব্দটা শোনামাত্রই নিজের লোকদের দিকে একবার তাকানোর সুযোগ পেল কর্নেল, সে অনুধাবন করতে পারল শব্দটা ওরাও শুনেছে এবং জোরদার সম্ভাবনা ওরাও সতর্ক হয়ে উঠেছে। কারণ এই শব্দের সঙ্গে ওরাও কমবেশি পরিচিত। কর্নেলও ওদের দিকে তাকাল আর সঙ্গে সঙ্গে কোনোদিক থেকে ছুটে এল একাধিক ছোট বলের মতো কিছু। বলগুলো ওদের দিকে ছুটে এসে একেবারে দরবারের মাঝামাঝি গিয়ে পটকা ফাটার মতো বিস্ফোরিত হলো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গলগল করে ধোঁয়া বের হতে শুরু করল ওগুলো থেকে। শিসের শব্দ এবং বলগুলোর ছুটে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা জানত কী ঘটতে চলেছে। বলগুলো গড়িয়ে আসতেই কর্নেল সরে গেল দরবারের কেন্দ্র থেকে যতটা সম্ভব দূরে, এবং নিজের লোকদের দিকে ইশারা করেই মাটিতে গুয়ে পড়ল ওরা। এটা মিস্তিই ওদের বলে দিয়েছিল, এতে করে হাতবোমার আঘাতের প্রকোপ কমে যায়, বিষাক্ত ধোঁয়াও কম ক্ষতি করে। কর্নেল লাফ দিতেই তার লোকেরাও গুয়ে পড়েছে যে যেখানে পেরেছে। ব্যাপারটা সম্ভবও হয়েছে। কারণ, ওদের বন্দি করলেও রাজা বিক্রমের লোকেরা হাত বাঁধেনি। এর পেছনে কারণ ছিল এত সৈনিকের মাঝে ওরা কিছু করতে পারবে লোকগুলো ভাবতেও পারেনি। এর ফলও ভোগ করল ওরা।

হাতবোমাগুলো ফাটতেই কর্নেল এক হাতের কনুই ভাঁজ করে, নাকটাকে যতটা সম্ভব আড়াল করে সামনে এগোল। এটাও মিস্তির নির্দেশনা। এতে করে চোখটা খুব বেশি বাঁচাতে না পারলেও নাক-মুখ বাঁচবে কিছুটা। অন্তত অন্যদের

চেয়ে কম আক্রান্ত হবে ওরা। কর্নেল এগোতে গিয়ে খকখক করে কাশতে থাকা এক সৈনিকের হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিয়ে ওটা তারই বুকে বসিয়ে দিয়ে, সামনে এগোল তার বন্ধু জনের খোঁজে। দরবারের লোকজনের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ, কারণ বোমাটা ফেটেছে তাদের একেবারে মাঝে। দেহরক্ষীরা পাহারা দেবে কি, নিজেদেরই অবস্থা খারাপ। এগোনোর পথে অরেকজনের হাত থেকে তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে সেটা দিয়ে এক কোপে সৈনিকটাকে ফেলে দিতেই কর্নেল সামনে দেখতে পেল তার বন্ধু জন আর কোম্পানির প্রতিনিধি এডওয়ার্ডকে।

ওদের দিকে এগোতে যাবে, একেবারে কর্নেলের সামনে পড়ে গেল রাজা বিক্রম। কর্নেল তলোয়ার তুলল তার দিকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার দু পাশ দিয়ে দুটো ছায়া তারচেয়েও দ্রুত বেড়ে এগিয়ে গেল রাজা বিক্রমের দিকে। ছায়া দুটো কর্নেলকে পার হওয়ার সময়ে একটা ছায়া কর্নেলের কানে ফিস ফিস করে বলল, 'বিক্রম আমাদের শিকার,' কর্নেল মিস্তির কথায় মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে ফিরে তাকাল জন আর এডওয়ার্ডের দিকে। জন খানিক পিছিয়ে আর এডওয়ার্ড একেবারে ওর সামনে। কর্নেল সোজা বর্শাটা চালিয়ে দিল এডওয়ার্ডের বুকে, শেষ মুহূর্তে হাত তুলে সে ঠেকাতে চেয়েছিল আঘাত, তার হাতের তালু ভেদ করে স্বর্ষপিণ্ডের ভেতরে ঢুকে গেল বর্শার ফলা। 'কোম্পানির লোকজন কোনোদিনই পছন্দ না আমার,' কর্নেল তার কথা শেষ করার আগেই গুলি খেয়ে তার হাত থেকে ছুটে গেল বর্শাটা। হাত ঝাড়া দিতে দিতে দেখল জন গুলি করেছে, কিন্তু ধোঁয়ার ভেতরে লাগাতে পারেনি, বর্শার হাতলে লেগেছে।

খোলা তলোয়ার হাতে জনের দিকে এগিয়ে গেল কর্নেল। জন পিঙ্কল ফেলে আরেকটা অস্ত্র বের করে আনতে যাচ্ছিল, কর্নেল এক কোপে তার পিঙ্কল ধরা হাতটা আলাদা করে ফেলল। ডান হাত হারিয়ে তারদ্বরে চাঁচিয়ে উঠল জন। 'আমাদের বন্ধুত্বের জন্য,' বলে সোজা গলা বরাবর তলোয়ার চালান কর্নেল। জনের বিখণ্ডিত মস্তকের রক্তের ছিটেয় চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল কর্নেলের। ফিরে তাকাল সে দরবারের দিকে।

জন, এডওয়ার্ড আর বিক্রম তিনজনেই শেষ। মিস্তির হাতে ধরা একটা থলে থেকে রক্ত পড়তে দেখে কর্নেল অনুমান করল, ওটার ভেতরেই বিক্রমের মাথা। কর্নেলের দিকে তাকিয়ে ছোট একটা বটুয়া দেখিয়ে কায়া সেটা ঢুকিয়ে রাখল নিজের পোশাকের ভেতরে। সোলেমান, পালোয়ান, পিটার, ত্রিলোক সবাই লড়াই করেছে সৈনিক আর গ্রহরীদের সঙ্গে। হাতবোমার ধোঁয়া কেটে যেতেই কর্নেল দেখল দরবারের ঠিক মাঝে গোল হয়ে লড়ছে ওরা, আর

সিপাহী

চারপাশ থেকে ওদের ঘিরে ধরেছে বিক্রমের সৈনিক প্রহরী দেহরক্ষী আর সাদা চামড়ার সৈনিকেরা। নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারলেও পালানোর পথ নেই, চারপাশ থেকে বন্দি হয়ে গেছে ওরা।

ধোঁয়া কেটে যেতেই চারপাশে তাকিয়ে নিজেদের যতটা সম্ভব সামলে নিয়ে সবাই অনুধাবন করল বিষয়টা।

‘হয় মুক্ত হবো আর না হয় জ্ঞান দেব,’ বলে চিৎকার করে আক্রমণ চালান কর্নেল। সঙ্গে সঙ্গে দরবারের সৈনিকদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই মিলে।

বর্তমান

‘কি মনে হয় কী আছে পাহাড়ের ওপরে?’ ছোট টিলাটার একেবারে নিচ থেকে প্যাচানো সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। সেটা দিয়ে উঠতে উঠতে বাশার প্রশ্নটা করল তার পাশে হাঁটতে থাকা কান্টের সেই চেক শার্ট মহিলাকে।

‘কোনো ধারণা নেই,’ মহিলা মাথা নেড়ে অপারগতা প্রকাশ করল। ‘ডেভিড আসলে কী করেছে, কীভাবে জিনিসগুলো সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেছে কে জানে।’

‘সেটাই,’ রুশো বলে উঠল ওদের পেছন থেকে। ‘ওপরে না গেলে কিছুতেই বোঝা সম্ভব নয়।’

বাশার আর চেক শার্ট মহিলা, ওদের ঠিক পেছনেই রুশো সামিরা, টমি আর কান্টের বাকি দুজন। সবাই সারি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল টিলার ওপরে। ‘একটা চার্চ,’ বাশারই প্রথম টিলার ওপরে পা রাখল টিলার ওপরে। এতগুলো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে খানিক দম হারিয়ে ফেলেছে ও। ‘একটা চার্চে সংরক্ষণ করেছে সে ওগুলো, কিন্তু কীভাবে?’ বাশারের গলায় জেনুইন কৌতূহল।

‘ব্যাপারটা সেন্স মেইক করে, ডেভিড নিজে ক্যাথলিক ক্রিস্টিয়ান ছিল, অ্যাগ্নি ডার্সিটিতেও সে একটা ক্রিস্টিয়ান কবরের ফলকের ভেতরে চাবিটা রেখেছিল। আর এই এলাকা যেহেতু ট্রাইবাল কমিউনিটির এবং তাদের অনেকে ক্রিস্টিয়ানিটির অনুসারী, এখানে চার্চ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং কোনো না কোনোভাবে সে সেটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে।’

‘আপনারা কি কাউকে খুঁজছেন?’ হঠাৎ কেউ একজন বলে উঠল ওদের পেছন থেকে। মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ, লুঙ্গি আর স্যাভো গোল্ডি পরনে, কাঁধে একটা ছোট লাল গামছা আর হাতে ধরা ছোট একটা ছুরি। চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। লোকটা নিশ্চিত পঁয়াজ কাটছিল।

‘ইয়ে, আমরা আসলে,’ বাশার ঠিক কী বলবে বুঝতে পারছে না। ‘মানে আমরা আসলে একজনকে খুঁজে এসেছিলাম। কিন্তু ভুল জায়গায় এলাম কি না,’ সে সমর্থনের আশায় অন্যদের দিকে তাকাল। ‘আমাদের বন্ধু ডেভিড আসলে—’

‘আপনারা ডেভিডের বন্ধু,’ লোকটা গামছা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চট করে চোখ তুলে তাকাল ওদের দিকে। ‘আমি এই চার্চের ফাদার।’

‘ফাদার,’ বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল টমি। ‘আপনাকে ঠিক ফাদার—’

লোকটা হেসে উঠল, ‘আমি জানি, টিভি-সিনেমা দেখে যেমন মনে হয় আমি এখন অস্তুত ওরকম না দেখতে।’

‘সেটাই, লুজি আর স্যাভো গচ্ছিতে ফাদার ভাবতে পারি না আমরা,’ বাশার বলে উঠল। ‘ফাদার আসলে ডেভিডের বিষয়ে—’

‘আপনাদের কিছুই করতে হবে না, আপনাদের বন্ধু হোক বা শত্রু মিস্টার ডেভিডের কিছু জিনিস গচ্ছিত আছে আমাদের কাছে, সেটা আপনাদের দেয়ার নির্দেশ আছে আমার ওপরে।’

‘সত্যি!’ অবাক হয়ে বলে উঠল বাশার। ‘আমি ঠিক বুঝলাম না,’ এত কাহিনি করে এখানে এসে এত সহজে জিনিসগুলো পেয়ে যাবে ভাবতে পারেনি বাশার।

‘জিনিসটা অবাক লাগতে পারে, আমি আপনাদের বুঝিয়ে বলছি,’ বলে সে টিলার ওপরে ছোট চার্চটা দেখাল। ‘যে-চার্চটা দেখছেন, এটা মিস্টার ডেভিডের প্রতিষ্ঠা করা। এই এলাকাতে ট্রাইবাল কমিউনিটির জন্য নির্দিষ্ট এবং পাকা কোনো চার্চ ছিল না। মিস্টার ডেভিড এই চার্চ নিজে বানিয়ে দেন এবং তার একটা ব্যাগ আমাদেরকে দিয়ে বলেন এটা গচ্ছিত রাখতে, এক সময় কেউ আসবে এটার সন্ধান নিতে, তাদের দিয়ে দিতে। উনি যেহেতু নির্দিষ্ট করে কারো বিবরণ দেননি বা কাকে দিতে হবে বলেননি আর অনেক অনেক সময় পার হয়ে গেছে, কাজেই তার ব্যাগটা আপনাদের দিতে আমার আপত্তি নেই, আপনারা প্রাক্তণেই অপেক্ষা করুন, আমি নিয়ে আসছি,’ বলে সে চার্চের পাশের ছোট একটা এক কামরার ঘরের দিকে চলে গেল। বাশার অনুমান করল ওটাতেই থাকে সে।

‘বুঝলাম না!’ মাথা নেড়ে বলে উঠল বাশার। ‘যে-জিনিসের জন্যে এত হাঙ্গামা, সেগুলো এত সহজে পেয়ে যাবো ভাবতেই পারিনি।’

‘গ্রেট জব গাউজ, অস্তুত জিনিসগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে।’

‘আমার ধারণা ডেভিড গোপনে রাখার জন্যে এখানে রেখে গিয়েছিল, তার নিজেরই আসার ইচ্ছে ছিল কিন্তু হঠাৎ মারা যাওয়াত সেটা আর পারেনি।’

সিপাহী

দশ-পনেরো মিনিটের ভেতরে ফাদার একটা পুরনো লেদার ব্যাগ এনে ধরিয়ে দিল ওদের হাতে। ‘আমি ছায় মুক্ত হলাম,’ বলে সে একটা হাসি দিল, মানুষটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অন্যদের দিকে ফিরে বাশারও একটা হাসি দিল। ‘কি মনে হয় কি আছে ব্যাগে?’

কেউ জবাব দেয়ার আগেই ওদের মাথার ওপরে একটু আগে দেখা হেলিকপ্টারটা এসে ছিন্ন হলো। ওরা সতর্ক হওয়ার আগেই ওটা থেকে নেমে এলো একাধিক দড়ি, ওগুলো বেয়ে নেমে আসছে পুরোদোস্তর কমান্ডার পোশাকে সজ্জিত মিলিটারির মতো সৈনিকদল।

অতীত

সৈনিক আর কর্নেলের বাহিনীর ভেতরে লড়াইটা হলো রক্তক্ষয়ী, হিংস্র এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ। রক্তক্ষয়ী কারণ কর্নেলের বাহিনীর জন্য এটা প্রাণের লড়াই, টিকে থাকার লড়াই। ওরা জানে ধরা পড়লেও মরতে হবে, লড়াই করলেও মরতে হবে, কাজেই লড়াই করেই মরা ভালো, আর এ কারণেই হিংস্র আক্রমণ চালান তারা, আর অসামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ বিক্রম সিংয়ের বাহিনীর তুলনায় তারা সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য।

দরবারে কর্নেলের দলটাকে ঘিরে ফেলতেই ওরাও গোল হয়ে গেল, যাতে চারপাশের আক্রমণ ঠেকাতে পারে। ওদের সামনে-পেছনে মিস্ত্রি ও কায়ী, ওদের মাঝখানে ভিক্টর। ঘেউ ঘেউ করে পালোয়ানের কুকরটা এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে।

পালোয়ানের একহাতে বর্শা, অন্যহাতে একটা তলোয়ার খুলে আনা পেতলের পায়ী, সোলেমানের দুই হাতেই তরবারি, পিটারেরও তাই, ত্রিলোকের হাতে ধরা একটা উলটানো বন্দুক। ওদের ঘিরে ধরলেও আক্রমণ চালান কর্নেলই প্রথম। সে তার বাঁ হাতে ধরা একটা উঠিয়ে আনা বন্দুক দিয়ে গুলি চালান, আর সোলেমান তলোয়ার হাতে আক্রমণ করল। দুই পাশে দুজনার সম্মিলিত আক্রমণে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেড়ে গেল। চারপাশে পেতলের সঙ্গে লোহার, লোহার সঙ্গে কাঠের, কাঠের সঙ্গে ফলার সংঘর্ষের আওয়াজ।

কিছুক্ষণ লড়াই করেই কর্নেল বুঝল এই লড়াইতে টেকার কোনো উপায় নেই। সে চিৎকার করে নির্দেশ দিল সবাই যাতে দরবারের সঙ্গে সংলগ্ন ছাদের দিকে এগোতে থাকে। ভিক্টরকে মাঝে রেখে ওদের দলটা আক্রমণ করতে এবং ঠেকাতে ঠেকাতে ছাদের দিকে সরে গেল খানিকটা।

কর্নেল দেখল, ছাদের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। সে দেখতে গিয়ে দৃষ্টি সামান্য হটেছিল, তাতেই একপাশ থেকে তাকে গুলি করল একজন, কর্নেলের ঠিক পাশেই ছিল পিটার, সে উপায় না দেখে সোজা চলে এল কর্নেলের সামনে। গুলিতে বিদীর্ণ হয়ে গেল তার বুক, 'পিটার,' বলে চিৎকার করে বন্দুকধারীর দিকে হাতের তলোয়ারটা ছুড়ে দিল কর্নেল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পড়তে তাকে ধরে ফেলল কর্নেল। বাকিরা এর মধ্যেই ছাদের কিনারার অংশে চলে গেছে। পিটারকে টেনে নিয়ে চলল কর্নেল সেদিকে। সোলেমান আক্রমণ ঠেকিয়ে পথ করে দিল তাদের।

ছাদের কিনারায় পৌঁছেই পিটারকে মাটিতে শুইয়ে দিল কর্নেল। 'কর্নেল, তুমি চলে যেয়ো, এই ভারতে তোমার জন্যে যত্না ছাড়া আর কিছু নেই,' বলেই দৃষ্টি ছিন্ন হয়ে গেল পিটারের। এই প্রথমবারের মতো বুক চিরে চিৎকার বেরিয়ে এলো কর্নেলের, পিটারের দেহ মাটিতে শুইয়ে সোজা হলো সে ছাদসংলগ্ন দেয়ালের দিকে।

'কর্নেল, আমরা আটকা পড়ে গেছি,' এগিয়ে আসা এক সৈনিকের মাথাটা পেতলের পায় দি়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে পালোয়ান বলে উঠল। কর্নেল তাকিয়ে দেখল, তারা দুর্গের একেবারে ছাদের দেয়ালের সঙ্গে, ওদের গোল করে ঘিরে ফেলেছে সৈনিকেরা। পেছনে তাকিয়ে দেখল দুর্গের দেয়ালের অন্যপাশে নদী দেখা যাচ্ছে। কর্নেল একবার সামনে একবার পেছনে দেখছে।

'ওরা থেমে গেছে কেন?' সোলেমান জানতে চাইল।

সামনের সৈন্যরা ওদের অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে ফেলে থেমে আছে। 'গ্রেপ্তার করবে?' কেউ একজন জানতে চাইল।

কর্নেল মাথা নেড়ে মানা করল। 'না, ওরা বন্দুক বাহিনীর আসার অপেক্ষা করছে। গুলি করে মারবে আমাদের,' বলেই সে মোটা কাপড় দিয়ে ঢাকা ইংরেজদের নিয়ে আসা জিনিসটা দেখল তারপর মিস্তির দিকে দেখল, 'মিস্তি, তোমার হাতবোমা আর আছে?'

'আর একটা আছে।'

'দাও ওটা,' সবাই মন দিয়ে শোন, কি করবে, এখনো বাঁচার উপায় একটা আছে,' বলে সে নিচের লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিস্তির বোমা দিয়ে আমি একটা ধোঁয়াশা তৈরি করব, আর তোমরা পেছনের দেয়াল বেয়ে নেমে যাবে। মিস্তি বোমা দাও, আর আমার একটু আগুন লাগবে,' বলেই কর্নেল হাত

সিপাহী

বাড়াল, অন্য কেউ কিছু বলার আগেই ওদের সামনে পৌঁছে গেল সৈনিক বাহিনীর বন্দুকধারীদের দল।

এবার গুলি করবে ওরা।

বর্তমান

হেলিকপ্টারের তীব্র বাতাসের চোটে মনে হচ্ছে গায়ের পোশাকও উড়ে যাবে। এর ভেতরেই বাশার যে-মুহূর্তে দেখতে পেল কন্টারটা থেকে দড়ি নেমে আসছে সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারল আবার ওদের ওপরে আক্রমণ হয়েছে এবং এই আক্রমণ যে শক্তিশালী কেউ করেছে কোনো সন্দেহ নেই। সে চিৎকার করে সবাইকে আড়ালে নিতে বলেই নিজের গ্রুক পিস্তলটা বের করে আনল। সেইসঙ্গে হাতের ব্যাগটা ছুড়ে দিল টমির দিকে।

ব্যাগটা ছুড়ে দিয়েই সে সামিরাকে ইশারা করল সামনে এগোনোর। সে আর সামিরা সামনে এগিয়ে মাটিতে গড়ান দিয়ে দুটো ছোট পিলারের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে সামনে দেখার চেষ্টা করল। কন্টারের রোটরের বাতাসে ধুলো আর বালির ঝড় বইছে, কে কোথায় আছে বোঝার উপায় নেই। কন্টার থেকে একাধিক কমান্ডোর মতো লোক নেমে আসতেই সেটা সরে গেল মাথার ওপর থেকে।

বাতাসের চাপ একটু কমতেই সে আবারো সামিরার দিকে ইশারা করল। সে আর সামিরা অস্ত্র তুলে সামনে এগোবে, সামনের দৃশ্য দেখে জমে গেল দুজনেই।

কন্টার মাথার ওপর থেকে সরে যেতেই বাতাস কমে গেল এবং ধুলো স্থির হয়ে গেল। সেই সঙ্গে ওরা দেখতে পেল, ওদের সামনে অস্ত্রত আধা ডজন কমান্ডোর পোশাকে সজ্জিত সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকেরই হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র। আর ওদের ঠিক মাঝখানে, একজন কমান্ডো নিজের অস্ত্র ধরে রেখেছে রুশোর কপালের পাশে। ‘মিস্টার বাশার আত্মসমর্পণ করুন। ব্যাগটা দিয়ে দিন।’

বাশার বড় করে দম নিয়ে নিজের অস্ত্র নামিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। সামিরাতেও ইশারা করল তাই করতে। ‘ব্যাগটা দিয়ে দিন,’ একই রকম যান্ত্রিক গলায় বলে উঠল লোকটা। বাশার টমির দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় জানাল। ‘আফসোস ! তীরে এসে হেরে গেলাম।’

বাশার-টমি-সামিরা, কান্টের তিনজনকে এক সারিতে দাঁড় করানো হলো। কমান্ডো লোকটা এখনো অস্ত্র তাক করে আছে রুশোর কপালের পাশে। ‘ওকে ছেড়ে দিন, সবই তো দিয়ে দিলাম।’

‘অবশ্যই,’ বলে লোকটা একগাল হেসে অস্ত্র সরিয়ে নিল। ভয়ে কাঁপতে থাকা রুশো ওদের দিকে এগিয়ে এল এক পা, তারপর নিজের অস্ত্রটা তুলে কিছু একটা বলে উঠল সে। ‘করছে কি ছেলেটা?’ বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল সামিরা।

‘মরবে তো এই ছেলে।’

‘এই রুশো—’ বাশার কথা শেষ করার আগেই কমান্ডো লোকটা নিজের অস্ত্র তুলল রুশোর দিকে। বাশারসহ সবাই অবাক হয়ে দেখল লোকটা অস্ত্র দিয়ে রুশোকে আঘাত করার বদলে তার হাতে দিয়ে দিল ওটা। অস্ত্রটা হাতে নিয়ে আনন্দের সঙ্গে ওটা দিয়ে দুটো ফাঁকা ফায়ার করল রুশো, তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলে উঠল, ‘ড্যাম, এমন আনন্দ আমি জীবনে খুব কমই পেয়েছি,’ বলে সে জোরে হেসে উঠে যোগ করল। ‘এটুকু শো-অফ তো করা যেতেই পারে।’

অতীত

ওদের সামনে দাঁড়ানো সৈনিকেরা বন্দুক তাক করল কর্নেলদের দিকে, মিস্তির দেয়া হাতবোমাটা ছুড়ে দিল কর্নেল একেবারে ওদের পায়ের কাছে। বোমাটা মাটিতে পড়ার আগেই কর্নেল লাফ দিল ছাদের কিনারায় রাখা মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা জিনিসটার দিকে। এক টানে সরিয়ে ফেলল ওটার ওপরের আবরণ। দরবারে জন যখন বসেছিল রাজা বিক্রমের জন্য বিশেষ উপহার এনেছে, তখনই কর্নেল অনুমান করেছিল জিনিসটা কী হতে পারে, আর ছাদে এসে ওটা ঢাকা অবস্থাতেও সে বুঝতে পেরেছে এটা একটা কামান।

কর্নেলের পরিকল্পনা সহজ। দুর্গের এই দিকের ঠিক পেছনের অংশেই নদী। তার লোকেরা দুর্গের দেয়াল বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে যেতে পারবে যদি সে তাদের খানিক সময় দিতে পারে। আর সেজন্য সে রয়ে যাবে পেছনে, আর অন্যরা নামতে শুরু করবে দেয়াল বেয়ে। একবার নামতে পারলে নদীতে সাঁতরে বা কোনো নৌকায় করেই পালাতে পারবে তারা। কর্নেল যেই মুহূর্তে বোমাটা ছুড়েছে সেই মুহূর্তে বাকিরা নামতে শুরু করেছে পেছনের দেয়াল বেয়ে।

সিপাহী

জিনিসটার কাছে পৌছেই এক টান দিয়ে কাপড়টা সরিয়ে খুশি হয়ে উঠল কর্নেল। সে একটা বোমা তুলে কামানের পেছনের অংশ দিয়ে ভরবে, সোলেমান এসে হাত লাগাল তার সঙ্গে। ‘তুমি নামোনি?’ রাগের সঙ্গে বলে উঠল কর্নেল। সোলেমান কিছু না বলে গোলাটা ভরল, তারপর কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘হুজুর, আপনি একা পারবেন না,’ বলেই সে যোগ করল কোনদিকে ঘোরাব,’ কর্নেল দেখল সময় নেই, সৈন্যরা ধোঁয়া কাটার অপেক্ষা করছে। আর খোলা জায়গাতে দ্রুতই ধোঁয়া কেটে যাবে। কর্নেল সোলেমানের সঙ্গে হাত লাগিয়ে কামানটাকে সোজা তাক করল তাদের দিকে।

একবার নিজের গোঁফে তা দিয়ে কর্নেল বলে উঠল, ‘আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে চকমকি পাথর ঠুকবে,’ বলে সে চিৎকার করে উঠল, সোলেমান কামানের সলতের একপাশে পাথর আর অন্যপাশে নিচের ছুরিটা রেখে ঘষা মারল, পড় পড় করে পুড়তে পুড়তে ব্যাপক শব্দ করে একটা গোলা ছুটে গেল সৈনিকদের দিকে। যেদিকে পারল লাফিয়ে পড়ল, অন্যরা ওই অংশের দেয়ালের সঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ‘আবার,’ বলে কর্নেল আবারো গোলা ভরল, পাথর আর ছুরি ঘষে দিল, আরেকটা গোলা ছুটে গেল ওদের দিকে। ‘আবার,’ একই কায়দা পুনরাবৃত্তি হলো। শত্রুপক্ষের সৈনিকেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, যারা এখনো সোজা গুলি করল ওদের।

কর্নেল আবার নির্দেশ দিতে যাবে, গুলি খেয়ে পড়ে গেল সে। সোলেমান তাকে টেনে তুলে সোজা করল, তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে চলল ছাদের কিনারার দিকে, একাধিক সৈনিক পেছন থেকে বন্দুক তুলেছে, কর্নেলকে জড়িয়ে ধরে দুর্গের দেয়াল থেকে লাফ দিল সোলেমান।

বর্তমান

হঠাৎই যেন ছোট টিলার ওপরের জায়গাটা খুব সুনসান হয়ে গেছে। পাশের টিলার ওপর থেকে কন্টারের রোটরের আওয়াজ আসছে কিন্তু সেটা খুব বেশি না, বাশার সোজা হয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল রুশোর দিকে, তাকে চিৎকার করে থামতে বলল কমান্ডার পোশাক পরা লোকগুলো, কিন্তু সে শুনল না। রুশোর সামনে যেতেই এক কমান্ডো এসে তার বুকে চেপে ধরল সাবমেশিনগানের নল। ‘আরে আন্তে আন্তে,’ বলে রুশো এক হাতে সরিয়ে দিল নলটা, কপট রাগের সঙ্গে সে বলে উঠল, ‘হাজার হলেও বাশার সাহেব আসলে আমার কলিগ, একসঙ্গে কতগুলো কাজ সমাধা করলাম আমরা। ঠিক না?’ বলে সে বাশার এবং সামিরার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে দিল।

‘তুমি, তুমি ওদের লোক?’ বাশার রাগের সঙ্গে কথা বলতে পারছে না।

‘না, মিস্টার বাশার, আমি ওদের লোক নই,’ বলে সে তার পেছনের লোকগুলোকে দেখাল। ‘ওরাই আমার লোক, শুধু ওরাই না, সিলেটের জেড মাস্টার, চট্টগ্রামের মিস্টার ইউ, এরা সবাই আমার লোক,’ বলে সে নিজের মোটা লেন্সের চশমা খুলে মাটিতে ফেলে দিল। ‘জিনিসটা খুব বিরক্ত করেছে গত কয়টা মাস। যাক গে,’ বলে সে নিজের পোশাক টানটান করে নিতে নিতে বলে উঠল। ‘এমনকি আসলে ডেভিডও আমার লোক ছিল। ডোন্ট মাইন্ড মাই ম্যানারস, অধমের নাম আসলেই রুশো, তবে আমার আরেকটা নাম রয়েছে, আমি রেলিকের এশিয়ান জোনের প্রধান, আমাকে আমার কাজের জগতে সবাই প্রডিজি কিং বলে চেনে।’

‘হাউ কাম!’ বাশার বলে উঠল। সে এখনো মেনে নিতে পারছে না এভাবে বোকা বনেছে। ‘তুমি নিজে রিফাতের সঙ্গে চাকরি করেছো, তুমি তাকে অপহরণের সময়ে গুলি খেয়েছো। আমি নিজে সিসিটিভি দেখেছি। আরো অসংখ্য বিষয় আছে—’

‘একে একে বলছি, এটুকু ব্যাখ্যা তো আপনাদেরই পাওনা,’ বলে সে হেসে উঠে ব্যাগটা নিজের হাতে নিয়ে সেটার স্ট্র্যাপ গলিয়ে দিল কাঁধের ওপর দিয়ে। ‘প্রথমেই বলি, আমার নাম রুশোই। আমি বাংলাদেশি বংশদ্ভূত। আপনারা হয়তো ভাবছেন, আমার যে-বয়স, তাতে আমি ডেভিডের বস হই কীভাবে। প্রথম কথা, আমি আসলে এত কম বয়স্ক নই যতটা লাগে। আর আমি প্রডিজি, জিনিয়াসও বলতে পারেন, বারো বছর বয়সে আমি আর্কিওলজিতে পি-এইচডি শেষ করি এবং অনুমান করেন আমার বিষয় কি ছিল।’

‘সিগনেট রিং,’ কাস্টের চেক শার্ট মেয়েটা বলে উঠল।

‘ভেরি গুড ম্যাডাম,’ রুশোর গলায় আন্তরিক খুশি। ‘আমিই রেলিককে আইডিয়া দিই সিগনেট রিংয়ের সম্ভাব্য অবস্থান কোথায় হতে পারে। ওরা ডেভিডকে নিয়োগ দেয় এই কাজে। ডেভিড আমারই দেখানো পথে কাজ শুরু করে। প্রাথমিকভাবে সে দারুণ সফলও হয়। এরপর সে হঠাৎ হারিয়ে যায়। তার আসলে কী হয় আমরা জানতে পারিনি। সে যা খুঁজে পেয়েছিল সেগুলোর কি করেছে, সেটাও ঠিকভাবে বের করতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম সে নিজের পরিচয় পাল্টে জিনিসগুলো নিয়ে পাশিয়েছে। আনটিল—’ বলে সে বাশারের দিকে আঙুল তাক করল।

‘আমি তার মৃতদেহ পুকুরের নিচ থেকে উদ্ধার করি—’

সিপাহী

‘ডেরি শুড। এরও আগে মিতায়নকে সিলেটে এবং আরেকজনকে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। আপনি ডেভিডকে উদ্ধারে পর আমি ভাবি এবার আমাকে নামতে হবে। এর ভেতরে আপনাদের খুব উঁচু মহলের একজন আমাকে হেল্প করার নিশ্চয়তা দিলে,’ বলে সে হেসে উঠল। ‘সব বলব না। স্রেফ এটুকু বলি, সিলেট-চট্টগ্রামে এবং কিশোরগঞ্জে যা পেয়েছেন সবই আলটিমেটলি আমার কাছে আসবে।’

‘রিফাতকে অপহরণ করলে কেন? আর এত নাটকই বা করলে কেন?’ সামিরা রাগের সঙ্গে বলে উঠল।

‘আমি আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই, তবে আপনাদের সঙ্গে যেহেতু আমাকে আরো কাজ করতে হবে, কাজেই আমি বলছি। রিফাত আপার সঙ্গে কাজ করতে করতে আমি ভাবছিলাম ডেভিড যা খুঁজে পেয়েছিল সেগুলোর উদ্ধারের কাজটা নিজে না করে পুলিশের কাউকে দিয়ে করালে বেটার হয়। এমন না যে আমি বা আমার সংগঠন পারবে না। কিন্তু অভিজ্ঞ একজন ইনভেস্টিগেটর করলে অনেক সহজ হবে। আর পুলিশ হিসেবে তার ভালো এক্সেসও থাকবে। প্রফেসর ইফতেখার উদ্ধারের পরও সবকিছু যাতে আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং ডেভিডের আগের উদ্ধার করা জিনিসগুলো যাতে আমরা ফিরে পাই, সে জন্যই রিফাত আপাকে অপহরণ করে, আপনাদের মাঠে নামানো হয়। আর রিফাত আপাকে উদ্ধারের সময় আমাকে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা, গুলি খাওয়া এই নাটকগুলো করতে হয়েছিল যাতে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন, নিজেদের দলে নেন। গুলিটা না খেলে আমি যে ভিক্টিম এটা বিশ্বাস করানো মুশকিল হতো। আমি বস হলেও এই কেসের একেবারে কেন্দ্রে আমার থাকাটা খুব জরুরি ছিল, একদিকে আমি আমার জ্ঞান দিয়ে সহায়তাও করছিলাম আপনাদের তদন্তে, অন্যদিকে, আমি আপনাদের হাতে তুলে দেয়া রিঙ থেকে ধুরু করে পুরো তদন্ত প্রক্রিয়ার অগ্রগতির ওপরে নজরও রাখছিলাম।’

‘তাহলে একটা রিং যে রয়ে গেল পিবিআইএস ল্যাবে?’ টমি বলে উঠল বিস্ময়ের সঙ্গে।

হেসে উঠল রুশো। ‘আছে, তবে ওটাও আসবে আমার হাতেই।’

‘ইনসপেক্টর রবিউল,’ বাশার মন্তব্য করার মতো বলে উঠল। ‘তোমার লোক তাই না?’ রুশো হেসে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ‘মূলত তাকে আমাদের দলে ভেড়ানোর জন্যই চরপাড়ার নাটকটা সাজানো হয়েছিল, তাইনা?’

‘হ্যাঁ, ওটা না করলে তাকে বিশ্বাস করতেন না আপনারা। পিবিআইএসে যা আছে, প্রয়োজনে যেকোনো মূল্যে সে আমাকে এনে দেবে। আসলে সবই

গল্প শেষের শুরু

আমার পরিকল্পনা করা ছিল আগে থেকে। পুরো কেসে স্রেফ একবার সবকিছু আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেছিল।’

‘আমি বলি,’ সামিরা বলে উঠল পাশ থেকে। ‘বিপিন পার্কের সামনে যখন কাল্টের ওরা ডেভিডের ডায়েরি ছিনিয়ে নেয়, ঠিক না?’

‘একদম ঠিক, খুবই মেজাজ খারাপ হয়েছিল, মনে হচ্ছিল সব গেল,’ রুশোর চোখে গলায় অস্থিরতা। ‘তবে মিস্টার বাশার আপনি যেভাবে জিনিসগুলো ওদের হাতে তুলে দিয়ে ট্র্যাপ করলেন, ওটা ব্রিলিয়ান্ট ছিল, মানতেই হবে,’ প্রডিজি কিং এর গলায় প্রশংসা।

‘তুমি বললে কিশোরগঞ্জে যা উদ্ধার হয়েছে সবই তোমার হাতে আসবে, কীভাবে—’

জোরে হেসে উঠল প্রডিজি কিং, ‘মিস্টার বাশার, আপনার কোন ধারণা নেই, আপনাদের সংস্থার কত ওপরের মহলের লোক জড়িয়ে আছে আমাদের সঙ্গে। সিলেট চট্টগ্রাম সবখান থেকে সব আমার কাছেই আসবে, তবে—’

‘রিফাত কোথায়?’ রাশার থমথমে গলায় বলে উঠল। ‘আর আমাদের নিয়ে কি করতে চাও?’

‘রিফাত কোথায় এই প্রশ্নের উত্তর খুব মজার। তাকে যেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল সে ওখানেই আছে। যে-মার্সেনারি দল তাকে অপহরণ করে, তারা তাকে অপহরণ করে পাতালের ভেতরে ঢুকে পড়ে বাইরে বের না হয়ে। আর বাইরের বিষয়গুলো সাজানো হয় একদিকে আপনাদের বিশ্বাস করানোর জন্য—যে তাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে, সেই সঙ্গে আপনাদের হাতে কুগুলো তুলে দেয়ার জন্য।’

এই পর্যন্ত বলে সে একটা হাত তুলল। ‘আর আপনাদের নিয়ে কী করা হবে সেটাও বলছি। ইনসপেক্টর বাশার সামিরা এবং সে কাল্টের চেক শার্ট মহিলাকে দেখাল। আপনারা তিনজনে মিলে আমার জন্য আরেকটা কেস সলভ করবেন। ছয়টা সিগনেট রিংয়ের বেশ কয়েকটার হদিস আছে এখন, থ্যাংকস টু ডেভিড। কিছু রিং এখনো মিসিং। একটার শেষ সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল দেশভাগের সময়ে অন্যটা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে, আপনারা আমার জন্য ওই দুটো খুঁজে বের করবেন। না হলে আপনাদের সঙ্গী বলে সে কাল্টের দুজনকে দেখাল, আর রিফাতকে মেরে ফেলা হবে।’

‘এসব কিসের জন্য?’ বাশার ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইল। ‘সব সিগনেট রিং দিয়ে আসলে হবে কি?’

সিপাহী

রুশো হাসল। 'ধরেন আপনি একটা টিভি সিরিজ দেখছেন, পুরো সিরিজ সাত সিজনের, আপনি এখন পঞ্চম সিজনে আছেন। এই পর্যায়ে এসে পুরো গল্পের মূল রহস্য বোঝার দুটো উপায় আছে। এক, সব কু এর মধ্যে দেওয়া আছে, মূল জিনিসটা আপনি মাথা খাটিয়ে বের করবেন। দুই, যদি মাথা খাটিয়ে বের করতে না পারেন আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে সব জানার জন্য।'

বলে সে বাকিদের দিকে তাকিয়ে হাসি দিয়ে বলে উঠল, 'এখন আমরা যাব,' বলে সে হাতের ইশারা করতেই পাশের টিলা থেকে হেলিকপ্টারটা শূন্যে উঠে এসে ছিন্ন হলো তাদের মাথার ওপরে, ওটা থেকে নেমে এলো একটা মই।

'চলুন, নতুন পৃথিবীর দিকে যাওয়া যাক।'

রুশো ওঠার পর বাকিদের অস্ত্রের মুখে তোলা হলো হেলিকপ্টারে।

অতীত

কর্নেলের মনে হতে লাগল সে অন্ধকারের ভেতরে ডুবেই যাচ্ছে ডুবেই যাচ্ছে। হঠাৎ কেউ তাকে টেনে তুলে বসিয়ে দিল। নাক-মুখ থেকে এক গাদা পানি উগড়ে দিয়ে কাশতে কাশতে উঠে বসল কর্নেল। 'আহ, যাক বাঁইচা আছে,' কেউ একজন বলে উঠল পাশ থেকে। যদিও কাশছে, তাও কর্নেল বুঝতে পারল মানুষটা পালোয়ান। 'অবশ্যই আমি বেঁচে আছি, সোলেমান কোথায়?' এক হাতে মুখ মুছতে মুছতে কর্নেল উঠে বসে জানতে চাইল। 'ও ঠিক আছে?'

'এই যে হজুর,' তার থেকে খানিক দূরে জাহাজের কাঠের পাটাতনে গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে সোলেমান। কর্নেল দেখল, পালোয়ান বসে তার কুকুরটার পিঠে হাত বোলাচ্ছে, তার পাশেই ত্রিলোক, অন্যপাশে মিস্তি। একটা গদির মতো কিছুতে হেলান দিয়ে বসে আছে ভিক্টর, দেখে মনে হলো ঘুমাচ্ছে সে। কায়াকে কোথাও দেখতে পেল না।

'আমরা আছি কোথায় এখন, এটা কি?' চারপাশে দেখতে দেখতে কর্নেল খুব অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'এটা একটা ছোট জাহাজ,' জাহাজটার হালের কাছ থেকে, কায়া বলে উঠল। 'জাহাজটা দুর্গের পেছনে নদীতে ছিল। সম্ভবত এইটাতে কইরাই ইংরেজরা আসছিল রাজা বিক্রমের লগে দেহা করতে। ওরা সেই আঙটিটা নিতে, আর কামানটা দিতে আসছিল। দুর্গের পেছনে একটা পুলির মতো লাগানি ছিল দড়িসহ, ওইটা দিয়াই মনে হয় কামানটা তোলা অইছিল। আমরাও ওইটা বাইয়াই নাইমা আসছি।'

‘কর্নেল তুমি সময় না দিলে অবশ্য হইত না, কেউই বাঁচতাম না আমরা,’ পালোয়ান যোগ করল, তার হাতে সাধের হুকো। দু টুকরো হয়ে গেছে ওটা। ‘তোমারে নিয়া সোলেমানরে লাফায়া পড়তে দেইখা আমরা ভাবছিলাম, তোমরা আর বাঁচবা না। কিন্তু পানিতে পড়াতে আর সোলেমান তোমারে আগলাইয়া রাখাতে বাইচা গেছ। কাউয়ার জান দুইটারই,’ পালোয়ানের কথায় হেসে উঠল সবাই।

‘এখন করণীয় কি?’ কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল। ‘পালোয়ান তো ফিরা যাবা নিজের গ্রামে—’

‘আমিও যাব পালোয়ানের সঙ্গে,’ ত্রিলোক বলে উঠল। ‘আমার পরিবার ওইখানেই আছে, নিজের শহর খেইকা তো উৎখাত হয়ে গেছি, পারলে পালোয়ানের গ্রামেই রয়ে যাব।’

কর্নেল মাথা নেড়ে সায় জানল। ‘আমি ভিক্টরকে নিয়ে গোপনে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেব। ভিক্টর অসুস্থ, ওকে সেবা করে শারীরিক এবং মানসিকভাবে আমাকেসুস্থ করে তুলতে হবে। ভারত থেকে ইংল্যান্ডে যাওয়া কঠিন হবে তবে একবার ইংল্যান্ডের মাটিতে পা রাখলে আর সমস্যা নেই। আমার তো আর পরিবার নেই, ভিক্টরকে সুস্থ করে তুলব, বন্ধু পিটার আর আর্থারের কথা স্মরণ করব। কায়্যা কি এখনো মিস্তিকে মারতে চায়?’

কর্নেলের কথার কোনো জবাব দিল না কায়্যা, সে জাহাজের হাল ধরে বসে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে। মিস্তিরও মুখে কোনো ভাষা নেই।

‘হজুর আমার একটা কতা বলার আছে,’ কায়্যা বলে উঠল হালের পাশ থেকে। ‘আসলে ক্ষমা চাওয়ার আছে। মুঙ্গির বাড়ি খেইকা বাইর হওয়ার পর মৃত আর্থার সাহেবের বাড়ির বাইরে আপনেনগোরে নিজামের সৈনিকেরা ধাওয়া করছিল, ওইটা আমার কাজ আছিল। মুঙ্গিরে দিয়া আমি খবর পাঠাইছিলাম, আসলে আমি তহন—’ সে কথা শেষ না করে মুখ তুলল। ‘রাজা বিক্রমেরে খুন করার জন্যে, মিস্তিরে—’ সে কথা শেষ করল না।

‘হিংস্রতাও ক্ষেত্রবিশেষে ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ,’ কর্নেল বলে উঠল। ‘শোন তোমাদের দুজনার জন্য দুজনার যে ভালোবাসা, সেটা নষ্ট হতে দিও না। মিস্তি, তুমি তোমাদের গোত্রের জিনিসগুলো তোমার যে-বন্ধুকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলে তার মাধ্যমে তুলে দিয়ে জানিয়ে দাও—তুমি আর ফিরবে না। কায়্যা যেহেতু বিক্রমকে হত্যা করতে পেরেছে, তার গোত্রও হয়তো ওর বিদায় মেনে নিতে পারে কিংবা নাও পারে। তোমার নিজের গোত্রকে মানানোর কাজ তোমাদের। তোমরা দুজনে সরে পড়া অন্য কোনো দেশে, যেখানে হয়তো তোমাদের যোত্র নাও পৌছাতে পারে।’

সিপাহী

মিস্তি তাকিয়ে আছে কায়ার দিকে। কায়ার মাথা নেড়ে সাই জানাল।

‘একটা উপায় আছে,’ কথাটা বলল কায়ার, সে রাজা বিক্রমের দরবার থেকে নিয়ে আসা বটুয়াটা দেখাল। ‘এইটায় সেই আঙুটি আছে। হয়তো দুই গোতের লগে এইটা দিয়া আমি আর মিস্তি নিজের গোর জানের আর মুক্তির সওদা করতে পারবো। আর না পারলে আমরা নিজেরাই এইটা ধারণ করব। এবার মিস্তি মাথা নেড়ে সাই জানাল কায়ার কথায়।

‘শেষ একটা কথা বলার আছে যদিও,’ কর্নেল ফিরে তাকাল সোলেমানের দিকে। ‘সোলেমান তুমি কি করবে? সেনাবাহিনীতে তো আর ফিরতে পারবে না?’

‘হজুর আমি জানি না,’ সে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে।

‘তুমি কি তোমার আসল পরিচয়টা দেবে সবাইকে?’ কর্নেল মৃদু হেসে বলে উঠল।

‘আসল পরিচয় মানে?’ পালোয়ান ত্রিলোকসহ সবাই ফিরে তাকাল সোলেমানের দিকে।

‘তুমি বলবে না আমি বলব?’ কর্নেলের প্রশ্নের জবাবে সোলেমান মাথা নিচু করে আছে।

‘আমি বলি,’ কর্নেল বড় করে দম নিল। ‘সোলেমানের আসল নাম সোলেমান নয়, ওর নাম সম্ভবত কিরণ। ও ইউসুফির ছেলেও নয়, ও আসলে কেদারের ছেলে। যাকে আমার পরিবারকে হত্যার ষড়যন্ত্রের দায়ে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। কি আমি ঠিক বলছি?’ সোলেমান চুপ। ‘সোলেমান সম্ভবত আমাদের সঙ্গে এসেছিল, আমাকে হত্যা করতে, কেন করেনি সে আমি জানি না। সোলেমান তুমি কিছু বলবে?’

সোলেমান চুপ, আলতো করে জানতে চাইল, ‘আপনে কখন বুঝতে পারলেন হজুর?’

‘আমি মোটামুটি গুরুতেই ধরতে পেরেছিলাম,’ কর্নেল আনমনে বলে উঠল। ‘কারণ আমার পরিষ্কার মনে ছিল, ইউসুফির ছেলের চোখের রং ছিল কটা। আমার ছেলে জর্জ, ইউসুফির ছেলে আর কেদারের ছেলে একসঙ্গে খেলত, তাই আমার মনে আছে। এরপর একবার তুমি ভুলে তোমার নাম বলে ফেল। নদীর কাছে মাছ ধরতে ধরতে তুমি যখন তোমার বাবাবে স্বপ্ন দৃশ্যের বর্ণনা করছিলে, তখন তুমি নিজের নাম বলে ফেল ভুলে, তুমি বলো তোমার বাবা স্বপ্নের ভেতরে তোমাকে কিরণ ডেকেছে। তখন আমি আরো নিশ্চিত হই। একটাই কথা জানার আছে, তুমি আমাকে মারতে এসেও কেন মারলে না?’

‘হজুর আমার বাবা নির্দোষ ছিল, সে কিছুই করে নাই, তারে ফাঁসানো হইছিল, কিন্তু আপনে তারে মুক্ত না করে অভিমান করে ভারত ছেড়ে চলে

গল্প শেষের শুরু

যান। তারে ফাঁসি দেয়া হয়। আমার জীবন সাংঘাতিকভাবে বদলাইয়া যায় বেইমানের ছেলে হিসেবে বড় হইতে হয় আমার। আমার বাবার ফাঁসির পর আমাদের দুই পরিবার একসঙ্গেই ছিল, এরপরে ইউসুফি চাচার ছেলে এবং স্ত্রী কালাজুরে মারা গেল, আমি দেখি এইটাই সুযোগ তার ছেলের পরিচয় নিয়া নেই আমি, ততদিনে আমার মা-ও মারা গেছে। তাই সমস্যা হয় নাই। আমি ইউসুফি চাচার ছেলের পরিচয়ে মিলিটাতে চাকরি পাই। আমার ইচ্ছা ছিল আপনাদের খুঁইজা বাইর করার। এরপর একসময় শুনি আপনে আসতাহেন ভারতে। এরচেয়ে বড় সুযোগ আর পাবো না, সেইটাই নিয়া নেই। আমার ক্ষোভ ছিল আপনার ওপরে, কিন্তু আপনার লগে কাম শুরু করার পর বুঝলাম, আপনার নিজের পরিবারের মৃত্যু যেমন কষ্ট দেয় আপনাকে, আমার বাবা এবং অন্যদের পরিণতিও আপনাকে একই কষ্ট দেয়। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারি, আমি এতদিন আপনাকে ভুল বুঝতাইলাম, সে বড় করে দম নিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল।

কর্নেল উঠে এসে সোলেমান ওরফে কিরণের কাঁধে হাত রাখল। 'দিল্লিতে যখন আমাদেরকে ফাঁসি দেয়ার জন্যে নিয়ে যায় সেই বিদ্রোহী লোকটা, খন্দকার, একটা কথা বলেছিল, আমরা সবাই সিপাহী, সবাই নিজের মতো করে নিজেদের লড়াই লড়ছি। লোকটা হয়তো আর বেঁচে নেই, কিন্তু তার কথাগুলো মনে রয়ে গেছে। আমি, তুমি, আমরা,' কর্নেল নিজের লোকদেরকে দেখল। 'তোমার বাবা, আমরা সবাই সিপাহী, আর আমাদের সবচেয়ে বড় লড়াই সময়ের সাথে। এই গল্প সিপাহীর গল্প, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সিপাহীদের গল্প। আমি আগে একটা ছেলে হারিয়েছিলাম, মিস্তি যেমন বলেছিল, আমি আমার আত্মার সন্ধান করতে ফিরে এসেছি ভারত, আমার বিশ্বাস আমি আমার আত্মা খুঁজে পেয়েছি। তুমিই আমার সেই হারানো অংশ। তুমি যাবে, আমার আর ভিক্টরের সঙ্গে ইংল্যান্ডে? আমার দস্তক ছেলে হবে?' সোলেমান ওরফে কিরণ কিছু না বলে সম্মতির সঙ্গে হাসি দিল কর্নেলের দিকে তাকিয়ে।

বেলা পড়তির দিকে, সূর্যের অপসৃয়মান লালচে আলোয় নদীর পানি কেটে নৌকাটা এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে। সেই আলোয় রাঙা হয়ে একাধিক মানুষ এগিয়ে চলল তাদের নতুন ভবিষ্যতের দিকে।

পেছনে রেখে যাচ্ছে হাজার বছরের পুরনো এক রহস্য, শত বছর ধরে যার সন্ধান করে বেড়াবে মানুষ।

শেষ কথা

‘এখন আমরা কি করব?’ জয়া সরকার বলে উঠল—

পাটোয়ারি চিন্তিত মুখে বলে উঠল, ‘সাবধানে এগোতে হবে আমাদের। যেকোনোভাবেই হোক বাশারের সন্ধান বের করতে হবে, সিলেট আর চট্টগ্রামে তানভীর আর শারিয়ারকে সাবধান করে দিতে হবে। যেকোনো উপায়ে ওদেরকে জানাইতে হবে এই সব ষড়যন্ত্রের চাবিকাঠি সম্ভবত হাবিব আনোয়ার পাশার হাতে। সমস্ত ঘটনার মূলেও আছে আনোয়ার পাশাই। যদি আমরা নিজেরা এক হতে পারি তাহলে এর একটা সমাধান বের করা যাইতে পারে। সবাইরে রক্ষা করা যাইতে পারে আনোয়ার পাশার হাত ধেইকা। তবে বিষয়টা কঠিন অইবো, কারণ পিবিআইএসের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ এহন সে।’

‘তাহলে কাজ শুরু করি আমরা,’ জয়া সরকার বলে উঠল অস্ফুট স্বরে।

কিন্তু জয়া সরকার জানে না, তারা যখন ময়মনসিংহের ল্যাভে বসে ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস করছে, ঠিক সেই সময়ে বাশার যখন হেলিকপ্টারে করে উড়ে চলেছে বন্দি অবস্থায়, প্রায় কাছাকাছি সময়ে সময়ে সিলেটের সাধারণ একটা গুদামঘর থেকে একটা গাড়ি রওনা দিল ঢাকার দিকে। তার ভেতরে এক বন্দি একাধিক অফিসার এবং সেটার নেতৃত্বে তানভীর মালিক। আর চট্টগ্রামে একটা গাড়ি এসে থামল ট্রেন স্টেশনে। সেখান থেকে একাধিক লোক উঠে পড়ল ট্রেনের একটা কামরায়। এই টিমের ভেতরে রয়েছে একাধিক অফিসার, একজন বন্দি এবং এই টিমের নেতৃত্বে অফিসার শারহান শারিয়ার।

এই দুটো অপারেশনের খবর এবং বিস্তারিত জানে স্রেফ একজন মানুষ। সিলেট এবং চট্টগ্রামের অপারেশন শুরু হয়ে গেছে শুনে মৃদু হাসি ফুঁটে উঠল হাবিব আনোয়ার পাশার মুখে।

[সময় উপাখ্যান সিরিজের পরবর্তী বইয়ের নাম ‘অশ্বারোহী’]

মিসেস



সূত্র অঙ্ককার যেন উলটো হয়ে থাকা জল্লাদের খড়্গের মতো ঝুলে আছে দিল্লি শহরের ওপরে।

আর সেই অঙ্ককারের ওপরে প্রলেপ বুলাচ্ছে অদ্ভুত নিখর এক নীরবতা। আজ থেকে কয়দিন আগেও এই সময়ে যে শহর প্রাণচঞ্চল থাকত অলিগলিতে জমায়েত হওয়া মানুষের মুখরতায়, সেখানে আজ সন্ধের গাঙি পার হওয়ার আগেই অর্ধমৃতের মতো মুখ খুবড়ে সন্ধের কালিগোলা অঙ্ককারের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে সেই প্রাণচঞ্চল মুখরতা। প্রাণচাঞ্চল্য তো দূরে থাক, পুরো শহর আজ যেন প্রাণের ভয়ে ভীত।

এমনই এক সময়ে দিল্লিতে প্রবেশ করল এমন একজন মানুষ, যার আসলে দিল্লি থেকে বহু দূরে অবস্থান করার কথা।

অন্যদিকে আরেকজন মানুষ দিল্লি থেকে পালানোর পরিকল্পনা করছে।

পরস্পর অজানা এবং অচেনা এই মানুষ দুজনার ভেতরে সম্পর্কটা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে পুরনো সম্পর্কগুলোর একটা :

একজন শিকার এবং অন্যজন শিকারি।



<https://www.facebook.com/anyadhara> অন্যধারা



ISBN 978-984-98319-4-5

9 789849 831945